চিত্র-১ ঃ 'সোরাই'/ 'জোরাই' (২৪.৫.২)

চিত্র-২ ঃ দা-পর্বতিয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত পাথরের মন্দিরের দ্বার (২৪.৩)

মুখবন্ধ

বাংলা ভাষার মাধ্যমে আসামের ইতিহাস জানার এবং আসাম-চর্চার চাহিদা ও আগ্রহ ইদানীং যেভাবে বাড়ছে তাতে অনুপ্রাণিত হয়েই একদিন নিজের মাতৃভাষায় বর্তমান গ্রন্থটি লেখার কাজ শুরু করেছিলাম। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠক্রম, গবেষক ও সাধারণ পাঠকের দাবি অনুযায়ী, দুটি খণ্ডের অধ্যায়গুলি ভাগ করেছিলাম। প্রথম খণ্ডটি প্রাচীন থেকে আহোম যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মোট তেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বর্তমান খণ্ডটি আধুনিক পর্বের এবং চোদ্দ থেকে চব্বিশ অধ্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত। কয়েকটি অধ্যায় রীতিমতো বড়ো হয়ে গেছে—যেমন, সপ্তদশ, দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। কিন্তু এরপরেও অনেক প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা গেল না—বিশেষত, বর্তমান আসামের জ্বলন্ত সমস্যার গতি-প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া। আধুনিক আসামের যাঁরা গর্ব ও অহংকার, তাঁদের মধ্যে সপ্তদশ অধ্যায়ে মাত্র সাতাত্তর জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পেরেছি; আরও কিছু নাম অবশিষ্ট রয়ে গেল। বাংলা ভাষায় আসামের ইতিহাস সংকলনের যে অভাববোধ এতদিন ছিল সেটি সাধ্যমতো মেটাতে গিয়ে কমপক্ষে চারটি বছর ব্যয় করেছি; তবু কিছু অপূর্ণ রয়ে গেল। যেসব গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে এই দুটি খণ্ড তৈরি করতে পেরেছি তার তালিকা (গ্রন্থপঞ্জি) দুটি খণ্ডেই উল্লেখ করেছি এবং এটি আমার মৌলিক কাজ বলে একবারও দাবি করিনি। শুধুমাত্র ঘটনা বিবৃতিই নয়, ঘটনা-বিশ্লেষণের জন্য যা প্রয়োজন সেটি সাধ্যমতো করার উদ্যোগ নিয়েছি। পথদ্রষ্টা হিসাবে আসামের যেসব ঐতিহাসিকদের লেখায় অনুপ্রাণিত হয়েছি তাঁদের মধ্যে সূর্যকুমার ভুঁইয়া, অমলেন্দু গুহ, মহেশ্বর নিয়োগ, হেরম্বকান্ত বরপূজারী, অরুণচন্দ্র ভুঁইয়া এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'NEIHA' (নীহা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বৃদ্ধ বয়সে যতটুকু পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছি তাতে বারবার মনে হয়েছে, এইসব বরেণ্য অধ্যাপক, গবেষক ও গবেষণা-সংস্থা আধুনিক আসাম ইতিহাস রচনার প্রকৃত স্থপতি।

যেহেতু প্রথম খণ্ডে আসামের মানচিত্র, সংক্ষেপিত শব্দের তালিকা ইত্যাদি ছাপা হয়েছে, এজন্য দ্বিতীয় খণ্ডে এগুলি স্থান পায়নি। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্প-সংক্রান্ত আলোচনা প্রথম খণ্ডে স্থান না পাওয়ার কারণে বর্তমান খণ্ডে সংযোজিত হল। 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'র বিধি অনুযায়ী বানান লেখার চেষ্টা করলেও কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটি থেকে যেতে পারে। কিছু নাম এক এক স্থানে ভিন্ন রকম হয়েছে—যেমন, 'গৌহাটি' / 'গুয়াহাটি' (কারণটি অবশ্য '২৪.১.৪' প্যারায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে)।
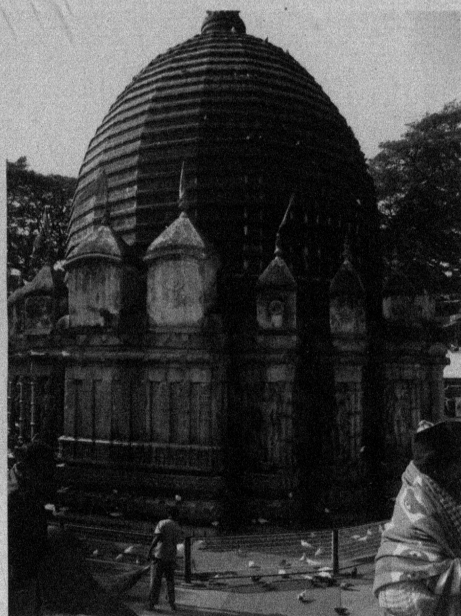
চিত্র-৩ ঃ কামাখ্যা মন্দির (২৪.২.৩)
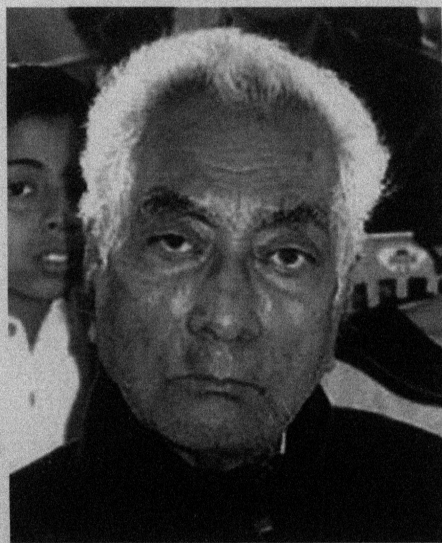
চিত্র-৪
অমলেন্দু গুহ (১৭.১)
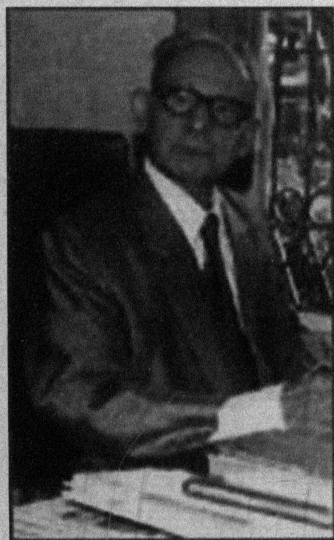
চিত্র-৫
হেরম্বকান্ত বরপূজারী (১৭.৭৬)

আসলে, অসমিয়া উচ্চারণ অনুযায়ী, বাংলা অক্ষরে সঠিকভাবে কিছু নাম লেখা কঠিন বলে মনে হয়েছে। আশা করি, পাঠক এই ত্রুটি মার্জনা করবেন।

প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডটি রচনার ক্ষেত্রে অনুসন্ধিৎসু গবেষক এবং আমার প্রাক্তন সহকর্মী 'ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়'-এর তরুণ অধ্যাপক মণিশংকর মিশ্র যেভাবে তাঁর মূল্যবান মতামতসহ একটার পর একটা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ নিয়মিত সরবরাহ করেছেন, তাতে তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। 'প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স'-এর কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ যেভাবে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে অত্যন্ত দ্রুত গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন তাতে আমি মুগ্ধ। আসলে, 'প্রগ্রেসিভ'-এর দীপক কুমার মল্লিক-এর ক্রমাগত তাগিদ ও উৎসাহের জন্যই বর্তমান খণ্ডটি লেখার কাজ এই বয়সে এত দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হল। প্রথম খণ্ডের মতো বর্তমান খণ্ডটি যদি ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠক সমাজের কাছে আদৃত হয়, তবেই সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হবে।

মহাদেব চক্রবর্তী

চিত্ৰ-৬
পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া (১৭.৩৭)

চিত্ৰ-৭
বাণীকান্ত কাকতি (১৭.৪৩)

চিত্ৰ-৮
সূর্যকুমার ভুঁইয়া (১৭.৬৮)

সূচিপত্র

চিত্ৰ-৯
লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুয়া (১৭.৬২)

চিত্ৰ-১০
মহেশ্বৰ নিয়োগ (১৭.৫৩)

চিত্ৰ-১১
বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুয়া (১৭.৪৬)

ষোড়শ অধ্যায় ঃ আসাম ও বঙ্গদেশ ৪৮৬-৫২০

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ আসামের কয়েকজন কৃতী সন্তান ৫২১-৬৯৮

চিত্র-১২
বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (১৭.৪৯)

চিত্র-১৩
বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা (১৭.৪৭)

চিত্র-১৪
হেমচন্দ্র বরুয়া (১৭.৭৪)

চিত্র-১৫
জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৭.২৮)

চিত্র-১৬
গোপীনাথ বরদোলই (১৭.২০)

চিত্র-১৭
নবকান্ত বরুয়া (১৭.৩৪)

চিত্র-১৮
রজনীকান্ত বরদোলই (১৭.৫৮)

চিত্র-১৯
পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া (১৭.৩৯)

চিত্র-২০
শীলভদ্র/রেবতীমোহন দত্তচৌধুরি (১৭.৬০)

সারণি সূচি

ভূমিকা

আসাম ঃ আধুনিক ইতিহাসের সময়রেখা (Assam : Timeline of Modern History)

সময় (খ্রিস্টাব্দ)	ঘটনা
১৭৭১	আহোম রাজার অনুরোধে আসামে বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির (EIC) সামরিক সাহায্য দান।
১৭৯৩	আসামে আহোমদের সাথে EIC'র বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও চুক্তি।
১৮১৯	অসমিয়া গদ্যে 'বাইবেল' প্রকাশ (মিশনারিদের উদ্যোগে)।
১৮১৯-১৮২৪	আসামে বর্মী শাসন এবং পুতুল আহোম রাজা।
১৮২৩	আসামের সাদিয়া অঞ্চলে বনজ চা-গাছের আবিষ্কার।
১৮২৪-১৮২৬	প্রথম ইঙ্গো-বর্মী যুদ্ধ এবং আসাম প্রায় শ্মশানে পরিণত এবং চারদিকে অরাজকতা।
১৮২৬, ২৪ ফেব্রুয়ারি	ব্রহ্মদেশের (মায়ানমার) সাথে EIC'র ইয়ান্দাবো চুক্তি। আসামে বর্মী কর্তৃত্বের অবসান এবং ব্রিটিশ কর্তৃত্বের সূত্রপাত। আহোম রাজতন্ত্রকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে বিদায় জানানো না হলেও, EIC'র সামরিক শাসনের প্রতিষ্ঠা। ডেভিড স্কট (১৭৮৬-১৮৩১)-এর আশ্বাস ঃ অবস্থা স্বাভাবিক হলে আবার আহোম রাজাদের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।
১৮২৮	নিম্ন আসামকে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'র অভ্যন্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা। EIC'র শাসনের বিরুদ্ধে ধনঞ্জয় বরগোঁহাই ও গোমাধর কুঁওর-এর নেতৃত্বে আহোম অভিজাতদের প্রথম বিদ্রোহ।
১৮২৯	তিরোট সিং-এর নেতৃত্বে খাসি বিদ্রোহ।

সময় (খ্রিস্টাব্দ)	ঘটনা
১৮৩০	EIC'র বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিদ্রোহ এবং জিউরাম দুলিয়া বরুয়া ও পিয়ালি বরফুকনের ফাঁসি।
	কাছাড়ি রাজা গোবিন্দচন্দ্র আততায়ীর হাতে নিহত এবং রাজার উত্তরাধিকারী প্রশ্নে জটিলতা।
১৮৩২	কার্বি-আংলং ও দক্ষিণ কাছাড়ের সমতল EIC'র দখল এবং নওগাঁও জেলার অঙ্গীভূত।
১৮৩৩	'আপার-আসাম' (জোড়হাটে রাজধানী) আহোম রাজা পুরন্দর সিংহ-কে প্রত্যর্পণ করদ রাজ্য হিসেবে কারণ, EIC-কে বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা কর প্রদান সহ সুশাসনের প্রতিশ্রুতি দিতে হল পুরন্দর সিংহকে।
	'লোয়ার-আসাম' EIC-র দখলে রইল এবং চারটি জেলায় বিভক্ত করা হল ঃ গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরং ও নওগাঁও।
	১৮৩৩-এর চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী ইউরোপীয়রা ভারতে ভূসম্পত্তির মালিকানা অধিকার পাওয়ায় আসামকে ব্রিটিশের উপনিবেশ হিসেবে তৈরি করার পথ প্রশস্ত হল।
	EIC'র খাসি পাহাড় দখল—তিরোট সিং বন্দি এবং বন্দিদশায় মৃত্যু (১৮৩৪)।
১৮৩৪	উত্তর কাছাড়ে তুলারাম-এর সাথে বোঝাপড়ার পর কাছাড়ি রাজ্যটিতে প্রকৃতপক্ষে EIC'র শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল।
১৮৩৫	জয়ন্তিয়া পাহাড়ের রাজা পদচ্যুত এবং EIC কর্তৃক জয়ন্তিয়া রাজ্য গ্রাস।
	'আপার-আসাম'-এর লখিমপুরে প্রথম বড়ো চা-বাগান প্রতিষ্ঠা।
	গুয়াহাটিতে প্রথম ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠা।

সময় (খ্রিস্টাব্দ)	ঘটনা
১৮৩৬	'আপার-আসাম'-এর সাদিয়া ও লখিমপুরে 'আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারি'দের (ABM) উপস্থিতি এবং তাঁদেরই উদ্যোগে প্রথম শিবসাগরে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা। স্থানীয় অসমিয়া কথ্য ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে যাত্রা শুরু।
১৮৩৭	শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে EIC কর্তৃক অসমিয়া ভাষার স্থলে বাংলা ভাষার প্রবর্তন। তীব্র প্রতিক্রিয়া। ১৮৩৭ থেকে ১৮৭৩ পর্যন্ত সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলা চালু ছিল।
১৮৩৮	আহোম রাজতন্ত্রের যবনিকাপাত—পুরন্দর সিংহ অপসারিত—আনুষ্ঠানিকভাবে সমগ্র আসাম ('আপার' ও 'লোয়ার') ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। শিবসাগর ও লখিমপুর জেলার প্রতিষ্ঠা।
	Wasteland Rules (১৮৩৮) প্রবর্তন। এই নিয়ম পুরোপুরি প্রয়োগ করার ফলে স্থানীয় মানুষের পক্ষে পতিত জমি উদ্ধার করে চা-বাগান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইউরোপীয়দের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই এটি প্রবর্তিত হয়েছিল এবং বাগিচা শিল্পে ইউরোপীয়দের প্রায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
	আসামের চা প্রথম বিদেশে রপ্তানি।
১৮৩৯	আসাম কোম্পানির সূত্রপাত।
	খামতি বিদ্রোহ।
	মোরান/মটকদের রাজ্যের অধিকাংশ দখল। নানা কারণে মটক রাজ্য কোম্পানির শ্যেনদৃষ্টির বাইরে ছিল।
১৮৪২	সাদিয়া সহ আশপাশের সমগ্র মটক রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ লখিমপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হল।

সময় (খ্রিস্টাব্দ)	ঘটনা
১৮৪৩	দাসপ্রথা অবলুপ্ত হওয়ার ফলে আহোম অভিজাতদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া।
১৮৪৩-৪৪	মণিরাম দেওয়ান প্রথম অ-ব্রিটিশ ব্যক্তি যিনি চিনামোরাতে চা-বাগান প্রতিষ্ঠা করলেন।
১৮৪৬	'আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারি'দের (ABM) উদ্যোগে প্রথম অসমিয়া ভাষায় মাসিক পত্রিকা *অরুণোদয়*-এর আত্মপ্রকাশ। ১৮৪৬-১৮৮০ পর্যন্ত 'অরুণোদয়' প্রকাশিত হয়েছিল।
১৮৪৮	এন. ব্রাউন-এর প্রথম অসমিয়া ব্যাকরণ প্রকাশিত।
১৮৫২	বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে আফিং চাষ (স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আফিং চাষ পদ্ধতি দীর্ঘদিন আসামে প্রচলিত ছিল)।
১৮৫৪	তুলারাম সেনাপতিকে উৎখাত করে উত্তর কাছাড় দখল করার ফলে সমগ্র কাছাড়ের উপর EIC'র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র কাছাড়া রাজ্যটি আনুষ্ঠানিক-ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত। খাসি ও জয়ন্তিয়া হিল্ ডিস্ট্রিক্ট গঠন।
১৮৫৭	মহাবিদ্রোহ/ভারতের প্রথম স্বাধীন সংগ্রামের প্রভাব আসামে অনুভূত—৭ সেপ্টেম্বর কন্দর্পেশ্বর সিংহ-কে গ্রেপ্তার এবং বিচারের নামে প্রহসনের পর ১৮৫৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মণিরাম বরুয়া (দেওয়ান) এবং পিয়ালি বরুয়া'র ফাঁসি। আসামে তুলাচাষ প্রবর্তন।
১৮৫৮	EIC'র বিদায়। কোম্পানির শাসন অবসান হওয়ার পর ব্রিটিশ রাজা/রানি'র নামে নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন। অবশ্য এর ফলে তেমন গুণগত পরিবর্তন কিছু হয়নি।
১৮৬০-৬১	'আপার-আসামে' প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।

সময় (খ্রিস্টাব্দ)	ঘটনা
১৮৬১	আফিং চাষ নিষিদ্ধকরণের উদ্যোগ।
	ফুলাগুড়ি বিদ্রোহ এবং কঠোর হাতে দমন।
১৮৬৬	আঙ্গামি-নাগা রাজ্য দখল ও আসামে অন্তর্ভুক্তি এবং ১৮৬৯-এ নাগা পাহাড়ের পশ্চিমাংশ নিয়ে 'ফন্ট্রিয়ার ডিস্ট্রিক্ট' বা সীমান্ত জেলা গঠন।
১৮৬৭	M. Bronson প্রণীত মিশনারিদের দ্বারা প্রকাশিত প্রথম অসমিয়া-ইংরেজি অভিধান।
	শিবসাগরের কথ্য ভাষাই সরকারিভাবে স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ড অসমিয়া ভাষার মর্যাদালাভ।
১৮৭২	আসামের প্রথম সেন্সাস রিপোর্ট প্রকাশিত। লুসাই পাহাড় (এবং দুটি রাজন্যশাসিত রাজ্য ঃ মণিপুর ও ত্রিপুরা) ব্যতিরেকে সমগ্র আসামের জনসংখ্যা ৪১,৫০,৭৬৯ ঐ সেন্সাসে দেখানো হয়েছে।
১৮৭২-৭৩	গারো রাজ্য দখল এবং গারো পাহাড়কে ব্রিটিশ আসামের একটি জেলায় পরিণত করা হল।
১৮৭৩	অসমিয়া ভাষা ৩৭ বছর বাদে পুনর্মর্যাদা ফিরে পেল এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেল।
	১৮৭৩ সালে আসামের পার্বত্য এলাকায় 'ইনার-লাইন' প্রথা চালু হল এবং পরবর্তী সময়ে কিছু পাহাড়ি এলাকা 'বহির্ভূত', 'আংশিকভাবে বহির্ভূত' অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হল।
১৮৭৪	আসাম (সিলেট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া সহ) শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বঙ্গদেশ থেকে ভিন্ন হয়ে চিফ্-কমিশনার শাসিত স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা পেল এবং শিলং রাজধানী হিসেবে ঘোষিত হল।
১৮৭৬	'আপার-আসামে' তিনসুকিয়ার লেডো এবং মার্গারিটায় কয়লা খনির সন্ধান।
১৮৮০	কলেরা মহামারি।

সময় (খ্রিস্টাব্দ)	ঘটনা
১৮৮২	ডিগবয়ে প্রথম খনিজ তেল উত্তোলন এবং পরবর্তী সময়ে তেল কূপ ও 'রিফাইনারি' বা শোধনাগার তৈরি।
	আসামের চা ইত্যাদি যাতে সহজে নদীপথে বিদেশে রপ্তানি করা যায় সেই উদ্দেশ্যে Assam Railway and Trading Company কর্তৃক ১৮৮২ সালে অমলাপট্টি (ডিব্রুগড়)-এর দিনজাম নদী পর্যন্ত ১৫ মাইল প্রথম রেলপথ নির্মাণ। ১৮৮৪ সালে এই রেলপথ মার্গারিটার মাকুম কয়লাখনি পর্যন্ত প্রসারিত
১৮৮৩	আসাম ও বঙ্গদেশের মধ্যে প্রতিদিন নদীপথে স্টিমার সার্ভিস চালু হল।
১৮৮৪	জোড়হাটে জগন্নাথ বরুয়া সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংগঠন 'সার্বজনিক সভা' প্রতিষ্ঠা করলেন।
	গুণাভিরাম বরুয়ার আসামের ইতিহাস 'আসাম বুরঞ্জি' প্রকাশিত।
১৮৮৫-৮৬	কলেরা সহ নানা রোগের মহামারি।
১৮৮৮	কলকাতায় অসমিয়া ছাত্রদের উদ্যোগে 'অসমিয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা।
১৮৮৯	চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা'র উদ্যোগে ১৮৮৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি *জোনাকি* সাংস্কৃতিক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। 'জোনাকির যুগ' ১৯০৩ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।
	ডিগবয়ে এশিয়ার প্রথম এবং সমগ্র বিশ্বের তৃতীয় তেল শোধনাগার নির্মাণ।
১৮৯৩	'আহোম সভা'র প্রতিষ্ঠা। আহোম জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ এরপর নানাভাবে ঘটে। ১৯১০ সালে 'আহোম সভা'র নাম পরিবর্তন করে 'Ahom Association' (AA) এবং ১৯১৫ সালে 'All Assam Ahom Association' (AAAA) রাখা হয়।

সময় (খ্রিস্টাব্দ)	ঘটনা
১৮৯৪	পাথারুঘাট কৃষক বিদ্রোহ।
১৮৯৭	আসামে ভয়াবহ ভূমিকম্প।
১৮৯৮	লুসাই রাজ্য ১৮৯০ সালে ব্রিটিশ দখলীভূত হওয়ার পর লুসাই পাহাড়কে আসামের একটি জেলায় পরিণত করা হল।
১৮৯৯	Assam Oil Company গঠন।
১৯০১	সেন্সাস রিপোর্টে (মণিপুর সহ) আসামের জন-সংখ্যা ৬১,২৬,৩৪৩।
	গুয়াহাটিতে 'কটন কলেজ' প্রতিষ্ঠা।
১৯০৩	অসমিয়া জনগণের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষাকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে মানিকচন্দ্র বরুয়ার উদ্যোগে Assam Association গঠন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় 'আসাম প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটি'র (APCC) অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্তির পর Assam Association-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলীন।
১৯০৪	নাগা পাহাড়ের পূর্বাংশ ব্রিটিশ দখলে।
১৯০৫	কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ। আসাম ও পূর্ববঙ্গকে একত্রিত করে একজন ছোটোলাটের অধীনে ঢাকা'য় রাজধানী স্থাপিত হল। ঐ সময় থেকেই পূর্ববঙ্গের কৃষকদের ব্যাপকহারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিপ্রয়াণ শুরু এবং জনবিন্যাসের পরিবর্তন লক্ষণীয়। ১৯০৫ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে আসামের জনসংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'অনুপ্রবেশ' প্রশ্নটি আসামে একটি স্পর্শকাতর প্রশ্ন এবং বর্তমান উত্তেজনার একটি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত। ১৯১১ পর্যন্ত আসাম ও পূর্ববঙ্গের সংযুক্তি কার্যকর ছিল।
	১৯০৫-১৯০৮-এর বঙ্গদেশের 'স্বদেশি আন্দোলন'-এর প্রভাব ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তেমন অনুভূত হয়নি,

সময় (খ্রিস্টাব্দ)	ঘটনা
	যদিও অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরির মতো কয়েকজন নেতা উদ্যোগ নিয়েছিলেন।
১৯১১-১২	১৯১১-এর দিল্লি দরবারে বঙ্গ-ভঙ্গ বাতিল ঘোষিত হল। ১৯১২-তে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ আবার একত্রিত হল এবং আসাম চিফ্-কমিশনারের শাসনাধীনে আবার স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা পেল।
১৯১৩	Assam Legislative Council স্থাপন।
১৯১৬	'আসাম ছাত্র সম্মেলন'-এর যাত্রা শুরু।
১৯১৭	'অসম সাহিত্য সভা'র জন্ম।
	আসামের অভ্যন্তরে নাগাল্যান্ড জেলায় কুকিদের অন্তর্ভুক্তি।
১৯১৯	আসামের অভ্যন্তরে সিলেট একটি জেলা হিসেবে ঘোষিত।
১৯২১	আসামের জন্য স্বতন্ত্র গভর্নর নিয়োগ (১৯১২ থেকে এতদিন আসাম ছিল চিফ্-কমিশনারের শাসনাধীন)।
	আসামে ট্রেন ও স্টিমার সার্ভিসে ধর্মঘট।
	১৯২১-এর আগস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধির প্রথম আসাম সফর।
	অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ে সমগ্র আসাম উত্তাল।
	'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর সাথে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সংযুক্তি।
১৯২৬	গুয়াহাটির কাছে পাণ্ডুতে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত All India Congress Committee (AICC)-র ৪১তম অধিবেশনে জাতীয় নেতৃত্বের উপস্থিতি।
১৯৩৪	হরিজন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে মহাত্মা গান্ধির দ্বিতীয়বার আসাম সফর।

সময় (খ্রিস্টাব্দ)	ঘটনা
	জওহরলাল নেহরু-র আসাম সফর।
১৯৩৭	ভারত সরকারের ১৯৩৫ আইনের ধারা অনুযায়ী স্বশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজধানী শিলং-এ Assam Legislative Assembly-র প্রতিষ্ঠা।
১৯৩৮	মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর পরামর্শ উপেক্ষা করে গোপীনাথ বরদোলই-কে মন্ত্রীসভা গঠনের সুযোগ দেবার জন্য আসামের গভর্নর-কে বাধ্য করতে জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু শিলং ছুটে এসেছিলেন।
১৯৩৯	সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয়বার ১৯৩৯ সালের অক্টোবরে আসামে এসেছিলেন।
১৯৪২	'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় আসাম আবার উত্তাল হয়েছিল। ১০ সেপ্টেম্বর গোহপুরে কনকলতা বরুয়া ব্রিটিশ পুলিশের গুলির আঘাতে শহিদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন।
১৯৪৪	নেতাজি সুভাষের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ইম্ফল ও কোহিমা পর্যন্ত যখন এগিয়ে এসেছিল, সেই সময় সমগ্র আসামে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল।
১৯৪৬	মহাত্মা গান্ধি জানুয়ারিতে তৃতীয় ও শেষবার আসাম সফরে এসেছিলেন।
	ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যবনিকা টানতে এক গুচ্ছ প্রস্তাবসহ ক্যাবিনেট মিশন যখন আসামকে পূর্ববঙ্গের সাথে একত্রিত করে 'সি' গ্রুপ-এর রাজ্য হিসেবে মেনে নিতে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল ('মুসলিম লিগ' ঐ প্রস্তাবে রাজি ছিল), সেই সময় গোপীনাথ বরদোলই-এর নেতৃত্বে APCC উপরোক্ত 'গ্রুপিং' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়।

সময় (খ্রিস্টাব্দ)	ঘটনা
	মিশন-এর ঐ 'গ্রুপিং' প্রস্তাব কার্যকরী হলে আসাম অনিবার্যভাবেই পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হত।
১৯৪৭	৬ এবং ৭ জুলাই Sylhet Referendum অনুষ্ঠিত হয়। ঐ গণভোটের রায় অনুযায়ী, সিলেট-এর অধিকাংশ ভোটার প্রস্তাবিত পূর্ব পাকিস্তানে অঙ্গীভূত হওয়ার সপক্ষে ভোটদান করেন। ফলে, স্বাধীনতার পর সিলেট শুধু আসাম থেকেই নয়, ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
	১৫ আগস্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়, একমাত্র সিলেট ছাড়া, অখণ্ড আসাম (অর্থাৎ বর্তমান অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মিজোরাম সহ) ভারতের অঙ্গীভূত হয়।
	স্বাধীনতা প্রাপ্তির দু'দিন পরে (১৭ আগস্ট ১৯৪৭) র‍্যাড্‌ক্লিফ্ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘোষিত হয়।
	স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলস্বরূপ আসাম সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একদিকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা এবং অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের আগমনের ফলে উদ্ভূত উদ্বাস্তু সমস্যার জন্য সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের চরম দুর্দশার দিন শুরু হয়।
১৯৪৮	গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।
	NEFA (North-East Frontier Agency) (অর্থাৎ বর্তমান অরুণাচল প্রদেশ) একটি স্বতন্ত্র ফেডারেল অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত।
১৯৫০	আসামে ভয়ংকর ভূমিকম্প।
১৯৫১	কামরূপ জেলার দেওয়ানগিরি অঞ্চল ভুটানের

সময় (খ্রিস্টাব্দ)	ঘটনা
১৯৫২	ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন নাগা পাহাড়ে বয়কট।
	'বোড়ো সাহিত্য সভা'র প্রতিষ্ঠা।
১৯৬১	অসমিয়া ভাষা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক করায় বরাক উপত্যকায় উত্তেজনা।
১৯৬২	ভারত-চিন যুদ্ধের সময় আসামের জনজীবন বিপর্যস্ত।
১৯৬৩	আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাগাল্যান্ড রাজ্যের জন্ম।
১৯৬৫	ভারত-পাক যুদ্ধের সময় আসামে উত্তেজনা।
১৯৭১	বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সময় আসামে শরণার্থীদের আশ্রয় শিবির এবং এর প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল।
১৯৭২	আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গারো-খাসি-জয়ন্তিয়া পর্বতমালা নিয়ে স্বতন্ত্র মেঘালয় রাজ্যের সৃষ্টি। লুসাই পাহাড়কে আসাম থেকে কেটে স্বতন্ত্র মিজোরাম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত।
১৯৭৪	আসামের রাজধানী শিলং থেকে গুয়াহাটির দিসপুরে স্থানান্তরিত। মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী হিসেবে শিলং-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।
১৯৭৯-১৯৮৫	তথাকথিত 'বিদেশি বিতাড়নের' নামে আসাম আন্দোলন। ১৯৭৯ সালে United Liberation Front of Assam (ULFA)-র জন্ম। ১৯৮৫-তে 'অসম গণ-পরিষদ' কর্তৃক সরকার গঠন।
১৯৮৭	মিজোরাম এবং অরুণাচল প্রদেশ (১৯৪৮ থেকে 'নেফা' হিসেবে পরিচিত)-এর স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা অর্জন।
	১৯৮৭ সালের ২ মার্চ থেকে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের নেতৃত্বে All Bodo Students Union (ABSU) আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র 'বোড়োল্যান্ড' গঠনের আন্দোলন শুরু।

চতুর্দশ অধ্যায়

আসাম ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
Assam and The East India Company

১৪.১ ব্রিটিশ শাসন সূত্রপাতের সময় আসামের রাজনৈতিক অবস্থা (Political Condition of Assam on the eve of British Rule)

প্রথম খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে আহোম রাজতন্ত্রের পতনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি, কীভাবে মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ, রাজপ্রাসাদে গৃহযুদ্ধ, একটার পর একটা অযোগ্য পুতুল রাজার শাসন এবং সর্বোপরি বর্মী আক্রমণ ইত্যাদির ফলে আসামে চরম অরাজকতার অধ্যায় শুরু হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আহোম রাজারা বারবার নিজেদের অসহায়তার চিত্র বঙ্গদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোচরে এনে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করতেন এবং কোম্পানির সেনাবাহিনী উপস্থিত হয়ে আহোম রাজার অনুকূলে অবস্থা আয়ত্তে আনার উদ্যোগ নিতেন। এক কথায়, আহোমদের সামরিক দুর্বলতার কাহিনি কোম্পানির অজানা ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সমকালীন দলিলের সূত্র অনুযায়ী, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ আসাম দখলের প্রশ্নে প্রথমদিকে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। ১৭৯৩ সালে আসামের সাথে কোম্পানির যে বাণিজ্যিক চুক্তি হয়েছিল তারই প্রেক্ষিতে ধারণা হয়েছিল, আসাম থেকে বিশেষত আপার-আসাম (যেটি ছিল আহোম শাসনের কেন্দ্রভূমি) থেকে প্রভূত রাজস্ব আদায় অসুবিধাজনক। John MacCosh তাঁর *Topography of Assam* গ্রন্থে আসামকে "profit-less......primeval jungle" বলে চিত্রিত করেছিলেন। তাছাড়া কোম্পানি কর্তৃক আসাম জয় করাই যথেষ্ট নয় ; সেটিকে রক্ষা করতে গেলে এবং সীমান্ত অঞ্চল সুরক্ষিত রাখতে গেলে যে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, সেটিরও অভাব সেই সময় ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। ১৮২৩ সালে আসামে চা-এর আবিষ্কার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দৃষ্টি আসামের দিকে নিবদ্ধ করে (প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। শুধু তাই নয়, ব্রহ্মদেশের (মায়ানমার) সেনাবাহিনী যেভাবে ব্রিটিশ অধিকৃত বঙ্গদেশের সীমান্তে বারবার হানা দিচ্ছিল তাতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ রীতিমত উদ্বিগ্ন হন (প্রথম খণ্ডে ১০.৪.৫ দ্রষ্টব্য)। ১৮২১-২২ সালে বর্মীরা আসাম দখল করে। বর্মী শাসনের

ফলে আসাম কীভাবে প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়েছিল ১০.৬-এ উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮২৩ সালে বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম সংলগ্ন শাহপুরি অঞ্চল বর্মীরা দখল করার পর তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-২৮) বর্মীদের শায়েস্তা করার লক্ষ্যে ১৮২৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। আসামের সব কিছু প্রকৃতপক্ষে ১৮২৪ সাল থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির করায়ত্ত ছিল এবং দীর্ঘদিনের কোচ-শাসিত নিম্ন-আসামে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল এবং ১৮২৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ১৬৯৮ সাল থেকে প্রধানত কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকেই সব কিছু পরিচালনা করতেন এবং ১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধের পর, বিশেষত ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি প্রাপ্তির পর, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আসামকে বঙ্গদেশের পূর্ব-প্রান্তের সীমান্ত অঞ্চল হিসেবেই সেই সময় দেখা হত। বঙ্গদেশে কোম্পানির স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্য আসাম দখল কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে অনিবার্য হয়ে উঠল। বর্মীদের আগ্রাসন ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ১৮২৪ সালের ১৩ মার্চ কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ কোম্পানির বাহিনী যাত্রা শুরু করল। ২৮ মার্চ ১৮২৪-এ কোম্পানির সিপাইরা গুয়াহাটিসহ নিম্ন-আসাম দখল করার সময় কিংবা ১৮২৫ সালের জানুয়ারিতে আপার-আসামের রাজধানী রংপুর থেকে বর্মী বাহিনীকে উৎখাত করার সময় ডেভিড স্কট (যিনি ঐ সময়ে ছিলেন কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান অফিসার)-এর বিখ্যাত ঘোষণাটি উল্লেখযোগ্য ঃ

> *We are not led to your country (Assam) by the thirst of conquest, but are forced in our defence to deprive the enemy (Burmese) of the means of annoying us.*

(অর্থাৎ আসাম জয় করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং প্রতিরক্ষার তাগিদে এবং বর্মী শত্রুরা যাতে আর উত্যক্ত না করতে পারে, সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেই কোম্পানির সেনাবাহিনী আসামে এসেছে।) ডেভিড স্কট-এর উপরোক্ত ঘোষণাটি সাম্প্রতিককালে সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাতের নামে আমেরিকার ইরাক অভিযানের অনুরূপ। ১৮২৬ সালের যে ইয়ান্দাবো চুক্তির (প্রথম খণ্ডের ১০.৮ দ্রষ্টব্য) বলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসাম শাসনের বৈধতা খোঁজার চেষ্টা করেছিল, যেটি সম্পাদিত হয়েছিল বর্মী ও কোম্পানির কর্তৃপক্ষের মধ্যে। ঐ চুক্তিতে কোথাও আহোম রাজা বা প্রজার কোনো স্বাক্ষর বা অনুমতি ছিল না।

তথাপি সেই মুহূর্তে আসামের কেউ ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতা করেননি ; বরং দুহাত তুলে কোম্পানির কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বর্মী অপশাসনের যবনিকা টানার জন্য। ডেভিড স্কট-এর ঘোষণার ভিত্তিতে সেই সময় আসামে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক শাসনের মেয়াদ স্বল্পকালের জন্য এবং অবস্থা স্বাভাবিক হলে কোম্পানির ফৌজ আসাম থেকে বিদায় নেবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হল।

সারণি ১

গভর্নর-জেনারেল-এর এজেন্ট

১৮২২ সালে এজেন্টের দায়িত্ব পান ডেভিড স্কট।
১৮২৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইয়ান্দাবো চুক্তি অনুযায়ী ব্রহ্মদেশ অধিকৃত আসামের অংশ কোম্পানির কাছে হস্তান্তরের পরে গভর্নর-জেনারেল-এর এজেন্ট হিসেবে ডেভিড স্কট ১৮২৬ থেকে ১৮২৮ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

আসামে ব্রিটিশ কমিশনার (১৮২৮-১৮৭৪)

১. ডেভিড স্কট (১৮২৮-১৮৩১)
২. টমাস ক্যাম্পবেল রবার্টসন (১৮৩১-১৮৩৪)
৩. ফ্রান্সিস জেন্‌কিনস্‌ (১৮৩৪-১৮৬১)
৪. হেন্‌রি হপকিন্‌সন্‌ (১৮৬১-১৮৭৪)

১৪.২ ডেভিড স্কট ও আসামে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা (David Scott and the British administration in Assam)

আসাম থেকে বর্মী আধিপত্য নির্মূল করতে একদিকে যেমন জর্জ ম্যাক্‌মরিন, আর্থার রিচার্ডস্‌ প্রভৃতি ব্রিটিশ সেনাপতিরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন ; ঠিক তেমনি ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা পত্তনের প্রশ্নে ডেভিড স্কট বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ সিভিল সার্ভেন্ট ডেভিড স্কট (১৭৮৬-১৮৩১) স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। গভর্নর-জেনারেল-এর এজেন্ট হিসেবে আসামে আসার আগে তিনি অবিভক্ত বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ও কোচবিহারে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮২২-এর নভেম্বরে তিনি তাঁর নিজস্ব পদের দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের প্রশ্নে গভর্নর-জেনারেল-এর এজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৮২৪ সালের ২৮ মার্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈনিকরা যখন গুয়াহাটি দখল করে, সেই আশ-পাশ এলাকার

অনেক ছোটো-খাটো অধীশ্বর স্কটের সাথে দেখা করে ব্রিটিশ আনুগত্যের শপথ নেন। কাছাড়ের রাজা গোবিন্দচন্দ্র, জয়ন্তিয়া রাজ্যের রাজা রাম সিং, মণিপুরের রাজা গম্ভীর সিং এবং আরও অনেকে কোম্পানির সাথে মৈত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ হন। যুদ্ধ ছাড়াই এটি সম্ভব হয়েছিল। এক কথায়, নিম্ন-আসাম অতি সহজে ব্রিটিশ অধিকারে চলে আসে। ১৮২৫ সালের জানুয়ারি মাসে বর্মী সেনারা আপার-আসামের রংপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার পর ১৮২৬-এর ইয়ান্দাবো চুক্তির আগেই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাই কোম্পানির দখলে চলে আসে। তাঁর সামনে তিনটি বিকল্প ছিল ঃ (১) তাঁর আগের ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্মী-সন্ত্রাস-মুক্ত আসাম থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা এবং আসামের কর্তৃত্ব আবার আহোম রাজাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া ; (২) সমগ্র আসাম (নিম্ন ও উর্ধ্ব) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করা ; (৩) আসামকে দু-ভাগে বিভক্ত করে পশ্চিম বা নিম্ন-আসামের উপর ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব বা আপার-আসাম (আহোম রাজাদের এতদিনের কীর্তিভূমি) আহোম রাজাদের কাছে প্রত্যর্পণ। কিন্তু ডেভিড স্কটের উপরোক্ত তিনটি প্রস্তাবের কোনোটিই সেই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। দুই গভর্নর-জেনারেল—লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-২৮) এবং লর্ড বেন্টিংক (১৮২৮-৩৫)-এর কাছে তিনটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঃ (১) উত্তর-পূর্ব সীমান্তের বিভিন্ন উপজাতিদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর হানা এবং ভবিষ্যতে বর্মীদের আবার আক্রমণের সম্ভাবনাকে চিরতরে বিনষ্ট করা ; (২) সমগ্র আসামের উপর প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করার আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া ; (৩) ব্রিটিশ-অনুগত নতুন আহোম রাজার অনুসন্ধান। এরই জন্য ডেভিড স্কটের প্রস্তাবকে গভর্নর-জেনারেল-এর কাউন্সিল সাথে সাথে অনুমতি দিতে পারেনি। আসাম সম্পর্কে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের প্রথম দিকে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না এবং আমহার্স্ট ও বেন্টিংক একটু সময় নিয়ে আসামে এমন একটা শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন যেটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সমস্যার কিছুটা স্থায়ী সমাধান করতে পারে। অবশ্য নিম্ন-আসাম ১৮২৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়।

১৪.২.১ আপার-আসামে স্কট

যদিও গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিল আসাম প্রশ্নে নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নে অনেক বিলম্ব করেছিল তথাপি ডেভিড স্কট উপরের অনুমতি নিয়েই নিজের উদ্যোগে আপার-আসামের সাদিয়া অঞ্চলের স্থানীয় চিফ্‌দের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি

করে সর্বত্র বিশৃঙ্খলার স্থলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করলেন।

১. মটক রাজ্য ঃ ব্রহ্মপুত্র থেকে বুড়ি-দিহিং নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মোয়ামারিয়া অধ্যুষিত মটক রাজ্যের অধিপতি মতিবর বর-সেনাপতির সাথে ১৮২৬ সালের ১৩ মে একটি চুক্তি স্কটের উদ্যোগে সম্পাদিত হল। যদিও বর-সেনাপতি কোনো কর দিতে রাজি হননি ; তথাপি ৩০০ পাইক সহ যুদ্ধের সময় কোম্পানিকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন। বেঙ্গমোরা (বর্তমান তিনসুকিয়া) ছিল এক সময় মটক রাজ্যের রাজধানী এবং একসময় ঐ রাজ্যের রাজা সর্বানন্দ সিংহ তাঁর প্রজাহিতৈষণার জন্য অনেকেরই প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। ১৮০৫ সালে আহোম রাজা কমলেশ্বর সিংহ (১৭৯৫-১৮১১) মোয়ামারিয়া বিদ্রোহীদের শেষ নেতা সর্বানন্দ সিংহকে মটক রাজ্যের 'বরসেনাপতি' হিসেবে ঘোষণা করেন। যেহেতু মটক রাজ্যের কর ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত উদার, এরই জন্য বিপদের সময় আহোম রাজ্য থেকে দলে দলে মানুষ মটক রাজ্যে আশ্রয় নিতেন। ১৮৪২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ রাজ্যের অঙ্গীভূত হওয়ার আগে মটক রাজ্য তার স্বাধীনতার ধ্বজা উঁচুতে রেখেছিল। ডেভিড স্কট প্রথমেই ঐ স্বাধীনতা হরণ করতে চাননি ; বরং মৈত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে আপার-আসামের প্রতিবেশীদের ব্রিটিশ-বিরোধী ভূমিকাকে কিছুটা ভোঁতা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

২. 'সাদিয়াখোয়া গোঁহাই'-এর সাথে চুক্তি ঃ আহোম যুগে প্রতাপ সিংহ ১৫২৩ সালে চুটিয়া রাজ্য দখল করে আহোমদের অনুগতদের ঐ রাজ্য শাসন করার জন্য খামতি উপজাতি নেতার উদ্দেশ্যে 'সাদিয়াখোয়া গোঁহাই' (অর্থাৎ সাদিয়ার অধিপতি) পদটি সৃষ্টি করেছিলেন (যেমন, কাছাড়িদের কাছ থেকে মারঙ্গী অঞ্চলটি দখল করার পর 'মারঙ্গীখোয়া গোঁহাই' ; কিংবা কাজলিমুখ এলাকাটি শাসনের জন্য 'কাজলিমুখিয়া গোঁহাই' ইত্যাদি)। ডেভিড স্কট ১৮২৬ সালের মে মাসে খামতি উপজাতিদের অধীশ্বর 'সাদিয়াখোয়া গোঁহাই'-এর সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। গোঁহাই বিচারের ক্ষমতা সহ কিছু অধিকার হারালেও কোম্পানির বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

৩. ১৬ সর্দারের সাথে সমঝোতা ঃ Captain Neufville-র অভিযানের পর সীমান্তের সিংফো-দের উপদ্রব কমতে শুরু করে। ১৮২৬ সালের মে মাসে ১৬টি উপজাতি সর্দারের সাথে সমঝোতায় ভবিষ্যতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ব্রিটিশ শক্তিকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করা সম্ভব হয়। পরবর্তী

সময়ে Capt. Neufville-কে আপার-আসামের Political Agent হিসাবে নিযুক্ত করা হয় এবং বিশ্বনাথ অঞ্চলে সদর-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

এইভাবে একটার পর একটা সমঝোতার মাধ্যমে সাদিয়া সহ সীমান্ত অঞ্চলে ডেভিড স্কট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বকে সংহত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। স্কটের উদ্যোগে আপার-আসাম-এর অবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক হওয়ার ফলে প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের সময় কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে যে সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়েছিল, ধীরে ধীরে তা প্রত্যাহার শুরু হয়। ১৮২৭-২৮-এ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সুরক্ষার উদ্দেশ্যে First Assam Light Infantry গঠিত হয় এবং এযাবৎ চালু সামরিক আইনও ১৮২৮ সালের মার্চ মাসে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

৪. আহোম রাজ-পরিবারের সাথে সম্পর্ক ঃ ডেভিড স্কট অনেকের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হলেও আহোম রাজ-পরিবারভুক্ত সদস্যদের সাথে কোনো সমঝোতা চুক্তি করেননি। স্কট জানতেন, দীর্ঘ ৬০০ বছর আহোম রাজারা আসামের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁদের বংশধরদের পক্ষে ঐ রাজ্যে ব্রিটিশ উপস্থিতি ও কর্তৃত্ব খুব সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। David Scott-এর ভাষায় "...the members of the royal family, the nobility, the public functionaries and the religious orders would view with dislike the introduction of our authority founded, as it seems to me, it must ultimately be upon the destruction of their own."

এরই জন্য তিনি আপার-আসামের কর্তৃত্ব আহোমদের ফিরিয়ে দিয়ে করদ রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার জন্য ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল রাজা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। প্রথম খণ্ডে আমরা লক্ষ করেছি, একজন আহোম রাজার মৃত্যু হলে রাজপরিবারের অভ্যন্তরে কীভাবে গৃহযুদ্ধ শুরু হত ; কারণ সিংহাসনের দাবিদার অনেক এবং প্রত্যেকেরই পিছনে বিভিন্ন শক্তি কাজ করত। নির্বাচিত রাজতান্ত্রিক পদ্ধতি আহোমরা অনুসরণ করতেন। ডেভিড স্কট ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষকে রাজি করাতে সমর্থ হলেও উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান করতে রীতিমতো অসুবিধের মুখোমুখি হন। আহোম রাজত্বে রাজা নির্বাচন পাত্রমন্ত্রীদের দায়িত্ব ছিল। বর্মী আক্রমণের সময় আহোম-রাজা যোগেশ্বর সিংহ (১৮২১-২৪) ছিলেন ব্রহ্মদেশীয় শাসকদের হাতের পুতুল ; যদিও পাত্রমন্ত্রীরাই তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। সিংহাসনের অনেক দাবিদারের মধ্যে যে দুটি নাম ডেভিড স্কটের সামনে ছিল তাঁরা হলেন যথাক্রমে ঃ (১) চন্দ্রকান্ত সিংহ, (২) পুরন্দর সিংহ। উভয়েরই পক্ষে-

বিপক্ষে নানারকম যুক্তি দিয়ে ডেভিড স্কট কোম্পানির ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে পুরন্দর সিংহর নাম অনুমোদনের জন্য আবেদন করলেন ; কারণ চন্দ্রকান্ত সিংহ, স্কটের দৃষ্টিতে ছিলেন 'নপুংসক'। যদিও ডেভিড স্কটের যুক্তিকে মর্যাদা দিয়ে পুরন্দর সিংহকে করদ রাজ্যের অধিপতি (১৮৩৩-৩৮) হিসেবে মেনে নিতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন ; কিন্তু ১৮৩৩ সালে পুরন্দর সিংহ যখন পুনর্বার সিংহাসনে বসেন, তার দু'বছর আগেই ডেভিড স্কটের মৃত্যু হয়। ফোর্ট উইলিয়ামের এই বিলম্বিত সিদ্ধান্তের জন্যই আপার-আসামের কমিশনার ডেভিড স্কটকে একটার পর একটা বিদ্রোহের মুখোমুখি হতে হয়।

১৪.৩ ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্ব (Primary Stage of Resistance and Revolts against British rule)

১৮২৮ থেকে ১৮৩০-এর মধ্যে আপার-আসামে একটার পর একটা বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে ডেভিড স্কটকে রীতিমতো নাজেহাল হতে হয়। এইসব বিদ্রোহগুলির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গোমাধর কুঁওর, পিয়ালি ফুকন, জিউরাম দুলিয়া বরুয়া, রূপচাঁদ কুঁওর, হরনাথ ফুকন প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। বিদ্রোহীদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন খামতি বুরাগোহাইন, দিউরাম দিহিঙ্গিয়া ফুকন, ধেনুধর কুঁওর, বোম্ সিংফো, পানিশালিয়া বরুয়া, কটকটিয়া বরুয়ার মতো সমকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব। ডেভিড স্কট এইসব বিদ্রোহের 'popular character' বা জনপ্রিয় চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছিলেন যে, ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহীদের ফাঁসি দিয়েই সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের ফাঁসি তাঁকেই কার্যকরী করতে হয়েছিল।

১৪.৩.১ প্রথম বিদ্রোহ

১৮২৮ সালে গুয়াহাটিসহ নিম্ন-আসাম আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার পর, অনেকেই কোম্পানির আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করলেন। ১৮২৮-এর নভেম্বরে আপার-আসামে ধনঞ্জয় বরগোঁহাই আহোমদের শূন্য সিংহাসনে রাজ-পরিবারভুক্ত গোমাধর কুঁওর-কে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অনেক অনুগামী নিয়ে প্রথম জোড়হাটে সমবেত হন। সেখানে 'বৈলুং' (আহোম পুরোহিত) প্রথামত গোমাধরের অভিষেক-ক্রিয়াও সম্পন্ন করেন। বিদ্রোহীরা মরিয়ানির দিকে অগ্রসরের সময় প্রথমে লেফট্যানেন্ট Rutherford এবং পরে পলিটিক্যাল এজেন্ট ক্যাপটেন Neufville তাঁদের গতিরোধ করায় সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। ধনঞ্জয়

ও তাঁর পুত্র হরনাথ ব্রিটিশ সিপাইদের হাতে ধরা পড়েন। গোমাধর পলাতক হয়ে দীর্ঘদিন বনে-জঙ্গলে ঘুরে শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেন। বিচারে গোমাধরের সাত বছর কারাদণ্ড এবং বন্দি ধনঞ্জয়ের ফাঁসির আদেশ হয়। জেল থেকে পলাতক হয়ে ধনঞ্জয় নাগা পাহাড়ে আশ্রয় নেন। ক্যাপ্টেন Neufville গোমাধর কুঁওর-কে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাননি ; কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল ধনঞ্জয়ই আসল নাটের গুরু এবং গোমাধর তাঁর হাতে ক্রীড়নক-মাত্র। ডেভিড স্কট মন্তব্য করেছিলেন, Neufville মাঝপথে বিদ্রোহীদের ঐভাবে গতিরোধ না করলে, অনেক জীবনহানির আশঙ্কা ছিল। এইভাবে একটা ব্যর্থ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রথম পর্ব শেষ হয়েছিল।

১৪.৩.২ দ্বিতীয় বিদ্রোহ

১৮৩০-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্বে ধনঞ্জয় বরগোঁহাই ও তাঁর পুত্র হরনাথ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যেহেতু গোমাধর কুঁওরের অনুগত অনেক আহোম অভিজাত মটক রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, এরই জন্য ধনঞ্জয় প্রথম তাঁদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু গোমাধর নিজেই যেহেতু সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করে ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, এরই জন্য জনৈক রূপচাঁদ কুঁওরকে সিংহাসনের দাবিদার রাজা হিসেবে ঘোষণা করে এবং রূপচাঁদকে সামনে রেখে ধনঞ্জয় মোয়ামারিয়া, খামতি, সিংফো, খাসি, গারো, নাগা প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতির অসন্তুষ্ট নেতৃত্বকে এক জায়গায় সমবেত করে ব্রিটিশ বিরোধী অভিযানের ডাক দিলেন। এঁদের সাথে গুয়াহাটির প্রাক্তন প্রধান বদনচন্দ্র বরফুকনের পুত্র পিয়ালি ফুকনরাও যুক্ত হলেন। প্রত্যেকেরই অসন্তোষ বা উত্তেজনার নানা কারণ ছিল। যদিও ডেভিড স্কট প্রথমদিকে অনেককেই মৈত্রী জালে জড়াতে পেরেছিলেন, কিন্তু ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শক্তির সামনে আগামীদিনে নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্থানীয় অনেক নেতাই প্রমাদ গুনতে শুরু করেছিলেন। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। ১৮২৬ সালে ডেভিড স্কট খাসি পাহাড়ের নেতা ('স্যিয়েম') ইউ. তিরোট সিং (১৪.৩.৩.১ দ্রষ্টব্য)-এর সাথে মৈত্রী চুক্তির ভিত্তিতে খাসি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে কোম্পানির একটি সড়ক নির্মাণের প্রশ্নে রাজি করাতে পেরেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিরোট সিং বেঁকে বসেন এবং ব্রিটিশদের অবিলম্বে Nongkhlaw এলাকাটি ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন, যদিও কোম্পানির কর্তৃপক্ষ যথারীতি ঐ নির্দেশ অমান্য করে সড়ক নির্মাণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যায় এবং এটিকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আসলে, কোম্পানির

কাছে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি নানা কারণে এই পথ-নির্মাণ ছিল জরুরি। ক্যাপ্টেন Pemberton তাঁর *Report on the North Eastern Region* গ্রন্থে খাসি উপজাতির সততা এবং খাসি পাহাড়ের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গের দেওয়ানি অধিকার প্রাপ্তির সময় সুরমা উপত্যকাও অবিভক্ত বঙ্গের অঙ্গ হিসেবে লাভ করেছিল। ১৮২৮ সালে নিম্ন-আসাম আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ অধীনে আনার পর, কোম্পানির কাছে, সুরমা উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে যুক্ত করা খুবই প্রয়োজনীয় বোধ হয়। ঐ দুই উপত্যকাকে যুক্ত করতে গেলে খাসি পাহাড়ের অভ্যন্তর দিয়ে পথ-নির্মাণ ছাড়া বিকল্প ছিল না। কিন্তু তিরোট সিং-এর কাছে এই পথ আগামীদিনে শুধু যে ব্রিটিশ সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করবে তাই নয়, খাসি 'স্যিয়েম'-এর স্বাধীন অস্তিত্বকেও বিলুপ্ত করতে পারে। এইভাবে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বিলুপ্তির আশংকায় বিভিন্ন শক্তি একজোট হয়ে ব্রিটিশ-বিরোধিতায় অংশ নিয়েছিল। ১৮৩১-এর জানুয়ারিতে তিরোট সিং-এর নেতৃত্বে খাসি ও জয়ন্তিয়া বাহিনী একজোট হয়ে নিম্ন আসামের পশ্চিম প্রান্ত থেকে ব্রিটিশ-শক্তিকে উৎখাতের জন্য এগিয়ে এসেছিল। Pemberton-এর বর্ণনা অনুযায়ী,

> *They (Khasis and Garos) descended into the plains both of Assam and Sylhet and ravaged with fire and sword the villages which stretched along the base of the lofty region.*

১৪.৩.২.১ ব্যর্থতার কারণ

ধনঞ্জয় বরগোঁহাই ও তাঁর দুই পুত্র হরকান্ত ও হেমনাথ এবং তাঁর জামাতা জিউরাম দিহিঙ্গিয়া বরুয়া ব্রিটিশ-বিরোধী বিভিন্ন শক্তিকে একত্রিত করার উদ্যোগ নিলেও শেষপর্যন্ত সেটি সফল হয়নি। ক্যাপ্টেন Neufville সিংফোদের সাথে অন্যান্য বিদ্রোহীদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হন। সাদিয়াখোয়া গোঁহাই নিজে হরকান্তকে ধরে ব্রিটিশদের কাছে সমর্পণ করেন। ১৮৩০-এর মাঝামাঝি সময়ে প্রায় ৪০০ মানুষের এই অভ্যুত্থানকে নির্মমভাবে ব্রিটিশ শক্তি দমন করে ; যদিও সব জায়গায় সেটি সম্ভব হয়নি। রূপচাঁদ, ধনঞ্জয়, হরকান্ত, জিউরাম, পিয়ালি, বোম্ সিংফো সহ বিদ্রোহী নেতাদের অনেকেরই ফাঁসি হয়। ভবিষ্যতে যাতে এরকম বিদ্রোহ করতে আর কেউ সাহস না পায়, এজন্য বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যে ফাঁসির নির্দেশ ডেভিড স্কটই দিয়েছিলেন। বাকি বিদ্রোহীদের হয় নির্বাসন অথবা ১৪ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আসলে, এই বিদ্রোহের সময়

পরস্পর-বিরোধী অনেক শক্তি এক জায়গায় এলেও বিদ্রোহীদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার যথেষ্ট অভাব ছিল। বিদ্রোহীদের সংগঠনও তেমন মজবুত ছিল না। এটি ছিল ক্ষমতা-হারানো অভিজাত সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ, যার পিছনে সাধারণ মানুষের গণ-সমর্থন তেমন ছিল না। যাঁরা বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের কাছে অতীতের কাজকর্মের জন্য অত্যাচারী হিসেবেই চিহ্নিত ছিলেন। সোনোয়াল গ্রামের সাধারণ মানুষ যখন গোমাধর বা রূপচাঁদকে ভাবী রাজা হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, সেই সময় তাদের জানানো হয় যে এর পিছনে কোম্পানির অনুমোদন আছে। এইভাবে সাধারণ মানুষকেও প্রবঞ্চিত করা হয়। সর্বোপরি, ব্রিটিশ রণকৌশল, আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদির সামনে বিদ্রোহীরা কোনোভাবেই সমকক্ষ ছিল না। ফলে, এই বিদ্রোহকে দমন করতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে তেমন বেগ পেতে হয়নি এবং সমস্ত ঘটনাটি Neufville-র ভাষায় ছিল "Chimerical in design and short-lived."

১৪.৩.৩ তৃতীয় বিদ্রোহ

আহোম সিংহাসন ছিনিয়ে আনার জন্য জনৈক Eyang Goomendao বা গদাধর সিংহর নেতৃত্বে তৃতীয় একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান ঘটেছিল। গদাধর নিজেকে প্রাক্তন আহোম রাজা যোগেশ্বর সিংহ'র ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে দাবি করতেন। কোম্পানির দৃষ্টিতে গদাধর ছিলেন বর্মীদের এজেন্ট যারা ইয়ান্দাবো চুক্তির (১৮২৬) পরেও আসামের প্রতি শ্যেনদৃষ্টি অব্যাহত রেখেছিল। যাইহোক, কোম্পানির সতর্ক দৃষ্টির ফলে ব্রিটিশ-বিরোধী এই তৃতীয় বিদ্রোহটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা সম্ভব হয়েছিল।

উপরোক্ত পরপর তিনটি বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর থেকে শিক্ষা নিয়ে কোম্পানি আসামে ব্রিটিশ রাজের পত্তন ও সম্প্রসারণে অনুসৃত নীতির ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনতে বাধ্য হল। গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক নানা কারণে ডেভিড স্কট অনুসৃত সীমান্তের উপজাতি চিফ্ বা শাসকদের প্রতি নীতিকে 'তোষণ-নীতি' আখ্যা দিয়ে, আরও কড়া পদক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে আহোমদের শূন্য সিংহাসনে কিছুদিনের জন্য অনুগত একজন দাবিদারকে দিয়ে আপার-আসামকে করদ রাজ্যে পরিণত করার যে প্রস্তাব স্কট দিয়েছিলেন তার সাথে সহমত পোষণ করতেন। ১৮৩১ সালের ২০ আগস্ট ডেভিড স্কটের হঠাৎ মৃত্যুর ফলে এটি কিছুটা বিলম্বিত হয়েছিল। ১৮৩২ সালের অক্টোবরে ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ পুরন্দর সিংহকে জোড়হাটে রাজধানীসহ সিংহাসন প্রত্যর্পণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বিনিময়ে কোম্পানিকে পুরন্দর সিংহ বাৎসরিক

৫০,০০০ টাকার কর এবং ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টের নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবেন। এইভাবে ১৮৩৩ সালে আপার-আসামে আহোম করদ রাজ্যের যাত্রা শুরু হয়। ব্রিটিশ Court of Directors অবশ্য প্রথমেই জানতেন, এত বিপুল অঙ্কের নগদ অর্থ আহোম রাজার পক্ষে সময়মতো কোম্পানির তহবিলে জমা দেওয়া কঠিন হবে। Court of Directors-এর ভাষায় ঃ

> *It appears to us very doubtful whether the Chief will be able to pay an annual tribute. amounting half of his gross revenue without involving himself in embarrassment.*

১৪.২.২ ডেভিড স্কটের মূল্যায়ন (An estimate of David Scott)

আসামে গভর্নর-জেনারেল-এর এজেন্ট হিসেবে ডেভিড স্কট ১৮২৬ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত শাসনব্যবস্থার খুঁটি-নাটি ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের নজরে আনতেন এবং তাঁদের পরামর্শ নিয়েই সব কাজ করতেন। ১৮২৮ সালে তিনি আসামের কমিশনার পদে উন্নীত হন এবং আমৃত্যু (১৮৩১) সেই পদে থেকে কীভাবে সকলের আস্থা অর্জন করে ব্রিটিশ শক্তিকে আসামে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে ব্যাপারে তাঁর কিছু স্বকীয় চিন্তা ও প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেছিলেন। তাঁর কিছু প্রস্তাব গৃহীত হলেও, কর্তৃপক্ষ অনেক কিছুই নাকচ করে দিয়েছিলেন। আসলে, আসামের চিরায়ত শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি, সামাজিক বিধান ও ঐতিহ্য সম্পর্কে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট ধারণা না থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিলম্ব হত। এর ফলে ডেভিড স্কট মাঝে মাঝে হতাশাগ্রস্ত হতেন। স্কটের সকল প্রস্তাবই যে গ্রহণযোগ্য ছিল তা নয় ; তথাপি ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রূপকার হয়েও তিনি হিংস্র ও উলঙ্গ আক্রমণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর গণতান্ত্রিক চেতনার জন্য তিনি অনেক সময় ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে সমালোচিত হয়েছেন।

বর্মী আক্রমণে বিধ্বস্ত আসামে কিছুটা শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ছিল তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব। এই কাজে সাফল্যের জন্য ডেভিড স্কট অনেকেরই অভিনন্দন অর্জন করেছিলেন। সমগ্র আসামে যে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন সেই সময় সম্ভব ছিল না, এটি তিনি কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেহেতু নিম্ন-আসামে আহোম রাজাদের কর্তৃত্ব ছিল ক্ষীণ এবং বঙ্গদেশের লাগোয়া ঐ অঞ্চলে কিছুদিন মুসলিম শাসন অব্যাহত ছিল এবং রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিবেশী বঙ্গদেশের অনুরূপ ছিল, এরই জন্য যত

সহজে এটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে (আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮২৮-এ) শাসন করা সম্ভব ছিল ; আপার-আসামের ক্ষেত্রে আসামের ঊর্ধ্বভাগ ছিল আহোম রাজাদের ক্ষমতার কেন্দ্রভূমি এবং সামাজিক গঠনও ছিল কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। আহোম অভিজাতরা সহজে যে ক্ষমতা-হারানোর যন্ত্রণা ভুলতে পারবেন না, এটা তিনি জানতেন বলেই অভিজাতদের প্রতি তাঁর একটা সহানুভূতি ছিল ; যদিও তাঁদের বিদ্রোহগুলি নির্মম হাতে দমন করেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে পুরন্দর সিংহ শেষপর্যন্ত সিংহাসনে বসতে পেরেছিলেন। আহোম রাজত্বের প্রচলিত 'খেল' ব্যবস্থার যবনিকা তিনি টানেননি ; কিন্তু ঐ ব্যবস্থার সাথে জড়িত অন্যান্য প্রথা কিছুটা আধুনিক করতে গিয়ে তিনি একটা জগাখিচুড়ি শাসনব্যবস্থা চালু করেছিলেন। প্রচলিত বিনিময় ব্যবস্থার স্থলে তিনি নগদ অর্থে কর প্রদান থেকে শুরু করে সমস্ত আদান-প্রদান পদ্ধতি চালু করায় রীতিমত জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। অভিজাতদের ব্যক্তিগত দাস হিসেবে পাইকদের এতদিনের শ্রমদান ব্যবস্থা বা মধ্যযুগীয় শাস্তিদান পদ্ধতি রহিত করে তিনি মানবিকতার স্বাক্ষর রাখলেও, এইসব প্রথা যে আহোম যুগের 'খেল' ব্যবস্থারই অঙ্গ এটি সম্ভবত তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক বিধান যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অচল এটি সেই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে অনুধাবন করাও কঠিন ছিল। এরই জন্য A. C. Banerjee মন্তব্য করেছেন ঃ

> *Failure to realise the basic incompatibility of the Ahom and British system was Scott's greatest weakness. There could be no integration between the two even at superficial level and hasty attempts to forge links between them led to tension and maladjustments. Scott succeeded neither in conciliating the nobles nor in bringing happiness to the people.*

আসামে ডেভিড স্কটের শাসনকাল ছিল এক উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে আর এক উৎপাদন-সম্পর্কে বিবর্তনের যুগ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসামে আগমনের সাথে সাথেই যে প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বদলে পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি বা উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নয় ; তবে খুব ধীরে ধনতন্ত্রের উপাদানগুলির অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছিল। এইরকম একটি বিবর্তনের মুহূর্তে (জমিতে ব্যক্তি-মালিকানা প্রতিষ্ঠা, মুদ্রা-ব্যবস্থার মাধ্যমে আদান-প্রদান, চা-বাগানের সূত্রপাত, যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে উন্নত করার উদ্যোগ, খাস জমি সহ প্রাকৃতিক সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা ইত্যাদি)

সমাজে কিছু জটিলতা সৃষ্টি হয়। ডেভিড স্কট এইরকম একটি বিবর্তনের সন্ধিক্ষণে আসামের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৮২৯ সালে ডেভিড স্কটের এক আবেদনের ভিত্তিতে কলকাতার সন্নিকটে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রথমে গুয়াহাটি ও পরে চেরাপুঞ্জিতে শাখা অফিস তৈরি করে। শুধু খ্রিস্টধর্ম প্রচারই নয়, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল ঐ মিশনারিদের প্রধান উদ্দেশ্য। নানা কারণে গুয়াহাটি মিশন বন্ধ হলেও স্কট কিন্তু হাল ছাড়েননি। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়েই ১৮২৬ সালে ডেভিড স্কট প্রধানত নিম্ন-আসামে দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এবং সংস্কৃত ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়ে ১১টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও যেহেতু সমগ্র আসাম থেকে প্রত্যাশামতো রাজস্ব-আদায় হচ্ছিল না, সম্ভবত এরই জন্য ডেভিড স্কটের কাজকর্ম সম্পর্কে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ খুব একটা খুশি ছিলেন বলে মনে হয় না। স্কটের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে Court of Directors-এর একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ

> *For whatever cause, we have hitherto governed extremely ill.....the country has been retrograding, its inhabitants emigrating, its villages decaying and its revenue annually declining although in natural advantages.*

ডেভিড স্কট হয়তো কোম্পানির কর্মকর্তাদের মনোরঞ্জন করতে পারেননি ; কিন্তু তিনি চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। তিনি প্রথমে যে আশ্বাস আসামের মানুষকে দিয়েছিলেন, সেটি রক্ষা করতে পারেননি বলে সংগত কারণেই সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু আসামে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল এবং মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। একটি ব্যক্তির মূল্যায়ন সাধারণত দুটি দৃষ্টিতে হয়—এক, শাসকশ্রেণির দৃষ্টিতে এবং অন্যটি শাসিতের দৃষ্টিতে। স্কট শাসকশ্রেণির প্রতিনিধি হয়েই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। পরবর্তী কমিশনার রবার্টসন (১৮৩১-৩৪) স্কট সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন ঃ "Doubtless Scott attempted more than he was equal to perform" কিন্তু কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিবেদিত-প্রাণ এই যোদ্ধার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হননি ; বরং তাঁকে সমালোচনাই করেছেন। অন্যদিকে শাসিতের দৃষ্টিতে ডেভিড স্কটের সমালোচনাই প্রাপ্য ছিল। তা কিন্তু হয়নি। বর্তমান মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জিতে তাঁর সমাধিস্থলের স্মৃতি-সৌধে ডেভিড স্কটকে 'দীর্ঘদিনের নির্যাতিত মানুষের বন্ধু' হিসেবেই চিত্রিত করা হয়েছে। অসমিয়া ঐতিহাসিক Nirode K. Barooah (তাঁর গ্রন্থে *David Scott*

in North East India 1802-1831 : A Study in British Paternalism) মন্তব্য করেছেন ঃ

> *...no Assamese could have more efficiently championed the cause of his country as did Scott.*

১৪.৩ আসামে ব্রিটিশ শাসনের প্রসারণ এবং রাজ্য জয় (Expansion of British Rule in Assam and annexations of States)

১৪.৩.১ প্রেক্ষাপট

ডেভিড স্কটের অনুসৃত নীতি আসামের পরবর্তী কমিশনার রবার্টসন (১৮৩১-৩৪) এবং ফ্রান্সিস জেন্‌কিনস্ (১৮৩৪-৬১) এবং হপকিন্‌সন্ (১৮৬১-৭৪)-এর সময় প্রকৃতপক্ষে পরিত্যক্ত হয়। ১৮৩১ সালে স্কটের মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ আহোম-শাসিত অঞ্চল ছাড়াও আশপাশের ছোটখাটো স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যগুলিকেও নানা অজুহাতে গ্রাস করে একটি অখণ্ড বৃহৎ আসামের নীল নক্‌শা আঁকতে শুরু করেন। অবশ্য ১৮২৮ সালে নিম্ন-আসাম আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়েছিল ডেভিড স্কটেরই উদ্যোগে। ফ্রান্সিস জেন্‌কিনস্ প্রথম থেকেই পুরন্দর সিংহ-কে ১৮৩৩ সালে উর্ধ্ব-আসামের সিংহাসনে বসানোর পরিকল্পনাটির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। পুরন্দর সিংহ ব্রিটিশের করদ রাজ্যের অধিপতি হয়েও বারবার কমিশনার জেন্‌কিনস্-এর কাছে অপদস্থ হয়েছিলেন। এখানেই ডেভিড স্কটের আচরণের সাথে ফ্রান্সিস জেন্‌কিনস্-এর পার্থক্য। আসলে, ডেভিড স্কটের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ক্রমশ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। সময়মতো নির্দিষ্ট রাজস্ব কোম্পানির কোষাগারে জমা দিতে ব্যর্থতা, অপশাসন, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ইত্যাদি নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করে ১৮৩৮ সালে পুরন্দর সিংহ-কে অপসারিত করা হল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আহোম রাজতন্ত্রেরও যবনিকা টানা হল। এই সময় থেকেই শুধু 'লোয়ার' আসামই নয়, 'আপার' আসামও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়েছল। ইয়ান্দাবো চুক্তির (১৮২৬) ১২ বছর পরে ঘটনাটি ঘটেছিল। ডেভিড স্কট 'শ্রীরামপুর মিশন'-এর মাধ্যমে কিছু জনহিতকর কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু জেন্‌কিনস্ ব্রহ্মদেশ থেকে বহিষ্কৃত আমেরিকার ব্যাপটিস্ট মিশনকে আমন্ত্রণ করে তাঁর তথাকথিত *Civilizing mission* কর্মসূচি তৈরি করেন। এতদিন আসাম সম্পর্কে সুনিশ্চিত দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্প ও নীতির অভাবে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ অনেক

সময় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতেন, কিন্তু ফ্রান্সিস জেন্‌কিনস্ সহ কোম্পানির কর্মকর্তাদের আসামে Commodity Capitalist Structure গঠনের দিকে ঝোঁক এবং ব্রহ্মদেশ সহ সীমান্তের অন্যান্য দেশগুলির প্রতি নজর তীব্র হওয়ার ফলে ১৮৩০-এর দশক থেকে কোম্পানির অনুসৃত নীতির মধ্যে সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য লক্ষ করা যায়। আসলে ১৮৩০-এর দশকের নীচের দুটি ঘটনা এই নীতি পরিবর্তনে সাহায্য করে।

(১) ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী, ইউরোপীয়রা ভারতে জমির মালিকানা স্বত্ব প্রথম পাওয়ার পর আসামকে অন্যান্য উপনিবেশের মতো গঠন করার পথ প্রশস্ত হয়। ১৮৩৮ সালের Wasteland Rules বা পতিত জমি উদ্ধার ও বিলি-বণ্টনের নিয়ম প্রবর্তিত হয়। আসামে ব্রিটিশ সাহেবরা করমুক্ত প্রায় সাত লক্ষ একর জমির মালিকানা-স্বত্ব বিনা শ্রমে দখল করেন। অন্যদিকে আসামের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে নানারকম বিধিনিষেধ জারি এবং একর প্রতি দুই বা তিন টাকার রাজস্ব প্রদান রীতিও প্রবর্তিত হয়। এইভাবে আসামে ইউরোপীয় বাগিচা শিল্পমালিকদের রাজত্ব (Planter Raj) তৈরি করার পথ প্রশস্ত হয়।

অন্যদিকে আহোম অভিজাতদের অধিকাংশ ছিলেন প্রায় নিরক্ষর, চিরাচরিত 'খেল' ও 'পাইক' ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনে প্রায় অবলুপ্ত হওয়ার ফলে নানা সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ফ্রান্সিস জেন্‌কিনস্-এর 'চৌধুরি ব্যবস্থা'র স্থলে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং জমিতে পাট্টা-দান রীতি প্রবর্তনের ফলস্বরূপ এক সময়ের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এবং অভিজাত সমাজপতিরা প্রায় নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ।

(২) যদিও ১৮২৩ সালে রবার্ট ব্রুশ আপার-আসামে সিংফো উপজাতিদের কাছ থেকে বুনো চা-গাছের সন্ধান পেয়েছিলেন (প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য), তথাপি উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চর্চার পরেও বিশ্ববাজারে সেই সময়ে প্রচলিত চিনা চা-এর সমকক্ষ আসামের চা হতে পারবে কি না তা নিয়ে কোম্পানির যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ১৮৩২ সাল পর্যন্ত আসামের চা-এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনিশ্চিত ছিল। কিন্তু ১৮৩৩ সালে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হলেন যে, এই 'সবুজ সোনা' দিয়ে চায়ের সাম্রাজ্য (MacFarlanes-এর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম *Green Gold : The Empire of Tea*) গড়ে তোলা সম্ভব। ১৮৩৫ সালে আপার-আসামের লখিমপুরে প্রথম বড়ো চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত হল এবং ১৮৩৮ সালে আসামের চা বিদেশে সমাদৃত হল। ১৮৩৯ সালে 'আসাম কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা এবং পরের বছর দুই-তৃতীয়াংশ সরকারি পরীক্ষামূলক চা-বাগানকে বিনা অর্থে বিনা শুল্কে আসাম কোম্পানির অধিগ্রহণের সাথে সাথে

আসামের মাটিকে স্বর্ণতুল্য হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষের মধ্যে লক্ষ করা যায়। সুসতাং আসামকে যে কোনও মূল্যে রক্ষা করা এবং রাজ্যটির সীমানা প্রসারিত করা (সম্ভব হলে অন্য রাজ্য গ্রাস করে) কোম্পানির কাছে প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হল।

১৪.৩.২ সংক্ষিপ্তসার

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রসারণ নীতির মূল্যায়ন করতে হবে। ব্রিটিশ-শাসিত আসামের আয়তন ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১৮৩০ সালে দক্ষিণ কাছাড়, ১৮৩৩-এ খাসি পাহাড়, ১৮৩৫-এ জয়ন্তিয়া রাজ্য, ১৮৩৮ সালে মিকির হিলস্ (বর্তমান কার্বি-আংলং), ১৮৩৯ সালে মোরান/মটক রাজ্য এবং ১৮৫৪ সালে উত্তর কাছাড় একে একে দখল করা হয়। আসামে ব্রিটিশ শাসনের এই প্রসারণ প্রধানত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলেই হয়েছিল। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত থেকে বিদায় নিলেও ব্রিটিশ প্রভুত্ব সম্প্রসারণ নীতির কিন্তু যবনিকা টানা হয়নি। ১৮৭২-৭৩ সালে গারো পাহাড় এবং ১৮৯০ সালে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক লুসাই পাহাড় দখল এর বড়ো প্রমাণ। নাগা পাহাড় কোনও সময়েই অতীতে একক কর্তৃত্বে একজন দলনেতা বা চিফ্-এর অধীনে ছিল না। নাগাদের অনেক শাখা-প্রশাখা এবং প্রতিটি গোষ্ঠীর আলাদা দলপতি ছিলেন। ১৮৬৬ সালে আঙ্গামী-নাগাদের ব্রিটিশ শাসনাধীনে আনা সম্ভব হলেও সমগ্র নাগা পাহাড়ের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠা করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। অবশেষে ১৯০৪ সালে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সমগ্র নাগা পাহাড়কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে একটি শাসনাধীনে আনা সম্ভব হয়েছিল। এইভাবে ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসামের আয়তন ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল।

ব্রিটিশ আগ্রাসনের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণের কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন যাতে উপলব্ধি করা যায়, কীভাবে ব্রিটিশ শক্তি আসামের আশপাশের বিভিন্ন এলাকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

১৪.৩.২.১ কাছাড় দখল (Annexation of Cachar)

(প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কাছাড় সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য)

ত্রয়োদশ শতকে আহোম আগমনের পূর্বে উত্তর-পূর্ব ভারতে কাছাড়ি রাজ্য (যেটি মধ্যযুগে দিমাসা রাজ্য হিসেবে পরিচিত) বহুদূর বিস্তৃত ছিল। দিমাসা (দিমা বা ধানসিড়ি নদীর সন্তান) জনগোষ্ঠী বোড়ো-কাছাড়িদেরই একটা অংশ। দিমাসা

রাজাদের মধ্যে শত্রুদমন/প্রতাপনারায়ণ (১৫৮৩-১৬১৩) বিখ্যাত যিনি একসময় বর্তমান নওগাঁও জেলার দিমারু, সমতল কাছাড় ও উত্তর কাছাড়, ধানসিড়ি উপত্যকা এবং সিলেটের পূর্বাংশে তাঁর কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিলেন এবং নিজের নামে মুদ্রাও প্রচার করেছিলেন। কিন্তু এই কাছাড়ি রাজারা আহোম, কোচ, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ফলে পর্যুদস্ত হয়ে ধীরে ধীরে পিছু হটতে এবং তাঁদের রাজধানী প্রথমে ডিমাপুর (বর্তমান নাগাল্যান্ডে) থেকে মাইবং এবং পরে খাসপুর এবং হরিতিকরে (বর্তমান করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরের কাছে) স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন। ব্রিটিশ শক্তির সাথে কাছাড়িদের প্রথম যোগাযোগ হয় ১৭৬২ সালে যখন চট্টগ্রাম থেকে Verelst সাহেব কিছু সিপাই নিয়ে মণিপুরের দিকে যাওয়ার পথে (বর্মীরা মণিপুরের রাজা জয়সিংহকে সিংহাসনচ্যুত্য করায় জয়সিংহকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে) বর্তমান শিলচরের কাছে যাত্রাপুরে প্রায় এক বছর ছাউনি করেছিলেন। আসলে সিপাইদের রোগ, মৃত্যু ইত্যাদি নানা কারণে Verelst সাহেবের আর শেষপর্যন্ত মণিপুর যাওয়া সম্ভব হয়নি, তবে কাছাড়ি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের (১৭৭২-১৮১৩) সাথে খাসপুরে যোগাযোগ হয়েছিল।

১৮১৩-তে কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ (১৮১৩-৩০) সিংহাসনে বসলেও ঘরে-বাইরে সর্বত্রই ছিলেন শত্রু সমাকীর্ণ। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজভৃত্য কোহি দাস পাহাড়ে ঘেরা দুর্গম উত্তর কাছাড়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার ডাক দেন। গোবিন্দচন্দ্রের লোকজন গোপনে কোহি দাসকে হত্যা করলেও কোহি'র পুত্র তুলারাম নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা দেওয়ার ফলে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কাছাড় রাজ্য উত্তর এবং দক্ষিণ এই দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং তুলারাম সেনাপতি প্রকৃতপক্ষে ১৮২৮ থেকে ১৮৫৪ পর্যন্ত উত্তর কাছাড় পাহাড়ে নিজের আধিপত্য বজায় রাখেন। অন্যদিকে মণিপুরের সংলগ্ন দক্ষিণ কাছাড়ের সমতল এলাকার অধিপতি গোবিন্দচন্দ্র মণিপুর রাজপ্রাসাদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে যুক্ত থাকলেও মণিপুরী ও বর্মীদের দৌরাত্মে সব সময় অসহায়বোধ করতেন। ১৮২৪ সালের ৬ মার্চ গোবিন্দচন্দ্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং বাৎসরিক দশ হাজার টাকা কোম্পানিকে দেওয়ার বিনিময়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান। ডেভিড স্কট চেয়েছিলেন গোবিন্দচন্দ্রের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় কোম্পানি যেন হস্তক্ষেপ না করে, কিন্তু গভর্নর জেনারেল স্কটের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। ফলে, দক্ষিণ-কাছাড় প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ইয়ান্দাবো চুক্তির (১৮২৬) পর বর্মী আগ্রাসন কমলেও,

মণিপুরের সাথে দক্ষিণ কাছাড়ের তিক্ত সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। ১৮৩০ সালের ২৪ এপ্রিল মণিপুরের রাজা গম্ভীর সিং-এর ষড়যন্ত্রে গোবিন্দচন্দ্র আততায়ীর আঘাতে নিহত হন।

যেহেতু গোবিন্দচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন এবং কোম্পানির কর্তৃপক্ষ দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার মানতে অস্বীকার করলেন, এরই জন্য টি. ফিসার নামে কোম্পানির সেনাবাহিনীর জনৈক অফিসারের হাতে ১৮৩০ সালের ৩০ জুন চেরাপুঞ্জিতে সদর দপ্তর করে কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হল। যদিও সেই সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি'র (১৮৪৮-৫৬) 'স্বত্ববিলোপ নীতি' আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়নি, তথাপি কাছাড়ের সমতল এলাকা গভর্নর জেনারেল-এর ঘোষণা অনুযায়ী ১৮৩২ সালের ১৪ আগস্ট (প্রথমে দুধপাতিল ও পরে শিলচরে সদর-কেন্দ্র করে) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হল। প্রথমে এই ব্রিটিশ জেলার সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে টি. ফিসার এবং পরে আই. জি. বার্নস্, ই. আর. লিউনস্, ই. পিয়ারসন, পি. জি. ভার্নার প্রভৃতি সাহেবরা কার্যভার গ্রহণ করেন। J. B. Bhattacharjee তাঁর *Cachar Under British Rule in North East India* গ্রন্থে কাছাড়ের এই রাজনৈতিক নাটকের কাহিনি বর্ণনা করেছেন।

১৪.৩.২.১.১ নর্থ কাছাড় দখল

আমরা আগেই লক্ষ করেছি, কীভাবে কাছাড়ি বা দিমাসা রাজ্য বলতে একসময় সমতল ও পাহাড়ি—এই উভয় কাছাড়কেই বোঝাত এবং কীভাবে রাজভৃত্য কোহি দাস ও তাঁর পুত্র তুলারাম সেনাপতির বিদ্রোহের ফলে কাছাড় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে উত্তর কাছাড় রাজ্যের জন্ম হয়। তুলারাম জয়ন্তিয়া পাহাড়ের রাজা রাম সিং-এর কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন, কারণ রাম সিং-এর লক্ষ্য ছিল কাছাড়ি শক্তিকে দুর্বল করা। যেহেতু প্রথমদিকে অর্থাৎ ১৮৩০-এর দশকের আগে, আসামে স্থায়ীভাবে ব্রিটিশ প্রতিপত্তি ও সীমানা বৃদ্ধির দিকে কোম্পানির তেমন আগ্রহ লক্ষ করা যায় না, সম্ভবত এরই জন্য ডেভিড স্কট ১৮২৯ সালে গোবিন্দচন্দ্র ও তুলারামের বিবাদ নিষ্পত্তির একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তুলারামের সাথে কথা বলার মানসিকতা গোবিন্দচন্দ্রের ছিল না, কারণ তুলারামকে তিনি ঘৃণা করতেন। ফলে, ডেভিড স্কটের মীমাংসা-সূত্র বের করার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। কিন্তু স্কটের মৃত্যুর পর ঘটনা-প্রবাহ অন্যদিকে বইতে শুরু করে। ১৮৩৪ সালের ৩ নভেম্বর কমিশনার ফ্রান্সিস জেন্‌কিনস্ তুলারামকে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করেন যার ফলে তুলারাম শুধু নামে মাত্র উত্তর কাছাড়ের অধিপতিতে

পরিণত হন এবং তাঁর রাজ্যটি প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির একটি ভৃত্য করদ রাজ্যে পরিণত হয়। তুলারামের রাজ্যের একটি অংশ কেটে ব্রিটিশ শাসিত নওগাঁও জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৫৪ সালে তুলারামের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র নকুলরাম ও ব্রজনাথের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও অপদার্থতার অভিযোগ এনে, গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি-র নির্দেশমতো, উত্তর কাছাড় পাহাড়ের বাকি অংশও বিনা বাধায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। এইভাবে সমতল ও পাহাড়ি— এই দুই কাছাড়ের সীমান্ত পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হয়।

১৪.৩.৩ খাসি পাহাড় দখল (Annexation of Khasi Hills)

আহোম যুগে খাসি পাহাড় সহ সংলগ্ন পার্বত্য এলাকা আসামের সীমান্ত অঞ্চল হিসেবেই বিবেচিত হত এবং এই পাহাড়ের দলপতিদের সাথে নামমাত্র আনুগত্যের বিনিময়ে আহোমরা সুম্পর্ক বজায় রাখতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম দিকে আহোমদের এই নীতি অনুসরণ করলেও এবং খাসি দলপতিরা কোম্পানির ক্রমাগত প্রসারণের বিরুদ্ধে তেমন চ্যালেঞ্জ না জানালেও ক্রমশ এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। ঐ পাহাড়ের উপজাতিরা মাতৃ-প্রধান সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বিশ্বাসী। ভৌগোলিক দিক থেকে বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে এবং আসামের দক্ষিণ-পশ্চিমে ঐ পাহাড়ের অবস্থান, সুতরাং বাণিজ্যিক ও সামরিক প্রশ্নে কোম্পানির কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি অধিকার লাভ করে এবং সিলেটের সুরমা উপত্যকা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অঙ্গীভূত হয়। ১৭৯০-এর দশকে পাহাড় থেকে নীচে নেমে এসে ব্রিটিশ কর্মকেন্দ্রের উপর উপজাতিদের হামলা কোম্পানির কাছে দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। ১৮২৮ সালে নিম্ন আসামের উপর কোম্পানির আধিপত্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুরমা উপত্যকাকে যুক্ত করা কোম্পানির কাছে প্রাধান্য পায়। এটি যুক্ত করার জন্য খাসি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পথ নির্মাণের প্রশ্নটি কেন্দ্র করেই খাসি-ব্রিটিশ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল।

১৪.৩.৩.১ ইউ-তিরোট সিং-এর সংগ্রাম (Struggle of U. Tirot Singh)

প্রাক-ব্রিটিশ যুগে জয়ন্তিয়াদের স্বতন্ত্র রাজ্য ছাড়াও খাসি পাহাড় ছোটো ছোটো খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং খাসি দলপতিরা Syiem (স্যিয়েম) বা রাজা হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতেন। এঁদের নিজেদের সম্পর্কও স্বাভাবিক কারণে খুব একটা ভালো ছিল না। কমপক্ষে ২৫টি স্যিয়েম-এর মধ্যে Nongkhlaw (নংখলই)-এর স্যিয়েম ইউ তিরোট সিং (১৮০২-১৮৩৪)-এর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য, কারণ তাঁর এলাকা দিয়েই ব্রিটিশরা রাজপথ নির্মাণ করতে গিয়ে প্রবল বাধার মুখোমুখি হয়েছিলেন। ১৮২৬ সালে নংখলউ-এর স্যিয়েম ছত্তর সিং-এর মৃত্যুর পর যখন খাসি 'দরবার' (পঞ্চায়েত) পরবর্তী স্যিয়েম নির্বাচনের প্রশ্নে প্রচণ্ড দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মুখোমুখি, সেইসময় কোম্পানির কমিশনার ডেভিড স্কটের হস্তক্ষেপের জন্যই তিরোট সিং স্যিয়েম হতে পেরেছিলেন। এরই বিনিময়ে তিরোট সিং ১৮২৬ সালের নভেম্বরে ডেভিড স্কটের সাথে একটি চুক্তিতে অন্যান্য অনেক শর্তের মধ্যে কোম্পানিকে নংখলউ এলাকার মধ্য দিয়ে পথ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন (অনেক বিতর্কের পর খাসি দরবার এই চুক্তি গ্রহণও করেছিল)। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই চুক্তি অগ্রাহ্য করার প্রবণতা খাসিদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

খাসি উত্তেজনার আর একটি অন্যতম কারণ ছিল। আহোম যুগে নিম্ন-আসামের কামরূপের দক্ষিণে নাদুয়ার (নয়টি দুয়ার) এলাকায় খাসি দলপতিরা নামমাত্র নজরানা দিয়ে সমতলের মানুষের সাথে, বিশেষত সিলেট অঞ্চলের লোকজনের সাথে, আদান-প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি করার অধিকার ভোগ করে আসছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ-শক্তি নিম্ন-আসামে আসার পর থেকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার সেই অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। মাত্র তিনটি দুয়ারে কিছু অধিকার অবশিষ্ট থাকে এবং সেটিও আবার কোম্পানির লোকজনকে নগদ অর্থে কর বা ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে। ১৮২৬ সালে চুক্তির সময় ডেভিড স্কট আশ্বাস দিয়েছিলেন তিরোট সিং বরদুয়ারে কারও হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজের অধিকার কায়েম করতে পারবেন। তা কিন্তু হয়নি। H. K. Barpujari তাঁর *Problem of the Hill Tribes : North East Frontier* গ্রন্থে বরদুয়ারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাধর বরুয়ার সাথে তিরোট সিং-এর কথোপকথন এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

> *Barroowah, Mr. Scott formerly made friendship with me saying 'your enemy is company's enemy' and he would relinquish the Borduar revenue, both in money and* ***pykes****. He has not done it, and he has the wish to give troops to my enemy...*

সহজ, সরল খাসি নেতার কাছে সভ্যতার মুখোশধারী সাহেবদের এই কথার খেলাপ মর্মবেদনার কারণ ছিল। তাছাড়া শুরু থেকেই কোম্পানির সেনাবাহিনী নংখলউ-কে পদানত রাজ্য হিসেবে দেখত এবং সাধারণ মানুষের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাত। এরই বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে স্বাধীনতার ধ্বজা নিয়ে তিরোট সিং-এর বাহিনী ১৮২৯ সালের ৪ এপ্রিল নংখলই-য়ে কোম্পানির ক্যাম্প পুড়িয়ে

ছারখার করে দেয়, রাস্তা নির্মাণের সাথে জড়িত শ্রমিক সহ দু'জন ব্রিটিশ অফিসার Bedingfield এবং Burlton-কেও হত্যা করে (ইতিহাসে এটি Massacre of Nongkhlaw নামে পরিচিত)। এই ঘটনার পরেই শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে ছোটোবড়ো নানা ধরনের সংঘর্ষ।

তিরোট সিং অন্যান্য খাসি স্যিয়েমদেরও তাঁর সাথে যৌথ অভিযানের আবেদন জানান এবং অনেকেই সে ডাকে সাড়া দেন। যেসব খাসি নেতা তিরোটের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে Bormanik, Lorshan Jarain এবং Monbhut-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য স্যিয়েমরাও প্রথমদিকে সাধ্যমতো এগিয়ে এসেছিলেন এবং তিরোটের নেতৃত্বে প্রায় দশ হাজার বাহিনী তৈরি হয়েছিল যাতে প্রাপ্ত-বয়স্ক প্রায় সকলেই ছিলেন সৈনিক। এছাড়া প্রাক্তন আহোম রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ, সিংফো, খামতি ও ভুটিয়াদেরও ব্রিটিশ বিরোধী এই অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য তিরোট সিং আহ্বান জানিয়েছিলে। Capt. Pemberton তাঁর রিপোর্টে তিরোটের অভিযান সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ঃ

> *They descended into the plains both of Assam and Sylhet, and ravaged with fire and sward the villages which stretched along the base of the lofty region.*

মিলিথেম এবং থাইরম-এর স্যিয়েমদের সাহায্য নিয়ে দীর্ঘ চার বছর ব্যাপী (১৮২৯-৩৩) এই অসম যুদ্ধে খাসিরা গেরিলা কায়দায় মাঝে মাঝে ব্রিটিশ শক্তিকে উত্যক্ত করলেও শেষ পর্যন্ত পরাজন স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অবশেষে ১৮৩৩ সালের ১৩ জানুয়ারি তিরোট সিং ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৩ সালেই খাসি পাহাড় দখল হয়। তাঁকে ঢাকার কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। এর আগেই অন্যান্য স্যিয়েমরা আত্মসমর্পণ করেছিলেন। অবশ্য Cherra, Khyrim, Nongstoin, Langrin এবং Nongspung প্রভৃতি এলাকার স্যিয়েমরা নিজেদের অধিকার অনেকটা সুরক্ষিত রেখে পূর্বেই ব্রিটিশদের সাথে সমঝোতায় এসেছিলেন। Aitchinson-এর *(A Collection of Treaties, Engagements and Sanads)* বর্ণনা অনুযায়ী, তিরোট সিং জেলে বন্দি থাকা অবস্থায়, স্যিয়েম পদ অবলুপ্ত না করে তিরোটের ভাগিনেয় রাজন সিং-কে পরবর্তী স্যিয়েম করা হয়েছিল। ব্রিটিশরা একা তিরোট সিং-এর বিদ্রোহ সহজে দমন করতে পারেনি, মণিপুরের অনুগত রাজা গম্ভীর সিং ও নর সিং-এর সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তিরোট-কে আশ্বাস দিয়েছিলেন ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব মেনে নিলে তাঁর স্যিয়েম পদ আবার তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া

হবে, কিন্তু তিরোট উত্তরে বলেছিলেন ঃ "একজন নামে মাত্র রাজার ক্রীতদাসের জীবনযাপনের চেয়ে তিনি সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন বেশি পছন্দ করেন"। দীর্ঘ একবছর বন্দি থাকা অবস্থায় ঢাকা কারাগারেই ১৮৩৪ সালে মাত্র ৩২ বছর বয়সে তিরোট সিং-এর জীবনাবসান হয়।

শুধু খাসি সমাজ যে আজ তিরোট সিং-এর জন্য গর্ব অনুভব করে তাই নয়, ব্রিটিশ-বিরোধী দেশপ্রেমিক হিসেবে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের তিনি অহংকার। Dr. U. Hamlet Bareh প্রণীত তিরোট সিং-এর জীবনী ভারত সরকারের Publications Division প্রকাশ করেছে। খাসি পাহাড়ের নংখলউ-তে তাঁর স্মৃতিসৌধ একটি দর্শনীয় স্থান। সম্ভবত তিরোট সিং-এর জনপ্রিয়তা লক্ষ করে ব্রিটিশ শক্তি খাসি জনগোষ্ঠীর স্যিয়েম ব্যবস্থা সহ চিরাচরিত প্রথার উপর হস্তক্ষেপ না করলেও, ১৮৩৫ সালের মার্চ মাসে Capt. Lister-কে Political Agent হিসেবে নিয়োগ করা হয়। যে খাসি পাহাড় এতদিন ছিল আসামের সীমান্ত, সেটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। শুধু তাই নয়, খাসি পাহাড়ের শিলং শহর—যেটি ব্রিটিশদের চোখে ছিল "Scotland of the East"—১৮৭৪ সালে (আসাম চিফ্ কমিশনার শাসিত প্রদেশে পরিণত হওয়ার পর) আসামের রাজধানী হিসেবে ঘোষিত হয়।

১৪.৩.৪ জয়ন্তিয়া রাজ্য দখল (Annexation of the Jayantia Kingdom)

১৪.৩.৪.১ জয়ন্তিয়ার অবস্থান ও রাম সিং

ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বাস করে ঐ পাহাড়ের নামেই পরিচিত জয়ন্তিয়া উপজাতি। জয়ন্তিয়া রাজ্যের জন্মকাহিনি ঠিক না জানা গেলেও ষষ্ঠদশক শতকের শুরুতে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে প্রভাবিত জয়ন্তিয়া রাজা প্রভাত রায়ের আমলে (১৫০০-১৫১৬ খ্রি.) জয়ন্তিপুরে রাজধানী সহ ঐ রাজ্যের সীমানা যে অনেকদূর বিস্তৃত ছিল এবং বর্তমান সিলেটের অঞ্চল জয়ন্তিয়া রাজ্যের অঙ্গ ছিল তার কিছু অকাট্য প্রমাণ আছে। কালক্রমে জয়ন্তিয়া রাজ্যের ক্রমশ শক্তি ক্ষয় শুরু হয়। কোচ, কাছাড়ি, আহোম প্রভৃতি শক্তির সাথে সংঘর্ষ এর প্রধান কারণ। ১৭৬৫-তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি অধিকার লাভ করার ফলে সুরমা উপত্যকা এলাকায় জয়ন্তিয়া রাজা/স্যিয়েম ক্ষমতা হারায়। ১৮২৪ সালের মার্চ মাসে আসামের এজেন্ট ডেভিড স্কট যখন জয়ন্তিয়ার রাজা দ্বিতীয় রাম সিং (১৭৯০-১৮৩২)-এর সাথে চুক্তি করেন, তখন তাঁর ধারণা ছিল

বর্মীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধে জয়ন্তিয়াদের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পাবেন। কিন্তু তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। খাসিদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময়ও ব্রিটিশ শক্তি জয়ন্তিয়া রাজের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পায়নি। ফলে, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ রাম সিং-এর প্রতি এমনিতেই রীতিমত বিরক্ত ছিলেন। এছাড়া জয়ন্তিয়ার বিরুদ্ধে কোম্পানির অভিযোগ ছিল যে ঐ রাজ্যটি প্রাক্তন আহোম রাজ্যের দিকে ক্ষমতা প্রসারিত করার চেষ্টা করছে। Gait সাহেব তাঁর *History of Assam* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

> Ram Singh *"encroached considerable on the southern border of the Nagaon district"* during *"the unsettled conditions which prevailed for some years after the Burmese War"*.

১৪.৩.৪.২ নরবলি

এছাড়া ১৮৩২ সালে একটি নতুন অভিযোগ আনা হল ঃ দু'জন ব্রিটিশ প্রজাকে নাকি জোড় করে জয়ন্তিয়া রাজ্যে ধরে নিয়ে গিয়ে মাকালীর সামনে বলি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল (যদিও ধৃতরা শেষ পর্যন্ত পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল)। কোম্পানির পক্ষ থেকে দাবি জানানো হল অবিলম্বে নৃশংস নরবলি প্রথা জয়ন্তিয়া রাজ্যে নিষিদ্ধ করতে হবে। আসলে, রাম সিং নিজে এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করলেও তিনি একা স্যিয়েম হিসেবে এতদিনের একটি প্রচলিত প্রথাকে নিষিদ্ধ করতে পারতেন না, কারণ জয়ন্তিয়া সমাজে শক্তির উপাসক 'দোলুই'-দের অনুমতি পাওয়া ছিল জরুরি। ১২জন উপজাতি সর্দার বা 'দোলুই'-এর মিলিত উদ্যোগের ফলেই জয়ন্তিয়া রাজ্য গঠিত এবং এরই জন্য জয়ন্তিয়া'র আর এক নাম *Ka Ri Khadar Doloi* (বা ১২ 'দোলুই'-এর রাজ্য)। যাইহোক, এই ঘটনার ঘা শুকিয়ে যাবার আগে আবার একটি অনুরূপ ঘটনা ঘটল। চারজন ব্রিটিশ প্রজাকে অপহরণ করে তিনজনকে সত্যিই মাকালীর সামনে বলি দেওয়া হল। Gait সাহেবের মতে, সমস্ত ঘটনাটিই ছিল ষড়যন্ত্র এবং এর পিছনে নওগাঁও-র পশ্চিমে গোভা'র রাজার ইন্ধন ছিল। যাইহোক, আসামে ব্রিটিশ কমিশনার টি. সি. রবার্টসন (১৮৩১-৩৪)-কে ঘটনাটি তদন্তের আশ্বাস দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই জয়ন্তিয়ার স্যিয়েম/রাজা রাম সিং-এর মৃত্যু হয় (১৮৩২ সালের সেপ্টেম্বরে)।

১৪.৩.৪.৩ রাজেন্দ্র সিংহ

যেহেতু রাম সিং-এর পুত্র সন্তান ছিল না, এরই জন্য তাঁর দূর সম্পর্কের ভাগিনেয় ১৭ বছরের কিশোর রাজেন্দ্র সিং (১৮৩২-৩৫)-কে জয়ন্তিয়ার স্যিয়েম বা রাজা

হিসেবে ঘোষণা করা হয়। স্বল্পবয়সী এই স্যিয়েম-এর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রবার্টসন কোম্পানির 'কোর্ট অব ডাইরেক্টরস'-এর কাছে প্রস্তাব দেন যে, ১৮২৪-এর মার্চ মাসে ডেভিড স্কট ও রাম সিং-এর মধ্যে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি বাতিল করার সময় উপস্থিত, কারণ ঐ চুক্তি নাকি 'ব্যক্তিগত চুক্তি'। কোম্পানির কর্মকর্তাদের মধ্যে এই প্রশ্নটি কেন্দ্র করে অনেক বিতর্কের পর ১৮৩৩ সালের মে মাসে রবার্টসন নিজে ছুটে গিয়ে রাজেন্দ্র সিং-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বার্ষিক দশ হাজার টাকার নগদ কর প্রদানসহ অনেক অবমাননাকর শর্ত সংবলিত একটি নতুন চুক্তির খসড়ায় অবিলম্বে স্বাক্ষরদানের জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেন। 'দোলুই'দের পরামর্শ ছাড়া ঐ প্রস্তাবে রাজি হওয়া সম্ভব নয়, এই কথা রাজেন্দ্র সিং জানানোর সাথে সাথে রবার্টসন হুমকি দিয়ে যান, যতদিন না রাজেন্দ্র সিং ঐ নতুন চুক্তি গ্রহণ করছেন, ততদিন কোম্পানি তাঁকে স্যিয়েম হিসেবে স্বীকৃতি দেবে না।

ইতিমধ্যে রাজেন্দ্র সিং 'দরবার' না ডেকে দু'জন 'দোলুই'কে বন্দি করার ফলে রাজ্যের অভ্যন্তরেও নানা রকম জটিলতা সৃষ্টি হয়। জয়ন্তিয়া পাহাড়ের প্রথা অনুযায়ী, কয়েকটি গ্রাম সংঘবদ্ধ করে হয় 'এলাকা' এবং তার প্রধানের নাম 'দোলুই' এবং এঁরাই স্যিয়েম/রাজা নির্বাচন করেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে 'দরবার' ডাকতে হয় যাতে কেউ স্বৈরাচারী না হয়। তিন রকমের 'দরবার' প্রথা জয়ন্তিয়া সমাজে প্রচলিত আছে ঃ গ্রামের দরবার, এলাকা দরবার এবং স্যিয়েম দরবার। রাজেন্দ্র সিং-এর অভিযোগ ছিল, 'দোলুই'দের একটি অংশ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

১৪.৩.৪.৪ দখল-নাটকের শেষ পর্ব

রবার্টসন ফিরে এসে আবার সেই পুরোনো প্রশ্নটিকে (অর্থাৎ নরবলির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের অবিলম্বে কোম্পানির কাছে সমর্পণ সংক্রান্ত) কেন্দ্র করে হুমকি দেন এবং একইসাথে গভর্নর জেনারেলের কাছে জয়ন্তিয়ার রাজাকে অবিলম্বে অপসারিত করার অনুমতি চান। কিন্তু আইনগত কিছু অসুবিধার জন্য সেই মুহূর্তে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ রাজি হননি। ১৮৩৪ সালে কমিশনার পদে রবার্টসনের পর ফ্রান্সিস জেন্‌কিনস্ স্থলাভিষিক্ত হন। ১৮৩৪ সালে রাজেন্দ্র সিং এক ডেপুটেশনে মিলিত হয়ে জেন্‌কিনস্-কে বিশদভাবে তাঁর অসহায়তার কথা জানানোর পর এই তরুণ রাজার প্রতি জেন্‌কিনস্ সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। জেন্‌কিনস্ বিভিন্নভাবে কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে রাজেন্দ্র সিং-এর প্রতি কিছুটা উদার হবার আবেদন জানান, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। অবশেষে ১৮৩৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ

ভারতের সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রাজেন্দ্র সিং-কে রাজধানী জয়ন্তিয়াপুর সহ সমতলের সমস্ত এলাকা কোম্পানির কাছে হস্তান্তরের এবং পার্বত্য এলাকার জন্য বাৎসরিক ১০ হাজার টাকার কর ইত্যাদি সংক্রান্ত নোটিশ দেওয়া হয় এবং সেইমতো ১৮৩৫ সালের ১৫ মার্চ সেটি কার্যকরী হয়। যেহেতু Gait সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী ঐ সময় জয়ন্তিয়া পাহাড়ে কিছু ছাগল, লাকড়ি ও মুড়ি ছাড়া তেমন কোনো সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়নি, এরই জন্য রাজেন্দ্র সিং সমতল এলাকার সাথে জয়ন্তিয়া পাহাড়ও কোম্পানির হাতে সমর্পণ করাই শ্রেয় মনে করলেন। এইভাবে জয়ন্তিয়া পাহাড়কে ছিনিয়ে নেওয়া নাটকের সমাপ্তি হল। যদিও কোম্পানির কর্মকর্তারা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে স্যিয়েম পদ অবলুপ্ত করেছিলেন, কিন্তু 'দোলুই' থেকে শুরু করে গ্রামীণ ব্যবস্থাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। স্বাধীনচেতা জয়ন্তিয়ার মানুষ ব্রিটিশ শাসনকে যে মেনে নিতে পারেননি, সেটি ১৮৬২ সালে জয়ন্তিয়া বিদ্রোহের সময় প্রতিফলিত হয়েছিল এবং বিদ্রোহী নেতা U Kiang Nongbah-র ফাঁসি হয়েছিল।

১৪.৩.৫ সাদিয়া দখল (Annexation of Sadiya)

১৪.৩.৫.১ খামতি অধিপতি 'সাদিয়াখোয়া গোঁহাই' উৎখাত

বর্তমান অধ্যায়ের ১৪.২.১(২) অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, কীভাবে আহোমরাজা প্রতাপ সিংহ খামতি উপজাতিকে পুরোপুরি দমন করতে না পেরে খামতি দলপতির জন্য 'সাদিয়াখোয়া গোঁহাই' পদটি সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ডেভিড স্কট ১৮২৬ সালে খামতিদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। থেরাবাদী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী (যদিও মাংসাশী) এবং থাই উদ্ভূত খামতি (শ্যান-দের 'লিক্-তাই' লিপির সাথে পরিচিত) জনগোষ্ঠী সাদিয়া অঞ্চলে আসার পর মটকদের সাথে প্রথমদিকে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু খামতি-মটক সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হতে শুরু করে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই সুযোগটি গ্রহণ করে। যে দু'জন 'সাদিয়াখোয়া গোঁহাই' ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তাঁরা হলেন (১) Chow Salam (১৮২৫-৩৪), (২) Chowrang Phat (১৮৩৪-৩৮)। খামতিরা প্রথম দিকে ব্রিটিশদের নানাভাবে সাহায্যও করত। বর্তমান অধ্যায়ের ১৪.২.১.৩-এ আমরা লক্ষ্য করেছি কীভাবে আহোম অভিজাত বিদ্রোহী ধনঞ্জয় বরগোঁহাই-এর আত্মগোপনকারী পুত্র হরকান্তকে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে 'সাদিয়াখোয়া বরগোঁহাই' সমর্পণ করেছিলেন। খামতিদের মতই থেরাবাদী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সীমান্তের সিংফো উপজাতি—যারা অষ্টাদশ

শতকে আসামে প্রবেশ করেছিল (যাদের অনেক সময় 'কাচিন' বলে পরিচয় দেওয়া হয়) এবং যাদের কাছ থেকে রবার্ট ব্রুশ প্রথম চা-গাছের সন্ধান পেয়েছিলেন (প্রথম খণ্ডের ১৩.৪ দ্রষ্টব্য)—ব্রিটিশ প্রভুত্ব অস্বীকার করে বিদ্রোহের ধ্বজা তোলায় ১৮৩০-এ তাদের দমন করার জন্য ব্রিটিশ শক্তির পাশে দাঁড়িয়েছিল খামতিরাই। সুতরাং 'সাদিয়াখোয়া গোঁহাই'দের আনুগত্যের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশদের সন্দেহ থাকার কারণ ছিল না। তথাপি সন্দেহ দিন দিন ঘনীভূত হতে শুরু করল। আসলে, ১৮৩৪ সালে Chow Salam-এর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অর্থাৎ পরবর্তী 'সাদিয়াখোয়া গোঁহাই'-এর সময় অবস্থা জটিল হতে শুরু করল।

সাদিয়া অঞ্চলের উল্টোদিকে মটক রাজ্যের সীমানার অভ্যন্তরে সাইখোয়া এলাকাটি ১৮৩৪ সালে সাদিয়াখোয়া গোঁহাই দখল করলে মটক-খামতি উত্তেজনা এতই তুঙ্গে ওঠে যে উভয়ের মধ্যে তথাকথিত মীমাংসার সূত্র বের করার জন্য শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট-এর প্রতিনিধি হিসাবে লেফ্‌ট্যানেন্ট চার্লটন-কে সাদিয়ায় নিয়োগ করতে কোম্পানি বাধ্য হয়। কিন্তু চার্লটনের সাথে সাক্ষাৎ করতেও 'সাদিয়াখোয়া গোঁহাই' অস্বীকার করলে কোম্পানি সামরিক হস্তক্ষেপ করে, কারণ কোম্পানির কর্তৃপক্ষের ইতিমধ্যে ধারণা হয়, ঐ গোঁহাই কোম্পানির শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে একটি বড়ো আকারের বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে, 'সাদিয়াখোয়া গোঁহাই'কে (অর্থাৎ Chowrang Phat-কে) ক্ষমতাচ্যুত করে গুয়াহাটি কারাগারে বন্দি করা হয়। সাদিয়া এবং সাইখোয়া—এই দুটি অঞ্চলই সরাসরি ব্রিটিশ শাসনে চলে আসে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৪.৩.৫.২ খামতি বিদ্রোহ

কারণ

আপার-আসামে কোম্পানির এইভাবে উলঙ্গ আক্রমণ, সীমানা প্রসারণ এবং রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্যোগ খামতিরা যে নীরবে মেনে নিয়েছিল তা নয়। ১৮৩৯-এর খামতি বিদ্রোহে কোম্পানির কর্মকর্তারা কিছুটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। 'সাদিয়াখোয়া গোঁহাই'কে যেভাবে বন্দি করে গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই দৃশ্য এমনিতেই খামতি জনগোষ্ঠীর মনঃপীড়ার কারণ ছিল। এরপর চার্লটন সাহেব সাদিয়ার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে নানা রকম পীড়নমূলক কর নগদ অর্থে জমা দেওয়ার জন্য অত্যাচার শুরু করলেন। আসামে বর্মী আক্রমণকে কেন্দ্র করে ডামাডোল ও অরাজকতার সময় খামতিরা আহোম রাজার অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য

করে স্থানীয় অসমিয়া মানুষকে প্রায় দাসের পর্যায়ে পরিণত করেছিল। লেফট্যানেন্ট চার্লটন সাদিয়া ও সাইখোয়া থেকে 'পাইক'-কেন্দ্রিক ঐ ব্যবস্থা বাতিল করার পর খামতি সর্দাররা প্রচণ্ড উত্তেজিত ছিলেন। এতদিন সাদিয়া অঞ্চলের পতিত জমির অধিকার এইসব সর্দাররাই ভোগ করতেন। ১৮৩৮ সালের পতিত-জমি আইনের বলে (জমির মালিকানা ও বণ্টনের অধিকার সরকারের) সাহেবরা বিনা মূল্যে ঐসব জমি অধিকার করে বড়ো বড়ো চা-বাগানের মালিক হয়ে ঘোরাফেরা শুরু করলে খামতিরা নিজভূমে প্রায় পরদেশি পর্যায়ে নেমে এল। এইরকম একটা পর্যায়ে Assam Light Infantry-র সদর দপ্তর ১৮৩৮ সালে ১৭ অক্টোবর সাদিয়ায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে বারুদের স্তূপে যেন অগ্নিসংযোগ হল। খামতিদের সন্দেহ হল, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে কোম্পানি তাদের চিরতরে পদানত বা উৎখাত করতে চায়।

১৮৩৯ সালের ২৮ জানুয়ারি কোম্পানির Infantry বাহিনীর মাত্র কিছু সেনা সাদিয়ায় অবতরণের সাথে সাথে প্রায় ৬০০ খামতি তাদের চিরাচরিত তির-ধনুক, দা ইত্যাদি নিয়ে কোম্পানির বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়ে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ শুরু করল এবং সেনা-ছাউনি পুড়িয়ে দিল। খামতিদের এই আক্রমণে Major White সহ কোম্পানির অনেকেরই মৃত্যু হল। আসামের কমিশনার ফ্রান্সিস জেন্‌কিনস্ এর ভাষায়, ব্রিটিশ-বিরোধী খামতিদের এই আক্রমণ ছিল "the boldest attempt yet made in the eastern frontier"। কোম্পানির অবশ্য সন্দেহ ছিল, খামতি বিদ্রোহের পিছনে মটক, সিংফো এবং এমনকি বর্মীদেরও মদত ছিল। খামতিদের এই আক্রমণের পাল্টা হিসেবে কিছুদিনের মধ্যেই লেফট্যানেন্ট Marshall-এর নেতৃত্বে কোম্পানির এক বড়ো বাহিনী সাদিয়ার মাটিতে অবতীর্ণ হয় এবং বিদ্রোহী নেতা Ranua Gohain-সহ শতাধিক বিদ্রোহীকে খুন করে সাদিয়ার মাটিকে রক্তে লাল করে দেয়। ক্যাপ্টেন Hannay খামতিদের ঘর-বাড়ি, শস্য-ভাণ্ডার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেককে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। সমকালীন অন্যান্য উপজাতি বিদ্রোহের মতো খামতি বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল ঠিক, কিন্তু এটি যদি সফল হত তাহলে আপার-আসাম থেকে কোম্পানিকে চিরতরে পাততাড়ি গুটোতে হত। এই মন্তব্যটি কোনো ভারতীয়র নয়, গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল সদস্য W. W. Bird-এর ভাষায় ঃ "There is little doubt that had the attack been successful, Upper Assam would have been in the utmost danger of being lost".

১৪.৩.৬ মটক রাজ্য দখল (Annexation of Muttock Kingdom

১৪.৩.৬.১ মটকের সাথে মৈত্রী চুক্তি

প্রথম খণ্ডের নবম অধ্যায়ে (৯.১) 'মটক', 'মোরান', 'মোয়ামারিয়া ইত্যাদি শব্দের ব্যঞ্জনা ও অর্থ আলোচনা করা হয়েছে। ১৭৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মটকের অধিপতি দীর্ঘদিন স্বাধিকারের অধিকারী ছিলেন। আহোম-রাজা সুকলিংফা বা কমলেশ্বর সিংহ-র রাজত্বকালে (১৭৯৫-১৮১১) সম্পাদিত একটি চুক্তি (১৮০৫) অনুযায়ী ব্রহ্মপুত্র থেকে বুড়িদিহিং পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ এলাকা মটক রাজ্যের অধিপতি সর্বানন্দকে অর্পণ করে আহোমরা তাঁকে 'বড়সেনাপতি' পদে বরণ করে নিয়েছিলেন। যেহেতু মোয়ামারিয়া বিদ্রোহের কেন্দ্রভূমি ছিল এই স্থানটি, এরই জন্য এটি 'মোয়ামারিয়াদের দেশ' হিসেবে পরিচিত, যেখানে মোরান বা মারন সহ বিভিন্ন উপজাতি এবং অ-উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ একসাথে বসবাস করত। পেম্বারটন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রায় ১৮,০০০ বর্গ মাইলের এই এলাকার রাজধানী ছিল বেঙ্গমারা এবং মোট জনসংখ্যা প্রায় বাইশ হাজারের মতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ প্রথমদিকে আহোমদের মতো মটক রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি। ১৮২৬ সালে ডেভিড স্কটের সাথে একটি মৈত্রী চুক্তির শর্ত বলে যুদ্ধের সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রয়োজন হলে ৩০০ পাইক সরবরাহ করতে মটক অধিপতি অঙ্গীকার করেন। যেহেতু মটক রাজ্যে নগদ অর্থে করদান পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না, এজন্য ডেভিড স্কটও কোম্পানির কাছে রাজস্ব-প্রদানের দাবি উত্থাপন করেননি। এক কথায়, আহোম শাসনের মতো কোম্পানির জামানাতেও মটক রাজ্যকে কেন্দ্র করে প্রথমদিকে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয়নি।

১৪.৩.৬.২ সিংফো পরিচয়

কিন্তু ক্রমশ মটকের আনুগত্যের প্রশ্নে কোম্পানির কর্মকর্তাদের সন্দেহ ঘনীভূত হতে শুরু করে। বড়সেনাপতির এক পুত্রের সাথে সীমান্তের সিংফো সর্দারদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এর আগে সাদিয়াখোয়া গোঁহাই-এর সাথে সিংফোদের সম্পর্ক উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে, সিংফোদের কিছুটা পরিচয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। থেরাবাদী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সিংফোরা অষ্টাদশ শতকে আসামে অনুপ্রবেশ করে বলে ধারণা করা হয়। যেহেতু সিংফোদের বিভিন্ন শাখা মায়ানমার, চিন

ইত্যাদি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এজন্য সিংফোদের পরিচয় কিছুটা আন্তর্জাতিক বলা যায়। বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশের লোহিত ও চ্যাংলাঙ্গ জেলায়, মায়ানমারের কাচিন রাজ্যে এবং আসামের তিনসুকিয়া জেলায় অধিক সংখ্যায় এদের বসবাস। চিনের 'জিংপো'-দের সাথে সিংফোদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আজও বর্তমান এবং উভয়ের ভাষার মধ্যেও যথেষ্ট মিল আছে। মোটামুটি চারভাগে সিংফোদের ভাগ করা যায় ঃ (১) Shangai, (২) Myung, (৩) Lubrung এবং (৪) Mirip এবং এদের দলপতিকে বলা হয় Gam ('গাম')। যেসব অঞ্চলের 'গাম'-এর সাথে কোম্পানির লোকজনের যোগযোগ ছিল তার মধ্যে Bessa, Duffa, Luttora, Tesari, Lophae, Lutong, Magrong ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। চায়ের জন্ম কাহিনির সাথে সিংফোদের নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। Bessa-র 'গাম'-এর সাথে আসামের কমিশনার ফ্রান্সিস জেন্‌কিনস্-এর বৈরী সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কিছু কাহিনি আছে, কারণ সিংফোরা ব্রিটিশ প্রভুত্ব সহজে মেনে নিতে পারেনি। ফলে, সিংফো বিদ্রোহ অনিবার্য ছিল। কোম্পানির কর্মকর্তারা সন্দেহ করতেন, মটকের বড়সেনাপতির এক পুত্র সিংফো-গামদের নানাভাবে উত্তেজিত করছিলেন।

১৪.৩.৬.৩ স্কটের পর মটক-কোম্পানি সম্পর্ক

ডেভিড স্কটের পর কোম্পানির সাথে মটকের সম্পর্কের অবনতি ধীরে শুরু হয়। আসলে, মটক রাজ্যটি শুধু আহোম রাজাদেরই নয়, বর্মী আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকা এবং কোম্পানির শ্যেন দৃষ্টির বাইরে থাকার ফলে মটকের বড়সেনাপতির স্বাধীনতা স্পৃহা অন্যদের তুলনায় একটু বেশিই ছিল। মটক রাজ্যে করব্যবস্থা প্রায় অনুপস্থিত থাকার ফলে আহোম ও ব্রিটিশ শাসিত আসামের অন্যান্য অঞ্চল থেকে দলে দলে দুর্গত মানুষ বড়সেনাপতির রাজ্যে আশ্রয় পেত। প্রজাহিতৈষী হিসেবে বড়সেনাপতি অনেকের প্রশংসাও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু একইসাথে এটি আবার কোম্পানির কাছে উদ্বেগেরও কারণ ছিল। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে কোম্পানির দৃষ্টিভঙ্গিও যে পরিবর্তিত হতে পারে, সহজ-সরল বড়সেনাপতি এটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। জয়ন্তিয়া রাজ্যের মতো মটকের কাছ থেকেও ১৮৩৫ সালে কোম্পানির কমিশনার জেন্‌কিনস্ বাৎসরিক ১০,০০০ টাকা নগদ রাজস্ব দাবি করলেন। এর উত্তরে সর্বানন্দ বা বড়সেনাপতি জানালেন, যেহেতু তিনি নিজে প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করেন না, সুতরাং তাঁর পক্ষে নগদ অর্থে কর দেওয়া কষ্টকর, তবে আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে তিনি নগদে বাৎসরিক ১,৮০০ টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি। আসলে, কোম্পানির কাছে ঐ নগদ

অর্থের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল মটক রাজ্যের অতি উর্বর মাটি। ১৮৩৩ সালে চার্টার অ্যাক্ট চালু হওয়ার পর ব্রিটিশ সাহেবরা ভারতে ভূসম্পত্তির মালিকানা হওয়ার সুযোগ পায়। এছাড়া পতিত জমি অধিকার করে চা-বাগানের মালিক হওয়ার স্বপ্ন কোম্পানির সাথে জড়িত অনেকেরই ছিল। সাধারণ প্রজাদের মধ্যে সর্বানন্দ বা বড়সেনাপতির জনপ্রিয়তা লক্ষ করে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয় বলে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ মনে করলেন।

১৪.৩.৬.৪ প্রস্তাবিত নতুন সন্ধি

বড়সেনাপতির চারটি পুত্র সন্তান ছিল এবং প্রত্যেকেই রাজ্যের নির্দিষ্ট অংশে, পিতার নির্দেশ মতো, কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন। এঁরা হলেন (১) বড়গোঁহাই, (২) মাজু গোঁহাই, (৩) খুদ গোঁহাই ও (৪) ক্যাপ্টেন গোঁহাই। জেন্‌কিনস্-এর ধারণা ছিল, সর্বানন্দর মৃত্যুর পর বড়সেনাপতির পদ নিয়ে চার ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য এবং সেই মুহূর্তটিই হবে কোম্পানির পক্ষে মটক রাজ্যের অভ্যন্তরীণ প্রশ্নে হস্তক্ষেপের প্রকৃষ্ট সময়। ১৮৩৮ সালে মৃত্যুপথযাত্রী সর্বানন্দ তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মধ্যম পুত্র ভগীরথ মাজু গোঁহাই-কে মটকের পরবর্তী বড়সেনাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং কয়েক মাস পরে ১৮৩৯ সালের ২ জানুয়ারিতে তাঁর মৃত্যু হয়। মাজু গোঁহাই এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বড়গোঁহাই-সহ অন্যান্যরা এটি মেনে নিলে ফ্রান্সিস জেন্‌কিনস্ (১৮৩৪-৬১) রীতিমত হতাশ হন। যাইহোক, পলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর Adam White মটকের দরবারে এসে আশ্বাস দিলেন, কোম্পানি মাজু গোঁহাই-কে বড়সেনাপতি হিসেবে স্বীকৃতি দেবে একটি নতুন চুক্তির ভিত্তিতে (১৮০৫-এ ডেভিড স্কটের চুক্তি বাতিল করে) যার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শর্ত হল ঃ (১) কোম্পানিকে বড়সেনাপতি বাৎসরিক ১০,০০০ টাকা রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকবেন, (২) মটক রাজ্যের পতিত জমি কোম্পানির লোকজনের চা-চাষের জন্য বরাদ্দ থাকবে, এবং (৩) একজন ব্রিটিশ অফিসার মটক রাজ্যে নিয়োগ করা হবে যিনি সবকিছু তদারকি করবেন এবং মটক ও কোম্পানির মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসা করবেন। মজা হচ্ছে, মাজু গোঁহাই-সহ অন্যান্যরা শুধু প্রথম শর্তটিরই তীব্র বিরোধিতা করলেন এবং বাকি দুটি শর্ত মেনে নিলেন। আসলে শেষ দুটি শর্তের প্রকৃত অর্থ হয়তো মাজু গোঁহাই সঠিকভাবে সেইসময় উপলব্ধি করতে পারেননি। যাইহোক, যেহেতু সেই মুহূর্তে আবার নতুন করে বর্মী আক্রমণ সহ সিংফো বিদ্রোহের প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল, এরই জন্য বড়সেনাপতিকে না চটিয়ে এবং সীমান্তে অশান্তি তৈরি না করে, নতুন চুক্তির

ব্যাপারটি অমীমাংসিত রেখেই কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতো মেজর হোয়াইট মটক রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন।

১৪.৩.৬.৫ মোরান-মটক দ্বন্দ্ব

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই ১৮৩৯ সালের ২৮ জানুয়ারি খামতি বিদ্রোহীদের হাতে মেজর হোয়াইট নিহত হবার পর থেকে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। পরবর্তী পলিটিক্যাল এজেন্ট Hamilton Vetch লক্ষ করেন, মোয়ামারিয়াদের নিজেদের মধ্যে বিভাজন দিনদিনই স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং মোরান/মারন ও মটক—এই দুটি ভাগে বিভক্ত মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব দিনদিনই তীব্র হচ্ছে। রাজ্যের উপরিভাগে বেশিরভাগ মানুষ মোরান সম্প্রদায়ের যারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত টিফুক গোঁসাই-এর আদর্শে প্রভাবিত। রাজ্যের নীচের দিকে অ-মোরান জনগোষ্ঠীই বেশি যারা মোয়ামারিয়া গুরু ভক্তনন্দ'র আদর্শে প্রভাবিত এবং মাজু গোঁহাই এই দ্বিতীয় পক্ষের নেতৃত্ব দেন। মোরান-মটক প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব অতীতেও ছিল, কিন্তু মাজু গোঁহাই ক্ষমতা দখলের পর এটি তীব্র হতে শুরু করে। এতদিন মোরান ও মটক সমার্থক বলেই মনে হত, কিন্তু একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই বিবাদ পলিটিক্যাল এজেন্ট (Vetch) এবং কমিশনার (Jenkins)-এর কাছে নতুন সুযোগ এবং নতুন অস্ত্র এনে দেয়। আসলে, মোরানদের স্বতন্ত্র অতীত ও অস্তিত্ব নিয়ে নানারকম ব্যাখ্যা আছে। লোককথায়, মৃত্যুপথযাত্রী জনৈক ব্যক্তিকে এক বৃদ্ধা মন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে অনিবার্য মরণের হাত থেকে উদ্ধার করার পর ঐ বৃদ্ধার সন্তানরাই মারন/মোরান নামে পরিচিত হয়। কেদার ব্রহ্মচারীর মতে, নেপালের সৌমার অঞ্চল থেকে আসামে আগত Maurang/Muurang-রাই পরবর্তী সময়ে মোরান নামে পরিচিত। বেণুধর শর্মা মনে করেন, Meram ক্ল্যানের জনৈক নৃপতির নাম অনুসারে, 'মোরান' শব্দটি এসেছে। Endle-এর ভাষ্য অনুযায়ী, মোরানদের জন্মভূমি ছিল Hukong Valley-তে এবং সেখান থেকে আসামে প্রবেশ করে Tiphuk নদীর ধারে তারা বসবাস শুরু করে। J. P. Wade মনে করেন, আহোম রাজাদের বিরোধিতা করে মৃত্যুবরণকে কেন্দ্র করেই 'মোরান' শব্দটির জন্ম হয়েছে। জন্ম-কাহিনি যাইহোক, মোরান-মটক তিক্ততা এমন পর্যায়ে যায় যখন মোরানরা মাজু গোঁহাই-এর শাসনাধীনে থাকার চেয়ে ব্রিটিশ অধীনে থাকাও শ্রেয় মনে করতে শুরু করেন। Vetch সাহেব মটক রাজ্যকে দুভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দেন। মাজু গোঁহাই ও তাঁর ভাইরা শুধু যে ঐ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন তাই নয়, আগের প্রস্তাবিত তিনটি শর্তও মানতে অস্বীকার করেন।

১৪.৩.৬.৬ মটক অধিকৃত

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে কোম্পানির কর্মকর্তাদের নির্দেশমতো Vetch ১৯৩৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর এক ঘোষণা বলে সমগ্র মটক রাজ্যটি কোম্পানির অঙ্গীভূত করেন। মাজু গোঁহাই সহ তাঁর ভাইদের ভরণ-পোষণ ইত্যাদির দায়িত্বও কোম্পানি গ্রহণ করে এবং সাথে সাথে যাতে তাঁরা সিংফো, খামতি প্রভৃতি বিদ্রোহী শক্তির সাথে হাত মেলাতে না পারেন, তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৮৪২ সালে সাদিয়া সহ সমগ্র মটক রাজ্য ব্রিটিশ অধিকৃত লখিমপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এক সময় আহোম-বিরোধী মোয়ামারিয়া বিদ্রোহকে (প্রথম খণ্ডের নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কেন্দ্র করেই বড়সেনাপতির নেতৃত্বাধীন মটক রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটেছিল, কোম্পানির আমলে আরও অনেক রাজ্যের মতো, মটকের স্বাধীন অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। মটক অধিগ্রহণের সাথে সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রসারণ নীতিরও যবনিকা টানা হয়। কোম্পানির আমলে অধিকৃত সমগ্র অঞ্চল সেইসময় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিরই অঙ্গ ছিল। ১৮৭৪ সালে আসাম চিফ্-কমিশনার শাসিত স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর উপরের অধিকৃত সকল অঞ্চল আসামের অংশ হিসেবে গৃহীত হয়। এইভাবে আহোম যুগের আসামের তুলনায় ব্রিটিশ শাসিত আসামের আয়তন বৃদ্ধি পায়।

১৪.৩.৬.৭ উপসংহার

শুধু কোম্পানির আমলে অধিকৃত অঞ্চলই নয়, কোম্পানি বিদায় নেওয়ার পর, অর্থাৎ ১৮৫৮ সাল থেকে, আরও কিছু অঞ্চল আসামের সাথে যুক্ত হয়, যেমন ১৮৬৬ সালে আঙ্গামী রাজ্য দখল, ১৮৭২-৭৩ সালে গারো রাজ্য, ১৮৯০-এর দশকে লুসাই-পাহাড়, একটার পর একটা অভিযানের পর ১৯০৪ সালে নাগা পাহাড়ের পূর্বাংশ ইত্যাদি। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করার সময় যে আসাম ভারতের অঙ্গ রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হয় তার মধ্যে ছিল বর্তমান অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও মেঘালয়। অর্থাৎ ১৯১২ সালের পর থেকে আসামের আয়তন ছিল বিশাল। অতীতে কোনো সময়েই এই সমগ্র অঞ্চল একক শাসনাধীনে ছিল না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হওয়ার ফলেই সেটি সম্ভবপর হয়েছিল। ১৮২০-র দশকে আসাম থেকে বর্মী সেনাদের উৎখাত করার সংকল্প নিয়েই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এসেছিল, যদিও ব্যবসা-বাণিজ্য এর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৮২৮ সালে নিম্ন-আসামে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর নিম্ন-আসামকে রক্ষা করার স্বার্থে এবং আহোম-শাসনের পুরোপুরি যবনিকা

টানতে উর্ধ্ব-আসাম জয় কোম্পানির কাছে জরুরি হয়ে পড়ল। এরপর পাহাড়ি উপজাতিদের উপদ্রব থেকে নিম্ন ও উর্ধ্ব আসামকে মুক্ত রাখা ও তথাকথিত 'আইন-শৃঙ্খলা' প্রতিষ্ঠার স্বার্থে (কোম্পানির সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী "to protect Assam from the tribal outrages and depredations and to maintain law and order in the sub-mountainous region") আশপাশের ছোটোখাটো রাজ্য ও পাহাড় দখল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে অনিবার্য ছিল। সমকালীন ব্রিটিশ সমরনায়কদের কাছে, বিশেষত লর্ড মিন্টো এবং লর্ড কার্জনের মতো শাসকদের কাছে, "...the defence of the British Empire in the northeastern frontier was no less important than the northwest frontier". কিন্তু কেন? আসলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য ছিল আসামকে কেন্দ্র করে মায়ানমার হয়ে চিনের দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের তথা সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করা। এই সুপ্ত ইচ্ছা সরকারিভাবে প্রথমদিকে ঘোষিত না হলেও ১৮২৬ সালে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের জনৈক সদস্যের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় ঃ

> ***We may expect to open new roads for commerce with Yunan and other southwestern provinces of the Celestial empire through Assam and Manipore.***

সীমানা প্রসারণের সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের কাজের বৈধতা প্রমাণের জন্য নানারকম যুক্তি উপস্থিত করলেও এটি দিবালোকের মতো স্বচ্ছ যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষাই ছিল আসল উদ্দেশ্য, দেশীয় অধিপতিদের অকাট্য কোনো যুক্তিই শেষপর্যন্ত ধোপে টেকেনি। ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে একটি প্রবাদ চালু ছিল ঃ "All causes that were not the cause of Rome were destined to be lost". উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে এই একই প্রবাদ সমভাবে প্রযোজ্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মহাবিদ্রোহ ও অন্যান্য কৃষক অভ্যুত্থান
The Great Revolt and Other Uprisings

১৫.১ আসামে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ও অন্যান্য অভ্যুত্থান (The Great Revolt of 1857 and Other Uprisings in Assam)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আসামে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্বে বিভিন্ন বিদ্রোহের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহকে এতদিন মূলত উত্তর ও মধ্য ভারতীয় ঘটনা হিসেবেই চিত্রিত করা হত। গাঙ্গেয় উপত্যকাকেই উত্তেজনার প্রাণকেন্দ্র মনে করা হত এবং ব্রহ্মপুত্র বা বরাক উপত্যকাকে নিস্তরঙ্গ বা 'Stagnant backwater' বলা হত। উত্তর-পূর্ব ভারতে, বিশেষত আসামে, ১৮৫৭-তে ব্রিটিশ শক্তি যে কত আতঙ্কে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছিল, সেই সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা এতদিন হয়নি। মহাবিদ্রোহের ১৫০ বছর (২০০৭) পূর্তি উপলক্ষ্যে কিছু আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক, তবু আজও অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (সমকালীন ব্রিটিশ শাসকদের ব্যক্তিগত ডায়েরি, চিঠি-পত্র, অসমিয়া লোক-সাহিত্য, খাসি-জয়ন্তিয়া প্রভৃতি উপজাতিদের লোককথা, প্রতিবেশী চট্টগ্রাম, সিলেট ও ঢাকার বিদ্রোহ-সংক্রান্ত নানা তথ্য, পুলিশের দলিল ইত্যাদি) হয় মহাফেজখানার ধুলায় বন্দি অথবা যথাযথভাবে চর্চার অভাবে উপেক্ষিত হয়ে আছে। সম্ভবত এরই জন্য 'আসামে মহাবিদ্রোহ' সংক্রান্ত কোনো অধ্যায় ভারত-ইতিহাসে স্থান পায়নি। অথচ ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহের অগ্নিশিখা অন্যান্য অঞ্চলের মতো আসামকেও সেই সময় আলোড়িত করেছিল। ১৯৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের শতবর্ষে অসমিয়া ঐতিহাসিক বেণুধর শর্মা এবং পরবর্তী সময়ে H. K. Barpujari (১৭.৭৬ দ্রষ্টব্য) *Assam in the Days of the Company* গ্রন্থে কিছুটা আলোকপাত করলেও সামগ্রিক মূল্যায়ন এখনো অসম্পূর্ণ আছে।

১৫.১.১ বিদ্রোহের চরিত্রায়ণ প্রসঙ্গ

এতদিন ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ পাঠ্য পুস্তকে 'সিপাহি বিদ্রোহ' হিসেবেই পরিচিত ছিল। কারও চোখে এটি ছিল 'ভারতীয়দের বিদ্রোহ' ('ইন্ডিয়ান মিউটিনি'), কেউ বা এটিকে 'ভারতীয় সামন্তপ্রভুদের শেষ যুদ্ধ' বা 'শেষ আর্তনাদ' অথবা 'কৃষকদের বিদ্রোহ', 'ইসলামিক ষড়যন্ত্র' ও 'ধর্মযুদ্ধ' ইতাদি নানা নামে চিত্রিত করলেও এটি

যে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' সেটি প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে যেতে হয়েছে। বিদ্রোহের চরিত্র যাইহোক, এটি যে ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থান এবং শুধুমাত্র সিপাহিদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না এবং বিভিন্ন স্থানে অনেক সাধারণ মানুষ (যদিও সকল অংশের মানুষ নয়) বিদ্রোহের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ডালহাউসির স্বত্ববিলোপ নীতি চালু হওয়ার ফলে দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ভয় ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ অনেকেরই উত্তরাধিকারী হিসেবে পুত্র-সন্তান ছিল না। এইসব রাজ্যহারা দেশীয় রাজন্যবর্গ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। উত্তর-পূর্ব ভারতে স্বত্ববিলোপ নীতি ঘোষিত হওয়ার আগেই নানা অজুহাতে প্রকৃতপক্ষে চালু হয়ে গিয়েছিল—যেমন, ব্রিটিশ কর্তৃক গোবিন্দচন্দ্রের কাছাড় দখল (১৪.৩.২.১ দ্রষ্টব্য), রাম সিং-এর জয়ন্তিয়া রাজ্য দখল (১৪.৩.৪) ইত্যাদি। দুর্বল আহোম রাজারা প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের পর কার্যত ব্রিটিশ-শক্তির আশ্রিত হয়েই দিন কাটাতেন। চন্দ্রকান্ত সিংহকে কোম্পানি মাসিক 'পেনশন্' দিয়ে কালিয়াবরে স্থানান্তরিত করেছিল এবং সেখানেই ১৮৩৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। পুরন্দর সিংহ'কে পাঁচ বছরের জন্য (১৮৩৩-৩৮) আহোম সিংহাসনে বসিয়েও মাসিক 'পেনশন্' দিয়ে আবার পদচ্যুত করা হয় এবং ১৮৫৬ সালের অক্টোবরে তাঁরও মৃত্যু হয়। পুরন্দর সিংহর নাবালক নাতি কন্দর্পেশ্বর সিংহকে আহোম সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরই নিযুক্ত 'দেওয়ান' মণিরাম বরুয়া (১৮০৬-৫৮) ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন। এক কথায়, বিদায়ী শাসকদের মধ্যে আসামে বা পার্শ্ববর্তী রাজ্যে সমকালীন উত্তর ভারতের বীর নেতা—যেমন, নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপি, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, বেগম হজরৎ মহল, কানোয়ার সিং, মৌলবি আহমাদুল্লাহ, বখত খান প্রভৃতি অনুপস্থিত থাকলেও সকলের ভিতর নানা কারণে একটা ব্রিটিশ-বিরোধী মানসিকতা কিন্তু সক্রিয় ছিল। এতদিন উপযুক্ত সময়ের অভাবে সেটি তেমনভাবে বিস্ফোরিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। ১৮৫৭-র ঘটনাবলী সেই সুযোগটি এনে দিল। কিছু বিস্ফোরণ যে আগে হয়নি তা নয়, ছোটো-বড়ো অনেক ঘটনাই ১৮৫৭-র আগে ঘটেছে (খাসি পাহাড়ে তিরোট সিং-এর সংগ্রাম [১৪.৩.৫.২ দ্রষ্টব্য] ইত্যাদি)—কিন্তু সেগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা, ১৮৫৭-র মত সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে কোম্পানির সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে সেগুলি ঘটেনি। এখানেই প্রাক-১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের সাথে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পার্থক্য। জোড়হাট, ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি কিংবা গোলাঘাটে কোম্পানির যেসব হিন্দুস্তানি সিপাই ছিল তাদের সাথে আসামের

ক্ষমতাচ্যুত অভিজাতদের যোগসূত্র তৈরিতে মণিরাম দেওয়ানই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১৫.১.২ 'বেঙ্গল আর্মি'র ভূমিকা

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ মূলত 'বেঙ্গল আর্মি/রেজিমেন্ট' (যাদের 'পূর্বিয়া সিপাই' বলা হত)—এরই বিদ্রোহ, অন্যদের নয়। 'মাদ্রাজ আর্মি' 'বোম্বে আর্মি' অথবা শিখ, গোর্খা বা পাঠান রেজিমেন্ট ঐ বিদ্রোহে অংশ নেয়নি ; বরং তাদের দিয়ে বিদ্রোহকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল। অবশ্য সেই সময় 'বেঙ্গল আর্মি'ই ছিল সবচেয়ে বড়ো, যার মধ্যে ১,৪০,০০০ ভারতীয় এবং মাত্র ২৬,০০০ ছিল ব্রিটিশ অফিসার। 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'তে শুধু যে অবিভক্ত বঙ্গ বা আসাম সহ উত্তর-পূর্বাংশ ছিল তাই নয়, সমগ্র হিন্দি বলয়ও এর অঙ্গীভূত ছিল। এই 'বেঙ্গল আর্মি-তে ১০টি অশ্বারোহী রেজিমেন্ট এবং ৭৪টি 'infantry' বা পদাতিক বাহিনী ছিল ; 1st Assam Light Infantry (1844-61) ছিল এই ৭৪টির মধ্যে একটি এবং এরাই আসামে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিল। ১৯০৩ সালে অবশ্য তিনটি প্রেসিডেন্সির (বেঙ্গল, বোম্বে, মাদ্রাজ) সৈনিক ও বিভিন্ন রেজিমেন্ট একত্র করে British Indian Army গঠিত হয়েছিল। 1st Assam Light Infantry-র সিপাইদের সাথে কন্দর্পেশ্বর সিংহ (চারিং রাজা)-র প্রতিনিধিদের মধ্যে বিদ্রোহের নীল-নক্‌শা সংক্রান্ত গোপন শলা-পরামর্শের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে কোম্পানির অনুগতদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৫৭-র ২৯ মার্চ কলকাতার সন্নিকটে ব্যারাকপুরের সেনা ছাউনিতে মঙ্গল পাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছিল। এরপর একে একে আগ্রা, এলাহাবাদ, আম্বালা, মিরাট, দিল্লি, রোহিলখণ্ড, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, কানপুর, বেরিলি, লক্ষ্মৌ, ঝাঁসি, ইন্দোর, জৌনপুর, জগদীশপুর (আরা জেলা) ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের ১১ মে মীরাট থেকে 'দিল্লি চলো' আওয়াজ তুলে বিদ্রোহীরা সমগ্র ভারতের আকাশ মুখরিত করেছিলেন। ১৮৫৭-র নভেম্বর পর্যন্ত নানা উত্থান-পতন ও ঘটনার মধ্য দিয়ে এটি স্থায়ী হয়।

১৫.১.৩ সিপাহি উত্তেজনার কারণ

সাধারণত পাঠ্য-পুস্তকে ১৮৫৩ সালে প্রবর্তিত এন্‌ফিল্ড রাইফেলে গরু ও শুকরের চর্বি মিশ্রিত কার্তুজের কাহিনি এতদিন বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। আসলে, শুধু এন্‌ফিল্ড রাইফেলই নয়, নানাভাবে ভারতের মানুষের চিরাচরিত ধর্ম-বিশ্বাসে (হিন্দু ও মুসলমান) কোম্পানি আঘাত হানার ফলে দিনদিনই উত্তেজনা জমা

হচ্ছিল। সিপাইদের মধ্যে এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছিল যে, কোম্পানির মদতে খ্রিস্টান মিশনারিদের একাংশ ভারতীয়দের (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার-আচরণ, রীতি-নীতিকে ঘৃণা করে এবং জোরজবরদস্তি করে সকলকে খ্রিস্টান ধর্মের আঙ্গিনায় আনাই শাসকদের একমাত্র লক্ষ্য। হার্বাট এডওয়ার্ডস, কর্নেল এস. জি. হুইলার প্রভৃতি ইংরেজ সেনানায়কদের বিরুদ্ধেও সিপাইদের একই অভিযোগ ছিল। যেভাবে, প্রধানত 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট' বা পূর্বিয়া সিপাইদের 'কালাপানি' অতিক্রম করে (চিরাচরিত বিশ্বাস অনুযায়ী, হিন্দু সিপাইদের মনে জাতিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ছিল) পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে ক্লান্তিহীন যুদ্ধ করতে হত তাতে উত্তেজনা দিনদিনই জমছিল। এই সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আফগান যুদ্ধ (১৮৩৮-৪২), পাঞ্জাব যুদ্ধ (১৮৪৫-৪৬, ১৮৪৮-৪৯), ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (১৮২৪-২৬, ১৮৫২), চিনের বিরুদ্ধে তথাকথিত আফিম যুদ্ধ (১৮৪০-৪২, ১৮৫৬-৬০), রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪) ইত্যাদি করেছিল ; অথচ কোম্পানির সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের পদোন্নতির কোনো সুযোগ ছিল না। 'বেঙ্গল আর্মি'-র সৈনিকরা মাদ্রাজ বা বোম্বে 'আর্মি'-র সৈনিকদের তুলনায় কম বেতন পেতেন এবং 'পেন্সন'-এর ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তা ছিল। ঊর্ধ্বতন ইংরেজ অফিসারদের হাতে প্রতিমুহূর্তে লাঞ্ছনা, অপমান তাদের সহ্য করতে হত। এছাড়া উত্তর ভারতের যেসব অঞ্চল থেকে 'বেঙ্গল আর্মি'-তে নিয়োগ করা হত সেইসব অঞ্চলে "মহলওয়ারি" ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। কোম্পানির আমলে ভারতের বিভিন্নস্থানে যত ধরনের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা চালু ছিল তার মূল কথা হল ঃ ফসল হোক বা নাই হোক, নগদ অর্থে নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব প্রদান বাধ্যতামূলক। "মহলওয়ারি" ব্যবস্থায় কোম্পানির কর্মকর্তারা ঊনবিংশ শতকের প্রথম চারদশকে সত্তর শতাংশ খাজনা বৃদ্ধি করেছিলেন। Richard Collier তাঁর *The Great Indian Mutiny*-তে উল্লেখ করেছেন, জমির খাজনা বৃদ্ধি ছাড়াও কুড়ি মাইল পথ যেতে গেলেও গ্রামের মানুষ ('সেতু কর' সহ) বিভিন্ন ধরনের কর না দিয়ে যেতে পারত না, সেটি খেয়া পারপারের জন্যই হোক বা অন্য নামে হোক। সর্বত্রই ছিল কোম্পানির এজেন্ট। কোম্পানির শাসনে দুর্ভিক্ষ, মহামারি ইত্যাদি ছিল মানুষের নিত্যসঙ্গী। এইসব সময়ে কোম্পানির উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে একটার পর একটা কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছে ; অথচ কোম্পানির টনক নড়েনি। সিপাইরা ছিলেন মূলত কৃষকেরই সন্তান ; সুতরাং তাদের মনে উত্তেজনা জমা খুবই স্বাভাবিক। William Dalrymple তাঁর *The Last Mughal : The Fall*

of a Dynasty গ্রন্থে মহাবিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লুঠপাট ও অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে বরং মুঘল শাসকদের প্রশংসা করেছেন। ইংরেজরা যেমন ভারতের চিরাচরিত কুটিরশিল্প, সেচব্যবস্থা, কৃষি ইত্যাদি ধ্বংস করে চিরদিন বিদেশি হয়েই ভারত শাসন করেছে, মুঘলদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটি প্রযোজ্য নয়। এরই জন্য মহাবিদ্রোহের নায়করা ৮২ বছরের বৃদ্ধ সুফি কবি তথা শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে সামনে রেখেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মাধ্যমে স্বৈরাচারী কোম্পানির অপশাসনের যবনিকা চেয়েছিলেন। মহাবিদ্রোহের এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটেই আসামের ঘটনাবলী বিচার করতে হবে।

১৫.১.৪ আসামের অভিজাত শ্রেণির উত্তেজনা

আহোম রাজতন্ত্রের অবসান এবং কোম্পানির শাসন প্রবর্তনের পর আসামে অভিজাতদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কত শোচনীয় অবস্থায় এসেছিল সেটি আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ করেছি। পাইক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং বিভিন্ন অধিকার ভোগে অভ্যস্ত অভিজাত শ্রেণি কোম্পানির কর্তৃত্ব, দাস ব্যবস্থার অবলুপ্তি, জমির মালিকানা প্রশ্ন ইত্যাদি নানা কারণে অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত ছিলেন এবং কোম্পানি-শাসনে যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল সেটি অভিজাত শ্রেণি মেনে নিতে পারেনি। মণিরাম দেওয়ান ছিলেন এই অভিজাতদেরই প্রতিনিধি। আহোম রাজা পুরন্দর সিংহ তাঁকে যেসব মৌজার অধিকার দিয়েছিলেন, সেগুলিও কোম্পানি তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুগত হিসেবেই জীবনযাত্রা শুরু করলেও, প্রতি মুহূর্তে কোম্পানি তাঁকে অপদস্থ করেছে এবং দেশীয় মালিক হিসেবে প্রথম চা-বাগান করতে গিয়ে তিনি অসংখ্য বাধার মুখোমুখি হয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে (১২.৩) মণিরাম দেওয়ানের কাহিনি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাফেজখানা থেকে সম্প্রতি প্রাপ্ত দলিলের সূত্রে দেখা যায়, কীভাবে মণিরাম নিজে জোড়হাট, গুয়াহাটি, ডিব্রুগড় ও গোলাঘাট-এ অবস্থিত 1st Assam Light Infantry (ALI)-র সিপাইদের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করে তাদের মনে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বালানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই সময় আকাশে বাতাসে রটে গিয়েছিল, কোম্পানির শাসনের শতবর্ষ পূর্তিতে (১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধের প্রেক্ষিতে) কোম্পানির পতন অনিবার্য। এই বিশ্বাসে বুক বেঁধে অভিজাতদের প্রতিনিধি মণিরাম কোম্পানির সৈনিকদের উত্তেজিত করায় আসামে কোম্পানির অনুগতরা প্রমাদ গুণতে শুরু করেছিলেন।

১৮৫৭-র জুলাই-আগস্টের Judicial Proceedings-এর রিপোর্টে তাই দেখা যায় ঃ *.....there is much reason to fear the extension of the revolt in Assam.....many of the men of the 1st Assam Light Infantry are from the Arrah district and closely related to the mutineers of the 40th Native Infantry*, শুধুমাত্র বিহারের আরা জেলা থেকেই আসাম বাহিনীর সিপাহিরা এসেছিলেন তাই নয়, বিদ্রোহী নেতা কানোয়ার সিং-এর অঞ্চল থেকেও অনেকে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাদের সকলের মধ্যে, উক্ত দলিলের ভাষ্য অনুযায়ী, একটা চরম অস্বস্তি ও চাপা উত্তেজনা ছিল "....an uneasy spirit has lately been perceived to prevail among them." কোম্পানির কাছে সবচেয়ে উদ্বেগের ব্যাপার ছিল, চারিং-রাজার লোকজন ও মণিরাম দেওয়ানের সাথে সিপাহিদের যোগাযোগ—যেটি তাদের আবাসস্থল খানাতল্লাশি করে কিছু চিঠিপত্র বাজেয়াপ্ত করার পর কোম্পানির চোখে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আসলে, চিঠিপত্রের ভাষায় এমন সব 'কোড' ব্যবহার করা হয়েছিল যে, সাধারণের কাছে সেগুলি ছিল দুর্বোধ্য।

১৫.১.৫ ঘটনাবলী

ALI-র জনৈক ইংরেজ সেনা অফিসার George Carter তাঁর 'ডায়েরি'তে সেই সময়ের আসামের পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করেছেন। কার্টার লিখেছেন, ১৮৫৭-র জুন-জুলাই পর্যন্ত ডিব্রুগড় সহ আসামের অন্যত্র পরিস্থিতি তেমন উদ্বেগজনক ছিল না ; কিন্তু আগস্ট মাস থেকে আশঙ্কা বাড়তে শুরু করল। ALI-র Commanding Officer Lt. Col. Hannay ১৭ আগস্ট ১৮৫৭,তাঁর উদ্বেগের কথা কার্টারকে জানিয়েছিলেন ; কারণ উত্তর-ভারতের বিদ্রোহীদের একটা অংশ গুয়াহাটির মধ্য দিয়ে আসামে ঢুকে সিপাইদের উত্তেজিত করছিলেন ; তাঁর ভাষায় ঃ "....trying to arrange a rising amongst our Sepoys in connection with the Assam Raja" এবং এটি মোকাবিলা করার জন্য "open precautionary measures" খুবই জরুরি। ১৯ আগস্ট Hannay আবার জানাচ্ছেন, গোলাঘাট ও ডিব্রুগড়ে বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়ে গেছে। গোলাঘাটের দক্ষিণে প্রায় ১২ কিমি দূরে 'Nogora' গ্রামের কাছে জামুগুড়ি ও বরপাথর সেনা ছাউনিতে আসামে মহাবিদ্রোহের প্রথম অগ্নিশিখা জ্বলে। এটির পিছনে মণিরাম দেওয়ানের ঘনিষ্ঠ পিয়ালি বরুয়ার কৃতিত্ব ছিল বিরাট। বেশ কিছু সিপাইকে ঐ সময় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ; যার মধ্যে জমাদার নূর মহম্মদ, দেশীয় ডাক্তার হাদিয়াত আলি,

সিপাই শেখ্ মহম্মদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৫০তম বর্ষে জামুগুড়ি ও বরপাথর-এ কিছু অনুষ্ঠানের সময় ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের এই সংগ্রামী অধ্যায়টি প্রচারিত হয়।

বিভিন্ন গোয়েন্দা রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ বড়ো কিছু ঘটনা আশঙ্কা করেছিলেন এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল থেকে সমস্ত ইউরোপীয় অফিসার প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। চা-বাগানের সাহেব মালিকরা আপার-আসাম ত্যাগ করে গুয়াহাটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা প্রমাদ গুণতে শুরু করেন। ALI-র পরিকাঠামোটি এমনি ছিল যে, উত্তর ভারতীয় সিপাইদের সাথে কিছু নেপালি, মণিপুরী, রাভা প্রভৃতি গোষ্ঠীর সিপাইরাও একই বাহিনীতে ছিল। ১৮৫৭-র জুন মাসে 1st ALI-র সৈন্যসংখ্যা ছিল এইরকম ঃ

হিন্দুস্তানি	৬০০
নেপালি/গোর্খা	২৫০
মণিপুরী, রাভা ইত্যাদি	২৬০
মোট	১,১১০

বিদ্রোহের ব্যাপারে সকলে কিন্তু একমত হতে পারছিল না। মেজর জেন্‌কিনস্ গোপন সূত্রে খবর পান যে, কন্দর্পেশ্বর সিংহ-র প্রতিনিধি সিপাইদের নানাভাবে লোভ দেখাচ্ছেন এবং সিংহাসন ফিরে পেলে তাদের বেতন দ্বিগুণ করারও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ঐ রিপোর্টের ভাষায়, "The Raja would double the pay of the sepoys and give the native officers pay like *Jongie Poltan*, if all the sepoys would join and get him the country." হিন্দু ও মুসলমান—উভয় ধর্ম-সম্প্রদায়ের কাছে নাকি কন্দর্পেশ্বর সিংহ নানাভাবে আবেদন জানাচ্ছেন এবং দেওরগাঁও মন্দিরের পুরোহিতের ভাই লাকিদত্ত শর্মাকে শ্রাবণ মাসে ঈশ্বরের পুজোর জন্য সোনা দিয়েছেন "In the month of *Swan* Luckidutta Sarmah, brother to the *Thakoor* of the Dewargaon *Temple* received gold from the *Rajah* for the performance of *Poojah* in the temple." কমিশনার জেন্‌কিনস অনন্যোপায় হয়ে ১৮৫৭-র ২৯ আগস্ট এক চিঠিতে অবিলম্বে ইউরোপীয় সেনাবাহিনী আসামে পাঠাবার জন্য গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের কাছে অনুরোধ করেন "to save the province from the revolution." ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭-তে Lt. Davis-এর নেতৃত্বে ১০৪ জন ইউরোপীয় নৌবাহিনীর সদস্য কলকাতা থেকে নদীপথে ডিব্রুগড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ঃ

> *.....the province is in considerable peril, and an European force of seamen, trained as gunners, under the command of a naval officer has been sent up by steamer to Debrooghar, to be disposed of as the local authorities may deem most advisable.*

ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্য (১৭.২৯ দ্রষ্টব্য) তাঁর *সাঁচিপটর পুঁথি* গ্রন্থে B. C. Allen *(Gazetteer of Naga Hills and Manipur)*-কে উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন, ১৮৫৭ সালে ডিব্রুগড় দ্বিতীয় কানপুর হতে যাচ্ছিল ("Dibrugarh was heading towards becoming a second Cawnpore").

১৫.১.৬ অন্যদের সমর্থন

সিপাহিরা বিদ্রোহ শুরু করলেও এবং অভিজাতদের একাংশ তাদের মদত দিলেও ধীরে ধীরে অন্যরাও তাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। অমলেন্দু গুহ তাঁর *Planter Raj to Swaraj* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কীভাবে কনট্র্যাকটরদের অধীনস্থ ইউরোপীয় চা-বাগানের শ্রমিকরা সিপাহিদের প্রতি সংহতি জানাতে বাগানের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। গুহ-র ভাষায়,

> *There is evidence that workers of the Assam Company—all of them Assamese Villagers working under contractors—struck work to fraternize with the rebels. This is evident from observations made by the planters at the time.*

কনট্র্যাকটরদের অসহযোগিতার কারণ হিসাবে কলকাতায় Assam Company-র Board of Directors মন্তব্য করেছে যে, তাদের একটা ধারণা জন্মেছিল আসামে কোম্পানির জমানার যবনিকাপাত হতে যাচ্ছে :

> *....the independent contractors for cultivating our lands, the indigenous inhabitants of the neighbouring villages held off from the performance of their contracts on the plea that they were not to be paid, believing that the Europeans 'were to be cut up'.*

এরই জন্য বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী আসামে পৌঁছানোর পর তাদের সাথে স্থানীয় মানুষ কোনো সহযোগিতা করেনি। কলকাতার Board of Directors আরো মন্তব্য করেছে, যদি ভারতবর্ষের অন্য অংশের মতো আসামে বিদ্রোহের দাবাগ্নি তেমনভাবে ছড়িয়ে পড়ত (যদিও শেষপর্যন্ত সেটি হয়নি), তাহলে আসামের অনেকেই সেদিন বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিত। Board of Directors এর ভাষায়,

....far from aiding government in suppressing revolt, they (common people) remained utterly passive, many sympathizing with their conspiring Rajah and the disaffected Sepoys. Had an outbreak occurred, there can be little doubt that they would have sided with the rebels.

'আসাম কোম্পানি'-র এই স্বীকারোক্তি থেকে উপলব্ধি করা যায়, আসামের পরিস্থিতি সেদিন কেমন অগ্নিগর্ভ ছিল।

১৮৫৭ সালে আসামে চা-শ্রমিক ধর্মঘটে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই মধুরাম কোচ-কে ১৮৫৮ সালের ৩০ জানুয়ারি সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। বিদ্রোহ দমনের কয়েকমাস পরেই শুরু হয়েছিল ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর চরম অত্যাচারের কালো অধ্যায়। উঁচু-নীচু নির্বিশেষে সমাজের অনেক মানুষের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল কোম্পানির নৌবাহিনীর ইউরোপীয় সেনারা। ডিব্রুগড় সহ বিভিন্ন স্থানে সাহেব সেনাদের নাম শুনলেই মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হত। দ্বিতীয়বার ব্রিটিশ-বিরোধী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে আসামের মানুষ যাতে পাঁচবার চিন্তা করে সেই উদ্দেশ্যেই একটা জয়ের পরিবেশ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আসামকে চিরদিন ব্রিটিশ পদানত হিসেবে রাখার জন্যই যে ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর এত অত্যাচার সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল সেটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত *Hindoo Patriot* সংবাদপত্রের একটি লেখা (২১ অক্টোবর, ১৮৫৮-তে প্রকাশিত) থেকে অনুমান করা যায়। ঐ দীর্ঘ রিপোর্ট-এর কয়েকটি লাইন ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে এইরকম ঃ

It appears from their manners and exprressions that they, as if instruments of torture and cruelty, are employed to bend the unbroken spirits of a newly acquired territory to the yoke of subjection.

১৫.১.৭ অন্তিম পর্ব

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে (১২.৩) উল্লেখ করা হয়েছে কীভাবে কলকাতায় মধু মল্লিকের বাড়ি থেকে মণিরাম দেওয়ান সাংকেতিক বার্তার মাধ্যমে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ; কারণ তাঁর পরিকল্পনা ছিল, দুর্গাপূজার সপ্তমীতে তিনি আসামে ফিরে গিয়ে কন্দর্পেশ্বরকে 'স্বর্গদেও' হিসেবে ঘোষণা করবেন। যেভাবে ঐক্যের প্রতীক বাহাদুর শাহকে সামনে রেখে

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ; আসামের ক্ষেত্রে কন্দর্পেশ্বর-কে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে সেইভাবে ঐক্য আনতে মণিরাম চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না যে, তাঁর সমস্ত সাংকেতিক চিঠি ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে চলে গেছে। একদিকে ALI-র সিপাহিদের মধ্যে ঐকমত্যে আসার ব্যর্থতা, এবং অন্যদিকে রাজ-পরিবারের কিছু সদস্যের বিশ্বাসঘাতকতা এবং হরনাথ পার্বতিয়া বরুয়া সহ অন্যদের ষড়যন্ত্র ইত্যাদির ফলে মণিরামের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। ক্যাপ্টেন হোলরোয়িড্ (Holroyd) এবং ক্যাপ্টেন লোথার (Lowther) ১৮৫৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর জোড়হাট থেকে কন্দর্পেশ্বর ও তাঁর সহযোগীদের গোপন চিঠি সহ গ্রেপ্তার করে কলকাতার আলিপুর জেলে পাঠিয়ে দিলেন। অন্যদিকে একই সময়ে কলকাতা থেকে মণিরাম দেওয়ান ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তার করে জোড়হাটে বিচারের নামে প্রহসনের জন্য নিয়ে আসা হল। তাঁদের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করা হল। শিবসাগর জেলার জেলা-শাসক ক্যাপ্টেন হোলরোয়িড়-কে এই 'ষড়যন্ত্র মামলা'-র বিশেষ কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত করে অত্যন্ত দ্রুত মোট ৩০ জনের বিচার হল। হোলরোয়িড় ছিলেন একাধারে অভিযোগকারী ও বিচারক। অভিযুক্তদের বক্তব্য না শুনেই বিচার সম্পন্ন হল। নাবালকত্ব এবং অন্যান্য কিছু কারণে কন্দর্পেশ্বর সিংহ-কে ফাঁসি না দিয়ে গুয়াহাটিতে গৃহবন্দি করা হল। মধু মল্লিক, দ্যুতিরাম বরুয়া, বাহাদুর গাঁওবুড়া, কমলা বরুয়া, মারঙ্গীখোয়া গোঁহাই, ত্রিনয়ন, মায়ারাম নাজির, শেখ ফরমুদ সহ অন্যদের আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ; দুজন মহিলা রূপাহি আইদেও এবং লুম্বই আইদেওর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং মণিরাম দেওয়ান ও পিয়ালি (মহেশ চন্দ্র) বরুয়া'র ফাঁসির আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন হোলরোয়িড্। ১৮৫৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মণিরাম ও পিয়ালি বরুয়ার ফাঁসির বার্তা অসমিয়া মননে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। এক দশকের মধ্যে এই দুই 'দেশপ্রেমিক' 'শহিদ' বিহুগীত সহ বিভিন্ন লোককথায় স্থান পেয়ে 'মিথ্' বা প্রবাদে পরিণত হয়েছিলেন।

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ মূলত আপার-আসামের অভিজাত ও সিপাহিদের একাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং খণ্ডিত অংশকে (চা-বাগানের কনট্র্যাকটর ও স্থানীয় শ্রমিক) কিছুটা প্রভাবিত করলেও সমগ্র আসামকে নানা কারণে সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। সমাজের সকল অংশের মানুষকে একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ মণিরাম দেওয়ান তৈরি করতে পারেননি। শুধুমাত্র দারোগা হরনাথ পার্বতিয়া বরুয়া যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তা নয়, অনেকের কাছেই মণিরামের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল। তাছাড়া আসামের অধিকাংশ মানুষ আহোম রাজতন্ত্রের উপর

বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। বর্মী আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত সমাজে কোম্পানি যেভাবে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিল তাতে অনেকে স্বস্তি ফিরে পেয়েছিলেন। এরই জন্য ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহ সকলের সমর্থন পায়নি।

১৫.১.৮ বরাক উপত্যকায় মহাবিদ্রোহের প্রভাব (Impact of the Great Revolt in the Barak Valley)

মিরাটে বিদ্রোহের বার্তা পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে ছড়িয়ে যাওয়ার পর সেখানে সিপাহিদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ১৮৫৭ সালের ১৮ নভেম্বরে বন্দর শহর চট্টগ্রামে 34th Native Infantry-র ৩০০ সিপাই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। E. A. Gait এবং অন্যান্যদের বিবরণ অনুযায়ী, বিদ্রোহীরা কালেক্টর অফিস থেকে ২,৭৮,২৬৭ টাকা লুঠসহ জেল ভেঙে বন্দিমুক্তি করে ৩টি হাতি নিয়ে পার্বত্য ত্রিপুরার (বর্তমান ত্রিপুরা) মধ্য দিয়ে সিলেটের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহের পর ৩৪ নং Infantry-কে নিরস্ত্র করা হয়েছিল ; কিন্তু চট্টগ্রামে তিন কোম্পানি সৈন্য তখনো অব্যাহত ছিল। এটি অবশ্য লক্ষণীয় চট্টগ্রামে বিদ্রোহীরা কোনো ইউরোপীয়কে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেনি ; অথবা কোনো ইউরোপীয়কে আহত করেনি। যাইহোক, চট্টগ্রাম থেকে ত্রিপুরা হয়ে বিদ্রোহীরা যেতে চেয়েছিল কারণ তাদের ধারণা ছিল রাজন্য-শাসিত ত্রিপুরার মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য (১৮৫০-৬২)-র কাছ থেকে হয়তো বা কিছু সাহায্য সহানুভূতি মিলতে পারে। কিন্তু দুর্বলচিত্র ঈশানচন্দ্র ব্রিটিশ-শক্তির ভয়ে সেটি করতে রাজি হননি। কুমিল্লা থেকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের কঠোর হাতে দমন করার জন্য ঈশানচন্দ্রের কাছে বারবার জরুরি নির্দেশ পাঠাতে থাকে। ফলে, ঈশানচন্দ্র ত্রিপুরা থেকে ৩৪নং রেজিমেন্টের সিপাহিদের বহিষ্কারের আদেশ দিতে বাধ্য হন। ত্রিপুরার ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ'র ভাষ্য অনুযায়ী, "...তাহারা (৩৪ নং রেজিমেন্টের সিপাইরা) মহারাজের আদেশ শ্রবণে ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক কাছাড়াভিমুখে গমন করে।" এই কাছাড়েই Sylhet Light Infantry (SLI) (পরবর্তী সময়ে 10th Gurkha Rifles নামে পরিচিত)-র সাথে 34th Native Infantry-র সংঘর্ষ বাধে। এটি 'লাটুর যুদ্ধ' নামে পরিচিত। J. B. Bhattacharjee তাঁর *Cachar Under British Rule in North East India* গ্রন্থে এই সংঘর্ষ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী সময়ে আরও কিছু তথ্য তিনি ও অন্যরা সংগ্রহ

কাছাড়ে ১৮৩০-এর দশক থেকে মণিপুর সিংহাসনের দাবিদার বেশ কয়েকজন মণিপুরী বাস করতেন এবং তার মধ্যে নরেন্দ্রজিৎ সিং উল্লেখযোগ্য। ক্ষমতাচ্যুত কাছাড়ি শাসককুলের কেউ নয় ; বরং অসন্তুষ্ট মণিপুরী রাজপরিবারের কিছু সদস্য বিদ্রোহী সিপাইদের সাহায্য নিয়ে মণিপুরের সিংহাসন দখলে বেশি আগ্রহী ছিলেন। ফলে ৩৪ নং রেজিমেন্ট কাছাড় হয়ে মণিপুরের দিকে রওয়ানা হয়েছিল। যদিও কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মতো বরাক উপত্যকাতেও বিদ্রোহীরা তেমন জনসমর্থন পায়নি, তথাপি সরকারি ভাষ্য কিন্তু অন্য কথা বলে। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার-এর ভাষায়,

> *....so many as 1200 people were said to have engaged themselves in opening roads, cutting jungles and procuring provisions for them....the Kookies were aiding them (the 'rebels') by carrying their baggage and cutting a path for them through the jungles.*

কত বিপুল জনসমর্থন বিদ্রোহীরা অর্জন করতে পেরেছিল এবং কীভাবে কুকিরা জঙ্গল কেটে বিদ্রোহীদের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল, উপরোক্ত দলিলই সেটি প্রমাণ করে। অবশ্য কমিশনার সাহেব এর কারণ হিসেবে চট্টগ্রাম কোষাগার থেকে লুঠ করা অর্থ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণকেই দায়ী করেছেন। বিদ্রোহীদের কাজকর্ম সম্পর্কে এইরকম ব্যাখ্যার সাথে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব'র মিল আছে। আসলে, কাছাড়ে বিদ্রোহী সিপাইদের সাথে কুকি বা লুসাই পাহাড়ের কিছু মানুষ, মণিপুরী রাজপরিবারের সদস্য, চেরা সর্দার, ভুটিয়া এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক, সর্বোপরি হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী, ব্রিটিশ সরকারের রোষ ও ভীতির অন্যতম কারণ ছিল। সুতরাং এটি যে শুধু সিপাইদের বিদ্রোহ ছিল না, এইসব ঘটনাগুলিই তার প্রমাণ। অন্যদিকে ব্রিটিশ আশ্রিত মণিপুরের তৎকালীন মহারাজা চন্দ্রকীর্তি সিংহ, ইম্ফলে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট McCulloch-এর নির্দেশমতো, ৪০০ মণিপুরী সৈনিককে পাঠিয়েছিলেন ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতা করে বিদ্রোহী সিপাইদের দমনের উদ্দেশ্যে।

বর্তমান বাংলাদেশ-সংলগ্ন করিমগঞ্জের সন্নিকটে কুশিয়াড়া নদীর পাশে একটি পশ্চাৎপট ও অবহেলিত গ্রামের নাম লাটু এবং এটিই ছিল ১৮৫৭ সালে রণক্ষেত্র। E. A. Gait-এর বিবরণ অনুযায়ী, SLI-র কমান্ডেন্ট Bying-এর নেতৃত্বে ১৬০ জন গোর্খা সৈন্য লাটুতে মার্চ করে আসার পর উত্তেজনা শুরু হয়। বিদ্রোহী সিপাইদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০-র মতো এবং ৩০ গজের ব্যবধানে উভয় বাহিনী

প্রায় মুখোমুখি দাঁড়ায়। শিলচরের Tagore Society কর্তৃক ১৯৮১ সালে প্রকাশিত এবং সুজিৎ চৌধুরি সম্পাদিত *The Mutiny Period in Cachar* গ্রন্থে ১৮৫৭-৫৮-তে ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে কাছাড়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট Robert Stewart-এর লেখা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি চিঠি থেকে কাছাড়ে মহাবিদ্রোহের প্রভাব এবং হাইলাকান্দি, সোনাই, ভুবন, লাখিপুর, সরসপুর ইত্যাদি এলাকার উত্তেজনা সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। এই প্রসঙ্গে সুজিত চৌধুরী কাছাড়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট Capt. Robert Stewart-এর একটি চিঠির উল্লেখ করেছেন ঃ "In the ensuing gun battle that took place on December 18, 1857, Major Bying and five of his soldiers were killed." চৌধুরীর বিবরণ অনুযায়ী, বিদ্রোহীদের নেতা সুবেদার অযোধ্যা সিং-এর অসম সাহসের ফলেই Major Bying সহ কোম্পানির ৫ সৈনিকের মৃত্যু সম্ভব হয়েছিল। বিদ্রোহীদেরও ২৬ জন ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। নিহত সিপাইদের যে স্থানে কবর দেওয়া হয়েছিল লাটুর সেই স্থানটি আজও 'সিপাই টিলা' নামে পরিচিত। লাটুর যুদ্ধ-সংক্রান্ত তথ্য অবহিত হতে গেলে ১৮৫৭-র ২২ ডিসেম্বর Bengal Government-এর সেক্রেটারিকে লেখা Capt. Robert Stewart-এর দীর্ঘ চিঠির কিছুটা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। চিঠিটি ছিল এই রকম ঃ

> *....late on the night of 19th I received a letter from Mr. Dod, who had accompanied the force sent with Major Bying from Sylhet in pursuit of the mutineers of the 34th Native Infantry, informing me that after having marched to Pratapgarh, Major Bying's force, upon certain information received, marched to Latoo along river Kushiara and there had been an engagement with the mutineers on the morning of December 18th in which 26 of them lost their lives. The remainder had fled, it was said, in the direction of Pratapgarh with a view to making towards Cachar and Manipur.*

Stewart-এর উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী, ২৬ জন সিপাই নিহত হওয়ার পর বিদ্রোহীরা মণিপুরের দিকে পলাতক। ঐ চিঠিতে স্থানীয় বাঙালি বাসিন্দাদের ভীতি উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিদ্রোহীদের 'বদমাশ', 'লুটেরা' ইত্যাদিতে এইভাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে ঃ "....The people of this district are much alarmed, the Bengalis being in the greatest fear. The *badmashes* are all on the lookout for a favourable opportunity to plunder."

Major Bying নিহত হওয়ার পর Lt. Ross SLI-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং বিদ্রোহীদের পিছু-ধাওয়া করে অবশেষে মণিপুর সীমান্তের কাছে ভুবন পাহাড়ে শেষ যুদ্ধ করে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। Stewart-এর বর্ণনা অনুযায়ী "....several of them (mutineers) died of hunger and disease." ১৯২১ সালে উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ তাঁর *কাছাড়ের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কীভাবে রায় বাহাদুর হরিচরণ শর্মা সহ কিছু স্থানীয় জমিদার ও চা-বাগানের মালিক ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক অচ্যুত চরণ চৌধুরী (জফিরগড় জমিদার পরিবারভুক্ত) প্রকাশ করেছেন, কীভাবে তাঁর পূর্বপুরুষ জনৈক কালা-মিয়া-কে সিপাইদের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। সম্প্রতি David R. Syiemlieh তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ "Echoes of the 1857 Uprising in North East India"-তে বরাক উপত্যকার এই ঘটনার অন্তিমলগ্ন অর্থাৎ মণিপুরে ঢোকার প্রাকলগ্ন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ঃ

> ***Pursued by the Sylhet Light Infantry and the Kookee Levy on their entry into the district, 110 of the mutineers were killed by early January 1858. 12 women and 7 children accompanying the men were taken prisoners. Later that month the numbers killed in pursuit increased to 167.***

অধ্যাপক জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য বরাকের শাখা নদী সোনাছড়ার তীরে শৈশবে 'গরাদ-বিল' ('গরাদ = কারাগার) দর্শনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, যেখানে সিপাইদের হয় বন্দি অথবা কবর দেওয়া হয়েছিল। সিলেটি ভাষায় কয়েকটি স্থানীয় ছড়ার উল্লেখ করতেও তিনি ভোলেননি। যেমন—"যাইওনা যাইওনা ভাইরে/লাটুর বাজার দিয়া/শয়ে শয়ে সিপাই আইছন, ইংরাজ খেদাইয়া/হায় রে ইংরাজ খেদাইয়া"। "দুয়ার বন্ধ রে, সিপাই আইলা ঘাটে/সাহেব বাবুয়ে হুকুম দিলা, মরবই ফাঁসির কাঠে/হায় রে মরবই ফাঁসির কাঠে" ইত্যাদি। যদিও মুক্তি-সংগ্রামীদের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনির কথা কিছু ছড়া, লোককথার মাধ্যমে বরাক উপত্যকায় প্রচারিত হয় ; তথাপি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে উত্তর-পূর্ব ভারতের এই কাহিনি যথাযোগ্য স্থান আজও অর্জন করতে পারেনি।

১৫.১.৯ খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে ১৮৫৭-র প্রভাব (Impact of 1857 on Khasi-Jayantia Hills)

ইতিপূর্বে খাসি নেতা তিরোট সিং-এর বিদ্রোহ (১৪.৩.৩.১ দ্রষ্টব্য), জয়ন্তিয়ার রাজা রাজেন্দ্র সিং-এর অপসারণ (১৪.৩.৪.৩ দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

ব্রিটিশ-বিরোধী উত্তেজনা খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে কীভাবে জমা হয়েছিল সেটি সহজেই অনুমেয়। ১৮৫৭-তে Board of Revenue-র বিচারক W. J. Allen ঐ দুই পাহাড়ের রাজনৈতিক অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করে কলকাতায় কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে জানান যে, সর্বত্রই একটা গুজব ছড়িয়েছে যে, ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম সময় এসে গেছে এবং এর ফলে খাসি 'স্যিয়েম'দের মধ্যে রীতিমত উত্তেজনা আছে। Allen-এর ভাষ্য অনুযায়ী, জয়ন্তিয়ার প্রাক্তন রাজা রাজেন্দ্র সিং চেরা 'স্যিয়েম'-এর সাথে একজোট হয়ে তাঁর হারানো অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করছেন। এই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে কোম্পানির প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, অবিলম্বে রাজেন্দ্র সিং-কে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় চালান করে দেওয়া। কিন্তু কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে Allen সতর্ক করে দিলেন। এটি করলে সমগ্র পাহাড়ে আরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এবং রাজেন্দ্র সিং-কে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হবে ; বরং রাজেন্দ্র সিং-কে বাধ্য করা হোক কোম্পানির সেনাবাহিনীকে নানাভাবে মদত দিতে। Allen সাহেবের পরামর্শমতো রাজেন্দ্র সিং-কে প্রস্তাব দেওয়ার সাথে সাথেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। রাজেন্দ্র সিং একটি স্টিমার দাবি করলেন যাতে জলপথে তিনি তাঁর নিজস্ব প্রায় ২৫০০ সৈনিক (কুকি, খাসি, মণিপুরীসহ) নিয়ে 'হিন্দুস্তান'-এ গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারেন, কারণ ১৮২৪ সালের ১০ মার্চে স্বাক্ষরিত সরকারের সাথে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এটি করতে তিনি দায়বদ্ধ। রাজেন্দ্র সিং-এর বক্তব্য, সরকারি দলিলের ভাষায়,

> *....to proceed to Hindustan with my own troops about 2500 (Cookees, Khasees and Moneepuries) to fight against the enemy of the British government as I am bound to assist the Government agreeably to the Treaty.....made on the 10th March 1824.*

রাজেন্দ্র সিং-এর উপরোক্ত প্রস্তাবে স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল ; কারণ জয়ন্তিয়া রাজার কাছ থেকে সমতল এলাকা কেড়ে নেওয়ার পর এবং রাজেন্দ্র সিং 'স্যিয়েম' পদ হারানোর পর প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনো সেনাবাহিনী ছিল না। যে স্টিমারটি রাজেন্দ্র সিং চেয়েছিলেন সেটি যে ব্রিটিশ-স্বার্থের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হবে এবং রাজেন্দ্র সিং তাঁর হারানো পদ ও অধিকার আবার দাবি করবেন, এই ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবার পর, কোম্পানি সেনাবাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত সিলেট শহরে কর্তৃপক্ষের চোখের সামনে রাজেন্দ্র সিং-কে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ফলে ১৮৫৭-এর টাল-মাটাল অবস্থার

সুযোগ গ্রহণ করতে খাসি বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে কেউ পারেননি। উত্তেজনা থাকলেও কোম্পানির সতর্ক দৃষ্টির জন্য তার বহিঃপ্রকাশ দখলিকৃত পাহাড়ে ঘটেনি।

১৫.১.১০ মহাবিদ্রোহের ভবিষ্যৎ ফল (Aftermath of the Great Revolt

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পরিণাম ভারতবর্ষের অন্যত্র যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে আসাম তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। এই ঘটনার পরেই ভারতবর্ষে অত্যাচারী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের যবনিকাপাত হয়েছিল। Government of India Act 1858 অনুযায়ী কোম্পানির স্থলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছিল। ১৮৭৭ সালে মহারানি ভিক্টোরিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত-সম্রাজ্ঞী হিসেবে ঘোষিত হলেন। এই পরিবর্তনে অবশ্য আসামের সাধারণ মানুষের জীবনে কোনো হেরফের হয়নি ; তাঁরা যে তিমিরে ছিলেন সেখানেই রইলেন। তবে ১৮৫৭-র পর লোক-দেখানো কিছুটা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা যায়। আহোম রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার শেষ উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথে ব্রিটিশের অধীনস্থ হয়ে আসামকে বাকি ৯০টা বছর কাটাতে হয়েছিল। ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতি বাতিল ঘোষণা সহ আরও রাজ্য দখল না করার ক্ষেত্রে মহারানি ভিক্টোরিয়ার আশ্বাস সত্ত্বেও আসামের সীমানা প্রসারণের ব্যাপারে সেটি কিন্তু মানা হয়নি—যেমন, ১৮৬৬-তে আঙ্গামী রাজ্য দখল, ১৮৭২-৭৩-তে গারো রাজ্য, ১৮৯০-এর দশকে লুসাই পাহাড় ইত্যাদি। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ঢেলে সাজানো সহ সমগ্র ভারতের শাসনব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে নতুন মোড়কে ঢাকা হল। যেসব আমলারা কোম্পানির সময় শাসন করতেন তাঁরা সকলেই বহাল তবিয়তে রইলেন, তবে পদ ও ক্ষমতা কিছুটা পরিবর্তিত হল, যাকে বলা হয় 'Cosmetic Change'। স্থানীয় স্তরে অসমিয়াদের বক্তব্য শোনার জন্য কিছু শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গৃহীত হল। ১৮৫৮ সালের নভেম্বরে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে রানি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাটি ছিল এইরকম ঃ

> *We hold ourselves bound to the natives of our Indian territories by the same obligations of duty which bind us to our other subjects.*

যদিও আসামে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ উত্তর ভারতের মতো অত বীভৎস আকার নেয়নি এবং বরাক উপত্যকা ছাড়া আসামের কোথাও ইউরোপীয় কোনো কর্মকর্তা বা সেনাবাহিনীর অফিসার নিহত হননি ; তথাপি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা

করে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক একাধিক ব্যবস্থা গৃহীত হল। 'বেঙ্গল আর্মি' ভেঙে দেওয়া হল এবং যেসব এলাকা বা জনগোষ্ঠী বা জাতি কোম্পানির পক্ষ নিয়ে অথবা অনুগত হয়ে বিদ্রোহ দমনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল তাদের 'যোদ্ধা জাতি' হিসেবে চিহ্নিত করে—যেমন, গোর্খা, শিখ ইত্যাদি—নতুন রেজিমেন্ট গঠিত হল। ALI-কেও ১৮৬১ সালে ভেঙে দিয়ে নতুন বাহিনী গঠিত হল।

১৮৫৭-র অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে চা-বাগানের ইউরোপীয় মালিকরা পুরোপুরি ইউরোপীয় বাহিনী সর্বক্ষণের জন্য আসামের উপরিভাগে মোতায়েন রাখার দাবি জানালেও সেটি মানা সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ সরকারের বক্তব্য ছিল ঃ

> *Considerations of economy on the one hand and security on the other prevent us from garrisoning and defending India exclusively with British or exclusively with native soldiers.*

১৮৫৭-র পর Major General Jonathan Peel-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ঢেলে সাজানোর জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। এই Peel Commission-এর সুপারিশ অনুযায়ী, ১৮৫৯ সালে সেনাবাহিনীতে ইউরোপীয়দের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল, গোলন্দাজ বাহিনী পুরোপুরি ইউরোপীয়দের অধীনস্থে রাখা হয়েছিল। যে নৌসৈনিকদের আসামে পাঠানো হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ওখানকার মহামারি ও জলবায়ু সহ নানা কারণে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং বেশ কিছু ইউরোপীয় সৈনিকের মৃত্যুও হয়েছিল। অন্যদিকে কম বেতনে স্থানীয় সিপাহিরা প্রতিকূল পরিবেশেও দক্ষতার সাথে ("more rough and ready than the regular army") কাজ করেছিল। এরই জন্য দেশীয় সৈনিকদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ইউরোপীয় বাহিনীর মাধ্যমে আসামকে বিদ্রোহের হাত থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব ছিল না। বরং Peel Commission-এর সুপারিশ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে জাত-পাত ও ধর্মের দেশীয় সৈনিকদের এমনভাবেই সন্নিবিষ্ট করা হল যাতে একজন বিদ্রোহী হওয়ার চেষ্টা করলে অন্যজন বাধা দেয় ("Counterpoise of Natives against Native")। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ ভারতের সেনাপ্রধান Sir Hugh Rose একটি চিঠিতে Secretary of State, Sir Charles Wood-কে অত্যন্ত নগ্নভাবে লিখছেন ঃ

> *I wish to have different and rival spirit in the different regiments so that Sikh might fire into Hindoo; Goorkha into either, without any scruple, in case of need.*

মণিরাম দেওয়ানের ফাঁসির মাধ্যমে আসামের সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তাটি স্পষ্ট করে দেওয়া হল, চা-বাগানের মালিকানা সহ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শক্তি কোনোভাবেই দেশীয় উদ্যোগকে প্রতিযোগিতার ব্যাপারে প্রশ্রয় দেবে না এবং ব্রিটিশ শক্তিকে অস্বীকার করার চেষ্টা করলে মণিরাম দেওয়ানের অবস্থা হবে। এরই জন্য বলা হয়, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ আসামের অভিজাত শ্রেণির 'শেষ আর্তনাদ'। এই ঘটনার পর তাঁরা নীরব হয়ে গিয়েছিলেন এবং কেউ কেউ ব্রিটিশের অনুগত ভৃত্যে পরিণত হয়েছিলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভুদয়ের ফলে শুধু যে অভিজাতদের শূন্যস্থান পূরণ হয়েছিল তাই নয়, আসামের রাজনৈতিক মানচিত্রও কিছুটা স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছিল। ১৮৫৭-র ঘটনা থেকে (হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী) শিক্ষা নিয়ে ব্রিটিশ শক্তি সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে যে মোক্ষম অস্ত্রটি ব্যবহার করতে শুরু করল, সেটি হল হিন্দু-মুসলমানকে "ভাগ করো, শাসন করো"। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন,

> *There is no record of a single incident of conflict or clash on a religious basis even though there are instances where British officers tried to weaken the Indian camp by stressing such differences.*

১৮৫৭-র পর থেকে আসাম সহ অন্যত্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করল এবং সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়াল। যেহেতু আসামের চা-বাগানের স্থানীয় শ্রমিকরা ১৮৫৭-তে ধর্মঘটে অংশ নিয়ে বিদ্রোহীদের প্রতি কিছুটা সংহতি জ্ঞাপন করেছিল ; এরই জন্য আসামের বাইরে থেকে চা-শ্রমিকদের দলে দলে নিয়ে আসার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। ১৮৫৭-র পর চা ছাড়াও অন্যান্য খনিজ সম্পদের দিকে ব্রিটিশদের দৃষ্টি আকর্ষণকে কেন্দ্র করে রেলপথ সহ যোগাযোগের প্রশ্নটিও গুরুত্ব পেল।

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হল। বিদ্রোহ দমনে যত খরচ হয়েছিল সবটা ভারতীয়দের উপর নতুন নতুন কর বসিয়ে উসুল করে নেওয়া হল। কোম্পানির হিসেবে মোট ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড বিদ্রোহ-দমনে খরচ হয়েছিল এবং এটি বহনের দায়ভার বর্তাল ভারতীয়দের উপরই। শুধু তাই নয়, কোম্পানির যবনিকার সাথে কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডারদের যে ক্ষতিপূরণ ব্রিটিশ সরকার দিয়েছিল সেটিও বহন করার দায়িত্ব ছিল গরিব ভারতীয়দের। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত-র *The Economic History of India*-র ভাষায় ঃ

The Empire of India was purchased by the Crown from the Company, but the people of India were charged with the purchase money. The value received by the shareholders of the company's stock was not paid by the British crown which was an imperial property, but was added to the Indian Debt.

কেন নিত্য-নতুন করভারে ন্যুব্জ আসামের কৃষক ১৮৫৮-র পর থেকে একটার পর একটা কৃষক বিদ্রোহ শামিল হতে বাধ্য হয়েছিল সেটি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে গেলে এই প্রেক্ষাপটটি উল্লেখ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আসামে মহাবিদ্রোহের পরবর্তী ইতিহাস এরই জন্য একাধিক কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস। আসলে, শুধু আসাম নয়, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে ১৮৫৭ একটি গুরুত্বপূর্ণ 'মাইলস্টোন'।

Darlymple তাঁর *The Last Mughal* গ্রন্থে ১৮৫৭-র ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

......it was not one single unified movement but many, with widely differing causes, motives and nature.

অন্যদিকে ২০০৭ সালে মহাবিদ্রোহের ১৫০ বছর পূর্তিতে ভারত সরকার এটিকে "India's First War of Independence" হিসেবে অভিহিত করে সারা দেশজুড়ে ব্যাপকভাবে এটিকে উদযাপিত করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর আগে ২০০৬ সালের অক্টোবরে লোকসভার স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ভারত সরকারের কর্মসূচির সূচনা হিসেবে বলেন ঃ

The war of 1857 was undoubtelly an epoch-making event in India's struggle for freedom. For what the British sought to deride as a mere sepoy mutiny was India's First War of Independence in a very true sense when people from all walks of life, irrespective of their caste, creed, religion and language rose against the British rule.

এরই জন্য ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে মণিরাম দেওয়ান, পিয়ালি বরুয়া (উদ্দেশ্যে তাঁদের যাই থাকুক) থেকে শুরু করে আসামের যত বীর যোদ্ধা শহিদ হয়েছেন বা আত্মত্যাগ করেছেন তাঁরা সকলেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের অমর সেনানী। যুগে যুগে বিজয়ীরাই ইতিহাস রচনা করে ("History is written by the Victors") বলে একই ঘটনা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ দৃষ্টিতে একরকম ; অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ভারতীয় দৃষ্টিতে ভিন্ন রকম।

১৫.২ ১৮৬১-র ফুলাগুড়ি অভ্যুত্থান (The Phulaguri Uprising of 1861)

১৫.২.১ প্রেক্ষাপট : ব্রিটিশ কর প্রণালী (Background : British Taxation Policy)

ইতিপূর্বে (১৫.১.১০) উল্লেখ করা হয়েছে কীভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে ব্রিটিশ সিংহাসনের উপর ভারত শাসনের দায়িত্বভারকে কেন্দ্র করে কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডারদের ক্ষতিপূরণ দান সংক্রান্ত খরচ এবং ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করার জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব ভারতীয়দের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আসামে এই অর্থ অন্যায়ভাবে আদায় করা হয়েছিল নিত্য-নতুন করের মাধ্যমে। সেই সময় James Wilson নামে একজন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ এবং ইংল্যান্ডের ট্রেজারির Financial Secretary-কে ভারতবর্ষে ভাইসরয়ের Executive Council-এ Financial Member হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। Wilson ভারত এসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন : (১) কাগজের মুদ্রার প্রবর্তন, (২) লাইসেন্স ট্যাক্স চালু এবং (৩) ১৮৬০ সালে ইনকাম্ ট্যাক্স বা আয়কর প্রচলন। এর ফলে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানারকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। প্রথম খণ্ডে মণিরাম দেওয়ান (১২.৩ দ্রষ্টব্য) প্রসঙ্গে আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে কীভাবে ১৮৫৩ সালেই (অর্থাৎ মহাবিদ্রোহের আগেই) A. G. Moffat Mills-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে মণিরাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে আসামের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা অবগত করেছিলেন। আসলে, কোম্পানির সময়েই সোমগাছে (যাতে মুগা গুটি জন্মায়) রাজস্ব প্রচলন, কামরূপ, নওগাঁও, দরং প্রভৃতি জেলা সদরগুলিতে আবগারি শুল্ক প্রবর্তন এবং আহোম-শাসনে বন থেকে যে সব সামগ্রী বিনা-শুল্কে সাধারণ মানুষ সংগ্রহ করত তার উপরও নানারকম বাধানিষেধ ও 'গোরখাটি' কর প্রবর্তনকে কেন্দ্র করে সমাজে উত্তেজনা এমনিতেই ছিল। মহাবিদ্রোহের পরে আবার নতুন করে কিছু কর প্রবর্তিত হল।

নতুন কর, যত তুচ্ছই হোক, মানেই মানুষের অসন্তোষ। পুরনো কর কিন্তু সেভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করে না ; কারণ প্রবাদ আছে "An old tax is no tax" ১৮৮০-তে W. W. Hunter মন্তব্য করেছিলেন "Mèn must have enough to live upon before they can pay taxes." কিন্তু Hunter সাহেবের এই সতর্কীকরণে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তেমন গুরুত্ব আরোপ করেননি। আসলে, ভারতের

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আসামে বিভিন্ন সামগ্রীতে কর আরোপের সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। ব্রিটিশ শাসনে বাইরে থেকে লবণ আমদানি হলেও (যদিও দাম ছিল নগণ্য) প্রায় করমুক্ত ছিল। ১৮৩৫ সালে Customs duties প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। প্রধানত ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধিই ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য। এছাড়া যেসব কর আদায় করা হত সেগুলি হল ঃ আফিং, গাঁজা, মদ ইত্যাদির উপর জেলা সদর ছাড়াও সর্বত্র আবগারি শুল্ক, স্ট্যাম্প কর, ফেরি-কর, মাছ ধরার ক্ষেত্রে জল-কর, লাইসেন্স কর, আয়কর, গো-চারণ ভূমির জন্য 'ঘুসারি কর', বাঁশ-বেত-নল-খাগড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রেও নানা ধরনের বন-কর ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায়, নানা রকম করের বাঁধনে সাধারণ মানুষের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। ফুলাগুড়ি বিদ্রোহ এইসব নিত্য নতুন করের বিরুদ্ধে ছিল মূর্ত প্রতিবাদ। বিদ্রোহের প্রসঙ্গে আসার আগে আফিম-চাষ নিষেধাজ্ঞা এবং ভূমিরাজস্ব সহ কয়েকটি করের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত দরকার।

১৫.২.১.১ আফিম প্রশ্ন (The Opiuim Question)

যেহেতু ফুলাগুড়ি অভ্যুত্থান ছিল প্রধানত আফিম-চাষ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ, এজন্য আফিম প্রশ্ন নিয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে (৫.২.৬) কীভাবে আসামে আফিম চাষ প্রবর্তিত হল সেই সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আফিম গ্রহণের এই ব্যাধি যে কীভাবে অসমিয়া সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল সেটিও আলোচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আসামে আফিম চাষ প্রবর্তনের প্রশ্নটি আজও রহস্যাবৃত। শংকরদেব প্রবর্তিত নব-বৈষ্ণব আন্দোলনের সময় আফিম অনেকের কাছেই অজানা ছিল এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। নিম্ন-আসামে মুঘল সিপাইদের হাত ধরেই সম্ভবত আফিম আসামে প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৮২৬ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত কি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, কি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কেউই আসামে আফিম নেশার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। সম্ভবত সেই সময় আসাম সহ আশপাশের অঞ্চল দখলই ছিল ব্রিটিশ শাসকদের মূল উদ্দেশ্য। যেখানে ফুলাগুড়ি অভ্যুত্থান ঘটেছিল সেই নওগাঁও জেলাতেই ১৮৫০ সালে ২,৫০০ একর জমিতে আফিম চাষ হত এবং সমকালীন ব্রিটিশ ডিস্ট্রিক্ট অফিসারের হিসাব অনুযায়ী, আসামের ছয়টি জেলায় ১২,৫০০ একর জমি আফিম চাষের জন্য বরাদ্দ ছিল। যেহেতু নওগাঁও জেলাতেই সবচেয়ে বেশি আফিম উৎপাদন হত এবং Tiwa বা Lalung

জনগোষ্ঠী ছিল এব্যাপারে অগ্রণী এরই জন্য ঐ জেলার ফুলাগুড়িতে মূলত লালুং-দের নেতৃত্বেই ১৮৬১ সালে অভ্যুত্থান ঘটেছিল।

ব্রিটিশ আদায়ীকৃত আবগারি শুল্ক মোটামুটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ একটি আসত আফিম থেকে এবং অন্যটি মদ, গাঁজা ইত্যাদি থেকে। কিন্তু আবগারি শুল্কের ছয় ভাগের মধ্যে পাঁচ ভাগই আসত আফিম থেকে। এরই জন্য ব্রিটিশ শাসকদের কাছে আসামের আফিম ছিল 'কালো সোনা'। আসামের কৃষকের কাছেও আফিম চাষ ছিল জরুরি ; কারণ সেটি বিক্রি করেই নগদ অর্থ পাওয়া যেত এবং নগদ অর্থ ছাড়া খাজনা দেওয়া যেত না। ব্রিটিশ শাসনে ভূমি রাজস্ব-ব্যবস্থা এমনভাবেই চালু হয়েছিল যাতে কৃষক সময়মতো নগদ অর্থে খাজনা দিতে বাধ্য থাকে (আহোম যুগে কিন্তু এমনটি ছিল না)। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কেন ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ সরকার আসামে আফিম চাষ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল? এই সিদ্ধান্ত কি আসামের মানুষের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে? সমকালীন আসামের বেশ কিছু বড়ো মাপের সমাজদরদি ব্যক্তিত্ব 'কল্যাণকামী' ব্রিটিশ শাসকদের তথাকথিত 'মহানুভবতায়' মুগ্ধ হয়ে ব্রিটিশ-বন্দনায় মুখরিত হয়েছিলেন। আসলে আসামে আফিম চাষ নিষিদ্ধ করার কারণটি লুকিয়ে ছিল অন্যত্র। ১৮৫১ সালে ব্রিটিশরা উত্তরভারত থেকে আসামে আফিম আমদানি বাণিজ্য শুরু করেছিল। ঐ বাণিজ্যে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যই আসামে ১৮৬০ সালে আফিম চাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আফিম চাষ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও আফিম-সেবন কিন্তু নিষিদ্ধ ছিল না ; বরং সরকার এই ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। ভারত থেকে জাহাজে আফিম রপ্তানি করে কীভাবে এই একই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিনের বন্ধ দরজা ১৮৩৯-এ শুরু হওয়া 'আফিম যুদ্ধের' মাধ্যমে জোর করে খুলেছিল এবং কীভাবে মাত্র ২০ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'চিনে মারণের ব্যবসা' প্রবন্ধে এই ঘৃণ্য ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের ধিক্কার দিয়েছিলেন সেইসব কাহিনিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

পোস্ত বা আফিম চাষ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে একদিকে যেমন কৃষক নগদ অর্থ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হল (বিশেষত নওগাঁও-র লালুং সম্প্রদায় যারা আফিম চাষে অগ্রণী ছিল এবং ফুলাগুড়ি অভ্যুত্থানেও সর্বাগ্রে ছিল) ; তেমনি অপরদিকে, আফিমের বিরুদ্ধে বেসরকারিভাবে নানারকম প্রচার সত্ত্বেও, আফিম-সেবন কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে কমল না। C. F. Andrews তাঁর *The Opium Evil in India : Britain's Responsibility* গ্রন্থে দেখিয়েছেন ব্রিটিশ সরকার কীভাবে আসামে ১৮৭৫ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত আফিম থেকে রাজস্ব ৩৫০ শতাংশ বৃদ্ধি

করেছিল ; অন্যদিকে ঐ সময়ের মধ্যে সমগ্র আসামে আফিম-সেবনের পরিমাণ কমেছিল মাত্র ১৩ শতাংশ। ক্রমাগত আফিমের দাম বৃদ্ধির ফলেই এই বিপুল পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ সম্ভবপর হয়েছিল। আফিমের দাম বাজারে ১৮৬০ সালে ছিল প্রতি সের ১৪্, ১৮৬২ সালে ২০ এবং ১৮৭৩ সালে ২৩ টাকা। প্রকৃত পক্ষে, ব্রিটিশ সরকার কিন্তু মনে-প্রাণে কোনো সময়েই আফিম-সেবন নিষিদ্ধ করতে চায়নি। চা-বাগানের ইউরোপীয় মালিকরা কীভাবে চা-শ্রমিকদের আফিম দেখিয়ে প্রলুব্ধ করতেন এবং নেশাগ্রস্ত শ্রমিকদের শোষণ করতেন অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ তাঁর *Planter Raj to Swaraj* গ্রন্থে সেটি দেখিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ Royal Commission on Opium (1893)-এর সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নওগাঁওর জনৈক আইনজীবী জানিয়েছিলেন, ঐ জেলার নিম্ন শ্রেণির বেশিরভাগ মানুষ তাদের রোজগারের ১০ থেকে ২০ শতাংশ আফিমের জন্য সাধারণত ব্যয় করেন। চা-বাগানের জনৈক সাহেব মালিক S. E. Peal-এর ভাষ্য অনুযায়ী, প্রায় ২০০ বর্গমাইল দূর এলাকা থেকে নিযুক্ত চা-শ্রমিকদের ১৮৬৩ থেকে প্রায় দশ/বারো বছর তিনি নিয়মিত ৪০ পাউন্ড আফিম দিতেন, যার ফলে শ্রমিকরা অর্ধেক বেতন পেতেন। আর একজন সাহেব E. P. Gilman কমিশনকে জানিয়েছিলেন, তিনি আসামের গ্রামের মানুষের কাছে আফিম বিক্রি করতেন। আর একজন দেশীয় চা-বাগানের মালিক হরিবিলাস আগরওয়ালা (১৮৪২-১৯১৬) স্বীকার করেছিলেন, কীভাবে সরকারের অনুমতি নিয়ে তিনি লোভনীয় আফিমের কারবার করতেন, যদিও তিনি নিজে আফিমের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমানোর পক্ষপাতী ছিলেন। অমলেন্দু গুহ-র ভাষায় ঃ "As long as opium was not a contraband commodity and money put into it paid dividends, there was no dearth of distributors of the drug." এইভাবে আমরা দেখি, ব্রিটিশ সরকার আসামে আফিম চাষ নিষিদ্ধ করলেও আফিমের ফলাও ব্যবসার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল!

সমকালীন আসামের বুদ্ধিজীবীদের সকলেই যে আফিম গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাধির বিরুদ্ধে একমত পোষণ করতেন, এমনটা নয় ; বরং কেউ কেউ আফিম-সেবন সমর্থনই করতেন। মণিরাম দেওয়ান (১২.৩ দ্রষ্টব্য), আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১২.৪ দ্রষ্টব্য), রাধানাথ চ্যাংকাকতি-র মতো গুটিকয়েক উদীয়মান মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর কথা বাদ দিলে, জগন্নাথ বরুয়া (১৭.২৬ দ্রষ্টব্য), দেবীচরণ বরুয়া, মাধবচন্দ্র বরদোলই-এর মতো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আফিম গ্রহণের পক্ষেই মতামত ব্যক্ত করতেন। কলকাতায় Royal Commission on Opium

(১৮৯৩)-এর সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে জগন্নাথ বরুয়া মন্তব্য করেছিলেন ঃ "Opium is a necessity in a jungly and malarious province like Assam" মাধবচন্দ্র বরদোলই উচ্ছ্বসিত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন ঃ "....Opium is one of the choicest gifts of Heaven which God has vouchsafed for the relief of suffering humanity." এইভাবে সমর্থনপুষ্ট হয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত কুড়ি বছরে আসামে মোট ৩১,৩৯২ মন আফিম বিক্রি করে ৩,১৪,৫৫,৫৭৬ টাকা এবং বিক্রেতাদের কাছ্ থেকে লাইসেন্স ফি বাবদ ৪৭,৬০,৬৫৭ টাকা অর্থাৎ মোট ৩,৬২,১৬,২৩৩ টাকা রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। এরই জন্য Ramesh Chandra Kalita আসামে আফিম-সংক্রান্ত তাঁর গবেষণামূলক এক প্রবন্ধে যথার্থই মন্তব্য করেছ্নে ঃ

> *Thus the suppression of the poppy cultivation in Assam in May 1860 was the result of meticulous prepartion and planning done at the official level so as to raise a large revenue and push down the Assamese people to a state of chattel slavery mostly of the tea planters.*

১৫.২.১.২ কৃষকের উপর আসামের ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব নীতির প্রভাব (Impact of the British Land Revenue Policy in Assam on the Peasantry)

ব্রিটিশ যুগে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্বই ছিল প্রধান। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে আহোম যুগের অর্থনৈতিক চিত্র আলোচিত হয়েছে। আহোম যুগের পাশে ব্রিটিশ যুগের চিত্রটি সংযোজিত হলে দুই যুগের পার্থক্যটি স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাবে। H. K. Barpujari তাঁর *Assam : In the Days of the Company* গ্রন্থে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় অনুসৃত নীতির আলোচনা করেছ্নে। প্রথমদিকে David Scott আহোম যুগের "খেল" ব্যবস্থা পুরোটা অবলুপ্ত না করে কিছুটা সংশোধন করেছিলেন, তবে দীর্ঘদিনের প্রচলিত ব্যক্তিগত শ্রমদান ইত্যাদির স্থলে সময়মতো নগদ অর্থে জমির বরাদ্দ খাজনা মিটিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি নিম্ন আসামে চালু করেছিলেন। এছাড়া তিনি নিম্ন আসামে পুরাতন 'পাইক' আধিকারিকদের (যেমন, বোরা, শইকিয়া, হাজারিকা ইত্যাদি) খাজনা আদায়ের এবং সংগৃহীত পুরাতন কাগজপত্রের উপর নির্ভর করে জমির রাজস্ব নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ করেছলেন। নিম্ন ও উর্ধ্ব সহ সমগ্র উপত্যকা শাসনতন্ত্রের সুবিধার জন্য প্রথমদিকে পাঁচটি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল ঃ গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরং, নওগাঁও এবং লখিমপুর। শিবসাগর অঞ্চলটি ১৮৩৩ সালে আহোম-রাজা

পুরন্দর সিংহ-কে নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বকেয়া খাজনা ইত্যাদি নানারকম অভিযোগ তুলে ১৮৩৯-এ তাঁকে উৎখাত করা হয়েছিল এবং শিবসাগরকে ব্রিটিশশাসিত ষষ্ঠ জেলায় পরিণত করা হয়েছিল। ব্রিটিশ অধিকৃত পার্বত্য এলাকাগুলিকেও পরবর্তী সময়ে জেলায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। জমির মাপ ও খাজনা নির্ধারণ সর্বত্র একরকম ছিল না, বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকম মাপকাঠিতে এটি করা হত। জমির চেহারাও সর্বত্র একরকম ছিল না। সমতলে স্থায়ী কৃষি এবং পাহাড়ে জুম-ভিত্তিক অস্থায়ী কৃষি প্রচলিত থাকায়, পাহাড়ের ক্ষেত্রে House Tax বা ঘর-চুক্তি কর আদায় করা হত। চা-বাগান এলাকা ছাড়া সমতলে কৃষি জমির পরিমাণ ১৮৮১-৮২-তে ছিল মোটামুটি ১৩,৩৫,০০০ একর। ১৮৯১-৯২-তে এই পরিমাণ প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯০১-০২-তে আরও প্রায় ৪ শতাংশ জমি কৃষির আওতায় আসে।

লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় থেকে (১৭৮৬-৯৩) সময়মতো নগদ অর্থে খাজনা আদায়ের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ব্রিটিশ যুগে সমগ্র দেশে নানা ধরনের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চালু ছিল। যেমন, জমিদারি, রায়তওয়ারি, মহলওয়ারি, মাল-গুজারি ইত্যাদি। আসামে শুধুমাত্র গোয়ালপাড়া ও কাছাড় জেলায় অবিভক্ত বঙ্গের মতো জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। আসামের বাকি সমতলে মাদ্রাজ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের মতো রায়তওয়ারি ব্যবস্থার মাধ্যমে জমির খাজনা আদায় করা হত। আহোম যুগে আসামের কৃষক শ্রেণি মোটামুটি ভাবে স্বাবলম্বী ছিল এবং 'খেল', 'মেল' ইত্যাদি নানা ব্যবস্থার জন্য কৃষকের উপর অন্যায় বা অত্যাচার ইত্যাদি হলে কিছুটা প্রতিবিধানেরও সুযোগ ছিল। কিন্তু রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় সেগুলি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে শুরু করল।

রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় কৃষকের দুর্দশা

ব্রিটিশ প্রবর্তিত রায়তওয়ারি ব্যবস্থার ফলে আসামে কৃষকের দুর্দশা ক্রমেই বাড়তে শুরু করল। প্রথমত, ফসল হোক বা নাই হোক্, নগদ অর্থে সময়মতো খাজনা-প্রদান ব্যাপারটি ছিল আসামের কৃষকের কাছে একেবারে নতুন। এই অপরিচিত ব্যবস্থা আয়ত্ত করতে অনেকের কালঘাম ছুটে যেত। Macfarlane-এর ভাষায় ঃ

> *The relaxed Ahom methods of tax collection in service or produce was replaced by an army of revenue 'farmers' trampling the country bearing demand papers totally incomprehensible to the illiterate peasantry.*

বাজার-ব্যবস্থা সেই সময় তেমন গড়ে ওঠেনি। সমকালীন বিবরণে দেখা যায়, গ্রামের কৃষককে তার পণ্য বাজারজাত করতে হলে একনাগারে দু-তিনদিন হেঁটে দূরের কোনো হাটে যেতে হত। তাছাড়া আফিম চাষ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে কৃষকের কাছে বাণিজ্যের জন্য তেমন উদ্বৃত্ত cash crop বা নগদ বিক্রয়যোগ্য ফসলও থাকত না। দ্বিতীয়ত, 'scarcity of coins as circulating media' বা মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা ছিল আর এক সংকট। আহোম যুগেও মুদ্রা ছিল, কিন্তু সেটি দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্য নয়। তাছাড়া আহোম মুদ্রা ছিল সোনা, রূপা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর, যার একটি নিজস্ব মূল্য ছিল। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৬১ সালে প্রথম ১০ টাকার কাগজি নোট (paper money), ১৮৬৪ সালে ২০ টাকার নোট, ১৮৭২ সালে ৫ টাকার নোট ইত্যাদি প্রচলনের সাথে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি, আসামে মুদ্রা বা নোট-এর সরবরাহ ছিল একেবারেই নগণ্য। ফলে, জমির খাজনা ইত্যাদি মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কৃষকের পক্ষে নগদ অর্থ সংগ্রহ করাই ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। অমলেন্দু গুহ তাঁর 'Colonization of Assam' প্রবন্ধে এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন। আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত অসমিয়া পত্রিকা *অরুণোদয়*-এও এই অসুবিধার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ আছে। মুদ্রার এই স্বল্পতার সুযোগ কিছু অসৎ ব্যবসায়ী গ্রহণ করত, যারা অতিরিক্ত সুদে কৃষকদের খাজনা পরিশোধের জন্য নগদ ঋণ দিত এবং অনেক সময় ঋণ শোধ করতে না পেরে কৃষক তার জমি-জায়গা ছেড়ে পলাতক হতে বাধ্য হত। তৃতীয়ত, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন-এর মতো আসামের আলোকদীপ্ত বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গদেশের জমিদারি প্রথার তুলনায় বরং রায়তওয়ারি প্রথাকে সমর্থন করতেন কারণ জমিদারের অত্যাচার থেকে প্রজাদের তুলনামূলকভাবে মুক্ত থাকার সুযোগ রায়তওয়ারি প্রথায় বেশি। এই প্রথায় প্রত্যক্ষভাবে সরকার এবং রায়ত বা কৃষকের মধ্যে ব্যবস্থাটি সীমাবদ্ধ থাকে, অত্যাচারী জমিদারের মতো মধ্যস্থকারীর কোনও ভূমিকা নেই। কিন্তু ঢেকিয়াল ফুকনরা সম্ভবত কল্পনা করতে পারেননি, ব্রিটিশ সরকার নিজেই অত্যাচারী জমিদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। জমির খাজনার পরিমাণ মাঝে মাঝেই জরিপের সময় অত্যন্ত উঁচুতে বেঁধে দেওয়া হত। রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় জমির প্রকৃত মালিক সরকার, ফলে কৃষক ছিল occupancy tenants বা জমি বিক্রির অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং একমাত্র ভোগদখল স্বত্বের অধিকারী প্রজা মাত্র। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে (৪.১২) আহোম শাসনে আসামের জমিকে কীভাবে 'রূপিত', 'ফড়িংগতি', 'সরিয়াতলি', 'কঠিয়াতলি', 'বাওতলি', 'জলাতক', 'দলনি', 'উবর-মাটি', 'গা-মাটি' ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ

করে ভূমি রাজস্বের প্রশ্নটি বিবেচিত হত, সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে জরিপের নামে প্রায়ই সমস্তরকম ভূমির ক্ষেত্রেই রাজস্ব খুশিমতো বৃদ্ধি করা হত। এরই জন্য ব্রিটিশ শাসিত আসামের ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে *The Cambridge Economic History of India*-র দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ১১৯-২০) মন্তব্য করা হয়েছে ঃ

> *...the government itself exercised the powers of a zamindar, and the way the revenue demand was increased, the context in which such increases were enforced and their consequences for the peasantry, were distinctive.*

একদিকে চা-বাগানের এলাকা ইউরোপীয় সাহেবরা যাতে খুশিমতো বৃদ্ধি করতে পারে সেজন্য প্রায় বিনা রাজস্বে তাদের ভূমিদান এবং অন্যদিকে আসামের কৃষকদের উপর ১৮৩২ থেকে মাঝে মাঝেই জরিপের নামে খাজনার চাপ বৃদ্ধি করে বিমাতৃসুলভ আচরণ—এই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল ব্রিটিশ-শাসিত আসামে ভূমি-ব্যবস্থার মূল নির্যাস। একবারও কিন্তু জমির প্রকৃত উন্নয়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ ব্রিটিশ শাসনে গৃহীত হয়নি, যেটি কিছুটা আহোম-শাসনে ছিল। ঊনবিংশ শতকের ভারতবর্ষে আসামের মতো এমন উর্বর মাটি অন্যত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন, অথচ আসামের মতো এমন দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক খুবই কম অন্যত্র দেখা যায়। অসমিয়া ঐতিহাসিক শ্রুতিদেব গোস্বামীর ভাষায় ঃ

> *Complete protection of the peasants from oppression had been a mere dream in Assam under the British. Undoubtedly there were perhaps very few people in India whom nature had bestowed a more fertile soil, and a country better adapted for the production of almost all kinds of articles of trade, but there were very few people in the nineteenth century whose conditions had been more deplorable.*

১৫.২.১.৩ কেন এত কৃষক-বিরোধী ভূমি-ব্যবস্থা?

যে প্রশ্নটি স্বাভাবিক কারণেই ওঠে কেন আসামে ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমি-ব্যবস্থা বা অন্যান্য নীতি এত কৃষক-বিরোধী? শুধু কি রাজস্ব বৃদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য ছিল, না কি অন্য কিছু? আসলে, আসামে চা-সাম্রাজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৮৩৮ সালে Wasteland Rules চালু হয়েছিল, যার অর্থ ছিল পতিত জমির দোহাই দিয়ে প্রায় বিনা পয়সায় ইউরোপীয়দের মধ্যে জমি-বণ্টন এবং ১৮৭০-৭১ পর্যন্ত ব্রিটিশ

বাগান-মালিকরা প্রায় ৭ লক্ষ একর জমির স্বত্ব পেয়েছিলেন। কিন্তু এত বিশাল এলাকার মধ্যে মাত্র ৫৬,০০০ একর প্রকৃতপক্ষে চা-উৎপাদনের জন্য (অর্থাৎ মাত্র ১/৮ বরাদ্দ জমি) ব্যবহৃত হত, বাকি অংশ বন সম্পদ, কৃষি ইত্যাদির জন্য বাগান-মালিকরা রেখে দিতেন। ১৮৪০ সালে Assam Tea Company, ১৮৫৯ সালে Jorhat Tea Company ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, বিশ্ব-বাজারে আসামের চায়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টির ফলে চা ছাড়া সেই সময় আসামে ব্রিটিশ শাসকদের কাছে অন্যান্য প্রশ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে হয় না। প্রথমদিকে স্থানীয় মানুষের শ্রমের উপর নির্ভর করেই চা-বাগানগুলি তৈরি হচ্ছিল এবং এব্যাপারে স্থানীয় মানুষের দক্ষতা ও কর্মকুশলতায় Assam Company-র Director-রা কত মুগ্ধ হয়েছিলেন সেটি ১৮৪২ সালে তাঁদের রিপোর্টেই প্রমাণিত ঃ

> *The excellent quality of tea and its improvement since it has been made by the Assamese...fully justifies the expectation that the labouring population of Assam will eventually furnish numerous and skilled-in-the-art-labourers for the purpose of manufacture on a very extended scale.*

১৫.২.১.৪ ভিন্ন ধরনের জমিদারি

কিন্তু চা-বাগান এলাকা প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে আরও অনেক দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। স্থানীয় মানুষ চা-বাগানের শ্রমিক হওয়ার ব্যাপারে মূলত দুটি কারণে অনিচ্ছুক হতে শুরু করে। প্রথমত, শ্রমিকের নামমাত্র মজুরি (যেমন, ১৮২৪ সালে মাসে এক টাকা, ১৮৩৯ সালে মাসে আড়াই টাকা, ১৮৫৮ সালে মাসে সাড়ে চার টাকা, অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে মাসে ছয় টাকা মজুরি মিলত)। দ্বিতীয়ত, চা-বাগানের বন্দিজীবন এবং কর্তৃপক্ষের অত্যাচার। আসলে, আসামের প্রতিটি চা-বাগান ছিল প্রকৃতপক্ষে বাগান-মালিকের জমিদারি এবং শ্রমিকরা (যাদের 'কুলি' বলা হত) তারা ক্রীতদাস না হয়েও শ্রমদাসের জীবনযাপন করত। এরই জন্য Alan ও Iris Macfarlane তাঁদের *Green Gold : The Empire of Tea* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ "The gap between the high life and huge profits of the British and the squalor and the misery of labourers was most obscene in the nineteenth century"। ইউরোপীয় বাগান-মালিকদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একদিকে যেমন আফিম চাষ নিষিদ্ধ

করেছিল যাতে ঐ চাষের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা অবশেষে চা-বাগানের শ্রমিক হতে বাধ্য হয়, একই কারণে ভূমি-রাজস্বও মাত্রাতিরিক্ত ভাবে ঘনঘন বৃদ্ধি করত, যাতে বিপন্ন কৃষক জমি ছেড়ে অবশেষে চা বাগানে হাজিরা দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তাই একদিকে যেমন চা-বাগানে কাজ করার জন্য আসামের বাইরে থেকে শ্রমিক আনা জরুরি হয়ে পড়ল, তেমনি আসামের অভ্যন্তরে একটার পর একটা কৃষক অভ্যুত্থান দমন করাও কঠিন হয়ে উঠল।

শুধু যে চা-বাগানেই পরোক্ষে জমিদারি ব্যবস্থা কায়েম করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত হল তা নয়। ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যে মধ্যস্থতাকারীর বিতর্কিত ভূমিকার জন্য একসময় আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের মতো বুদ্ধিজীবীরা একদিন আসামে চিরস্থায়ী জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধিতা করেছিলেন, সেই মধ্যস্থতাকারী কিন্তু রায়তওয়ারি ব্যবস্থারও হাত ধরে আবির্ভূত হল। নিম্ন আসামে এঁদের বলা হত 'মৌজাদার', 'চৌধুরি', 'পাটগিরি' ইত্যাদি এবং উর্ধ্ব আসামে এদের নাম ছিল 'মণ্ডল টেকালা' (রাজস্ব কালেক্টর) 'গাঁওবুড়া' (গাঁয়ের মোড়ল) ইত্যাদি। যদিও নগদ অর্থে সময়মতো রাজস্ব আদায়ের জন্যই এইসব পদ একদিন সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে এরাই প্রায় জমিদারের সমকক্ষ প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হলেন এবং এদের সমর্থনের উপর ভিত্তি করে আসামের সমাজে ব্রিটিশ প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ল।

আহোম যুগে যেসব কৃষি জমি 'দেবোত্তর', 'ধর্মোত্তর', 'ব্রহ্মোত্তর' ইত্যাদি নামে নিষ্কর 'লাখিরাজ' হিসেবে বিভিন্ন সত্রকে দেওয়া হয়েছিল, ব্রিটিশ শাসকরা সেটি অক্ষত রেখেছিল। ঐসব বৈষ্ণব সত্র যাতে ব্রিটিশ শাসনকে নিঃশর্তভাবে সমর্থন করে সেটি আদায়ের উদ্দেশ্যেই এটি করা হয়েছিল। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঐসব সত্রের সত্রাধিকার সত্রের জমিতে কর্মরত গরিব কৃষকদের সাথে জমিদারের মতো আচরণ করতেন, যেটি *Vaishnavite Zamindari Class* নামে পরিচিত। এটি সত্য, ১৮৪৩ সালে দীর্ঘদিন আসামে প্রচলিত দাস-ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করে ব্রিটিশ শাসকবর্গ অনেকেরই অভিনন্দন অর্জন করেছিলেন। দাস-ব্যবস্থা অবলুপ্ত হওয়ার ফলে আসামের অভিজাতদের মতো বৈষ্ণব সত্রগুলিও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আসলে, বন্ধনমুক্ত পূর্বতন দাসদের শ্রম-নির্ভর চা-বাগানে যুক্ত করার লক্ষ্যেই দাস-ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের সেই উদ্দেশ্য তেমন সফল হয়নি। মুক্ত দাসরা চা-বাগানে আকৃষ্ট না হয়ে বরং চিরদিনের অভ্যস্ত কৃষি জমিতেই ভিড় করতে শুরু করল। যথেষ্ট মূলধনের অভাবে জমির মালিক

হওয়ার পরিবর্তে পূর্বতন দাসরা হয় ভাগচাষি বা কৃষি মজুরে পরিণত হল অথবা যেসব অধমর্ণ ঋণ-গ্রহণের জন্য উত্তমর্ণের শ্রমদাস ছিল এবং নিজেকে বন্ধক রেখেছিল তাদের আর মুক্তিই হল না, কারণ ১৮৫৯ সালে নতুনভাবে Workmen's Breach of Contract Act পাস হল, যার শর্ত অনুযায়ী, অধমর্ণ চুক্তির খেলাপ করলে কঠিন শাস্তি বরাদ্দ ছিল। এরই জন্য দাস-ব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে অবলুপ্ত হলেও দাসদের প্রকৃত মুক্তির প্রশ্নটি অসমাপ্তই রয়ে গেল।

১৫.২.১.৫ ফুলাগুড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের মূল কারণ

উপরোক্ত সামগ্রিক পরিস্থিতির পটভূমিতেই ফুলাগুড়ি কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। একদিকে আফিম চাষ নিষিদ্ধ, অন্যদিকে ভূমি-রাজস্ব সহ অসংখ্য করের বন্ধন ও ক্রমাগত বৃদ্ধি, আদায়কারীদের অত্যাচার, চা-বাগানের ইউরোপীয় মালিকদের বৈরী আচরণ ও শোষণ ইত্যাদি নানা কারণে কৃষক উত্তেজনা যখন দিনদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সেইসময় নওগাঁও জেলায় রটে যায় যে, ব্রিটিশ সরকার পাহাড়ের মতো সমতলেও প্রত্যেক ঘর-বাড়ি সহ বাগান এবং পান চাষ ও সুপারির উপরও নতুন করে কর প্রবর্তন করতে যাচ্ছে। যদিও স্থানীয় ইংরেজ অফিসাররা এটিকে 'গুজব' বলে এককথায় বাতিল করে দেন, তথাপি রেভিনিউ বোর্ড ও জেলা কর্তৃপক্ষের মধ্যে এই নতুন কর প্রবর্তনকে কেন্দ্র করে লেখালেখি চলছিল সেটি সমকালীন নওগাঁও-র ডেপুটি কমিশনার (ডি.সি.) Herbert Sconce-র বয়ান থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। আসামের মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতিতে পান-সুপারির মতো তথাকথিত তুচ্ছ জিনিসও কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে সেটি অজানা নয়। ফুলাগুড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের সময় আসামের কমিশনার হেনরি হপকিন্‌সন মন্তব্য করেছিলেন যে, কত টাকা নতুন কর চাপানো হল সেটি বড়ো কথা নয়, বা যে ভঙ্গিতে এটি আদায় করা হত সেটিও নয়, বরং যে নীতির বশবর্তী হয়ে সরকারিভাবে প্রত্যেক মানুষের সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করা হত (তাদের দৃষ্টিতে আজ চার শতাংশ, পরে হয়তো চল্লিশ শতাংশ) তাতেই আসামের মানুষ প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়েছিলেন। Hopkinson-এর ভাষায় ঃ

> *...I do not think that it is the amount levied from them...not much the manner in which it has been collected, but it is the principle on which, in their understanding it is based that has so greatly alarmed them, they regard it as an assumption of the right of the dominant power to make inquisition into...everyman's property, four percent now, forty per cent hereafter perhaps.*

Hopkinson-এর এই মূল্যায়নের সাথে তৎকালীন বাংলার ছোটলাট Sir Cecil Beadon মোটেই একমত ছিলেন না এবং তিনি উপরোক্ত মন্তব্যকে "sweeping conclusions" বলে বাতিল করে দিয়েছিলেন। Beadon-এর ধারণা অনুযায়ী, ব্রিটিশ করনীতি বা হস্তক্ষেপের নীতির জন্য নয়, বরং স্থানীয় কিছু কারণ সহ অবস্থাটি মোকাবিলায় ইংরেজ আধিকারিকদের অভাবের জন্যই ফুলাগুড়িতে উত্তেজনা ঐভাবে বিস্ফোরিত হয়েছিল। Beadon সাহেব ফুলাগুড়ি অভ্যুত্থানকে "law and order problem" বা আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করলেও এটি যে ঔপনিবেশিক জাতি-বৈরিতাকে সমর্থনপুষ্ট করার জন্য তথাকথিত 'উন্নয়ন মডেল'-এরই বহিঃপ্রকাশ, অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ অনেক তথ্য সহ সেটিই প্রমাণ করেছেন। এই 'মডেল'-র নির্যাস হল ঃ ইউরোপীয় বাগান-মালিকরা ক্ষিপ্র, তৎপর ও প্রগতিশীল (চিরাচরিত অলস আহোম অভিজাতদের বিপরীত) এবং আসামের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বাইরের মূলধন ও উদ্যোগ আনতে সক্ষম, সুতরাং এইসব 'প্ল্যান্টার'দের সমাজের সর্বক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি (যেটি পরবর্তী সময়ে বেন্টিংকের শাসনকালে ১৮৮২-র সংস্কার অনুযায়ী 'প্ল্যান্টারদের' স্থানীয় 'লোক্যাল-বোর্ড'-এর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা করার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল) অন্যদিকে ইংরাজ কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, দীর্ঘসূত্রী ও আফিমে নেশাগ্রস্ত নিষ্ক্রিয় আসামের কৃষককে তাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রা থেকে দ্রুত টেনে এনে চা-বাগানের শ্রমিক হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা আবশ্যক। ঔপনিবেশিক শাসনে এই তথাকথিত 'উন্নয়ন-মডেল' অনুসরণ করার জন্যই আফিম-চাষ নিষিদ্ধ হয়েছিল (যদিও আফিম গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়নি) এবং ভূমি-রাজস্ব সহ অন্যান্য হরেকরকম কর খুশিমতো গ্রামীণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং এরই বিরুদ্ধে ফুলাগুড়ি সহ একাধিক কৃষক বিদ্রোহ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। গুহ'র ভাষায় ঃ

> *A colonial theory of development was thus there to rationalize discrimination. Its premises were that special concessions to the planters were necessary to attract capital, labour and enterprise which alone could bring the wastelands under cultivation, that heavy taxation was a necessary disincentive to the habitual 'laziness' of the local peasantay to force them to seek employment in plantations... (MECA,* p. 235*).*

১৫.২.১.৬ ফুলাগুড়ির ঘটনাবলী

নওগাঁও ও ফুলাগুড়ি

নওগাঁও শহর থেকে প্রায় ৯ মাইল দূরে একটি গ্রামের নাম ফুলাগুড়ি, মূলত Tiwa বা Lalung-দের বাসভূমি। মধ্য আসামের সবচেয়ে বড়ো জেলা নওগাঁও (প্রায় চার হাজার বর্গকিমি)-র মাটি অত্যন্ত উর্বর। এই জেলার অভ্যন্তরে প্রবাহিত কোলং, কোপিলি, যমুনা ইত্যাদি শাখানদীগুলি উত্তরদিকে ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশেছে। একসময় ঘন অরণ্য ও পাহাড়-ঘেরা এই অঞ্চলটিতে বারো ভুঁইয়া সহ ছোটো-বড়ো অনেক ভূপতির শাসন অব্যাহত ছিল। শ্রীমন্ত শংকরদেব-এর জন্মস্থান ও পুণ্যভূমি বোরদোয়া নওগাঁও শহর থেকে মাত্র ১৫ কিমি দূরে। সমগ্র জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের বিরাট প্রভাব আজও অপ্রতিহত। আসামে নবযুগের প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (প্রথম খণ্ড, ১২.৪ দ্রষ্টব্য), গুণাভিরাম বরুয়া (১৭.১৮ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি ব্যক্তিরা জীবনের একটা বড়ো অংশ নওগাঁও জেলাতেই কাটিয়েছেন। আসলে, উর্ধ্ব ও উত্তর আসামের মধ্যে (বর্তমান রাজধানী দিসপুর থেকে মাত্র ১২৩ কিমি দূরে) নওগাঁও একটি সেতু হিসেবে কাজ করে এবং ওখানকার ঘটনা সমগ্র রাজ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যেটি ফুলাগুড়ি ঘটনার সময়ও ঘটেছিল। বর্মী আক্রমণের পর ১৮২৬ সালে ইয়ান্দাবো চুক্তির সূত্র ধরে ব্রিটিশ শক্তি যখন আসামে আসে, সেইসময় বিধ্বস্ত ও ক্ষত-বিক্ষত সকল মানুষ কিছুটা স্বস্তিবোধ করেছিল, কারণ ব্রিটিশদের কাছ থেকে আসামের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল এবার হয়তো আসামে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু অচিরেই সেই প্রত্যাশা ধূলিসাৎ হল। কোলং নদীর ধারে ফুলাগুড়ি সহ সমগ্র নওগাঁও-এ ব্রিটিশ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে কয়েক বছর সময় লেগেছিল। ১৮৩৩ সালে নওগাঁও জেলা হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর নওগাঁও শহরে জেলা সদর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩৯ সালে। একসময় নাগা পাহাড়ের বেশিরভাগ অংশ ছাড়াও মিকির ও নর্থ কাছাড় হিলস্-ও ঐ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, যদিও পরবর্তী সময়ে পাহাড়ি এলাকাগুলি স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ও নওগাঁও-এর একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সবমিলিয়ে সমগ্র জেলাটি ছিল রীতিমত সচেতন ও সংগ্রামী। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ করেছি, সমগ্র আসামের মধ্যে নওগাঁও এলাকাতেই সবচেয়ে বেশি আফিম উৎপাদন হত। এরই জন্য আফিমচাষ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এখানেই।

আসামের তৎকালীন কমিশনার হেনরি হপ্‌কিনসন্ নওগাঁও-এর ডি.সি. Herbert Sconce-এর চিঠিপত্র এবং বেণুধর কলিতা-র *ফুলাগুড়ি ধাওয়া*-র উপর

নির্ভর করে আসামের এই প্রথম কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারি। প্রথমদিকে কালিয়াবর এলাকায় উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ১৮৬১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ঐ এলাকার ১৫০০ কৃষক সমবেত হয়ে সরকারের অন্যায় করনীতির বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ নওগাঁও ডি.সি.-কে জানানোর উদ্দেশ্যে সদরের দিকে অভিযান শুরু করেন। কিন্তু উগ্র প্রকৃতির Herbert Sconce ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের সাথে দেখা না করে তাঁদের অভিযোগ তাঁকে শ্রদ্ধা-প্রদর্শন পূর্বক দরখাস্তের মাধ্যমে জমা দিতে নির্দেশ দেন। এরপর ১৫ থেকে ২০ জন উত্তেজিত কৃষক জোর করে ডি.সি.-র চেম্বারে ঢুকে চিৎকার শুরু করলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। অবশেষে ধীর সিং নামে নওগাঁও-র এক ব্যবসায়ী জামিনে কৃষকদের মুক্ত করে নিয়ে যান।

দ্বিতীয় দফায় ৯ অক্টোবর, ১৮৬১-এ বেশ কিছু গাঁওবুড়া সহ কৃষকরা দরখাস্ত নিয়ে ডি.সি.-র অফিসের সামনে সমবেত হন। তাদের আবেদনপত্রে উল্লেখ ছিল, কীভাবে মাত্রাতিরিক্ত করবৃদ্ধি, আফিম চাষ নিষিদ্ধ ইত্যাদির ফলে এলাকার কৃষকরা বিপন্ন এবং এরপর ঘর-বাড়ি, বাগান, পান, সুপারি গাছের উপর নতুন কর চাপালে কৃষকরা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সহানুভূতির দৃষ্টিতে সমগ্র অবস্থাটি পর্যালোচনার অনুরোধ করেন। Sconce সাহেব দরখাস্তের উল্টোদিকে লিখে দেন, পান-সুপারিতে করধার্যের প্রশ্নে উপরের কোনও নির্দেশ তিনি পাননি। ব্যক্তিগতভাবে কৃষকের কথা না শুনে ডি.সি. বরং চিৎকার, চেঁচামেচির অভিযোগ এনে কিছু কৃষককে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

উপরোক্ত দুটি অভিজ্ঞতার পরই ফুলাগুড়িতে 'রেইজ-মেল' (অসমিয়া ভাষায় 'রেইজ' মানে জনগণ, এবং 'মেল' মানে সভা) এর অবিরাম অধিবেশন শুরু হল। যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তির অভিমত জানা প্রয়োজন এবং দূর-দূরান্ত থেকে মানুষের পৌঁছোতে সময় দরকার এরই জন্য দীর্ঘ পাঁচদিন ব্যাপী এই 'মেল' চলছিল। সরকারের বিরুদ্ধে আগের অভিযোগের সাথে দুর্ব্যবহারের প্রসঙ্গটিও যুক্ত হল। ডি.সি.-র কানে এত মানুষের সভার বার্তাটি যাওয়ার সাথে সাথে ১৪ অক্টোবর তিনি নওগাঁও সদর থানার দারোগাকে এইরকম 'মেল' অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। ১৫ অক্টোবর একজন জমাদার চারজন বরকন্দাজ ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে 'নামঘরে' আশ্রয় নিয়ে কাজটি করতে ব্যর্থ হলেন বরং একজন বরকন্দাজকে আন্দোলনকারীরা আটলে রাখলেন। ডি.সি.-র নির্দেশমতে, পরেরদিন ১৬ অক্টোবর একজন থানা মোহরি, একজন জমাদার, দশজন বরকন্দাজ নিয়ে থানার দারোগা ফুলাগুড়িতে একটি 'নামঘর' থেকে দেখেন 'রেইজ-মেল'-এ

রোহা, বড়পুজিয়া, চাপোরি, কামপুর, যমুনামুখ প্রভৃতি দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে প্রায় চারহাজার কৃষক সমবেত হয়েছেন এবং পাঁচশতর বেশি মানুষের হাতে লাঠি, অস্ত্র ইত্যাদি আছে। পরপর দু'দিন সমাবেশের মারমুখি চেহারা দেখে দারোগা অবস্থা সামাল দিতে ব্যর্থ হওয়ায় (যদিও 'রেইজ-মেল' থেকে কিছুটা দূরে 'নামঘরে' তাঁরা ছিলেন) উত্তেজিত ডি.সি. ১৮ অক্টোবর অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার Lt. G. B. Singer-এর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী অবিলম্বে 'রেইজ-মেল'-এ সমবেত কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পাঠালেন। Singer সাহেবও অন্যদের মতো কিছুক্ষণ 'নামঘরে' অপেক্ষা করে শেষে সভাস্থলে গেলে উত্তেজিত কৃষকরা তাঁকে ঘিরে ফেলেন এবং তাদের ক্ষোভের কারণ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু যে মুহূর্তে Singer তাদের লাঠি, অস্ত্র ইত্যাদি ত্যাগ করার জন্য জোর-জবরদস্তি শুরু করেন, সেইসময় বাবু ডুম নামে জনৈক মৎস্যজীবী পিছন থেকে Singer-এর মাথায় সজোরে আঘাত করায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ব্রিটিশের অস্ত্রধারী পুলিশ গুলি চালালেও শেষপর্যন্ত অর্ধমৃত Singer-কে ঘটনাস্থলে রেখেই পালিয়ে যেতে বাধ্য হওয়ায় নওগাঁওর ডি.সি. Sconce সাহেব রীতিমতো উদ্বিগ্ন হন। পরে আন্দোলনকারীরা Singer-এর দেহটি পাশের কোলং নদীতে ফেলে দিলে, রাতের দিকে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। চারিদিকে রটে যায়, ফুলাগুড়িতে সমবেত মারমুখী কৃষকরা একজোট হয়ে নওগাঁও-এ ডি.সি.-র অফিস এবার আক্রমণ করবে, ফলে অনেকেই প্রমাদ গুনতে শুরু করে।

ফ্রান্সিস জেন্‌কিনস্ আসামের কমিশনারের পদে (১৮৩৪-৬১) দীর্ঘদিন থাকার পর ১৮৬১ সালেই হেনরি হপ্‌কিনসন্ কমিশনার পদে (১৮৬১-৭৪) যোগ দিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে স্টিমারে ডিব্রুগড় যাওয়ার পথে ১৯ অক্টোবর তিনি তেজপুরে এসে ঘটনা শোনামাত্রই নওগাঁও-র দিকে যাত্রা করেন। যাত্রী হিসেবে একই স্টিমারে মেজর ক্যাম্পবেল-ও ছিলেন। হপ্‌কিনসন্-এর সাথে পরামর্শক্রমে Campbell তেজপুর থেকে 2nd Assam Light Infantry-র ৫০ জন সিপাই নিয়ে নওগাঁও-এর পথে পাড়ি দেন। অন্যদিকে হপ্‌কিনসন্ নওগাঁও পৌঁছে সরেজমিনে অবস্থা তদন্ত করে কালক্ষেপ না করে গুয়াহাটি থেকে 2nd Assam Light Infantry আরও ৮০ জন সিপাই আনতে ছোটেন এবং ক্যাম্পবেলকে নির্দেশ দেন যে, তিনি গুয়াহাটি থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। ২৩ অক্টোবর, ১৮৬১-তে হপ্‌কিনসন্ গুয়াহাটি থেকে বড়ো বাহিনী আনার পর শুরু হয় ব্রিটিশ বাহিনীর ফুলাগুড়ি অভিযান। বেণুধর কলিতা-র বিবরণ অনুযায়ী, কৃষকদের ব্যাপক ধরপাকড়, প্রহার ইত্যাদি ছাড়াও ব্রিটিশ সিপাইদের গুলিতে

২৪ অক্টোবর ৩৯ জন রায়ত নিহত এবং ১৫ জন গুরুতরভাবে আহত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, ৪১ জন রায়তকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা হাইকোর্টে বিচার হয়। রূপসিং লালুং, শিবসিং লালুং, লক্ষ্মণসিংহ ডেকা, বাবু ডুম (কৈবর্ত্য), বনমালি কৈবর্ত্য, সংগবর ডেকা, রংগবর ডেকা, নরসিং লালুং, হেবেরা লালুং সহ অনেকেরই ফাঁসি হয়। অন্যদের হয় দ্বীপান্তর বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এইভাবে Singer সাহেবের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, রাহা ও ফুলাগুড়িতে বাঁশের খুঁটি দিয়ে দুটি অস্থায়ী কারাগার তৈরি হয় যেখানে দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস অসংখ্য মানুষকে বন্দি করে রাখা হয়। একই সাথে বন্দিদের উপর অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচারের জন্য সিপাইদের ক্যাম্প তৈরি হয়। বন্দি ও সিপাইদের প্রতিদিনের খাদ্য জোগানের দায়িত্ব বহন করতে গ্রামবাসীদের বাধ্য করা হয়। বেণুধর কলিতা-র বর্ণনা অনুযায়ী, সমগ্র এলাকায় এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়।

১৫.২.১.৭ ফুলাগুড়ি বিদ্রোহের মূল্যায়ন

ব্রিটিশ ভারতে অধিকাংশ কৃষক বিদ্রোহের যে পরিণতি হয়েছিল, ফুলাগুড়ি তার থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না। সরকারি বয়ানে এটিকে *কানিয়ার বিদ্রোহ* বা নেশাগ্রস্ত আফিমখোরদের বিদ্রোহ হিসেবে অবমূল্যায়ন করা হলেও এটি যে আফিম ছাড়াও ব্রিটিশ প্রবর্তিত অন্যান্য নির্যাতনমূলক করের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ, সেটি কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। কেউ কেউ এটিকে 'উপজাতিদের বিদ্রোহ' বা 'লালুংদের বিদ্রোহ' হিসেবে অভিহিত করেন, যেমনটি ১৮৫৭ সালে তথাকথিত 'সিপাহি বিদ্রোহ' সম্পর্কে বলা হয়। কিন্তু লালুং উপজাতি জনগোষ্ঠী ছাড়াও অন্যান্যরাও যে এই বিদ্রোহে শামিল হয়েছিলেন, সেটি উপরে বর্ণিত শহিদ বা বন্দিদের নাম থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। Singer সাহেবকে হত্যার ব্যাপারে যার নাম বারবার সরকারি দলিলে উল্লেখ আছে সেই বাবু ডুম কিন্তু অ-উপজাতি এবং জাতিতে কৈবর্ত্য। ফুলাগুড়ির ঘটনাবলী যেভাবে চলছিল তাতে হেনরি হপ্‌কিনসন্-এর স্টিমার আকস্মিকভাবে তেজপুর না এলে কী ঘটতে পারত সেটির ব্যাপারে বাংলা প্রেসিডেন্সির ছোটোলাট Cecil Beadon নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ঃ

> *Had affairs taken an unfortunate instead of a fortunate turn, after Lieutenant Singer's murder, which there was at first reasons to fear they would, the consequence of the deficiency of available troops in that quarter would have been serious and as it was only the*

fortunate passage of a private steamer at the moment when the news of the Nowgong disturbance reached the commissioner, that enabled that officer to prevent a disaster.

আসামের কমিশনারের হপ্‌কিনসন্‌-এর মতে, কড়া পদক্ষেপ নিয়ে ঐভাবে প্রথম অভ্যুত্থানকে না ঠেকালে এইরকম অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ত এবং জল সময়মতো বের করে না দিলে ব্রিটিশ তরীই হয়তো আসামে ডুবে যেত। হপ্‌কিনসন্‌-এর ভাষায় ঃ

The beginning of a tumult is like the letting of water if not stopped at first, it becomes difficult to do so afterwards.

বেণুধর কলিতা ফুলাগুড়ির ঘটনাটিকে *ধাওয়া* বা যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করায় কেউ কেউ আপত্তি তুলেছেন। কিন্তু এটি যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য, 'রেইজ-মেল'-এর ভূমিকা। 'রেইজ-মেল' আসামের একটি পুরাতন রাজনৈতিক ও সামাজিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির মতামত গুরুত্ব পায়। 'রেইজ-মেল'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভ্যুত্থানের একটি হুকও তৈরি হয়েছিল। ফুলাগুড়ি অভ্যুত্থানে বিশেষ কোনো নায়কের ভূমিকার চেয়ে 'রেইজ-মেল'-এর ভূমিকাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ যেখানে বেশ কিছু গাঁওবুড়া সহ অনেকেই ছিলেন। সুতরাং এটিকে 'রেইজ-মেল'-এর বিদ্রোহ বলাই বরং যুক্তিযুক্ত।

ফুলাগুড়ি ঘটনার প্রেক্ষিতে নওগাঁও-এর ডি.সি. Herbert Sconce-এর পদাবনতি হয়েছিল এবং তাঁকে কামরূপে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। একই সাথে নওগাঁও-এ সশস্ত্র সিপাহির সংখ্যা বাড়িয়ে ৮০০ করা হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও ঔপনিবেশিক শাসনের দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলি সকলের কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। আসামের গ্রামীণ সমাজকে ফুলাগুড়ির ঘটনা প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দিলেও উদীয়মান মধ্যবিত্তদের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক আছে। ১৮৬১ সালের *অরুণোদয়* পত্রিকায় নভেম্বর সংখ্যায় ফুলাগুড়ি অভ্যুত্থানের সম্পূর্ণ বিকৃত ছবি পরিবেশিত হয়েছিল ঃ যেমন, আসামের মতো এত কম রাজস্ব বা কর ভারতবর্ষের কোথাও নেই, আফিম-পাগল কিছু ব্যক্তির প্ররোচনায় এটি ঘটেছিল, আসামের মানুষের মঙ্গলের জন্যই ব্রিটিশরা আফিম-চাষের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়েছিল অথচ মানুষ এতে ক্রুদ্ধ হল ইত্যাদি ইত্যাদি। Nidhi Levy Farwell (জনৈক অসমিয়া যিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নিজেকে সাহেব মনে করতেন) একটি ব্যঙ্গাত্মক লেখা প্রকাশ করলেন ('নোওগাঁও দ্রুহিলোকর [বিদ্রোহীদের] চরিত্র

বর্ণন') যাতে সর্বশক্তিমান ও অপরাজেয় ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র হতভাগ্যদের বিদ্রোহকে বিদ্রূপ করা হল।

ফুলাগুড়ি অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও প্রতিবাদী কৃষকদের কিন্তু এরপরও থামানো যায়নি। H. K. Barpujari তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন ঃ "The movement failed...but the precedent was not lost upon the people, it was followed up soon after"। ১৮৬১-তে ফুলাগুড়ির পরেও ১৮৯২ পর্যন্ত পতিদরং, নলবাড়ি, লাচিমা, বড়মা, বজালি, ক্ষেত্রি, উপর বরভোগ, ১৮৯৩ সালে রঙ্গিয়া প্রভৃতি এলাকায় একটার পর একটা ছোটো-বড়ো কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছে এবং সবচেয়ে কঠিন ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ১৮৯৪ সালে পাথারুঘাট কৃষক অভ্যুত্থানের সময়। অর্থনৈতিক অসন্তোষ ও উত্তেজনা কীভাবে মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে এবং ক্ষমতাশালী ব্রিটিশের মতো শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহস পায়, উপরোক্ত কৃষক অভ্যুত্থানগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৫.৩ 'রেইজ-মেল' বনাম ব্রিটিশ 'রাজ' (Raij-mel versus Raj)

ফুলাগুড়ি থেকে শুরু করে যে ক'টি কৃষক বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে আসামের বিভিন্ন প্রান্তে হয়েছে সবগুলিই ছিল 'রেইজ-মেল'-এর নেতৃত্বাধীন এবং সেগুলি মেজাজে রীতিমত জঙ্গি ছিল বলা যায়। ব্রিটিশ শাসকরা এত মানুষের সভা বা সমাবেশকে রীতিমতো ভয় করতেন, তাই 'মেল' কোথাও হচ্ছে শুনলেই ছুটে গিয়ে সেটিকে "unlawful assemblies" বলে নিষিদ্ধ করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা নিতেন এবং সেটিকে কেন্দ্র করেই অবশেষে উত্তেজনা সৃষ্টি হত। ব্রিটিশ শোষণ বৃদ্ধির সাথে সাথে 'মেল'-এর গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়। 'মেল' সম্পর্কে কামরূপের ডেপুটি কমিশনার বা ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর (ডিসি) R. B. McCabe-র মূল্যায়ন ছিল এইরকম ঃ

"The ordinary village panchayat, originally constitued as an authority on social matters, has developed into the *mel* or assembly not only of the members of a village, but of the whole inhabitants of even one or more *tahsils*. The *mels* are governed by the leading *Dolois* or *Gossains* and by the principal landholders of the district"

আসলে, McCabe যাই বলুন, 'মেল' ছিল প্রচলিত পঞ্চায়েত প্রথার চেয়ে অনেকবেশি শক্তিশালী গ্রামীণ মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এই সংঘবদ্ধ শক্তিকে ব্রিটিশ শাসকরা ভয় পেতেন বলেই 'মেল'-এর ঐক্য ও অস্তিত্বকে

ধ্বংস করার খেলায় তাঁরা মেতে উঠলেন, কারণ তাঁদের বক্তব্য ছিল ঃ "If British paramountcy was to be preserved in Assam, the *mels* must be crushed"। ফুলাগুড়িতে অত নির্যাতন সত্ত্বেও কিন্তু 'মেল' ভাঙা সম্ভব হয়নি, বরং 'মেল'গুলি আরও শক্তিশালী হয়েছিল। 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা' (১৮৮৪-তে প্রতিষ্ঠিত) যখন ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে 'রায়ত'-এর সমর্থনে এগিয়ে এল, সেই সময় থেকে কৃষক ছাড়াও ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন জীবিকার মানুষে 'মেল'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে শক্তিবৃদ্ধি করলেন। আসামের কোনো স্থানে 'মেল'-এর অধিবেশন চলছে মানেই, সেই সময় এটি ছিল বিদ্রোহের পূর্বাভাস। এককথায়, 'মেল'-এর সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ অমান্য করা গ্রামীণ মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। প্রশ্ন উঠল ঃ কে বেশি বড়ো? ব্রিটিশ রাজ? নাকি, 'রেইজ মেল'? 'রাজার হুকুম' নাকি 'মেল'-এর সিদ্ধান্ত? এই জটিল প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে অনেকে অবশ্য সেদিন বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। আসলে, সব মানুষ তো বিদ্রোহী বা বিপ্লবী হয় না, অনেকের মনেই রাজশক্তি সম্পর্কে ভয়-ভীতি ছিল। এই সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করেই কৃষক অভ্যুত্থানের মূল্যায়ন করা দরকার। কৃষক চরিত্রের সাথে শ্রমিক চরিত্রের একটা গুণগত পার্থক্য থাকে। কৃষকের কিছু হারানোর ভয় থাকে, তাই জন্মসূত্রে শ্রমিকের মতো বিপ্লবী শ্রেণি হিসেবে কৃষক সব সময় এগিয়ে আসে না। আর কৃষক যখন বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়, তখন অনিবার্য মৃত্যু জেনেই সেটি করে, কারণ তার সামনে আর বিকল্প থাকে না।

ফুলাগুড়ির পর যে ক'টি কৃষক অভ্যুত্থান আসামের বিভিন্ন স্থানে হয়েছে সবগুলির বিস্তৃত আলোচনা এই প্রসঙ্গে না করে শুধু এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, নলবাড়ি, বড়মা, বজালি কৃষক অভ্যুত্থানের সময় থেকে 'মেল'-এর পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকারকে খাজনা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিভিন্ন 'মেল' তার নিজস্ব ডাক-ব্যবস্থা তৈরি করে, যাতে সিদ্ধান্ত বা বার্তা দ্রুত পাঠানো সম্ভব হয়। অনেক স্থানে 'মেল'-এর লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে ওঠে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। যদি কোনও রায়ত 'মেল'-এর সিদ্ধান্ত অমান্য করে ব্রিটিশের সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রাখে, তবে তাকে সামাজিকভাবে একঘরে করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। ১৮৯৩ সালে রঙ্গিয়া কৃষক অভ্যুত্থানের সময় 'মেল'-এর মাড়োয়ারি-ব্যবসাদার-বিরোধী চরিত্র লক্ষ করা যায়, কারণ ঐসব মাড়োয়ারি 'দাদন' দিয়ে বা মোটা সুদে নগদ অর্থ সরবরাহ করে 'রায়ত'কে সময়মতো নগদ অর্থে ব্রিটিশদের রাজস্ব দিতে অনেক স্থানে এগিয়ে আসত। এইভাবে 'মেল' যত ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ

হতে চেয়েছে, ব্রিটিশ শক্তিও ততই সেটি নির্মমভাবে দমন করার জন্য একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

১৫.৪ পাথারুঘাট অভ্যুত্থান ১৮৯৪ (Patharughat Uprising 1894)

মঙ্গলদৈ শহর থেকে ৩৫ কিমি দূরে দরং জেলার দিগাজ নদীর ধারে পাথারুঘাটে ১৮৯৪ সালে কৃষক অভ্যুত্থান সমগ্র ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয়। ফুলাগুড়ির মতো 'রেইজ-মেল'-এর নেতৃত্বে এটি ছিল আসামের কৃষকদের জীবন-মরণ যুদ্ধ। ১৮৬১-তে ফুলাগুড়ির পর পতিদরং, নলবাড়ি, লাচিমা, বড়মা, বজালি, ক্ষেত্রি, উপর বরভোগ কিংবা রঙ্গিয়াতে একটার পর একটা অভ্যুত্থান 'মেল'-এর নেতৃত্বেই ঘটেছিল, কিন্তু ১৮৯৪ সালে পাথারুঘাট-এত মতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে এত কৃষকের রক্তে কোথাও মাটি ঐভাবে লাল হয়নি। স্থানীয় ঐতিহাসিক দীনেশ্বর শর্মার *পাথারুঘাটর রণ*-এর বিবরণ অনুযায়ী ১৪০ জনের মৃত্যু এবং ১৫০ জনের গুরুতরভাবে আহত হওয়ার সংবাদে সমকালীন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী অবশ্য মৃতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ এবং আহত হয়েছিলেন মাত্র ৩৭ জন। সরকারি ভাষ্য যে পুরোপুরি মিথ্যা এটি বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়। আসলে, পাথারুঘাট ছিল আসামের জালিয়ানওয়ালাবাগ, যদিও পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড পরবর্তী সময়ে (১৯১৯) ঘটেছিল।

১৫.৪.১ প্রেক্ষাপট

চারিদিকে 'মেল'-এর এত প্রতিবাদ, প্রতিরোধ সত্ত্বেও ক্রমাগত রাজস্ব-বৃদ্ধির প্রশ্নে ব্রিটিশ শাসকদের ক্ষান্ত করা সম্ভব হয়নি। যদিও ১৮৭০ সালে Settlement Rules কিংবা ১৮৮৬ সালে Assam Land Revenue Regulations প্রণীত হয়েছিল, কিন্তু রাজস্ব এমনভাবেই ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হচ্ছিল যে, যেটুকু সুবিধা উপরোক্ত আইন দিয়েছিল সেটিও অর্থহীন হয়ে গেল। ফুলাগুড়ি বিদ্রোহ (১৮৬১) থেকে পাথারুঘাট বিদ্রোহের (১৮৯৪) সময়কালের মধ্যে আদায়ীকৃত ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ১০ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষে এসেছিল, অর্থাৎ চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যদিও কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ (চা-বাগান ছাড়া) ঐ সময়ের মধ্যে তেমন বাড়েনি। গ্রামীণ দারিদ্র্য কেমন বেড়েছিল সেটি নিম্ন ও মধ্য আসামে বকেয়া খাজনাদাতার সংখ্যা থেকেই কিছুটা অনুমান করা যায়। ১৮৭৯-৮০-তে ৩,৩১১ জন 'রায়ত'-এর খাজনা বকেয়া ছিল, ১৮৯৫-৯৬ সালে সেটি বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৩,০০০-এ। কৃষিপণ্যের মূল্য কিছুটা বাড়লে কৃষকের হয়তো কিছু সুবিধা হত,

কিন্তু সেটিও দীর্ঘদিন স্থির ছিল। অন্যদিকে, আফিম সহ ব্রিটিশ আমদানিকৃত ভোগ্যপণ্যের দাম যথারীতি বাড়ছিল। ১৮৯২-৯৩ সালে হঠাৎ করে ভূমি-রাজত্বের পরিমাণ কমপক্ষে ৫৩ শতাংশ (কিছুস্থানে ৭০ থেকে ১০০ শতাংশ) বৃদ্ধির ফলে কৃষকের সামনে বিদ্রোহ ছাড়া আর কোনও পথ খোলা রইল না। সর্বত্রই 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'র সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন 'মেল' প্রতিবাদে ফেটে পড়লেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোনোকিছুই গ্রাহ্য করলেন না। এরই জন্য এতগুলি কৃষক অভ্যুত্থান (লাচিমা, বজালি, রঙ্গিয়া প্রভৃতি) ১৮৯২-৯৩ সালে ঘটেছিল। এই সময়ের অভ্যুত্থানগুলির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য ঃ (১) আবেদন-নিবেদনের অধ্যায় ব্যর্থ হওয়ার পরই 'মেল'গুলি জঙ্গি আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। (২) 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'র সমর্থনের দিকে লক্ষ রেখে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যেও কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এই সময়ে পরিলক্ষিত হয়। এক অংশ মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে সংগ্রামী আন্দোলনের মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। অন্য অংশ নরমনীতি অবলম্বন করে সাংবিধানিক পথেই এগিয়ে যেতে বেশি আগ্রহী। এককথায়, জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পর্বে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিতর্কের মতো একই ধরনের বিতর্ক 'মেল'-এর অভ্যন্তরে শুরু হল। এরই প্রতিক্রিয়া নানাভাবে কৃষক অভ্যুত্থানে প্রতিফলিত হয়েছিল।

১৮৯২-৯৩ সালে লাচিমা, বজালি, শরুক্ষেত্রি/ক্ষেত্রি, রঙ্গিয়া প্রভৃতি ঘটনার আগে ব্রিটিশ শাসকদের কড়া নির্দেশ ছিল সময়মতো রাজস্ব নগদ অর্থে জমা না দিলে জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। অন্যদিকে 'মেল'-এর নির্দেশ ছিল ঐ জমি যেন কেউ নিলামে গ্রহণ না করে। কামরূপের ডি.সি. R. B. McCabe নিজেই সমকালীন আসামের 'রায়ত'-এর অবস্থা একদিকে জমি হারানো অন্যদিকে সমাজচ্যুত হওয়ার ভয় এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

> The unfortunate *ryot* who has to pay his revenue is met by the *tahsildar* on one side who says "if you do not pay, your property will be attached", and on the other side by the *Rais* i.e. the embodiment of the order of the *mel*, which states "if you pay you are cursed and excommunicated". He has therefore to face loss of property on one side or social ostracism on the other.

১৫.৪.২ পাথারুঘাটের ঘটনাবলী

আসামের স্থানীয় চারণকবি নরোত্তম দাস তাঁর *ডোলি-পুরাণে* ছন্দের মাধ্যমে পাথারুঘাট অভ্যুত্থানের ভয়ংকর ছবি চিত্রিত করেছেন। আসলে, অসমিয়া ভাষায়

এটি ছিল 'ডোলি-রণ' বা যুদ্ধ, যদিও ফুলাগুড়ির 'ধাওয়া' শব্দের মতো পাথারুঘাটের ক্ষেত্রে 'ডোলি-রণ' শব্দটির ব্যবহার নিয়ে কেউ কেউ মৃদু আপত্তি তোলেন। আসলে, ঘটনাটি ছিল এইরকম ঃ

১৮৯৪ সালের ২৪ জানুয়ারি দরং জেলার ডি.সি. J. D. Anderson একটি বার্তা পান যে, সিপাঝড় এলাকায় একটি 'মেল'-এর অধিবেশন চলছে যেখানে মঙ্গলদৈ, কলিয়াগাঁও প্রভৃতি এলাকা থেকে হাজার হাজার কৃষক যোগ দিয়েছেন। ব্রিটিশ রাজস্ব-নীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে অনুরূপ একটি 'মেল' দরং জেলার পাথারুঘাটে ২৮ জানুয়ারি হতে চলেছে। যেহেতু ব্রিটিশ শাসকদের চোখে 'মেল্' মানেই বিদ্রোহের পূর্বাভাস, এরই জন্য অঙ্কুরে সেই সম্ভাবনাকে বিনাশ করতে Anderson সাহেব তাঁর একান্ত অনুগত Lt. Berrington-এর নেতৃত্বে একটি বড়ো সামরিক বাহিনী নিয়ে ২৭ জানুয়ারি পাথারুঘাটে আসার সময় লক্ষ করেন বিভিন্ন গাছে আটকানো ২৮ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য 'মেল'-এর নোটিশ। ২৮ জানুয়ারি সকালে Lt. Berrington যখন বকেয়া খাজানার দায়ে কিছু 'রায়ত'-এর জমি বাজেয়াপ্ত করতে যাচ্ছেন সেই সময় প্রায় ২০০ সশস্ত্র 'রায়ত' তাকে ঘিরে ধরেন। কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করে Berrington যখন ফিরে এসে স্থানীয় বিশ্রামাগারে অবস্থানরত Anderson-কে সমস্ত পরিস্থিতি জ্ঞাপন করছেন, সেই সময় প্রায় ২০০০ মানুষ লাঠি-সোটা ও ধারালো অস্ত্র সহ পাথারুঘাট বিশ্রামাগারের সামনে উপস্থিত হয়ে অবিলম্বে বর্ধিত খাজনা প্রত্যাহারের দাবি তোলেন। Anderson ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আন্দোলনকারীদের সাথে কথাবার্তা না বলে অবিলম্বে তাদের স্থানান্তরের আদেশ দিলেও কোনো কাজ হচ্ছে না দেখে গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে দেশীয় পুরোনো অস্ত্রের যে গতি হওয়া স্বাভাবিক তাই হল। 'রায়ত'-এর রক্তে মুহূর্তে পাথারুঘাটের মাটি লাল হয়ে গেল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দীনেশ্বর শর্মার মতে ১৪০ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং ১৫০ জনের মত ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন, যদিও সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী সংখ্যাটি অনেক কম।

১৫.৪.৩ প্রতিক্রিয়া

১৮৯৪ সালের ২৮ জানুয়ারির রক্তাক্ত অধ্যায় অসমিয়া মননে যে কত গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, সেটি বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, তবে আসামের বাইরে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেটি কিছুটা উল্লেখ দরকার। কলকাতার *The Hindoo Patriot* (৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

...According to official report the number of dead was fifteen, wounded thirty seven, but the number of both was much higher. Berrington who carried the order of firing and who was on the spot reported that it was impossible to ascertain the exact number of casualties from a distance of 250 yards. That the number of wounded was heavier is evident from the fact that special constables were asked to persuade the ryots to take their comrades to the Mangaldai dispensary"

কলকাতার *The India Nation* পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে (১২ এপ্রিল ১৮৯৪) মন্তব্য করা হয়েছিল যে, প্রাক-ব্রিটিশ যুগে আসামের 'রায়ত' জমির উপর যে অধিকার ভোগ করতেন, ব্রিটিশ শাসনে তার সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

...But at present he is neither a landholder...the ryot cannot transfer his land to another without permission of the Deputy Commissioner. Formerly there was no such restriction. The burden which now press upon the land in Assam are considerably heavier than on land owned by zamindars of Bengal.

আসলে, আসামে ব্রিটিশ যুগে জমি বন্দোবস্তের পদ্ধতি এবং খুশিমতো রাজস্ব বৃদ্ধি দুটোই ছিল H. K. Barpujari-র ভাষায় "arbitrary and unjust"। এই অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে পাথারুঘাটে অতগুলি মানুষকে প্রাণ দিতে হল। *The Indian Nation* পত্রিকায় (২১ এপ্রিল ১৮৯৪) কৃষকদের প্রতিটি দাবিকে সমর্থন জানিয়ে "real and not sentimental" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেভাবে পাথারুঘাট হত্যাকাণ্ডকে "Assam riot" হিসেবে সরকারি ভাষ্যে চিত্রিত করা হয়েছিল এবং প্রকৃত মৃতের সংখ্যা কমিয়ে সত্যকে গোপন করা হয়েছিল সেটির প্রতি তীব্র কষাঘাত হেনে ঐ একই পত্রিকা এটিকে "as a very serious affair" বলে মন্তব্য করেছিল।

কলকাতার *Amrita Bazar Patrika*-র সম্পাদকীয়তে (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪) মন্তব্য করা হয়েছিল ঃ "...in the Deccan the fury of the *ryots* was directed against the money-lenders, in Bengal against indigo-planters in 1860, in Pabna against *zamindars* in 1872, but in Assam, at this moment it is open rebellion against the government"। *অমৃত বাজার পত্রিকা*-র এই মন্তব্য যে যথার্থ এটি নিশ্চিতভাবে অনেকেই সমর্থন করবেন।

ভারতের খুব কম কৃষক-বিদ্রোহই আসামের মতো এমন প্রকাশ্যে সামনাসামনি ব্রিটিশ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল।

আসামের 'রেইজ-মেল'-এর সংগ্রামী মানসিকতার প্রতিধ্বনি শোনা গেল পাথারুঘাট ঘটনার বছরেই অর্থাৎ ১৮৯৪ সালের ২৯ মার্চ Imperial Legislative Council-এর সদস্য ড. রাসবিহারী ঘোষ-এর কণ্ঠে। পাথারুঘাট হত্যাকাণ্ডের জন্য ব্রিটিশ শাসকদের আসামির কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে ড. ঘোষ মোট আটটি প্রশ্নের জবাব চেয়েছিলেন, জরিপের নামে বারবার রাজস্ব বৃদ্ধির যৌক্তিকতা, আসামে ব্রিটিশ অফিসারদের নির্মম ও অমানবিক আচরণ, বকেয়া খাজনার জন্য রায়তের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার নৈতিক অধিকারের প্রশ্ন, স্থানীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের খাজনা-আদায়কারী ব্রিটিশের তহশিলদারে পরিণত করার নৈতিকতা ইত্যাদি। একটি প্রশ্নেরও সদুত্তর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দিতে পারেনি এবং সভ্যতাগর্বীদের মুখোশ সেদিন খসে গিয়েছিল। H. K. Barpujari-র ভাষায় ঃ

> *...The replies given to these by the government were vague and unsatisfactory. They were considered as "misleading and inconsistent with facts" by leading newspapers of the time...the repressive measures undertaken to suppress the popular movement could not but tarnish the fair name of any civilised government.*

১৫.৪.৪ ফলাফল

পাথারুঘাট অভ্যুত্থান আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও, এর কিছু সুদূরপ্রসারী ফলও নানা ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। যদিও ১৮৯৪-এর ২৮ জানুয়ারি রক্তাক্ত অধ্যায়ের পরও একটার পর একটা গ্রামে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর চরম অত্যাচার নেমে এসেছিল এবং বর্ধিত হারে খাজনা দিতে সকলে শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েছিল, তথাপি আসামের বাইরে ঘটনাটির ফলাও প্রচারের ফলে শাসকশ্রেণির সম্বিৎ কিছুটা ফিরে আসে। ব্রিটিশ ভারত সরকার আসামের ক্ষেত্রে প্রথমে ৫৩ শতাংশ এবং পরে ৩২.৭ শতাংশ কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। *The Indian Nation* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে (২১ এপ্রিল, ১৮৯৪) মন্তব্য করা হল ঃ সেই পিছু হটতে বাধ্য হল সরকার, কিন্তু অনেক রক্তের বিনিময়ে, এটি যদি আগে হত তাহলে হয়তো পাথারুঘাটের মতো মর্মান্তিক অধ্যায়ে এড়ানো সম্ভবপর হত। ঐ পত্রিকার ভাষায় ঃ "It is a lamentable instance of tardiness where promptness was the first requisite—a glaring proof of red-tapism"। এইসব কারণেই পাথারুঘাট অভ্যুত্থান পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল, বলা যায় না।

পাথারুঘাট সহ ১৮৯২-৯৪-এর প্রতিটি কৃষক অভ্যুত্থানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামীণ মানুষের ঐক্য যেখানে কৃষি কাজের সাথে যুক্ত নয় এমন বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ এতে শামিল হয়েছিলেন। এমনকি ব্রাহ্মণ, মোহান্ত ও দোলই প্রভৃতি গ্রামীণ আলোকদীপ্ত ব্যক্তিরাও সমভাবে অংশ নিয়েছিলেন। অমলেন্দু গুহ কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনৈক জঙ্গি কর্মকার পুষ্পরাম কানহার-এর নাম উল্লেখ করেছেন, যার বন্দিজীবনের অমর কাহিনি শরুক্ষেত্র মৌজার গ্রামীণ কুটির শিল্প শ্রমিকরা আজও উল্লেখ করেন। সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল, ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে হিন্দু-মুসলমানের সুদৃঢ় ঐক্য, যেটি পরবর্তী সময়ে আসামে ১৯২০-র প্রথমদিকে গান্ধিজির ডাকে অসহযোগ বা খিলাফৎ আন্দোলনের সময় আরও জোরদার হয়েছিল। শ্রুতিদেব গোস্বামী'র ভাষায় ঃ

> *The widespread peasant movements, based on the unity of the entire peasantry and a section of the non-cultivating landowners, hearalded the beginning of a new era of peasant awakening in Assam by effectively upholding the value and utility of organised resistance against governmental injusice.*

ফুলাগুড়ি থেকে শুরু করে পাথারুঘাট পর্যন্ত প্রতিটি কৃষক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিল 'রেইজ-মেল'। পাথারুঘাটই ছিল প্রকৃতপক্ষে 'মেল'-এর নেতৃত্বাধীন শেষ অভ্যুত্থান। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্থানে 'রায়ত-সভা' গঠিত হয় এবং ১৯৩৩ সালে 'সারা আসাম রায়ত সভা'র উদ্ভব হয়। আসামের উদীয়মান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমাজের সর্বত্র নিজেদের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে কৃষকদের অসন্তোষকে হাতিয়ার করে কৃষকদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে এবং গ্রামীণ সমাজে কৃষক, অ-কৃষক সকলকে একত্র করে 'রায়ত-সভা'র নেতৃত্বে এগিয়ে আসে। 'রায়ত-সভা'র নেতৃত্বের সাথে আবার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কিছু নেতার যোগাযোগ শুরু হয়, ফলে সর্বভারতীয় মঞ্চে আসামের কৃষকের প্রশ্নটি গুরুত্ব পায় (যেটি পাথারুঘাট অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে ড. রাসবিহারী ঘোষ Imperial Legislative Council-এ উত্থাপন করে সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন)। পাথারুঘাটের অভিজ্ঞতার পর বিচ্ছিন্নভাবে কৃষকদের মারমুখি আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে, কারণ 'রায়ত-সভা' সাংবিধানিক পথেই সমস্যার সমাধানে বেশি আগ্রহী ছিল, সশস্ত্র পথে নয়। যদিও পাথারুঘাট ঘটনাটির সময় 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা' আন্দোলনকারীদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু নেতৃত্ব 'মেল'-এর কাছে ছিল, যেখানে ব্যক্তি নেতৃত্বের তুলনায় সামগ্রিক নেতৃত্ব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পাথারুঘাটে

উত্তেজনার কিছুদিন আগে রঙ্গিয়া অভ্যুত্থানের সময় স্থানীয় 'মেল'-এর কিছু সদস্য তাদের অভিযোগ যখন ডি.সি. McCabe সাহেবকে নিবেদন করতে এসেছিলেন, সেইসময় McCabe নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের *dangar-manuh* ('ডাঙ্গর-মানুহ') অর্থাৎ নেতাকে পাঠিয়ে দিতে। রায়তদের কাছ থেকে উত্তর এসেছিল ঃ তারা সকলেই 'ডাঙ্গর'। পাথারুঘাট অভ্যুত্থানের সময় পর্যন্ত সামগ্রিক-নেতৃত্বই ছিল একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, কিন্তু পাথারুঘাটের পর মধ্যবিত্ত প্রভাবিত 'রায়ত-সভা'র ব্যক্তি-নেতৃত্বই সর্বত্র গুরুত্ব পেতে শুরু করল। কৃষক ক্রমশ নিজেদের নেতৃত্ব হারিয়ে মধ্যবিত্ত নেতাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল এবং কৃষক আন্দোলনের জঙ্গিপনারও যবনিকাপাত হল।

ষোড়শ অধ্যায়

আসাম ও বঙ্গদেশ

সারণি ২

ব্রিটিশ যুগে আসামে চিফ্ কমিশনার, লেফ্‌টান্যান্ট-গভর্নর এবং গভর্নর

চিফ্ কমিশনার (১৮৭৪-১৯০৫)

১. আর. এইচ. কিটিং (R. H. Keatinge)—১৮৭৪-১৮৭৮
২. এস. সি. ব্যেল্যে (S. C. Bayley)—১৮৭৮-১৮৮১
৩. সি. এ. এলিয়ট (C. A. Elliott)—১৮৮১-১৮৮৩
৪. ডব্লু. ই. ওয়ার্ড (W. E. Ward)—কিছুদিনের জন্য কর্মরত
৫. সি. এ. এলিয়ট (C. A. Elliott)—১৮৮৩-১৮৮৫
৬. ডব্লু. ই. ওয়ার্ড (W. E. Ward)—কিছুদিনের জন্য কর্মরত (ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫-অক্টোবর ১৮৮৭)
৭. ডি. ফিজ্‌প্যাট্রিক (D. Fitzpatrick)—১৮৮৭-১৮৮৯
৮. জে. ওয়েস্টল্যান্ড্ (J. Westland)—জুলাই ১৮৮৯-অক্টোবর ১৮৮৯
৯. জে. ডব্লু. কুইনটন্ (J. W. Quinton)—১৮৮৯-১৮৯১ (২৪ মার্চ ১৮৯১-এ মণিপুরে নিহত)
১০. এইচ. কোলেট (H. Collett)—দু'মাসের জন্য কর্মরত
১১. ডব্লু. ই. ওয়ার্ড (W. E. Ward)—১৮৯১-১৮৯৪
১২. সি. জে. লাইয়ল (C. J. Lyall)—১৮৯৪-১৮৯৬
১৩. এইচ. জে. এস. কটন (H. J. S. Cotton)—১৮৯৬-১৯০০
১৪. জে. বি. ফুলার (J. B. Fuller)—তিনমাসের (মে-জুলাই ১৯০০) জন্য
১৫. এইচ. জে. এস. কটন (H. J. S. Cotton)—আগস্ট ১৯০০-এপ্রিল ১৯০২
১৬. জে. বি. ফুলার (J. B. Fuller)—১৯০২-১৯০৫

লেফ্‌টান্যান্ট-গভর্নর (অক্টোবর ১৯০৫-মার্চ ১৯১২)

১. জে. বি. ফুলার (J. B. Fuller)—অক্টোবর ১৯০৫-আগস্ট ১৯০৬
২. এল. হেয়ার (L. Hare)—আগস্ট ১৯০৬-মে ১৯০৮
৩. সি. এস. ব্যেল্যে (C. S. Bayley)—মে ১৯০৮-নভেম্বর ১৯০৮
৪. এল. হেয়ার (L. Hare)—নভেম্বর ১৯০৮-আগস্ট ১৯১১
৫. সি. এস. ব্যেল্যে (C. S. Bayley)—আগস্ট ১৯১১-মার্চ ১৯১২

চিফ্ কমিশনার (১৯১২-১৯২১)

১. আর্চডেল আর্লি (Archdale Earle)—এপ্রিল ১৯১২-মে ১৯১৪
২. পি. আর. টি. গুর্ডন (P. R. T. Gurdon)—মে-সেপ্টেম্বর ১৯১৪
৩. আর্চডেল আর্লি (Archdale Earle)—সেপ্টেম্বর ১৯১৪-মার্চ ১৯১৮
৪. নিকোলাস্ ডড্ বিট্সন বেল (Nicholas Dodd Beatson Bell)—এপ্রিল ১৯১৮-জানুয়ারি ১৯২১

গভর্নর (১৯২১-১৯৪৭)

১. নিকোলাস্ ডড্ বিট্সন বেল (Nicholas Dodd Beatson Bell)—জানুয়ারি ১৯২১-মার্চ ১৯২১
২. উইলিয়াম সিন্‌ক্লেয়ার ম্যারিস্ (William Sinclair Marris)—মার্চ ১৯২১-অক্টোবর ১৯২২
৩. জন হেনরি কার (John Henry Kerr)—অক্টোবর ১৯২২-জুন ১৯২৭
৪. উইলিয়াম জেমস্ রীড্ (William James Reid)—কিছুদিনের জন্য হেনরি কার-এর অনুপস্থিতিতে কর্মরত ও স্থানাপন্ন
৫. এগবার্ট লোরি লুকাস্ হ্যামন্ড্ (Egbert Laurie Lucas Hammond)—জুন ১৯২৭-মে ১৯৩২
৬. মাইকেল কিনি (Michael Keane)—মে ১৯৩২-জুন ১৯৩৫ এবং অক্টোবর ১৯৩৫-মার্চ ১৯৩৭
৭. আব্রাহাম জেমস্ লেইন (Abraham James Laine)—এপ্রিল-অক্টোবর ১৯৩৫-কিছুদিনের জন্য কর্মরত
৮. রবার্ট নীল রীড্ (Robert Neil Reid)—মার্চ ১৯৩৭-মে ১৯৪২ (রবার্ট রীড্-এর অনুপস্থিতিতে ক্ষণকালের জন্য কয়েকজন দায়িত্বভার নিয়েছিলেন)
৯. অ্যানড্রু গৌরলে ক্লো (Andrew Gourlay Clow)—মে ১৯৪২-মে ১৯৪৭ (ক্লো'র অনুপস্থিতিতে কিছুদিনের জন্য এম. রেনিয়া, এ. সি. চ্যাটার্জী, এফ. সি. বোর্নি এবং এইচ. এফ. নাইট স্বল্প সময়ের জন্য কর্মরত ছিলেন)
১০. আকবর হায়দারি (Akbar Hydari)—৪ মে ১৯৪৭-১৫ আগস্ট ১৯৪৭

সূত্র : A. C. Bhuyan (ed.), *Political History of Assam*, vol. II, pp. 363-365, vol. III, p. 398 এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

সারণি ৩

ব্রিটিশ যুগে আসামে ১৯৩৫-এর আইন অনুযায়ী কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা (Ministries Constituted Under the Government of India Act 1935 in British ruled Assam)

(ক) ১ এপ্রিল ১৯৩৭-৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

১. মহ. শাদুল্লাহ (প্রধানমন্ত্রী), ২. মহ. ওয়াহিদ, ৩. জে. জে. এম. নিকোলাস-রায়, ৪. রোহিণীকুমার চৌধুরি, ৫. আলি হায়দার খান।

(খ) ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮-১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

১. মহ. শাদুল্লাহ (প্রধানমন্ত্রী), ২. জে. জে. এম. নিকোলাস-রায়, ৩. রোহিণীকুমার চৌধুরি, ৪. মুনাব্বর আলি, ৫. আব্দুল মতিন চৌধুরি, ৬. অক্ষয় কুমার দাস।

(গ) কংগ্রেস-কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-১৭ নভেম্বর ১৯৩৯

১. গোপীনাথ বরদোলই (প্রধানমন্ত্রী), ২. অক্ষয়কুমার দাস, ৩. রামনাথ দাস, ৪. কামিনীকুমার সেন, ৫. রূপনাথ ব্রহ্ম, ৬. ফখরুদ্দিন আলি আমেদ, ৭. মহম্মদ আলি, ৮. আলি হায়দার খান।

(ঘ) কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ১৭ নভেম্বর ১৯৩৯-২৫ ডিসেম্বর ১৯৪১

১. মহ. শাদুল্লাহ (প্রধানমন্ত্রী), ২. রোহিণীকুমার চৌধুরি, ৩. মুনাব্বর আলি, ৪. হীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, ৫. মুদাব্বির হুসেন চৌধুরি, ৬. মহেন্দ্রনাথ শইকিয়া, ৭. আব্দুল মতিন চৌধুরি, ৮. সইদুর রহমান, ৯. মাভিস্ ডুন, ১০. রূপনাথ ব্রহ্ম।

(ঙ) ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইনের ৯৩ নং ধারা বলে গভর্নর-এর শাসন ঃ ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪১-২৫ আগস্ট ১৯৪২

(চ) লিগ্ মন্ত্রীসভা ২৫ আগস্ট ১৯৪২-২৩ মার্চ ১৯৪৫

১. মহ. শাদুল্লাহ (প্রধানমন্ত্রী), ২. মুনাব্বর আলি, ৩. মুদাব্বির হুসেন চৌধুরি, ৪. সইদুর রহমান, ৫. আব্দুল মতিন চৌধুরি, ৬. হীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, ৭. মাভিস্ ডুন, ৮. মহেন্দ্রনাথ শইকিয়া, ৯. রূপনাথ ব্রহ্ম, ১০. নবকুমার দত্ত।

(ছ) কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ২৩ মার্চ ১৯৪৫-১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

১. মহ. শাদুল্লাহ (প্রধানমন্ত্রী), ২. বৈদ্যনাথ মুখার্জি, ৩. মুনাব্বর আলি, ৪. রোহিণীকুমার চৌধুরি, ৫. মুদাব্বির হুসেন চৌধুরি, ৬. সুরেন্দ্রনাথ বুরাগোহাইন, ৭. সইদুর রহমান, ৮. অক্ষয়কুমার দাস, ৯. আব্দুল মতিন চৌধুরি, ১০. রূপনাথ ব্রহ্ম।

(জ) কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-১৪ আগস্ট ১৯৪৭

১. গোপীনাথ বরদোলই (প্রধানমন্ত্রী), ২. বসন্তকুমার দাস, ৩. বিষ্ণুরাম মেধি, ৪. আব্দুল মতলিব মজুমদার, ৫. বৈদ্যনাথ মুখার্জি, ৬. জে. জে এম. নিকোলস্-রায়, ৭. রামনাথ দাস, ৮. ভীমবর দেউরি, ৯. আব্দুর রসিদ।

সূত্র ঃ A. C. Bhuyan (ed.), *Political History of Assam*, vol. II, p. 367, vol. III, pp. 399-400.

১৬.১ ঊনবিংশ শতকে আসামে বাংলার নবজাগরণের প্রভাব (Impact of Bengal Renaissance on Assam in the nineteenth century)

১৬.১.১ বাংলার নবজাগরণ

মহারাষ্ট্রের সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী গোপালকৃষ্ণ গোখলে'র (১৮৬৬-১৯১৫) একটি বিখ্যাত উক্তি "...what Bengal thinks today, India thinks tomorrow!" ঊনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে বেশি প্রযোজ্য। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশেই প্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এত গভীরভাবে অনুভূত হওয়ার ফলে নবজাগৃতির সূত্রপাত হয়েছিল। অধ্যাপক সুশোভন চন্দ্র সরকার ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর ক্ষেত্রে ইটালির সাথে বাংলার তুলনা করেছেন। অমিত সেন ছদ্মনামে ১৯৫০-এর দশকে (*Notes on the Bengal Renaissance*) তিনি লিখেছিলেন ঃ

> *The role played by Bengal in the modern awakening of India is thus comparable to the position occupied by Italy in the story of the European Renaissance.*

যদিও বাংলার সাথে ইটালি'র এই তুলনাটি নিয়ে বিতর্ক আছে এবং বাংলার গৌরবকে তিনি অতিরঞ্জিত করেছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন, তথাপি সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাসবোধ, যুক্তিবাদী মনন, সাংবাদিকতা, রাজনৈতিক চিন্তা, সমাজ সংস্কার, ধর্ম আন্দোলন, বিজ্ঞান-চিন্তা এবং সর্বোপরি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ইত্যাদির প্রশ্নে এক শতাব্দীর মধ্যে একসাথে এত প্রতিভার জন্ম ভারতবর্ষের অন্যত্র যে হয়নি, এটি অনস্বীকার্য। এক ধাক্কায় রূপকথার জগৎ থেকে মানুষের চেতনাকে সামগ্রিকভাবে সমাজের বাস্তব সমস্যা সমাধানের দিকে গতিমুখ ফেরাতে এবং সমষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই নবজাগৃতি এক নতুন দিশা উপহার দিয়েছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)-র (*Cultural Heritage of Bengal*) ভাষায় ঃ

> *...From the stories of gods and goddesses, kings and queens, princes and princesses, we have learnt to descend to the humble walks of life, to sympathise with the common citizen or even common peasant. ...Nowhere in the annals of Bengali literature are so many and so bright names found crowded together in the limited space of one century.*

১৬.১.২ চাঁদের হাট

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), হেন্‌রি ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-৮৬), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি (১৮১৩-৮৫), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭), লালবিহারী দে (১৮২৪-৯২), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯), তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-৫৫), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮), পিয়ারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০), রামতনু লাহিড়ি (১৮১৩-৯৮), দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি (১৮১২-৮৭), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯), মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০), হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি (১৮২৪-৬১), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), হরিনাথ দে (১৮৭৭-১৯১১), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪), বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-৮৬), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১), আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), মনমোহন ঘোষ (১৮৪৪-৯৬), অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭), দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি (১৮৪৪-৯৮), প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-৮৬), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) এবং সবার উপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রভৃতি ছিলেন ঐ যুগের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঊনবিংশ শতকের বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০), শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল বুক্ সোসাইটি (১৮১৭), হিন্দু কলেজ (১৮১৭) (যেটি ১৮৫৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়), সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪), জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশন (১৮২৪) যেটি 'স্কটিশ চার্চ কলেজ' নামে

পরিচিত, ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৫), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭), মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (১৮৭২) যার অঙ্গ হিসেবে ১৯১৭ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ, হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় (১৮৩৭) বা বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় (১৮৭৩) যেটি ১৮৭৮ সালে বেথুন কলেজের সাথে যুক্ত হয়, ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েস্ন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স (১৮৭৬), রিপন কলেজ (১৮৮৪) যেটি পরবর্তী সময়ে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ হিসেবে পরিচিত ইত্যাদি।

১৬.১.৩ 'রেনেসাঁস' নাম নিয়ে বিতর্ক

যদিও রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত সমাজ-সংস্কার আন্দোলন 'Renaissance movement' হিসেবে সর্বজনে স্বীকৃত, তথাপি উনবিংশ শতকের বঙ্গদেশে মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানকে কেউ বলেছেন 'Indian Renaissance', কেউ বা 'Hindu Renaissance' বা 'Bengal Renaissance' বা 'Calcutta Renaissance' ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে বিনয় ঘোষ (*A Critique of Bengal Renaissance*) উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও কলকাতা কেন্দ্রিক এই আন্দোলনকে মোটেই 'রেনেসাঁস' বলা যায় কি না সেটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বিতর্ককে তুঙ্গে তোলার চেষ্টা করেছেন। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) যেটির সূত্রপাত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সেটিতে অন্তিমরেখা টানেন। এটি ঘটনা, ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন থেকে শুরু করে সমাজে মহিলাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা সহ বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন ইত্যাদি সমাজের আলোকদীপ্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সমাজের নীচের তলায় তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। সতীদাহ-প্রথা রোধ, বিধবা-বিবাহ বা নারী-শিক্ষা প্রবর্তন ইত্যাদি প্রশ্ন গ্রাম-বাংলার মানুষকে তেমন উদ্দীপ্ত করতে পারেনি। যদিও স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) ও তাঁর 'সখি সমিতি', সরলা দেবী চৌধুরানি/ঘোষাল (১৮৭২-১৯৪৫) ও তাঁর 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল', লেডি অবলা বসু (১৮৬৪-১৯৫১) ও তাঁর 'নারী শিক্ষা সমিতি', সরোজ-নলিনী দত্ত (১৮৮৭-১৯২৫) ও তাঁর 'নারী মঙ্গল সমিতি' এবং সর্বোপরি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হুসেন (১৮৮০-১৯৩২) ও তাঁর 'অঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম' প্রভৃতি সামনের সারির মহিলারা নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় একাধিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন, তথাপি চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪)-কে বিবাহের পর সমকালীন প্রথা অনুযায়ী 'বেথুন কলেজ'-এর অধ্যক্ষার দায়িত্ব ত্যাগ করতে হয়েছিল। যদিও বিদ্যাসাগর জীবনের শেষ রক্তটুকু মেয়েদের শিক্ষার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন, তথাপি কেশবচন্দ্র সেন-এর মতো উজ্জ্বল

তারকাও মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। উনিশ শতকে পাবনা জেলার গ্রামের বধূ রসসুন্দরী দাসী (১৮০৯-?) নিজের চেষ্টায় ঘরে লেখাপড়া শিখে তাঁর আত্মচরিত 'আমার জীবন' (১৮৬৯) গ্রন্থে নানা বাধানিষেধের বেড়াজালে এবং অত্যাচারে জর্জরিত বাংলার গ্রামের মেয়েদের যন্ত্রণা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, অকরুণ ঈশ্বর এত কষ্ট দেখেও চিরদিনই নীরব দর্শক হয়ে আছেন। এটি ঠিক, বাংলার নবজাগরণের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু সেটি তো ইতালির 'রেনেসাঁস'-এর ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য এবং কোনোদিনই সেটি গণ-জাগরণ বা গণ-আন্দোলনের রূপ পায়নি। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রথমে একটি অংশ আলোকিত হয় এবং তারপর আলোকদীপ্তরাই অসংখ্য প্রদীপ জ্বালায়। সুতরাং 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' নাম নিয়ে বিতর্ক অহেতুক বলেই মনে হয়।

১৬.১.৪ আসাম কি স্বতন্ত্র দেশ?

যদিও রাজা রামমোহন রায় হুগলি জেলাধীন রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তথাপি ১৮১৪ সালে যখন তিনি কলকাতায় বসবাস শুরু করলেন তখন থেকেই নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল বলে সুশোভন সরকার মনে করেন, কারণ তিনিই প্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলির সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ("In his outlook, Rammohan worked out a synthesis of the best thought of the East and the West")। যদিও ১৮১৪'র আগে রামমোহন বাংলা-আসামের সীমান্ত অঞ্চলের একটি শহরে বসবাস করতেন, তথাপি অমলেন্দু গুহ'র মতে, আসাম সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল বলে মনে হয় না, সম্ভবত আপাতদৃষ্টিতে আসামকে তিনি ভারত থেকে ভিন্ন একটি দেশ বলেই মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে ভারতের সীমানা সংক্রান্ত ব্যাপারে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি গুহ উল্লেখ করেছেন ঃ "India...called Bharat is founded on its south by the sea, and on the east partly by the sea, and partly by ranges of mountains separating it from the ancient China, or rather of the countries now called Assam, Cassay and Arracans". (Susobhan Chandra Sarkar, ed., *Ram Mohan Roy on Indian Economy*, Calcutta, 1965, p. vii)।

মধ্যযুগে তুর্কি-আফগান ও মুঘলরা বারবার চেষ্টা করেও আসাম জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিল (বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮২৪ সালের আগে যে আসাম দখল করার ব্যাপারে খুব

একটা উৎসাহী ছিল না, সেটি ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি। একমাত্র ষষ্ঠদশ শতকে শ্রীমন্ত শংকরদেবের (১৪৪৯-১৫৬৯) নব-বৈষ্ণব বা ভক্তি-আন্দোলনের (প্রথম খণ্ডের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) (যেটিকে কেউ কেউ 'আসামের নবজাগরণ' হিসেবে চিহ্নিত করতে চান) অধ্যায়টি বাদ দিলে আসাম মোটামুটিভাবে ভারতীয় প্রবাহ থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বা বিচ্ছিন্নতা বজায় রেখেছিল। সুতরাং রাজা রামমোহনের পক্ষে উপরোক্ত মন্তব্য করা বিচিত্র নয়। ইদানীংকালে আসামের উগ্র জাতীয়তাবাদীদের একটি অংশের বক্তব্য ঃ সুদূর অতীত থেকে আসাম চিরদিনই আলাদা ছিল, কোনো সময়েই ভারতের অংশ হিসেবে ছিল না এবং এরই জন্য ভারতের জাতীয় সংগীতে আসামের উল্লেখ নেই। আহোম যুগে আসামের অর্থনৈতিক বা সামাজিক বনিয়াদ (শ্রমভিত্তিক স্বয়ম্ভর অর্থনীতি এবং যোগাযোগের অপ্রতুলতা ইত্যাদি নানা কারণে) ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যে কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছিল সেটি আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ করেছি, কিন্তু চিরদিনই ভিন্ন দেশ হিসেবে ছিল কি না (তাহলে তো প্রাচীন যুগের অনেক অধ্যায়ই বাদ দিতে হয়) সেটি একটি বিতর্কিত অধ্যায়।

১৬.১.৫ আসামে জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত

আসাম সম্পর্কে রামমোহনের ধারণাসহ এই বিতর্ক যাই থাক, বাংলার নবজাগরণের প্রভাব যে আসাম সহ বাংলার প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য যেমন একদিকে আধুনিক জীবন সম্পর্কে অনেককে আকৃষ্ট করল, ঠিক তেমনি নিজের ভাষাভিত্তিক দেশপ্রেমেরও জন্ম দিল। অমলেন্দু গুহ-র তত্ত্ব অনুযায়ী আসাম সহ ভারতের আধুনিক সাহিত্যে দেশপ্রেমের দুটি ধারা—একটি বড়ো জাতীয়তাবাদ বা ভারতীয় জাতীয়তবাদ এবং অন্যটি ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ (আসামের ক্ষেত্রে অসমিয়া জাতীয়তাবাদ) পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছিল এবং উনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত এই উভয় ধারার মধ্যে কোনও সংঘাত বা সংঘর্ষ দেখা যায়নি, বরং একটি অপরটিকে পুষ্ট করেছিল। আসলে, প্রত্যেকের কাছেই 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ', সুতরাং ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদে অন্যায় কিছু ছিল না। রাজেন শইকিয়া আসামে জাতীয়তাবাদ বিকাশের চিত্রের সাথে অন্ধ্র, উড়িষ্যা বা হিন্দি বলয়ের অনেক মিল খুঁজে পেয়েছেন। আসামে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার (১৮২৪) মাত্র সাত বছর পরে বাংলার *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় (১৮৩১ সালের ৩০ জুলাই) উল্লেখ করা হয়েছিল কীভাবে জ্ঞানান্বেষণের সন্ধানে

বঙ্গদেশের খুঁটিনাটি জানতে আসাম প্রদেশ থেকে প্রতিবার অসংখ্য চিঠিপত্র আসত। বাংলার কোনো জেলা থেকে অত পত্র কল্পনাও করা যেত না। আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন প্রবর্তিত শিবসাগর জেলা থেকে প্রকাশিত অসমিয়া ভাষার প্রথম পত্রিকা *অরুণোদয়* (১৮৪৬-৮৩)-এর পাশাপাশি কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলায় *সমাচার দর্পণ, সমাচার চন্দ্রিকা* এবং পরবর্তী সময়ে *মাসিক পত্রিকা* (১৮৫৪-৫৮) ইত্যাদির চাহিদা আসামে রীতিমতো বেশি ছিল। যেহেতু সেইসময় মাত্র ২টি অক্ষর ছাড়া বাংলা ও অসমিয়া লিপি ছিল মোটামুটি একইরকম, এজন্য পাঠকদেরও খুব একটা অসুবিধা হত না।

১৬.১.৬ দুই ভাই ঃ হালিরাম ও যুগোরাম

আধুনিক যুগে আসামে জাগরণের সূত্রপাতে দুই ভাই হালিরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮০২-৩২) এবং যুগোরাম থারঘাড়িয়া ফুকন (১৮০৫-৩৮) তাঁদের ক্ষণস্থায়ী জীবনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। বর্মীদের আসাম আক্রমণের সময় এই দুই ভাই বাংলার রংপুর জেলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে ব্রিটিশ শক্তি আসামে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৮২৫-এর এপ্রিলে গুয়াহাটির কালেক্টর অফিসে হালিরাম 'সেরেস্তাদার' পদে প্রথমে নিযুক্ত হন। ১৮৩২ সালে এপ্রিলে হালিরাম মাসিক ২৩০ টাকা বেতনে (যেটি সমকালীন সময়ে কোনও ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত লোভনীয় বেতন) অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। উত্তর-পূর্ব ভারতের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর জেনারেল ১৮৩২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এক চিঠিতে হালিরামের প্রশংসা করে ফোর্ট উইলিয়ামের চিফ্-সেক্রেটারিকে জানালেন ঃ

> *The individual in question (Haliram Dhekial Phukan) stood high in confidence of Mr. Scott, and is a man of large property and extended information and possesses some literary celebrity—he has visited Bengal and Hindoostan and has paid particular attention to the European system of jurisprudence and forms of Government regarding which he entertains liberal opinions.*

আর একজন ব্রিটিশ অফিসার গভর্নর-জেনারেলের এজেন্ট Col. White ১৮৩২-এর ২৮ মে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে হালিরাম সম্পর্কে এইভাবে মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> *I should think you might derive much information from him (Haliram), he is certainly clever in revenue business and enters readily into the ideal of Europeans.*

উপরোক্ত দুটি চিঠিতেই ইউরোপীয় এবং ইউরোপীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে হালিরামের দুর্বলতার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও হালিরাম ঢেকিয়াল ফুকন সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় দক্ষ ছিলেন, যদিও ইংরেজি ভাষা তিনি জানতেন না। একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হালিরাম, ১৮২৯ সালে কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে, রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে বরং শোভাবাজার রাজবাড়ির রাধাকান্ত দেবের 'ধর্মসভা'র সাথে বেশি যোগাযোগ রাখতেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, হালিরাম গোঁড়া ব্রাহ্মণ বা প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। হালিরাম ফুকন নারীশিক্ষার প্রশ্নটিকে প্রবলভাবে সমর্থন করতেন এবং *সমাচার দর্পণ*-এর সম্পাদকীয়তে (২৫ আগস্ট, ১৮৩২) তাঁর চিঠিপত্রের (যদিও বেনামে) স্বীকৃতিও আছে। হালিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের সবচেয়ে বড়ো অবদান হল, নিজের পয়সায় বাংলা ভাষায় চার অধ্যায়ে বিভক্ত 'আসাম-বুরঞ্জি' বা আসামের ইতিহাস ১৮২৯ সালে কলকাতায় 'বেঙ্গল প্রেস'-এ ছাপিয়ে বিনামূল্যে পণ্ডিতদের মধ্যে সেটির বিতরণ। এটিই ছিল ছাপার অক্ষরে বাংলা ভাষায় প্রথম আসামের বিবরণ। তারাচাঁদ চক্রবর্তী সমকালীন *ইন্ডিয়া গেজেট*-এ পুস্তকটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন যেটি *Asiatic Journal/ Monthly register* (vol. 2, May-August, ১৮৩০)-এ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

অন্যদিকে যুগোরাম থারঘাড়িয়া ফুকন শৈশবে মাতৃভাষা ছাড়াও ফার্সি ও আরবি-তে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন এবং ১৮২৭-২৯ কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে শুধু যে ইংরেজি ও বাংলা ভালো করে শিখেছিলেন তাই নয়, রাজা রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়ে তাঁকেই জীবনের ধ্রুবতারা করেছিলেন। রামমোহনের মতো যুগোরামেরই তিব্বতি (ভোট) ভাষা সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল। ৯ জুলাই ১৮৩১ কলকাতার *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় প্রকাশিত এক চিঠিতে যুগোরাম সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য ব্রিটিশ ভারতের সরকারকে অভিনন্দন জানান এবং একই সাথে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের বিদ্রুপ করেন। একই পত্রিকায় ১৯ মে ১৮৩২ সালে প্রকাশিত আর এক চিঠিতে যুগোরাম হিন্দুস্তানি ভাষাকে জনপ্রিয় করার জন্য বাংলা লিপিতে প্রচারের আবেদন জানান। আসামে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যুগোরাম প্রথমে দরং জেলার পুলিশ সুপার এবং ১৮৩০-এর দশকে গুয়াহাটিতে 'সেরেস্তাদার' ও 'সদর-আমিন' হিসেবে ব্রিটিশ শাসনধীনে কাজ করেন। যুগোরাম ফুকন সম্পর্কে Col. White-এর *Historical Miscellany* (vol. I [29]-তে ইংরেজি জানা একমাত্র অসমিয়া হিসেবে এইরকম মন্তব্য আছে ঃ

> ***...He (Juggoram) is talented but does not possess, I think, much principle. He has a tolerable knowledge of the English language,***

> *which he reads and writes, and is, so far as I know, the only Assamese so gifted. He makes no objection to dine with Europeans and eats and drinks freely of what is put before him—beef and veal not excepted.*

বাংলার 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনে যে যুগোরাম প্রভাবিত হয়েছিলেন সেটি বুঝতে অসুবিধে হয় না। ১৮৩৫ সালে যুগোরাম গুয়াহাটিতে একটি বাংলা ভার্নাকুলার স্কুল এবং একটি সরকারি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় স্কুলটির জন্য এক হাজার টাকা (সেই যুগে বিরাট) দান করেছিলেন।

১৬.১.৭ সরকারি সংস্কার ও বীজবপন

আসাম ও বাংলার মধ্যে যে প্রীতি-সম্পর্ক শুরু হচ্ছিল সেটি প্রথম হোঁচট খায় ১৮৩৭ সালে যখন আসামের স্কুল ও আদালতে অসমিয়ার স্থলে ভার্নাকুলার হিসেবে একমাত্র বাংলা ভাষা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জোর করে চাপিয়ে দেয়। সেদিন থেকে একটা চাপা গুঞ্জরণ শুরু হয়। আসামে ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বীজ এইভাবে বপন করা হয়, যেটি পরবর্তী সময়ে নানাভাবে পল্লবিত হতে থাকে। আসামে বাংলার নবজাগরণের প্রভাব এই ঐতিহাসিক পটভূমিতেই বিশ্লেষণ করতে হবে। মাত্র একবছর আগে, অর্থাৎ ১৮৩৬ সালে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা সমগ্র আসামের মধ্যে শিবসাগরে একটি ছাপাখানার প্রবর্তন করে প্রথম অসমিয়া ভাষায় পুস্তক-প্রকাশ শুরু করেছিলেন (যদিও প্রথম গ্রন্থটি বাইবেল-এর অসমিয়া অনুবাদ)। এরই জন্য অসমিয়ার স্থলে বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করার সরকারি সিদ্ধান্তটি অসমিয়া মননে গভীর যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে। শিবসাগরের ঐ ছাপাখানা থেকেই ১৮৪৬ সালে প্রথম অসমিয়া পত্রিকা *অরুণোদয়* প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ সালে 'আসাম ব্যাপটিস্ট অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়।

দাস-ব্যবস্থার অবলুপ্তি ও অন্যান্য কাজ

১৮৩০ দশকে আসামে ব্রিটিশ প্রতিপত্তি মোটামুটি স্থায়ী রূপ গ্রহণের সাথে সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ঢেউ লক্ষ করা যায়। দীর্ঘদিনের প্রচলিত শ্রমদান পদ্ধতি পরিবর্তন করে নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদান ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছিল। আসামে কোম্পানির শাসনে সবচেয়ে অভিনন্দনযোগ্য কাজটি ছিল ১৮৪৩ সালে দাস-ব্যবস্থার অবলুপ্তি। এরফলে একদিকে যেমন আসামের অভিজাত, মোহান্ত, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় (যাঁরা বিশেষেত

দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, ধর্মোত্তর সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করতেন) প্রচণ্ড উত্তেজিত হলেন, অন্যদিকে বাংলার নবজাগরণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ আর একটি অংশের মধ্যে খুশির জোয়ার লক্ষ করা গেল। রাধানাথ কটকির মতো ফৌজদারি মুহুরি মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের নামে তাদের মুক্তিকে অর্থপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক দরখাস্ত পেশ করেছিলেন। অন্যদিকে দাস-মালিকানা থেকে বঞ্চিতরাও তাদের দুর্দশা ব্যক্ত করে কোম্পানির কাছে প্রায় এক হাজার দরখাস্ত জমা দিয়েছিলেন। A. J. M. Mills-এর *Report on the Province of Assam* (1854)-এ সংগৃহীত অভিজাতদের অনেক দরখাস্তের মধ্যে একটির কয়েকটি লাইন দেখলেই তাদের ক্ষোভ কিছুটা আন্দাজ করা যায় ঃ "...Those whose ancestors never lived by digging, ploughing or carrying burdens are now reduced to such degrading employments"। স্পষ্ট দুইভাবে বিভাজিত অসমিয়া সমাজে মহান ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) তিনটি প্রধান আওয়াজ ঃ "স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী" (যার উপর ভিত্তি করে বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টারা নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন) কীভাবে বিভিন্ন অংশকে প্রভাবিত করেছিল সেই প্রশ্নটি সম্পর্কে অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এছাড়া ঊনবিংশ শতকের আসামে আরও দুটি প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঃ একটি, চা-বাগানকে কেন্দ্র করে সমাজজীবনে ইউরোপীয় বাগান-মালিকদের প্রতিপত্তি সংক্রান্ত এবং দুই, আফিং সংক্রান্ত বিতর্ক। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে যে দু'জন প্রখ্যাত অসমিয়ার ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর অনেক কিছু নির্ভর করত এবং যাঁরা আসামে আধুনিক যুগের অগ্রদূত হিসাবে পরিচিত তাঁরা হলেন আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯-৫৯) এবং মণিরাম দেওয়ান (১৮০৬-৫৮)। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে উভয় ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা আছে। এখানে শুধু বাংলার নবজাগরণের আলোকে উভয়ের মূল্যায়নের প্রশ্নটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

১৬.১.৮ আনন্দরাম ও মণিরাম

ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯-৫৯)-এর পিতা হালিরাম-এর প্রসঙ্গ আগেই আলোচিত হয়েছে। ১৮৪১-৪৪ সালে কলকাতার হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময় আনন্দরাম তাঁর প্রিয় শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র'র আদর্শে প্রভাবিত হন। কিন্তু অসুস্থতা ইত্যাদি নানা কারণে হিন্দু কলেজে পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখেই ১৮৪৫-এর জানুয়ারিতে একটি সরকারি চাকুরিতে যোগ দিতে

গুয়াহাটি ফিরে যেতে হয়। **সেইসময় নৌকার মাধ্যমে কলকাতা থেকে গুয়াহাটি যেতে হত এবং প্রায় মাসখানেক সময় লাগত।** সুতরাং গুয়াহাটি-কলকাতা যোগাযোগ খুব একটা সহজ ছিল না। আনন্দরামের জীবনীকার গুণাভিরাম বরুয়া উল্লেখ করেছেন, প্রথমে যখন আনন্দরাম কলকাতায় আসেন সেই সময় তাঁর সাথে যে শুধু 'শালগ্রাম শিলা' ছিল তাই নয়, সঙ্গে ব্রাহ্মণ পাচকও ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দুটোর কোনোটাই ছিল না। এই পরিবর্তন কম উল্লেখযোগ্য নয়। সরকারি কাজের জন্য ১৮৫০-৫২ পর্যন্ত আবার তাঁকে কলকাতায় থাকতে হয় এবং ঐ সময়েই প্রকৃতপক্ষে বাংলার অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তির সাথে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। তিনি Metcalfe Hall Library-তে নিয়মিত যাতায়াত করতেন এবং সেখানেই কলকাতার বিদগ্ধ সমাজের সাথে পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে। নিজের লেখালেখি প্রকাশ করার জন্য তিনি কলকাতায় একটি ছাপাখানাও কিনেছিলেন। কলকাতা থেকে বাংলাভাষায় তিনি Blackstone-এর *English Law Digest*-এর অনুকরণে আইনের গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন যার মধ্যে সদর দেওয়ানি ও নিজামৎ আদালতের গুরুত্বপূর্ণ রায়গুলিও সন্নিবদ্ধ ছিল। Rev. James Long রচিত *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* (1855) গ্রন্থে আনন্দরামের দুটি বইয়ের নাম (নং ২৬৭, ২৭০) উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্য ও রাজনৈতিক দর্শনেও আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের যথেষ্ট অবদান আছে।

১৮৫১ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'বেথুন সোসাইটি'র সদস্য হিসেবে আনন্দরাম নারী-শিক্ষা প্রসারণে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পিয়ারিচাঁদ মিত্র 'বেথুন সোসাইটি'র সম্পাদক থাকার সময় তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় (১৮৫২ জানুয়ারি) উপস্থিত থেকে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন এবং মিত্র সম্পাদিত *মাসিক পত্রিকার* গ্রাহক হয়েছিলেন। অসমিয়া, বাংলা, ইংরেজি ছাড়াও আনন্দরাম ফার্সি ও উর্দু ভাষাও জানতেন। যেহেতু তিনি কলকাতায় মাঝে মাঝে ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনাতেও যোগ দিতেন, এজন্য গোঁড়া ব্রাহ্মণদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের ইতিহাস পাঠ করে তিনি ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজে যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছিল তাতে এতই মুগ্ধ হন যে, আসামের *অরুণোদয়* পত্রিকায় 'ইংল্যান্ডের বিবরণ' শিরোনামে নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল, ইংল্যান্ডের মতোই (যদিও তিনি ইংল্যান্ডে যাননি) আসামে একদিন বাঁশের কুঁড়েঘর বিদায় নিয়ে সর্বত্র পাকা-বাড়ি তৈরি হবে, হাজার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল সর্বত্র গড়ে উঠবে, জঙ্গলের স্থলে সর্বত্র ফুলের বাগান, ডিঙ্গি নৌকোর স্থলে বড়ো বড়ো জাহাজ নদীপথে চলবে, গ্রামীণ দরিদ্রদের মুখে হাসির রেখা ফুটবে। এছাড়া

পিটার দ্য গ্রেট্ (১৬৭২-১৭২৫) যেভাবে ইউরোপীয় ধাঁচে রাশিয়াকে নতুন করে গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং প্রগতির পথে বাধা-সৃষ্টিকারীদের দমন করেছিলেন সেই কাহিনিও তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। হেমচন্দ্র বরুয়ার কাছে লেখা তাঁর চিঠিপত্র থেকে এটি স্পষ্ট যে, তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রতি (ঐ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও) অনেক বেশি অনুরাগী ছিলেন এবং আসামেও ঐরকম আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন।

অসমিয়া ভাষার আধুনিকীকরণ এবং আসামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিচারালয়ে তার ন্যায্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আনন্দরাম সমগ্র জীবন সংগ্রাম করেছেন, যদিও মাত্র তিরিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। ১৮৪৯ সালে শিশুদের জন্য প্রাথমিক গ্রন্থ *অসমিয়া লরার মিত্র* তিনি প্রকাশ করেন। আসামে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে আনন্দরাম সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক A. J. Moffat Mills-এর কাছে ১৮৫৩ সালের ৪ জুলাই যে প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন সেটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এটিকে একটি **দাবি-সনদ** বলা যায়, যদিও শব্দ চয়নের প্রশ্নে তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। প্রথমেই তিনি আসামে ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সকলের আস্থা ফিরে আসার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করার পর গণ-অসন্তোষের কারণগুলি ব্যাখ্যা করে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি-আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এই দীর্ঘ প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তু ছিল ঃ রায়তের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি রাজস্ব-বিভাগের আধিকারিকদের উদাসীনতা, জমি-জরিপের নামে অন্যায়ভাবে কথায় কথায় রাজস্ববৃদ্ধি, পুলিশ ও বিচার বিভাগের জোর-জুলুম ও ব্যভিচার, শিক্ষার দৈন্যদশা এবং অসমিয়া ভাষাকে অবহেলা করে বাংলা ভাষাকে স্কুল ও আদালতে চাপিয়ে দেওয়াব বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষ, মেয়েদের শিক্ষা সহ নতুন কারিগরি ও মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দাবি এবং চিনের উদাহরণ দিয়ে আফিম ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি। আনন্দরামের অধিকাংশ বক্তব্যের যৌক্তিকতা Mills স্বীকার করে নেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরই জন্য অমলেন্দু গুহ মন্তব্য করেছেন ঃ

> *...Thus, Anandaram truly represented the spirit of the Bengal Renaissance which he carried with him from Calcutta to Assam. His premature death at the age of thirty was a great loss to the cause.*

আনন্দরামের তুলনায় বরং মণিরাম দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন এবং বয়সেও জ্যেষ্ঠ ছিলেন, যদিও ফাঁসির মঞ্চে তিনি জীবনের জয়গান গেয়েছেন। আনন্দরামের

মতোই সমাজে প্রতিষ্ঠিত একটি পরিবারের সন্তান ছিলেন মণিরাম দত্ত বরুয়া (১৮০৬-৫৮)। তাঁর পিতা রাম দত্ত শুধুমাত্র আহোম রাজাদেরই নয়, ব্রিটিশদেরও অনুগত কর্মচারী ছিলেন। মণিরামও ব্রিটিশ শাসনে 'দেওয়ান' পদে আসীন ছিলেন এবং ডেভিড্ স্কট, পিতা ও পুত্রের দক্ষতা ব্রিটিশ স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে মণিরাম বিশেষ কিছু কারণে ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে পড়েন। আসামে ১৮৫৩ সালটি সাংবিধানিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আনন্দরামের মতো মণিরামও ঐ একই সালে A. J. Moffat Mills-এর কাছে দুটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন। প্রথমটিতে তিনি তাঁর বঞ্চনার কথা ব্যক্ত করে প্রতিকারের জন্য আবেদন করেছিলেন। দ্বিতীয়টিতে তিনি আহোম রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি আসামের অভিজাতবর্গ ব্রিটিশ শাসনে কীভাবে একটার পর একটা চিরাচরিত অধিকার হারিয়ে, এমনকি দাস-মালিকানা থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রায় পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছিলেন—সেই সংক্রান্ত বর্ণনা। আসলে, বাংলার নবজাগরণে আনন্দরাম নিজেকে যেভাবে যুক্ত করেছিলেন, মণিরামের ক্ষেত্রে সেটি দেখা যায় না। মণিরাম নিজের মাতৃভাষা ছাড়া বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা জানতেন, কিন্তু ইংরেজি জানতেন না। ফলে তাঁর সমস্ত বক্তব্য অনুবাদ করে তবেই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হত। *সমাচার দর্পণ* পত্রিকার গ্রাহক হলেও, কিংবা অসমিয়া পত্রিকা *অরুণোদয়*-এর তহবিলে একশো এক টাকা তিনি দান করলেও, মণিরাম যে পত্র-পত্রিকার উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করতেন তেমনটা মনে হয় না। তবে মানুষের উত্তেজনার কারণ স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে পেশ করার ক্ষেত্রে তাঁর সাহস ও বুদ্ধির প্রশংসা সকলেই করেছেন। সরকারিভাবে যেমন করে আফিম বিক্রি করা হত, মণিরাম ছিলেন তার ঘোরতর বিরোধী, বরং তিনি আফিম ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধকরণের পক্ষপাতী। তিনি শুধু যে অভিজাতশ্রেণির কথা বলেছেন তা নয়, ব্রিটিশ শাসনে স্থানীয় কারিগরদের দুর্গতি, মারওয়ার ও সিলেটের ব্যক্তিদের 'মৌঁজাদার' পদে নিয়োগের ফলে রায়তের যন্ত্রণা, কামাখ্যা মন্দির সহ বিভিন্ন ধর্মস্থানে পূজা-অর্চনা ও শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি প্রায় নিষিদ্ধ এবং অন্যায় রাজস্ব-ব্যবস্থার জন্য দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির প্রকোপ সম্পর্কেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু A. J. M. Mills আনন্দরামের প্রতিবেদনটিকে যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছিলেন, মণিরামের ক্ষেত্রে সেটি হয়নি, বরং এককথায় মণিরামের বক্তব্য বাতিল করে দিয়েছিলেন। Mills তাঁর Report-এ মণিরামকে *Untrustworthy and intriguing person* হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

Mills সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়ে কন্দর্পেশ্বর সিংহকে সিংহাসন ফিরিয়ে দেবার আর্জি নিয়ে বাংলার ছোটোলাটের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যেই *তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, বাংলার আলোকদীপ্ত আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে নয়। কিন্তু সেটির ক্ষেত্রেও তিনি ব্যর্থ হওয়ার ফলেই তরবারির মাধ্যমে তিনি তাঁর* উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের সুযোগটি তিনি শুধু গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং সিপাহিদের সাহায্য চেয়েছিলেন। সমগ্র দেশের বিভিন্ন অংশে মহাবিদ্রোহের কোনও নায়কের সাথে মণিরামের যোগাযোগের কাহিনি শোনা যায়নি। কলকাতায় যাঁদের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল, তাঁদের কেউই বাংলার নবজাগরণ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন না। বাহাদুর শাহ'কে সামনে রেখে যেভাবে ভারতের অন্যত্র মহাবিদ্রোহের ঝড় উঠেছিল, সেই প্রশ্নে তাঁর দ্বিধা থাকলেও (যেহেতু অসমিয়া মনে অতীতে মুঘল আক্রমণ সংক্রান্ত কারণে মুঘল সম্রাটের নেতৃত্ব সম্পর্কে আপত্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐ বিশেষ সময়টি তিনি আসামের ক্ষেত্রে ব্রিটিশেদের আঘাত হানার উপযুক্ত বলেই মনে করতেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এইভাবে আঘাত হানার জন্যই H. K. Barpujari মণিরামকে বিপ্লবী বা *revolutionary* বলেছেন, যেটি তিনি আনন্দরামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেননি। আসলে, চেতনার বিপ্লবের যদি প্রসঙ্গ ওঠে তাহলে কিন্তু আনন্দরামের ক্ষেত্রেই 'বিপ্লবী' আখ্যা প্রকৃতভাবে প্রযোজ্য, যাঁকে অমলেন্দু গুহ আসামে আধুনিক চিন্তার অগ্রদূত (যদিও সেটি নরমপন্থী মোড়কে) বলে মনে করেন। কেউ কেউ মণিরামকে *conservative* এবং আনন্দরামকে *an apostle of the new age* হিসেবে বর্ণনা করলেও ১৯ শতকের আসামে এই দুই প্রধান যোদ্ধার মূল্যায়নের প্রশ্নে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। অমলেন্দু গুহ মণিরামকে সর্বক্ষেত্রে *conservative* বা সংরক্ষণশীল বলে মনে করেন না, বরং তাঁর মতে, আসামে উদীয়মান চা-শিল্পকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী চিন্তার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন মণিরাম। আসলে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে অনেক কিছুর ব্যাপারেই মণিরামের কাজ যে দীর্ঘ সুচিন্তার ফসল, সেটি মনে হয় না। আসামে ভাষার প্রশ্নেও তাঁর অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল। মহেশ্বর নিয়োগ মণিরাম সম্পর্কে এইরকম মন্তব্য করেছেন ঃ "We do not have his opinion on the language question, but do very much see that in his remarkable *Buranji Vivek Ratna* he is torn between Assamese and Bengali".

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আদি পর্বে মোটামুটি তিনটি বৈশিষ্ট্য জাতীয়তাবাদীদের ছিল ঃ যেমন (১) প্রচলিত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার নির্ভীক সমালোচক, (২) শাসকশ্রেণির শোষণমূলক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে নেতৃত্বদান (নরমপন্থী বা চরমপন্থী যাইহোক), (৩) মানুষের কল্যাণার্থে জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণের জন্য ব্রিটিশ শাসকদের কাছে আহ্বান। হয়তো এর সবগুলি বা কিছু আনন্দরাম ও মণিরামের ছিল, তবে বাংলার আলোকপূর্ণ আকাশ-বাতাস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন যতটা অগ্রণী ছিলেন, মণিরাম দত্ত বরুয়া/দেওয়ান কিন্তু ততটা ছিলেন না। রাজেন শইকিয়া অসমিয়া জাতীয়বাদের পিতা হিসেবে আনন্দরামকে চিহ্নিত করে আসামের কমিশনার Hopkinson-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ *Anandaram is to Assam what Raja Rammohun Roy is to Bengal.*

১৬.১.৯ উনবিংশ শতকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কয়েকটি পত্র-পত্রিকা

ব্রিটিশ শাসনে ১৮৩৬ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত আসামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অসমিয়া ভাষা চালু ছিল না, তথাপি ১৮৭২ সালে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমিয়া ভাষায় তিনটি স্থানীয় পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায়—এর মধ্যে দুটি ছাপা হত শিবসাগর থেকে এবং একটি গুয়াহাটি থেকে। দৈনিক পত্রিকা সেইসময় একটিও ছিল না। ১৮৭২-এর পর আরও কয়েকটি পত্র-পত্রিকা উনবিংশ শতকের শেষার্ধে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সবগুলিই ছিল ক্ষণস্থায়ী। আসলে, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রশ্নটি আসামে প্রথমদিকে তেমন গুরুত্ব পায়নি। তাছাড়া স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকতারও অভাব ছিল। যদিও ভারতবর্ষের অন্যত্র সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল, আসামে কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি। ১৯ শতকে বেশিরভাগ অসমিয়া পত্র-পত্রিকায় সামাজিক সংস্কার, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা. স্বাস্থ্য, জনকল্যাণ ইত্যাদি সম্পর্কেই লেখালেখি হত, ব্রিটিশ-বিরোধী কণ্ঠ প্রায় ছিল না বললেই চলে। ফলে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পরোক্ষভাবে বরং পত্রপত্রিকা প্রকাশে সাহায্যের হাত অনেক সময় বাড়িয়ে দিতেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত অসমিয়া ছাত্রদের সাহিত্য-পত্রিকা *জোনাকি* (১৮৮৯-৯৬) রাজনীতি বর্জন করার ডাক দিয়েই যাত্রা শুরু করেছিল। এটি শুধু *জোনাকি* নয়, সমকালীন অসমিয়া পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ব্রিটিশদের বিরাগভাজন না হতে হয়। আসামে যে দ্বিভাষিক অসমিয়া ইংরেজি পত্রিকা *Asam News* (১৮৮২-৮৫) সাংবাদিকতার ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেটির বিরুদ্ধেও ব্রিটিশ

কর্তৃপক্ষের কোনো অভিযোগ ছিল না। *Asam News* সম্পর্কে আসাম উপত্যকার কমিশনারের মন্তব্য ছিল এইরকম ঃ

> *...Its tone contrasts, I think, favourably with the native press of lower Bengal... I find nothing in this newspaper calculated to foster ill-feeling between the natives and Europeans.*

সুতরাং উনবিংশ শতকের অসমিয়া পত্রপত্রিকায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব তেমন একটা দেখা যায় না, যদিও বিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে চিত্রটি ক্রমশ পাল্টে যেতে শুরু করল। মধ্যবিত্ত সমাজ বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে চিন্তা-চেতনা সহ পত্র-পত্রিকায় তার প্রভাব পরিলক্ষিত হল। উনবিংশ শতকের আসামে যে কয়েকটি পত্রিকার সন্ধান পাওয়া গেছে নীচে সেগুলির নাম উল্লেখ করা হল।

(১) **অরুণোদয় (১৮৪৬-১৮৮২)** ঃ ইয়ান্দাবো চুক্তির (১৮২৬) শর্তকে উপলক্ষ্য করে আসামে ব্রিটিশ শাসন সূত্রপাতের কুড়ি বছর পরে **আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্যোগে প্রথম অসমিয়া ভাষার পত্রিকা *অরুণোদয়* শিবসাগর থেকে ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত হয়।** মূলত খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে Oliver T. Cutter, Nathan Brown প্রমুখ ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা ১৮৩৬ সালে শিবসাগরে ছাপাখানা ও পরবর্তী সময়ে মিশন প্রেস্-এর প্রবর্তন করেন এবং সেখান থেকেই ১৮৪৬ সালে *অরুণোদয়* মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এর আগে কলকাতার সন্নিকটে শ্রীরামপুর থেকেই মিশনারিরা দেশীয় ভাষায় 'বাইবেল'-এর কপি প্রকাশ করতেন। আসামের শিবসাগর জেলা যেহেতু একসময়ে ছিল আহোম রাজাদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, এরই জন্য পূর্ব আসামে শিবসাগরের কথ্য-ভাষার মাধ্যমেই 'বাইবেল' সহ পত্রিকা প্রকাশিত হয় যাতে সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করা যায়। ক্রমে শিবসাগরের কথ্য ভাষাই অসমিয়া 'স্টান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ'-এ পরিণত হয়। উনবিংশ শতকে **আসামের তিনজন দিকপাল্—আসামের 'রাজা রামমোহন রায়' হিসেবে পরিচিত আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, অসমিয়া ভাষার 'পাণিনি' নামে খ্যাত 'হেমকোষ' রচয়িতা হেমচন্দ্র বরুয়া, আসামের 'বিদ্যাসাগর' নামে প্রশংসিত গুণাভিরাম বরুয়া**—সহ আরও অনেকে তাঁদের সাহিত্যজীবন শুরু করেন *অরুণোদয়* পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমেই। এঁরা ছাড়া Nathan Brown, Miles Bronson এবং Levi Nidhi (প্রথম অসমিয়া যিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নামটি সাহেবদের মতো করেছিলেন) প্রভৃতি ব্যক্তিরাও *অরুণোদয়*-এ লেখালেখি করতেন। *অরুণোদয়* পত্রিকায় অসমিয়া ভাষায় যখন বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত

হচ্ছিল, তখন কিন্তু আসামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আদালতে অসমিয়া ভাষার স্থান ছিল না, কারণ বাংলা ভাষার মাধ্যমেই সবকিছু হত। ফলে অবদমিত ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই বেশিরভাগ লেখা *অরুণোদয়*-এ প্রকাশিত হত এবং ভাষা-ভিত্তিক সুপ্ত জাতীয়তাবাদ এইভাবে ধীরে ধীরে মাথা তুলছিল এবং এটিই ছিল ঐ পত্রিকার সবচেয়ে বড়ো অবদান। 'আহোম বুরঞ্জি' বা 'চুটিয়া বুরঞ্জি'র অসমিয়া অনুবাদ সহ 'অনেক দেশের সংবাদ' ইত্যাদির মাধ্যমে পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করার উদ্যোগ প্রথম থেকেই পরিলক্ষিত হয়। 'উড্-কাট'-এ ছবি সহ *Illustrated London News*-এর আদলে পত্রিকার উপরে শিরোনাম ছিল এইরকম ঃ *অরুণোদয় ঃ গিয়ান ভাণ্ডার ঃ a monthly magazine devoted to religion, science and general intelligence*। ১৮৬৭-৬৮-তে *অরুণোদয়*-এর গ্রাহক সংখ্যা ছিল প্রায় সাতশো। এই পত্রিকার প্রভাব একসময় এমন ছিল যে, গ্রামের মানুষরা সব পত্রিকাকেই 'অরুণোদয়' বলে মনে করতেন। আসলে, অনেকেরই ধারণা **১৮৪৬ সালে 'অরুণোদয়' প্রকাশের সাথে আসামে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়**। খ্রিস্টধর্ম প্রচার ছাড়াও বিজ্ঞান ও সাধারণ বুদ্ধি বা জ্ঞানের প্রচার *অরুণোদয়*-এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এবং অধ্যাপক মহেশ্বর নিয়োগ-এর মতে, এই শেষের দুটি ছিল সমকালীন আসামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক নিয়োগের ভাষায় ঃ "That the *Orunodoi* was devoted to science and general intelligence is especially to be emphasized, as its pages went a long way to extend the intellectual horizons of the readers. The columns brought various news from all corners of the globe".

আসামে নবযুগ আনার ক্ষেত্রে *অরুণোদয়*-এর ভূমিকা সম্পর্কে কেউ উচ্ছ্বসিত হলেও পত্রিকাটির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও কিছু উল্লেখ দরকার। এটি শুধু যে মিশনারিদের মুখপত্র ছিল তাই নয়, ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির গৌরব-গাথাও সম্প্রচার করত। আসামের কৃষকের উপর উচ্চহারে রাজস্ব আরোপ, আফিম চাষের যবনিকা এবং সরকারি উদ্যোগে আফিমের ব্যবসা, বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ (বিশেষত ফুলাগুড়ি বিদ্রোহ), সাহেবদের পরিচালনাধীন চা-বাগানের শ্রমিকদের দুঃসহ জীবন বা সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক শোষণ সম্পর্কে পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি দেখলেই অনুমান করা যায়, কাদের স্বার্থে *অরুণোদয়* পরিচালিত হত। এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে *অরুণোদয়*-এর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দীর্ঘ ৩৬ বছর এই মাসিক পত্রিকাটি

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর ১৮৮২ সালে যবনিকা ঘনিয়ে আসে এবং 'মিশন প্রেস'টিও বিক্রি হয়ে যায়।

(২) অন্যান্য পত্রিকা ঃ উনবিংশ শতকের শেষার্ধে অসমিয়া সংবাদিকতার ভিত্তিভূমি ধীরে ধীরে তৈরি হতে শুরু করে। এই সময়ের মধ্যে বিশেষজ্ঞদের হিসেব অনুযায়ী আসামের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ডজন-খানেক পত্রিকা উদিত ও অস্তমিত হয়। এরমধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য।

ক. Asam News ঃ ১৮৮২ সালে *অরুণোদয়* পত্রিকা বন্ধ হলেও ঐ বছরেই গুয়াহাটি থেকে হেমচন্দ্র বরুয়া'র উদ্যোগে সাপ্তাহিক দ্বি-ভাষিক (অসমিয়া-ইংরেজি) *Asam News* পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। সমকালীন কিছু সমস্যা সহ আসাম সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য প্রকাশ করে পাঠকের জ্ঞান-স্পৃহা বাড়াতে এবং জনমত গঠনে পত্রিকাটি উদ্যোগী হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই পত্রিকাটির ব্যাপারে আসামের কমিশনারের কোনো অভিযোগ ছিল না *(I find, nothing in this newspaper calculated to foster ill-feeling between the natives and the Europeans—Administrative Report of 1883-84)*। একসময় পত্রিকাটির গ্রাহকসংখ্যা নয়'শো অতিক্রম করেছিল। কিন্তু মাত্র তিন বছরের মাথায় ১৮৮৫ সালের জুলাই মাসে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

খ. 'অসম বিলাসিনী' ঃ ১৮৭১ সালে মাজুলি দ্বীপে অউনিয়াতি সত্রের ধর্মপ্রকাশ প্রেস থেকে প্রকাশিত মূলত একটি মাসিক ধর্মীয় পত্রিকা। দীর্ঘ বারো বছর এই মাসিক পত্রিকাটি চলার পর সত্রটি স্থানান্তরের কারণে পত্রিকাটি ১৮৮৩ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

গ. 'অসম মিহির' ঃ ১৮৭২ সালে প্রকাশিত আসামের প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা *অসম মিহির* গুয়াহাটির চিদানন্দ প্রেস থেকে ছাপা হত। প্রথমদিকে এটি বাংলা ভাষায় ছাপা হত এবং পরবর্তী সময়ে দ্বি-ভাষিক (বাংলা ও ইংরেজি) হয়, কিন্তু উপযুক্ত গ্রাহকের অভাবে এক বছরের মধ্যেই (১৮৭৩) বন্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, 'মিহির' বা সূর্য শিরোনাম করে সিলেট থেকেও উনবিংশ শতকে *শ্রীহট্ট মিহির* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত।

ঘ. 'আসাম দর্পণ' ঃ ১৮৭৪ সালে *আসাম দর্পণ* অসমিয়া মাসিক পত্রিকাটি দরং জেলা থেকে প্রকাশিত হত, যদিও ছাপা হত কলকাতায়। কিন্তু এটিও এক বছরের মাথায় (১৮৭৫ সালে) উঠে যায়।

ঙ. 'হিতসাধিনী' ঃ ১৮৭৬ সালে গোয়ালপাড়া থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক *হিতসাধিনী* পত্রিকাটি উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে ১৮৭৮ সালে বন্ধ হয়।

চ. 'অসম দীপিকা' ঃ ১৮৭৬ সালে মাজুলির ধর্মপ্রকাশ প্রেস থেকে অসমিয়া মাসিক পত্রিকা *অসম দীপিকার* আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র এক বছর।

ছ. 'চন্দ্রোদয়' ঃ ১৮৭৬ সালে গুয়াহাটির চিদানন্দ প্রেস থেকে অসমিয়া মাসিক *চন্দ্রোদয়* প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই অবলুপ্ত হয়।

জ. 'আসাম বন্ধু' ঃ ১৮৮৫ সালে গুণাভিরাম বরুয়া সম্পাদিত অসমিয়া মাসিক পত্রিকা *আসাম বন্ধু* কলকাতায় ছাপা হত এবং নওগাঁও থেকে প্রকাশিত হত। মোট ১৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল এবং গুণাভিরাম সহ অন্যদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা এই ম্যাগাজিনে থাকলেও অধিকাংশই ছিল অসম্পূর্ণ।

ঝ. মৌ ঃ ১৮৮৬ সালে হরিনারায়ণ বরা সম্পাদিত অসমিয়া ভাষায় মাসিক সাহিত্য পত্রিকা *মৌ* কলকাতায় ছাপা হত। কিন্তু চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়।

ঞ. 'অসম তারা' ঃ ১৮৮৮-তে মাজুলি দ্বীপের ধর্মপ্রকাশ প্রেস থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা *অসম তারায়* ধর্মীয় বিষয়বস্তু ছাড়া সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধও সংকলিত হত। কিন্তু পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী তীর্থ দর্শনে যাওয়ায় ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বরে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

ট. 'জোনাকি' ঃ কলকাতায় অসমিয়া ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত 'অসমিয়া ভাষা উন্নতি সভা'র মুখপত্র হিসেবে ১৮৮৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা *জোনাকি* প্রথম আত্মপ্রকাশ করে এবং 'জোনাকি যুগের' সূচনা হয়। এই একটি পত্রিকা শুধু উনবিংশ শতকই নয়, বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ২০০১ সালে *জোনাকি*-র সমস্ত পুরাতন সংখ্যা একত্রিত করে ১,৫০০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। **বাংলার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মত, আসামের 'জোনাকি' চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, হেমচন্দ্র গোস্বামী, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া প্রভৃতি বরেণ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে আসামের সাহিত্যে 'রেনেসাঁস' এনেছিল, যদিও সেটি ছিল রোমান্টিক যুগ।** *জোনাকি*-র লেখক ও কবিরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতির লেখনীতে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বাংলার সাহিত্যিকরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। Wordsworth, Coleridge, Shelly, Byron-র কবিতায় যেমন রোমান্টিকতার ঢেউ, প্রেম, সুন্দরের আরাধনা, নৈসর্গিক শোভার বর্ণনা, মানবতাবাদ, সাধারণ

মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সন্ধান, দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়বস্তু প্রাধান্য পেত, আসামের সাহিত্য 'জোনাকি যুগে' ছিল অনুরূপ। হিতেশ্বর বরবরুয়া বা চন্দ্রধর বরুয়া যদিও মাইকেল মধুসূদন দত্ত'র অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখতেন, কিন্তু বিষয়বস্তু ছিল আসামের কাহিনি। রজনীকান্ত বরদোলই বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতেন। সবার শীর্ষে ছিলেন মুকুটহীন রাজা রসরাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। 'জোনাকি যুগে' সাহিত্যের অঙ্গনে বাংলা তথা পাশ্চাত্যের অবদান কত গভীর ছিল সেটি বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। 'অরুণোদয়'-এর যুগে যেটির সূত্রপাত হয়েছিল, 'জোনাকি'র যুগে সেটি তুঙ্গে ওঠে। ঊনবিংশ শতকে আসামে শিল্পায়ন বা নগরায়ণ-এর তেমন ব্যাপক প্রচলন হয়নি, ফলে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পেয়েছে। এরই জন্য সমকালীন ভিক্টোরীয় যুগের তুলনায় রোমান্টিক যুগের আবেদন সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। 'অরুণোদয়' ও 'জোনাকি'র অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে ডিম্বেশ্বর নিয়োগ মন্তব্য করেছেন ঃ "The *Orunodai* and the *Jonaki* were practically the organs of the two movements, the former against the usurpation by the Bengali (language) and the latter for the recoronation of the Assamese after her restoration."

ঠ. **'বিজুলি'** ঃ *জোনাকি*-র আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮৮৯ সাল থেকে যথাক্রমে কৃষ্ণপ্রসাদ দোয়েরা, পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া এবং বেণুধর রাজখোওয়া সম্পাদিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা *বিজুলি* প্রকাশিত হতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে কলকাতায় অবস্থানরত অসমিয়া ছাত্রদের উদ্যোগেই এটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং আসামে মুঘল আক্রমণ সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছিল। কিন্তু তিন বছরের মাথায় (১৮৯২) পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

ড. 'অসম' ঃ ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গুয়াহাটিতে অসমিয়া সাপ্তাহিক *অসম*-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বিংশ শতক পর্যন্ত এটি দীর্ঘস্থায়ী হয়। মাঝে মাঝে ছোটো ইংরেজি প্রবন্ধও এতে স্থান পেত। জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ *অসম* ছিল সমাজের উচ্চশ্রেণির পত্রিকা।

ঢ. The Times of Assam ঃ ১৮৯৫ সালে ডিব্রুগরের রাধানাথ প্রেস থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা *The Times of Assam*-এ চা-বাগান ও সমকালীন কিছু ঘটনাবলীর উল্লেখ থাকত।

উপরের বেশিরভাগ পত্রিকার ক্ষণস্থায়ী আয়ুষ্কাল নানা ইঙ্গিত বহন করে।

১৬.১.১০ ফলশ্রুতি

তিলোত্তমা মিশ্র তাঁর *Literature and Society in Assam : A Study in Assam Renaissance* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ Renaissance শব্দটি "...no more foreign to the Indian situation than other concepts like liberty, socialism and nationalism" এবং তিনি এটিও উল্লেখ করেছেন যে, আসামের 'রেনেসাঁস'-এর সাথে বাংলার 'রেনেসাঁস'-এর একটা দ্বন্দ্ব আছে এবং বাংলার আধিপত্য আসাম স্বীকার করেনি। তিলোত্তমা মিশ্রের মন্তব্যের উদ্দেশ্য যাইহোক, আমরা যে কজন ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ এপর্যন্ত উল্লেখ করেছি তাঁরা সকলেই কিন্তু কলকাতা থেকে উদ্দীপ্ত হয়েই আসামে ফিরে গিয়েছিলেন। বাংলার নবজাগরণের সাথে কতকগুলি মোটা দাগের বৈশিষ্ট্য জড়িত—যেমন (১) পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার ফসল, (২) সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, (৩) জনমত গঠনের ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব, (৪) সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ, (৫) নানা ধরনের সোসাইটি বা সংগঠনের উদ্ভব, (৬) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা, (৭) নগরায়ণ ইত্যাদি ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতকের আসামে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সমাকৃতি ছিল কি না সেটিরও আলোচনা প্রয়োজন। আসলে, তিনটি প্রভাব ১৯ শতকের আসামে সক্রিয় ছিল ঃ (১) ব্রিটিশ শাসনের বিস্তারের সাথে জড়িত পরিকাঠামো, (২) খ্রিস্টান মিশনারি, বিশেষত আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারির ভূমিকা এবং (৩) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলার রেনেসাঁস-এর প্রভাব। এগুলির মাধ্যমেই পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার উন্মেষ আসামে ঘটেছিল। এরই জন্য ঊনবিংশ শতকে আসামের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গভাষী মানুষের আগমন এবং সরকারি চাকুরি ইত্যাদি প্রশ্নে অসমিয়া ও বাঙালির মধ্যে প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব এবং অসমিয়া মননে কিছুটা ক্ষোভ থাকলেও পারস্পরিক সম্পর্ক পরবর্তী সময়ের মতো অত তিক্ত হয়নি।

১৬.১.১০.১ দৈনন্দিন জীবনে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব

এটি ঘটনা, ১৮৩৬ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত অসমিয়া ভাষা তার মর্যাদা পায়নি এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমেই আসামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আদালতে কাজকর্ম চালাতে হত। কিন্তু ৩৭ বছর বাদে ১৮৭৩ সালে অসমিয়া ভাষা তার হারানো মর্যাদা ফিরে পায়। এই প্রশ্নে অবশ্য আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ডিম্বেশ্বর নিয়োগ (১৭.৩০ দ্রষ্টব্য)-এর ভাষায় ঃ "The Missionaries not only liberated the spirit of the Assamese from the bondage of old-world ideas in the domain of thought, but they also removed the confines

of the language and made it quite suitable for modern age"। ১৮৭৪ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসাম চিফ্-কমিশনার শাসিত প্রদেশে পরিণত হয়। ১৯ শতকে আসামের বিভিন্ন স্থানে বাঙালি অধ্যুষিত ছোটো ছোটো শহরের উদ্ভবের ফলে স্বাস্থ্যকর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমিও তৈরি হয়, যেটি পরবর্তী সময়ের মতো উৎকট ও উগ্র জাতীয়তাবাদের চেহারা নেয়নি। আসামে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বাংলার নবজাগরণের প্রভাব মোটেই তুচ্ছ ছিল না। শুধু যে যুগোরাম ফুকন বা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবিত হয়েছিলেন তাই নয়, আসামের শিক্ষিতদের মধ্যমণি 'doyen of Assamese litterateurs' লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য) তাঁর আত্মজীবনীতে ('মোর জীবন স্মরণ') স্বীকার করেছেন কীভাবে প্রচলিত প্রথা-বিরোধী তাঁর ইউরোপীয় পোশাক ও কেশচর্চা দেখে পিতা দীননাথ বেজবরুয়া হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া বাঙালি ধুতি-পাঞ্জাবি ইত্যাদি পোশাক-পরিচ্ছদ, বাঙালিদের মতো আচার-আচরণ, এমনকি রান্নাঘরের খাদ্যবস্তুও অসমিয়া বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে প্রভাবিত হয় এবং মহিলারা শাড়িতে অভ্যস্ত হন। সমাজের গোঁড়াপন্থীরা পুরোপুরি সাহেবিয়ানা বা পাশ্চাত্যকরণের তুলনায় বরং বাঙালিয়ানাকে কিছুটা সহ্য করতেন। অসমিয়া ভদ্রলোকদের বাঙালিদের মতো 'বাবু' বলে ডাকার রেওয়াজ তৈরি হল যদিও সমকালীন 'মৌ' পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭) 'অসমিয়া বাবু'দের কেন্দ্র করে অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছিল। কলকাতায় পড়ুয়া অসমিয়া ছাত্ররা নানাভাবে স্থানীয় প্রভাবে প্রভাবিত হলেন। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, তৎকালীন কলকাতার *সমাচার-দর্পণ, সমাচার-চন্দ্রিকা, মাসিক পত্রিকা* শুধু আসামের শহরাঞ্চলেই নয়, বেশ কিছু গ্রামাঞ্চলেও প্রচারিত হত। বাংলার পূজাপার্বনের অধিকাংশই আস্তে আস্তে আসামের গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ল। H. K. Barpujari (*Assam : In the Days of the Company*) উল্লেখ করেছেন কীভাবে আসামের সমাজজীবনে বাংলার গান, বাদ্যযন্ত্র, যাত্রা এমনকি বাইজি-নাচ ইত্যাদিও প্রবেশ করল। সত্রের মোহান্তরা পর্যন্ত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনায় এগুলিকেই মনোনয়ন দিতে দ্বিধা করলেন না। একইসাথে, পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া অবহিত করেছেন, নতুন সংস্কৃতির ঢেউয়ে আসামের নিজস্ব চিরাচরিত লোক-সংস্কৃতি, বিহু নাচ-গান ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষিত অসমিয়াদের মধ্যে বৈরাগ্য বা নাক-সিটকানো মানসিকতা গজিয়ে উঠল। একদিকে যেমন পশ্চিমি প্রভাবে প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাস ইত্যাদির স্থলে যুক্তিবাদী চিন্তা প্রাধান্য পেল, তেমনি দৈনন্দিন জীবনের সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রতিবেশী বঙ্গের ভালো-মন্দ অনেক কিছুরই অনুপ্রবেশ ঘটল।

১৬.১.১০.২ নারী-শিক্ষা

বাংলার তুলনায় আসামের সমাজ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিছুটা উদার ছিল। কুলিন প্রথা, সতীদাহ প্রথা, কন্যা-সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি ব্যাধি থেকে আসাম মোটামুটি মুক্ত ছিল। পুরুষের বহু-বিবাহ অথবা বাল্য-বিবাহ ইত্যাদি কিছু ক্ষেত্রে থাকলেও বাংলার মতো অত ভয়াবহ আকার নেয়নি। প্রথাগত শিক্ষাদীক্ষার প্রশ্নে অবশ্য অসমিয়া মহিলারা অন্ধকারে থাকলেও এটি দাবি করা হয় যে, কিছু সামাজিক মর্যাদা মহিলারা ভোগ করতেন। ঘরে বসে মা সহ সংসারের অন্যদের কাছ থেকে হাতের কাজ, বোনা ইত্যাদির মধ্যে তাদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকত। এরই জন্য হালিরাম ঢেকিয়াল ফুকন, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন থেকে শুরু করে বাংলার নবজাগরণে আলোকদীপ্ত ইংরেজি শিক্ষিত যুবকরা নারী-শিক্ষার উপর প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন। অবশ্য উদ্দেশ্য তাঁদের যাই থাক, এই ব্যাপারে খ্রিস্টান মিশনারিরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। আসামে মেয়েদের জন্য প্রথম শিবসাগরে ১৮৪০ সালে মিশনারি স্কুল তৈরি করেন Mrs. Brown এবং Mrs. Cutter, এরপর ১৮৪৩ সালে Bronson নওগাঁও-এ, Mrs. Barker ১৮৫০ সালে গুয়াহাটিতে। কিন্তু উচ্চশ্রেণিভুক্ত অভিভাবকদের এইসব স্কুল সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ ও ভীতি থাকার ফলে মিশনারিদের উদ্যোগ তেমনভাবে সফল হয়নি। ১৮৫৪ সালে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে Wood-এর Despatch-এর পর ১৮৬০-৬১-তে প্রথম মেয়েদের জন্য শিবসাগরে সরকারি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল। পরের দু'বছর এইরকম সরকারি স্কুল গুয়াহাটি ও নওগাঁও-তেও স্থাপিত হল। সরকার বা মিশনারি ছাড়াও উদার মনোভাবাপন্ন অসমিয়া বা অ-অসমিয়াদের কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও ১৯ শতকে আসামে নারীশিক্ষা যে মোটেই সন্তোষজনকভাবে এগোয়নি সেটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ১৮৭৪-৭৫ সালে সমগ্র আসামে প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৮৫৭ জন। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে (১৮৯৭-৯৮) সমগ্র আসামে (পার্বত্য এলাকা সহ) মোট প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় ছিল ২৩৫টি এবং মোট ছাত্রী ৩৮২৩, এছাড়া ৩টি মিডিল স্কুলে মোট ২৩৫ ছাত্রী ছিল।

ঊনবিংশ শতকের আসামে ঢেকিয়াল ফুকন ছাড়াও গুণাভিরাম বরুয়া (১৮৩৭-৯৪), হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩৫-৯৬), মানিকচন্দ্র বরুয়া (১৮৫১-১৯১৫), জগন্নাথ বরুয়া (১৮৫১-১৯০৭), হরিবিলাস আগরওয়ালা (১৮৪২-১৯১৬) প্রভৃতি আলোকদীপ্ত বুদ্ধিজীবীরা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। সেই সময় মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটি কোনো

স্থানেই তেমন গুরুত্ব পায়নি, এরই জন্য দেখা যায় স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী নব-আলোকিত অসমিয়াদের একাংশ মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে প্রকাশ্যেই অনাগ্রহ দেখাতেন। সমকালীন *মৌ* পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধ (বিশেষত ডিসেম্বর ১৮৮৬-র একটি লেখা) থেকে এই ধারণাটি পাওয়া যায়। এরই জন্য H. K. Barpujari ও অন্যান্যদের সম্পাদিত *Political History of Assam* (vol. I, p. 131)-তে দেখা যায় এরকম মন্তব্য ঃ "Western Culture, higher education of women in particular, it was feared, would produce a greater disaster than the invasion of the Burmese in Assam"। সুতরাং আসামে মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত ছিল—এসব কথা মুখে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে কেমন ছিল, উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়। আসলে, উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত-ধারণা নিরসনে উপযুক্ত পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি বলেই এইরকম মধ্যযুগীয় চিন্তা থেকে অসমিয়া সমাজ পুরোপুরি মুক্ত হয়নি। এটি ছিল বড়ো সীমাবদ্ধতা এবং এর জন্য বাংলার সাথে তুলনামূলক বিচারে আসামে 'রেনেসাঁস'-এর ভিত্তিভূমি ছিল দুর্বল। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ছিল প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বেশি আলোকদীপ্ত গুণাভিরাম বরুয়া (১৭.১৮ দ্রষ্টব্য) এবং হেমচন্দ্র বরুয়ার (১৭.৭৪ দ্রষ্টব্য) যুগ, সুতরাং তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি।

১৬.১.১০.৩ অন্যান্য সমাজ-সংস্কার

আসামের সমাজ-সংস্কারকরা যে তিনটি সামাজিক ব্যাধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সেগুলি হল ঃ (১) বৈধব্যের যন্ত্রণা, (২) আফিমের নেশা, (৩) পুরুষের বহু-বিবাহ (যদিও সংখ্যার দিক থেকে সেটি খুব বেশি ছিল না)।

গুণাভিরামের জীবন প্রসঙ্গে আলোচনার সময় (১৭.১৮ দ্রষ্টব্য) আমরা লক্ষ করব কীভাবে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছায়াসঙ্গী হয়ে বিধবা-বিবাহের অন্যতম প্রবক্তা হয়েছিলেন। আসামে সতীদাহ প্রথা ছিল না ঠিক, কিন্তু বিধবাদের লাঞ্ছনা যথারীতি ছিল। বৈধব্যের যন্ত্রণা শুধু আসাম নয়, সমগ্র দেশের একটি অন্ধকারের দিক। সম্প্রতিকালে অসমিয়া লেখিকা ইন্দিরা রাইসম গোস্বামী (১৭.৭ দ্রষ্টব্য) এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করে বিখ্যাত হয়েছেন। গুণাভিরাম নিজে বিধবা বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর কন্যা বিধবা হওয়ার পর পুনর্বার বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর 'রাম নবমী' নাটক-এর মাধ্যমে তিনি জনমত সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। **হেমচন্দ্র বরুয়া (১৭.৭৪ দ্রষ্টব্য) যাঁকে *Father of the Modern Assamese***

language and literature আখ্যা দেওয়া হয়, তিনিও গুণাভিরামের সাথে সহমত ব্যক্ত করতেন এবং এই প্রশ্নে অনেক সাহিত্য-কীর্তিও সৃষ্টি করেছিলেন। সরকারিভাবে ১৮৫৬ সালে বিধবা পুনর্বিবাহ আইন (Act XV of 1856) পাস হলেও বাংলার মতো আসামের গ্রামাঞ্চলেও এটি সঠিকভাবে কার্যকরী হয়নি। জীবনের সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত বিধবাদের সাথে সহমর্মিতা ব্যক্ত করে সমাজ সংস্কারকরা উদ্যোগ নিলেও সেটি কতটুকু সাফল্যলাভ করেছিল তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে আফিম সংক্রান্ত আলোচনা আছে। হেমচন্দ্র বরুয়া তাঁর 'কানিয়ার কীর্তন' নাটকে উল্লেখ করেছেন, কীভাবে আফিমের নেশা আসামের সমস্ত উদ্যম উদ্যোগকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ঐ নাটকে ধুরন্ধর সমাজপতি ও ধর্মীয় নেতাদের নৈতিক অধঃপতন, মিথ্যাভাষণ, অন্যায় আচরণের জন্য আফিমের নেশাকেই দায়ী করা হয়েছে। একদিকে আসামে আফিম চাষ নিষিদ্ধ, অন্যদিকে আফিম সরবরাহের কাজ ব্রিটিশ সরকার নিজের দায়িত্বে নেওয়ার কারণে এবং ক্রমাগত দর বৃদ্ধি হেতু সংকট আরও তীব্র হয়েছিল। A. J. M. Mills-এর কাছে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন ও মণিরাম দত্ত বরুয়া/দেওয়ান যে প্রতিবেদনগুলি পেশ করেছিলেন, তার মধ্যে আফিমের প্রশ্নটিও ছিল, যদিও তাঁরা নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমস্যাটি দেখেছিলেন। গুণাভিরাম বরুয়া আসামে আফিম-ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। হরিবিলাস আগরওয়ালা (নিজে আফিম ব্যবসায়ী) ধীরে ধীরে আফিম ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার কথা বলতেন। সত্যনাথ বোরা মনে করতেন, আফিম গ্রহণ না করলে যদি কারও মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তাহলে তার ক্ষেত্রে আফিম সরবরাহ বন্ধ করা যথাযথ হবে না। অন্যদিকে জগন্নাথ বরুয়ার নেতৃত্বাধীন 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা' আফিম গ্রহণ নিষিদ্ধকরণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, কারণ তাঁর মতে, আফিম নিষিদ্ধ করলে সাধারণ মানুষ মদ সহ আরও মারাত্মক নেশার দিকে ঝুঁকবে। যদিও আফিম নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন 'নিবারণী সভা' গঠিত হয়েছিল এবং জনমতের চাপে Royal Commission on Opium ১৮৯৩-৯৪ সালে রিপোর্ট পেশ করতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু 'নানা মুনির নানা মত'-এর জন্য Royal Commission কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে, আফিম-বিরোধী সংস্কার অভিযান অসমাপ্তই রয়ে গেল।

আর একটি সামাজিক ব্যাধি দূর করার ব্যাপারে বাংলার নবজাগরণের আলোকে উদ্ভাসিত কিছু বুদ্ধিজীবী উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং সেটি ছিল পুরুষের বহু বিবাহ প্রথা, যদিও সেটি সীমিত ছিল কিছু অংশের মধ্যে। *অরুণোদয়* পত্রিকায়

'শ্রীসোনারচাঁদ' ছদ্মনামে (সম্ভবত হেমচন্দ্র বরুয়া) 'অনেক বিয়া করা অজুগুৎ' নামে এক প্রবন্ধে এই প্রথার বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছিল। হেমচন্দ্র বরুয়া নিজের নামে 'বাহিরে রংচং ভিতরে কোওয়া ভাতুরি' (বাইরে হাঁকডাক, অন্দরে শূন্য বা চক্‌চক্ করলেই সোনা হয় না) নামে একটি ছোট্ট উপন্যাসে বহু-বিবাহকে রীতিমত ব্যঙ্গ করেছিলেন। বেণুধর রাজখোওয়া (১৮৭২-১৯৫৫) তাঁর 'তিনি ঘইনী' (তিনজন স্ত্রী বা ঘরনী) নাটকে অধিবেত্তা বা বহুগামিতার বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত হেনেছেন। এই অধিবেদন পদ্ধতি সহ অসামাজিক গুপ্তপ্রেম ও ব্যভিচার প্রতিবেশী বঙ্গদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের সমাজে কেমন ছিল সেটি রুদ্ররাম বরদোলই তাঁর 'বাঙ্গাল-বাঙ্গালিনী' নাটকে চিত্রিত করেছিলেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৮৬৮-১৯৩৮) (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য) 'কৃপাবর বরুয়া' ছদ্মনামে লিখিত বিভিন্ন লেখায় বহুবিবাহ সংক্রান্ত ব্যাধি থেকে মুক্তির আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরফলে, একটা গণচেতনা গড়ে উঠেছিল ঠিক, যদিও সেইসময় সমাজজীবন থেকে ব্যাধিটিকে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

এইভাবে আমরা দেখি, **বাংলার নবজাগরণের ফসল আসামের মাটিতে যে ব্যাপকভাবে ফলেছিল তা নয়।** আসলে, ঊনবিংশ শতকে আসামে মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব তেমনভাবে হয়নি, যতটুকু হয়েছিল সেটি গুটিকয়েকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরই জন্য তথাকথিত 'নবজাগরণ'-এর ঢেউ সকলকে সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করেনি।

১৬.২ বঙ্গভঙ্গ ও আসাম (Partition of Bengal and Assam)

১৮২৬ সালে ইয়ান্দাবো চুক্তিকে কেন্দ্র করে আহোম রাজ্য অধিকারের পর আসামকে ব্রিটিশ শাসনাধীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেই সময় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বলতে অবিভক্ত বঙ্গদেশ সহ বিহার, উড়িষ্যা, সমগ্র যুক্ত প্রদেশ (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ), মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ, ছোটোনাগপুর ও আসামকেও বোঝাত। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তুলনায় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি আয়তনে ছিল বৃহত্তম। যেহেতু এই বিশাল এলাকা কার্যকরীভাবে শাসন করা ছিল কঠিন কাজ, এজন্য বারবার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের কাজ অতীতে হয়েছে। ১৮৭৪ সালে আসামকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে স্বতন্ত্র করে চিফ্-কমিশনার শাসিত প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের পূর্বলগ্নে (১৯০৩) বাংলার ছোটোলাটের শাসনাধীনে ছিল ৭,৮৪,৯৩,৪১০ জন মানুষ অধ্যুষিত ১,৮৯,৮৩৭ বর্গমাইল এলাকা এবং রাজস্ব ছিল (বার্ষিক) ১,১৩৭ লক্ষ, যার মধ্যে ৫০.৫ লক্ষ আসত ভূমিরাজস্ব থেকে।

শুধু আয়তনের কারণেই নয়, অন্যান্য অনেক কারণে বঙ্গদেশের শক্তিকে খর্ব করার চেষ্টা অতীতে হয়েছে। অবশ্য সরকারিভাবে আয়তনের বিশালতাকেই প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৮৫৩ সালের ডিসেম্বরে লর্ড ডালহৌসি মন্তব্য করেছিলেন, বঙ্গদেশ শাসনের বোঝা কোনো জীবিত মানুষের পক্ষে বহন করা কঠিন "a burden which in its present mass is more than mortal man can fitly bear"। কুড়ি বছর পরে বাংলার ছোটোলাট Sir George Campbell একই কথা বলেছিলেন ঃ "It is totally impossible that any man can properly perform single-handed the work of this Great Government"। আসামের প্রশ্নে ১৮৯২ সালে কিছু সরকারি অফিসার চট্টগ্রাম ডিভিসনকে আসামের সাথে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই প্রস্তাবের সাথে আসামের চিফ্-কমিশনার Sir William Ward ১৮৯৬ সালে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকেও আসামের সাথে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ১৮৯৭ সালে আসামের পরবর্তী চিফ্-কমিশনার Sir Henry Cotton উপরোক্ত দুটি প্রস্তাবই বাতিল করে দিয়েছিলেন, যদিও ১৮৯৭ সালে লুসাই পাহাড়ের শাসনব্যবস্থা তিনি বাংলার থেকে আসামে পরিবর্তন করেছিলেন।

১৯০৩ সালে বাংলার ছোটোলাট Sir Andrew Fraser আসামের চা-বাগানের ইউরোপীয় মালিকদের ক্রমাগত চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ১৮৯৬ সালে Sir William Ward-এর প্রস্তাবটি পুনরুজ্জীবিত করলেন, অর্থাৎ চট্টগ্রাম ডিভিসন এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা বঙ্গদেশ থেকে কেটে আসামে অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নটির উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। সমকালীন আসামের কমিশনার J. B. Fuller-ও এই ব্যাপারে সহমত ব্যক্ত করলেন। আসামের চা-সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল দ্রুত এবং কম খরচে বিদেশে রপ্তানির প্রশ্নে সমুদ্র বন্দর ছিল জরুরি এবং এরই জন্য চট্টগ্রাম ইত্যাদিকে আসামের অঙ্গীভূত করার এই প্রচেষ্টা। ভাইসরয় কার্জন ১৯০৩ সালে যখন আসাম সফরে এসেছিলেন সেইসময় J. B. Fuller এটির গুরুত্ব কার্জন এবং ভারত সরকারের সচিব H. H. Risley-কে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। Fraser এবং Fuller সাহেবদের এই প্রস্তাবটি লর্ড কার্জনের মূল উদ্দেশ্যটিকে নানাভাবে সহায়তা করায় তিনি এটি লুফে নিয়েছিলেন। সর্বভারতীয় মঞ্চে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার আধিপত্য এবং বাঙালির মেরুদণ্ডকে চিরতরে ভেঙে চুরমার করার মানসিকতা নিয়েই কার্জন ভারতে এসেছিলেন। ১৯০৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি লন্ডনে Secretary of the State-কে

লেখা এক চিঠিতে কার্জন নগ্নভাবেই স্বীকার করেছিলেন : *...The whole of their (leaders of Bengal) activity is directed to creating an agency so powerful that they may one day be able to force a weak government to give them what they desire.* বাংলা ভাগের প্রশ্নে কার্জন কীভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কায়েম করতে চেয়েছিলেন, সেটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেছেন :

> *In East Bengal, the Muslims, politically less advanced and more loyal to the British than the Hindus, would be in a majority, while in Bengal the Bengalis would form a minority by inclusion of Bihar and Orissa. Thus the Bengalis would be divided from their kith and kin, the Bengali Hindus, hated and dreaded by Curzon for their advanced political ideas, would form a minority, and a thin wedge would be driven between the Hindus and Muslims of Bengal.*

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে ১৯০৫ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর ভারত সরকার ঘোষণা করল যে সমগ্র পূর্ববঙ্গ, দার্জিলিং ও মালদহ ছাড়া উত্তরবঙ্গ এবং আসামকে একত্রিত করে Eastern Bengal and Assam নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ তৈরি হবে এবং ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে এটি কার্যকরী হবে। বাংলাকে তথাকথিত 'ভারী বোঝা' থেকে মুক্ত করা এবং আসামের উন্নয়ন—এই দুটি ছিল সরকারি যুক্তি। Risley উল্লেখ করলেন, আয়তনে ক্ষুদ্র আসামে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অফিসার শাসনব্যবস্থায় অংশ নিতে অনাগ্রহী হওয়ার জন্যই আসামের আয়তন বৃদ্ধি জরুরি ছিল "to give to its officers a wider and more interesting field of work" এবং একই সাথে আসামের জন্য "a maritime outlet in order to develop its industries in tea, oil and coal" (অবশ্যই ব্রিটিশ স্বার্থে)। এইভাবে ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইলের 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' রাজ্যের অভ্যুদয় হল, যার মোট জনসংখ্যা ছিল ৩১ মিলিয়ন এবং যেটির নতুন রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হল। এই নতুন রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১,৮০,৩৬,৬৮৮ এবং হিন্দু ১,২০,৩৬,৫৩৬ এবং বাংলাভাষী ২,৭২,৭২,৬৯৫ এবং অসমিয়া ভাষী ১৩,৪৯,৭৮৪ এবং বাকি অংশ বোরো, খাসি, গারো, মণিপুরী, হিন্দি ইত্যাদি ভাষার জনগোষ্ঠী।

কীভাবে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সমগ্র বঙ্গদেশকে উত্তাল করেছিল এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৯০৩ এবং ১৯০৪ সালের অধিবেশনে পরিকল্পিত

উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল (যেমন, ১৯০৪ সালে বোম্বাই-এ জাতীয় কংগ্রেসের বিংশতি অধিবেশনের সভাপতি Sir Henry Cotton বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন এইভাবে ঃ *the most arbitrary and unsympathetic evidence of irresponsible statesmanship*) সেইসব প্রসঙ্গে বর্তমানে না গিয়ে, আসামে প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল সেটির মধ্যেই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখব।

প্রাথমিকভাবে, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবটি আসামের কাছে প্রায় বিনামেঘে বজ্রপাতের মতোই মনে হয়েছিল। ব্রিটিশ আধিপত্য শুরু হওয়ার সময় থেকে আসাম দীর্ঘদিন ব্রিটিশ-বঙ্গের শাসনের অধীনস্থই ছিল এবং বাংলার ছোটোলাটের কাছে আসামের স্বার্থের প্রশ্নটি কোনও সময়েই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়নি। ১৮৭৪ সালে আসামের জন্য স্বতন্ত্র চিফ্-কমিশনারের পদ সৃষ্টি করে উপরোক্ত সমস্যার কিছুটা সুরাহা হচ্ছিল—যেমন, যাতায়াতের ক্ষেত্রে রেল ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং প্রতিদিন ব্রহ্মপুত্রে স্টিমার সার্ভিস, শিক্ষার সম্প্রসারণ, অসমিয়া ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও এনট্রান্স পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঐ ভাষার মাধ্যমে লেখার স্বীকৃতি-দান, সরকারি চাকুরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অসমিয়াদের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি সদর দফতর আসামে থাকায় কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরি নিজেদের অভাব-অভিযোগ বা দাবি পেশ করার অধিকার ইত্যাদি। কিন্তু মাত্র তিরিশ বছর এটি চালু থাকার পর সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হল (মানিকচন্দ্র বরুয়া'র ভাষায় (to "nullify the good that has been derived")। প্রথমদিকে এই নতুন অংশটির নাম "North-Eastern Province" করার চিন্তাভাবনা ছিল। 'আসাম' নামের উল্লেখ না থাকায় হতবাক্ Assam Association ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪-এ অনুষ্ঠিত সভায় আসামের ক্ষোভ এইভাবে ব্যক্ত করেছিল ঃ *...the historic name of Assam will be obliterated forever, her language will suffer, and the removal of the seat of Government to a place outside Assam proper and further away from the geographical centre will necessarily make her lose the amount of care and attention which it at present receives from the Government*। যাইহোক, শেষপর্যন্ত আসাম নামটি পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত থাকায় কিছুটা স্বস্তি হয়তো আসামে ফিরে এসেছিল ; যদিও লর্ড কার্জন নিজেই ঢাকা ও ময়মনসিংহে প্রকাশ্য বক্তৃতায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, সংখ্যাধিক্য বাংলা-ভাষীর চাপে হয়তো একদিন অসমিয়া ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আসলে, 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা' ও 'আসাম অ্যাসোশিয়েসন'-এর

এটিই ছিল বড়ো ভয়। একদিকে কার্জন এবং অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম ছোটোলাট Fuller উভয়েরই প্রধান লক্ষ্য ছিল বাঙালি হিন্দুর আধিপত্য খর্ব করা (অমলেন্দু গুহ'র ভাষায় ঃ *Fuller found in the Assamese, as well as in the Muslim religious community, a counterpoise to the expansionism of the Bengali Hindus...this manoeuvre was sure to bear bitter fruit in the context of the divide and rule policy)*।

বাংলা ভাষার আধিপত্যের প্রশ্ন ছাড়াও বঙ্গভঙ্গের পরিণাম হিসেবে শিক্ষিত অসমিয়াদের চাকুরি সংকোচন এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য অসুবিধের প্রশ্নগুলিও উপরোক্ত দুটি সংগঠনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯০৯ সালে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ ও আসাম আইন-পরিষদের সদস্য হিসেবে প্রথম বক্তৃতায় মানিকচন্দ্র বরুয়া (১৭.৫৫ দ্রষ্টব্য) আসাম ডিভিশনের কমিশনার লে. কর্নেল P. R. T. Gurdon-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে (*...both the Ahoms and the Assamese Hindus are in great danger of being elbowed out of all Government as well as industrial employment by the people of Eastern Bengal*) অসমিয়াদের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু আসাম পূর্ববঙ্গের প্রথম ছোটোলাট J. B. Fuller সহ অন্যান্য ব্রিটিশ কর্মকর্তা অসমিয়াদের উষ্মা প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে যেসব যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন, সেগুলি নিম্নরূপ ঃ (১) বঙ্গভঙ্গের পরিণামে আসামের আয়তন বৃদ্ধি এবং আসামের পশ্চিমাংশ প্রাকৃতিক সুনির্দিষ্ট সীমানায় চিহ্নিতকরণ সম্ভবপর হয়েছে, (২) সামুদ্রিক পথ থেকে বঞ্চিত আসাম এতদিন বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর আসামের সাথে সংযুক্ত হওয়ায় এতদিনের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে আসাম মুক্তি পেয়েছে। আসাম-বেঙ্গল রেললাইন ইতিমধ্যে আসামের অভ্যন্তরের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের সংযোগ স্থাপন করেছে এবং এরফলে আসামের বহির্বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে (সরকারি ভাষায় ঃ "...this had ushered in an era of flourishing trade and commerce mostly in export trade")।

কিন্তু উপরোক্ত সব যুক্তিই যে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে (আসামের মানুষের স্বার্থে নয়) এটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বাংলার মতো তীব্র বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী 'স্বদেশি' ও 'বয়কট' আন্দোলন আসামে তেমনভাবে ছড়িয়ে পড়েনি ; যদিও ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটি, ডিব্রুগড় ও বরাক উপত্যকায় বেশ কিছু প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হয়েছিল। H. K. Barpujari মনে করেন, বঙ্গভঙ্গের ফলে আসামের উন্নতির যে চিত্র আঁকা হয়েছিল, তার সবটাই ছিল সাম্রাজ্যবাদের

স্বার্থেঃ *These were designed to serve imperial interests administrative, economic, strategic and military, not in the interest of the needs, wishes and aspirations of the people.*

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয়েছিল এবং ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বাংলার উত্তাল 'স্বদেশি' আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। এরফলে, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ আবার যুক্ত হয়েছিল এবং আসাম ১৯১২ সালে চিফ্-কমিশনার শাসিত প্রদেশ হিসেবে স্বতন্ত্র মর্যাদা ফিরে পেয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী 'স্বদেশি' ও 'বয়কট' আন্দোলন বরাক উপত্যকায় যেমন জনজাগরণ সৃষ্টি করেছিল আসামের অন্যত্র তেমন হয়নি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শহরাঞ্চলে, যেখানে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা বেশি, একমাত্র সেইসব এলাকাতেই আন্দোলন কিছুটা দানা বেঁধেছিল। যদিও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করার প্রশ্নে মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি গুজব ইত্যাদির মাধ্যমে নানারকম উত্তেজনা ছড়ানোর অপচেষ্টা নিয়েছিল, কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃত্বের সজাগ সতর্ক প্রহরার জন্য আসামের ব্রহ্মপুত্র বা বরাক উপত্যকার কোথাও তেমন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা যায়নি। বরং ১৯০৬ সালে ডিব্রুগড়ে বঙ্গভঙ্গের প্রথম বর্ষে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির নায়ক নবাব সেলিমুল্লার দুটি কুশপুত্তলিকা তৈরি হয় একটি হিন্দুরা দাহ করে এবং অন্যটি মুসলমানরা কবরস্থ করে।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতের অন্যত্র যেমন জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করেছিল, আসামেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। চরমপন্থীদের একটি অংশ বঙ্গদেশে যেমন কমপক্ষে পাঁচটি বৈপ্লবিক (সরকারি পরিভাষায় 'টেররিস্ট' বা 'সন্ত্রাসবাদী') সংগঠন তৈরি করেছিলেন, আসামে এর মধ্যে দুটির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় ঃ (১) ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' এবং (২) ময়মনসিংহ'র 'সুহৃদ সমিতি'। সিলেটের 'সুহৃদ সমিতি' বন্দুকের নল দেখিয়ে বড়ো বড়ো ব্যবসাদার ও ধনপতিদের কাছ থেকে 'স্বদেশি' আন্দোলনের জন্য অর্থ আদায় করেই ক্ষান্ত থাকেনি, গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, এর সদস্যরা তথাকথিত আলিপুর 'ষড়যন্ত্র' মামলার সাথেও জড়িত ছিলেন। বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে শিলচরের কাছে গুরুদাস চৌধুরি ও দয়ানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত 'অরুণাচল আশ্রম'-এর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে, যেটির মুখপত্র মহেন্দ্রনাথ দে সম্পাদিত 'প্রজাশক্তি' হবিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হত। আপাতদৃষ্টিতে একটি ধর্মীয় সংগঠন বলে মনে হলেও, কার্যত এর

লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি (১৭.৩ দ্রষ্টব্য) পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'সেবা সংঘ' অনুশীলন সমিতির আদলে তৈরি হয়েছিল। সুতরাং বৈপ্লবিক কাজকর্ম যে আসামে অনুপস্থিত ছিল এমনটা নয়, যদিও এইসব সংগঠনের বিস্তৃত বিবরণ এখনও অনালোচিত। চরমপন্থী ও বৈপ্লবিক জাতীয়বাদীদের চিন্তাধারা বা কাজকর্ম নরমপন্থীরা যেমন ভারতের অন্যত্র অনুমোদন করেননি, আসামেও ঠিক তেমনি। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য) 'কৃপাবর বরবরুয়া'র ছদ্মনামে বোমা-হাতে দেশ স্বাধীন করার সংকল্পকে শুধু 'অবাস্তব' বলে ক্ষান্ত হননি, তীব্র ভাষায় বিপথগামী যুবকদের নিন্দা করেছিলেন।

চরমপন্থী নেতৃত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রয়ী 'লাল-বাল-পাল' একের পর এক গ্রেপ্তার হওয়ার পর কিছুটা হতাশা থেকেই বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল। বঙ্গভঙ্গের পর প্রতিবাদের কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একটার পর একটা নিপীড়নমূলক আইন প্রবর্তন করতে দ্বিধা করেনি। যেমন (১) Seditious Meetings Act (1907), (২) Explosive Substance Act (1908), (৩) Newspapers (incitement to offences) Act (1908), (৪) Criminal Law Amendment Act (1908), (৫) Indian Press Act (1910) ইত্যাদি। এইসব আইনের বেড়াজালে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার, সরকার-বিরোধী কোনোকিছু করার অধিকার যেখানে খর্ব ও নিষিদ্ধ, সেইরকম পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক আন্দোলন টিকিয়ে রাখাও ছিল রীতিমতো কঠিন কাজ। বৈপ্লবিক কাজকর্ম ছাড়া 'স্বদেশি' আন্দোলনের জোয়ারও আসামে তেমনভাবে অনুভূত হয়নি। যদিও উল্লেখ করা হয়, ডিব্রুগড়, বরপেটা, গুয়াহাটি, তেজপুর, নওগাঁও, ধুবরি প্রভৃতি অঞ্চলে 'রাখি বন্ধন' উৎসব অসমিয়া মননে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল, কিংবা কামাখ্যা মন্দিরের পুরোহিত বিদেশি দ্রব্য বর্জন করার জন্য মন্দিরের পাণ্ডাদের কাছে আবেদন করেছিলেন, কিংবা গুয়াহাটির কটন কলেজের ছাত্ররা নানাভাবে 'স্বদেশি' আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি, তথাপি সমকালীন কলকাতা থেকে প্রকাশিত *অমৃতবাজার পত্রিকার* (২৯ ডিসেম্বর ১৯০৫) ভাষায় ঃ "So far as Assam is concerned, the Swadeshi movement does not seem to have touched even the outer fringe of Manchester trade."

অসমিয়া ঐতিহাসিকদের অধিকাংশের মতে, বাঙালি আধিপত্য থেকে অসমিয়াদের মুক্ত করার কথা ব্রিটিশ কর্মকর্তারা মুখে বললেও কার্যত হয়েছিল ঠিক বিপরীত, কারণ আজকের আসামের জ্বলন্ত 'অনুপ্রবেশ সমস্যার' সূত্রপাত

হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই। ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট উদ্ধৃত করে দেখানো হয়, কীভাবে ময়মনসিংহ, রংপুর ও জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলা থেকে ১৯০৪-১৯১১ সালে ৫৪,০০০ মানুষ আসামে এসে স্থায়ী বাসভূমি তৈরি করেছিল এবং ১৯২১-এ এই সংখ্যাটি চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫৮,০০০-এ দাঁড়ায় এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পূর্ববঙ্গের মোট অধিবাসীর সংখ্যা হয় তিন লক্ষ। বঙ্গভঙ্গের মুহূর্তে আসামে তেমন উত্তেজনা না থাকলেও, পরবর্তী সময়ে ১৯০৫-এর ঘটনা কীভাবে আসামে এইরকম অসংখ্য সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, সেটি ইদানীং অনেকেই উপলব্ধি করেন।

আসামে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সামাজিক ও রাজনৈতিক জাগরণ সহ অসমিয়া জাতীয়তাবাদ বিকাশের প্রশ্নে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাংলার মতো উত্তাল না হলেও আন্দোলনের ঢেউ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকেও স্পর্শ করেছিল। 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা' ও 'আসাম অ্যাসোশিয়েসন'-এর বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী বক্তব্য অসমিয়া মননে গভীর রেখাপাত করেছিল। মুকুন্দ দাস-এর গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিষ্ণু মেধি, কলিরাম বরুয়া, রক্তিম বোরা, পিতাম্বর চক্রবর্তী, নিধিরাম দাস, ত্রিগুণা বরুয়া, কুমুদ বোরা, পুষ্পা উজির প্রভৃতি ছাত্র-যুবরা দেশপ্রেমের আদর্শ প্রচারে আত্মনিবেদন করেন যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী সময়ে জাতীয় আন্দোলন আসামের মাটিতে নতুন মাত্রা পায়।

সপ্তদশ অধ্যায়

আসামের কয়েকজন কৃতী সন্তান

১৭.১ অমলেন্দু গুহ (৩০ জানুয়ারি, ১৯২৪-) (Amalendu Guha 30 January, 1924-)

আসামের স্বনামধন্য মার্কসবাদী ঐতিহাসিক অমলেন্দু গুহ মণিপুরের ইম্ফলে ১৯২৪ সালের ৩০ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস ছিল বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায়। তাঁর পিতা যামিনীসুন্দর গুহ (১৮৭৩-১৯৫০) ময়মনসিংহ থেকে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সময় ইম্ফলে এসেছিলেন একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতে ; ফলে অমলেন্দু গুহ-র শৈশব কাটে মণিপুরে। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত) রাজন্য-শাসিত মণিপুর ছিল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। শৈশবের স্মৃতিচারণ করার সময় গুহ উল্লেখ করেছেন, **ডিমাপুর থেকে ইম্ফল শহরের দূরত্ব ছিল ১৪৪ মাইল এবং গোরুর-গাড়িতে ঐ পথ অতিক্রম করতে প্রায় ১০ দিন অতিবাহিত হত**। যামিনীসুন্দর অবসর গ্রহণের পর গুয়াহাটিতে চলে আসেন এবং সপ্তম শ্রেণির ছাত্র অমলেন্দু গুহ সেই সময় থেকে আসামেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন। জন্মসূত্রে বাঙালি পরিবারের সন্তান হলেও তাঁর স্ত্রী (অণিমা) অসমিয়া এবং অমলেন্দু গুহ আসামের মাটি ও মানুষের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত এবং সমগ্র আসামের গৌরব ও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

১৯৪১ সালে গুয়াহাটির পল্টনবাজার বেঙ্গলি হাই স্কুল থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি বৃত্তি নিয়ে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন। সময়টি ছিল নানা কারণে উত্তাল এবং সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন-এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে অমলেন্দু গুহও নানা আন্দোলনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। ছাত্র জীবনেই তাঁর মার্কসবাদে হাতে-খড়ি এবং সমগ্র জীবন তিনি দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের মাধ্যমেই ইতিহাসের ঘটনাচক্রকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ছাত্রজীবনে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান একই সাথে পড়তে হত এবং ১৯৪৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কিছুদিন টাঙ্গাইল ও গুয়াহাটিতে কাটিয়ে অবশেষে ১৯৪৮ সালের নভেম্বরে তেজপুরের দরং কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দরং কলেজে অধ্যাপনার সময়ে তিন বছরের ছুটি নিয়ে দিল্লি'র 'স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ'-এ বিংশ শতাব্দীর আফগানিস্তানে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের

উপর পিএইচ. ডি. থিসিস্ জমা দেওয়ার পর তিনি ১৯৬২ সালে আবার ঐ কলেজে ফিরে আসেন। কিন্তু পনেরো দিনের মাথায় তাঁকে কমিউনিস্ট সন্দেহে গ্রেপ্তার করে উড়িষ্যার বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয় ; অবশ্য ৬ মাস পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। সেই সময় আসাম থেকে ৫২ জনকে একসাথে গ্রেপ্তার করে ঐ জেলে পাঠানো হয়েছিল যার মধ্যে বিষ্ণু রাভা, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, বীরেশ মিশ্র, জীবন কলিতা, বিষ্ণু হাজারিকা প্রভৃতি খ্যাতনামা কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ ছিলেন। অমলেন্দু গুহ তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, কীভাবে জেলের অভ্যন্তরে প্রখ্যাত পণ্ডিত গৌরীশংকর ভট্টাচার্য মার্কসবাদী তত্ত্বের উপর তাঁদের ক্লাস নিতেন। অর্থনীতির অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসের প্রতি অমলেন্দু গুহ-র আছে গভীর মমত্ববোধ। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর (ইতিমধ্যে তিনি পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছেন) শুরু হল নতুন বস্তুবাদী দৃষ্টিতে আসাম ইতিহাস চর্চা, যে পথে সমগ্র আসামে তিনিই ছিলেন প্রথম পথিক।

১৯৬৫ সালে তিনি পুনেতে 'গোখেল ইনস্টিটিউট অব পলিটিক্স এ্যান্ড ইকনমিকস্'-এ যোগদান করে নব উদ্যমে গবেষণার কাজ শুরু করেন। 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ' (আই. সি. এইচ. আর.)-এর বিশেষ আগ্রহ অনুরোধ ও অনুদানের জন্যই প্রকাশিত হয় অমলেন্দু গুহ-র ধ্রুপদী গ্রন্থ *Planter Raj to Swaraj : Freedom Struggle and Electoral Politics in Assam 1826-1947* যেটি আজ বিশ্বনন্দিত। অমলেন্দু গুহ-র লেখা *Medieval and Early Colonial Assam, The Decline of the Ahom Kingdom of Assam 1765-1826, Neo-Vaishnavism to Insurgency, The Decline of India's Cotton Handicrafts 1800-1905, The Ahom Political System* ইত্যাদি প্রতিটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ (কিছু 'Occasional Papers' হিসাবে কলকাতার Centre for Studies in Social Sciences কর্তৃক প্রকাশিত) বস্তুবাদী দৃষ্টিতে আসামের ইতিহাস-চর্চাকে নব আলোকে সমৃদ্ধ করেছে। সহস্র কাজ ও বন্ধনের মধ্যে গবেষণাকেই তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অনেক অজানা কথা তিনি লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামসহ অন্যান্য মহাফেজখানা থেকে উদ্ধার করে সকলের জন্য প্রকাশ করেছেন। শুধু অতীত নয়, বর্তমানের বিভিন্ন সংকট ও সমস্যার উপরও অমলেন্দু গুহ-র নিজস্ব ভাবনা-চিন্তাকে আসামে ইদানীং যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়। **সাম্প্রতিক ধ্বংসাত্মক আসাম আন্দোলনের ছয়টি বছরে অন্যান্য অনেক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মতো অধ্যাপক অমলেন্দু গুহও সমানভাবে অতিউগ্র অসমিয়া জাতীয়তাবাদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন ; তবু মানুষের**

শুভবুদ্ধির উপর এবং মার্কসবাদের উপরে বিশ্বাস হারাননি। আসামের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে এইরকম নিবেদিত-প্রাণ ঐতিহাসিকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। ১৯৮৩ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের (আধুনিক বিভাগ) সভাপতি হিসাবে তাঁর বিখ্যাত ভাষণের পর অনেক গবেষকের দৃষ্টি আসাম ইতিহাস-চর্চার দিকে আকৃষ্ট হয়। অধ্যাপক গুহ 'নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া হিস্ট্রি অ্যাসোশিয়েসন' (সংক্ষেপে 'নীহা')-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ১৯৮১-৮২-তে 'নীহা'র সভাপতি। উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসবিদদের একটি মঞ্চে সমবেত করার এই শুভ উদ্যোগের জন্য সংগঠনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতার মতো তিনিও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ শুধু একজন মার্কসবাদী ঐতিহাসিক হিসেবেই খ্যাতি পেয়েছেন তাই নয় ; তিনি আসামের একজন বিশিষ্ট কবি হিসেবেও অনেকের কাছে পরিচিত। অসমিয়া ভাষায় ১৯৬০-এ প্রকাশিত তাঁর কাব্য সংকলন 'তুমালই' এবং ১৯৬৮-তে প্রকাশিত 'লুইত পারর গাথা' এক কথায়, অনবদ্য। কলকাতায় ছাত্র-জীবন থেকে তিনি বাংলায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছিলেন, যার অনেকগুলিই আজ হারিয়ে গেছে। একজন অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক, কবি, সাহিত্যিক, সমাজ-বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, সমাজ-সচেতন নাগরিক সংগঠক ও কমিউনিস্ট—সবকিছু একটি ব্যক্তিত্বে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। এইরকম একটি নির্লোভ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনামের অধিকারী ঐতিহাসিক, কিন্তু 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' থেকে দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তিত্ব মৃত্যুর পরেও যাতে তাঁর দেহটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে লাগে এরই জন্য সম্প্রতি 'দেহদান'-এর সংকল্প-পত্রে স্বাক্ষর দিয়েছেন এবং সেই সংকল্পের সাক্ষী হয়েছেন বিশিষ্ট সমাজ-বিজ্ঞানী তথা তাঁর স্ত্রী ড. অণিমা গুহ এবং আসামের প্রবাদ প্রতিম ইংরেজির অধ্যাপক ড. হীরেন গোঁহাই।

১৭.২ অমিয় কুমার দাশ (১৮৯৫-১৯৭৫) (Omeo Kumar Das : 1895-1975)

আসামের বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও শিক্ষাবিদ অমিয় কুমার দাশ ২১ মে, ১৮৯৫-এ তেজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁর পিতা (নওগাঁও চা-বাগানের ডাক্তার) উদয় নারায়ণ দাস-কে হারানোর ফলে মতামহ লক্ষ্মীকান্ত বরকটকি (*আসাম-বান্ধব* পত্রিকার সম্পাদক)-র আশ্রয়েই তিনি বড়ো হন। স্কুল জীবন তেজপুরেই কাটে। কিছুদিন গুয়াহাটির 'কটন কলেজ'-এ পড়াশোনা করে ১৯১৪ সালে কলকাতা চলে যান এবং ১৯২০-তে 'সিটি কলেজ' থেকে স্নাতক হন।

গান্ধিবাদী অমিয় কুমার ছাত্রাবস্থা থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে বারবার কারাবরণ করেছেন এবং জনমনে আসামের 'লোকনায়ক' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। ছাত্রজীবনে তিনি "Servants of India Society"-র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং গোপালকৃষ্ণ গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালগঙ্গাধর তিলকের লেখনীতে নানাভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর কাছে দেশপ্রেমের চেয়ে বড়ো ধর্ম কিছু ছিল না এবং ছাত্র-নেতা হিসাবে এই মহান আদর্শে সহপাঠীদের উদ্দীপ্ত করাই ছিল তাঁর সর্বপ্রথম দায়িত্ব। অত্যন্ত মেধাবী এই ছাত্রটি **নিজের নাম 'অমিয়' ইংরেজিতে লেখার সময় 'Amiya' না লিখে 'Omeo' লিখতেন, কারণ অসমিয়া উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী ঐভাবে লেখাই নাকি সঠিক**। ১৯৩০-এর দশকে গান্ধিজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তাঁর দায়িত্ব ছিল ব্রিটিশ পুলিশের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে আসামের যুবকদের সংগঠিত করা এবং আন্দোলনে অংশ নিতে প্রেরণা সৃষ্টি করা। তিনি 'ছাত্র-সম্মিলনী'-তে অংশগ্রহণ ছাড়াও 'বন্দেমাতরম ক্লাব' তৈরি করেছিলেন। এরই জন্য তাঁকে বারবার জেল-খাটা সহ শারীরিকভাবে অসুস্থ হতে হয়েছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি গান্ধিবাদী আদর্শে অটল ছিলেন ও গান্ধির জীবনীসহ বহু গ্রন্থ এবং গান্ধির আত্মচরিত *My Experiment with Truth*-এর অসমিয়া অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ ভারতে সরকারি আইন অনুযায়ী আসামে ১৯৩৭ সালে যে বিধানসভা গঠিত হয়, অমিয় কুমার দাশ তার সদস্য হন। স্বাধীনতার পরেও তিনি বারবার বিধানসভার সদস্য হয়েছেন, স্বাধীনতার প্রাক-লগ্নে দিল্লিতে যে সংবিধান পরিষদ (Constituent Assembly) গঠিত হয় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অমিয় কুমার তারও সদস্য হন এবং আকর্ষণীয় সংবিধান বিতর্কে অংশ নেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের বছরে তিনি আসামের অগ্নিকন্যা পুষ্পলতা দাশের (১৭.৪০ দ্রষ্টব্য) সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং দুজনেই কারাগারের অন্তরালে বিচ্ছিন্নভাবে বন্দিজীবন কাটান। স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে নাগা পাহাড়ে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছিল সেটি নেভানোর উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালের ২০ আগস্ট সমস্ত ভয়-ভীতি অগ্রাহ্য করে সস্ত্রীক অমিয় কুমার দাস কোহিমা সহ সংলগ্ন গ্রামগুলিতে পরিভ্রমণ করেন। অসমিয়াদের মধ্যে তিনিই প্রথম ঐরকম অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে অনেক ঝুঁকি নিয়ে শান্তির আদর্শ প্রচারে নাগা পাহাড়ে এসেছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করেই পরবর্তী সময়ে গোপীনাথ বরদোলই (১৭.২০ দ্রষ্টব্য) এবং আসামের গভর্নর স্যার আকবর হায়দারি নাগা বিদ্রোহীদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য কোহিমায় এসেছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর

ঢেকিয়াজুলি কেন্দ্র থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত নির্বাচিত হন। তিনি আসামের গোপীনাথ বরদোলই মন্ত্রীসভার সদস্য হিসাবে শিক্ষা, খাদ্য ও শ্রম দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। শ্রমমন্ত্রী হিসাবে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হল আসামের চা-বাগানের দীর্ঘদিনের বঞ্চিত শ্রমিকদের জন্য 'প্রভিডেন্ট ফান্ড' গঠনের সিদ্ধান্ত, যেটি শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে প্রথম। শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে শিক্ষা সংস্কারের কাজে তিনি হাত দেন, যার মধ্যে মহাত্মা গান্ধি প্রচারিত বুনিয়াদি শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেন। ১৯৫৭ সালে বিধানসভায় পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুরাম মেধি ও ঢেকিয়াজুলি-র অগণিত মানুষের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি মন্ত্রীপদ গ্রহণ করেননি ; কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, দীর্ঘদিন মন্ত্রী থাকা ঠিক নয়। লোকনায়ক অমিয় কুমার দাশ ছিলেন অত্যন্ত উঁচু মাপের চিন্তাবিদ। তিনি ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, জনপ্রিয় লেখক ও সমাজ-সংস্কারক। মদ, আফিম, গাঁজা ইত্যাদির নেশা থেকে অসমিয়া মানুষকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি এগুলি নিষিদ্ধকরণের জন্য জনমত সৃষ্টিতে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। গান্ধিজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ লোকনায়ক কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত সকল, সাদামাটা জীবনের অধিকারী অমিয় কুমার ছিলেন সমাজের উপেক্ষিত, বঞ্চিত মানুষের মরমী বন্ধু। সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গজদন্ত মিনারে বসে জ্ঞানচর্চার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি 'হরিজন সেবক সংঘ', 'ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সংঘ', 'ভারত-সেবক সমাজ', 'গান্ধি স্মারক নিধি', 'আসাম সেবা সমিতি', 'কস্তুরবা ট্রাস্ট' ইত্যাদি বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর্ত মানুষের কাছে সেবা-সামগ্রী দ্রুত সরবরাহ করা সম্ভব।

তাঁর বীরাঙ্গনা স্ত্রী পুষ্পলতার সাথে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে নারীর সম-অধিকারের ন্যায্য দাবির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে দেশভাগের মুহূর্তে আসামকে পূর্ববঙ্গের সাথে গ্রুপিং-এর বিরোধিতায় স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সোচ্চার হয়ে গোপীনাথ বরদোলই-এর হাত শক্ত করেছিলেন। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের একাংশ এই গ্রুপিং-এর পক্ষপাতী ছিলেন এবং এটি কার্যকরী হলে আসাম অনিবার্যভাবেই পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হত। কংগ্রেস সদস্য হওয়া সত্ত্বেও গান্ধিজির আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে অমিয় কুমার দাশ এই বিপর্যয় থেকে আসামকে রক্ষা করেছিলেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন এক বড়ো মাপের দেশপ্রেমিক। অমিয় কুমারের সবচেয়ে বেশি দুঃখ ছিল, অসমিয়ারা

অনেকেই আসামের অভ্যন্তরে অগণিত উপজাতিদের জীবন, সমস্যা বা সংস্কৃতি সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নয় এবং যতটুকু ধারণা আছে সেটিও আবার বিদেশি সাহেবদের লেখা গ্রন্থ থেকে নিজের চোখে দেখে নয়। অমিয় কুমার নিজে মিকির হিলস্-এ গিয়ে কার্বি-সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়েছিলেন। তিনি বাণীকান্ত কাকতি (১৭.৪৩ দ্রষ্টব্য), বিরিঞ্চি কুমার বরুয়ার (১৭.৪৬ দ্রষ্টব্য) সাহায্য নিয়ে বোড়ো ভাষায় দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন এবং বোড়ো ভাষার মাধ্যমে বোড়ো ছাত্ররা (মাতৃভাষার মাধ্যমে) শিক্ষার সুযোগ যাতে পায় তার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে তিনি একটি 'Tribal Culture and Research Institute'-এর নীল্ নক্‌শা এঁকেছিলেন, যদিও অর্থের অভাবে সেটি বাস্তবায়িত হয়নি। আসাম সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা এবং উত্তরণের সম্ভাব্য উপায়গুলির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৯ সালের ৩০ মার্চ গুয়াহাটিতে Institute for Social Change and Development নামে একটি গবেষণা সংস্থা স্থাপন করেন। ১৯৯৫ সালে অমিয় কুমার দাশের জন্মশতবর্ষে আসামের এই মহান সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ঐ গবেষণা সংস্থাটির নামের আগে OKD বা অমিয় কুমার দাশ সংযোজিত হয়। বর্তমানে সমগ্র দেশে ২৭টি মর্যাদাপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে *OKDISCD* একটি গৌরবের স্থান দখল করেছে। ১৯৯৮ সালে ভারত সরকারের পোস্টাল বিভাগ তাঁর নামে একটি স্ট্যাম্প প্রকাশ করেছে এবং তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধিতেও ভূষিত হয়েছেন। এই শিক্ষা-দরদির নামে শোণিতপুরের ঢেকিয়াজুলিতে 'লোকনায়ক অমিয় কুমার দাশ কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জীবিতাবস্থায় অমিয় কুমার দাশ-এর নাম বহুল প্রচালিত না হলেও বা তাঁর চিন্তা বা কাজ তেমন মর্যাদা না পেলেও ১৯৭৫ সালে নেতাজি সুভাষের জন্মদিনে (২৩ জানুয়ারি) গুয়াহাটিতে ৮১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসার পর তাঁর সমগ্রজীবন ও সংগ্রামের কাহিনি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

১৭.৩ অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি (১৮৮৫-১৯৬৭) (Ambikagiri Roychoudhury : 1885-1967)

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বছরে (১৮৮৫) আসামের কামরূপ জেলার বরপেটা মহকুমাভুক্ত রায়পাড়া গ্রামে অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরির জন্ম হয়। কায়স্থ পরিবারভুক্ত বাবা কৃষ্ণরাম রায়চৌধুরি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। মা দেবকীসুন্দরী ছিলেন সুন্দরদিয়া সত্রের প্রধান সীতারাম অধিকারীর কন্যা।

ছোটোবেলা থেকে এক ধর্মীয় পরিবেশে তিনি লালিত হয়েছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁর প্রথাগত লেখাপড়া 'গৌহাটি গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে' থাকাকালীন সময়েই সমাপ্ত হয়। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য প্রণীত অম্বিকাগিরি-র জীবনী (১৯৮৯-এ দিল্লির 'সাহিত্য অকাদেমি' প্রকাশিত) থেকে জানা যায়, রায়চৌধুরি দুই হাতে দুই অস্ত্র নিয়ে (একহাতে 'ডিনামাইট' অন্যহাতে 'কলম') ব্রিটিশ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে শিলং-গুয়াহাটি রাস্তায় তিনি ডিনামাইট পুঁতেছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটোলাট (লেফ্‌টান্যান্ট গভর্নর) ব্যামফিল্ড্ ফুলারের গাড়ি উড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে (যদিও সেটি বিস্ফোরিত হয়নি)। অবশ্য গুয়াহাটির ইউরোপীয় ক্লাবে অগ্নিসংযোগ করতে তিনি সফল হয়েছিলেন। 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর'—এর মতো বিপ্লবী দলের অনুকরণে অম্বিকাগিরি 'সেবা সংঘ' গড়ে তোলেন। যদিও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিপ্লবীদলের কার্যকলাপ নিয়ে তেমন ব্যাপক গবেষণা আজও হয়নি ; তথাপি অম্বিকাগিরি-র পুত্র ভবগিরি রায়চৌধুরি-র (গুয়াহাটির বি. বরুয়া কলেজের ইংরেজি-র প্রাক্তন অধ্যাপক) স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী কাজকর্মে অম্বিকাগিরি একা ছিলেন না। ভবগিরি তাঁর পিতা অম্বিকাগিরি-কে আসামের লোকমান্য তিলক বা 'আসাম কেশরী' হিসাবে চিত্রিত করেছেন। আসলে মহারাষ্ট্রের তিলক-এর মতোই জ্বলন্ত দেশপ্রেম ছিল অম্বিকাগিরির বুকে। মহাত্মা গান্ধি পরিচালিত ১৯২১-২২-এর অসহযোগ আন্দোলন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটি অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে অম্বিকাগিরি বন্দি অবস্থায় চরম নির্যাতন সহ্য করেন। তাঁর লেখা 'বন্দিনী ভারত' নাটিকাটি নিষিদ্ধ হয়। ১৯২৩ সালে 'শতধর' বই লেখার জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন। এটি ছিল প্রথম অসমিয়া গ্রন্থ যেটি বিদেশি সরকারের কাছে দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। কারাগারে থাকাকালীন তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক কিছু গান প্রখ্যাত অসমিয়া সাহিত্যিক বাণীকান্ত কাকতি 'Songs of the Cell' নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। পুত্র ভবগিরি ও কন্যা শুচিব্রতা তাঁদের পিতা অম্বিকাগিরি-র গান বিভিন্ন স্থানে পরিবেশন করতেন। অম্বিকাগিরি-র মনে একটা যন্ত্রণা ছিল যে, তাঁর কাব্য প্রতিভা কোথাও সঠিকভাবে স্বীকৃতি পায়নি এবং পৃথিবীতে তিনি বড়ো একা। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে ১৯৬৬ সালে দিল্লির 'সাহিত্য অকাদেমি' তাঁর অসমিয়া কাব্যগ্রন্থ 'বেদনার উল্কা'-কে পুরস্কৃত করেছিল।

মহেশ্বর নিয়োগ-এর মতে, দেশপ্রেম ও যৌবনের মূর্ত-প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও অম্বিকাগিরি তেমন সফল রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না ; বরং কাব্য-কবিতায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন। রাজনীতি যে কাব্য-কবিতা নয়, এটি তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। বিপ্লবী জীবন থেকে তিনি গান্ধিবাদী পথের পথিক হন। ১৯০৭ থেকে ১৯১৪ সাল বরপেটায় থাকাকালীন সময়ে সমাজসেবামূলক কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। সুস্থ জীবনের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আবশ্যিকতা প্রচারের উদ্দেশ্যে একদল যুবক নিয়ে অম্বিকাগিরি নর্দমা সাফাই অভিযানে নেমে পড়েন। আফিং সেবনের অভ্যাস ত্যাগ করা, দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাদের আশ্রয় দেওয়া ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা, দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানসহ অনেক সামাজিক কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং *ডেকা আসান* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গুয়াহাটিতে *চেতনা* নামে একটি মাসিক পত্রিকারও তিনি সম্পাদনা করতেন। তিনি শুধু যে আসামের কথা ভাবতেন তা নয় ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) চলাকালীন সময়ে এবং পরে তিনি 'জগতের শেষ', 'আদর্শ আরু বিশ্বব্যাপী মহাশান্তি স্থাপনের উপায়' ইত্যাদি প্রবন্ধ কিংবা 'মানব জীবনের রূপ' ইত্যাদি কবিতা সংকলন করেছিলেন। তিনি বরপেটায় সনাতন সংগীত সমাজ এবং ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ছোটোখাটো ব্যবসা বা বাণিজ্যিক উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি যুবকদের উৎসাহ দিতেন। খুব স্বল্প সময়ের জন্য হলেও অম্বিকাগিরির উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল একটি রাসায়নিক কারখানা।

সমকালীন কলকাতার পত্র-পত্রিকায় অম্বিকাগিরিকে বাংলা ভাষা-বিরোধী ও বাঙালি-বিদ্বেষী হিসেবে চিত্রিত করা হত। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রথম প্রেমিকা ইন্দুমতী (কবি শেলি-র এমিলা ভিভিয়ানি-র মতো) শুধু যে বাঙালি তনয়া ছিলেন তাই নয়, অম্বিকাগিরির সমস্ত প্রেরণার উৎস। ১৯৬০-এ গুয়াহাটি শহরের বাঙালিরা যখন অসমিয়া ভাষা আন্দোলনের আবর্তে আতঙ্কগ্রস্ত, সেই মুহূর্তে তিনি অনেক বিপন্ন বাঙালি পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বাইরে কিছুটা কাঠখোট্টা-গোছের হলেও কবি অম্বিকাগিরি অন্তরে ছিলেন কুসুমের মতো কোমল। আসলে, আসামে অ-অসমিয়া জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান স্রোত অসমিয়াদের একদিন সংখ্যালঘুতে পরিণত করতে পারে—এমনি ধরনের আশঙ্কায় রায়চৌধুরি সব সময় ভীত ছিলেন। অসমিয়াদের ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি 'আসাম জাতীয় মহাসভা'-র মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। অনেকেই তাঁর সাথে একমত না হলেও তিনি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ছিলেন অচল ও অনড়। সমকালীন প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে

অম্বিকাগিরি-র নিজস্ব কিছু মতামত ছিল এবং মাঝে মাঝে কঠিন মন্তব্য করতেও দ্বিধা করতেন না। আসাম যখন খণ্ডিত হচ্ছিল, তিনি মনে করতেন তাঁর সমগ্র জীবনের সব সংগ্রামই ব্যর্থ। শেষ জীবনে প্রায় বন্ধু-বান্ধব-বিচ্ছিন্ন অম্বিকাগিরি অভিমান করে বলতেন, তাঁর মৃত্যুর সংবাদ কাউকে যেন দেওয়া না হয় এবং সংসারের বাইরের কেউ যেন তাঁর মৃতদেহ স্পর্শ না করে ; কিন্তু ১৯৬৭ সালের ২ জানুয়ারি তাঁর প্রয়াণের সংবাদে হাজার হাজার মানুষের ঢল নেমেছিল গুয়াহাটির রাজপথে।

অম্বিকাগিরি-র জাতীয়তাবাদ বা রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিতর্ক আছে। অমলেন্দু গুহ-র মতে, অম্বিকাগিরি ছিলেন 'Chauvinist' বা উৎকট স্বদেশভক্ত। ক্রমাগত অনুপ্রবেশ ও বাঙালির আধিপত্যে অতিষ্ঠ হয়ে 'অসমিয়া সংরক্ষণী সভা'-র পক্ষ থেকে অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি ও নীলমণি ফুকন ২৮ নভেম্বর ১৯৩৭ সালে যে প্রতিবেদন জওহরলাল নেহরু-র কাছে জমা দিয়েছিলেন (নেহরুর আসাম সফরের সময়) তাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল ঃ

> *.....as a means of saving the Assamese race from extinction, a considerable section of the Assamese intelligentsia had even expressed their mind in favour of the secession of Assam from India.*

১৯৫০ সালে 'অসম সাহিত্য সভা'-র সভাপতি হিসেবে অম্বিকাগিরি তাঁর সমগ্র জীবনের স্বপ্ন (বাঙালি-বিরোধী) যেভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, অমলেন্দু গুহ তাঁর সুবিখ্যাত *Planter Raj to Swaraj* গ্রন্থে সেটি এইভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

> *....While explaining his life's mission in his presidential address to the Assam Sahitya Sabha Conference at Margherita in 1950, he blamed the Bengali community of Assam for so long endangering the Assamese culture and language. 'That is why', he (Ambikagiri Raychaudhury) concluded, 'that the Bengalis residing in Assam had been more hostile than the British to them—this belief of the Assamese is getting stronger day by day, keen as they are on self-defence.*

এছাড়াও গুহ উল্লেখ করেছেন, কীভাবে আসামে বাঙালি-অনুপ্রবেশ চিরতরে বন্ধ করার জন্য অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি তাঁর প্রতিষ্ঠিত (১৯২৬ সালে) 'অসম আত্মরক্ষী বাহিনী'-র নামে দু লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক-কে সংগঠিত করার ডাক

দিয়েছিলেন। এইসব কারণেই অম্বিকাগিরিকে 'Chauvinist' আখ্যা দিয়েছেন অমলেন্দু গুহ। আসলে, অম্বিকাগিরির উত্তেজক মন্তব্যকে মূলধন করেই ১৯৮০-র দশকে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী 'বহিরাগত বিতাড়ন'-এর নামে যে আন্দোলন আসামে শুরু হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু অপূর্ব কুমার বরুয়া এক প্রবন্ধে (Ambikagiri Raychaudhury and Assamese Nationalism : An Analysis of his ideas as reflected in *'Ahuti'*) অমলেন্দু গুহ-র তীব্র বিরোধিতা করে *আহুতি* পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অম্বিকাগিরি যে কত বড়ো মাপের জাতীয়তাবাদী এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা ছাড়া যে মানব-জীবন সম্পূর্ণ হয় না—সেটির উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বরুয়ার ভাষায় ঃ *As a strong proponent of linguistic nationalism. Ambikagiri argues that each nationality should have a homeland of its own.*

জাতীয়তাবাদ নিশ্চয়ই কাম্য কিন্তু সেটি যদি উগ্র-জাতীয়তাবাদে পরিণত হয় (যেটিকে স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার দিয়েছিলেন) তাহলে সেটি যে ফ্যাসিবাদে রূপান্তরিত হয়—এই সরল সত্যটি অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর মূল্যায়নের সময় যদি অপূর্ব কুমার বরুয়া মেনে নিতেন (যদিও তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, ".....Raychaudhury's politics of Assamese nationalism had a rather aggressive tone.") তাহলে ভালো হত।

১৭.৪ অরুণ কুমার চন্দ (১৮৯৯-১৯৪৭) (Arun Kumar Chanda : 1899-1947)

কাছাড় জেলায় শিলচরে খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা কামিনী কুমার চন্দের দ্বিতীয় পুত্র অরুণ কুমার চন্দ ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। শিলচর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে ১৯১৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে একাধিক বার কলেজ পরিবর্তন করতে হয়—যেমন, মুরারীচাঁদ কলেজ (সিলেট), সেন্ট কলম্বিয়া কলেজ (হাজারিবাগ) এবং বঙ্গবাসী কলেজ (কলকাতা)। এইসব সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি এল. এল. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইংল্যান্ড যান এবং লিঙ্কন্‌স ইন্‌ থেকে ১৯২৯-এ ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সিঙ্গাপুরে কিছুদিন (১৯৩০-৩১)

রূপে কাজ করার পর পিতার অসুস্থতার বার্তা পেয়ে তিনি শিলচরে ফিরে আসেন এবং ছোট্ট শিলচর শহরটিই তাঁর কর্মজীবনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। শৈশব থেকে অরুণ কুমার তাঁদের 'চন্দ-ভবনে' জাতীয় স্তরের অনেক বড়ো বড়ো নেতার সাহচর্য পেয়েছিলেন যাঁরা তাঁর পিতা কামিনী কুমারের অতিথি হিসেবে আসতেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে একদিকে আইন-ব্যবসা এবং অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি অনেক যশ অর্জন করেন।

শিক্ষাব্রতী ও সংস্কৃতিমনা অরুণ কুমার ১৯২১ সালে শিলচরের স্বল্পস্থায়ী ন্যাশনাল স্কুল এবং কলকাতার ন্যাশনাল কলেজে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন। আসলে ঐ সময় অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশসহ অন্যত্র সরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'গোলামখানা' (অর্থাৎ ব্রিটিশদের 'গোলাম' তৈরির কারখানা) হিসেবে চিত্রিত করার ফলে পড়ুয়াদের মধ্যে একটা সংকটের সৃষ্টি হয়। দীপঙ্কর ব্যানার্জির একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, ১৯২১ সালে শিলচর সরকারি স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা ৫১৫ থেকে কমে ৩৭৬-তে দাঁড়ায় যার মধ্যে ৭৬ জন ছাত্রকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার 'অপরাধে' বহিষ্কৃত করা হয়। মূলত ঐসব ছাত্রদের জন্যই সেই সময় 'ন্যাশনাল' বা জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল, যদিও এটি ছিল ক্ষণস্থায়ী। যাই হোক, কলকাতায় ন্যাশনাল কলেজে কাজ করার সময় অরুণ কুমার অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তির সান্নিধ্য পান, যার মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু উল্লেখযোগ্য। অরুণ চন্দ্র-র সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব ছিল ১৯৩৫ সালে শিলচরে গুরুচরণ কলেজ প্রতিষ্ঠা। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৯৪৭ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনিই ছিলেন তাঁর স্বপ্নের কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও অবৈতনিক ইংরেজির অধ্যাপক। তাঁর বিশদ অধ্যয়ন, মনোমুগ্ধকর ইংরেজি ও বাংলায় বক্তৃতা এবং পরিহাসপ্রিয় স্বভাবগুণে তিনি ছিলেন প্রকৃত ছাত্রবন্ধু। জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন, কীভাবে ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা নীতির তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং শিলচর থেকে প্রকাশিত *শিক্ষাসেবক* ত্রৈ-মাসিক পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে লিখে গেছেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় শিলচরের বাংলা সাপ্তাহিক *সপ্তক* জনমত প্রকাশের এক শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে শিলচরের নর্মাল স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের এক সভায় শিক্ষকদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের তীব্র নিন্দা করে এবং শিক্ষকদের প্রতিটি দাবিকে সমর্থন জানিয়ে অবিলম্বে সেগুলি মিটিয়ে দেবার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানান।

অরুণ কুমার চন্দ ১৯৩৭ থেকে আমৃত্যু কাছাড় জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪২ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল, এরই জন্য কমিউনিস্টদের একটা বড়ো অংশ জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকেই কাজ করতেন। অধ্যাপক জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্যের মতে, অরুণ কুমার চন্দ জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী শিবিরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁরই প্রভাবে কাছাড় জেলা কংগ্রেস ছিল মোটামুটি বামপন্থী-ঘেঁষা। অনেক সময় তিনি পরিচিত বামপন্থী নেতাদের (যেমন অচিন্ত্য কুমার ভট্টাচার্য বা গৌরীশংকর ভট্টাচার্য) সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি আসাম বিধানসভার সদস্য হন এবং কংগ্রেস দলের ডেপুটি লিডার হিসেবে ১৯৩৮ সালে গোপীনাথ বরদোলই-এর নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন, যদিও নিজে মন্ত্রীপদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অরুণ কুমারের উদ্যোগেই ১৯৩৯ সালের ১ মে শিলচরে 'মে-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়েছিল এবং তিনি নিজে উধারবন্ধে রক্ত-পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, যেটি কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে ছিল অচিন্তনীয়। সমকালীন *The Statesman* পত্রিকায় (২ মে, ১৯৩৯) এই খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রমিক, কর্মচারীদের নানারকম ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অরুণ কুমারের অংশগ্রহণও কম উল্লেখযোগ্য নয়। শিলচরে প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মূল কেন্দ্র ছিল। তিনি ছিলেন এর সভাপতি এবং শিলচরের চা-শ্রমিক নেতা সনৎ কুমার আহীর ছিলেন সহ সভাপতি। তাঁরই উদ্যোগে সনৎ কুমার আহীর-এর নাম চা-বাগান কেন্দ্রের জন্য প্রার্থী হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল এবং তিনি আসাম বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। সিলেট-কাছাড় চা মজদুর সংগঠনের সভাপতি পদে থাকাকালীন সময়ে ১৯৩৮-৩৯ সালে চা-শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে কাছাড়ের পাঁচটি এবং সিলেটের দুটি চা-বাগানে ধর্মঘট হয়েছিল। এর ফলে, চা-বাগানের মালিকদের সাথে তাঁর সম্পর্ক কিছুটা তিক্ত হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে তাঁরই নেতৃত্বে অরুণাবন্দ চা-বাগানের ধর্মঘট দীর্ঘ ৪০ দিন স্থায়ী হয়েছিল এবং মালিকপক্ষ কিছুটা নরম হয়ে মীমাংসা সূত্র মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। চা-শ্রমিকদের দুর্দশা সরেজমিনে তদন্তের জন্য তিনি বরদোলই-এর কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে বাধ্য করেছিলেন 'Tea Garden Labour Unrest Enquiry Committee' গঠন করতে। এরই জন্য চা-মজদুরদের কাছে তিনি 'অরুণ-রাজা' নামে পরিচিত ছিলেন।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসেবে তিনি ডিগবয়ে আসাম অয়েল কোম্পানির শ্রমিক আন্দোলনের সাথেও যুক্ত ছিলেন, যদিও বরদোলই-এর নেতৃত্বে আসামের

কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ঐ আন্দোলনের সুষ্ঠু মীমাংসার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। এছাড়া 'কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট পোস্টাল অ্যান্ড রেলওয়ে মেইল সার্ভিস ইউনিয়ন'-এর সভাপতি পদে তিনি দীর্ঘ বারো বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১৯৪৫ সালে ঐ কর্মীসংঘের সারা ভারত সম্মেলনেও সভাপতিত্ব করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে শ্রমিক-কর্মচারীদের নানা আন্দোলনে এইভাবে যুক্ত থেকে তিনি তাঁর প্রগতিশীল মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। গান্ধিজির ডাকে তিনি আইন অমান্য ও অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনেরও সহযাত্রী ছিলেন। ১৯৩১ সালে শিলচরের আর্য-পট্টিতে সার্বজনীন দুর্গাপূজায় তথাকথিত অস্পৃশ্যদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্ত অরুণ কুমার ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধের বিরোধিতা করে ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করায় অরুণ কুমার এক বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় আবার তাঁকে কলকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়। কারামুক্তির পরও ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁকে আসামে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। ১৯৪৫-এর অক্টোবরে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি'-তে নির্বাচিত হন। তাঁর জনপ্রিয়তা এর থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী ও কংগ্রেস নেতা অরুণ কুমার একদিকে গান্ধিবাদী এবং অন্যদিকে রবীন্দ্র-অনুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্র সংগীতের শিল্পী ও থিয়েটার অভিনেতা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁরই উদ্যোগে শিলচরে প্রতি বছর ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী উৎসবের সূচনা হয়। নানান গুণের অধিকারী কর্মবীর এই মানুষটি দেশ স্বাধীন হওয়ার চারমাস আগে ১৯৪৭ সালের ২৬ এপ্রিল কলকাতায় প্রয়াত হন। অগণিত মানুষের প্রিয়জন অরুণ কুমার চন্দ 'কাছাড়প্রাণ', 'জননায়ক' ইত্যাদি নামেও পরিচিত। ১৯৯৯ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষে ভারত সরকারের ডাক বিভাগ তাঁর নামে ডাক-টিকিট প্রকাশ করে এবং আসাম সরকার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করে।

১৭.৫ আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা (১৮৭৪-১৯৩৯) (Ananda Chandra Agarwala : 1874-1939)

তেজপুরের বিখ্যাত আগরওয়ালা পরিবারের সন্তান (যাঁরা প্রতি ইঞ্চে অসমিয়া জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন) আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা ছিলেন একাধারে কবি, পুলিশ অধিকর্তা, লেখক এবং ইতিহাসবিদ। একই ব্যক্তির মধ্যে

এত বিচিত্র গুণের সমাবেশ সচরাচর দৃষ্ট হয় না ; অবশ্য এ ব্যাপারে পারিবারিক সহ তেজপুরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আনন্দচন্দ্রকে প্রভূতভাবে সাহায্য করেছিল। আধুনিক যুগে গুয়াহাটি আসামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রাজধানী হলেও তেজপুর ছিল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণ। জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা, ফণী শর্মা, ভূপেন হাজারিকা সহ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ; এমনকি লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার ও রাজনীতিবিদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান ছিল তেজপুর। ব্রিটিশ শাসিত আসামে দীর্ঘ ৩২ বছর পুলিশ বিভাগে কাজ করে আনন্দচন্দ্র এস. পি. হিসেবে অবসর নেন এবং ১৯০৬ সালে 'Police Manual' সংকলন করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

অসমিয়া ভাষায় তাঁর কবিতা গ্রন্থ *জিলিকোণি* এবং *জীবন সংগীত*, ইংরেজিতে ইতিহাস গ্রন্থ *An Account of Assam* অথবা অসমিয়ায় *গোয়ালপাড়ার পুরণি বিবরণ*, পাঠ্যপুস্তক *কুমাল পথ* ও *আদিপথ* ইত্যাদি আজও আদৃত। নিজের কবিতা ছাড়াও তিনি অনেক বিখ্যাত ইংরেজি কবিতা এমন অনবদ্যভাবে অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন যে, আনন্দচন্দ্র আসামে 'ভাঙ্গনি কুঁয়র' আখ্যা পেয়েছিলেন। এই অনুবাদ পড়ে মনে হয় না যে, সেগুলি ভাষান্তর মাত্র ; বরং স্বকীয় মৌলিকতায় প্রতিটি কবিতা উজ্জ্বল। আসামের লোকসাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা কয়েকটি আখ্যানকাব্য রচনা করেছেন। ১৯৩৪ সালে 'অসম সাহিত্য সভা'-র মঙ্গলদৈ অধিবেশনে আনন্দচন্দ্র সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯১ সালে R. D. Choudhury এবং Shri Bhagwan Singh-এর সম্পাদনায় *Aspects of History and Culture : Ananda Chandra Agarwala Commemoration Volume* প্রকাশিত হয়।

১৭.৬ আনন্দরাম বরুয়া (১৮৫০-১৮৮৯) (Anandaram Barooah : 1850-1889)

উত্তর গুয়াহাটির রাজা দুয়ারে জন্ম। পিতা গঙ্গারাম বরুয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং ব্রিটিশ সরকারের সদর আমিন (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) এবং তাঁর প্রথমা স্ত্রী দুর্লভেশ্বরীর তৃতীয় পুত্র আনন্দরাম। বাবার কাছে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করে ১৮৬৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আনন্দরাম কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। অত্যন্ত মেধাবী আনন্দরাম পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে গণিত শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ব্যারিস্টারিও পাশ করেন। কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় তিনি যেমন স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি, স্যার তারকনাথ পালিত, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের মতো প্রখ্যাত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন এবং নানা কাজে ওঁদের সাথে যুক্ত হন, বিদেশেও তেমনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পণ্ডিত ফ্রেডরিখ ম্যাকস্‌মূলারের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়।

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম প্রখ্যাত ঠাকুর পরিবারের সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত কঠিন আই. সি. এস. পরীক্ষায় ১৮৬৩ সালে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। **১৮৭০ সালে আসামের প্রথম আই. সি. এস. হন আনন্দরাম বরুয়া**। আসামের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সূর্যকুমার ভুঁইয়া ১৯২০ সালে এবং ভারততত্ত্ববিদ মুকুন্দমাধব শর্মা ১৯৯২ সালে আনন্দরাম বরুয়ার জীবনী প্রকাশ করেন। আনন্দরামের মতো এত বড়ো মাপের মানুষ তৎকালীন আসামে কল্পনা করাও ছিল কঠিন। ১৮৭২ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি প্রথমে শিবসাগর জেলার অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। এরপর অবিভক্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন মহকুমায় এস. ডি. ও. হিসেবে কাজ করেছিলেন। জীবনের শেষদিকে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট পদ লাভ করেছিলেন।

মার্জিত রুচিসম্পন্ন অকৃতদার আনন্দরাম ছিলেন এক নীরব কর্মী, বিনয়ী ও পণ্ডিত। ম্যাজিস্ট্রেট পদের তুলনায় তাঁর অনুরাগ অনেক বেশি ছিল গ্রন্থের প্রতি। ১৮৮১ সালে দীর্ঘ অবকাশ নিয়ে তিনি বিলেতে পাড়ি দেন গবেষণার অভিপ্রায়ে। একাধারে গণিত শাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্য উভয় বিষয়েই তাঁর দক্ষতা ছিল তুলনাহীন। ১৮৮৩-তে ভারতে ফিরে এসে তিনি প্রথমে চট্টগ্রামে এবং পরে যশোর ও নোয়াখালিতে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংমিশ্রণ, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মিলন এবং বাস্তব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর রচনা ও চেতনাকে করে তুলেছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। একাধারে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে অত্যধিক পরিশ্রম এবং গভীর অধ্যয়ন ক্রমান্বয়ে তাঁর স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে ওঠে। মাত্র ৩৯ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় তাঁর প্রিয় বন্ধু তারকনাথ পালিতের আবাসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখানেই তিনি ১৯ জানুয়ারি ১৮৮৯-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিজ্ঞানের কাজ ছাড়াও তাঁর এই স্বল্প জীবনে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে মোট ১২টি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ তিন খণ্ডের *A Practical Sanskrit—English Dictionary, A Comprehensive Grammar of the Sanskrit Language, Bhababhuti and his place in Sanskrit Literature, সরস্বতী কাষ্ঠাভরণ, ভাগবতালঙ্কার* ইত্যাদি।

১৭.৭ ইন্দিরা গোস্বামী/মামণি রাইসম গোস্বামী (১৯৪২-)
(Indira Goswami/Mamoni Raisom Goswami : 1942-)

আসামের প্রখ্যাত লেখিকা ইন্দিরা গোস্বামী বা মামণি রাইসম গোস্বামী (যিনি 'মামনি বাইদেও' হিসেবে জনপ্রিয়) ১৯৪২ সালের ১৪ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। যেহেতু দিনটি ছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন ('শিশু দিবস') এরই জন্য তাঁর পিতা উমাকান্ত গোস্বামী আদরের কন্যার নাম নেহরুর কন্যার নামে রাখেন। অবিভক্ত আসামের রাজধানী শিলং-এর পাইন মাউন্ট স্কুল, এরপর গুয়াহাটির কটন কলেজ এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসমিয়া সাহিত্যে ইন্দিরা উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। ছাত্রী জীবন থেকেই তাঁর গল্প লেখার অভ্যাস তৈরি হয়েছিল। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী থাকা অবস্থায় তাঁর প্রথম গল্পটি কীর্তিনাথ হাজারিকা তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬২ সালে (যখন তাঁর মাত্র ২০ বছর বয়স) ইন্দিরার ছোটো-গল্প সংগ্রহ *চিনাকি মোরোম* প্রকাশিত হয়েছিল। ইন্দিরা তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী *আধালিখা দস্তাবেজ* (*An Unfinished Autobiography* নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন প্রফুল্ল কটকি)-এ উল্লেখ করেছেন (১৯৮৮) কীভাবে শৈশব থেকেই সব সময় বিষাদাচ্ছন্ন ও মনমরা অবস্থায় দিন কাটাতেন এবং শুধুমাত্র বাবার মুখের দিকে তাকিয়েই তাঁর বাঁচতে ইচ্ছা হত। সেই বাবা যখন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ করে পৃথিবী থেকে চলে গেলেন, সেই সময় শিলং এর বাড়িতে অনেকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেও ইন্দিরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। এইরকম একটা বিপন্ন সময়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পাশে পেয়েছিলেন মহীশূর রাজ্যের (বর্তমান কর্ণাটক) একজন ইঞ্জিনিয়ার যাঁর নাম ছিল মাধবন রাইসম আয়েঙ্গার। ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে মাধবন রাইসম আয়েঙ্গারের সাথে ইন্দিরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু বিবাহের মাত্র ১৮ মাসের মধ্যেই কাশ্মীরে এক মোটর গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর স্বামী প্রাণ হারান। এবারও ইন্দিরা কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ব্যক্তিগত জীবনে একটার পর একটা দুর্যোগ অবশেষে তাঁকে লেখালেখির জগতে টেনে এনেছিল। শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদেই তিনি লিখতে শুরু করলেন। আসামে ফিরে এসে প্রথমে গোয়ালপাড়া সৈনিক স্কুলে কিছুদিন শিক্ষয়িত্রীর কাজ করলেও তাঁর তথাকথিত 'ব্যর্থ' জীবনের অর্থ তিনি অন্যভাবে অন্বেষণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করলেন। এমন সময়ে তাঁর শিক্ষক উপেন্দ্রচন্দ্র লেহারু তাঁকে বৃন্দাবনে গিয়ে মনে কিছুটা শান্তি পেতে গবেষণা কাজে ব্রতী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। ইন্দিরা তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন, তাঁর সামনে দুটি পথ খোলা ছিল ঃ হয় তিনি

পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও গণতন্ত্রের কেন্দ্রভূমি লন্ডনে যেতে পারতেন এবং সেখানে গিয়ে নারীমুক্তি আন্দোলনে শামিল হতে পারতেন ; অথবা প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার চিরায়ত সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনে যেতে পারতেন। তিনি দ্বিতীয়টাই বেছে নিলেন।

বৃন্দাবনে গিয়ে প্রবাসী ব্রাহ্মণ বিধবাদের, যাঁরা 'রাধেশ্যামী' নামে পরিচিত, দুর্দশা নিজের চোখে দেখে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস *নীলকণ্ঠী ব্রজ* (যেটি *The Blue-Necked Braza* অথবা *Shadow of Dark God* নামে ইংরেজিতে প্রফুল্ল কটকি অনুবাদ করেছেন)-তে সৌদামিনী চরিত্রের মাধ্যমে প্রায় নিজের জীবনের যন্ত্রণা ব্যক্ত করলেন। মেয়েদের প্রতি, বিশেষত বিধবাদের প্রতি সমাজের অমানবিক হৃদয়হীন আচরণ ইন্দিরার মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। মুক্তির আকুলতায় বৃন্দাবনে গিয়ে বা যেতে বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভর করে এক সময়ের উঁচু ঘরের ঐসব নিঃসঙ্গ বিধবারা তিল তিল করে অর্থ সংরক্ষণ করতেন শুধুমাত্র মৃত্যুর পর তাঁর সৎকার যাতে হিন্দু বিধান অনুযায়ী হয়, সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু বেশিরভাগ সময় তাঁদের সঞ্চিত অর্থ চুরি হয়ে যেত এবং তাঁদের মৃতদেহগুলির কোনো সৎকারই হত না। কৃষ্ণের লীলাভূমির এই মর্মন্তুদ ছবি ভারতীয় সাহিত্যে ইন্দিরা রাইসম-ই প্রথম আঁকলেন ; ফলে স্বার্থান্বেষী মহল তাঁকে নানাভাবে সমালোচনায় এগিয়ে এল। অন্যান্য অসমিয়া মেয়েদের মতো ইন্দিরাও অত্যন্ত মৃদুভাষী ; কিন্তু গল্পের মাধ্যমে সমাজের অনাচার, অত্যাচারের ছবিটি এমনভাবেই চিত্রিত করলেন যাতে ঐসবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দীপা মেহতা তাঁর 'ওয়াটার' (জল) ছবিটিতেও এই একই বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে এগিয়ে এলেন।

উপেন্দ্রচন্দ্র লেহারু-র তত্ত্বাবধানে বৃন্দাবনে থাকা অবস্থায় হিন্দি ভাষার উপর ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ইন্দিরা তুলসীদাসের *রামায়ণ* পাঠ শুরু করলেন। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় লেখক ছিলেন ষষ্ঠদশ শতকের হিন্দি কবি তুলসীদাস যাঁর প্রণীত *রামায়ণ* বা *রামচরিতমানস*, বাল্মীকির সুপ্রাচীন 'রামায়ণ' থেকে কিছুটা ভিন্ন। অন্যদিকে চতুর্দশ শতকে অসমিয়া ভাষায় রচিত কবিরাজ মাধব কন্দলীর রামায়ণ-কথা ছিল বাল্মিকীর অনুরূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সমগ্র পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে মাধব কন্দলীই প্রথম আঞ্চলিক ভাষায় চতুর্দশ শতকে রামায়ণ রচনা করেন (কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' পঞ্চদশ শতকে রচিত এবং তুলসীদাসের রচনা ষষ্ঠদশ শতকে)। তুলসীদাসের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনে পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতির সাথে ইন্দিরার শৈশবের কিছুটা মিল কেউ কেউ খুঁজে পেয়েছেন। কথিত আছে, অশুভ গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে

নাকি তুলসীদাসের জন্ম হয়েছিল (জন্ম মুহূর্তে নাকি কাঁদেননি এবং ৩২টি দাঁত নিয়েই তিনি নাকি জন্মেছিলেন) এবং এরই জন্য তুলসীদাসের পিতা আরো অশুভ ঘটনার আতঙ্কে ও আশঙ্কায় তাঁর পুত্রসন্তানটিকে শৈশবেই পরিত্যাগ করেছিলেন। জ্যোতিষীদের মতে, ইন্দিরার জন্মও নাকি একই রকম একটি অশুভ ক্ষণে হয়েছিল। তাঁর মা জ্যোতিষীদের কাছেই বারবার ধর্না দিতেন ইন্দিরার ভাগ্যরেখাকে পরিবর্তিত করার জন্য। একজন পণ্ডিত ইন্দিরার মাকে নাকি পরামর্শ দিয়েছিলেন কন্যাকে দ্বি-খণ্ডিত করে, নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে। শৈশব থেকে এইসব কথাবার্তা শুনতে শুনতে ইন্দিরার মনটা ভারী হয়ে উঠত এবং সম্ভবত এরই জন্য বিষণ্ণতাই ছিল তাঁর নিত্য সাথী। বৃন্দাবনে থাকাকালীন সময়ে তুলসীদাসের মতো কিছু সৃষ্টিশীল রচনা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর ভাগ্য-রেখাকে অগ্রাহ্য করে জন্মলগ্নের ঐ তথাকথিত অশুভ মুহূর্তটির প্রভাব থেকে নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বৈধব্যের দুর্দশা তিনি মোটেই মানতে রাজি নন ; ফলে দৈনন্দিন জীবনে অন্য পাঁচজন সাধারণ মহিলার মতোই সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। তুলসীদাস ও মাধব কন্দলীর রচনার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় সমৃদ্ধ 'থিসিস্'টির জন্য ১৯৭৩ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করার পর তাঁর সামনের বন্ধ দুয়ার খুলে গেল এবং ধাপে ধাপে তিনি উন্নতির শিখরে আরোহণ করলেন। তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপিকা পদে যোগদান করে দিল্লিতে বসেই তাঁর শ্রেষ্ঠ ছোটো-গল্পের রচনাসহ অনেক সৃজনশীল কাজে হাত লাগালেন। তাঁর 'থিসিস্'-এর উপর নির্ভর করে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত বৃহদাকার গ্রন্থ *Ramayana from Ganga to Brahmaputra*-এর আবরণ উন্মোচন করলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. শঙ্করদয়াল শর্মা।

ইন্দিরা গোস্বামীর ছোটো-গল্প বা উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ হল, তিনি তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে মাঝে মাঝে কল্পনার রং মিশিয়েছেন। তাঁর ভাষায় ঃ *I try to write from the direct experience of my life. I only mould these experiences with my imagination.* তিনি তাঁর মাতৃভাষা অসমিয়াতেই প্রথম লিখতেন এবং পরে সেটি কিছুটা নিজে এবং কিছুটা অন্যের মাধ্যমে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হত। ১৯৭২ সালে তাঁর উপন্যাস *চিনাবর স্রোত* (*The Stream of Chennab*) প্রকাশিত হয়। জম্মু-কাশ্মীরে তাঁর ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর সাথে থাকার সময় চেনাব নদীর উপর একটি সেতু তৈরির অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে উপন্যাসটি রচিত। সেতুটির নির্মাণ শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের

কোম্পানির কর্তারা কীভাবে প্রতি মুহূর্তে শোষণ করত সেই বর্ণনাও আছে। ম্যানেজমেন্টের হাতে শ্রমিকের লাঞ্ছনার চিত্র ১৯৮০ সালে প্রকাশিত আর একটি উপন্যাস *মামোরি ধরা তরোয়াল* (*The Rusted Sword*)-তেও দেখা যায়। প্রসঙ্গত, এই দ্বিতীয় উপন্যাসটির জন্য ১৯৮৩ সালে তিনি সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার পান। দেশান্তরী শ্রমিক ও বিধবাদের দুর্দশার উপরই তিনি বেশি আলোকপাত করেছেন। সমস্যার সমাধানের দাওয়াই তিনি দেননি ; ওটি পাঠকের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

তাঁর উপন্যাস *দাতাল হাতির উনি-খাওয়া হাওদা* (*The Moth-Eaten Howdah of a Tusker*) ১৯৮৮ সালে 'অসম সাহিত্য সভা'-র পুরস্কার পায়। আসামের দক্ষিণ কামরূপ জেলার সত্রগুলির শোচনীয় অবস্থা, ঐ অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চরম অধঃপতন এবং বিভিন্ন সত্রে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে মেয়েদের উপর নির্যাতনকে উপলক্ষ্য করেই নির্ভীক ড. ইন্দিরা রাইসম গোস্বামী এই উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। এটি পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্রে (*Adajya*) রূপায়িত হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছিল। এই উপন্যাসটি National Book Trust of India কর্তৃক প্রকাশিত *The Masterpieces of Indian Literature*-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৮৪ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি নিহত হওয়ার পর দিল্লিতে যে শিখ-বিরোধী ভয়ংকর দাঙ্গা হয়েছিল তারই প্রেক্ষিতে লেখা *তেজ আরু ধুলিরে ধূসরিত পৃষ্ঠা* (*Pages Stained with Blood*) একটি অসাধারণ উপন্যাস। লেখিকা ঐ সময় দিল্লির শক্তিনগর এলাকায় থাকতেন এবং নিজে ছিলেন অনেক ঘটনার সাক্ষী। এর পরেও দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অনেক এলাকা, এমনকি দিল্লির দেহ-ব্যবসায়ীদের লাল-সংকেত নিষিদ্ধ এলাকা জি. বি. রোডেও, সরেজমিনে তদন্ত করেন এবং এইসব মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই উপন্যাসটি তৈরি করেন।

তাঁর রচিত *ছিন্নমস্তার মনুহত* (*The Man of Chinnamasta*) উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে আসামে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়। যুগ-যুগান্তর ধরে প্রচলিত বিখ্যাত কামাখ্যা মন্দিরে পশুবলি প্রথার বিরুদ্ধে এই উপন্যাসে ইন্দিরা তীব্র জেহাদ ঘোষণা করেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'-কে এক সময় পুরোহিত সম্প্রদায়ের একাংশ ধিক্কার জানিয়েছিলেন ; অনুরূপ অবস্থা ছিল ইন্দিরার 'ছিন্নমস্তার' ; এমনকি তাঁর জীবনহানিরও আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। একদিকে বৃন্দাবনের অসহায় বিধবা অন্যদিকে কামাখ্যা মন্দিরের সর্বশক্তিমান দেবী—এই দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী ধর্মীয় বিশ্বাসের ছবি তিনি এঁকেছেন। ইন্দিরা হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্র

উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, কীভাবে মা-কে ফুল দিয়ে পুজো করতে হয়, রক্তের হোলি দিয়ে নয়। মানবতাবাদী ও সমাজকর্মী ইন্দিরার চোখে, কামাখ্যা মন্দিরে ধর্মের নামে যা কিছু হচ্ছে তার বেশিরভাগটাই নিন্দনীয়। ২০০৬ সালে প্রশান্ত গোস্বামী তাঁর অসমিয়া ভাষার উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। বর্তমানে রক্তস্নাত আসামে ULFA জঙ্গিদের সাথে ভারত-সরকারের শান্তি-আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য তিনি মাঝে খুব উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন ; যদিও সেটিকে কেন্দ্র করে নানারকম বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্ক যাইহোক, তিনি যে গজদন্তমিনারে বসে সাহিত্যচর্চা করেন না ; বরং বাস্তব জীবনের নানা সমস্যার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সেই অভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্যের পাথেয়—উপরোক্ত ঘটনাবলী সেটিই প্রমাণ করে।

৪৫টির বেশি জীবনধর্মী গল্প ও গ্রন্থের রচয়িতা ইন্দিরা গোস্বামী বর্তমানে শুধু আসামের নয়, আন্তর্জাতিক স্তরের লেখিকার মর্যাদায় উন্নীত। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর লেখা অনুদিত হয়েছে ; যদিও প্রথমে তিনি তাঁর মাতৃভাষা অসমিয়াতেই লেখেন। আসামে তিনি 'মা-মণি' নামেই পরিচিতা। অসংখ্য পুরস্কার তিনি জীবনে পেয়েছেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৮৩), 'অসম সাহিত্য সভা'-র পুরস্কার (১৯৮৮), ভারত নির্মাণ পুরস্কার (১৯৮৯), উত্তর প্রদেশের সৌহার্দ্য পুরস্কার (১৯৯২), সাহিত্য-কীর্তির জন্য কথা জাতীয় পুরস্কার (১৯৯৩), কমলকুমারী ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৯৬), মিয়ামি-র ফ্লোরিডা ইউনিভার্সিটি থেকে 'রামায়ণে'-র উপর গবেষণার জন্য International Tulsi Award (১৯৯৯), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (২০০০), 'পদ্মশ্রী' (ব্যক্তিগত কারণে প্রত্যাখ্যাত) (২০০২), আসামের মহীয়সী জয়মতি পুরস্কার (২০০২), ডি. লিট. উপাধি (২০০২ সালে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭ সালে অরুণাচল প্রদেশের রাজীব গান্ধি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২০০৮ সালে IGNOU থেকে), International Federation for World Peace কর্তৃক শান্তির রাষ্ট্রদূত হিসেবে পুরস্কৃত, কলকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রদত্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গোল্ড-প্লেট (২০০৮) এবং সর্বশেষ আমস্টার্ডাম-এ Principal Prince Claus Award (২০০৮)।

সূত্র ঃ

i. Indira Goswami, *An Unfinished Autobiography*;
ii. Amar Krishna Paul, *The Humanist : A Short Life Sketch of Dr. Indira Goswami*;

iii. K. B. Satarawala, *Indira Goswami (Mamoni Raisom Goswami) and Her Fictional World—The Search for the Sea*;
iv. পত্র-পত্রিকা ও ইন্টারনেট।

১৭.৮ ইলারাম দাস (১৯২৯-২০০৩) (Ilaram Das : 1929-2003)

আসামে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে যাঁর নাম সবচেয়ে উপেক্ষিত সেই ইলারাম দাস (যিনি পরবর্তী সময়ে 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত হন) ছিলেন অবিভক্ত নওগাঁও জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম জালুগুটির বাসিন্দা। পিতা কালীরাম দাস ও মাতা খোপাদিয়া দাস-এর প্রথম পুত্র ইলারাম ১৯২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। জালুগুটি গ্রামের তিনিই প্রথম সন্তান যিনি ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৪৭ সালে নওগাঁও কলেজ থেকে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বি. এ. ক্লাসে পড়ার সময় হোলি উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীমন্ত শংকরদেবের পুণ্যনামে পরিচিত বটদ্রয় সত্রের একটি দৃশ্য তাঁর সমগ্র চিন্তা-চেতনা এবং জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। তিনি দেখলেন, উচ্চ সম্প্রদায়ের কিছু ব্যক্তি নওগাঁও-র কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদের গুরুর আসনের সামনে বসে প্রার্থনার অনুমতি দিতে নারাজ। শংকরদেবের জাত-পাত ভেদাভেদ-মুক্ত মহান আদর্শ এইভাবে কিছু স্বার্থান্বেষীর হাতে নষ্ট হচ্ছে দেখে স্থির থাকতে না পেরে তিনি দলিত অংশের মানুষকে সংঘবদ্ধ করে এই অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করলেন। এই আন্দোলনের সামনে ছিলেন সাহিত্য-রত্ন হরিনারায়ণ দত্ত বরুয়া। মুহূর্তে পট-পরিবর্তন হল। ঐ সত্রের সত্রাধিকার প্রকাশ্যে সকলের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করে সত্রের দ্বার চিরদিনের কাছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য হলেন। এই একটি ঘটনাই ইলারামের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্মসূচির রূপরেখাও তিনি মনে মনে আঁকতে শুরু করলেন।

শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি জালুগুটি হাই স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করলেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন ছাত্রদের খুবই প্রিয়। তপশিলি জাতিভুক্ত এই ছাত্র-দরদি শিক্ষককে কংগ্রেসের রাজনীতিতে টেনে আনতে 'ত্যাগবীর' হেম বরুয়া (১৭.৭২ দ্রষ্টব্য), দেবকান্ত বরুয়া, মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী (১৭.৫২ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি নেতারা চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। গান্ধিভক্ত ইলারাম ছাত্র-জীবনে জাতীয় আন্দোলনে অংশ নিলেও সংসদীয় রাজনীতির আবর্তে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাননি। ফলে,

আসাম সহ জাতীয় স্তরের অনেক বড়ো বড়ো নেতার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি ভোটে দাঁড়াতে রাজি হননি। তিনি বরং শ্রীমন্ত শংকরদেবের আদর্শের রূপায়ণে নিজেকে নিবেদন করাকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। নওগাঁও-এর 'পালনাম সমাজ'-এর গুরু নন্দীরাম আটা-র কাছে 'এক শরণ নাম ধর্মে' দীক্ষা নিয়ে ১৯৫৫ সালে শিক্ষকতায় ইতি টেনে তিনি দীর্ঘ ১৪ বছর শংকরদেবের দর্শন অধ্যয়ন করেন। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা ও সাংগঠনিক দক্ষতায় 'পালনাম সমাজ' নিপীড়িত মানুষের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং এই 'সমাজ' ১৪টি প্রাথমিক ইউনিটসহ 'আসাম শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘ'-র সাথে যুক্ত হল। ইলারাম ঐ সংঘের 'উপ-পদাধিকার' পদে ১৯৬৮ সাল থেকে দু'বার নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালের ৭ ডিসেম্বর ইলারাম 'এক শরণ ভাগবতী সমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেন—যেটি অবশেষে কোচ, কৈবর্ত্য, কেউট, কাছারি, বোরো, রাভা, লালুং, ব্রাহ্মণ, মিশিং, হীরা, আহোম, চুটিয়া, কায়স্থ, তিয়াস ও চা-বাগানের অসংখ্য শ্রমিকের মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হল এবং ইলারাম দাস 'আচার্য' পদ গ্রহণ করলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুপ্রসাদ দাসের বিবরণ অনুযায়ী ইলারাম কমপক্ষে পাঁচ হাজার জনসভায় সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও শংকরদেবের আদর্শ-প্রচারে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সমগ্র আসামের কোনো অংশই বাদ যায়নি। যে সব প্রশ্নে গুরুত্ব দিয়ে তিনি সকলের কাছে গিয়েছিলেন সেগুলি হল ঃ (১) মদ্যপান সহ নেশাভাং-এর বিরোধিতা, (২) অস্পৃশ্যতা বর্জন, (৩) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি করা, (৪) যুগান্তরের অন্ধকার থেকে চা-বাগানের শ্রমিকদের মুক্তি আন্দোলনকে সুদৃঢ় করা, (৫) উপজাতিদের কল্যাণে মিকির পাহাড়ে (কার্বি-আংলং) কিছু জনহিতকর কর্মসূচি, (৬) নারী-শিক্ষার উপর গুরুত্ব-আরোপ, (৭) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতির জয়গান, (৮) বয়ন শিল্পকে প্রত্যেক পরিবারে প্রসার, (৯) সামাজিক বনায়নের কর্মসূচি, (১০) সর্বধর্মের সমানাধিকার, (১১) তাঁর নিজের জন্মস্থান জালুগুটির ব্যাপক উন্নয়নের প্রস্তাবকে জনপ্রিয়করণ ইত্যাদি। একদিকে 'নামঘরে' শঙ্করদেবের 'বরগীত', 'অংকিয়া নট' ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কর্মসূচি এবং অন্যদিকে সামাজিক-সংস্কার আন্দোলন ইলারাম দাসের নেতৃত্বে সমাজ-জীবনে বিপুল তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। এইসব বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে তিনি মোট ৮টি গ্রন্থও প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর জন্মস্থান জালুগটিতেই ৭৪ বছর বয়সে ১৯ অক্টোবর, ২০০৩ সালে তিনি প্রয়াত হন।

১৭.৯ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম (১৯৫৭-৯০) (Upendranath Brahma : 1957-90)

বোড়োল্যান্ড আন্দোলনের নায়ক এবং **'Bodofa'**/ **'বোড়োফা'** ('ফা' = পিতা) বা বোড়োদের পিতা হিসেবে খ্যাত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের জীবনকাল ছিল মাত্র ৩৩ বছর। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই বোড়ো রাজনীতিকে রীতিমতো তপ্ত করে দিয়ে যান। কোকরাঝাড় জেলার দোতোমা নামে একটি ছোট্ট শহরে ৩১ মার্চ ১৯৫৭-তে তাঁর জন্ম। কোকরাঝাড় কলেজ থেকে বি. এ. এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সকলের কাছে পরিচিত হন। আসামের ইতিহাস উদ্ধৃত করে বক্তৃতার মাধ্যমে জনমত গঠন করার জন্য উপেন্দ্রনাথ উল্লেখ করতেন কীভাবে সুদূর অতীত থেকে বোড়ো জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে আসামে বঞ্চিত হয়ে এসেছে এবং 'দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক' হিসেবে গণ্য হয়েছে, অথচ আহোম যুগের আগে বোড়োদের কর্তৃত্ব একদিন সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রসারিত ছিল। এইভাবে ছাত্রদের মধ্যে বোড়ো জাতীয়তাবাদের বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত All Bodo Students' Union বা ABSU-কে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিলেন।

অতীতে বোড়ো বুদ্ধিজীবীরা—যেমন, কালীচরণ ব্রহ্ম (১৭.১৪ দ্রষ্টব্য), রূপনাথ ব্রহ্ম (১৭.৫৯ দ্রষ্টব্য), সীতানাথ ব্রহ্ম চৌধুরি (১৭.৬৭ দ্রষ্টব্য) অসমিয়া ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাগ্রহণসহ সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি করতেন ; যদিও ১৯৫২ সালে 'বোড়ো সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত All Assam Students' Union বা AASU-র নেতৃত্বে 'বিদেশি বিতাড়নের' নামে সেই ভয়ংকর আন্দোলনের সময় ABSU কিন্তু AASU-র সমর্থনে পথে নেমেছিল এবং রক্তের হোলি-খেলায় উভয়েই মেতেছিল। এই আসাম-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর থেকেই এই দুটি ছাত্র সংগঠনের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ততার দিকে এগোল এবং বোড়ো ছাত্ররা অসমিয়া 'সম্প্রসারণবাদের' বিরুদ্ধে ক্রমশ সোচ্চার হতে শুরু করল। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম ঐ সময়ে ছিলেন বোড়ো ছাত্র-নেতা। আসলে, ১৯৭০-এর দশক থেকে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ১৯৭৮-৭৯-তে Goalpara District Bodo Students' Union-এর সভাপতি হন। আসাম আন্দোলনের পর ১৯৮৩-৮৪-তে তিনি ABSU-র সহ-সভাপতি এবং ১৯৮৮-তে বাশবাড়িতে ABSU-র বিংশতম অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এরপর থেকেই

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-র নাম সামনে চলে আসে। ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরদিকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'বোড়োল্যান্ড' গঠনের ডাক দেওয়ার সাথে সাথেই সমগ্র রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ক্রমশ চঞ্চল ও তপ্ত হতে শুরু করে এবং ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত বোড়োল্যান্ড আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে ; যদিও এর আগেই ১৯৯০-এর পয়লা মে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-র মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল। ভেলোরে CMC Hospital-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির আমন্ত্রণে ত্রি-পক্ষীয় (কেন্দ্রীয় সরকার, আসাম সরকার ও ABSU-র প্রতিনিধিদের মধ্যে) কয়েকটি বৈঠকে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম অংশগ্রহণ করলেও তাঁর 'বোড়োল্যান্ড' তৈরির স্বপ্ন অসম্পূর্ণ রেখেই তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়।

বোড়ো জনগোষ্ঠীর কাছে তিনি মহানায়ক এবং অত্যন্ত সম্মানের 'Bodofa'-র মর্যাদায় ভূষিত। তাঁর মৃত্যুদিন পয়লা মে আসামে 'Bodofa Day' হিসাবে পালিত হয়। তাঁর জন্মস্থান দোতোমায় তাঁর নামে একটি উদ্যান হয়েছে। এছাড়া সমাজের অবহেলিত ও উপেক্ষিত মানুষের কল্যাণে 'উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম ট্রাস্ট' 'U. N. Brahma Soldier of Humanity Award' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর ১০ বছর পরে, অর্থাৎ ২০০০ সালের পয়লা মে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-র ২১ ফুট উঁচু একটি ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচিত হয়েছে।

সূত্র : Y. Z. Brahma, *Bodoland Movement 1986-2001 : A Dream and Reality*

১৭.১০ কনকলাল বরুয়া (১৮৭২-১৯৪০) (Kanaklal Barua : 1872-1940)

আসামের বরপেটার সদর মুন্সেফ্ লক্ষ্মীলাল বরুয়ার পুত্র কনকলাল ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সালে বরপেটার বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর ছাত্রাবস্থাতেই *আসাম বন্ধু, মৌ* ইত্যাদি পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা পাঠাতেন। পরবর্তীকালে পিতার মতো সদর মুন্সেফ্ (১৯০৯-১৯১৭) হয়ে বরপেটায় থাকাকালীন সময়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য) সম্পাদিত অসমিয়া *বাহি* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মমত' (অর্থাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মমত) সংক্রান্ত বিখ্যাত লেখাটি প্রকাশ করেন। বিদ্যোৎসাহী কনকলালের সম্পাদনায় ইংরেজিতে *Journal of the Assam Research Society* এবং অসমিয়া ভাষায় *জোনাকি* নামে দুটি বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশিত হত। শৈশব থেকে সাহিত্য ও গবেষণার প্রতি তাঁর অনুরাগের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯২৪ সালে 'অসম

সাহিত্য সভা' ডিব্রুগড় অধিবেশনে তাঁকে সভাপতি পদে বরণ করে নেয়। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' খেতাব দিয়ে সম্মানিত করে। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে *Early History of Kamarupa* এবং *Studies in the early history of Assam* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯২৭ সালে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯২৯ সালে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে তিনি National Liberal Party of India (যার মধ্যে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, অ্যানি বেসান্ট, তেজবাহাদুর সপ্রু-র মতো খ্যাতিমান নরমপন্থীরা ছিলেন)-র বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন। এর আগে ঐ দলের সদস্য হিসাবে ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় Unity Conference-এ তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯২৮ সালে এলাহাবাদ অধিবেশনে National Liberal Federation-এর জাতীয় কাউন্সিলে স্থান পেয়েছিলেন। আসলে ঐ সময় গান্ধিজির ডাকে কংগ্রেস সদস্যরা ভাইসরয়ের কাউন্সিল থেকে পদত্যাগের পর যে শূন্যস্থান ছিল ব্রিটিশ-অনুগত কনকলাল বরুয়া সেটি পূরণ করেন। সে যাইহোক, আসামের ভয়াবহ গ্রামীণ ঋণের প্রতি কনকলাল বরুয়া তৎকালীন Royal Commission এবং ১৯২৯-৩০-এর Assam Provincial Banking Enquiry Committee-র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মহাজনদের নির্মম সুদের চাহিদার চাপে সর্বস্বান্ত হয়ে আসামের কৃষকরা কীভাবে কৃষিকাজ ছেড়ে গ্রাম থেকে দলে দলে পলাতক হচ্ছে সেই মর্মন্তুদ ছবি এঁকেছিলেন রায়বাহাদুর কনকলাল বরুয়া।

১৯৩৫ সালে আসামের তৎকালীন রাজধানী শিলং শহরে 'রোজাভিলা' নামে একটি মনোরম আবাস তৈরি করেছিলেন রায় বাহাদুর বরুয়া যেটি আজও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। 'রোজাভিলা'-র নীল-নক্শা তৈরি করেছিলেন কনকলালের পুত্র তপনলাল বরুয়া এবং রায় বাহাদুরের প্রিয় কন্যা 'রোজা'-র নামে এটি নামাঙ্কিত হয়েছিল।

সূত্র ঃ R. D. Choudhury and Bhagwan Singh (edited), *Kanaklal Barua Commemoration Volume*, Ramanand Vidya Bhawan, Delhi, 1990.

১৭.১১ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৮৫৩-১৯৩৬) (Kamalakanta Bhattacharya : 1853-1936)

এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন একজন মৌলিক চিন্তাবিদ ও সুলেখক। আসামের দরং জেলার বরহগি গ্রামে ১৮৫৩ সালের ২৩

ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় হঠাৎ পিতার মৃত্যু ঘটলে প্রথাগত পড়াশোনায় তাঁর ছেদ ঘটে। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য), চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (১৭.২২ দ্রষ্টব্য), গুণাভিরাম বরুয়া (১৭.১৮ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের সান্নিধ্যে এসে তাঁর মনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে এবং তাঁর রচিত সাহিত্যে এর প্রতিফলন দেখা যায়। অসমিয়া জনগোষ্ঠীর উপর বাংলা ভাষাকে ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে আরোপ করার বিরুদ্ধে অন্যান্যদের মতো তিনিও প্রতিবাদে সোচ্চার ছিলেন। এইরকম প্রতিক্রিয়া দেখে অবশেষে ১৮৭১ সালে ঐ আদেশ প্রত্যাহার করতে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব বাধ্য হন। এই সাফল্য কমলাকান্ত-র মনে নতুন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। ১৮৮৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি আসামের প্রতিনিধি হিসেবে কলকাতায় গিয়েছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মুক্তমনা এবং অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, বাল্য-বিবাহ এবং বহু বিবাহের তীব্র বিরোধী। কমলাকান্ত ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। নতুন স্বাধীন ভারত গঠনের প্রথম ধাপ হিসেবে তিনি কুসংস্কার-বিরোধী সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ 'অষ্টাবক্রর আত্মজীবনী'-তে একেশ্বরবাদী কমলাকান্ত ভারতবর্ষকে একক ধর্মভিত্তিক (বহু-ধর্মভিত্তিক নয়) রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান রেখেছিলেন।

অসমিয়া সাহিত্যে কমলাকান্তর স্থান ছিল অনন্য। তাঁর রচিত 'কাছাড়ি জাতির বুরঞ্জি' থেকে তাঁর ইতিহাস-চেতনা অনুমান করা যায়। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর আত্মজীবনী 'মোর মনত্ পরা কথা'-য় সমকালীন অসমিয়া সমাজের চিত্র নিখুঁতভাবে এঁকেছেন। তাঁর কবিতা-গ্রন্থ 'চিন্তানল', 'কহ পন্থা', 'চিন্তা-তরঙ্গ', 'মারিসতি', 'পাহারানী', 'জাত-গৌরব' ইত্যাদি গভীর দেশাত্মবোধে সিক্ত। অসমিয়া সাহিত্যে তাঁর অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৯ সালে 'অসম সাহিত্য সভা'-র জোড়হাট অধিবেশনে তাঁকে সভাপতির আসনে বরণ করে নেওয়া হয়। অখণ্ড আসামের পাহাড়ী এলাকা ও সমতল অঞ্চলকে একই সুতোয় বাঁধার উদ্দেশ্যে তিনি বহু পাহাড়ী উপজাতির ভাষা শেখেন এবং কিছুকাল তাদের সাথে বসবাসও করেন। কিছুটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো কমলাকান্ত ভট্টাচার্য সমাজের উপেক্ষিত নারী সমাজের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অসমিয়া সমাজের প্রচলিত দেশাচার, লোকাচার, কুসংস্কারের নির্মম সমালোচক এবং স্পষ্টবাদী ও উদার ঋষিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কমলাকান্ত ভট্টাচার্য *মহর্ষি* নামে জনপ্রিয় হন। আসামের

এইরকম অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ১৯৩৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর ৮৩ বছর বয়সে চিরনিদ্রাভিভূত হন।

১৭.১২ কামিনী কুমার চন্দ (১৮৬২-১৯৩৬) (Kamini Kumar Chanda : 1862-1936)

আসামের বরাক উপত্যকার অবিসংবাদী নেতা কামিনী কুমার চন্দ্র অধুনা বাংলাদেশের সিলেটের অন্তর্গত হবিগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) ছাতিয়াইনে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে ১৮৬২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই পিতা রামকুমার প্রয়াত হওয়ায় পিতৃব্য ইন্দ্রকুমার চন্দের ছত্রছায়ায় তিনি বড়ো হয়েছিলেন। শৈশবে পড়াশোনরা উদ্দেশ্যে শিলচরে আসেন। শিলচর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ১৮৭৯ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম. এ. ও বি. এল. ডিগ্রি অর্জন করে আইনজীবী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ঊনবিংশ শতকে বাংলার 'নবজাগরণে' প্রভাবিত কামিনী কুমার ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও শিলচরে ১৮৯৭ সালে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ছাত্রজীবনে একদিকে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'স্টুডেন্টস্ অ্যাসোশিয়েসন'-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ; অপরদিকে শিবনাথ শাস্ত্রীর ধর্মভাবনা সহ ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার আন্দোলনে গভীরভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে শুরু করে আমৃত্যু তিনি কংগ্রেস দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি তাঁর নিজের গ্রামে ছাত্রাবস্থা থেকে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসাবে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে শিলচর শহরে দীননাথ নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল। শিক্ষার সাথে ঐ বিদ্যালয়ে মেয়েদের হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থাও ছিল। আসলে কাছাড়ে প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠা Rev. William Pryse-র উদ্যোগে কামিনী কুমারের জন্মের বছরেই অর্থাৎ ১৮৬২ সালে শিলচরে শুরু হয় এবং ১৮৬৩ সালে (নানান নাম পরিবর্তনের পর) শিলচর সরকারি উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের যাত্রা শুরু হয় একটি কাঁচা ঘরে। সুতরাং ঐ যুগে মেয়েদের শিক্ষা বা তাদের জন্য বিদ্যালয় তৈরি ছিল একটি স্বপ্নমাত্র। কামিনী কুমার চন্দ সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন ; এটি কম গৌরবের কথা নয়! শিলচর শহরে সরকারি স্কুল তৈরি হলেও একসময়

এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ঐ স্কুলের ছাত্রদের সুদুর সিলেট শহরে যেতে হত। কামিনী কুমার নিজেও গিয়েছিলেন ; কারণ শিলচরে পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল না। কামিনী কুমার চন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীতিমতো দরবার করে ১৯০৬ সালে শিলচরে পরীক্ষা-কেন্দ্র আদায় করেছিলেন, যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে পরীক্ষার্থীরা আসত। হয়তো এইসব কাজকে নগণ্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সময় ও স্থানের প্রেক্ষিতে মোটেই অকিঞ্চিৎকর ছিল না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সাধারণের জন্য মমত্ববোধ।

প্রথম দিকে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৮৮৬ থেকে) তিনি এবং জয়গোবিন্দ সোম 'Habiganj People's Association'-এর প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতেন, অন্যদিকে বিপিন চন্দ্র পাল যেতেন 'Sylhet Association'-এর পক্ষ থেকে। যদিও জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক সকল অধিবেশনে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি ; তথাপি ১৯০১ থেকে (১৯১৬, ১৯১৮, ১৯১৯ ইত্যাদি) তিনি শিলচরের প্রতিনিধি হিসেবেই যোগ দিতেন। বরাক উপত্যকার এই ছোট্ট শহর শিলচরই ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। ছাত্রাবস্থায় ১৮৭৭ সালে কলকাতায় সিলেটের ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী'-র তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য।

শিলচরের মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান এবং পরে বারো বছর চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি গভীর পরিচালন-দক্ষতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই সময় সমগ্র আসামে Local Self-Government বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি শুধু নামেই ছিল, কার্যত তেমন কোনো ক্ষমতা ছিল না ; এবং যেটুকু বা ছিল সেটিও সরকারি আমলা ও চা-বাগানের মালিকদের কুক্ষিগত ছিল। ১৯১৫ সালে LSG Act 1915 প্রবর্তিত হওয়ার আগে Select Committee-র সদস্য হিসেবে ১৯১৪ সালের নভেম্বরে বিলটির উপর আলোচনার সময় সমগ্র আসামে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির গণতন্ত্রীকরণ, নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং কার্যকরী ক্ষমতার দাবিতে কামিনীকুমার চন্দ জোরালো বক্তব্য পেশ করলেও বাগান মালিকদের তীব্র বিরোধিতার জন্য সেটি গৃহীত হয়নি। এতসব সত্ত্বেও শিলচর পৌরসভা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কামিনী কুমারের নেতৃত্বে অনেক জনহিতকর কাজ করেছিল।

১৯০৫-এ কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-কে কেন্দ্র করে বাঙালির মননে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল তার ঢেউ অনিবার্যভাবেই সুরমা উপত্যকায় আছড়ে পড়েছিল। ১৯০৬ সালের ১১ আগস্ট Surma Valley Association-এর জন্মের সাথে সাথে প্রথম অধিবেশনে (সিলেট জেলার জলশুকায়) সভাপতির আসন অলংকৃত

করেছিলেন কামিনী কুমার চন্দ। এই প্রথম অধিবেশনটি ছিল নানা কারণে স্মরণীয়। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ২০০ প্রতিনিধি সহ, সমকালীন পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী (*The Bengalee*, 14 August, 1906; *The Weekly Chronicle*, 22 August, 1906) এক হাজার অতিথি যোগ দিয়েছিলেন। ঐ অধিবেশন থেকেই 'স্বরাজ, স্বদেশি, বয়কট' আওয়াজ সেদিন আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছিল। অসমসাহসী কামিনী কুমারের নেতৃত্বে স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার যেভাবে সমগ্র সুরমা উপত্যকাকে প্লাবিত করেছিল, সেটি এর আগে আর হয়নি। স্বদেশি মডেলে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির দাবিও ছিল অন্যতম। বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) আগে ১৯০৪ সালের ৩১ মার্চ আইনজীবী ও শিলচর পৌরসভার সহ-সভাপতি হিসেবে কামিনী কুমার চন্দ সিলেট ও কাছাড় যেভাবে ১৮৭৪ সালে আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যুক্তি দিয়ে তার তীব্র বিরোধিতা করে যে স্মারকলিপি ব্রিটিশ সরকারের কাছে জমা দিয়েছিলেন সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, আজও যার তাৎপর্য হারায়নি। আসামের চিফ্ কমিশনারের কাছে লেখা এই দীর্ঘ চিঠিটির শেষ কটি লাইন ছিল এইরকম ঃ

> *...The Honourable, the Chief Commissioner invited my opinion from the provincial point of view. My opinion is therefore necessarily based on somewhat narrow and parochial grounds, though if I were to consider it from even the viewpoint of the whole of my race and nation I would be still more strongly opposed to it.*

শুধু একবার নয় বারবার তিনি সিলেট ও কাছাড়ের প্রশ্নটি বিভিন্ন মঞ্চে ও প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন। কামিনী কুমার 'হোমরুল' লিগের সহ-সভাপতি ছিলেন এবং ১৯১৩-১৬ আসাম বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৯১৬ সালে কংগ্রেস-লিগ জোটের সূত্র ধরে ভাইসরয়ের কাছে Imperial Legislative Council-এর যে ১৯ জন সদস্য ন্যায়বিচার সহ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অধিকারের প্রতিবেদনটি পেশ করেন (সেপ্টেম্বর ১৯১৬) সেটিতেও স্বাক্ষরদানকারী হিসেবে কামিনী কুমার চন্দ ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতবাসীর সাহায্য করার বিনিময়ে প্রত্যাশা ছিল যে, যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ শাসকরা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এগুলি স্বীকার করে নেবে। কিন্তু ১৯১৮-তে যুদ্ধ শেষে রাওলাট আইনের মতো নির্যাতনমূলক আইন ("lawless law") প্রবর্তন করে ব্রিটিশ শাসকরা সমস্ত প্রত্যাশা ধূলিসাৎ করে দিলেন। কামিনী কুমারের ভাষায় ....it is "not the way to introduce reforms." এক বছর আগে

১৯১৭ সালের জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে প্রথম কংগ্রেস মঞ্চ থেকে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি উত্থাপিত হয়। যার অর্থ বাংলা-ভাষী সিলেট বা কাছাড় অনিবার্যভাবেই বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, আসামের সাথে নয়। কামিনী কুমারের উদ্যোগে ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে "Sylhet People's Association" একই দাবিতে সোচ্চার হয়ে Viceroy ও Secretary of State-এর কাছে প্রতিবেদন পেশ করে। ১৯১৮ সালে 'Bengal Provincial Conference'-এর সভাপতি হিসেবে কামিনী কুমার চন্দ এই দাবিটিকে 'public appeal' হিসেবে সামনে নিয়ে আসেন। কিন্তু মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে এটি অগ্রাহ্য করা হয়। ধুরন্ধর ব্রিটিশ শাসকরা আসামের জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানারকম কৌশল গ্রহণ করেন এবং নেতৃস্থানীয় "Assam Association"-এর সভ্যদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, সিলেট বা কাছাড় বাদ দিলে আসামের আয়তন এত ক্ষুদ্র হবে যে সেটি স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা হারাবে এবং স্বতন্ত্র রাজ্যপালও সেখানে থাকবে না। এইভাবে কামিনী কুমারদের সমস্ত উদ্যোগে সেদিন জল ঢেলে দেওয়া হয়।

গান্ধিজির ডাকে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ, খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন—প্রতিটিতে কামিনী কুমার চন্দ ছিলেন সামনের সারির যোদ্ধা। গান্ধির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যেমন অনেক আইনজীবী ১৯২১ সালে তাঁদের জীবিকা ত্যাগ করে পথে নেমেছিলেন, সুরমা উপত্যকাতেও যে দুজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী আদালত ত্যাগ করেছিলেন তাঁরা হলেন কাছাড়ের কামিনী কুমার চন্দ ও শ্যামাচরণ দেব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট্‌ হিসেবে কামিনী কুমার বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর পসারও রীতিমতো জমে উঠেছিল। অবিভক্ত বঙ্গের ফৌজদারি আদালতে তাঁর সমকক্ষ খুব কমই ছিলেন। বলাধুন হত্যা মামলায় নির্দোষ অভিযুক্তদের পক্ষে সওয়াল করে এবং নিম্ন আদালতে চারজন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অভিযুক্তদের হাইকোর্টে মুক্ত করে তিনি এক নয়া নজির গড়ে তুলেছিলেন।

কামিনী কুমার চন্দ-র মতো ত্যাগী, কর্মবীর, দেশপ্রেমিক, সর্বজনপ্রিয় নেতা বরাক উপত্যকায় বিরল। আসামের ছোটো একটি শহরের ব্যক্তি হয়েও তিনি সে যুগের জাতীয় নেতাদের সাথে যেভাবে নিজেকে সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেটি অনেকের কাছেই ছিল ঈর্ষণীয়। তাঁকে বলা হত **"আসামের মুকুটহীন রাজা"**। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধিজি, মৌলানা মহম্মদ আলি প্রভৃতি জাতীয় নেতারা তাঁর "চন্দ-ভবনে" আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের সাথেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথের *ভাণ্ডার* পত্রিকার জন্য তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। উদার, সুরুচিসম্পন্ন, সংস্কৃতিবান কামিনী কুমার তাঁর পরিশীলিত বাচনভঙ্গির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। জীবনের শেষদিকে তিনি কার্যত দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন এবং তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপনের দায়িত্ব প্রিয় পুত্র অরুণ কুমারের (১৭.৪ দ্রষ্টব্য) হাতে সঁপে যান। ১৯৩৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি শিলচরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৭.১৩ কালিরাম মেধি (১৮৭৮-১৯৫৪) (Kaliram Medhi : 1878-1954)

আসামের উত্তর কামরূপের রামদিয়া গ্রামে ১৮৭৮ সালের অক্টোবরে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে কালিরাম মেধির জন্ম। নিরক্ষর বাবা বুখোলি মেধি এবং মা সোনাতারা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেননি যে তাঁদের সন্তান একদিন বিখ্যাত পণ্ডিত হবেন। কিন্তু কালিরামের জ্যাঠামশাই ধরম মেধি স্বপ্ন দেখতেন তাঁর ভাইপো একদিন ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে তাঁর উপর যে অত্যাচার হয়েছে এবং মণ্ডলরা যেভাবে তাঁর জমি গ্রাস করেছে তার প্রতিকার করবেন। প্রধানত জ্যাঠার উদ্যোগেই কালিরাম প্রথমে গুয়াহাটির গভর্নমেন্ট সেমিনারি থেকে ১৮৯৭ সালে কৃতিত্বের সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত ভাষায় অসমিয়া ছাত্রদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য তিনি হেমচন্দ্র বরুয়া ও হেমধর বরুয়া মেডেল পান এবং এলিয়ট্ স্কলারশিপ বা বৃত্তি (আসামের তৎকালীন চিফ্ কমিশনার চার্লস্ এলিয়ট-এর নামাঙ্কিত) পেয়ে কলকাতার 'সিটি কলেজ'-এ ভর্তি হন। সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে এফ. এ., রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যায় অনার্স নিয়ে স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৩ সালে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। **অসমিয়াদের মধ্যে কালিরাম ছিলেন তৃতীয় ব্যক্তি (এর আগে রাধানাথ ফুকন এবং আনন্দচরণ ভট্টাচার্য) যিনি সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রির অধিকারী।**

কলকাতায় শিক্ষা সমাপনান্তে আসামে ফিরে গিয়ে কালিরাম প্রত্যাশা করতেন, তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে উচ্চপদে আসীন করবেন। তা কিন্তু প্রথমে হয়নি। ডিব্রুগড়ে অ্যাসিস্‌টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার হিসাবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর ধাপে ধাপে সাব্-ডেপুটি কমিশনার, এস. ডি. ও. ইত্যাদি হিসাবে কাজ করার পর ১৯৩৬ সালে নওগাঁর ডেপুটি কমিশনার পদে উত্তীর্ণ হন এবং ঐ বছরেই অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অবসরের পরেও ব্রিটিশ সরকার তাঁকে

স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে পুনর্নিয়োগ করেন এবং দীর্ঘ দশ বছর ঐ পদে কাজ করেন। সরকারি আধিকারিক হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের অবসান হয় ১৯৪৬ সালের পয়লা জানুয়ারি এবং ঐ বছরেই তিনি 'রায় বাহাদুর' খেতাব পান।

কালিরাম মেধি-র সাংসারিক জীবন অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে কেটেছে। বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর প্রথম বালিকা বধূর মৃত্যু হয়। প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মোক্ষদা দেবীর সাথে বিবাহিত জীবন দীর্ঘ ১২ বছর স্থায়ী হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত ৫টি মাতৃহারা শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি তৃতীয়বার বিবাহ করেন এবং তৃতীয় স্ত্রী শ্যামলতা-র গর্ভজাত ৬টি সন্তান প্রতিপালন করতে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর দিন কাটে। পুত্রদের মধ্যে রামভদ্র, সুভদ্র এবং সুরেন্দ্র কিছুটা পিতার অসাধারণ মেধার অধিকারী হতে পেরেছিলেন। সরকারি কাজের জন্য একদিকে যেমন আসামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত তাঁকে ঘুরতে হয়েছে ; তেমনি ছোটো-বড়ো নানা ধরনের মানুষের সমস্যা ও সংকট গভীরভাবে অনুধাবনের সুযোগও তাঁর সামনে এনে দিয়েছে। সহস্র বন্ধনের মধ্যেও কালিরাম মেধি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, আশাবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ মুক্ত পুরুষ। ধর্ম, শিক্ষা, অর্থনৈতিক সমস্যা বা সমাজ সংস্কার—প্রতিটি বিষয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তা ছিল যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। শেষদিন পর্যন্ত সততার মূর্ত-প্রতীক কালিরাম অনাড়ম্বর ও কষ্টসহিষ্ণু জীবনযাপন করে গেছেন। হতাশা তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। *অসম বান্ধব, আলোচনী* ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর রচনা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।

ছাত্র ছিলেন মূলত বিজ্ঞানের, কর্মজীবন কেটেছে ব্রিটিশ সরকারের আধিকারিক হিসাবে, কিন্তু সাহিত্যের অঙ্গনে কালিরাম মেধি অনন্য পুরুষ। **প্রাচীন অসমিয়া সাহিত্যের সমালোচনায় প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে তাঁর রচনায়।** বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত কালিরাম ছিলেন বৈষ্ণব সন্ত শংকরদেব-এর একান্ত অনুরাগী। শংকরদেবের বিখ্যাত কথাগুলি বিষয়ের বৈচিত্র্য অনুসারে সাজিয়ে 'মহাপুরুষ শংকরদেবের বাণী' নামে একটি অনবদ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। শংকরদেবের পূর্ববর্তী কবি হেম সরস্বতীর কবিতা 'প্রহ্লাদ চরিত'-এর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণই হল তাঁর সাহিত্যকীর্তির প্রথম অনুপম নিদর্শন। তাঁর রচিত 'অসমিয়া ব্যাকরণ আরু ভাষাতত্ত্ব' অসমিয়া সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। প্রাচীন অসমিয়া সাহিত্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'অঙ্কাবলী', বিজ্ঞান সংক্রান্ত 'অসমিয়া প্রকৃতি বিজ্ঞান', 'বীজগণিত' ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাদের গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তাঁর রচিত ইংরেজি গ্রন্থ *Studies in the Vaisnava literature and Culture of Assam* পণ্ডিতমহলে

বিশেষভাবে আদৃত। ভারততত্ত্বের একনিষ্ঠ সাধক কালিরাম মেধি 'Assam Research Society', 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' ইত্যাদির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৯ সালে 'অসম সাহিত্য সভা'-র সভাপতিত্ব করার সম্মান লাভ করেছিলেন পণ্ডিত কালিরাম মেধি। ১৯৭৮ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাঁর অমূল্য রচনাগুলির সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের ২৪ জানুয়ারি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সূত্র ঃ *কালিরাম মেধি রচনাবলী*

১৭.১৪ কালীচরণ ব্রহ্ম (১৮৬২-১৯৩৮) (Kalicharan Brahma : 1862-1938)

বোরো সমাজের ধর্মীয় সংস্কারক এবং **'গুরুদেব'** বা **'গুরু ব্রহ্ম'** হিসাবে সম্মানিত কালীচরণ ব্রহ্ম গোয়ালপাড়া জেলার কাজিগাঁও গ্রামে ১৮৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল কালিচরণ মেচ। আসামের ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি গুণাভিরাম বরুয়া (১৭.১৮ দ্রষ্টব্য), স্বর্ণলতা দেবী প্রভৃতি ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে কালীচরণ বোড়ো সমাজে দীর্ঘদিন প্রচলিত সর্বপ্রাণবাদী ('Bathow') 'ব্যাথু' ধর্মের পরিবর্তে ১৯০৬ সালে কলকাতায় ব্রাহ্ম সমাজের আদি ধর্ম গ্রহণ করেন যেটি 'বোড়ো ব্রহ্ম ধর্ম' নামে পরিচিত। কালীচরণকে অনুসরণ করে বোড়ো সমাজের একটা বড়ো অংশ ঐ ধর্মের সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং ১৯১১ সালে নামের পাশে 'ব্রহ্ম' ব্যবহার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পায়। কালীচরণ যে সময় ব্রাহ্ম সমাজের আদি ধর্ম গ্রহণ করেন, সেই সময় বোড়োদের একটা অংশ বিদেশি মিশনারিদের প্রভাবে হয় খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, অথবা সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের আঙিনাভুক্ত হচ্ছিলেন (সারনিয়া বা রাজবংশীদের মতো)। এই প্রবণতায় ইতি টানার উদ্দেশ্যে এবং জাত-পাত-পুরোহিত ও আচারভিত্তিক পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম থেকে বোড়োদের দূরত্ব বজায় রাখার সংকল্প নিয়ে তিনি নতুন ধর্ম-আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। শুয়োর ও মুরগির মাংস-ভক্ষণে এবং 'জৌ', 'জুমাই' ইত্যাদি (ঘরে প্রস্তুত) মদ্যপানে অভ্যস্ত বোড়োদের বর্ণহিন্দুদের একাংশ কিছুটা ঘৃণার চোখে দেখতেন বলে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি কালীচরণের আকর্ষণ ছিল না ; আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও তিনি সহ্য করতে পারতেন না (কিছুটা গুণাভিরাম বরুয়া-র মতো)। নতুন ধর্মের উন্নত চেতনা, জাত-পাতের বিরুদ্ধে অভিযান, শিক্ষার মাধ্যমে অন্ধকার সমাজে আলো জ্বালানোর ব্রত নিয়েই কালীচরণ ব্রহ্ম তাঁর যাত্রা শুরু

করেছিলেন এবং 'বোড়ো মহাসভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। কালীচরণের জীবিতাবস্থায় ১৯২১ সালে ভাত্তরাগুড়িতে, ১৯২৫-এ রঙ্গিয়াতে এবং ১৯২৯-এ বঙ্গাইগাঁও-এর কাছে রোউমারিতে বোড়োদের 'মহাসম্মেলন' হয়। ১৯১২-তে Tipkai M. E. School প্রতিষ্ঠা করে যে অভিযান কালীচরণ শুরু করেছিলেন ; এইসব মহাসম্মেলনে তা শক্তি অর্জন করে। এইভাবে ধর্মের মাধ্যমে তিনি সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। 'Trust deed of Brahmo Sabha'-র নির্দেশমতো তিনি একদিকে মূর্তি পূজা, বলিদান বা প্রাণী হত্যার বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে বোড়ো সমাজে শূকর-পালন, মদ্যপান ইত্যাদি প্রচলিত কু-অভ্যাসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিলেন। যদিও সর্বক্ষেত্রে সাফল্য সাথে সাথে আসেনি, তথাপি শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে চেতনা-সৃষ্টিতে তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন যেটি পরবর্তী সময়ে বোড়ো-ভাষা বা স্বাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিফলিত। তাঁরই অনুগামী রূপনাথ ব্রহ্ম, জয়নারায়ণ বসুমাতারি, সতীশচন্দ্র বসুমাতারি প্রভৃতি বোড়ো নেতারা পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিনের প্রচলিত 'ব্যাথু' ধর্ম থেকে কিছু অংশ নিয়ে 'বোড়ো ব্রহ্ম ধর্ম'কে কিছুটা সংশোধিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তবু কালীচরণ ব্রহ্ম বোড়ো সমাজের প্রকৃতই 'গুরুদেব'। প্রতিটি বোড়ো পরিবারে বয়নশিল্প-কে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন। বোড়ো কন্যারা কত সুন্দর রং ও অভিনব ডিজাইনের মাধ্যমে তাঁতকে আকর্ষণীয় করতে পারে সেটি সকলকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ১৯২৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের পাণ্ডু অধিবেশনের সময় কালীচরণ ব্রহ্ম একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। দীর্ঘ ৭৬ বছর জীবিত থাকার পর ১৯৩৮ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

১৭.১৫ কুলধর চালিহা (১৮৮৮-১৯৬৩) (Kuladhar Chaliha : 1888-1963)

আসামের শিবসাগর জেলার প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং চা-বাগানের মালিক রায়বাহাদুর ফণিধর চালিহা-র (১৮৫৫-১৯২৩) সন্তান কুলধর চালিহা (১৮৮৮-১৯৬৩) ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অগ্রণী গান্ধিবাদী যোদ্ধা। আসামে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে কুলধর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের স্নাতক হয়ে শিবসাগরে ফিরে যান এবং ওকালতি ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২১ সালে কুলধর চালিহা, নবীনচন্দ্র বরদোলই (১৭.৩৫ দ্রষ্টব্য) ও তরুণরাম ফুকন (১৭.৩১ দ্রষ্টব্য) একযোগে অসহযোগ আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুম্বাইয়ে গিয়ে মহাত্মা গান্ধিকে আসাম পরিভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান। ওঁদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ

হয়ে গান্ধিজি যথাক্রমে গুয়াহাটি, তেজপুর ও জোড়হাটে কয়েকটি সমাবেশে ঐ আন্দোলনে সকলকে শামিল হওয়ার আহ্বান রাখেন। আসামে জাতীয় আন্দোলনের এটি ছিল চরম মুহূর্ত। কুলধর চালিহা নিজের উদ্যোগে গান্ধিজিকে মরিয়ানি থেকে জোড়হাট আনার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কুলধর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এক বছর কারাদণ্ডও ভোগ করেন। প্রসঙ্গত, ঐ সময় আসামে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয় এবং কুলধর চালিহা হন ঐ কমিটির প্রথম সভাপতি এবং নবীনচন্দ্র বরদোলই হন সম্পাদক। গান্ধিবাদী কুলধর ওকালতি ছেড়ে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধে এবং সমাজে নারীর সমানাধিকারের পক্ষে আজীবন সংগ্রাম চালান।

১৯২৩ সাল থেকে পরপর দুবার কুলধর চালিহা আসাম বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি (এ. আই. সি. সি.)-র নির্দেশে অবশেষে তাঁর সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নির্লজ্জভাবে বৈষম্যমূলক নীতি প্রচার করার জন্য তিনি সাইমন কমিশনের (১৯২৮-২৯) বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে তাঁর জাতীয়তাবাদী আপোসহীন সংগ্রামী মনোভাবে পরিচয় দিয়েছিলেন। আসামে জনসাধারণের মধ্যে আফিম-সেবন দূরীকরণের জন্য ১৯২৫ সালে যে আফিম-সেবন নিষিদ্ধকরণ সমিতি গঠিত হয়েছিল, কুলধর চালিহা ছিলেন তার সভাপতি। এই সমিতির নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের ফলেই ১৯২৫ সালে আসামে বছরে ৯২৮ মন আফিম-সেবন ১৯২৯-৩০ সালে কমে ৫৯১ মনে দাঁড়িয়েছিল ; যদিও পুরোপুরি নিষিদ্ধকরণ হয়নি।

১৯৩৬ সালে কেন্দ্রীয় অ্যাসেম্বলি (Central Assembly)-তে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৬ সালে সংবিধানসভায় (Constituent Assembly) গোপীনাথ বরদোলই, নিবারণচন্দ্র লস্কর, ধরণীধর বসুমাতারি, জে. জে. এম. নিকলস্-রায়, রোহিণীকুমার চৌধুরি, মহম্মদ সাদুল্লাহ এবং আব্দুল রউফ্-এর সাথে কুলধর চালিহাও অবিভক্ত আসামের প্রতিনিধিত্ব করেন। উপজাতিদের স্বশাসন সহ বিভিন্ন অধিকার সম্প্রসারণের প্রশ্নে কুলধর চালিহার নিজস্ব কিছু ধ্যান-ধারণা ছিল। **চালিহা মনে করতেন, বহির্ভূত এলাকায় (excluded areas) উপজাতিদের বেশি সুযোগ-সুবিধা দিলে একদিন 'পাকিস্তান'-এর মতো 'tribalistan' গড়ার পথ প্রশস্ত হবে এবং ভারতবর্ষ আবার বিভিন্নভাবে খণ্ডিত হবে।** চালিহার সাথে এই প্রশ্নে রোহিণীকুমার চৌধুরির তুমুল বিতর্ক এবং অবশেষে গোপীনাথ বরদোলই-এর হস্তক্ষেপে মীমাংসা সূত্র খুঁজে বের করার কাহিনি সংবিধানসভা-বিতর্কের একটি আকর্ষণীয় অধ্যায়। একই ভাবে পরবর্তীকালে

নাগাল্যান্ড গঠিত হওয়ার সময় চালিহা প্রশ্ন তুলেছিলেন ঃ কেন ডিমাপুর শহরকে নাগাল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, ডিমাপুরে নাগা জনগোষ্ঠীর কোনো অস্তিত্ব নেই। যদিও জাতীয় কংগ্রেসের তিনি নিবেদিত প্রাণ সৈনিক ছিলেন ; তথাপি— এইরকম অনেক প্রশ্নেই তিনি নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এরই জন্য মাঝে মাঝে তিনি বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হতেন ; তথাপি আসামের কংগ্রেসের তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় নেতা। ১৯৫২ সাল থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি আসাম বিধানসভার অধ্যক্ষের পদে আসীন ছিলেন। যদিও ১৯৬৩-তে তিনি প্রয়াত হয়েছেন ; তথাপি ১৯৮৮-তে তাঁর জন্মশতবর্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় সরকার কুলধর চাহিলার নামে একটি ডাক-টিকিট প্রকাশ করেন।

১৭.১৬ কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক (১৮৯৮-১৯৮২) (Krishna Kanta Handique : 1898-1982)

আহোম গোষ্ঠীভুক্ত চা-বাগানের মালিক রায় বাহাদুর রাধাকান্ত ও নারায়ণী হ্যান্ডিকের পুত্র কৃষ্ণকান্তর জন্ম হয় ১৮৯৮ সালের ২০ জুলাই আসামের জোড়হাট শহরে। অত্যন্ত মেধাবী কৃষ্ণকান্ত প্রথমে গুয়াহাটির কটন কলেজ, এরপর ক্রমান্বয়ে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ (১৯১৫-১৭), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৭-১৯), অক্সফোর্ড, প্যারিস ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২০-২৭) ইতিহাসে কৃতিত্বের সাথে উচ্চশিক্ষা সমাপন করে বিভিন্ন ভাষার প্রায় ২,০০০ ধ্রুপদী গ্রন্থ নিয়ে আসামে ফিরে আসেন। **তিনি দেশি-বিদেশি মোট ১৩টি ভাষায় দক্ষ ছিলেন** ; এর মধ্যে পালি ও প্রাকৃতসহ দেশি ৫টি এবং লাতিন, গ্রিক, ফরাসি, জার্মান, রাশিয়ান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ ও ইংরেজি সহ মোট ৮টি বিদেশি ভাষা। সরকারি চাকুরির প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। ১৯৩০ থেকে যৌবনের প্রথম ১৭টি বছর তিনি জোড়হাটে নিজের উদ্যোগে স্থাপিত অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন 'জগন্নাথ বরুয়া কলেজ' বা সংক্ষেপে জে. বি. কলেজ-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন। এটিই ছিল আসামের প্রথম বেসরকারি কলেজ যেটি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ধনী ব্যক্তির সন্তান হওয়ার সুবাদে আর্থিক উপার্জনের দিকে তাঁর তেমন নজর ছিল না। শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি জোড়হাটে 'হেমলতা হ্যান্ডিক মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট', 'চন্দ্রকান্ত হ্যান্ডিক মেমোরিয়াল হল' ইত্যাদি স্থাপন করেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে জোড়হাটে এগ্রিকালচারাল কলেজ ১৯৪৮-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেটি ১৯৬৯ সালে

এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তরিত, ১৯৪৮-এ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৩ বার অর্থাৎ প্রথম ৯ বছর তিনি ছিলেন ঐ **বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য (১৯৪৮-৫৭)**। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করে সেই সময় উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মৃত্যুর (১৯৮২) আগে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পৃথিবীর ১১টি ভাষার ৭,৪৮৯টি অমূল্য গ্রন্থ তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছিলেন। সমগ্র জীবন তিনি ছাত্রের মতো পড়াশোনা করেছেন, কারণ পৃথিবীতে বই ছিল তাঁর একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু। প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধানে সমগ্র জীবন তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় কাটিয়েছেন। এরই জন্য তাঁকে **'জ্ঞানতপস্বী'** বলা হয়।

একদিকে সংস্কৃত সাহিত্য এবং অন্যদিকে Indology বা ভারততত্ত্ব ও ইতিহাসে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাঁর প্রতিটি লেখায় পরিস্ফুট। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে *শ্রীহর্ষের নিষাধচরিত, Yasastilaka and Indian Culture, Pravarasena's Setubandha* ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই সময় ভারততত্ত্বের প্রসিদ্ধ বিদেশি পণ্ডিত উইন্‌টারনিজ্, এ. বি. কীথ্ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন হ্যান্ডিকের প্রতিটি গ্রন্থকে। তাঁর বয়স যখন মাত্র ৩৬ বছর, তখনি তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাকৃত ভাষায় লেখা প্রবর সেন-এর 'সেতুবন্ধ'-র ইংরেজি অনুবাদ করার সময় বারবার তিনি উল্লেখ করেছেন, ভারতীয় সাহিত্যের চিরায়ত কালজয়ী গ্রন্থগুলির আকর্ষণ কীভাবে যুগে যুগে অম্লান আছে এবং কীভাবে ঐসব ধ্রুপদী গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে আধুনিক জীবনের অনেক সমস্যা সমাধানের সূত্র আমরা খুঁজে পেতে পারি। এইভাবে তত্ত্ব-জ্ঞান-কে বাস্তবে প্রয়োগ করে (applied knowledge) তিনি প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে। একই কথা উল্লেখযোগ্য দ্বাদশ শতকের সংস্কৃত কাব্য শ্রীহর্ষের *নিষাধচরিত* অনুবাদ এবং অন্যান্য গ্রন্থ প্রসঙ্গে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়—শিক্ষার প্রতিটি অঙ্গনে কীভাবে সংস্কার সাধন জরুরি সেটি বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আসলে, তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে শিক্ষা সংস্কারক। ১৯২৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *Forward* নামক সাময়িকীতে 'German Academic Ideals' প্রবন্ধে জার্মানির উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার সাথে আমাদের দেশের শোচনীয় চিত্রের তুলনামূলক আলোচনার সময় বারবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছেন। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বারবার কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক ছাত্রদের কাছে মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। আমাদের দেশে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি ও ছাত্রদের মূল্যায়ন প্রসঙ্গেও তাঁর কিছুটা ভিন্ন

বক্তব্য ছিল ; যদিও প্রবল বাধার মুখোমুখি হওয়ার জন্য সেগুলি তিনি ঠিকমতো বাস্তবায়িত করতে পারেননি।

১৯৩৭ সালে গুয়াহাটিতে অসম সাহিত্য সভার সভাপতি হিসাবে তিনি জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সকলকে শামিল করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন ভাষার ধ্রুপদী গ্রন্থের অসমিয়া ভাষায় অনুবাদের তিনি ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। অতুলচন্দ্র হাজারিকার 'শকুন্তলা' অনুবাদ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন হ্যান্ডিক। তৎকালীন *The Modern Review, The Indian Antiquary, The Indian Historical Quarterly* ইত্যাদি বিখ্যাত সাময়িকপত্রে কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক-এর অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫১ সালে লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত 'All India Oriental Conference'-এ ধ্রুপদী সংস্কৃত অধিবেশনে তিনি ছিলেন সভাপতি। একদিকে যখন তাঁর পিতা রাধাকান্ত হ্যান্ডিক (১৮৫৭-১৯৫২) আহোম উত্থান, আহোম জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে সোচ্চার, সেই সময় কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সর্বভারতীয় গবেষণামূলক বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার প্রথমে তাঁকে 'পদ্মশ্রী' এবং ১৯৬৭ সালে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৮-তে তিনি 'ডেকান কলেজ'-এর সম্মানীয় 'ফেলো' হিসেবে নির্বাচিত হন। 'অসম সাহিত্য সভা' তাঁকে 'সদস্য মহীয়ান' হিসেবে মর্যাদা দেয় এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি. লিট' প্রদান করে। ১৯৮৫ সালে দিল্লির সাহিত্য অকাদেমি যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক রচনা-সম্ভার-এর জন্য তাঁকে মরণোত্তর সম্মান জানায়। তাঁর মৃত্যুর এক বছর পরে ১৯৮৩ সালে ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক-এর নামে বিশেষ একটি ডাক-টিকিট প্রকাশ করে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

১৭.১৭ গণেশচন্দ্র গোগুই (১৯০৭-৩৮) (Ganesh Chandra Gogoi : 1907-38)

প্রেম ও সৌন্দর্যের বিখ্যাত কবি, গায়ক, অভিনেতা, ক্রীড়াবিদ গণেশচন্দ্র গোগুই ১৯০৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর জোড়হাটে ঢাকুয়াখানায় জন্মগ্রহণ করেন। অভিজাত পরিবারভুক্ত তাঁর ম্যাজিস্ট্রেট পিতা কনকচন্দ্র গোগুই ছিলেন তৎকালীন অবিভক্ত লখিমপুর জেলার (বর্তমানের লখিমপুর, ধেমাজি, ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়া জেলা একত্রে) প্রথম গ্র্যাজুয়েট। বাবার কড়া শাসনের গণ্ডির মধ্যে থেকে গণেশচন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এরপর প্রথমে গুয়াহাটির কটন কলেজ এবং পরে কলকাতার রিপন কলেজ (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে স্নাতক হয়ে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু শেষপর্যন্ত উচ্চশিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই আসামে ফিরে আসেন।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার থিয়েটার আন্দোলন তরুণ ছাত্র গণেশকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। প্রিয় বন্ধু ও পরামর্শদাতা আনন্দচন্দ্র বরুয়ার সমর্থনপুষ্ট হয়ে তিনি জোড়হাটে 'বাণী সম্মেলন' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং ১৯২৯-এ 'জোড়হাট থিয়েটার'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে অভিনয়-শিল্পে অংশ নেন। *রামায়ণ, মহাভারত* থেকে নানা কাহিনি নিয়ে তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে সুমধুর কবিতার মাধ্যমে *শকুনির প্রতিশোধ* নামে তাঁর 'এপিক-ড্রামা' মুহূর্তে জনচিত্ত জয় করে। এরপর একে একে তাঁর রচিত *সীতা, কুঁয়রি সতীকা, কমলা কুঁয়রি, কাশ্মীর কুঁয়রি* ইত্যাদি নাটকগুলি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য) যখন তাঁর যুগান্তকারী ছায়াছবি *জয়মতী* তৈরি করছিলেন, সেই সময় গণেশ গোগুই একই বিষয়বস্তুর উপর থিয়েটারের জন্য নাটক লিখছিলেন। অবশ্য জ্যোতিপ্রসাদের অনুরোধে নাটকটির নাম পরিবর্তন করে *জেরেঙ্গার সতী* দেন।

অত্যন্ত সুদর্শন ও মৃদুভাষী গণেশচন্দ্র ছিলেন রোমান্টিক কবি তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের জীবন প্রেম ও সৌন্দর্যের মাধ্যমেই সুভাষিত ও সমৃদ্ধ হয়। তাঁর আত্মজীবনীমূলক প্রেমের কাব্যগ্রন্থ *পাপড়ি* তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। যৌবনে যে মানবী তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস ছিল এবং যাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গণেশচন্দ্রের মনে প্রেমের নবোন্মেষ হয়েছিল এবং বীণার ঝংকারে কাব্য কবিতা ছন্দিত হয়েছিল, সেই প্রিয়ার প্রত্যাখ্যানই তাঁর অন্তর্বেদনাকে কাব্যে এক নতুন মূর্তি দিয়েছে। *পাপড়ি*-র অসাধারণ কবিতাগুলি যাতে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পায় সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময় প্রখ্যাত হেম বরুয়া (১৭.৭২ দ্রষ্টব্য) মন্তব্য করেছিলেন ঃ "In it, he creatls pearls of poetry, each dyed with the superb tings of a sad heart."

তাঁর স্বল্প-পরিসর জীবনে গণেশ গোগুই অনেক সংগীত রচনা করেছেন যেগুলি সাহিত্যের সংবাদপত্র *বহ্নি, আহ্বান, ঘর-জিয়ুতি, দৈনিক বাতরি* ইত্যাদিতে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁর রচিত গানগুলি এক জায়গায় সংকলন করে অমূল্য বরুয়া *রূপজ্যোতি* নাম একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যেহেতু গণেশচন্দ্র নিজেই ছিলেন সুরকার ও গায়ক এবং অসমিয়া লোকসংগীতের অনুরাগী, এরই জন্য তাঁর গানের আবেদন ছিল সর্বত্রগামী।

ক্রীড়া জগতেও গণেশ গোগুই কম নৈপুণ্য দেখাননি। কটন কলেজে ছাত্রাবস্থায় ১৯২৬ সালে তিনি 'আসাম ভ্যালি অ্যান্ড সুরমা ভ্যালি টুর্নামেন্টে' শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ হিসেবে সম্মানিত হয়েছিলেন। কলকাতা ও বেনারসে ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এত বিচিত্র ও বিভিন্ন গুণের অধিকারী সম্পূর্ণ মানুষটি ১৯৩৮ সালের ২১ আগস্ট মাত্র ৩১ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার ফলে সমগ্র আসামের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল।

১৭.১৮ গুণাভিরাম বরুয়া (১৮৩৭-১৮৯৪) (Gunaviram Barua : 1837-1894)

জন্ম আসামের জোড়হাটে। পিতা রণরাম বরুয়া। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে অনাথ গুণাভিরাম প্রথমে তৎকালীন উদার ধনাঢ্য লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রহ্মচারী এবং পরবর্তী সময়ে কাকা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (প্রথম খণ্ড, ১২.৪ দ্রষ্টব্য)-এর আর্থিক সহায়তায় কলকাতায় পড়াশোনার সুযোগ পান। সেই সময় কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী এবং সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পীঠস্থান। ১৮৫৪ সালে বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গুণাভিরাম কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে আইন শিক্ষা শুরু করেন। আনন্দরামের উদ্যোগেই তাঁর বিবাহ হয়। আনন্দরামের আকস্মিক মৃত্যুর পর গুণাভিরাম কলকাতা ত্যাগ করে আসামে ফিরে যান এবং উভয় সংসারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এরপর গুণাভিরাম সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন এবং শীঘ্রই 'একস্ট্রা অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার' পদে উন্নীত হন। তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিধবা বিবাহ ঃ কলকাতায় অবস্থানকালে বাঙলার 'নবজাগরণ' ও নানারকম প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রভাবে গুণাভিরামের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা লাভ করেছিল। **যে স্বল্পসংখ্যক অসমিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনিই অন্যতম। সমাজ-সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যুবক গুণাভিরামকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।** সুকিয়া স্ট্রিটে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে অন্যদের সাথে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি যে শুধুমাত্র আদর্শের দিক থেকে বিদ্যাসাগরের মতবাদের সমর্থক ছিলেন তা নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও তাকে কার্যকরী করে তুলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। প্রথমা স্ত্রী ব্রজসুন্দরী দেবীর মৃত্যুর পর তিনি ১৮৭০ সালে তাঁর প্রয়াত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিধবা স্ত্রী (দুই সন্তানের জননী) বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। গুণাভিরাম ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলনে তিন পুত্র

ও এক কন্যার জন্ম হয় এবং তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখকর হয়েছিল। তৎকালীন অসমিয়া সমাজে এটি ছিল এক অভিনব ঘটনা। নিজের কন্যা স্বর্ণলতা বিধবা হওয়ার পর তিনি কন্যারও পুনর্বিবাহ দিয়েছিলেন। বিধবা বিবাহের প্রেক্ষিতে লেখা তাঁর অমর সাহিত্য *রামনবমী* আসামের প্রথম সামাজিক নাটক। ১৮৫৭ সাল থেকে অসমিয়া ভাষার *অরুণোদয়* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে নাটকটি প্রচারিত হয় এবং ১৮৭০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৭ বছর পর ২০০৭ সালে 'অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস' গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ (তিলোত্তমা মিশ্র কৃত) প্রকাশ করে বিশ্ব দরবারে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নাটকটির নায়িকা তরুণী বিধবা 'নবমী' (বিবাহের পর স্বামীর সাথে একসাথে সহবাসের আগেই কলেরায় স্বামীর মৃত্যু) এবং নায়কের নাম 'রামচন্দ্র'। গুণাভিরাম ব্যক্তিগত জীবনে যেমন নারীশিক্ষা (স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া এবং কন্যা স্বর্ণলতাকে শিক্ষানুরাগী করেছিলেন) এবং সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁর নাটকের নায়িকা নবমীও সেই একই দাবিতে সোচ্চার। নবমীর দুই বান্ধবী জয়ন্তী (বিবাহিতা এবং নবমীকে পড়াশোনায় আগ্রহান্বিত করতে তৎপর) এবং উর্বশী (বাল্য বিধবা এবং স্পষ্টবক্তা)-র মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে সমকালীন অসমিয়া সমাজের চিত্র ফুটে ওঠে। কলাকৌশল ও আঙ্গিকের দিক থেকে নাটকটিতে পাশ্চাত্য রীতির প্রথম প্রয়োগ এবং বিয়োগান্ত পরিণতি লক্ষ করা যায়। জয়ন্তীর দূর সম্পর্কের ঠাকুরপো ছিল রামচন্দ্র এবং কিছুটা জয়ন্তীর প্রভাবেই নবমী ও রামচন্দ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, প্রেম এবং নবমীর সন্তানসম্ভবা হওয়ার প্রসঙ্গটি আসে। *রামনবমী* নাটকের শেষ দৃশ্যে যদিও উভয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ, কিন্তু গোঁড়া সমাজের মহাজনরা নামিয়ে আনে শিবকান্ত (নবমীর বাবা) ও যুলেশ্বরী (নবমীর মা)-র উপর অকথ্য অত্যাচার এবং শেষপর্যন্ত এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে নায়ক-নায়িকাকে আত্মহত্যার আশ্রয় নিতে হয়। *রামনবমী* নাটকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রও চিত্রিত হয়েছে। যদিও ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাস হয়েছিল, তথাপি আসামের চিরায়ত সমাজজীবনে এই আইনের প্রয়োগ যে কত নগণ্য ও কঠিন ছিল, এই নাটকটিই তার সাক্ষ্য দেয়। আসলে, **গুণাভিরাম বরুয়ার *রামনবমী* কে আধুনিক অসমিয়া নাট্য সাহিত্যের পথপ্রদর্শক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।**

সংস্কারমুক্ত এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন গুণাভিরাম অসমিয়া সমাজে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। তিনি অসবর্ণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহের প্রশ্নে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তাঁর পরিবারের কয়েকজন বাংলার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের

সঙ্গে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। অসমিয়া-বাঙালি মৈত্রী এবং একটি অখণ্ড সমাজ ও জাতীয় সংহতির প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও জন্মভূমি আসাম ও মাতৃভাষা অসমিয়ার প্রতি ছিল গুণাভিরামের গভীর মমত্ববোধ। *জোনাকি* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'সৌমার ভ্রমণ', 'অলিখিত বুরঞ্জি', 'অসমত মানর শেষ ছোয়া' ইত্যাদি সহজ, সরল ও আধুনিক অসমিয়া ভাষায় লিখিত প্রবন্ধগুলি ছিল তারই নিদর্শন। ব্রিটিশ শাসকরা আসামে ইচ্ছাকৃতভাবেই ১৮৩৭ সালে অসমিয়ার পরিবর্তে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করেছিলেন। এর পিছনে যে উদ্দেশ্য ছিল দুষ্ট ভেদবুদ্ধি এটি বুঝতে অসুবিধে হয় না। পৃথিবীর সকলের কাছেই নিজের মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, হেমচন্দ্র বরুয়া এবং গুণাভিরাম বরুয়া-র মতো প্রতিভাধর ব্যক্তিদের তীক্ষ্ণধার লেখনী ও ক্রমাগত প্রতিবাদের জন্যই অবশেষে ১৮৭৩ সালে আসামের বিদ্যালয়ে বাংলার পরিবর্তে অসমিয়া ভাষার পুনঃপ্রচলন সম্ভবপর হয়েছিল। ১৮৮০ সালে গুণাভিরাম লিখিত *আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনর জীবনচরিত* প্রকাশিত হয়। অসমিয়া সাহিত্যে এটিই প্রথম আধুনিক জীবনীগ্রন্থ রূপে গণ্য হয়। শুধু ঢেকিয়াল ফুকনের জীবনের বিভিন্ন কাহিনিই নয়, সমকালীন সমাজের ঘটনাপ্রবাহ ও নিপুণ বিবরণ গ্রন্থটিকে আদর্শ জীবনীগ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে ইতিহাস, নাটক, জীবনীমূলক আখ্যান, কবিতাসহ জটিল সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন সাহিত্যের বহু বিস্তৃত অঙ্গনে তাঁর নিরলস যাতায়াত ছিল কত সহজসাধ্য। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গুণাভিরাম রচিত *অসম বুরঞ্জি* (আসামের ইতিহাস) ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। এটি ইতিহাসের একটি আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত।

১৮৮৫-তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে অবিভক্ত বঙ্গদেশে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক ধারা প্রচারকল্পে যেমন অসংখ্য সভা সমিতি ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছিল ; গুণাভিরাম সেই একই ধারা আসামের ক্ষেত্রেও অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। আনন্দরাম ও গুণাভিরামের যৌথ উদ্যোগে ১৮৫৭ সালে নওগাঁও-তে 'জ্ঞান-প্রদায়িনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতি রবিবারে এর সভা হত এবং ৫০ থেকে ৬০ সদস্যবিশিষ্ট এই সংগঠনের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়মিত এতে অংশ নিতেন। ১৮৮৫ থেকে গুণাভিরাম সম্পাদিত *আসাম বন্ধু* নামে মাসিক পত্রিকা নওগাঁও থেকে প্রকাশিত হতে থাকে ; যদিও এটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে সাহিত্যিক রুচি সৃষ্টিতে এবং নতুন লেখক গোষ্ঠী তৈরির ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল অনবদ্য।

আসাম বন্ধু পত্রিকাতেই গুণাভিরামের 'আসাম ঃ অতীত ও বর্তমান' সংক্রান্ত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বিখ্যাত অসমিয়া পত্রিকা *অরুণোদয়, জোনাকি, আসাম বন্ধু*-র পাতায় পাতায় বরুয়ার প্রাণবন্ত শক্তিশালী গদ্যরীতি এবং সমাজকে জাগ্রত করার মহৎ প্রচেষ্টার সাক্ষ্য আছে। *বিজুলি* পত্রিকায় ছদ্মনামে লেখা তাঁর কিছু কবিতাও ছিল একইরকমভাবে উদ্দীপক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহাপ্রয়াণে গুণাভিরামের 'শোকগাথা' শ্রদ্ধাঞ্জলি *বিজুলি* পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। জীবনকে কলুষমুক্ত করার তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয় ১৮৯১ সালে আফিম-সংক্রান্ত 'রয়েল কমিশন'-এ সাক্ষ্যদানে। যেহেতু আফিম-এ নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা আসামে 'কানিয়া' বলে নিন্দিত হত ; এরই জন্য গুণাভিরাম (বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন ভিন্ন) আফিম-এর উপর নিষেধাজ্ঞার দাবি তুলেছিলেন। তাঁর বক্তব্যে মুগ্ধ হয়ে হরিবিলাস আগরওয়ালার মতো আফিম ব্যবসাদারও গুণাভিরামের সাথে সহমত ব্যক্ত করেছিলেন। জীবনকে হাসি, আনন্দে ভরপুর রাখার উদ্দেশ্যে হাস্যরস ও কৌতুকে পূর্ণ 'কঠিন শব্দের রহস্য ব্যাখ্যা'র মতো প্রবন্ধ ১৮৯৪-এ তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এইভাবে অসমিয়া জাতীয়তাবাদসহ নতুন সমাজ ব্যবস্থার অভ্যুদয়ের ভিত্তি তিনিই স্থাপন করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে আসামে আলোকবর্তিকাধারীর মধ্যে গুণাভিরাম বরুয়া সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। দীর্ঘকাল সরকারি কাজে নিযুক্ত থাকার পর ১৮৯০ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে আমৃত্যু বসবাস করেছিলেন।

১৭.১৯ গৈডিনলিউ (রানি) (১৯১৫-১৯৯৩) (Gaidinliu : 1915-1993)

গৈডিনলিউ ('গুইডেলা' নামেও পরিচিত) যদিও নাগা নেত্রী এবং ১৯১৫ সালের ২৬ জানুয়ারি মণিপুরের তামেংলং জেলার লোংকাও (নুনগাও) গ্রামে তাঁর জন্ম, তথাপি ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি এক উজ্জ্বল নাম এবং তৎকালীন অবিভক্ত আসামের সাথে তাঁর নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শৈশব থেকে গৈডিনলিউর স্বাধীনচেতা মানসিকতা, দৃঢ়স্বভাব ও পুরুষসুলভ আচরণে বাবা Lothonang Pamei এবং মা Kachaklenliu বিস্মিত হতেন এবং লক্ষ করতেন যে, তাঁদের পঞ্চম কন্যাটি (ছয় কন্যা ও এক পুত্রের মধ্যে) সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। মণিপুরের পশ্চিমাঞ্চলের পার্বত্য এলাকা সেই সময় ছিল ব্রিটিশ অধীনস্থ এবং স্থানীয় দুর্গত উপজাতিভুক্ত মানুষের অবস্থা ছিল শোচনীয়ভাবে করুণ। খ্রিস্টধর্ম প্রচার ছাড়া

শাসক ব্রিটিশদের দ্বিতীয় কোনো কর্মসূচি ছিল না। স্থানীয় মানুষের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও স্বাধীনতাকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার ঐ বিদেশি চক্রান্তের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদের ভূমিকা নিয়েছিলেন গৈডিনলিউর দূর সম্পর্কের আত্মীয় Haipou Jadonang/হাইপোউ যাদোনাঙ যিনি পুইলন (কামবিরোন) পাহাড়ি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গৈডিনলিউর যখন মাত্র ১৩ বছর বয়স তখন থেকেই তিনি ছিলেন যাদোনাঙ-এর অনুগামী। আগ্রাসী খ্রিস্টান মিশনারিদের হাত থেকে নিজেদের আচরিত ধর্ম ও বিশ্বাসকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই যাদোনাঙ Heraka/ হেরাকা (পবিত্র) ধর্মমতের মাধ্যমে অসংখ্য গোষ্ঠীতে বিভক্ত নাগাদের মধ্যে জেমি, রোংমি ও লিয়াংমি শাখার নাগাদের একত্রিত করেছিলেন (যেটি পরবর্তী সময়ে 'জেলিয়াঙগ্রঙ' নামে পরিচিত)। ঐ শাখাভুক্ত নাগাদের কাছে যাদোনাঙ প্রায় ঈশ্বরের অবতার পর্যায়ে চলে গিয়েছিলেন। হেরাকা-তে বিশ্বাসী জেলিয়াঙগ্রঙ নাগারা 'খামপই' নামেও পরিচিত। **যাদোনাঙ-এর হেরাকা-আন্দোলন ব্রিটিশ শক্তির রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, কারণ এটি ছিল একাধারে খ্রিস্টধর্ম ও অন্যদিকে ব্রিটিশ শক্তির আগ্রাসী অভিযানের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধ আন্দোলন**। ১৯২৭ সালে এটি শুরু হয়েছিল এবং **ইতিহাসে এটি 'নাগা-রাজ আন্দোলন' নামেও পরিচিত**। কাছাড় ও আসামের অন্যান্য স্থান থেকে শতাধিক বন্দুক সংগ্রহ করে ব্রিটিশের চাপানো অন্যায় কর ব্যবস্থা, জুলুমবাজি, বিনা পারিশ্রমিকে জবরদস্তি শ্রম ইত্যাদি বয়কটের আওয়াজ তোলা হয়। তথাকথিত সভ্য ব্রিটিশ শাসকদের চোখে, হেরাকা সহ এই মুক্তি আন্দোলন ছিল 'বন্য, পাশবিক, নির্মম' কারণ, নরমুণ্ড রক্তপাত ইত্যাদি এর সাথে যুক্ত ছিল। এই ধর্মীয় সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের আগুন মণিপুরের পশ্চিমাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, নাগা পাহাড়সহ উত্তর কাছাড় পার্বত্য এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সমরনায়করা যাদোনাঙ-কে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয় এবং ইম্ফল জেলে ১৯৩১ সালের ২৯ আগস্ট যাদোনাঙ-এর ফাঁসি হয়। গৈডিনলিউর বয়স তখন মাত্র ১৭-এর কাছাকাছি। যাদোনাঙ-এর অসমাপ্ত কাজকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয় ; কারণ জেলিয়াঙগ্রঙ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের চোখে ঐ রণচণ্ডী নাগা-কন্যাটি ছিলেন দৈবশক্তির অধিকারিণী দেবী।

গৈডিনলিউ-র নেতৃত্বে নাগাদের একাংশের মধ্যে তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে অতিষ্ঠ হয়ে জি. পি. মিলস্, ক্যাপটেন ম্যাকডোনাল্ড, হ্যারি ব্লাহ-র মতো বাঘা-বাঘা ব্রিটিশ সামরিক অফিসাররা একটার পর একটা নাগা গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিলেন। আত্মগোপনে থাকা গৈডিনলিউ-কে জীবিত বা মৃত

অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারলে বড়ো অঙ্কের পুরস্কারের ঘোষণাও করা হয়েছিল। কিন্তু মণিপুর সহ আসামের নাগা পাহাড়, নর্থ কাছাড় হিলস ও কাছাড়ে তাঁর অনুগামীরা তাঁকে নয়নের মণির মতো রক্ষা করায় ব্রিটিশ গোয়েন্দারা সেই সময় ব্যর্থ হয়েছিল। যাইহোক, শেষপর্যন্ত গোয়েন্দা রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বর্তমান নাগাল্যান্ডের পইলয়া (পুলোমি) গ্রামের ঘন-জঙ্গলে আচ্ছাদিত নির্মীয়মান এক কাঠের দুর্গ অতর্কিতে আক্রমণ করে ক্যাপ্টেন ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২ সালের ১৭ অক্টোবর জেলিয়াঙগ্রঙ বিদ্রোহের নেত্রীকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হলেন। শোনা যায়, ঐ সময় ম্যাকডোনাল্ডের হাত গৈডিনলিউ-র কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। এরপর গৈডিনলিউ-কে হাত-কড়া সহ চেন্ দিয়ে বেঁধে টেনে টেনে গ্রামের পর গ্রাম পরিক্রমা এবং কোহিমার রাজপথে প্রকাশ্য নির্যাতনের দৃশ্য আজও নাগাদের একাংশ ভুলতে পারেনি। গৈডিনলিউ-র শত শত অনুগামীর উপর পাশবিক অত্যাচার ও নির্মম মৃত্যু পরোয়ানার মাধ্যমে এই বিদ্রোহকে সেদিন দমন করা হয়েছিল। মহিলা বলে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে গৈডিনলিউ-র ভাগ্যে জুটেছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান। ব্রিটিশের চোখে এই "ভয়ংকর মেয়েটিকে" দীর্ঘদিন একটি কারাগারে রাখা নিরাপদ নয়, এই বিবেচনায় গুয়াহাটি, তুরা, আইজল, শিলং ইত্যাদি বিভিন্ন কারাগারে মাঝে মাঝেই স্থানান্তরিত করা হত।

১৯৩৭ সালে আসাম সফরে গিয়ে জওহরলাল নেহরু এই বীরাঙ্গনার কাহিনি শুনে মুগ্ধ হন এবং রাজধানী শিলং-এর কারাগারে এই অগ্নিকন্যার সাথে সাক্ষাৎ করেন। সমকালীন *হিন্দুস্থান টাইমস* পত্রিকায় **নেহরুর বিবৃতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় যেখানে তিনি পাহাড়ি-কন্যা গৈডিনলিউ-কে 'রানি' আখ্যায় ভূষিত করেন। সেদিন থেকে তিনি 'রানি গৈডিনলিউ' নামেই সকলের কাছে পরিচিতা।** গৈডিনলিউ মুক্তির বিষয়টি সহানুভূতির সাথে ব্রিটিশ সরকারের বিবেচনার জন্য তিনি লন্ডনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তৎকালীন মহিলা এম. পি. Lady Aston-কে অনুরোধ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে Lady Aston উত্তর দেন যে, তাঁর অনুরোধ ব্রিটিশ ভারতের 'সেক্রেটারি অব স্টেটস্' নাকচ করে দিয়েছেন কারণ প্রশাসনের মতে বিদ্রোহের আগুন এখনও পুরোপুরি নেভেনি এবং গৈডিনলিউ কে মুক্তি দিলে আসাম ও মণিপুরের পাহাড় অঞ্চলে আবার দাবানল সৃষ্টি হতে পারে। নেহরুর দৃষ্টিতে রানি গৈডিনলিউ ছিলেন ফ্রান্সের জোয়ান-অব-আর্ক অথবা ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের নায়িকা ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর সমকক্ষ।

দীর্ঘ ১৫ বছর কারাবন্দি থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার পর গৈডিনলিউ মুক্তিলাভ করেন, যদিও নিরাপত্তা ইত্যাদির কারণে তাঁর

নিজের জন্মস্থান মণিপুরের তামেংলং জেলার লোংকাও (নুনগাও) গ্রামে ১৯৫২ সালের আগে যাওয়ার অনুমতি তিনি পাননি। আসলে ঐ সময় তাঁর জন্মস্থানে গেলে তিনি হয়তো স্থির থাকতে পারতেন না ; কারণ হেরোকা-আন্দোলনে তাঁর অনুগামী জেলিয়াঙগ্রঙ নাগারা ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত 'নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল' (এন. এন. সি)-এর ব্যাপটিস্ট খ্রিস্টানদের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়ে ঐ সময় চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন। এক কথায়, বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাগাদের মধ্যে স্বাধীন-ভারতে গৃহযুদ্ধ চলছিল। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে গৈডিনলিউ দীর্ঘ ১৩ বছর সক্রিয় রাজনীতি থেকে সাময়িক অবসর নিয়ে নাগা পাহাড়ের মোকক্‌চুঙ্গ এলাকায় ছিলেন। কিন্তু ১৯৬০ সালে আবার আগুন জ্বলে উঠল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নিলেও, বিদেশি শক্তির মদতপুষ্ট এন. এন. সি.-র মোকাবিলার উদ্দেশ্যে তাঁর অনুগামীরা রানি-কে গোপনস্থানে নিয়ে যায়। বরাক নদীর পাশে মগুলং (Magulong) গুহায় দীর্ঘ তিন বছর আত্মগোপনের সময় ৪০০ অনুগামীর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিয়ে রানি তাঁর 'খামপই' বাহিনী তৈরি করেন। দীর্ঘ এই ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামে প্রতিপক্ষের আঘাতে রানির 'খামপই' বাহিনীর অনেকেই নিহত হয়েছিল। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে নাগাদের উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে সাময়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রানি গৈডিনলিউ ১৯৬৬ সালে প্রকাশ্যে আসেন।

কি ছিল গৈডিনলিউ-র দাবি ?—তিনি চেয়েছিলেন তাঁদের শাশ্বত ধর্ম, প্রথাগত সংস্কৃতি ও গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলির রক্ষা, ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভারতের অভ্যন্তরে থেকেই অন্যদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে নাগাদের স্বার্থ আদায় এবং আসাম, নাগা পাহাড় ও মণিপুরের যে সব এলাকায় জেলিয়াঙগ্রঙদের অধিবাস সেগুলি একত্রিত করে একটি ইউনিট হিসেবে গঠন করা, যাতে নাগাভূমির অভ্যন্তরে থেকেই ঐসব এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচি দ্রুত সম্প্রসারিত করা যায়। মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক (ইতিহাসের) Gangmumei Kamei (পরবর্তী সময়ে মন্ত্রী) ছিলেন রানিমার মুখপাত্র এবং সাংবাদিক সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সামনে উপস্থিত হয়ে আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করতেন। অন্যদিকে ফিজো (Adinho Phizo)-র নেতৃত্বে গঠিত এন. এন. সি. সহ মিশনারিদের একাংশের বক্তব্য ছিল, জেলিয়াঙগ্রঙ একটা 'মিথ' ("Zeliangrong region is a myth") এবং "Nagaland for Christ" ধ্বনি দিয়ে অ-খ্রিস্টীয়দের (অর্থাৎ হেরোকা ধর্মাবলম্বীদের) দাবি পুরোপুরি নস্যাৎ করার জন্য খড়্গহস্ত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত নাগারা

শুধু একটিমাত্র উপজাতি নয়, নানা শাখা উপশাখায় বিভক্ত—যেমন, আও, সেমা, আঙ্গামি, লোথা, রেংমা, জেলিয়ান, কোনিয়াক ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব শাখার উপজাতিদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, ভাষাও ভিন্ন এবং সৌভ্রাতৃসুলভ পারস্পরিক সম্পর্কও অতীতে ছিল না বললেই চলে ; যদিও সকলেই আজ 'নাগা' নামে পরিচিত। রানি গৈডিনলিউ এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, বিশ্বজুড়ে নাগাদের সম্পর্কে যে অপপ্রচার আছে (১) নাগারা সকলেই খ্রিস্টান, (২) নাগারা ভারত-বিরোধী ও হিন্দু-বিরোধী এবং (৩) নাগারা আদিম বর্বর ও অসভ্য—এটি মোটেই নাগাদের সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন নয় ; কারণ প্রত্যেকটি অভিযোগই বিতর্কিত। শুধুমাত্র এন. এন. সি.-র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দেখে নাগা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ভুল ও মিথ্যা অভিযোগ আনা ঠিক নয়। নেহরুর মতো ব্যক্তিত্ব এটি অবগত ছিলেন বলেই অগ্নিকন্যা গৈডিনলিউকে 'পাহাড়ের রানি' বলে সম্বোধন করেছিলেন।

গৈডিনলিউ-র জেলিয়াঙগ্রঙ দাবি আজও হয়তো অধরা রয়ে গেছে, কিন্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংগ্রামী নেত্রী হিসেবে তিনি মর্যাদা পেয়েছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসেবে তিনি ১৯৭২ সালে 'তাম্রপত্র', ১৯৮১-তে 'পদ্মভূষণ', ১৯৮৩-তে 'বিবেকানন্দ সেবা পুরস্কার' ইত্যাদি নানা সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। জীবনের শেষদিকে তিনি গান্ধিবাদী পথ অনুসরণের মাধ্যমে নাগা সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধিসহ জাতীয় নেতৃত্বের অনেকের সাথেই তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। নীরবে অনেক অপবাদ ও নির্যাতন সহ্য করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। ১৯৮৯ সালে প্রায় ৭৫ বছর বয়সে তিনি জেলিয়াঙগ্রঙ-এর দাবিতে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে দিল্লিতে ধর্নায় বসেছিলেন। ১৯৯১ সালে তাঁর প্রিয় জন্মস্থান লোংকাও (নুনগাও) গ্রামে যাবার অনুমতি পান এবং সেখানেই ১৯৯৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রায় ৭৯ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। ঐ বছরেই মণিপুরে তাঁকে মরণোত্তর বীরসা-মুন্ডা পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর ছবি সহ ডাক-টিকিট প্রকাশিত হয়।

১৭.২০ গোপীনাথ বরদোলই (১৮৯০-১৯৫০) (Gopinath Bardoloi : 1890-1950)

সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন আসামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও আধুনিক আসামের অন্যতম রূপকার **'লোকপ্রিয়'** গোপীনাথ বরদোলই ১৮৯০ সালের ১০ জুন আসামের নওগাঁও জেলার অন্তর্গত রোহা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা বুধেশ্বর বরদোলই ছিলেন সরকারি চিকিৎসক। গোপীনাথের ১২ বছর বয়সে তাঁর মাতা প্রাণেশ্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠা ভগিনী শশীকলা দেবী ছিলেন গোপীনাথের কাছে মাতৃসম। ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ শ্রেণিভুক্ত শিক্ষিত মার্জিত রুচিসম্পন্ন বরদোলই পরিবারের আদি নিবাস এক সময়ে ছিল উত্তরপ্রদেশে ; কিন্তু অবশেষে তাঁরা আসামের মাটির সাথে মিশে যান এবং স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হন। আসামের বিভিন্ন কর্মস্থলে বুধেশ্বর-এর বদলির জন্য গোপীনাথ রোহা, মঙ্গলদৈ, বরপেটা, গুয়াহাটি প্রভৃতি স্থানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। গুয়াহাটির 'কটন কলেজিয়েট স্কুল' থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং 'কটন কলেজ' থেকে আই. এ. পাস করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য গোপীনাথ কলকাতায় আসেন। ১৯১১ সালে ইতিহাসে অনার্স সহ 'স্কটিশ চার্চ কলেজ' থেকে বি. এ. পাশ করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম. এ. এবং বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রবীন্দ্র-অনুরাগী গোপীনাথ ছাত্রাবস্থায় দক্ষ ক্রিকেটার হিসেবেও সুনাম অর্জন করেন।

কলকাতায় ছাত্রজীবন শেষ করে আসামে প্রত্যাবর্তনের পর গোপীনাথ প্রথমে ১৯১৫ সালে গুয়াহাটির শতাব্দী প্রাচীন 'সোনারাম হাইস্কুল'-এ প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে তাঁর পিতার মৃত্যু হয় ; ফলে সংসারের দায়-দায়িত্বও গোপীনাথকে নিতে হয়। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা তাঁকে পরবর্তী সময়ে আসামের অন্যতম শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিতে পরিণত করে। ঐ স্কুলের গভর্নিং বডির সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার তরুণরাম ফুকন (১৭.৩১ দ্রষ্টব্য) এবং এরই সূত্র ধরে উভয়ের মধ্যে সখ্যতা গড়ে ওঠে। গোপীনাথের জীবনে তরুণরামের প্রভাব ছিল ব্যাপক। তরুণরামের পরামর্শেই অবশেষে গোপীনাথ ১৯১৭ সালে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে আইন-ব্যবসা শুরু করেন। ওকালতিতে তেমন উল্লেখযোগ্য খ্যাতি বা প্রতিপত্তি অর্জন না করলেও যৌবন থেকে বিভিন্ন জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করে প্রভূত সুনামের অধিকারী হন। সেই সময় বিভিন্ন আন্দোলনে আইনজ্ঞরা তুলনামূলকভাবে সর্বাগ্রে অংশ নিতেন এবং সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নিতেন। **আসামে ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে যে তিন আইনজ্ঞের নাম 'ত্রয়ী' হিসেবে চিহ্নিত তাঁরা হলেন গোপীনাথ বরদোলই ('লোকপ্রিয়'), তরুণরাম ফুকন ('দেশভক্ত') এবং নবীনচন্দ্র বরদোলই ('কর্মবীর')।** এঁরা তিনজনেই ছিলেন গান্ধিবাদী এবং জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে ওকালতি ব্যবসায় ইতি টেনে সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনের সময় আসামে এসে গান্ধিজি অসমিয়া উকিলদের একটা বড়ো অংশ যেভাবে

আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন সেটি দেখে মুগ্ধ হন এবং *ইয়ং-ইন্ডিয়া* পত্রিকায় আইনজীবীদের এই অংশগ্রহণ শতাংশের হিসাবে ভারতবর্ষের বৃহত্তম বলে উল্লেখ করেন। গান্ধিজির ভাষায় : *I must not omit to mention that out of nearly seventy eight Assamese pleaders, fifteen have suspended practice, perhaps the highest percentage throughout India.* গোপীনাথ ছিলেন এই ব্যবহারজীবীদের অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে, অসহযোগ আন্দোলনের আগে আসামে জাতীয় কংগ্রেসের তেমন কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ১৯২০-এর দশকের আগে আঞ্চলিক দল 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' ছিল একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯২০-তে কলকাতায় লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গোপীনাথ বরদোলই যোগদান করেন এবং এরপরই আসামে কংগ্রেসের প্রভাব স্থাপিত হয়। ১৯২১-এ 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'—এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং এর সদস্যরা 'আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি'তে (এ. পি. সি. সি.) সমাবিষ্ট হন। এটি সম্ভবপর হয়েছিল গোপীনাথ বরদোলই-এর মতো ধীসম্পন্ন নেতাদের বিচক্ষণতার জন্যই।

১৯২৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের গুয়াহাটি বা পাণ্ডু অধিবেশনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন তরুণরাম ফুকন, সম্পাদক ছিলেন নবীনচন্দ্র বরদোলই এবং যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন গোপীনাথ বরদোলই। এই 'ত্রয়ী'র আন্তরিক উদ্যোগেই আসামে জাতীয় কংগ্রেসের শাখা-প্রশাখা চারিদিকে বিস্তৃত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের এই পাণ্ডু অধিবেশনে জাতীয় নেতাদের মধ্যে অনেকেই অংশ নিয়েছিলেন এবং সকলেই আসামের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। গঠনমূলক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে গোপীনাথ বরদোলই একদিকে যেমন ১৯২৯ সালের কুখ্যাত 'কানিংহাম সার্কুলার'-এর বিরুদ্ধে (যে আদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল) প্রতিবাদ সংগঠিত করে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন ; অন্যদিকে তাঁরই উদ্যোগে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। প্রধানত তাঁরই উদ্দীপনায় গুয়াহাটিতে 'কামরূপ অ্যাকাডেমি', 'বি. বরুয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলে শিক্ষানুরাগী গোপীনাথের ঐকান্তিক তৎপরতার জন্যই গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, এগ্রিকালচার কলেজ, ভেটিরিনারি কলেজ, সরকারি যাদুঘর এবং অন্যান্য কারিগরি প্রতিষ্ঠান ও গৌহাটি হাইকোর্ট ইত্যাদির অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠা

আসামে সম্ভবপর হয়েছিল। এরই জন্য **গোপীনাথ বরদোলই-কে আধুনিক আসামের অন্যতম রূপকার হিসেবে চিত্রিত করা হয়।**

১৯৩৪ সালে গোপীনাথ গান্ধিজির নির্দেশে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন এবং কারাবরণ করেন। ১৯৩৬-এ কংগ্রেস প্রার্থীরূপে গোপীনাথ (১৯৩৫-এর আইন অনুযায়ী গঠিত) বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নেন ও জয়ী হন। আসামে সেই সময় মুসলিম লিগ ও চা-বাগানের বিদেশি মালিকদের একাধিপত্যে গঠিত শাদুল্লাহ মন্ত্রীসভা অধিষ্ঠিত ছিল। ফলে কংগ্রেস এই প্রাদেশিক নির্বাচনে এক-তৃতীয়াংশ আসন দখল করে বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু গোপীনাথের রাজনৈতিক কূট-কৌশলের জন্য ১৯৩৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শাদুল্লাহ মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং আসামে প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের সুযোগ উপস্থিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু আসামের পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্তের জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে আসামে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব লক্ষ করে আজাদ আসামে কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা গঠনের সম্ভাবনা বাতিল করে দেন ; যদিও গোপীনাথ সমকালীন 'ট্রাইব্যাল লিগ'-এর সমর্থনের কথা আজাদকে জানিয়েছিলেন। এর ফলে, এ. পি. সি. সি.-র সভাপতি বিষ্ণুরাম মেধি (১৭.৪৮ দ্রষ্টব্য), বিধানসভায় কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বরদোলই সহ অনেকে হতোদ্যম হয়ে অবশেষে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। সুভাষচন্দ্র আসামের তৎকালীন রাজধানী শিলং-এ ছুটে আসেন এবং আসামে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন যে জরুরি এটি উপলব্ধি করেন। যদিও সুরমা উপত্যকার কংগ্রেসি সদস্যরা প্রথমদিকে গোপীনাথের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভা গঠনের বিরোধী ছিলেন, তথাপি বসুর হস্তক্ষেপে এটির মীমাংসা হয়। এরপর সুভাষ আসামের ব্রিটিশ গভর্নর রবার্ট নীল রীড্-এর সাথে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে বরদোলই এর নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার শপথ অনুষ্ঠানের দাবি জানান। চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও রীড্ অবশেষে রাজি হন এবং ১৯৩৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর আসামের প্রধানমন্ত্রী (**সেই সময় 'মুখ্যমন্ত্রী'-কে 'প্রধানমন্ত্রী' বলা হত**) হিসেবে গোপীনাথ বরদোলইকে শপথ বাক্য পাঠ করান। আসাম প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আজাদের সাথে বসুর মতপার্থক্য তুঙ্গে ওঠে, অবশ্য গান্ধিজির মধ্যস্থতায় শেষপর্যন্ত এটির নিষ্পত্তি হয় ; কারণ এই একটি প্রশ্নে গান্ধিজি অবশেষে সুভাষের সাথে সহমত ব্যক্ত করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র যে আসামে কত জনপ্রিয় ছিলেন সেটির চাক্ষুষ প্রমাণ মেলে ১৯৩৯ সালের ৬ অক্টোবর। ঐ দিন যখন দ্বিতীয়বার তিনি পাণ্ডুঘাটে অবতরণ করেন পাণ্ডু

থেকে পানবাজার সেদিন উৎসবের সাজে সেজেছিল। যাইহোক, সুভাষের সমর্থনপুষ্ট হয়ে এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে বরদোলই মন্ত্রীসভা গঠিত হলেও ১৩ মাসের বেশি টেকেনি। ১৯৩৯ সালে ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজার সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব তথা জাতীয় পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী আসামের বরদোলই মন্ত্রীসভা ১৯৩৯-এর ১৭ নভেম্বর পদত্যাগপত্র দাখিল করতে বাধ্য হয়। এই সুযোগে প্রায় ফাঁকা মাঠে আবার মুসলিম লিগ নেতৃত্বাধীন শাদুল্লাহ মন্ত্রীসভা ফিরে আসে এবং একটানা দীর্ঘ সাত বছর ক্ষমতা ভোগ করে। এই সময়ে আসামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) থেকে আগত শত শত প্রবাসী ভারতীয় শরণার্থীর জন্য ডিমাপুরে শিবির স্থাপন করে গোপীনাথ তাদের সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সততা, ত্যাগ, মানবিকতা, আন্তরিকতা তথা কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণকে তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বলে মনে করতেন বলেই তাঁর জীবনাদর্শের সাথে জনমানসের কোনো সংঘাত তেমন ঘটেনি ; বরং একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ-বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য জীবনে তিনবার কারাবরণ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সময় অন্যদের সাথে গোপীনাথও কারারুদ্ধ হন। বন্দি অবস্থায় জোড়হাট জেলে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাসভায় গোপীনাথ ভারতের ঐক্য, আসামের স্বায়ত্তশাসন ও উন্নয়নের রূপরেখা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। নিজের জীবন সম্বন্ধে গোপীনাথ মন্তব্য করতেন, "I would describe myself as one who had tried to do what he considered to be his duty in life." তিনি যে তাঁর স্বপ্নমতো সবকিছু করতে পেরেছিলেন তা তিনি দাবি করেননি ; তবে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন এটাই তাঁর সান্ত্বনা। কারাবাসকালে ধর্মপ্রাণ গোপীনাথ সহজ সরল অসমিয়া কিশোরদের উপযোগী কয়েকটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে 'শ্রীরামচন্দ্র', 'বুদ্ধদেব', 'যিশুখ্রিস্ট', 'হজরত মহম্মদ' এবং 'গান্ধিজি' অন্যতম। গান্ধিজি লিখিত 'গীতা'-র টীকা অনাসক্তি যোগ-এর অসমিয়া অনুবাদও তিনি করেছিলেন। গোপীনাথের কাছে মহাত্মা গান্ধি ছিলেন "political as well as spiritual *Guru*."

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর ১৯৪৬-এ ক্ষমতাশালী শাদুল্লাহ-র মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসামে প্রথম সম্পূর্ণ কংগ্রেসি

মন্ত্রীসভা গঠন গোপীনাথ বরদোলই-এর এক অসাধারণ কৃতিত্ব। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৫০-এর ৫ আগস্ট মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারত-বিরোধী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল-এর বিদায় এবং 'লেবার পার্টি'র নেতৃত্বাধীন ক্লিমেন্ট এ্যাটলি সরকার ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতের স্বাধীনতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু ভারত থেকে বিদায়ের আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি তৎকালীন ভারতের জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে ১৯৪৬-এ 'ক্যাবিনেট মিশন' অবিভক্ত ভারতে পাঠিয়েছিলেন (যার সদস্য ছিলেন লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্, এ. ভি. আলেকজান্ডার এবং তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল)। এই 'মিশন' ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ-এর সাথে আলোচনার পর ভারতের প্রদেশগুলিকে তিনটি 'গ্রুপ' বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত করার যে প্রস্তাব দেয় তাতে উভয় রাজনৈতিক দলই প্রথমদিকে মোটামুটি সম্মত হয়েছিল। 'এ' বা 'ক' গ্রুপে থাকবে ৬টি হিন্দু-প্রধান প্রদেশ যেমন মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা, সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং আগ্রা ও অযোধ্যাসহ ইউনাইটেড প্রভিন্স (বা যুক্তপ্রদেশ)। গ্রুপ 'বি' বা 'খ'-এ থাকবে পাঞ্জাব, সিন্ধ, বেলুচিস্তান এবং নর্থ-ওয়েস্টার্ন ফন্ট্রিয়ার প্রভিন্স (বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ)। গ্রুপ 'সি' বা 'গ' -এ থাকবে বঙ্গদেশ ও আসাম। এইভাবে ঐক্যবদ্ধ ভারতকে 'গ্রুপ' হিসাবে বিভাজনের মধ্যে গোপীনাথ বরদোলই এক ভয়ংকর বিপদের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই 'গ্রুপ-বিভাজন' মেনে নিলেও (যার মধ্যে আগামীদিনের 'পাকিস্তান' তৈরির ছক ছিল) ; গোপীনাথ বরদোলই-এর নেতৃত্বে এ. পি. সি. সি. এর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৪৬ সালের ১ এপ্রিল গোপীনাথ 'ক্যাবিনেট মিশন'-এর সামনে উপস্থিত হয়ে কোনোমতেই আসামকে মুসলিম-প্রধান প্রদেশ হিসেবে গণ্য করা চলবে না এবং "গ' শ্রেণিভুক্ত করা যাবে না, সেটি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন। বরদোলই-এর নেতৃত্বে আসাম বিধানসভা ১৯৪৬ সালের ১৬ জুলাই একই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ফলে, স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে আসামে এক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে 'ক্যাবিনেট মিশন'-এর দৌত্য ব্যর্থ হয়। পরবর্তী সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গোপীনাথ বরদোলই-এর সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। এইভাবে আসামকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার সমস্ত অপপ্রয়াস গোপীনাথ বরদোলই ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন এবং কিছু ঐতিহাসিকের মতে, এটাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান ও সাফল্য এবং এরই জন্য আসামের অগণিত মানুষের কাছে গোপীনাথ একটি অত্যন্ত প্রিয় নাম।

দেশভাগের প্রস্তুতি পর্বে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ৩ জুন আসামের শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট গ্রহণের কথা ঘোষিত হয়। ১৯৪৭-এর ৬ জুলাই অনুষ্ঠিত গণভোটের রায় অনুযায়ী শ্রীহট্ট পূর্ব-পরিকল্পিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে বাংলা-ভাষী মানুষের মনে নানা প্রশ্ন উদিত হয়। এই গণভোট ছিল খুবই বিতর্কিত। ইতিহাসবিদ সুজিত চৌধুরি ভাইসরয় ওয়াভেল-এর 'জার্নাল' উদ্ধৃত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন কীভাবে গোপীনাথ বরদোলই-এর নেতৃত্বাধীন সমকালীন আসাম সরকার ও এ. পি. সি. সি.-র জন্যই শ্রীহট্টকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া অত সহজ হয়েছিল। ওয়াভেল ১৯৪৬-এর ১ এপ্রিলে লিখেছিলেন : "Assam would be quite prepared to hand over Sylhet to Eastern Bengal." আসলে এই দলিলটি ঐতিহাসিক অমলেন্দু গুহ তাঁর সুবিখ্যাত *Planter Raj to Swaraj* গ্রন্থে প্রথম উল্লেখ করেছিলেন। বাংলা-ভাষী শ্রীহট্ট আসাম থেকে বিসর্জন দিয়ে বরদোলইসহ অসমিয়া নেতৃত্ব যে কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পেরেছিলেন এবং অসমিয়া জাতীয়তাবাদ কীভাবে বাঙালি-বিরোধী মানসিকতা থেকে জন্ম নিয়েছিল এটি প্রমাণ করার জন্য সুজিত চৌধুরি ১৯৪৫ সালে এ. পি. সি. সি. -র নির্বাচনী ইস্তাহার থেকে নীচের লাইনগুলি উদ্ধৃত করেছেন :

> *Unless the province of Assam is organised on the basis of Assamese language and Assamese culture, the survival of the Assamese nationality and culture will become impossible. The inclusion of Bengali-speaking Sylhet and Cachar and immigration or importation of lacs of Bengali settlers on wastelands has been threatening to destroy the distinctiveness of Assam and has, in practice, caused many disorders in its administration.*

এরই জন্য অনেকের মতে, আসামে অনুপ্রবেশ প্রশ্ন সহ উগ্র-জাতীয়তাবাদ এবং বরাক বনাম ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দ্বন্দ্ব এবং আজকের অনেক উত্তেজনা, সমস্যা ও বিতর্কের বীজ গোপীনাথ বরদোলই-এর সময়েই রোপণ করা হয়েছিল। এই কারণেই সুজিত চৌধুরি প্রশ্ন তুলেছিলেন শ্রীহট্টে গণভোট কি বাঙলা-ভাষীদের দাপট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আসামের কাছে একটি "ঈশ্বর প্রদত্ত সুযোগ"? ("A 'god-sent' opportunity"?)। অবশ্য চৌধুরির যুক্তির বিরুদ্ধে দেখানো হয়, কীভাবে গোপীনাথের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাংলাভাষী করিমগঞ্জ মহকুমা কাছাড়ের সাথে যুক্ত হয়েছিল। যাইহোক, স্বাধীনতার আগে ও পরে রাজ্য

প্রশাসন পরিচালনায় প্রধান হিসাবে তিনি যে দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন সে ব্যাপারে অনেকেই একমত। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী আসামকে ব্রিটিশ যুগ থেকে যে রকম অন্যায়ভাবে শোষণ করা হয়েছে তিনি সংগত কারণেই স্বাধীন ভারতে তার অবসানের জন্য জোরালো দাবি উত্থাপন করেছিলেন। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ প্রতিপত্তি থাকায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কসহ গোপীনাথ বরদোলই-এর মতামত ও দাবি সেদিন যথেষ্ট গুরুত্ব পেত। ভারতীয় সংবিধানসভার তিনি ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত উপজাতি এলাকা সংক্রান্ত 'সাব-কমিটি'-র চেয়ারম্যান। প্রধানত গোপীনাথ বরদোলই-এর উদ্যোগেই অনেক বিতর্কের পর উপজাতি-জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকল্পে ষষ্ঠ তপশিল ভারতীয় সংবিধানে স্থান পেয়েছিল। এটি ছিল বরদোলই-এর এক অভিনন্দনযোগ্য অবদান।

সুদর্শন, অভিজাত, দীর্ঘকায়, আড়ম্বরহীন, সহজ সরল স্বামী সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী লিলি উল্লেখ করেছেন কীভাবে তাঁর পিতা ভূমিকান্ত মজিন্দার বরুয়া এবং মাতা বিবিকা বরুয়া ২৮ বছরের যুবক গোপীনাথের সাথে অনেক ঘটা করে বিবাহ দিয়েছিলেন যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩ বছর। ধনী পিতামাতার একমাত্র কন্যা হওয়া সত্ত্বেও, লিলি উল্লেখ করেছেন রান্না-বান্না থেকে শুরু করে সংসারের খুঁটি-নাটি সমস্ত দায়-দায়িত্ব কীভাবে তাঁর প্রিয়তম জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন। গোপীনাথের আইন-ব্যবসা ত্যাগ, বারবার কারাবরণ ইত্যাদি কারণে পরিবারের আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। কিন্তু গোপীনাথের আপাতরুক্ষ ব্যবহারের নীচে অন্তরের কোমলতা কীভাবে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হত, কীভাবে সংসারের পরিমণ্ডল মধুময় হয়ে উঠত যখন তাঁর স্বামী উদাত্ত কণ্ঠে ব্রহ্মসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত বা বিহু গান গাইতেন অথবা এস্রাজ বা বেহালা বাজাতেন। সমগ্র জীবন তিনি খাদি পরিধান করেছেন, দেশপ্রেমকে সবচেয়ে বড়ো ধর্ম মনে করেছেন এবং কোনোদিন হতাশাকে প্রশ্রয় দেননি। অনেক গুণের অধিকারী এমন একজন স্বামীর স্ত্রী হতে পারায় তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলে গর্ববোধ করেন।

১৯৫০ সালের ৫ আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর হঠাৎ মৃত্যুর পর তৎকালীন অবিভক্ত আসামের রাজ্যপাল জয়রামদাস দৌলতরাম 'লোকপ্রিয়' আখ্যায় গোপীনাথ বরদোলই-কে ভূষিত করেন। উপজাতি জনগোষ্ঠীর কাছে তিনি যে কত প্রিয় ছিলেন সেটি উপলব্ধি করা যায় যখন এ. জেড. ফিজোর মতো বিদ্রোহী নাগা নেতা আসামের মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াণে মন্তব্য করেন, ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও

একখণ্ড নীল আকাশের দিশা পেয়েছিলেন বরদোলই ("Bardoloi saw years ago amidst gathering storm a patch of blue sky")। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ-এর পর গোপীনাথ বরদোলই আসামের দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি **স্বাধীন ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারত-রত্ন' উপাধিতে বিভূষিত** হয়েছিলেন যদিও মৃত্যুর ৪৯ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৯৯ সালে। বিলম্বিত এই মর্যাদা সত্ত্বেও আসামের জনমনে তাঁর নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। গুয়াহাটি বিমানবন্দর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা সবই আজ গোপীনাথ বরদোলই-এর নামে অলংকৃত।

সূত্র ঃ

i. Birendra Kumar Bhattacharyya, *Gopinath Bardaloi.*
ii. Lily Mazinder Baruah, *Lokopriya Gopinath Bardoloi, an Architect of Modern India.*
iii. কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ।

১৭.২১ গোলাপ বরবোরা (১৯২৩-২০০৬) (Golap Borbora : 1923-2006)

গোলাপ বরবোরা ছিলেন **স্বাধীনোত্তর আসামের প্রথম অ-কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী** যিনি মাত্র ১৮ মাস (১২ মার্চ, ১৯৭৮- ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৩ সালে গোলাঘাটে তাঁর জন্ম। স্কুলের শিক্ষা তিনসুকিয়ায় শেষ করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ার ফলে কলকাতায় পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখেই ১৯৪৭ সালে আসামে ফিরে আসেন। রামমনোহর লোহিয়া ও জয়প্রকাশ নারায়ণের আদর্শে দীক্ষিত বরবোরা জীবনে কয়েকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন এবং ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময়ে তিহার জেলে ১৮ মাস বন্দি ছিলেন। স্যোসালিস্ট পার্টির সদস্য ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে তিনি ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। জরুরি অবস্থার অন্তিমলগ্নে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি আসাম প্রাদেশিক জনতা পার্টির সভাপতি হন। ১৯৭৮ সালে তিনসুকিয়া কেন্দ্র থেকে জনতা পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পান।

গোলাপ বরবোরার স্বল্প সময়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে ১০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিককে ভূমি রাজস্ব কর থেকে মুক্ত করা হয়, মেয়েদের শিক্ষার সম্প্রসারণের

লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাসিক বেতন থেকে রেহাই দেওয়া হয়, সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ, সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বাধাগুলির দূরীকরণ ইত্যাদি নানা জনহিতকর কাজের ফলে বরবোরা মন্ত্রীসভা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে দলে দলে অনুপ্রবেশের স্থায়ী যবনিকা টানতে গিয়ে এবং চা-বাগান এলাকায় একচেটিয়া মদের ব্যবসায় আঘাত করার ফলে স্বার্থান্বেষী মহলের তিনি চক্ষুশূল হন এবং তাদের নানারকম প্রতিরোধ ও অসহযোগিতার ফলে শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদ থেকে পদত্যাগ করতে গোলাপ বরবোরা বাধ্য হন।

গোলাপ বরবোরা ছিলেন বইয়ের পোকা। এরকম পড়ুয়া, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ্যমন্ত্রী আসামের মানুষ এর আগে দেখেননি। আজীবন গোঁড়া স্যোসালিস্ট বরবোরা ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সততার মূর্ত প্রতীক। তাঁর নিজস্ব কোনো জমি বা গৃহ ছিল না। ২০০৬ সালে ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি ভাড়া বাড়িতেই জীবন কাটিয়েছিলেন। জীবনের অন্তিম লগ্নে অসুস্থতা ইত্যাদি নানা কারণে রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

১৭.২২ চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (১৮৬৭-১৯৩৮) (Chandra Kumar Agarwala : 1867-1938)

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে নবরঙ্গ আগরওয়ালা আসামে এসেছিলেন ছোটো-খাটো ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। বর্তমান শোনিতপুর জেলার বিশ্বনাথের কাছে গামিরিতে এই মাড়োয়ারি পরিবারের কর্তা বাসস্থান তৈরি করেন। সামান্য মুদিখানা দোকানের মালিক থেকে নবরঙ্গ আগরওয়ালা ক্রমে চা, রাবার, কাঠ ইত্যাদি ব্যবসার মাধ্যমে সমাজে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে 'মৌজাদার' হওয়ার অধিকার পান। নবরঙ্গ দুই অসমিয়া তনয়ার (সদরি ও শোনপাহি) পাণিগ্রহণ করেন এবং অসমিয়া বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। একটি মাড়োয়ারি পরিবার নবরঙ্গের সময় থেকে আসামে যেভাবে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিবিলাস সেই একই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। হরিবিলাসের দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রকুমারের জন্ম হয়েছিল ১৮৬৭ সালের ২৮ নভেম্বর। যেহেতু ১৮৭৩ সালে আগরওয়ালা পরিবার তেজপুরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, এরই জন্য বাবার কঠোর শাসনের মধ্যে চন্দ্রকুমারের প্রাথমিক শিক্ষা তেজপুরেই শুরু হয়। কিছু সময় কলকাতায় পড়াশোনার জন্য অতিবাহিত করলেও চন্দ্রকুমার তেজপুর থেকেই এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আবার কলকাতার প্রেসিডেন্সি

কলেজে প্রথমে এফ. এ. এবং পরে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসার। কিন্তু পিতা হরিবিলাসের বিরোধিতার জন্য সে ইচ্ছাপূরণ হয়নি। কিছুটা হতোদ্যম চন্দ্রকুমার কলকাতায় পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখেই আসামে ফিরে আসেন এবং ডিব্রুগড়ের কাছে তামোলবাড়ি চা-বাগানে বাবার সাথে ব্যবসায় যোগ দেন।

অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (প্রথম খণ্ডের ১২.৪ দ্রষ্টব্য), গুণাভিরাম বরুয়া (১৭.১৮ দ্রষ্টব্য), হেমচন্দ্র বরুয়া (১৭.৭৪ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি খ্যাতিমান ব্যক্তিরা প্রভূত উদ্যোগ নিয়েছিলেন ; কিন্তু তাঁদের কাজ ছিল অসমাপ্ত। পরবর্তী সময়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য), হেমচন্দ্র গোস্বামী (১৭.৭৩ দ্রষ্টব্য), পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া (১৭.৩৭ দ্রষ্টব্য), কনকলাল বরুয়া (১৭.১০ দ্রষ্টব্য), রজনীকান্ত বরদোলুই (১৭.৫৮ দ্রষ্টব্য) এবং চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা সহ এক ঝাঁক উজ্জ্বল প্রতিভা দেশপ্রেমের দায়বদ্ধতা থেকে অসমিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে অসংখ্য ফুল ফুটিয়ে সভ্য পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা তাঁর পিতা বা পিতামহর মতো বাহ্যিকভাবে মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও অসমিয়া ভাষা, সংস্কৃতি আত্মস্থ করে ঐ সমাজের অঙ্গ হিসেবে আসামের জন্য নিজেদের নিবেদন করেছিলেন। কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় চন্দ্রকুমার 'অসমিয়া ভাষার উন্নতি সাধিনী সভা'-র উদ্যোগী সভ্য হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন। এই সভার উদ্যোগেই ১৮৮৯ সালে বিখ্যাত *জোনাকি* পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ছিলেন ঐ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। আসামে 'জোনাকি যুগের' মধ্যমণি হিসাবে চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া এবং হেমচন্দ্র গোস্বামী আসামে 'ত্রিমূর্তি' নামে খ্যাত। প্রখ্যাত গবেষক মহেশ্বর নিয়োগ (১৭.৫৩ দ্রষ্টব্য) চন্দ্রকুমারের উদ্যোগে *জোনাকি*-র আত্মপ্রকাশকে এইভাবে প্রশংসা করেছেন ঃ "The appearance and celebration of *Jonaki* in 1889 at Calcutta caused an invocation of the birth of modern Assamese literature with great significance."

সাংবাদিকতার জগতে চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার অবদান কম উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯১৮ সালে ডিব্রুগড় থেকে মননশীল প্রবন্ধে সমৃদ্ধ সাপ্তাহিক *অসমিয়া* পত্রিকা প্রকাশ তিনি শুরু করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে গুয়াহাটিতে এটি স্থানান্তরিত হয় এবং বিশিষ্ট গান্ধিবাদি স্বাধীনতা সংগ্রামী অমিয় কুমার দাশ (১৭.২

দ্রষ্টব্য)-এর হাতে তিনি পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। জনমত সৃষ্টিতে এই অসমিয়া ভাষার পত্রিকাটির গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা লক্ষ করে তিনি এটিকে সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক পত্রিকায় পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যদিও শেষপর্যন্ত এটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ছিলেন বিরল প্রতিভাধর অসমিয়া কবি। তাঁর দুটি অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ *প্রতিমা* (১৯১৩) ও *বীন-বোরাগি* (১৯২৩) সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার সময় লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া মন্তব্য করেছিলেন, যদিও 'প্রতিমা'টি ছোটো ; কিন্তু ওটি খাঁটি সোনার। 'মানব বন্দনা' কবিতায় চন্দ্রকুমার মানুষকেই 'ভগবান' আখ্যা দিয়ে মানুষের জয়গান গেয়েছেন। অসমিয়া জাতীয়তাবোধের অঙ্কুরোদ্‌গম সাহিত্যের জগতে এইসব আলোড়নের জন্যই সম্ভব হয়েছিল। গর্ববোধ না থাকলে যে একটি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় চেতনা আসতে পারে না, এই সরল সত্যটি অন্যদের মতো চন্দ্রকুমার সব সময় অনুভব করতেন।

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা তেমনভাবে অংশ না নিলেও তিনি ছিলেন গান্ধিবাদী। প্রসঙ্গত, ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন গান্ধিজি আসামে আসেন, সেই সময় তেজপুরে আগরওয়ালা পরিবারের আতিথ্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন। খুব কাছে থেকে গান্ধিজিকে দেখার পর এবং তাঁর সাথে বিভিন্ন প্রশ্নে আলোচনার সুযোগ পাওয়ায় চন্দ্রকুমারের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। পাশ্চাত্য পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ ইত্যাদি ত্যাগ করে তিনি অবশিষ্ট জীবন খদ্দর পরিধান করে অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবেই কাটিয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালের ২ মার্চ গুয়াহাটির উজানবাজার এলাকায় তাঁর নিজের বাড়িতে জীবনাবসানের সাথে অসমিয়া সাহিত্যের এক গৌরবময় যুগের যবনিকাপাত হয়েছিল।

১৭.২৩ চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানি (১৯০১-৭২) (Chandraprabha Saikiani : 1901-72)

অবিভক্ত কামরূপ জেলার বোজালি এলাকার এক গ্রামের মোড়ল রতিরাম মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী গঙ্গাপ্রিয়ার কন্যা চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানি ১৯০১ সালের ১৬ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রতিরাম চাইতেন তাঁর কন্যাদের (রামেশ্বরী ও চন্দ্রপ্রভা) লেখাপড়া শেখাতে ; কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা বা রীতি সেই সময় ঐ স্থানে ছিল না। তাঁদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে ছেলেদের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই কন্যাকে রতিরাম ভর্তি করে দিয়েছিলেন এবং প্রতিদিন দীর্ঘপথ হেঁটে ঐ দুই শিশু

বিদ্যালয়ে যেত। শিক্ষার প্রতি এত আগ্রহ লক্ষ করে স্কুল ইন্সপেক্টার নীলকান্ত বরুয়া ঐ দুই কন্যাকে বোর্ডিং-এর সুযোগসহ বৃত্তি দিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিদের পরিচালিত নওগাঁও মিশন স্কুলে ভর্তি করে দেন এবং এরই ফলে চন্দ্রপ্রভার পক্ষে কিছুটা লেখাপড়া শেখা সম্ভব হয়। চন্দ্রপ্রভা লক্ষ করতেন, ঐ মিশন স্কুলে পড়াশোনার চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ অনেক বেশি উৎসাহী। একবার বোর্ডিং-এর সুপার মিস্ লং জনৈকা গরিব অসমিয়া ছাত্রীকে অনেক চেষ্টার পর খ্রিস্টধর্মের আওতায় আনতে ব্যর্থ হয়ে অসমিয়াদের সম্পর্কে সকলের সামনে অনেক কুৎসিত মন্তব্য করেছিলেন। চন্দ্রপ্রভা জীবনে এই প্রথম জাতিগত বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ছাত্রীদের ধর্মঘটের হুমকি দিলে কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছিল এবং ঐ পাশ্চাত্য সুপার সকলের সামনে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছিলেন। ছাত্রী-জীবনের এই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েই চন্দ্রপ্রভা অবশেষে আসামের অগ্নিকন্যায় পরিণত হন।

নওগাঁও মিশন স্কুলে শিক্ষা সমাপনান্তে চন্দ্রপ্রভা নওগাঁওতেই একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। চন্দ্রপ্রভা তাঁর দিদি রামেশ্বরীকে (যিনি পরবর্তী সময়ে 'রজনীপ্রভা' নামে পরিচিত হন) সব সময় পড়াশোনায় উৎসাহ দিতেন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। এই রামেশ্বরী / রজনীপ্রভা অবশেষে একদিন আসামের প্রথম মহিলা ডাক্তার হন। নওগাঁও পর্ব শেষ করে চন্দ্রপ্রভা তেজপুরে যান এবং 'তেজপুর গার্লস্ এম. ই. স্কুলে' প্রধান শিক্ষিকার পদ গ্রহণ করেন। চন্দ্রপ্রভাই আসামের প্রথম মহিলা যিনি সাইকেলে চড়ে বাড়ি থেকে স্কুল সহ বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতেন, যে দৃশ্য সমকালীন আসামে ছিল অভূতপূর্ব। যদিও অবিভক্ত বঙ্গদেশের প্রেক্ষিতে আসামের সমাজ তুলনামূলকভাবে ছিল অনেক উদার ; তথাপি নানা কারণে স্বাধীনচেতা চন্দ্রপ্রভার জীবনে সমাজের গোঁড়াপন্থীদের কাছ থেকে নেমে এসেছিল অনেক ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও তিরস্কার। তেজপুরে বিখ্যাত আগরওয়ালা পরিবারের অতিথি হিসাবে তিনি ছিলেন এবং জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য) সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। জ্যোতিপ্রসাদের মা কিরন্ময়ী ছিলেন তাঁর স্থানীয় অভিভাবিকা। তেজপুরেই তিনি আসামের বিখ্যাত কিছু ব্যক্তির—যেমন, অমিয়কুমার দাশ (১৭.২ দ্রষ্টব্য), চন্দ্রনাথ শর্মা, লক্ষ্মীধর শর্মা—সান্নিধ্য পান এবং জীবন সম্পর্কে নতুন চেতনায় উদ্ভাসিত হন। ১৯২০-তে তিনি আসামের 'ছাত্র সম্মেলনে' প্রধান স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে নির্বাচিত হয়ে একটা বড়ো সমাবেশের সামনে জীবনে প্রথম বক্তৃতা দেন। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধি যখন অসহযোগ আন্দোলনের

সূত্রে তেজপুরে আসেন, চন্দ্রপ্রভা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে জাতীয় আন্দোলনে আসামের মেয়েদের ভূমিকা ও আশু কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হন।

ইতিমধ্যে চন্দ্রপ্রভার জীবনে আর একটি পরিবর্তন আসে। তেজপুরের জনপ্রিয় লেখক দণ্ডিনাথ কলিতা-র সাথে গোপন প্রেম, মন্দিরে গিয়ে মালাবদল এবং সন্তানধারণকে কেন্দ্র করে চন্দ্রপ্রভার জীবনে দুর্যোগ নেমে আসে। কলিতা পরিবার চন্দ্রপ্রভাকে বধূ হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, কারণ তিনি ছিলেন তাঁদের দৃষ্টিতে নীচু জাতের মেয়ে। দণ্ডিনাথেরও বলিষ্ঠ ভূমিকার অভাবহেতু চন্দ্রপ্রভাকে সকলে অবিবাহিতা মা হিসেবেই গণ্য করে এবং তাঁকে নানাভাবে অতিষ্ঠ করতে শুরু করে। দুর্বলচিত্ত দণ্ডিনাথের প্রতি অভিমানে তেজপুর অধ্যায়ে যবনিকা টেনে চন্দ্রপ্রভা কামরূপের গ্রামে তাঁর বাবার কাছে ফিরে আসেন এবং সেখানেই ১৯২৩ সালের ১৩ আগস্ট তাঁর পুত্র অতুল (যিনি পরবর্তী সময়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন)-এর জন্ম হয়। জাত-পাত, সমাজের নানা কুসংস্কার সহ মেয়েদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামের শপথ নিয়ে চন্দ্রপ্রভা খদ্দরের কাপড় পরিধান শুরু করেন। ১৯২৫ সালে রজনীকান্ত বরদোলই (১৭.৫৮ দ্রষ্টব্য)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'অসম সাহিত্য সভা'-র নওগাঁও অধিবেশনে বিভিন্ন বক্তা যখন সমাজ সংস্কারের প্রসঙ্গে নারী-শিক্ষা, নারীর সম-অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সেই সময় মেয়েদের জন্য আলাদাভাবে সংরক্ষিত বাঁশের চিকের ঘেরাটোপ থেকে শিশু-পুত্র অতুলকে কোলে নিয়ে চন্দ্রপ্রভা মঞ্চের উপরে উঠে এসে এইসব ভণ্ডামির চিরতরে যবনিকা টানার জন্য এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন যেটি আসামের সামাজিক ইতিহাসের এক উজ্জ্বল দলিল। শ্রীমন্ত শংকরদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত চন্দ্রপ্রভা জাতপাতের বৈষম্যে কষাঘাত হানার উদ্দেশ্যে হাজোতে হয়গ্রীব মাধব মন্দিরে মহিলাসহ তথাকথিত নিম্নবর্ণের সকলের অবাধ প্রবেশাধিকারের দাবিতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং শেষপর্যন্ত সাফল্যলাভ করেন। জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য ১৯৩০ এবং ১৯৪২-এ তিনি দুবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ব্রিটিশ পুলিশের রক্তচক্ষু এড়াতে গোপীনাথ বরদোলই (১৭.২০ দ্রষ্টব্য), তরুণরাম ফুকন (১৭.৩১ দ্রষ্টব্য), বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা (১৭.৪৭ দ্রষ্টব্য)-র মতো প্রথম সারির নেতৃবর্গ চন্দ্রপ্রভার গ্রামেই আত্মগোপন করে থাকতেন।

১৯২৬ সালে চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানির নেতৃত্বে 'আসাম প্রাদেশিক মহিলা সমিতি' গঠিত হয় যার শাখা আজ সমগ্র রাজ্য জুড়ে বিস্তৃত। নারী শিক্ষা, নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, বাল্যবিবাহ রোধ এবং নারীর সমঅধিকারের দাবিতে

এই সমিতি সমাজজীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯২৬ থেকে ১৯৬৩ দীর্ঘ ৩৭ বছর চন্দ্রপ্রভা ছিলেন এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা এবং এরপর দীর্ঘ ৬ বছর ছিলেন সভানেত্রী। লেখিকা হিসাবে ঐ সমিতির মুখপত্র *অভিযাত্রী*-র তিনি সম্পাদিকা ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অসমিয়া ভাষায় অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে সাহিত্যের জগতেও নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন। চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানি রচিত *কণ্ঠমালা, অপরাজিতা, শেষ আশ্রয়, মহাত্মা গান্ধির শেষ কথা* (তিন খণ্ডে অসমিয়ায় অনুবাদ) গ্রন্থের অনেক স্থানেই নিজের জীবনের ঝড়ের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। ১৯৩৭-এ রচিত তাঁর *পিতৃভিটা* উপন্যাসটিকে কিছুটা উল্টোভাবে আত্মজীবনী বলা যায়। উপন্যাসটিতে নানাভাবে সমৃদ্ধ ও ধনাঢ্য মন্দার চামুয়া দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে একে একে তার সব কিছু হারায়, এমনকি নিজের ভিটে ভূমিটিও। মন্দারের একমাত্র কন্যা মাধবী কীভাবে নিজের জীবনের সব কিছুর বিনিময়ে, প্রেমিককে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে, হতভাগ্য পিতার পাশে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ভিটাটি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়—সেই দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনি নিয়েই উপন্যাসটি আবর্তিত। জীবন সংগ্রামে অপরাজিতা চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানি যদিও আসামের একমাত্র বীরাঙ্গনা নন (অতীত ইতিহাসেও এরকম কয়েকজন অগ্নিকন্যার পরিচয় পাওয়া যায়), তথাপি নিজের ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে সামগ্রিকভাবে নারী সমাজের যন্ত্রণা হিসেবে সকলের সামনে তুলে ধরে তার প্রতিকারের জন্য সংগ্রামের কাহিনি আসামের সামাজিক ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো দৃষ্ট হয়। কেউ কেউ তাঁকে 'feminist' বা নারীবাদী আখ্যা দিলেও, তাঁর সংগ্রাম ছিল অনন্য। তাঁর জন্মদিন ছিল ১৬ মার্চ এবং ঐ একই দিনে ১৯৭২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর বছরেই তিনি ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ২০০২ সালে একটি ডাক টিকিটও প্রকাশিত হয়।

সূত্র ঃ নিরূপমা বরগোঁহাই-এর *অভিযাত্রী* (চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানির বিস্ময়কর জীবনী অবলম্বনে)
[ইংরেজিতে অনুবাদ ঃ প্রদীপ্ত বরগোঁহাই]

১৭.২৪ চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়া

প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, পুস্তক-প্রকাশক চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়া গুয়াহাটির কটন কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ সালে ইংরেজিতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থায় মাত্র

১৫ বছর বয়সে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশ নিয়ে দুবার জেল খাটেন। ১৯৪৫-এ কারাগারের অভ্যন্তর থেকেই পরবর্তী সময়ের রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আমেদ (১৭.৪১ দ্রষ্টব্য) এবং মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহার (১৭.৪৫ দ্রষ্টব্য) অনুগত ছাত্র হিসেবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। লোভনীয় কিছু সরকারি চাকুরির সুযোগ ঐ সময় থাকলেও চন্দ্রপ্রসাদ 'সাংবাদিকতা' বৃত্তিকে জীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে গ্রহণ করেন। কলকাতা থেকে এম. এ. পরীক্ষার পর আসামে ফিরে এসে তিনি ১৯৫৫ সালে ইংরেজি দৈনিক *আসাম ট্রিবিউন* পত্রিকায় 'সাব-এডিটর, হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৩-তে *আসাম বাতরি* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা *মণিদীপ*-এর সম্পাদক হিসাবে সাংবাদিকতাকে সৃষ্টিশীল গঠনমূলক কাজে কীভাবে ব্যবহার করা যায় সেই প্রশ্নে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দেন। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ তিনি অসমিয়া পত্রিকা *নতুন দৈনিক*-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকরূপে অনেক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। ১৯৬৭ সালে আসাম 'পাবলিকেশন বোর্ড'-এর সম্পাদক পদে বৃত হয়ে ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৬ ঐ বোর্ডের মুখপত্র *প্রকাশ*-এর সম্পাদনা করেন। ১৯৯৩ থেকে ৮ আগস্ট, ২০০৬ তাঁর ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যু পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বিখ্যাত অসমিয়া মাসিক সাহিত্য পত্রিকা *গরীয়সী*-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এই *গরীয়সী* পত্রিকাটি *সাহিত্য-প্রকাশ* কর্তৃক প্রকাশিত হত এবং ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ পরপর তিনবার মর্যাদাপূর্ণ 'কথা' পুরস্কার অর্জন করেছিল। একই ব্যক্তির উদ্যোগে এতগুলি পত্রিকার আত্মপ্রকাশ বিস্ময় সৃষ্টি না করে পারে না।

ইংরেজি সাহিত্যের কৃতি ছাত্র হওয়ার সুবাদে তুলনামূলক সাহিত্যচর্চার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অধিক এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের উদ্যোগ থাকলে বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে অসমিয়া সাহিত্যও যে কিছুটা মর্যাদার স্থান দখল করতে পারে, সেটি তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন। আসামের অতীত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁরই উদ্যোগে আসাম 'পাবলিকেশন বোর্ড' *প্রাচ্য-শাসনাবলী, হস্তি-বিদ্যার্ণব, সত্রীয় নৃত্য, গোঁহাই বরুয়া রচনাবলী, কালিরাম মেধি রচনাবলী* ইত্যাদি পাণ্ডুলিপি ছাপতে বাধ্য হয়েছিল। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* তাঁরই উদ্যোগে অসমিয়া ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ 'অসম সাহিত্য সভা'-র পরপর দুটি অধিবেশনে (হাজো এবং জোড়হাটে) তিনি সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন। নতুন প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্যবাহী অতীত আসামের নিবেদিত-প্রাণ দিকপালদের

সামাজিক ভাবনা-চিন্তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়ার উদ্যোগেই ঊনবিংশ শতকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত অসমিয়া দুটি ধ্রুপদী পত্রিকা *জোনাকি* ও *বহি*-র পুরোনো অনেক মননশীল প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল। আসলে, চন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে আসাম 'পাবলিকেশন বোর্ড'-এর প্রকাশনার এটি ছিল স্বর্ণযুগ। ১৯৮৩-তে তিনি জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফার্ট শহরে বিশ্ব বইমেলায় অংশ নেন এবং অসমিয়া গ্রন্থের ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ থেকে গুয়াহাটিতে বাৎসরিক বইমেলা আয়োজনে উদ্যোগ নেন।

গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ গান্ধিবাদি চন্দ্রপ্রসাদ ভারতের দুটি মহাকাব্য *রামায়ণ* ও *মহাভারত* ব্যাপকভাবে গবেষণা করে বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্রকে সময়োপযোগী করার ব্যাপারে তৎপরতা দেখিয়েছিলেন। মহাভারতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় কর্ণ চরিত্রটি বেছে নিয়ে তিনি *মহারথী* নামে একটি অসাধারণ এবং আসামের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস রচনা করেন, যেটির জন্য ১৯৯৫ সালে দিল্লির 'সাহিত্য অকাদেমি'-র পুরস্কার পান। দুটি মহাকাব্য নিয়ে তাঁর রচিত *বিশ্বাস অরু বিস্ময়* তাঁকে খ্যাতির শিখরে নিয়ে গিয়েছিল। সমগ্র ভারতের প্রেক্ষিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের, শইকিয়ার দৃষ্টিতে, কর্ণের মতো গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও আজও উপেক্ষিত, বঞ্চিত 'হতাশের দলে' অন্তর্ভুক্ত। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্ধকার কাটিয়ে আলোর সন্ধানে চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়া সমগ্র জীবন নিবেদন করেছেন। আসামের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য) জীবনীকে কেন্দ্র করে চন্দ্রপ্রসাদের *তরী মোর আলো করে যাত্রা* নামের অসাধারণ উপন্যাসটির জন্য ২০০০ সালে তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন। চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়ার মতো একাধারে অত বড়ো মাপের সাংবাদিক ও সাহিত্য 'মহারথী' (তিনি নিজেই ছিলেন কর্ণের ভূমিকায়) শুধু আসামে নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে বিরল। চন্দ্রপ্রসাদের প্রস্তাব ছিল 'আসাম' নামটি ব্রিটিশদের দেওয়া ; ঐ নামটি পরিবর্তন করে রাজ্যের নাম 'অসম' হলে ভালো হত। শইকিয়ার মৃত্যুর ৬ মাস আগে আসাম মন্ত্রীসভা (২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬) তাঁর শেষ ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে ঐ প্রস্তাবের সাথে সহমত ব্যক্ত করেন ; যদিও সংবিধানের কিছু জটিলতার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে এটি আজও কার্যকরী হয়নি। আসামের সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জগতের এত বড়ো উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সম্মানার্থে কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৭ সালে তাঁকে মরণোত্তর 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৭.২৫ চিলা রাই (Chilarai)

ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে আসামের পশ্চিম প্রান্তে বর্তমান উত্তরবঙ্গে, কোচ বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশ্বসিংহ (১৫১৫-৪০)। বিশ্বসিংহের দুই পুত্র (১) মল্লদেব বা মল্লধ্বজ বা নরনারায়ণ এবং (২) শুক্লধ্বজ বা সংগ্রাম সিংহ বা চিলা রাই (রায়)-এর জয়গাথা নিয়েই কোচ ইতিহাসের গৌববের অধ্যায় বর্ণিত হয়। কথিত আছে, ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের মাঘি পূর্ণিমায় (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) মাতা পদ্মাবতীর গর্ভে শুক্লধ্বজ-র জন্ম। পিতা বিশ্বসিংহ তাঁর দুই সন্তানকে (মল্লধ্বজ ও শুক্লধ্বজ) বারাণসীতে গুরু ব্রহ্মানন্দ বিশারদ-এর কাছে শাস্ত্রপাঠ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র, তর্কবিদ্যা, দর্শন ও রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং উভয়েই নিষ্ঠার সাথে ঐসব বিদ্যা অর্জন করে ফিরে আসেন। ১৫৪০-এ বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর মল্লদেব রাজা হলেন এবং 'নরনারায়ণ' হিসেবে পরিচিত হলেন। প্রায় একটানা অর্ধশতাব্দী (১৫৪০-৮৭) নরনারায়ণের রাজত্বে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ, যিনি ইতিহাসে 'চিলা রাই'/'চিলা রায়' নামে পরিচিত, ছিলেন প্রধান সেনাপতি। কোচ গৌরব ঐ সময় শিখরে উঠেছিল। উভয় ভ্রাতার মধুর সম্পর্ক নিয়ে অনেক কাহিনি আছে (প্রথম খণ্ডের প্রথম ও সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

প্রবাদ আছে, চিলা রাই সেনাপ্রধান হয়ে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে দক্ষ লক্ষাধিক সামরিক বাহিনী গঠন করেছিলেন যাতে ছিল ৪,০০০ অশ্বারোহী, ৭,০০০ যুদ্ধ হস্তী, ১,০০০ নৌতরীতে ৬,০০০ নৌ-সেনা ইত্যাদি। তিনি নাকি ভারতের প্রথম কুশলী নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ। এত ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে কোচ সেনাপতি চিলা রাই শুধু যে আহোমদের পর্যুদস্ত করে পূর্বদিকে সাদিয়া পর্যন্ত কোচ আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন তাই নয় ; প্রতিবেশী কাছাড়ি, খাসি, গারো, জয়ন্তিয়া এবং এমনকি মণিপুর, ত্রিপুরাসহ বঙ্গের শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ এলাকাতেও তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কিছুটা পরবর্তী সময়ে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর 'ব্লিৎস্ক্রিগ' কৌশল বা শত্রুপক্ষকে প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে আচমকা আক্রমণের পদ্ধতি অনুসরণ করে চিলের মতো ছোঁ মেরে এক একটা অঞ্চল তিনি ছিনিয়ে এনেছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি 'চিলা রাই' নামে পরিচিত। চিলা রাই-এঁর সাহস, নায়কোচিত কার্যকলাপ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের গল্প প্রচলিত আছে।

তিনি যে শুধু বিখ্যাত সমরনায়ক হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত তা নয় ; তিনি ছিলেন একাধারে বিদ্যোৎসাহী, সমাজ-সংস্কারক এবং শংকরদেব প্রবর্তিত নব

বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা। আহোম রাজাদের রক্ত-চক্ষু থেকে নিজেকে রক্ষা করতে শ্রীমন্ত শংকরদেব (১৪৪৯-১৫৬৯) সেই সময় নরনারায়ণ ও চিলা রায়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং কামতা রাজ্যে কোচদের আশ্রয়েই জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, চিলা রাই নিজে শংকরদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী (শংকরদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামরাই-এর কন্যা) ভুবনেশ্বরীকে বিবাহ করে আসামের মহান ধর্মনায়কের পরিবারের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। গল্পে আছে, একবার ভুবনেশ্বরীর সুরেলা কণ্ঠে শংকরদেবের 'বরগীত' শুনে চিলা রায় এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি পাণিগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কামতা রাজ্যে কোচ রাজপরিবারভুক্ত হওয়ার পর ভুবনেশ্বরীর নতুন নাম হয় 'কমলাপ্রিয়া'। শংকরদেব কোচ রাজপরিবারের ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ হওয়ায় একটি দুষ্টচক্র নরনারায়ণের কাছে শংকরদেবের বিরুদ্ধে একটার পর একটা মিথ্যা অভিযোগ করে এমনভাবে তাঁর কান বিষিয়ে দিয়েছিলেন যে রাজা অবশেষে শংকরদেবকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সেই সময় চিলা রায় ও কমলাপ্রিয়া না থাকলে শংকরদেবের মৃত্যু অনিবার্য ছিল। তাঁর প্রিয় ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর জন্যই নরনারায়ণ অবশেষে তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং শংকরদেবের দর্শন 'এক-শরণ-নাম ধর্ম'র মর্মকথা উপলব্ধি করেন (প্রথম খণ্ডের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। নরনারায়ণ ও চিলা রায়ের সৌজন্যেই শংকরদেব এবং তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য মাধবদেব-এর পক্ষে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কোচ রাজত্বে থাকা এবং অসাধারণ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভবপর হয়েছিল। কামতা রাজ্যে চিলা রায়ের অনুরোধেই শংকরদেব ভগবদগীতার সারমর্ম 'গুণমালা' অথবা রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে 'রাম বিজয়' ইত্যাদি প্রণয়ন করেছিলেন বর্তমান কোচবিহারে অবস্থানকালে। চিলা রায়ের বিশেষ আবেদনে সাড়া দিয়ে শংকরদেব ১৮০ ফুট দীর্ঘ ও ৯০ ফুট প্রস্থ বরপেটায় বোনা এক অসাধারণ কাপড়ে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার ছবি এঁকেছিলেন, যেটি 'বৃন্দাবন বস্ত্র' নামে পরিচিত এবং বর্তমানে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আসামের এক অনন্য শিল্প হিসেবে সংরক্ষিত।

শংকরদেব ছাড়াও বিদ্বজ্জনকে চিলা রায় কীরকম পৃষ্ঠপোষকতা করতেন সেটি উপলব্ধি করা যায় যখন রাম সরস্বতী কোচবিহারে চিলা রায়ের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে মহাভারত অনুবাদ করলেন, অথবা পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য 'রত্নমালা ব্যাকরণ' রচনা করলেন, কিংবা শ্রীধর পণ্ডিত 'জ্যোতিষ শাস্ত্র' অথবা অঙ্কশাস্ত্রের উপর বকুল কায়স্থ বিখ্যাত 'লীলাবতী' প্রণয়ন করলেন। চিলা রায়ের স্ত্রী কমলাপ্রিয়ার আবেদনে গৃহবধূদের উদ্দেশ্যে মাধবদেব 'জন্ম রহস্য' রচনা করেছিলেন। এক কথায়, মহাসেনাপতি চিলা রায়ের জন্যই সেদিন কামতা রাজ্যের সাংস্কৃতিক

পরিমণ্ডল ছিল অত উন্নত। নিজে শাক্ত ধর্মভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও নীলাচল পাহাড়ে কামাখ্যা মন্দির কালা-পাহাড় প্রায় ধ্বংস করার পর ১৫৬৫-তে চিলা রায় মধ্যযুগের মন্দিরের আদলে বর্তমান গঠনটি নির্মাণে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

চিলা রায়ের পুত্র রঘুদেবকে একসময় নরনারায়ণ 'কোচ হাজো'র শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র (রঘুদেব) 'কোচ হাজো'-র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষণা করেন এবং কামতা রাজ্যটি চিরতরে স্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় ঃ একদিকে কোচবিহার এবং অন্যদিকে কোচ-হাজো। চিলা রায়ের জীবনের শেষ অধ্যায় ও সময়কাল নিয়ে অনেক পরস্পরবিরোধী মতামত আছে। একটি মত অনুযায়ী, গৌড়-বঙ্গের আফগান সুলতান সুলেমান কাররানির সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধের সময় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে চিলা রায় গঙ্গার ধারে প্রাণ হারিয়েছিলেন। চিলা রায় আহোমদের পর্যুদস্ত করলেও লাচিৎ ফুকনের (প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) মতো আসামে চিলা রায়-কেও 'মহাবীর' আখ্যায় ভূষিত করা হয়। 'অল আসাম কোচ রাজবংশী সম্মিলনী' ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮-এ চিলা রায়ের ৪৯৮তম জন্মদিনটি 'বীর চিলা রায় দিবস' হিসেবে উদযাপন করেছে।

সূত্র ঃ হেমন্ত কুমার রায় বর্মা, *কোচবিহারের ইতিহাস*

১৭.২৬ জগন্নাথ বরুয়া (১৮৫১-১৯০৭) (Jagannath Barooah : 1851-1907)

জোড়হাটের ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত এক সরকারি কর্মচারীর সন্তান জগন্নাথ বরুয়া ছিলেন আপার আসামের প্রথম বি. এ. পাশ করা ব্যক্তি। যেজন্য তিনি **বি. এ. জগন্নাথ** নামে পরিচিত। ১৮৭২ সালে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হন। এটা ছিল জোড়হাটের বড়ো গর্ব। আসলে, আহোম রাজত্বের শেষদিকে জোড়হাট ছিল আসামের রাজধানী এবং পরবর্তী সময়ে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির—যেমন, কবি চন্দ্রধর বরুয়া, পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক, দানবীর রাধানাথ হ্যান্ডিক, গণেশ গোগুই, নীলমণি ফুকন, যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী ইত্যাদি—জন্মস্থান ছিল জোড়হাট। জগন্নাথ বরুয়ার উদ্যোগেই ১৮৮৪ সালের ৯ ডিসেম্বর 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের ইচ্ছা ও আশা ব্রিটিশ সরকারের গোচরীভূত করা। প্রথম একটা বেড়া-দেওয়া কাঁচা ঘরে সার্বজনিক সভার অফিস ছিল যেখান থেকে অনেক জরুরি সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। নাটক সহ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে এই সভা একদিন

অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। ১৮৯৫ সালের সাইক্লোনে সার্বজনিক সভার কাঁচা ঘরটি ভূমিসাৎ হওয়ার পর মালভোগ গোঁহাই, চিত্রসেন কাকতি, কণ্ঠি হাজারিকা প্রভৃতি সংস্কৃতি কর্মীদের উদ্যোগে ১৮৯৬ সালে জোড়হাট অ্যামেচার থিয়েটারের পাকা মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। আসলে, ১৯০৭ সালে জগন্নাথ বরুয়ার মৃত্যুর পর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জন্য সার্বজনিক সভার মতো এইরকম একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান অবলুপ্ত হয় এবং থিয়েটারই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

১৮৯৩ সালে জগন্নাথ বরুয়া, সার্বজনিক সভার সভাপতি হিসাবে, আসামের তৎকালীন চিফ্ কমিশনার William Erskine Ward-এর কাছে এক দরখাস্তে আসামে আফিম চাষ ও সেবনে নিষেধাজ্ঞা জারি না করার আবেদন জানান। তাঁর যুক্তি ছিল, এই নিষেধাজ্ঞা জারি হলে আসামের সমাজ ও অর্থনীতিতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। জগন্নাথ বরুয়া 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এরও সহ-সভাপতি ছিলেন ; যদিও ঐ অ্যাসোশিয়েসনের সম্পাদক মানিক চন্দ্র বরুয়াই ছিলেন সর্বেসর্বা। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সময় আসামকে পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত করার ফলে যে অসুবিধেগুলির মুখোমুখি আসামের মানুষ হচ্ছিল তার একটি তালিকা 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'র পক্ষ থেকে জগন্নাথ বরুয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কোনো সরকারি চাকুরি গ্রহণ না করে জগন্নাথ বরুয়া কয়েকটি চা-বাগানের মালিক হয়ে ১৮৯৩ সালে প্রায় ৫০০ শ্রমিক নিয়োগ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' খেতাব দিয়েছিলেন। জগন্নাথ বরুয়ার ভাই রায় বাহাদুর কৃষ্ণকুমার বরুয়া এবং জামাতা চন্দ্রধর বরুয়া প্রাক-স্বাধীনতা যুগে আসামের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসাম আইনসভার সদস্য হয়েছিলেন। মাত্র ৫৬ বছর জগন্নাথ বরুয়া বেঁচেছিলেন। চা-বাগানের মালিক হয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি হলেও আসামের সামগ্রিক মঙ্গলের কথা (তাঁর মতো দৃষ্টিতে) ভাবতেন বলেই 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'-র মতো একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। যদিও ১৯০৭ সালে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে সার্বজনিক সভারও যবনিকাপাত হয়, তথাপি জোড়হাট থিয়েটার কিন্তু দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল।

১৭.২৭ জয়মতী (Joymoti)

সমগ্র আহোম যুগে (১২২৮-১৮২৬) যে দুজন রমণীর নাম প্রায়ই উল্লিখিত হয়, তাঁর একজন হলেন পঞ্চদশ শতকে মুলা গাভরু (প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ এবং সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছিলেন ; এবং অন্যজন হলেন সপ্তদশ শতকে জয়মতী কুঁয়রি যিনি

ভারতীয় নারীত্বের ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক। আহোম রাজত্বের শেষদিকে সিংহাসনের উপর অধিকারের প্রশ্নে রাজ পরিবারের অভ্যন্তরে কীরকম অকল্পনীয় গৃহযুদ্ধ হত প্রথম খণ্ডে সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। জয়মতী ছিলেন এই অন্তর্দ্বন্দ্বেরই বলি।

আহোম অভিজাত লাই থিপেনা বরগোঁহাই-এর ১২টি স্ত্রী, ২৪টি পুত্র এবং ১৩টি কন্যা ছিল। জয়মতী ছিলেন থিপেনার ১৩টি কন্যার একজন এবং শিবসাগর থেকে কিছু দূরে মেচাগর-মাদুরি গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তুংখুংগিয়া রাজ-পরিবারের গদাপাণি কানোয়ার ('গোবর রাজা'র পুত্র)-এর সাথে জয়মতীর বিবাহ হয়। পাত্র-মন্ত্রীদের ইচ্ছা / অনিচ্ছার উপর রাজার অস্তিত্ব নির্ভর করত এবং কেউই দীর্ঘদিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ পেতেন না (প্রথম খণ্ডে ৩.৬ দ্রষ্টব্য)। **১৬৭০ থেকে ১৬৮১ সাল অর্থাৎ মোট ১১ বছরে ৭জন রাজা হয়েছিলেন এবং প্রায় প্রত্যেকেরই মৃত্যু কাহিনি মর্মান্তিক**। সেই সময় ধর্মের দোহাই দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবেই একটি নতুন প্রথা চালু করা হয়েছিল। প্রথাটি হল, দেহে ক্ষতচিহ্ন থাকলে তিনি রাজা হওয়ার অনুপযুক্ত। এরই জন্য ভাবী রাজাদের হয় খুন করা এবং সেটি না পারলে নিদেনপক্ষে তাঁদের দেহে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দেওয়া ছিল প্রতিপক্ষের একমাত্র কাজ। সুপাতফা বা গদাপাণি-র রাজ সিংহাসনে বসার সুযোগ চিরতরে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পেয়ে জয়মতীই তাঁর স্বামীকে বাধ্য করেছিলেন স্থানত্যাগ করে নাগা পাহাড়ে (বর্তমান নাগাল্যান্ড) আশ্রয় নিতে।

লাচিৎ বরফুকনের দেশপ্রেম নিয়ে আসামের মানুষের অনেক গর্ব থাকলেও তাঁর দাদা লালুকশোলা বরফুকন ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। দেশদ্রোহী লালুকশোলা শুধু যে মুঘলদের কাছে সমকালীন অর্থ মূল্যে চার লক্ষ টাকার বিনিময়ে গুয়াহাটিকে সমর্পণ করেছিলেন তাই নয়, সমগ্র আসামের পুরো কর্তৃত্ব নিজের হাতে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৪ বছরের সুলিকফার (যিনি 'লোরা রাজা' বা রত্নধ্বজ সিংহ নামে পরিচিত) সাথে নিজের ৫ বছরের কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। এই 'লোরা রাজা'-র সময়েই (১৬৭৯-১৬৮১) জয়মতীর উপর অত্যাচারের কাহিনিটি সৃষ্টি হয়েছিল। লালুকশোলা বরফুকন ও দেবেরা বরুয়ার লোক-লস্কর গদাপাণিকে খুঁজে না পেয়ে জয়মতীকে বন্দি করে এবং কোথায় তার স্বামী আছে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জয়মতী এইসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর না দেওয়ায় শুরু হয় তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার। শিবসাগরের কাছে জেরেঙ্গা-পাথর গ্রামে কাঁটাগাছে বেঁধে গথি হাজারিকার নেতৃত্বে রাজরক্ষীবাহিনী তাঁর স্ত্রীকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করছে—এই বার্তা শুনে স্থির থাকতে না পেরে

ছদ্মবেশে গদাপাণি নাগা পাহাড় থেকে নেমে এসে ঘটনাস্থলে লোকারণ্যের মধ্য থেকেই চিৎকার করে স্বামীর গোপন আস্তানা জানিয়ে দেওয়ার জন্য জয়মতীকে অনুরোধ করেন। কণ্ঠটি যে তাঁর স্বামীর, এটি বুঝতে জয়মতীর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি এবং আকারে ইঙ্গিতে অবিলম্বে ঐ স্থানটি পরিত্যাগ করতে গদাপাণিকে বলেন। একটি রাজপরিবারের মহিলার উপর প্রকাশ্যে এইরকম নির্যাতনের কাহিনি নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। দীর্ঘ ১৪দিন নীরবে এই বর্বর অত্যাচার সহ্যের পর জয়মতী প্রাণ হারান। পরবর্তী সময়ে সুপাতফা বা গদপাণি সিংহাসন আরোহণ করেন এবং তাঁর পনেরো বছরের রাজত্বকালে (১৬৮১-৯৬) তিনি গদাধর সিংহ নামে পরিচিত ছিলেন। জয়মতী ও গদাধর-এর পুত্র সুখরুংফা বা রুদ্র সিংহর রাজত্বকালে (১৬৯৬-১৭১৪) মায়ের স্মৃতিকে জেরেঙ্গা-পাথরে অক্ষয় করে রাখার উদ্দেশ্যে স্মৃতি-সৌধসহ জয়সাগর জলাশয় ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। ঐতিহাসিক সূর্যকুমার ভুঁইয়া (১৭.৬৮ দ্রষ্টব্য), সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য), রূপ কানোয়ার জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য) সহ আসামের বিশিষ্ট সন্তানরা জয়মতীর কাহিনিকে নানা আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন এবং প্রতিবছর এই মহীয়সী নারীর মৃত্যু দিন ১৩ চৈত্র 'জয়মতী দিবস' উদযাপিত হয়।

জয়মতী শুধু নিজের স্বামীর জন্য নয়, সমকালীন আসামের দেশদ্রোহিতা ও অরাজকতার বিরুদ্ধে যেভাবে নীরব ও অহিংস প্রতিবাদের ভাষা বেছে নিয়েছিলেন সেই কাহিনিতে মুগ্ধ হয়ে সেই সময় গান্ধিবাদী আন্দোলনে প্রভাবিত জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ঐ নামে আসামে প্রথম ছায়াছবি তৈরি করে আর এক দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিলেন ; যদিও ১৯৩০-এর দশকে আসামে ছবিটি সেইভাবে আদৃত হয়নি। জয়মতীর জীবন যেমন বিষাদের, ঠিক তেমনি ছবিটিতে জয়মতীর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন সেই **আইদেও হ্যান্ডিক**-এর নিজের জীবনও সমভাবে মেঘে আচ্ছন্ন ছিল। সেই সময় (১৯৩০-এর দশকে) আসামে মহিলাদের অভিনয় করার রেওয়াজ ছিল না ; পুরুষরাই নাটকে মহিলাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন ; কিন্তু সিনেমায় তো এসব চলে না। জ্যোতিপ্রসাদ সমগ্র আসাম তন্ন তন্ন করে খুঁজে অভিনেত্রীর সন্ধান না পেয়ে শেষে গোলাঘাট থেকে একটা গ্রামের অশিক্ষিতা মেয়ে আইদেওকে (যিনি কোনোদিন অভিনয় করেননি) অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছিলেন। যেহেতু কুমারী আইদেও অভিনয়ের সময় গদাপাণিকে 'স্বামী' বলে সম্বোধন করেছিলেন, এজন্য তিনবার প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও সমাজে তাঁকে অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছিল এবং তাঁর মা পর্যন্ত তাঁকে রান্নাঘরে ঢোকার অনুমতি দিতেন না। নিজের অভিনয় কেমন হয়েছে সেটি দেখারও সুযোগ

দীর্ঘদিন তিনি পাননি। সমগ্র জীবন অবিবাহিতা অবস্থায় কাটিয়ে ২০০২ সালে ৮২ বছর বয়সে তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেন। **এই একটি ঘটনা থেকেই অসমিয়া সমাজে নারীর স্থান বা ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করা যায়।**

১৭.২৮ জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৯০৩-১৯৫১) (Jyoti Prasad Agarwala : 1903-1951)

আসামের লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি হিসেবে খ্যাত রূপ-কানোয়ার জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার, গীতিকার, ফিল্ম-নির্মাতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৮১১ সালে বর্তমান রাজস্থান থেকে মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের নবরঙ্গম আগরওয়ালা ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসামে এসে, অসমিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করে, শেষে একদিন নিজেই অসমিয়া হয়ে গিয়েছিলেন। এই ট্র্যাডিশন ঐ পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মও একইভাবে অনুসরণ করেছিলেন। **আসামের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই আগরওয়ালা পরিবারের অবদান ছিল অসামান্য।** তামুলবাড়ি চা বাগানে পরমানন্দ ও কিরন্ময়ী আগরওয়ালার সন্তান জ্যোতিপ্রসাদের জন্ম হয়েছিল ১৯০৩ সালে। কলকাতা ও আসামের বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনা করে ১৯২১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কলকাতায় স্বদেশি আন্দোলনের সময় সৃষ্ট ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ; কিন্তু আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ার সাথে সাথে ঐ কলেজটিও শেষে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯২৬ সালে জ্যোতিপ্রসাদ ইংল্যান্ডের এডিনবার্গে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে যান। কিন্তু নানা কারণে পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে ১৯৩০ সালে দেশে ফিরে আসেন। ফেরার আগে অবশ্য জার্মানিতে দীর্ঘ সাতমাস থেকে প্রবাসী ভারতীয় হিমাংশু রায় ও তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী দেবীকারানির সহায়তায় চলচ্চিত্র-নির্মাণ, অভিনয়, সংগীত ইত্যাদি সম্পর্কে বিদেশি স্টুডিও থেকে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসেছিলেন। আসামে সেই সময় গান্ধিজির ডাকে আইন-অমান্য আন্দোলনের সূত্রে যাঁরা পথে নেমেছিলেন, জ্যোতিপ্রসাদ তাঁদের অন্যতম। রাজনৈতিক আন্দোলনে সংস্কৃতি কত বড়ো ভূমিকা পালন করতে পারে আসামে জ্যোতিপ্রসাদ তাঁর গানের ডালি নিয়ে তা প্রথম দেখিয়েছিলেন ; যার নজির ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় বঙ্গদেশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃষ্টি করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়ার 'অপরাধে' ১৯৩২-এ জ্যোতিপ্রসাদকে দীর্ঘ পনেরো মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি প্রথম 'জয়মতী' (১৭.২৭ দ্রষ্টব্য) ছবি তৈরির কাজে হাত লাগান। **সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে এটাই প্রথম ছায়াছবি।** সেই সময় আসামে সিনেমা শিল্পের কোনো পরিকাঠামো ছিল না। কিন্তু জ্যোতিপ্রসাদ ভোলাগুড়ি

চা-বাগানে 'চিত্রবান' স্টুডিও তৈরি করে 'সাহিত্যরথী' লক্ষ্মীনাথ (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য) কাহিনি অবলম্বনে এক অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেছিলেন। 'নটসূর্য' ফণী শর্মা (১৭.৪২ দ্রষ্টব্য) মন্তব্য করেছেন, 'চিত্রবান' শুধু একটা স্টুডিও ছিল না, এটা ছিল সিনেমা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। অসাধারণ 'জয়মতী' ছায়াছবিটির তিনি শুধু যে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন একাধারে এই ছবিটির প্রযোজক, পরিচালক, সংগীত রচয়িতা, সংগীত পরিচালক, বেশভূষা থেকে কোরিওগ্রাফি বা নৃত্যলিপি ও সম্পাদনা—সবই তাঁর একক উদ্যোগ। ১৯৩৫ সালে আসামের এই প্রথম ছবিটি মুক্তি পেলেও তেমন একটা আদৃত হয়নি ; কিন্তু ২০০৬ সালে জার্মানির মিউনিখ চলচ্চিত্র উৎসবে কিংবা ইতালির ভেনিস উৎসবে দীর্ঘ সাত দশক আগের ছবি হিসেবে খ্যাতি ও পুরস্কার অর্জনের পর এখন অনেকের টনক নড়েছে। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকার ফলে একটা দাসত্বসুলভ মানসিকতা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। বিদেশি স্বীকৃতি না থাকলে 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না'। একই অভিজ্ঞতা কী রবীন্দ্র-জীবনে কিংবা ১৯৫০-এর দশকে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' প্রদর্শনের সময় পশ্চিমবঙ্গেও দেখা গিয়েছিল ; কারণ ঐ ছবি দেখতে অনেকেই সেদিন আগ্রহী ছিলেন না।

'জয়মতী' ছাড়া আর একটি ছবি 'ইন্দ্রমালতী' ১৯৩৯ সালে জ্যোতিপ্রসাদ নির্মাণ করেছিলেন। আজ জ্যোতিপ্রসাদকে **উত্তর-পূর্ব ভারতে সিনেমা-শিল্পের 'জনক'** আখ্যা দেওয়া হলেও জীবিতাবস্থায় তেমন মর্যাদা তিনি পাননি। অথচ আসামের অভিনয়ের জগতে তিনি যে কেমন 'নীরব বিপ্লব' এনেছিলেন সেটি 'নটসূর্য' ফণী শর্মার স্মৃতিকথায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রচলিত যাত্রার ঢং-এ অভিনয়ের স্থলে তিনি রাশিয়ান চলচ্চিত্র-নির্মাতা লেভ্ কুলেশোভ-কে অনুসরণ করে একেবারে বাস্তবধর্মী কথোপকথনের পক্ষপাতী ছিলেন। বিষয়বস্তু অতীত আসামের কাহিনি থেকে তুলে এনে কীভাবে নাটককে তিনি আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন সেটি তাঁর রচিত অসমিয়া নাটক—যেমন, 'শোণিত কুঁওরি', 'কারেঙ্গার লিগিরি', 'রূপলিম', 'নিমাতি কইন্যা আরু রূপ কানোয়ার', 'সোনাপখিলি', 'ক্ষণিকার', 'কণকলতা', 'লভিতা' ইত্যাদিতে পরিলক্ষিত হয়। একদিকে চিরায়ত এবং অন্যদিকে আধুনিকতা—এই দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ধারার একত্রীকরণ ও মিশ্রণ হল জ্যোতিপ্রসাদের সৃষ্টির সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ।

জ্যোতিপ্রসাদের আগে আসামে হিন্দুস্তানি ক্ল্যাসিকাল ও বাংলা গানের সুরেই শিক্ষিত সমাজে সংগীত চর্চা হত, গ্রামের লোকসংগীতের কোনো মর্যাদা ছিল না। জ্যোতিপ্রসাদ এই ধারাটিকে পুরোপুরি পাল্টে দিলেন। আসামের মাটি থেকে

বিহুগীত, বনগীত, আইনাম, বিয়ানাম, বোরাগী গীত, টোকারি গীত ইত্যাদি তুলে এনে, এমনকি শ্রীমন্ত শংকরদেব প্রবর্তিত বরগীত ইত্যাদির সুরের সাথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং চিরাচরিত কথাকে কিছুটা প্রাসঙ্গিক করার জন্য অদল-বদল করে জ্যোতিপ্রসাদ সঙ্গীতের জগতে 'কামরূপ ঘরানা' সৃষ্টি করলেন যেটি সকলের কাছে **জ্যোতিসংগীত** হিসেবে পরিচিত। তাঁর সংক্ষিপ্ত মাত্র ৪৮ বছরের জীবনে কমপক্ষে ৩০০টি গান তিনি রচনা করেছিলেন এবং সুরারোপের ক্ষেত্রে তাঁর দুই সহোদর কমলাপ্রসাদ ও হৃদয়ানন্দকে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই ঘরানাকে অনুসরণ করেই পরবর্তী সময়ে ভূপেন হাজারিকার (১৭.৫১ দ্রষ্টব্য) মতো শিল্পীরা বিখ্যাত হয়েছিলেন। কবি জ্যোতিপ্রসাদের *লুইতর পারর অগ্নিসুর* (ব্রহ্মপুত্রকে আদর করে 'লুইত' নামে ডাকা হয়) এক অনবদ্য কাব্য যেটি সংকলিত আকারে তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পরে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রূপকথার নায়কের নামানুসারে বিশিষ্ট কবি আনন্দ রাম বরুয়া (১৭.৬ দ্রষ্টব্য) জ্যোতিপ্রসাদকে প্রথম 'রূপ কানোয়ার' নামে সম্বোধন করেছিলেন এবং আজ আসামে তিনি ঐ নামেই পরিচিত। ১৯৩৬ সালে তিনি দেবযানী ভুঁইয়ার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন তাঁর শিল্পী জীবনের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস।

পৌরাণিক কাহিনির উপর ভিত্তি করে ছাত্রজীবনে তাঁর কাব্যধর্মী নাটক 'শোণিত কুঁয়রি' বা শোণিতপুরের রাজকন্যা গ্রন্থটি প্রণয়নের জন্য তিনি অনেকের কাছেই পরিচিত ছিলেন। সেই সময়ে বিখ্যাত ছাত্রনেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী অমিয় কুমার দাশ (১৭.২ দ্রষ্টব্য) এবং লক্ষ্মীধর শর্মা ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সকলেই গান্ধিজি প্রদর্শিত পথে নিবেদিত-প্রাণ যোদ্ধার ভূমিকায় থাকলেও ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় আত্মগোপন করে থাকা কালে জ্যোতিপ্রসাদের চেতনায় পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যিনি একদিন ছিলেন রোমান্টিক এবং অহিংসার পূজারী তিনি ক্রমে হয়ে উঠলেন বিপ্লবী। স্বাধীনতার পূর্বলগ্ন থেকে আই. পি. টি. এ. বা গণনাট্য আন্দোলনের সাথে **'গণশিল্পী' জ্যোতিপ্রসাদের** নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে গেল। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের (১৭.৭৫ দ্রষ্টব্য) সাথে যুক্ত হয়ে জ্যোতিসংগীত হয়ে উঠল লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের মুক্তি সংগীত। তাঁর 'শিল্পীর পৃথিবী'-তে তিনি শিল্পীদের কাছে উদাত্ত আহ্বান রাখলেন ঃ শিল্পের সাথে বাস্তব জীবনের মিলনের মাধ্যমেই প্রকৃত শিল্প সৃষ্টি সম্ভব। যাঁরা মনে করেন, "শিল্প শুধু শিল্পের জন্য" তাঁরা ভুল। রাজনীতির সাথে শিল্পীর বিচ্ছেদ নয় ; বরং শিল্পীরই দায়িত্ব রাজনীতিতে নান্দনিক রূপ দিতে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া। এরই জন্য সেই

সময়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল। আসামে যতটুকু বামপন্থী আন্দোলনের প্রকাশ ঘটেছিল, তার পিছনে এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও একটা ভূমিকা ছিল। জ্যোতিপ্রসাদের প্রথম দিকের নাটকে, গল্পে, ছবিতে অসমিয়া মহিলারা মৃদুভাষী, ধৈর্য ও সহ্যের নির্বাক প্রতিমা ; কিন্তু ১৯৪৮ সালে তাঁর রচিত 'লভিতা'-য় নায়িকার ভিন্ন মূর্তি দেখে কেউ কেউ বিস্মিত হন। আসলে, জ্যোতিপ্রসাদের চেতনার জগতে যে পরিবর্তন এবং তারই সাক্ষ্য তাঁর সৃষ্টি ; এটি হয়তো তেমনভাবে তলিয়ে দেখা হয়নি। জীবনের শেষদিকে তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯৫১ সালের ১৭ জানুয়ারি তামুলবাড়ি চা বাগানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই মহান শিল্পী আসামের অহংকার। তাঁর স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর আসামে ১৭ জানুয়ারি **'শিল্পী দিবস'** হিসেবে উদ্‌যাপিত হয় এবং সরকারি ছুটির দিন হিসেবে গণ্য হয়।

সূত্র ঃ (১) Iswar Prasad Chowdhury, *Jyotiprasad Agarwala*, ('Builders of Modern India' Series), Publications Division, Govt. of India.
(২) Apurba Sarma, *Jyotiparasad as a Film Maker.*

১৭.২৯ ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্য (১৯৩৯-) (Troilokya Bhattacharjya : 1939-)

ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্য সাম্প্রতিককালের অসমিয়া গল্প লেখক ও ঔপন্যাসিক যিনি ইতিহাসধর্মী উপন্যাস লেখায় বেশি আগ্রহী। নওগাঁও-এর আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন কলেজ থেকে ১৯৬৪-তে বি. এ. এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬-তে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেন। অসমিয়া ছাড়াও তিনি বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলতে পারতেন। ফলে, বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর একটা মোটামুটি ধারণা ছিল। কলেজ ম্যাগাজিনে 'ডাক্তারবাবু' নামে একটি গল্প লিখে ছাত্রছাত্রী মহলে সুপরিচিত হন। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য (১৭.৪৯ দ্রষ্টব্য) সম্পাদিত *নবযুগ* সাহিত্য পত্রিকায় ত্রৈলোক্যের লেখা, 'শিলালিপি' নামে একটি ডিটেক্‌টিভ্ ছোটোগল্পও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এরপরই তিনি আসামের অতীত কাহিনির উপর নির্ভর করে গল্প ও উপন্যাস লেখা শুরু করেন। আসামের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্যের ১০টি উপন্যাস, ২৫০ ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি আজও এক জায়গায় সংকলিত আকারে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্পকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক বা কিংবদন্তি-নির্ভর। আসলে,

আহোম যুগের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ বেশি থাকায় ঐতিহাসিক উপন্যাস (শব্দটি বিতর্কিত, কারণ ইতিহাসে কল্পনার স্থান নেই, যদিও উপন্যাস কল্পনা-নির্ভর) লেখার প্রশ্নে তিনি ওয়াল্টার স্কট, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী এবং রজনীকান্ত বরদোলই (১৭.৫৮ দ্রষ্টব্য)-এর প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছিলেন। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে ভিন্নতা—কিছুটা প্লুটার্ক ও শেক্সপিয়রের সৃষ্টির মধ্যে তারতম্যের মতো, কিংবা ডকুমেন্টারি ছবি ও ফিচার ফিল্ম-এর পার্থক্যের মতো। এসব সত্ত্বেও ত্রৈলোক্যের উপন্যাস ও গল্প পাঠককে অতীতমুখী করতে নানাভাবে সাহায্য করে। আহোম রাজাদের সমাধিক্ষেত্রকে নিয়ে তাঁর রচিত *মইদাম* , কিংবা তাঁদের রাজধানীভিত্তিক উপন্যাস *চরাইদেও*, অথবা ভারত-চিন সংঘর্ষের পটভূমির উপর *বুদ্ধদেবর মৃত্যু* ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

যে উপন্যাসটি কেন্দ্র করে ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সেটি হল ঃ *সাঁচিপটর পুঁথি* যেটি ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসটির বিস্তৃতিকাল ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত। ১৮৩৬ সালে বাংলা ভাষাকে আসামের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্রিটিশ সরকার চাপিয়ে দেওয়ার ফলে জনমনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল সেটির জীবন্ত বর্ণনা দিয়ে যেমন উপন্যাসটির সূত্রপাত হয়েছে, তেমনি ১৮৫৭-তে মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্রে আসামের ডিব্রুগড় যে কোনো অংশেই উত্তরপ্রদেশের কানপুরের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না (যদিও ভারতের এই 'প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে' আসামের ভূমিকার উল্লেখ তেমন হয় না)—এই তত্ত্ব দিয়েই উপন্যাসটির যবনিকাপাত হয়েছে। তিনটি ভাগে সমগ্র উপন্যাসটি বিভক্ত ঃ (১) *হে বিদেশি বন্ধু*, (২) *অরুণোদয়*, (৩) *অগ্নিযুগর ফিরিংগতি মই*। যদিও এটিতে বিশেষ একজন নায়ক বা নায়িকা নেই, তথাপি অসংখ্য ছোটো-বড়ো ঘটনা গল্পের চরিত্রের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। প্রথম অংশে আছে Nathan Browne, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা সোফিয়া সহ কার্টার পরিবারের কাহিনি, যাঁরা দিখৌ নদী বেয়ে আপার-আসামে এসেছিলেন। নদীর নিখুঁত বর্ণনায় ভিক্টোরীয় যুগের ইংরাজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই প্রথম পর্বেই সেদিনের আসামের গ্রামের ছবি এবং প্রথম খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত দয়ারামকে আমরা দেখতে পাই। এই প্রথম পর্বের শেষদিকে খামতি বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে মিশনারিরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, এবং পথিমধ্যে সোফিয়ার মৃত্যুর মর্মন্তুদ কাহিনিও পাঠকের মন স্পর্শ করে। দ্বিতীয় পর্বে আছে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের উদ্যোগে প্রথম অসমিয়া পত্রিকা *অরুণোদয়*-এর প্রতিষ্ঠা ও ভূমিকা। যদিও মিশনারিদের প্রধান লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার,

তথাপি অসমিয়া ভাষার উন্নতির প্রশ্নে তাঁদের ব্যাপক ভূমিকার কথা পাঠককে অবগত করাই ছিল ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্যের প্রধান লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)-এর উজ্জ্বল ভূমিকা—যিনি ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এরা অনুকরণে আসামে প্রথম নবজাগরণের সূত্রপাত করেছিলেন—লেখক উল্লেখ করেছেন। আনন্দরামের নিষ্পাপ স্ত্রী মহিন্দ্রীর সাথে দেওরদের মিষ্টি-মধুর ঝগড়ার কাহিনিও স্থান পেয়েছে। সেই সময় অসমিয়া গার্হস্থ্য জীবনের বৈচিত্র্য উপন্যাসটির অন্যতম আকর্ষণ। আসলে, সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই ধরনের উপন্যাস প্রভূতভাবে সাহায্য করে। তৃতীয় পর্বে লেখক শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্'র করুণ জীবনের সাথে আহোম রাজা কন্দর্পেশ্বর সিংহর বন্দি-জীবনের তুলনা করেছেন এবং ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের আগুনে কলকাতার মধু মল্লিক থেকে শুরু করে মণিরাম দেওয়ান, পিয়ালি ফুকনসহ অন্যান্যদের আত্মদানের মর্মন্তুদ কাহিনি মাত্র ৩৩ পৃষ্ঠার মধ্যে জীবন্ত করেছেন। আসলে, সমগ্র উপন্যাসটি যেন আসামের ছবির একটি গ্যালারি।

১৭.৩০ ডিম্বেশ্বর নিয়োগ (নেওগ) (১৮৯৯-১৯৬৬) (Dimbeswar Neog : 1899-1966)

শেক্সপিয়রের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে ঃ *Some are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them.* ডিম্বেশ্বর নিয়োগ প্রথমটির পর্যায়ে পড়েন কারণ তিনি "born genius" বা জন্মসূত্রেই প্রতিভাধর। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও ঐতিহাসিক। মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত বাবা মানিকচন্দ্র নিয়োগ ও মা চন্দ্রপ্রভার জ্যেষ্ঠ পুত্র ডিম্বেশ্বর ১৮৯৯ সালে শিবসাগরের ছোট্ট গ্রাম কামারফাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই ডিম্বেশ্বর অন্য শিশুর তুলনায় কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের ছিলেন। ঐ গ্রামের গাছপালা, নদী-নালা প্রকৃতি তাঁর কাছে ছিল স্বর্গতুল্য। জন্মভূমির উপর তাঁর মমত্ববোধ 'মোর গাঁও' কবিতায় বারবার ধ্বনিত হয়। স্বল্পভাষী ডিম্বেশ্বর ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির এবং একা একা ঘুরে বেড়াতেন। কামারফাড়িয়া প্রাথমিক স্কুলের সহপাঠীরা তাঁকে 'সাগর' বলে সম্বোধন করতেন। প্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে ১৯১০ সালে শিবসাগর ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ১৯১৯-এ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গুয়াহাটির কটন কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯২৪-এ বি. এস.সি. ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি কলকাতা চলে আসেন। ১৯২৬-এ অসমিয়া ভাষায় এম. এ. ছাড়াও পরবর্তী

সময়ে তিনি ইংরেজিতেও এম. এ. করেন। ১৯২৬ থেকেই শুরু হয় সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা এবং আজীবন তিনি স্কুল শিক্ষক হিসেবেই কর্মজগতে ছিলেন। দীর্ঘ প্রায় ৩২ বছরের শিক্ষক জীবন সম্পর্কে তাঁর হতাশা তিনি গোপন রাখেননি। কটন কলেজে পড়ার সময় আসামের বিখ্যাত রোমান্টিক কবি চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (১৭.২২ দ্রষ্টব্য) তাঁর প্রতিভা দেখে প্রকাশনার জগতে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেও ডিম্বেশ্বর সেটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং শিক্ষা জগতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার সংকল্প নেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি সাফল্য পেলেও সহকর্মীদের কাছ থেকে কোনো মর্যাদা পাননি ; কারণ গবেষণা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁরা কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ দেখাতেন না। ধুবরি থেকে লখিমপুর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তিনি কাজ করেছেন, জোড়হাট ও শিলং-এর কলেজে অংশকালীন অধ্যাপনাও করেছেন এবং নর্মাল স্কুলের সুপারিটেন্ডেট হিসাবে ১৯৫৭-তে তিনি অবসর নিয়েছেন ; কিন্তু কোথাও শিক্ষার প্রতি বা নিজের বৃত্তির প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহ বা নিষ্ঠা না দেখে তিনি হতাশ হয়েছেন।

আসামের সাহিত্য ও ইতিহাসের উপর মোট ৯৮টি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। এত গ্রন্থ তাঁর আগে কেউ রচনা করেছেন কি না জানা নেই। তিনি প্রধানত অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের উপর চর্চা করেছেন। তাঁর রচিত দীর্ঘ ৪৬৫ পৃষ্ঠার *New light on history of Asamiya literature* (অসমিয়া ভাষাতেও এটির অনুবাদ আছে) গ্রন্থটির ভূমিকায় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এটিকে *......one of the most comprehensive histories of the literature of Modern Indian Language attempted so far.* হিসাবে বর্ণনা করেছেন। দেশ বিদেশের অনেক বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডিম্বেশ্বরের রচনাকে ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। স্বাধীনচেতা ডিম্বেশ্বর সাহিত্যের অঙ্গনে নিজে যেটিকে সত্য বলে মনে করতেন, শেষদিন পর্যন্ত সেটিই আঁকড়ে থাকতেন এবং অন্য বিরুদ্ধ-যুক্তি মোটেই গ্রাহ্য করতেন না এবং সমঝোতা করতেন না। তাঁর ভাই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহেশ্বর নিয়োগ (১৭.৫৩ দ্রষ্টব্য) নিজের দাদার অসহিষ্ণু চরিত্রের এই দিকটির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করে মন্তব্য করেছেন, এরই জন্য ডিম্বেশ্বরের ভাষা হয়ে উঠত মাঝে মাঝে রীতিমতো রুক্ষ এবং সমালোচকদের আঘাত দিত এবং জনপ্রিয়তা অর্জনও তাঁর প্রত্যাশামতো হয়নি। মহেশ্বর নিয়োগের ভাষায়, *.......an unhappy sense of frustration, however, came into his critical writing more and more, and sometime even vitiated his judgement and made his language too much biting and bitter.*

ডিম্বেশ্বর নিয়োগ-এর মূল বক্তব্য ছিল, গ্রিয়ার্সন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিকরা যদিও মনে করেন, অসমিয়া ভাষার উৎপত্তি মাগধি প্রাকৃত থেকে হয়েছিল, সেটি ঠিক নয় ; বরং অসমিয়া ভাষার জন্ম হয়েছিল কামরূপী প্রাকৃত থেকে। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ডিম্বেশ্বর প্রাক-আহোম অতীত লিপিসহ অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান উপস্থিত করেছিলেন এবং *Indian Historical Quarterly*-র মতো মর্যাদাপূর্ণ পত্রিকায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। আসলে, আসামের সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাস ও বুরঞ্জির আলোচনা নিয়েই তিনি জীবনের একটা বড়ো অংশ ব্যস্ত ছিলেন।

তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে *মল্লিকা, সফুরা, থুপিতারা, ইন্দ্রধনু, মুকুট, মেঘদূত* ইত্যাদি ছিল বিখ্যাত। তাঁর কবিতাগুলি মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত—এক, যৌবনের উচ্ছ্বাস এবং দুই, স্বদেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধে উদ্দীপ্ত। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম অনুসারে তিনি আসামে 'ইন্দ্রধনু কবি' নামে প্রসিদ্ধ। 'সাহিত্যরথী' লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য) মতে, তাঁর কবিতাগুলি ছিল 'সুরেলা'। বাণীকণ্ঠ কাকতি (১৭.৪৩ দ্রষ্টব্য) ডিম্বেশ্বরের *থুপিতারা* (এক গুচ্ছ তারা) কবিতার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। মাঝে মাঝে মজার গল্প বলে এবং শিশু সাহিত্য রচনা করে তিনি ছাত্রসমাজের মন জয় করতেন। অসাধারণ মেধার অধিকারী ডিম্বেশ্বর ছিলেন কাব্য কবিতার জগতে এক নতুন পথের পথিক। লোকসাহিত্যের উপর *অকুল পথিক, বনবেণু, ফাগুনি, ভোগজোরা* ইত্যাদি ১৪টি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি *গাঁও-নগরে* নামে শুধু একটি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে *শিশুলীলা, কুন্দিলা নগর, কামরূপ* উল্লেখযোগ্য। বড়োদের জন্য তাঁর গল্পের বই প্রকৃতপক্ষে একটি এবং সেটির নাম *দীপাবলি*। আসলে, এত সব রচনা সত্ত্বেও তাঁর অসমিয়া সাহিত্যের ইতিহাসকে (*Modern History of Assamese Literature*) সূর্যকুমার ভুঁইয়া (১৭.৬৮ দ্রষ্টব্য) তাঁর 'শ্রেষ্ঠ অবদান' হিসাবে চিহ্নিত করে মন্তব্য করেছিলেন, এটি ছিল ....*author's life-long labours in the study of Assamese literature*. যদিও এইরকম অমূল্য গ্রন্থের জন্য তিনি 'ডক্টরেট' উপাধি পাননি। শংকরদেবের প্রতি ডিম্বেশ্বরের অসীম শ্রদ্ধার নজির তাঁর রচিত অসমিয়া ভাষায় *যুগনায়ক শঙ্করদেব*, কিংবা ইংরেজিতে *Mahapurusiasm–a Universal Religion* গ্রন্থগুলি।

এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত সাদামাটা। ১৯২১-২৪ ডিম্বেশ্বর নিয়োগ ছিলেন 'আসাম ছাত্র সম্মিলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এবং ঐ সংগঠনের মুখপত্র *জন্মভূমি* ও *মিলন* তিনি সম্পাদনা করতেন। ছাত্রদের সাথে

মধুর সম্পর্কের মাধ্যমেই যে শিক্ষক জীবনে সার্থকতা এটি তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি 'অসম সাহিত্য সভা'-র সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন এবং ঐ 'সভা'র নলবাড়ি অধিবেশনে তিনি সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। ১৯৬৬ সালের ১২ নভেম্বর মাত্র ৬৭ বছর বয়সে আসামের এই 'ইন্দ্রধনু কবি' পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

১৭.৩১ তরুণরাম ফুকন (১৮৭৭-১৯৩৯) (Tarunram Phukan : 1877-1939)

হালিরাম ঢেকিয়াল ফুকন এবং আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত তরুণরাম ফুকন ছিলেন আসামের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি **দেশভক্ত** উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালের ২২ জানুয়ারি কামরূপ জেলার গুয়াহাটিতে তাঁর জন্ম। গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষাগ্রহণের পর তরুণরাম লন্ডনের ইনার টেম্পেল ইন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং প্রথমে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে গুয়াহাটির আর্ল ল কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। আসামে 'দেশভক্ত' তরুণরাম ফুকন, 'কর্মবীর' নবীনচন্দ্র বরদোলই (১৭.৩৫ দ্রষ্টব্য) এবং 'লোকপ্রিয়' গোপীনাথ বরদোলই (১৭.২০ দ্রষ্টব্য)—এই 'ত্রয়ী'র নাম একসাথে উচ্চারিত হয় এবং এই তিনজনেই আসামে জাতীয় কংগ্রেসকে নানাভাবে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯২০ পর্যন্ত তরুণরাম ছিলেন 'আসাম অ্যাসোশিয়েসন'-এর একজন প্রভাবশালী সদস্য। জাতীয় কংগ্রেসের তেমন কোনো ভিত্তি আসামে সেই সময় ছিল না। একদিকে মতিলাল নেহরুর সাথে তরুণরামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং অন্যদিকে নবীনচন্দ্র বরদোলই-এর প্রভাবের জন্যই জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের সাথে নিজেকে জড়িত করার অধ্যায় তরুণরামের জীবনে শুরু হয়েছিল। ১৯২১-এ কংগ্রেসের আসাম প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি হওয়ার পর অসহযোগ আন্দোলনের বার্তা আসামের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। গান্ধিজির আসাম পরিভ্রমণ মূলত তরুণরামের উদ্যোগেই সম্ভবপর হয়েছিল। লোভনীয় আইনব্যবসা পরিত্যাগ করে গান্ধি আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যারিস্টার তরুণরাম ১৯২১ সালের ১৮ আগস্ট গান্ধির উপস্থিতিতে তাঁর পাশ্চাত্য পোশাক-পরিচ্ছদের বহ্ন্যুৎসব করে সমগ্র আসামে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। কথিত আছে, দীর্ঘ সাত দিন নাকি ঐ আগুন জ্বলেছিল যাতে অন্যরাও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন। গান্ধিজি সেই সময় আসামে হিন্দিতে বক্তৃতা দিতেন এবং তরুণরাম অসমিয়া ভাষায় সেটি অনুবাদ করে

দিতেন এবং বিভিন্ন সভায় মহাত্মা ও ফুকনের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া হত। এই আন্দোলনের জন্য তরুণরামকে দীর্ঘ একবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়েছিল।

কারাগার থেকে বাইরে আসার পর তরুণরামের জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায়। চৌরি-চৌরা ঘটনার পর হিংসার অজুহাতে গান্ধিজির নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার ফলে অনেকের মতো তরুণরামও হতাশ হয়েছিলেন। আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে গান্ধি-নেতৃত্বের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ১৯২২-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু প্রভৃতি দেশনায়করা গান্ধির ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণের অভিপ্রায়ে 'স্বরাজ্য দল' গঠন করেন এবং তরুণরাম ঐ দলে যোগদান করেন। 'স্বরাজ্য দল'-এর সদস্য হিসেবে তরুণরাম পরপর দু'বার কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন। ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর মতিলাল নেহরু সহ তরুণরাম ফুকনরা আবার জাতীয় কংগ্রেসে ফিরে আসেন। ১৯২৬-এ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের গুয়াহাটি বা পাণ্ডু অধিবেশন তরুণরামের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তরুণরাম ফুকন ছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি। শূন্য তহবিল সত্ত্বেও সমগ্র অধিবেশনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তরুণরামের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাণ্ডু / গুয়াহাটি কংগ্রেসে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কংগ্রেসের অনেক বড়ো মাপের ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকের সাথে তরুণরামের হৃদ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশনের সময় তরুণরাম তাঁর ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করার ফলে তিনি প্রায় কপর্দকহীন হয়ে পড়েছিলেন ; তবু অন্যের কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতেননি। দেশপ্রেমের অনুভূতি কত তীব্র হলে এরকম উদাহরণ সৃষ্টি করা সম্ভব, সেটি বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ১৯২৯ সালে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক লাহোর কংগ্রেসে তিনি সদলবলে (গোপীনাথ বরদোলই, মহেন্দ্রমোহন চৌধুরি, রোহিণীকুমার চৌধুরি, দেবেন্দ্রনাথ শর্মা সহ অন্যান্য অসমিয়া নেতৃবৃন্দ) উপস্থিত থেকে 'পূর্ণ স্বাধীনতার' আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত করেছিলেন। লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি গুয়াহাটিতে ডি. সি-র বাংলো সংলগ্ন জুবিলি ময়দানে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তরুণরাম ফুকন। এটি ছিল আসামের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ১৯৩০-এর দশকে গান্ধিজির নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ

সহ আইন অমান্য আন্দোলনে সমগ্র ভারতবর্ষ যখন উত্তাল সেই সময় তরুণরাম ফুকন ও নবীনচন্দ্র বরদোলই সমগ্র আন্দোলন থেকে হঠাৎ করে অবসর নিলেন। তরুণরাম আইনসভা থেকেও পদত্যাগ করলেন। কী কারণে তরুণরাম ফুকনের মতো অত বড়ো মাপের দেশপ্রেমিক ঠিক ঐ মুহূর্তে সবকিছু থেকে অব্যাহতি নিলেন সেটি গবেষণার যোগ্য।

তরুণরাম ফুকন আসামের প্রথম ব্যক্তি যিনি বাই-সাইকেল চালিয়েছিলেন। গৌহাটি পৌরসভার তিনিই প্রথম বেসরকারি চেয়ারম্যান বা পৌরপিতা। সমাজের অবহেলিত মানুষের কল্যাণার্থে, বিশেষত কুষ্ঠরোগীদের সেবায়, পৌরপিতা হিসেবে তিনি এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যেগুলি ছিল আসামে অভিনব। অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন তরুণরাম এবং তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে অনেক যুবক সেদিন আসামে জাতীয় আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। ১৯২৭-এ গোয়ালপাড়া অধিবেশনে তরুণরাম ফুকন ছিলেন **'অসম সাহিত্য সভা'-র সভাপতি**। ১৯২৮-এ তেজপুরে 'অসম ছাত্র সম্মিলনী'-র ত্রয়োদশ অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে তরুণরামের ভাষণ, অনেকের মতেই, আসামের ছাত্র-যুবদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শুধু পড়াশোনা নয়, ছাত্রদের জাতীয় আন্দোলনের শরিক করার এই উদ্যোগের জন্য সেই সময় একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। শিলচর জেল-এ অবস্থানকালে তাঁর রচিত *স্তুতিমালা*, *যৌনতত্ত্ব*, *মোর শিকারর কাহিনি*, *নিংগনিও ভরারিয়ার গীত* ইত্যাদি অসমিয়া গ্রন্থ নানা কারণে আকর্ষণীয়। একবার দিপারবিল এলাকায় বন্য হাতির আক্রমণে সবকিছু যখন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং শত শত মানুষ ঘরছাড়া, সেই সময় এগিয়ে এসেছিলেন তরুণরাম এবং ৫০টি পাগলা হাতিকে গুলিবিদ্ধ করেছিলেন (যদিও আজকের দৃষ্টিতে এটি হয়তো বেআইনি)। এরই জন্য তরুণরামকে **'আসামের জিম করবেট'** বলা হয়। এমন সময় পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন (২৮ জুলাই, ১৯৩৯) যখন আসামে তাঁর উপস্থিতি ছিল সবচেয়ে বেশি জরুরি। ভারত সরকারের পোস্টাল দপ্তর এই 'দেশভক্ত'কে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য স্ট্যাম্প প্রকাশ করেছে। তাঁর নামে পার্ক সহ আসামে কিছু স্মৃতিচিহ্ন আছে। সম্প্রতি 'আসাম সমাজ সাংস্কৃতিক সংস্থা' কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করেছে 'দেশভক্ত' তরুণরাম ফুকনকে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করা হোক, যেমনটি 'লোকপ্রিয়' গোপীনাথ বরদোলই-এর ক্ষেত্রে হয়েছে।

সূত্র ঃ *তরুণরাম ফুকন রচনাবলী*।

১৭.৩২ দিলীপ শর্মা (১৯২৬-২০০৮) (Dilip Sarma : 1926-2008)

বিখ্যাত গণশিল্পী এবং রবীন্দ্রসংগীত ও জ্যোতিসংগীতের প্রবাদপ্রতিম নায়ক দিলীপ শর্মার জন্ম ১৯২৬ সালের ২৫ জানুয়ারি, অবিভক্ত কামরূপ জেলার পাঠশালা অঞ্চলের বামুনকুচি গ্রামে। পিতা প্রখ্যাত সাংবাদিক ড. দীননাথ শর্মা এবং মাতা রেণু দেবী পুত্রসহ কলকাতায় চলে যান দিলীপের জন্মের কিছুদিন পরেই। কলকাতায় পিতা দীননাথ ১৯২৯ সাল থেকে আসামের প্রখ্যাত সাময়িক পত্রিকা *আবাহন* প্রকাশ শুরু করেন। এই *আবাহন*-কে কেন্দ্র করে কলকাতার বাড়িতে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য), পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া (১৭.৩৭ দ্রষ্টব্য), বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া (১৭.৪৬ দ্রষ্টব্য)-দের মতো খ্যাতনামা অসমিয়া ব্যক্তিত্বদের সমাবেশ হত এবং শৈশব থেকেই দিলীপ এঁদের সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। দিলীপের শৈশব ও কৈশোর কলকাতাতেই কেটেছিল। বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করে ১৯৪২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এবং পরবর্তী সময়ে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে ভর্তি হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) বিভীষিকাময় টাল-মাটাল পরিস্থিতিতে সমাজ জীবনের অনেক কিছুই লন্ডভন্ড হচ্ছিল এবং তারই পরিণতিতে *আবাহন* পত্রিকার প্রকাশনাও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পিতার পত্রিকা দেখাশোনার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে দিলীপ সংগীত-সাধনাকেই জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেন। ১৯৫৪ সালে প্রখ্যাত গায়ক ভূপেন হাজারিকার (১৭.৫১ দ্রষ্টব্য) ভগ্নী (নিরুপমা যিনি পরবর্তী সময়ে সুদক্ষিণা নামে পরিচিতা) সুদক্ষিণার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য), বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা (১৭.৪৭ দ্রষ্টব্য), হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৭.৭৫ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সামনের সারির যোদ্ধাদের সাথে আই. পি. টি. এ. আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চল্লিশের দশকের শেষদিকে দিলীপ শর্মার দুটি গানের রেকর্ড 'মোরে ভারতরে মোরে সপোনরে' এবং 'লুইতর পানি যাবি ঐ বৈ' আসামে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া তাঁর গাওয়া 'ধূলির ধরাত আপোন পাহরি', কিংবা কামরূপী লোক-সংগীতের সুরে 'কুরুয়াই পারে রাও, বলিতে রাগরি কান্দে দুটি বাঘর ছাও', 'ময়ো বনে যাও স্বামী হে নকরা নৈরাশ' ইত্যাদির সাথে আধুনিক বিশ্বের প্রগতিশীল চিন্তাধারা তথা পাশ্চাত্য সংগীতের সুরের ছোঁয়া লক্ষ করা যায়।

দিলীপ শর্মার সমগ্র জীবন ছিল সংগ্রামের। এক সময় গুয়াহাটি বাংলা স্কুলে অসমিয়া ভাষার শিক্ষক, অন্য সময় গানের টিউশন, প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকার ফেরিওয়ালা বা বেতার কেন্দ্রে গানের শিক্ষক ইত্যাদি নানা ভূমিকায় তাঁকে দেখা যায়। স্বচ্ছল জীবনের অধিকারী না হয়েও মুহূর্তের জন্য আদর্শচ্যুত হননি। রবীন্দ্রনাথ ছিল তাঁর আশ্রয়। সমাজতন্ত্র ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন। সংগীতের সাথে প্রগতিশীল চিন্তার প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন অবিচল। খ্যাতির শিখরে পৌঁছোতে না পারলেও জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার জন্ম শতবর্ষ অনুষ্ঠানের (২০০৩) তিনিই ছিলেন সভাপতি ; কারণ জ্যোতিসংগীতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। উগ্র জাতীয়তা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনি অনেকের কাছেই অপ্রিয় হয়েছিলেন ; এজন্য যথাযোগ্য মর্যাদাও তাঁর জোটেনি। এসব সত্ত্বেও জ্যোতিসংগীত চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০২ সালে সংগীত নাটক অকাদেমি এই শিল্পীর প্রতিভাকে মর্যাদা দিয়েছে এবং ত্রিপুরা সরকার ২০০৮ সালের মে মাসে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক হিসাবে তাঁকে পুরস্কৃত করেছে। ১৯৫৩ সালে বিপ্লবোত্তর চিন পরিদর্শনে যে ২৯ জন ভারতীয় শিল্পী গিয়েছিলেন তার মধ্যে আসামের প্রতিনিধি হিসেবে দিলীপ শর্মাও স্থান পেয়েছিলেন এবং নতুন চিন দেখে কীরকম অভিভূত হয়েছিলেন সেটি তাঁর স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাথে তিনি পোল্যান্ড গিয়েছিলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কো বেতার কেন্দ্রে অসমিয়া লোকসংগীত পরিবেশন করেছিলেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তাঁকে 'লিও এক্সপো' শিল্পী সম্মান প্রদান করা হয়। শিল্প ও আদর্শের জন্য এইরকম নিবেদিত-প্রাণ যোদ্ধা বর্তমান ভোগবাদী সমাজে এক বিরল দৃষ্টান্ত। ২০০৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রায় ৮৩ বছর বয়সে গুয়াহাটিতে তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়।

১৭.৩৩ দেবেশ্বর শর্মা (১৮৯৬-১৯৯৩) (Debeswar Sarmah : 1896-1993)

জননায়ক দেবেশ্বর শর্মা ছিলেন আসামের সামনের সারির স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৮৯৬ সালের ১০ অক্টোবর জোড়হাটে তাঁর জন্ম এবং তিনি ছিলেন জোড়হাটের গর্ব। মনে-প্রাণে গান্ধিবাদী নীতিতে বিশ্বাসী দেবেশ্বর কলকাতায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সময় থেকে জাতীয় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২০-তে স্নাতক হওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন-শাস্ত্র পড়ার সময় সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে

তাঁর ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। দেবেশ্বর শর্মা একাধারে সুভাষ-অনুরাগী ও গান্ধিবাদী। ১৯২০ সালে লালা লাজপৎ রাই (১৮৬৫-১৯২৮)-এর সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে দেবেশ্বর ছিলেন স্বেচ্ছাসেবকদের প্রধান। ১৯২০-২২ গান্ধিজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অপরাধে তাঁর তিন মাসের কারাদণ্ড হয়। ১৯৪০-এর দশকে প্রায় চার বছর তিনি বন্দি-জীবনযাপন করেন। ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড আরউইন যখন আসাম পরিভ্রমণ করছিলেন, সেই সময় চন্দ্রকান্ত বরুয়া, সর্বেশ্বর বরদোলই, শংকর বরুয়া প্রভৃতি স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের সাথে দেবেশ্বর শর্মাও ভাইসরয়কে জোড়হাটে কালো পতাকা দেখিয়েছিলেন। ১৯৩৫-এর আইন অনুযায়ী, ১৯৩৯ সালে আসামে যখন প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের সুযোগ আসে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আবুল কালাম আজাদ সরেজমিনে তদন্তের পর সেই সম্ভাবনা বাতিল করে দেন, সেই সময় দেবেশ্বর শর্মার বিশেষ অনুরোধে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু আসামে ছুটে আসেন এবং আজাদের পরামর্শ উপেক্ষা করে আসামে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের পথ পরিষ্কার করে দেন।

দেবেশ্বর শর্মার মতো স্বাধীনতা সংগ্রামী পরবর্তী সময়ে অনেক মর্যাদাপূর্ণ আসন দখল করতে পেরেছিলেন। ১৯৪৬ সালের ১২ মার্চ থেকে ১৯৪৭ সালের ১০ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি ছিলেন আসাম বিধানসভার স্পিকার বা অধ্যক্ষ। জোড়হাট থেকে কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে ভারতের প্রথম লোকসভায় আসামের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এছাড়া তিনি পরবর্তী সময়ে আসাম বিধানসভার সদস্য হয়ে শিক্ষামন্ত্রী হন। গান্ধিবাদী হওয়ার সূত্রে জোড়হাটে অনেক জনহিতকর সমাজসেবামূলক কাজকর্মের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন, যার মধ্যে অন্ধদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, Regional Research Laboratory, বালিকা বিদ্যালয়, জোড়হাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়, জোড়হাট হাসপাতাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সমাজে উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল বেশি। এরই জন্য তাঁকে 'জননায়ক' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। সমাজে উন্নয়ন ও পরিবর্তনের গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এবং জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি সাংবাদিকতার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'জন্মভূমি প্রকাশনী সংস্থা'র উদ্যোগে তিনটি পত্রিকা একইসাথে প্রকাশিত হত। *দৈনিক জন্মভূমি*, *সাপ্তাহিক জন্মভূমি* এবং একটি ইংরেজি দৈনিক। ১৯৯৬ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের পোস্টাল বিভাগ একটি

স্ট্যাম্প প্রকাশ করে। দীর্ঘ ৯৭ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। ১৯৯৩ সালের ১ আগস্ট জননায়ক শর্মা তাঁর কর্মভূমি জোড়হাটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৭.৩৪ নবকান্ত বরুয়া (১৯২৬-২০০২) (Nabakanta Barua : 1926-2002)

আসামের কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য নবকান্ত বরুয়া (যিনি Ekhud Kokaideu হিসেবেও পরিচিত) ২৬ ডিসেম্বর ১৯২৬-এ আপার-আসামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নীলকান্ত ও মাতা স্বর্ণলতা বরুয়ার আরও তিনটি পুত্র ছিল ঃ দেবকান্ত, জীবকান্ত ও শিবকান্ত। প্রথমে নীলকান্ত স্কুল ইনস্‌পেক্টর ছিলেন, পরে শিক্ষক এবং বাসস্থান আপার-আসাম থেকে পুরানিগুদাম এবং শেষে নওগাঁও শহরে স্থানান্তরিত করেন। নবকান্ত নওগাঁও সরকারি স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গুয়াহাটির কটন কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য পড়াশোনায় ছেদ ঘটে। ১৯৪৩ সালে নবকান্ত শান্তিনিকেতনে যান এবং ১৯৪৭ সালে ইংরেজি অনার্স সহ বি.এ. পাস করেন। এরপর আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাস করেন। প্রথমে উত্তরপ্রদেশের একটি কলেজে, তারপর জোড়হাটে জগন্নাথ বরুয়া কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনার পর ১৯৫৪ সালে তিনি কটন কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯৬৪ পর্যন্ত কাজ করেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ আসাম মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর আবার কটন কলেজে ফিরে আসেন। ১৯৮৪ সালে অবসর গ্রহণের সময় তিনি ঐ কলেজের ভাইস্‌-প্রিন্সিপাল ছিলেন।

শিক্ষাব্রতী নবকান্ত অবসর সময়ে লেখালেখি করতেন। তাঁর রচিত ৩৯টি গ্রন্থের মধ্যে ১১টি ছিল কবিতার সংকলন, ৫টি উপন্যাস, বাকিগুলি প্রবন্ধ, ছোটোগল্প ও শিশু সাহিত্য। অবসর গ্রহণের পর ১৯৮৪ সালে তিনি *সিরোলু* /পরবর্তী সময়ে *নতুন সিরোলু* নামে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর সাহিত্য কীর্তির স্বীকৃতি স্বরূপ 'অসম সাহিত্য সভা'র ১৯৯০ সালের বিশ্বনাথ চরিয়ালি অধিবেশনে সভাপতি হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেন। নবকান্ত ছিলেন উচ্চমানের কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ *হে অরণ্য, হে মহানগর, একটি দুটি এগারোটি তারা, যতি, কোকাদিউতার হার* এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শেষ গ্রন্থটির জন্য ১৯৭৫ সালে সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কারে নন্দিত হয়েছিলেন। নবকান্ত'র কবিতার মধ্যে টি. এস. এলিয়টের প্রচুর প্রভাব আছে। এলিয়টের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, কবিতার ভাষা, গদ্যের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হওয়া দরকার এবং এমন আঙ্গিক হবে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত

বোধিকেও রূপ দিতে সক্ষম। স্বভাবতই, নবকান্তর কবিতা সাধারণ পাঠকের কাছে দুরূহ বলে মনে হতে পারে। যেহেতু কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন এবং জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তীর মতো কবিদের সাহচর্য লাভ করেছেন, এরই জন্য তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ঐসব কবিদেরও প্রভাব লক্ষণীয়। কবিতার আঙ্গিককে বারবার তিনি ছন্দ ও ধ্বনির তালে তালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং বদলেছেন। ছন্দগঠনে তিনি মিত্রাক্ষর, অমিত্রাক্ষর দুটিতেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাস্তবের সাথে কবিতার সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং জীবনের বিভিন্ন দিক থেকে রসোদঘাটন করে অসমিয়া কবিতাকে আধুনিক রূপ দেওয়ার কৃতিত্ব তাঁরই। নবকান্ত ছিলেন ভূপেন হাজারিকার (১৭.৫১ দ্রষ্টব্য) ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁর কিছু অসাধারণ কবিতাকে হাজারিকা গানে রূপান্তরিত করেছেন। যেহেতু বিশ্বভারতীতে তাঁর শিক্ষা, এজন্য নবকান্ত বরুয়ার কবিতার মধ্যে গান লুকিয়ে আছে।

কবিতা ছাড়াও তাঁর অন্যান্য লেখার মধ্যে মার্জিত বৌদ্ধিক রূপটি বারবার ফুটে ওঠে। একটি প্রণয়মূলক আখ্যানকে কেন্দ্র করে নবকান্ত বরুয়ার *কপিলী-পরীয়া সাধু* গল্পটি আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণ। কপিলী নদীর গতি-প্রকৃতি প্রায় প্রত্যেক বছরই বদলাত, সেজন্য নদীর পারের জনগণের দুঃখদুর্দশার অন্ত ছিল না। নবকান্ত সেই কথাই একটি প্রেমের কাহিনির উপর ভিত্তি করে অনবদ্য ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের রূপকার হিসেবে ১৯৭৪ সালে 'আসাম প্রকাশনা পরিষদ'-এর পুরস্কার, ১৯৯৩ সালে 'আসাম ভ্যালি লিটারারি অ্যাওয়ার্ড', ১৯৭৬ সালে 'পদ্মভূষণ' ইত্যাদি নানা সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। ২০০২ সালের ১৪ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

১৭.৩৫ নবীনচন্দ্র বরদোলই (১৮৭৫-১৯৩৬) (Nabin Chandra Bardoloi : 1875-1936)

আসামের বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী নবীনচন্দ্র বরদোলই কামরূপ জেলার উত্তর গুয়াহাটিতে ৩ নভেম্বর ১৮৭৫-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাধবচন্দ্র বরদোলই ছিলেন ব্রিটিশ শাসিত আসামের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। মেধাবী নবীনচন্দ্র কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক এবং ১৯০০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসামে ফিরে আসেন। যদিও তাঁর সামনে লোভনীয় সরকারি চাকুরির সুযোগ ছিল, তবু তিনি ব্রিটিশ সরকারের আজ্ঞাবহ দাস হওয়ার চেয়ে স্বাধীনভাবে ওকালতি ব্যবসা ও রাজনীতিতে

অংশগ্রহণ অনেক শ্রেয় বলে মনে করতেন। তিনি প্রথমে গুয়াহাটি আদালতে এবং পরে (১৯০৮-১৮) কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তৎকালীন 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্য হিসাবেই তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯১৪ সালে তিনি 'আসাম অ্যাসোশিয়েসন'-এর সভাপতি পদ গ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯-এর মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের খসড়া রিপোর্টে (১৯১৮) আসামকে পশ্চাদ্‌ভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে প্রাদেশিক মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এরই বিরুদ্ধাচরণ করতে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্দেশ্যে 'আসাম অ্যাসোশিয়েসন'-এর প্রতিনিধি হিসাবে নবীনচন্দ্র বরদোলই ও প্রসন্নকুমার বরুয়া সুদূর লন্ডনে পাড়ি দিয়ে ভারত-সচিব মন্টেগু এবং 'সিলেক্ট কমিটি'র চেয়ারম্যান লর্ড সেলবোর্ন সহ-অন্যান্যদের কাছে আসাম সংক্রান্ত অবমাননাকর ধারাটি সংশোধনের জন্য আবেদন করেন এবং তাঁদের দৌত্য শেষপর্যন্ত সফল হয়। এরফলে নবীনচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

১৯২০-তে সি. বিজয়রাঘবচারিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নাগপুর কংগ্রেসে নবীনচন্দ্র অংশগ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে গান্ধিজি তখন সমগ্র দেশ পরিক্রমা করছিলেন। ঐ সময় 'আসাম অ্যাসোশিয়েসন'-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আসামে তুমুল বিতর্ক শুরু হয় এবং ঐ সংগঠনের সভাপতি হিসেবে নবীনচন্দ্রের উপর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়। নবীনচন্দ্রের উদ্যোগেই তরুণরাম ফুকন সহ অনেকে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে শামিল হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করায় ১৯২১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের আসাম শাখা গঠিত হয় এবং নবীনচন্দ্র বরদোলই সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় নবীনচন্দ্র আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এই আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দেন। ঐ সময় গান্ধিজির আসাম সফরের ফলে আন্দোলনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। ১৯২১-এ নবীনচন্দ্র অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বদানের অপরাধে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৬-এ জাতীয় কংগ্রেসের পাণ্ডু/গুয়াহাটি অধিবেশনে নবীনচন্দ্র ছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক। নবীনচন্দ্র আসাম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-এরও সদস্য ছিলেন, যদিও কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশমতো শেষপর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৩২-এ তিনি গুয়াহাটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (১৯২৯) ২৬ জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবসে' পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে ১৯৩২-এ তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন এবং ১০০ টাকা জরিমানা সহ তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩২-৩৫

কামরূপ লোকাল-বোর্ড এর সভাপতি হিসেবে তিনি গঠনমূলক বেশ কিছু জনহিতকর কাজের সাক্ষ্য রেখে গেছেন। জীবনের শেষদিকে আসামে খাদি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন নবীনচন্দ্র বরদোলই। গান্ধিজির ইচ্ছা অনুযায়ী, 'অল ইন্ডিয়া স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রাদেশিক শাখার আহ্বায়ক ছিলেন নবীনচন্দ্র বরদোলই। সমাজে জাত-পাত ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী নবীনচন্দ্র একাধিক সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কটন কলেজ, আর্ল ল' কলেজ সহ বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের সূত্রে ছাত্রদের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তা বিস্তারে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে 'অসম ছাত্র সম্মিলনী'র সভাপতি হিসেবে তাঁর উদ্দীপক বক্তৃতা বারবার উদ্ধৃত হয়। ১৯৩৪-এ 'সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি'তে নির্বাচিত হয়ে নির্ভীক নবীনচন্দ্র অধিবেশনের শুরুতেই বন্দি শরৎচন্দ্র বসু'র মুক্তির দাবিতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরের জীবনে একাধিক উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য তিন **'কর্মবীর'** ও **আসামের 'মুকুটবিহীন সম্রাট'** হিসেবে সাধারণের কাছে পরিচিত। আসলে **'দেশভক্ত' তরুণরাম ফুকন, 'কর্মবীর' নবীনচন্দ্র বরদোলই এবং 'লোকপ্রিয়' গোপীনাথ বরদোলই—এই 'ত্রয়ী' একত্রে** আসামের সমাজজীবনে উচ্চ আসনের অধিকারী।

বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে ছাত্রদের আলোকিত করার লক্ষ্যে শেক্সপিয়রের তিনটি নাটক নবীনচন্দ্র অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। নবীনচন্দ্র রচিত *গ্যারিবল্ডির জীবনী, গৃহলক্ষ্মী, কৃষ্ণলীলা* ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের গ্রন্থ আসামের সাহিত্যকেও নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। ক্রীড়া ও সংগীতের জগতেও তাঁর কম খ্যাতি ছিল না। এত বিচিত্র গুণের অধিকারী নবীনচন্দ্র বরদোলই ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬-এ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের পোস্টাল দপ্তর একটি স্ট্যাম্প প্রকাশ করে। এইরকম একজন দেশপ্রাণ পিতার কন্যা নলিনীবালা দেবী (১৮৯৯-১৯৭৭) তাঁর পিতার একটি সুন্দর জীবনী লিখেছেন। ঐ গ্রন্থ থেকেই কর্মবীর নবীনচন্দ্র বরদোলই-এর জীবনের কয়েকটি দিক উল্লেখিত হল। প্রসঙ্গত, পিতার আলোকে আলোকিত বাল্য বিধবা নলিনীবালা দেবী আধুনিক কালের অসমিয়া মহিলা কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন।

১৭.৩৬ নিরুপমা বরগোঁহাই (১৯৩২-) (Nirupama Borgohain : 1932-)

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার অন্যতম যোদ্ধা, আদর্শ মা, শিক্ষিকা, সাংবাদিক ও নির্ভীক লেখিকা হিসেবে পরিচিত যাদব ও কাশীশ্বরী তামুলির কন্যা

নিরুপমা তামুলি ১৯৩২ সালে গুয়াহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে উজানবাজার ও পানবাজার এলাকার বিভিন্ন স্কুলে পড়াশেনা করে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিকুলেশন (প্রথম ব্যাচের ছাত্রী), কটন কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হিসেবে আই. এস. সি. পাশ করলেও কলা বিভাগের প্রতিই ছিল তাঁর মূল আকর্ষণ এবং বি. এ. পরীক্ষায় তিনি ইতিহাস ও সংস্কৃতে স্টার মার্কস পেয়েছিলেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, প্রথমে ১৯৫৪ সালে ইংরেজিতে এবং পরে ১৯৫৬ সালে অসমিয়া ভাষায়। পিতা যাদব তামুলি ইনকাম-ট্যাক্স অফিসে প্রধান করণিক হলেও সততা ও উন্নত চেতনার জন্য সমাজে পরিচিত ছিলেন এবং কন্যাকে সব সময় মাথা উঁচু রেখে, স্বাবলম্বী হয়ে, উত্তমর্ণ বা অধমর্ণ কোনোটিই না হয়ে সমাজ-সেবার পরামর্শ দিতেন। অসমিয়া ভাষায় নিরুপমা তাঁর আত্মজীবনী *বিশ্বাস আরু সংসায়র মাজেদি*-তে এইসব স্মৃতিকথা উল্লেখ করেছেন। উদারপন্থী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্যই অন্যান্য সাধারণ মহিলার ঘরোয়া জীবনের তুলনায় নিরুপমার সংগ্রামের কাহিনি ছিল কিছুটা স্বতন্ত্র। পাণ্ডুর নেতাজী বিদ্যাপীঠে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে তিনি নলবাড়ি, লখিমপুর ও জোড়হাটের কলেজে বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপিকা পদে থেকে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

দীর্ঘদিনের প্রেমের পরিণতিতে ১৯৫৮ সালের ১২ মার্চ নিরুপমা আসামের খ্যাতিমান লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পী হোমেন বরগোঁহাই (১৭.৭৭ দ্রষ্টব্য)-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং দুটি পুত্র সন্তানের (অনিন্দ্য ও প্রদীপ্ত বরগোঁহাই) জননী হন। ব্যস্ত স্বামীর সাথে তাঁর বদলি-চাকুরির জন্য মাজুলি দ্বীপ সহ বিভিন্ন স্থানে ঘোরাঘুরির ফলে কোনও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৬৮ সালে তিনি সাপ্তাহিক *নীলাচল* পত্রিকার সাথে যুক্ত হয়ে বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য অনেকের দৃষ্টিই আকর্ষণ করেছিলেন। সত্যের পূজারি নিরুপমা জীবনে কোনোদিন অন্যায়ের সাথে আপোস করতে পারেননি, এরই জন্য তাঁর জীবনে নেমে এসেছিল নানা দুর্যোগ। হ্যান্ডিক কলেজে অসমিয়া ভাষার অধ্যাপিকা পদে ইন্দিরা মিরি তাঁকে চাইলেও ঐ কলেজের নির্বাচক মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের বিরোধিতার জন্য সেটি থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর নিরুপমার জীবনে ঝড় নেমে আসে। ১৯৭৯ সাল থেকে All Assam Students' Union (AASU)-র নেতৃত্বে

দীর্ঘ ৬ বছর আসাম-আন্দোলনের ভয়ংকর দিনে মানবতাবাদী নিরুপমা ছিলেন আসামের একমাত্র মহিলা সাংবাদিক যিনি বিপথগামী যুবকদের এই ভুল পথের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। ১৯৮০ সালে নলবাড়িতে সংখ্যালঘুদের এক আশ্রয় শিবিরে মা-বাপ হারা অগ্নিদগ্ধ এক ছয় মাসের শিশু চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত দেখে স্থানীয় ডাক্তারদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং অশ্রাব্য গালিগালাজের মুখোমুখি হন। *নীলাচল* পত্রিকার সম্পাদকের কাছে এই বার্তা যাওয়ার পর দীর্ঘ ১২ বছরের সাংবাদিকতার চাকুরিটিও তাঁকে খোয়াতে হয়। দুই পুত্রকে নিয়ে বেকার নিরুপমার জীবনে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে। বিভিন্ন কলেজে পড়ানোর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ললিতচন্দ্র ভরালি কলেজে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরিও তাঁর সেদিন জোটেনি। মজা হল, পরবর্তী সময়ে সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য এই কলেজই তাঁকে আবার সম্মানিত করেছিল। জীবনে বার্ধক্য আসা সত্ত্বেও নিরুপমা তাঁর আদর্শে আজও অবিচল এবং তাঁর কাছে মানবতার চেয়ে বড়ো ধর্ম পৃথিবীতে আর নেই। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় পাগলাদিয়া নদীকে তিনি তাঁর সাহিত্যে অমর করে রেখেছেন।

নিরুপমা বরগোঁহাই তাঁর আত্মজীবনী ছাড়া ৩০টি উপন্যাস, ছোটোগল্পের ১৬টি সংকলন, ৩টি প্রবন্ধ সংকলন, ৩টি শিশু সাহিত্য ছাড়াও বিভিন্ন ভাষা থেকে ধ্রুপদী গ্রন্থ অনুবাদ করে অসমিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সম্পাদনায় অসমিয়া সাপ্তাহিক *সাঁচিপট* এবং পাক্ষিক *চিত্রাঙ্গদা* কিছুটা নারীবাদী বলে মনে হলেও বুদ্ধিজীবীমহলে সমাদর পেয়েছে। তাঁর রচিত, *অভিযাত্রী, অন্যজীবন, ইপার হিপার, এই নদী নিরবধি, এই দ্বীপ এই নির্বাসন* ইত্যাদি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানির (১৭.২৩ দ্রষ্টব্য) জীবন অবলম্বনে রচিত তাঁর *অভিযাত্রী* গ্রন্থটি ১৯৮৩ সালে 'হেম বরুয়া পুরস্কার' এবং ১৯৯৬ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার অর্জন করেছে। ১৯৮৭ সালে *অন্যজীবন* উপন্যাসের জন্য ব্যাঙ্গালোরের একটি বেসরকারী সংস্থা থেকে 'শাশ্বতী পুরস্কার' এবং ১৯৮৮ সালে 'অসম সাহিত্য সভা'র 'বাসন্তী দেবী পুরস্কারে'ও তিনি ভূষিত হয়েছেন। অবহেলিত, নিপীড়িতদের নিয়ে সাহিত্য রচনার জন্য ২০০০ সালে প্রবীণা শইকিয়া পুরস্কার, ২০০২ সালে আম্বেদকর পুরস্কার এবং ২০০৩ সালে ত্রিপুরা সরকারের অদ্বৈত মল্লবর্মন পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন।

সূত্র ঃ Nirupama Borgohain, *Abhiyatri : One Life Many Rivers.*

১৭.৩৭ পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া (১৮৭১-১৯৪৬) (Padmanath Gohain Barua : 1871-1946)

আসামে সাহিত্য জগতের 'পিতামহ' এবং ১৯১৭ সালে শিবসাগরে অনুষ্ঠিত 'অসম সাহিত্য সভা'র প্রথম সভাপতি পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া উত্তর লখিমপুর শহরের কাছে নকরি-তে ১৮৭১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থানে একটি বাংলা-মাধ্যম স্কুলে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আহোম-শাসনের যবনিকার পর **আসাম ব্রিটিশ অধিকৃত হওয়ায় ১৮৩৬ সালে অসমিয়া ভাষার স্থলে বাংলা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করা হয়েছিল। এই ব্রিটিশ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চারিদিকে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়ার ফলে ১৮৭১ সালের পর আবার অসমিয়া ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়।** পদ্মনাথের ছাত্রাবস্থায় অসমিয়া ভাষায় শিক্ষার সুযোগ থাকলেও ঐ ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত পুস্তকের অভাব ছিল এবং এরই জন্য তিনি বাংলা-মাধ্যম স্কুলে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। যেহেতু তৎকালীন আসামে উচ্চশিক্ষার কোনও সুযোগ ছিল না, এরই জন্য অন্যান্য কৃতি ছাত্রের মতো পদ্মনাথও কলকাতায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণে এসেছিলেন এবং জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিছু অনিবার্য কারণে বি. এ. পরীক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁকে আসামে ফিরে যেতে হয় এবং প্রথাগত শিক্ষা ত্যাগ করতে হয়। কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে আসামের ছাত্রদের সংগঠিত করে তিনি 'অসমিয়া ভাষার উন্নতি-সাধিনী সভা' নামে একটি মঞ্চ তৈরি করেন, যেটির উদ্দেশ্য নামের মধ্যেই স্পষ্ট। এই সভার মাধ্যমেই 'অসম সাহিত্য সভা'র বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল যেটি আসামে ১৯১৭ সালে আত্মপ্রকাশ করে। অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এই সভার মাধ্যমেই অসমিয়া জাতীয়তাবাদ পল্লবিত হয়। বর্তমানে ঐতিহাসিক জোড়হাট শহরে কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ অসমিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রচারার্থে সমগ্র আসামে ও বাইরে 'অসম সাহিত্য সভা'র প্রায় এক হাজার শাখা আছে। পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া ছিলেন এই 'সভা'র প্রাণপুরুষ ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমা শহরে শিক্ষকতা করার সময় পদ্মনাথ এই সভার একটি শাখা নাগা পাহাড়েও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তেজপুরে শতাব্দী-প্রাচীন বান থিয়েটারের সম্পাদক পদে পদ্মনাথ দীর্ঘ সাত বছর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আসামে তিনিই প্রথম ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব অর্জন করেছিলেন। পদ্মনাথ ছিলেন 'আহোম সভা'র প্রতিষ্ঠাতা এবং আসাম বিধান পরিষদে প্রথম আহোম সদস্য। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ও আকর্ষণীয়।

অসমিয়া ভাষায় পাঠ্য-পুস্তকের অভাব পদ্মনাথ গোঁহাইকে সব সময় পীড়িত করত। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি বন্ধু ফণীন্দ্রনাথ গোগুই-কে সাথে নিয়ে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, নৈতিকতা, স্বাস্থ্য-চর্চা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর পাঠ্য-পুস্তক রচনা ও অনুবাদের কাজে হাত দেন। কিন্তু ফণীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পর তিনি একাই কাজটি সম্পূর্ণ করেন। আসামের স্মরণীয় ব্যক্তিদের জীবন অবলম্বন করে তাঁর লেখা *জীবনী-সংগ্রহ* একটি মূল্যবান ও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। পদ্মনাথ ছিলেন আসামে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টা। আহোম যুগের গৌরবময় কাহিনি অবলম্বনে তাঁর লেখা *লহরী* ও *ভানুমতী* উপন্যাস দুটি যথাক্রমে ১৮৯০ এবং ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি যুক্তিসংগত ভাবেই 'পিতামহ' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। আহোম যুগের আঞ্চলিক কাহিনি অবলম্বনে লেখা তাঁর অনেক ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে *জয়মতী, গদাধর, লাচিৎ বরফুকন, সাধনী* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এককথায়, অসমিয়াদের মধ্যে পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধ সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য। পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে 'বান রাজা' নাটকে তিনি ঊষা ও অনিরুদ্ধ'র প্রেমকে অমর করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। একই সাথে সমাজ-সচেতন পদ্মনাথ ব্রিটিশ শাসনে আসামের সাধারণ মানুষের আর্থিক ও নৈতিক দুর্গতি *গাঁওবুড়া* নাটকে নিপুণ শিল্পীর মত এঁকেছেন। হাস্য-কৌতুক সৃষ্টিতেও পদ্মনাথ একইভাবে পারদর্শী। তাঁর রচিত *তেতোন তামুলি, ভূত নি ভ্রম* নাটক দর্শকদের দমফাটা হাসিতে মাতিয়ে রাখে। অসমিয়া সাহিত্যে পদ্মনাথ গোঁহাই-এর সবচেয়ে বড়ো অবদান *শ্রীকৃষ্ণ* নামে গ্রন্থটির রচনা, যেটি একাধারে 'এপিক' নাটক, জীবনচরিত ও উপন্যাসের এক অসাধারণ সমাবেশ বলে ড. মহেন্দ্র বোরা মন্তব্য করেছেন। ভাগবত, পুরাণ, হরিবংশ, গীতা ও মহাভারত থেকে সংগৃহীত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের বিভিন্ন বর্ণাঢ্য দিকগুলি আধুনিক প্রেক্ষিতে তিনি এমন নিপুনভাবে এঁকেছেন যা সমগ্র অসমিয়া সাহিত্যে অতুলনীয়।

'জার্নালিজম' বা সাংবাদিকতার জগতে গোঁহাই বরুয়া এক নতুন পথের দিশারির সন্ধান দিয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় থাকাকালীন সময়েই কৃষ্ণপ্রসাদ দুয়ারার সাথে যৌথ সম্পাদনায় তিনি মাসিক *বিজুলি* পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনিই এই পত্রিকার সম্পাদক হন এবং তিন বছর এটি স্থায়ী হয় ১৯০১ সালে জয়দেব শর্মার সহযোগিতায় তেজপুর থেকে *অসম বন্টি* নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সূত্রপাত করেন, যাতে সমকালীন ব্রিটিশ সরকারের কাজকর্মের পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনামূলক প্রবন্ধ স্থান পেত। ১৯০৬ সাল থেকে গোঁহাই বরুয়া মাসিক *ঊষা* পত্রিকা প্রকাশ করেন যাতে

হেমচন্দ্র গোস্বামী, সত্যনাথ বোরা, শরৎচন্দ্র গোস্বামী-র মতো তৎকালীন আসামের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ ধারাবাহিকভাবে লিখতেন। জনমত সৃষ্টিতে গোঁহাই বরুয়া সম্পাদিত প্রতিটি পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও তেজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান, আসাম কাউন্সিলের সদস্য, 'আহোম অ্যাসোসিয়েসন'-এর সভাপতি সহ নানা পদে তিনি কাজ করেছেন। এককথায়, পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া ছিলেন একাধারে শিক্ষক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, সমাজ-সচেতন সাংবাদিক, সমাজ-সংস্কারক এবং নতুন যুগের অগ্রদূত। তাঁর ঘুম-ভাঙ্গানি সুরে আসামে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল।

সূত্র ঃ আরতি হাজারিকা, *পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়ার জীবনী* ; চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়া (সম্পাদিত), *পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া*।

১৭.৩৮ প্রমথেশ বরুয়া (১৯০৩-১৯৫১) (Pramathesh Barua : 1903-1951)

ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতিমান অভিনেতা ও পরিচালক প্রমথেশ চন্দ্র বরুয়া (প্রমথেশ বরুয়া নামেই বেশি পরিচিত) আসামের গোয়ালপাড়া জেলার গৌরীপুরের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রভাতচন্দ্র বরুয়া এবং মাতা সরোজবালা সাধারণের কাছে যথাক্রমে গৌরীপুরের রাজা ও রানি হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও মায়ের প্রভাবে ছোটোবেলা থেকেই প্রমথেশের মধ্যে সমাজের অবহেলিত মানুষের প্রতি মমত্ববোধ নানাভাবে পরিদৃষ্ট হয়। মা সরোজবালা ছিলেন শংকরদেবের বৈষ্ণব সত্রের অনুগামী এবং শৈশব থেকে প্রমথেশ ছিলেন নিরামিষাশী। সংস্কৃতির অঙ্গনে আসামের দুই প্রথিতযশা তারকা জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য) এবং প্রমথেশ বরুয়া যথাক্রমে তেজপুর ও গৌরীপুরের বিত্তবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও দু'জনেই স্বল্পায়ু এবং জন্ম-মৃত্যু একই বছরে। ১৯৩৫ সালে আসামের প্রথম ছায়াছবি 'জয়মতী' মুক্তি পাওয়ার পর জ্যোতিপ্রসাদের নাম আসামে ছড়িয়ে পরে। একইভাবে ১৯৩৫ সালে 'দেবদাস' মুক্তি পাওয়ার পর প্রমথেশ বরুয়ার খ্যাতি কলকাতা সহ অন্যত্র গগনচুম্বী হয়। দুজনেই কৃতি ছাত্র এবং বিদেশের শিক্ষা নিয়ে দেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে উন্নত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত দুজনেই সৃজনশীল শিল্পের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কোনও পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ভোলাগুড়ি চা বাগানের মধ্যেই 'চিত্রবান' স্টুডিও তৈরি করে তাঁর সৃষ্টির তাগিদ মেটানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, প্রমথেশ বরুয়া কলকাতায় 'বরুয়া স্টুডিও' তৈরি করেছিলেন। এইরকম অনেক ব্যাপারে

উভয়ের মিল থাকলেও, অমিলও প্রচুর। জ্যোতিপ্রসাদ যেমন আসামের অভ্যন্তরে থেকেই অসমিয়া-মননে একটা উজ্জ্বল স্থান দখল করতে পেরেছিলেন, প্রমথেশ কিন্তু সেটা পারেননি, কারণ তাঁর কর্মজগৎ ছিল কলকাতা বা মুম্বাই-কেন্দ্রিক। ফলে, দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রমথেশ বরুয়ার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও, আসামের অভ্যন্তরে তেমনটি দেখা যায় না। তবে ইদানীং বরুয়ার নামে স্মারক বক্তৃতা ইত্যাদি আয়োজন লক্ষ করা যাচ্ছে।

প্রমথেশের ডাক নাম ছিল 'মণি'। প্রথমদিকে বাড়ির কাছে বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পর কলকাতার হেয়ার স্কুলে নবম শ্রেণিতে প্রমথেশ ভর্তি হন এবং ১৯২০-তে ম্যাট্রিকুলেশনের পর ১৯২৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় অনার্স-সহ বি.এসসি. পাশ করেন। এই সময়ে তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং তাঁকে কিছুদিন আসামের জমিদারির কাজ দেখাশোনা করতে হয়। মায়ের তীব্র ইচ্ছা অমান্য করতে না পেরে কলকাতার বাগবাজারের বৃন্দাবন মিত্র'র বড়ো কন্যা সুন্দরী মাধুরীলতা-র সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই মাধুরীলতাই ছিলেন প্রথমদিকে তাঁর জীবনের দিক্-নির্দেশক এবং ধ্রুবতারা, শীলভদ্র'র (১৭.৬০ দ্রষ্টব্য) মতে, "Cynosure of all eyes"। আসামের লোক-সংস্কৃতির বিখ্যাত গবেষক এবং গৌরীপুরে প্রমথেশ চন্দ্র বরুয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ বীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৭.৫০ দ্রষ্টব্য) মাধুরীলতা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "...Madhurilata *baideo* could speak chaste Goalparia better than any local resident"। অর্থাৎ কলকাতার কন্যা হওয়া সত্ত্বেও মাধুরীলতা বৌদি স্থানীয় মানুষের চেয়ে আরও মার্জিত গোয়ালপাড়িয়া ভাষায় কথা বলতে পারতেন। যদিও পরবর্তী সময়ে প্রমথেশ আরও দুবার বিবাহ করেন (অমলা বরুয়া এবং 'দেবদাস' ছবির নায়িকা তথা সহ-অভিনেত্রী যমুনা বরুয়া) তথাপি মাধুরী'র সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসার। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর তিন স্ত্রীর ছয় পুত্রের মধ্যে সমভাবে তাঁর সম্পদ বণ্টন করে দেন।

১৯২০-র দশকে জমিদারির কাজে এবং ব্রিটিশ সরকারের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে তাঁকে একবার ইংল্যান্ড যেতে হয় এবং সেখানেই প্রথম বিদেশি ছায়াছবির উন্নত মান ও গতি দেখে মুগ্ধ হন। ১৯২৬-এ তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর তিনি জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৩০ সালে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলের প্রার্থী হিসেবে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন এবং ঐ দলের মুখ্য সচেতকের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আসাম রাজনীতিতে

ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং জমিদারির দায়িত্ব তাঁর ভাই প্রকৃতিশ-এর হাতে অর্পণ করে তিনি আসাম ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন এবং সৃজনশীল ছায়াছবি তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত প্রমথেশ বরুয়া ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো।

কলকাতায় প্রথম ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির Indo-British Film Co.-তে কিছু বিনিয়োগ করে অভিনেতার জীবন শুরু করেন। প্রাথমিক অবস্থায় চারটি নির্বাক ছবিতে ছোটবড় কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেন। সেগুলি হল ঃ দেবকী বসু পরিচালিত 'পঞ্চশর' (১৯২৯), ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি পরিচালিত 'টাকায় কী না হয়' (১৯৩০), দেবকী বসু পরিচালিত 'অপরাধী' (১৯৩১) এবং কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত 'ভাগ্যলক্ষ্মী' (১৯৩২)। প্রসঙ্গত, কথাবিহীন এই 'ভাগ্যলক্ষ্মী' ছবিতে বরুয়া 'ভিলেন'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৯৩০ সালে দ্বিতীয়বার তিনি ইউরোপে চলচ্চিত্র শিল্পের কারিগরি দিকগুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের জন্য গিয়েছিলেন এবং সাথে ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শংসাপত্র। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিভিন্ন স্টুডিওতে ঘুরে, বিশেষত প্যারিসের ফক্স্ স্টুডিওতে চলচ্চিত্রে কৃত্রিম আলোর ব্যবহার সহ ছবি তৈরির অন্যান্য কলা-কৌশল সম্পর্কে কিছু কাজ হাতে-কলমে শিখে আসেন। দেশে ফিরে দেখেন ধীরেন গাঙ্গুলির ফিল্ম কোম্পানি নানা আর্থিক সংকটের মুখোমুখি। এই অবস্থায় গাঙ্গুলি, দেবকী বসু ও অন্যান্যদের সাথে নিয়ে ১৪, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে 'বরুয়া স্টুডিও' তৈরি করলেন এবং 'অপরাধী' নির্বাক চিত্রটি ছিল ঐ স্টুডিওর প্রথম ছায়াছবি।

১৯৩২ সালে অভিনয়ের সাথে সাথে চলচ্চিত্র পরিচালনাও তিনি শুরু করেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত তিনি মোট ২১টি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। এর মধ্যে ১৪টি বাংলা এবং ৭টি হিন্দি। ১৯৩৪ সালে তিনি বীরেন্দ্র নাথ সরকারের প্রতিষ্ঠান 'নিউ থিয়েটার্স'-এ বেতনভুক্ত পরিচালক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৩৯ পর্যন্ত বাংলা ও হিন্দিতে মোট ১১টি ছবি পরিচালনা করেন—যেমন, 'রূপলেখা' (১৯৩৪), 'দেবদাস' (১৯৩৫), 'গৃহদাহ' (১৯৩৬ এবং হিন্দি রূপান্তর 'মঞ্জিল'), 'মায়া' (১৯৩৬), 'মুক্তি' (১৯৩৭, বাংলা ও হিন্দি), 'অধিকার' (১৯৩৮, বাংলা ও হিন্দি) এবং 'রজতজয়ন্তী' (১৯৩৯)। যে ছবিটি প্রমথেশ বরুয়াকে গৌরবের শিখরে নিয়ে গিয়েছিল সেটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস', যার পরিচালনা ছাড়াও নাম ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে বাংলায় 'দেবদাস' ছবিটি মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পর ১৯৩৬ সালে কে. এল. সায়গল-কে নাম ভূমিকায় রেখে হিন্দিতে ছবিটি তৈরি করেন। বরুয়ার চলচ্চিত্রের প্রধান ফটোগ্রাফার ছিলেন

পরবর্তী সময়ের বিখ্যাত পরিচালক বিমল রায়। ১৯৩৯ সালে 'নিউ থিয়েটার্স'-এর সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে তিনি স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী 'জিন্দেগী' (১৯৪০), 'শেষউত্তর'/'জবাব' (১৯৪২) ইত্যাদি ছবি প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর বেশ কয়েকটি ছবি অসমাপ্ত অবস্থায় থেকে গেছে। শেষদিকে তিনি 'এম. পি. প্রোডাকশন', 'অ্যাসোসিয়েটেড পিকচার্স' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন।

যৌবনে তিনি আসামের গৌরীপুরে নাটকের ক্লাব করে নানারকম নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ-জীবনকে প্রাণ-চঞ্চল রাখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। একই উদ্দেশ্যে পরবর্তী সময়ে তিনি চলচ্চিত্রকেই জীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নিপাট শিল্পী, প্রতি ইঞ্চে শিল্পী এবং মানবতাবাদী শিল্পী। নির্বাক থেকে সবাক—তাঁর সৃষ্ট সমস্ত চলচ্চিত্র এই মানবিক দিকটির প্রতিই বারবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৭ সাল থেকে আমৃত্যু প্রমথেশ বরুয়া ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের 'সিনে টেকনিসিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি। চলচ্চিত্র ছাড়াও সংগীতচর্চা, খেলাধুলা, শিকার ইত্যাদিতে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। রবীন্দ্র-অনুরাগী প্রমথেশ বরুয়া লন্ডনে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল' নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠানে নৃত্যের মাধ্যমে অভিনয় করেছিলেন। ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে বি.বি.সি. তাঁর দুটি বক্তৃতা ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল। ১৯৪৯ সালে তৎকালীন ভারতীয় হাই-কমিশনার ভি. কে. কৃষ্ণমেনন-এর আমন্ত্রণে বরুয়া লন্ডনের 'ইন্ডিয়া হাউস'-এ তাঁর শিল্পকলা প্রদর্শন করেছিলেন। 'The British Cinematograph Society'-র তিনিই ছিলেন প্রথম এবং একমাত্র ভারতীয় সদস্য। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর যে 'Indian Film Society' তৈরি হয়েছিল, তার আহ্বায়ক ছিলেন প্রমথেশ বরুয়া। ১৯৪৭ থেকেই নানা কারণে তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে এবং ২৯ নভেম্বর, ১৯৫১-এ কলকাতায় তাঁর ১২/৩ ম্যালিন স্ট্রিটের বাড়িতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সূত্র ঃ Shoma A. Chatterji, *P. C. Barua*.

১৭.৩৯ পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া (১৯০৪-১৯৬৪) (Parvati Prasad Barua : 1904-1964)

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে আসামের সাংস্কৃতিক জগতের অন্যতম নক্ষত্রের নাম পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া। একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, আসামের উন্নত সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে তিন 'প্রসাদ'-এর দান অসামান্য। এই তিনজন হলেন,

জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া এবং বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা। জ্যোতিপ্রসাদ ও পার্বতীপ্রসাদের জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে, দুজনেই চা-বাগানের মালিকানার সাথে যুক্ত মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান এবং গান, কবিতা, অভিনয় তাঁদের প্রাণ। অন্যদিকে বেপরোয়া-গোছের বিষ্ণুপ্রসাদ কিছুটা ভিন্ন গোত্রের, যিনি সব সময় বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন এবং তাঁর সাংস্কৃতিক সৃষ্টি সমাজ-পরিবর্তনের জন্যই নিবেদিত। ১৯০৪ সালের ১৯ আগস্ট শিবসাগর জেলার দিখৌ নদীর পাড়ে এক অভিজাত পরিবারে পার্বতীপ্রসাদের জন্ম। বাবা রাধিকা প্রসাদ বরুয়া এবং মা হিমলা দেবী দুজনেই উন্নত রুচির ব্যক্তিত্ব। বরুয়া পরিবার অবশ্য নদীর ভাঙ্গনের জন্য তাঁদের পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করে ৫০ কিমি পূর্বদিকে একই জেলার চরাইদেও মহকুমার সোনারি গ্রামে নতুন গৃহ নির্মাণ করেন। এই সোনারিই ছিল পার্বতীপ্রসাদের কৈশোর ও যৌবনের সৃষ্টির উৎস এবং ওখানেই ৭ জুন, ১৯৬৪-তে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জনগণের কাছে পার্বতীপ্রসাদ 'গীতিকবি' নামেই পরিচিত।

দাদা ভগবতীপ্রসাদ বরুয়া ছিলেন 'আসামের শেলি' এবং ভাই পার্বতী প্রসাদ 'আসামের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ'। এই দুই কবি ভাইয়ের সম্পর্ক এত নিবিড় ছিল যে, গ্রামের মানুষ তাঁদের 'গণেশ-কার্তিক' বলে সম্বোধন করতেন। ১৯২১ সালে শিবসাগর সরকারি বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পার্বতীপ্রসাদ গুয়াহাটির কটন কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন। পার্বতীপ্রসাদ ছিলেন প্রচণ্ড রবীন্দ্রভক্ত। দিনরাত তাঁর রবীন্দ্র সংগীতে উত্যক্ত হয়ে একবার কটন কলেজ হোস্টেলের ছাত্ররা তাঁর বিরুদ্ধে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটানোর অভিযোগ আনেন। হোস্টেল সুপার এইরকম একজন কবি-গায়ক ছাত্রকে মৃদু ভর্ৎসনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যদিও তিনি নিজে ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের একান্ত অনুরাগী। কটন কলেজ থেকে আই.এস.সি. পাশ করার পর পার্বতীপ্রসাদ বিজ্ঞান ছেড়ে দিয়ে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তাঁকে এতই আপ্লুত করেছিল যে, পড়াশোনার চেয়ে সংস্কৃতি-চর্চাই হয়ে উঠল তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। পার্বতীপ্রসাদের কাব্যনাটক *লক্ষ্মী* এবং *সোনার সোলং* প্রতীকী রচনা। নাট্যকার পার্বতীপ্রসাদ শস্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করে ঋতুরঙ্গের অভিনয় লিপিবদ্ধ করেছেন। লক্ষ্মী হচ্ছেন হেমন্তিকার আবাহন, যখন শস্য উৎপাদন শেষে কার্তিকা বিহু ('ভোগালি বিহু') উৎসবে তাঁর জয়যাত্রা উদযাপিত হয়। *সোনার সোলং* হল কিছু সুরসমৃদ্ধ মধুর প্রতীক গীতবল্লরীর সমাবেশ। প্রকৃতির রূপ-পরিবর্তনের সাথে

পার্বতীপ্রসাদ পুরোপুরি মিশে গিয়েছিলেন। তাঁর কাব্যগীতি *ভোগা টুকরির সুর, খেল ভোঙ্গা খেল* অসমিয়া সাহিত্যে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে সদা হাস্যময় এই মুখর কবি-শিল্পীর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন নেমে এসেছিল ১৯৩৩ সালে, যখন তাঁর বয়স মাত্র ৩০ বছর। দুর্গাপুজোর সময় শিবসাগর শহরে একটি নাট্যানুষ্ঠানে অংশ নিতে দাদা ভগবতী প্রসাদ ও পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে পার্বতীপ্রসাদ যাচ্ছিলেন। কিন্তু একটি 'ফেরি'তে ওঠার সময় পার্বতীপ্রসাদ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে, একমাত্র পার্বতীপ্রসাদ ছাড়া সকলেরই সলিল সমাধি ঘটে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া বিষণ্ণ পার্বতীপ্রসাদের বাকি জীবন ও সৃষ্টিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ১৯৫৩ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে বাকি ১১টি বছর বিছানাতেই কাটিয়েছিলেন। এত কষ্ট ও দুঃখের মধ্যেও তাঁর সৃষ্টি কিন্তু থেমে থাকেনি। সংখ্যার দিক থেকে বেশি না হলেও, গুণমানের দিক থেকে পার্বতীপ্রসাদের প্রতিটি সৃষ্টি অনবদ্য। অসমিয়া ছায়াছবির জগতে 'জয়মতী' খ্যাত জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা'র পরেই পার্বতীপ্রসাদের স্থান যদিও তাঁর একটি মাত্র ছবি 'রূপোহি' মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। ঐ ছবিতে নিজে আনন্দ মোহান্তর ভূমিকায় অভিনয় করে ও গান গেয়ে পার্বতীপ্রসাদ অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে রোমান্টিক। শারদ-সন্ধ্যার ঝলমলে তারাখচিত আকাশের নীচে সংগীত ও নৃত্যের তালিম দিতে (তাঁর ভাষায় 'শারদি সন্ধ্যার জোনাকি মেল') পার্বতীপ্রসাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি ছিলেন একাধারে অত্যন্ত উন্নতমানের কবি, নাট্যকার, অভিনেতা, চিত্র-পরিচালক, সংগীত সাধক, নৃতজ্ঞ, অথচ আচার-আচরণে অত্যন্ত সাধারণ, সাদামাটা আকর্ষণীয় জীবনের অধিকারী। তাঁর অসমিয়া কবিতা হিন্দি ও ইংরেজিতে অনুবাদ করে পারমিতা দাশ দিল্লির সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার পেয়েছেন। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন আসামের সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তাতে আরও উন্নত হয়েছে এবং ভারতসভায় সেটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করেছে।

১৭.৪০ পুষ্পলতা দাশ (১৯১৫-২০০৩) (Puspalata Das : 1915-2003)

আধুনিক যুগে যে ক'জন বীরাঙ্গনা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল স্থান দখল করেছেন তার মধ্যে আসামের পুষ্পলতা দাশ অন্যতম। রামেশ্বর ও স্বর্ণলতা

শইকিয়ার কন্যা পুষ্পলতা ২৭ মার্চ, ১৯১৫-তে উত্তর লখিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মা স্বর্ণলতা'র প্রেরণায় এই অগ্নিকন্যা শৈশব থেকেই দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। পুষ্পলতার বয়স যখন মাত্র ৬ বছর সেইসময় 'বানর সেনা'র সদস্য হয়ে তিনি খাদি বস্ত্রকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে 'চরকা সংঘ'র মাধ্যমে প্রচার আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। তাঁর বাবা রামেশ্বর শইকিয়া ব্রিটিশ-শাসিত আসামে সরকারি কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও প্রিয় কন্যার জন্য খাদি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে গুয়াহাটির 'পানবাজার গার্লস্ হাই স্কুল' থেকে পুষ্প বহিষ্কৃত হন। তাঁর অপরাধ ছিল, 'মুক্তি সংঘ'র সম্পাদিকা হিসাবে তিনি ভগৎ সিং-এর ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে সহপাঠীদের নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এ. এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে বি. এ. এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর আসামে ফিরে এসে গুয়াহাটির আর্লি ল কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৪০-এ কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। কিন্তু আইন পরীক্ষা সম্পূর্ণ করার আগে ঐতিহাসিক ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁকে যবনিকা টানতে হয়।

সাহসী পুষ্পলতার দেশপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে ৩০-এর দশকে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গান্ধিজি নিজে তাঁকে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে উৎসাহিত করেছিলেন। পুষ্প ছিলেন মনেপ্রাণে গান্ধিবাদী নীতিতে বিশ্বাসী। তেজপুরে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা'র সাংস্কৃতিক মঞ্চে তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী। তেজপুরে 'মৃত্যু বাহিনী' ও 'শান্তি বাহিনী'র সদস্য হিসেবে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী তাঁরই কথা ছিল গোহপুর থানার মধ্যে ব্রিটিশ পুলিশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জাতীয় পতাকা স্থাপন করার, কিন্তু অনিবার্য কিছু কারণে কনকলতা বরুয়া তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং জাতীয় পতাকা প্রোথিত করার সময় পুলিশের গুলিতে কনকলতা শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। গান্ধিবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুষ্পলতা বারবার কারাবরণ করেছেন। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় আড়াই মাস, ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় সাড়ে তিন বছর তিনি কারাগারে বন্দি ছিলেন। ১৯৪২ সালেই পুষ্পলতা প্রিয়জনের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বিখ্যাত সমাজসেবী ও গান্ধিবাদী নেতা অমিয় কুমার দাশকে (১৭.২ দ্রষ্টব্য) বিবাহ করেন। জেলের মধ্যে অসুস্থ হওয়ার ফলে পুষ্পকে 'প্যারোল'-এ মুক্তির প্রস্তাব

দিলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। একইভাবে স্বাধীনোত্তর ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে তাঁকে যখন তাম্রপত্র গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়, তিনি সেটিও বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পুষ্পলতার বক্তব্য ছিল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেই ধন্য হয়েছেন, বিনিময়ে কিছু স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য নয়। অমিয় কুমার ও পুষ্পলতার যুগলবন্দিতে আসামের মাটিতে গান্ধিবাদী আন্দোলন একটি নতুন মাত্রা পেয়েছিল। পুষ্পলতা 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পূর্বে জাতীয় প্ল্যানিং কমিটির মহিলা সাব-কমিটির সদস্য হিসেবে পুষ্পলতা বেশ কয়েক বছর মুম্বাই-এ ছিলেন। ঐ সময় মৃদুলা সারাভাই, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সহ জাতীয় স্তরের অনেক বড়ো বড়ো সমাজসেবী ও ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং নানারকম গঠনমূলক সামাজিক কাজে তিনি জড়িয়ে পড়েন। স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের একাংশ যখন ব্রিটিশ পরিকল্পনা অনুযায়ী আসামকে পূর্ববঙ্গের সাথে গ্রুপিং-এ সহমত ব্যক্ত করছিলেন, সেইসময় পুষ্পলতা ও অমিয়কুমার দাশ তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েন এবং গোপীনাথ বরদোলই (১৭.২০ দ্রষ্টব্য)-এর নেতৃত্বে এই 'গ্রুপিং'-এর ভয়ংকর পরিণতি (অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে আসামের অন্তর্ভুক্তি) সম্পর্কে সকলকে (বিশেষত জওহরলাল নেহরুকে) সতর্ক করে দেন। এ. আই. সি. সি.-র সদস্যা এবং আসাম কংগ্রেস কমিটির মহিলা শাখার আহ্বায়িকা হিসাবে ঐ সময় পুষ্পলতা দাশের একটি বিখ্যাত বক্তৃতা নানা কারণে স্মরণীয়। যাইহোক, শেষপর্যন্ত গান্ধিজির হস্তক্ষেপের ফলে এইরকম বিপর্যয়কর সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃবৃন্দ পিছু হটতে বাধ্য হন। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর ১৯৫২ থেকে দীর্ঘ দশ বছর তিনি রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন-এর সদস্য হিসাবে ১৯৫৯ সালে পুষ্পলতা দাশ পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং বিশ্ব-রাজনীতির গতিপথ সম্পর্কে অবহিত হন। রাজনীতি ও সমাজসেবার বিভিন্ন অঙ্গন ছাড়া শিল্পী হিসাবেও পুষ্পলতা দাশের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কলেজে ছাত্রী থাকাকালীন সময়ে সংগীত ও নৃত্যের জন্য তিনি সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। মাদ্রাজ ও বিশাখাপত্তনমে পুষ্পলতার 'অমৃতপর্ব' ও 'চিত্রলেখা' নৃত্যনাট্য দেখে অভিভূত তৎকালীন মাদ্রাজের রাজ্যপাল সি. রাজাগোপালাচারী প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। পুষ্পলতা দাশ 'ইস্ট ইন্ডিয়া মোশান পিকচার সেন্সার বোর্ড'-এর সদস্যা হিসেবে অভিনয় জগতের অনেকের সাথেও পরিচিত ছিলেন। আসামের তনয়া হয়েও সর্বভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে তাঁর

চেতনার মান ছিল অনেক উন্নত, যদিও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সাদামাটা। অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা, গান্ধিবাদী পুষ্পলতা দাশ আসাম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃদ্ধা হয়েও সোচ্চার ছিলেন। শেষদিন পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করতেন, স্ত্রীশক্তির ক্ষমতা অপরিসীম, মহিলারা যদি সাহস করে বিভ্রান্ত উগ্রপন্থীদের সঠিক পথে আনার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিতে এগিয়ে আসেন তাহলেই আসাম সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ১৯৭৫ সালে তাঁর স্বামী অমিয় কুমার দাশ প্রয়াত হন। শেষ জীবনটা তিনি কলকাতায় দক্ষিণ সারনিয়ায় তাঁর কন্যার কাছে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে কাটিয়েছিলেন এবং সেখানে ২০০৩ সালের ১৯ নভেম্বর ৮৯ বছর বয়সে তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়।

১৭.৪১ ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ (১৯০৫-১৯৭৭) (Fakhruddin Ali Ahmed : 1905-1977)

ভারতের পঞ্চম রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ প্রকৃতপক্ষে আসামের সন্তান। জাকির হুসেন (১৮৯৭-১৯৬৯)-এর পর আলি আহমেদ ছিলেন **স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্রপতি**। এই দু'জন রাষ্ট্রপতিই তাঁদের পুরো মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রয়াত হন। অবশ্য তৃতীয় মুসলিম রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আবদুল কালাম (১৯৩১-) তাঁর পুরো মেয়াদ (২৫ জুলাই ২০০২-২৫ জুলাই ২০০৭) সম্পূর্ণ করেছিলেন।

ধনী ঘরের সন্তান ফখরুদ্দিনের পিতা কর্নেল জালনুর আলি ব্রিটিশ শাসনাধীন আসামে 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস'-এ কাজ করতেন। কিন্তু একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে কর্নেল-কে আসাম ত্যাগ করতে হয়েছিল। তখন আসামের রাজধানী ছিল শিলং (বর্তমানে মেঘালয়-এর রাজধানী)। শিলং ক্লাবের একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ সাহেবদের কাছ থেকে বেশ কিছু দূরে ভারতীয়দের বসার ব্যবস্থা ছিল যাতে সাহেবদের আভিজাত্য বজায় থাকে। এইরকম বর্ণবিদ্বেষী নীতির বিরুদ্ধে কর্নেল আলি এবং তাঁর সহকর্মী কর্নেল শিবরাম বোরা প্রতিবাদ করেছিলেন এবং এরই ফলস্বরূপ কর্নেল আলি-কে সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে স্থানান্তরিত হতে হয়। অবশ্য এর ফলে, শাপে বর হয়। ঐ অঞ্চলে থাকার সময় দিল্লির লোহারি নবাব পরিবারের সাথে কর্নেল আলির পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় এবং ঐ পরিবারের কন্যা রুকাইয়া সুলতানার সাথে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ ছিলেন তাঁদেরই সন্তান এবং ১৯০৫ সালের ১৩ মে পুরোনো দিল্লির হউজ কাজি এলাকায় তাঁর জন্ম হয়।

প্রথমে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের বোন্দা সরকারি বিদ্যালয়, তারপর তৎকালীন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দিল্লি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপনের পর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালে ফখরুদ্দিন আহমেদকে বিলেত পাঠানো হয়, যদিও তাঁর মা রুকাইয়া সুলতানা পুত্রের এই বিদেশ যাত্রার বিরোধী ছিলেন। সেখানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ক্যাথারিন কলেজে তিনি ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। পিতা কর্নেল আলি'র ইচ্ছা ছিল তাঁর পুত্র আই. সি. এস. হয়ে দেশে ফিরে আসুক, কিন্তু ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ লন্ডনের ইনার-টেমপেল্ থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন এবং ১৯২৮ থেকে অবিভক্ত ভারতের লাহোর হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করলেন। ১৯২৮ সালের অক্টোবরে পিতা-পুত্র একসাথে আসামের গুয়াহাটির কাছে তাঁদের কয়েকশো একর পৈত্রিক সম্পত্তি দেখতে এসেছিলেন। আসামের সাথে দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক এরপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আলি আহমেদের সাথে তৎকালীন আসামের কংগ্রেস নেতৃত্বের যোগাযোগ হয় এবং ১৯৩১ সালে তিনি কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন সময় জওহরলাল নেহরুর সাথে আলি আহমেদের সখ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং প্রধানত নেহরুর পরামর্শেই তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন অধ্যায় নির্দিষ্ট হয়েছিল। তৎকালীন ক্ষমতাশালী 'মুসলিম লিগ' নেতাদের চাপ উপেক্ষা করে আলি আহমেদ 'লিগ'-এর সাথে যুক্ত না হয়ে জাতীয় কংগ্রেস-এর সাথেই অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়লেন। ১৯৩৫ সালে যখন মহম্মদ আলি জিন্না, লিয়াকৎ আলি খান এবং নাজিমুদ্দিন সহ জবরদস্ত মুসলিম লিগ নেতারা তাঁদের প্রার্থীর সমর্থনে আসামে এসেছিলেন সেইসময় প্রতিপক্ষের কংগ্রেস প্রার্থী ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ ভোট যুদ্ধে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এবং মুসলিম লিগ প্রার্থীকে পরাজিত করে আসাম আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর গোপীনাথ বরদোলই-এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারের অর্থ, রাজস্ব ও শ্রম মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন আলি আহমেদ। সেই সময় আসামে প্রবর্তিত Agricultural Income Tax বা কৃষি আয়কর আইন সমগ্র ভারতবর্ষে ছিল প্রথম উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। আসামে বিশাল চা-বাগিচার মালিক ইউরোপীয় সাহেবরা (যাঁরা এতদিন কোনও কর না দিয়ে বিশাল সম্পত্তি ভোগ করতেন), এরফলে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়েছিলেন। যাইহোক, গোপীনাথ বরদোলই মন্ত্রীসভা ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল, কারণ ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার পর ১৯৩৯ সালের ১৬ নভেম্বর বরদোলই মন্ত্রীসভা ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়।

১৯৪০ সালের ১৪ ডিসেম্বর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালানোর সময় আলি আহমেদ গ্রেপ্তার হন এবং এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত এ. আই. সি. সি. অধিবেশনে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষিত হওয়ার পর ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ যখন অধিবেশন থেকে ফিরছিলেন, তখন আবার গ্রেপ্তার বরণ করতে বাধ্য হন এবং ১৯৪৫-এর এপ্রিল পর্যন্ত জেলের অভ্যন্তরে বন্দি-জীবন কাটান। রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫২ সাল পর্যন্ত আলি আহমেদ আসাম সরকারের অ্যাড্ভোকেট-জেনারেল হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৪-১৯৫৭ আসাম থেকে রাজ্যসভার সদস্য এবং ১৯৫৭ সালে রাষ্ট্রসংঘে প্রেরিত ভারতীয় আইনজীবী দলের নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর তিনি আবার আসামের প্রাদেশিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণে এগিয়ে আসেন। তিনি দুইবার (১৯৫৭-১৯৬২ এবং ১৯৬২-১৯৬৭) কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে আসাম বিধানসভার সদস্য হন এবং চালিহা মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব পান। কিন্তু আসাম বিধানসভার মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৯৬৬ সালে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসে ভাঙন দেখা দিলে নেহরু পরিবারের একান্ত অনুগত আলি আহমেদ ইন্দিরা গান্ধির সমর্থনে ব্যাপকভাবে প্রচার আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৭১ সালে আসামের বরপেটা লোকসভা আসন থেকে জয়ী হয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে ইন্দিরা মন্ত্রীসভায় খাদ্য, কৃষি, সমবায়, শিক্ষা, শিল্প ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং ইন্দিরা গান্ধির অন্যতম প্রধান সহযোগী হয়ে ওঠেন। অবশেষে ইন্দিরা সমর্থনপুষ্ট প্রার্থী হিসেবে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৪ সালের ২৯ আগস্ট দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৯৭৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর জীবনাবসান হয়।

ভারতীয় রাজনীতির এক উত্তাল সময়ে ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বড়ো দুটি প্রশ্নে সমালোচনা আজও অব্যাহত। এক, ইন্দিরা গান্ধিকে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ও জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থান থেকে বাঁচানোর জন্য রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত আদেশ অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি, যার ফলে সমগ্র দেশ

জেলখানায় পরিণত হয়েছিল এবং গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরা হয়েছিল। স্বাধীন ভারতের এই কলঙ্কজনক কালো অধ্যায়ের সাথে আলি আহমেদের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুই, আপাতদৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় রাখলেও তাঁর সাম্প্রদায়িক মানসিকতাও সমানভাবে নানা প্রশ্নে পরিলক্ষিত হয়েছিল। তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম সাম্প্রদায়িক হিসাবে চিহ্নিত ও নিন্দিত কিছু শিক্ষিত ব্যক্তিকে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে স্থান দিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এরফলে, জাতীয় কংগ্রেসের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয় নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল। দ্বিতীয় অভিযোগটি অবশ্য বিতর্কিত (এই প্রসঙ্গে ১৯৩৫ সালের আসামের নির্বাচন উল্লেখযোগ্য), তবে প্রথম অভিযোগটির বিরুদ্ধে তেমন সওয়াল শোনা যায় না।

যদিও ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ প্রধানত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবেই পরিচিত, তথাপি তাঁর জীবনের অন্য দিকগুলিও আকর্ষণীয়। খেলাধুলার জগতেও তাঁর একটা স্থান আছে। টেনিস ও গলফ্ খেলোয়ার হিসাবে তাঁর পরিচিতি উপেক্ষণীয় নয়। তিনি বহুবার 'আসাম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন', 'আসাম ক্রিকেট অ্যাসোশিয়েশন'-এর সভাপতি এবং 'আসাম স্পোর্টর্স্ কাউন্সিল'-এর সহ-সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন। ১৯৬৭ সালে তিনি 'অল ইন্ডিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬১ সাল থেকে তিনি দিল্লির 'গলফ্ ক্লাব', 'জিমখানা ক্লাব' ইত্যাদির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মির্জা গালিবের কবিতা সহ ধ্রুপদী সংগীত ও নৃত্যের প্রতি ছিল তাঁর দুর্বলতা। রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে ও পরে তিনি ইউরোপ, আমেরিকা ও আরব দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বারবার পরিভ্রমণ করার ফলে তাঁর একটা বিশ্ব-দৃষ্টি ছিল। মায়ের পরিচয়ের সূত্রে তিনি নিজেকে মুঘলদেরই একজন বলে মনে করতেন এবং ধোপ-দুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ, মার্জিত ও উন্নত রুচির আচার-আচরণে তিনি সবসময় সচেতন থাকতেন। ফলে, তাঁর মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন খুব একটা বিচিত্র নয়। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিতা ২১ বছরের যুবতী আবিদা'র পাণিগ্রহণ করেন (৯ নভেম্বর ১৯৪৫) এবং উভয়ের দাম্পত্য-জীবন অত্যন্ত সুখের ছিল। ১৯৭৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ-এর মৃত্যুর পর ১৯৮১ সালে উত্তরপ্রদেশের এক লোকসভা উপ-নির্বাচনে বেগম আবিদা সাহেবা প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। আলি আহমেদ-এর মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক ও তার বিভাগের উদ্যোগে ভারতের পঞ্চম রাষ্ট্রপতির

নামে একটি ডাক-টিকিট প্রকাশিত হয় এবং ২০০৫ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

সূত্র ঃ M. A. Naidu, *Fakhruddin Ali Ahmed* (Paper back), 1975.

১৭.৪২ ফণী শর্মা (১৯০৯-১৯৭৮) (Phani Sarma : 1909-1978)

আসামের বিখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা, চিত্র-পরিচালক ফণী শর্মা তেজপুরের বান থিয়েটারের দ্বাররক্ষক হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। তাঁর পিতা মোলান শর্মা অভিনয়ের সাথে যুক্ত থাকার কারণে শৈশব থেকেই থিয়েটার ছিল তাঁর প্রাণ। অসাধারণ এই অভিনেতা **নটসূর্য** উপাধিতে ভূষিত, যদিও সকলের কাছে তিনি 'বোলিন' নামে পরিচত ছিলেন। একসময় তেজপুর ছিল আসামের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পীঠস্থান। শুধু ফণী শর্মা একা নন, রূপ-কানোয়ার জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য), কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা (১৭. ৪৭ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীরা তেজপুরের মাটিতেই তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শন করে বিখ্যাত হয়েছেন। ১৯২৮ সালে বনা-থিয়েটারে ফণীবাবু প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান *রাণা প্রতাপ* নাটকে মুঘল সম্রাট আকবরের ভূমিকায় অভিনয় করার। এরপর আর তাঁকে পিছনের দিকে তাকাতে হয়নি। নাট্যাচার্য ব্রজনাথ শর্মার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাম্যমাণ নাট্যসংস্থা 'কোহিনুর অপেরা'তে যোগ দিয়ে সমগ্র আসামের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি তাঁর নাট্যকলা প্রদর্শনের সুযোগ পান এবং জনচিত্ত জয় করেন। তাঁরই উদ্যোগে ব্রজনাথবাবু স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করার জন্য ১৯৩১ সালে মহিলাদের আমন্ত্রণ জানান (এর আগে পুরুষদেরই স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করতে হত)। আসামের তৎকালীন সমাজ-কাঠামোর প্রেক্ষিতে থিয়েটার শিল্পে এটি ছিল এক নীরব বিপ্লব। ঐতিহাসিক নাটক-রচনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে আসামের অতীত সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়েই ফণী শর্মা থিয়েটার ও সিনেমায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৩৫ সালে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা পরিচালিত আসামের প্রথম ছায়াছবি *জয়মতী*তে তিনি 'ভিলেন' চরিত্র গথি হাজারিকার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করে অনেককেই বিস্মিত করেছিলেন। *দেবদাস* ছায়াছবিতে এবং জ্যোতিপ্রসাদের দ্বিতীয় ছবি *ইন্দ্রমালতী*তেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা'র সাথে যৌথভাবে দেশপ্রাণ লক্ষ্মীধর শর্মার কাহিনি অবলম্বনে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীকে কেন্দ্র করে *সিরাজ* ছবিটি প্রস্তুত করেছিলেন। নাম ভূমিকায় তাঁর অসাধারণ অভিনয়ের জন্য অনেকের কাছে তিনি 'সিরাজ' নামেই পরিচিত। ১৯৫৫-তে ফণী শর্মা অভিনীত ও পরিচালিত *পিয়োলি ফুকন* এবং ১৯৬৩-তে

ব্রজেন বরুয়া রচিত ও তাঁর অভিনীত *ইতো সিতো বহুতো* (এটি ওটি সবকিছু) নামের হাস্যরসাত্মক ছবি (তাঁর জীবনের শেষ ছবি) আসামের সিনেমা-শিল্পকে মর্যাদার আসনে নিয়ে গেছে।

আসামে Indian People's Theatre Association বা IPTA আন্দোলন ১৯৪৬ সাল থেকে উদ্দীপক সাংস্কৃতিক আলোড়ন সৃষ্ট করেছিল প্রধানত বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা এবং ফণী শর্মা'র নেতৃত্বেই। ১৯৫৭ সালে *ভোগজারা* নাটকে সবচেয়ে নিন্দিত আহোম রাজা লক্ষ্মী সিংহ'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের অন্ধকার দিকগুলির প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক সূর্যকুমার ভুঁইয়া (১৭.৬৮ দ্রষ্টব্য) রচিত *কুঁয়র বিদ্রোহ* থেকে ফণী শর্মা কাহিনিটি সংগ্রহ করেছিলেন। IPTA আন্দোলনের জন্যই তিনি *শোনিত কুঁওরি, কিয়া, কারেঙ্গার লিগিরি, লোভিতা* ইত্যাদি নাটক রচনা করেছিলেন। অভিনয়ই ছিল ফণী শর্মার প্রাণ। বিনিময়ে কোনও সরকারি খেতাব বা সামাজিক মর্যাদা না পেলেও এই 'নটসূর্য' জনচিত্ত জয় করে ৬৯ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও আজও তাঁর নাম অমর হয়ে আছে।

১৭.৪৩ বাণীকান্ত কাকতি (১৮৯৪-১৯৫২) (Banikanta Kakoti : 1894-1952)

আসামের দুই স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব—সূর্যকুমার ভুঁইয়া (প্রখ্যাত ঐতিহাসিক) এবং বাণীকান্ত কাকতি (প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ) একই সনে (১৮৯৪) জন্মেছিলেন। তবে অধ্যাপক ভুঁইয়ার পিতার প্রভাব ও প্রতিপত্তি সূর্যকুমারের চলার পথকে যেভাবে সাহায্য করেছিল, বাণীকান্ত'র ক্ষেত্রে কিন্তু সেটি হয়নি। বরপেটা জেলার বাটিকুরিহা গ্রামে বাণীকান্ত ১৫ নভেম্বর, ১৮৯৪-এ জন্মগ্রহণের আগেই তাঁর পিতা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। পিতৃহারা দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রামীণ পরিবারের সন্তান হয়েও শুধুমাত্র মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে তাঁর জীবনযাত্রা শুরু করেছিলেন। ১৯১১-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি আসাম উপত্যকায় প্রথম এবং ১৯১৩-তে আই.এ. পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান দখল করেছিলেন। বি.এ. পরীক্ষায় তাঁর আশানুরূপ ফল না হলেও, এম. এ. (ইংরেজি) দুটি গ্রুপে 'এ' এবং 'বি' তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন এবং 'বি' গ্রুপে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। এইরকম একজন কৃতি ছাত্রের সামনে লোভনীয় অনেক সুযোগ থাকলেও বাণীকান্ত গবেষণা ও অধ্যাপনাকেই তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে বেছে নেন এবং ১৯১৮-তে গুয়াহাটির

কটন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এই ব্যাপারে সূর্যকুমার ভুঁইয়া ও বাণীকান্ত কাকতির মধ্যে বেশ মিল লক্ষ করা যায়। বাণীকান্তর মতো একজন গরিব ছাত্রের পক্ষে সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল আসামের তৎকালীন ডি.পি.আই. J. R. Cunningham-এর বদান্যতার জন্য যিনি ঐ ছাত্রের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা লক্ষ করেছিলেন।

যদিও বাণীকান্ত ছিলেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, তথাপি ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে তিনি অসমিয়া ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের উপর গবেষণা করেছিলেন। আসলে, সুনীতিকুমারের বিস্ময়কর সৃষ্টি *Origin and Development of Bengali Language (ODBL)*-এর মতো কিছু কাজ করতে পারলে মানব-জীবন যে সফল ও সার্থক হতে পারে, এটি বাণীকান্ত কাকতি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণীকান্ত পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন (অসমিয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে তিনিই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. প্রাপ্ত হন) তাঁর গবেষণা গ্রন্থ *Assamese : Its Formation and Development*-এর জন্য (গ্রন্থটি তিনি Cunningham-কে উৎসর্গ করেন)। এই থিসিসের অন্যতম পরীক্ষক ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Jules Bloth বিস্মিত হয়েছিলেন, এইরকম অসাধারণ আকর-গ্রন্থ কীভাবে আসামের মতো দুর্গম অঞ্চলে বসে সম্ভব! **একটি ধারণা এতদিন প্রচলিত ছিল, অসমিয়া ভাষা আসলে বাংলা ভাষারই একটি শাখা। কিন্তু বাণীকান্ত এই প্রচলিত ধারণাটি যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে নস্যাৎ করে দেন**। তিনি দেখিয়েছেন যে, বর্তমান বাংলা ও অসমিয়া কথ্যভাষার পূর্বযুগে আরও কতকগুলি কথ্যভাষা ছিল, যেগুলি প্রাচ্য মাগধী অপভ্রংশের মধ্যে পরিগণিত। যুগের বিবর্তনে প্রত্যেক কথ্যভাষাই নিজের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। এইভাবে অসমিয়া ভাষা, আসামের স্বাধীন নৃপতিদের সহযোগিতায় সমাজ জীবনের সর্বস্তরে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাণীকান্ত বর্তমান 'আসাম' (ইংরাজি) বা 'অসম' নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার সময় দেখিয়েছেন, আসলে শব্দটি পূর্ববর্তী কালের 'অচম' শব্দের সংস্কৃতায়ন। তাই-আহোমদের ভাষায় 'চম' শব্দের অর্থ বিজিত হওয়া। অসমিয়া ভাষার সূচনায় 'অ' 'আ' হয়ে গেলেও 'আসাম' বা 'আচাম'-এর অর্থগৌরব ক্ষুণ্ণ হয়নি, অর্থাৎ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরাজয়বিহীন' বা 'বিজয়ী'। এই সূত্রে কেউ কেউ অবশ্য তর্ক করেছেন যে, বিজয়ীদের নামই ('আহোম') ক্রমে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিজিত ভূখণ্ড ঐ নামে অভিহিত হয়।

বাণীকান্ত কাকতি কটন কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, কিন্তু অধ্যক্ষের কাজের চেয়ে গবেষণার কাজে ছিল তাঁর অনেক বেশি আকর্ষণ। ১৯৪৮-এ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনি ঐ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমিয়া ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান হিসাবে যোগ দেন। *চেতনা* নামে একটি অসমিয়া পত্রিকায় তাঁর প্রাচীন অসমিয়া সাহিত্য সম্বন্ধে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে 'সাহিত্য আরু প্রেম' উল্লেখযোগ্য। কাকতির বিভিন্ন গ্রন্থ বা প্রবন্ধের আকর্ষণ শুধু ভাষাবিদের আলোচনা বা অনুসন্ধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি সেই ভাষার রূপ ও ঐশ্বর্যের দিকেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেমন দেখা যায়; *পুরানি কামরূপর সাহিত্য* গ্রন্থে। সবচেয়ে বড়ো কথা হল, ইতিহাসের একনিষ্ঠ গবেষকের মতো তিনি যে সময়ের চিত্র আঁকছেন, তখনকার সামাজিক, ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও তার স্রষ্টাদের লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরছেন এবং ঐ বিশেষ যুগের মর্মবাণীকে উদ্ধারের চেষ্টা করছেন। আজকের দৃষ্টিতে অতীতের সামগ্রিক প্রকৃত মূল্যায়ন যে সম্ভব নয়, এটি তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Mother Goddess Kamakhya*-তে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে মধ্যযুগে শৈবধর্মের সাথে তান্ত্রিকবাদ কিংবা তথাকথিত 'আর্য' ও আদিম বিশ্বাস মিশ্রিত হয়ে এক বিচিত্র রূপ গ্রহণ করেছে। তিনি *কলিতা জাতির ইতিবৃত্ত,* ইংরেজিতে শংকরদেবের জীবন ও দর্শন সংক্রান্ত *Vishnuvite Myths and Legends,* কিংবা অসমিয়ায় *পুরানি কামরূপর ধর্মর ধারা,* মাধবদেবের 'নামঘোষা'র মূল্যায়ন ইত্যাদি নানা স্বাদের গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখেছেন, যেগুলির বেশিরভাগ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ Department of Historical and Antiquarian Studies (DHAS) প্রকাশ করেছে।

গুয়াহাটির দক্ষিণ উপকণ্ঠে রেহাবাড়িতে যখন বাণীকান্ত তাঁর গৃহনির্মাণ করেছিলেন তখন সকলেই খুব বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ জায়গাটি ছিল বনজঙ্গলে আকীর্ণ, রাস্তাঘাট, বসতি ইত্যাদি কিছুই প্রায় ছিল না। কিন্তু ঐ রেহাবাড়ির নির্জনতাই ছিল তাঁর কাছে বড়ো আকর্ষণ এবং ওখানে থেকেই তাঁর গবেষণায় তিনি ডুবে থাকতেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর ঐ রেহাবাড়িতেই কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক, বিষ্ণুরাম মেধি, অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া সহ অনেক অসমিয়া দিকপাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সাথে নানা ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতেন। ১৯৫২ সালের ২৫ নভেম্বর তাঁর জীবনাবসান হয়।

১৭.৪৪ বিপিনপাল দাস (১৯২৩-২০০৫) (Bipinpal Das : 1923-2005)

একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী, দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান, লেখক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে বিপিনপাল দাসের খ্যাতি আসামের বাইরেও প্রসারিত। ১৯২৩ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটিতে তাঁর জন্ম। ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী বিপিনপাল গুয়াহাটির কটন কলেজ, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং অবশেষে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম.এসসি. ডিগ্রি অর্জন করে আসামে ফিরে আসেন। বাবা সন্তপাল দাস ও মা আরতী দাস তাঁদের এই সন্তানটিকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখতেন। ১৯৪২-এ জাতীয় আন্দোলনের প্রবল স্রোতে অনেকের মতো বিপিনপালও ভেসে গিয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ নেওয়াই হয়ে ওঠে তাঁর প্রথম ব্রত। কামরূপ জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে ঘুরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিকে কোনোভাবে সাহায্য না করার জন্য তিনি শক্তিশালী জনমত গঠন করতে পেরেছিলেন। আত্মগোপন করে থাকার সময় অন্য চারজন যুবকের সাথে তিনি গ্রেপ্তার বরন করতে বাধ্য হন। জেল থেকে মুক্তির পর তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস স্যোসালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। স্বাধীনতার পর ১৯৫২-৫৪ তিনি ছিলেন 'প্রজা স্যোসালিস্ট পার্টি'র (পি. এস. পি.) আসাম শাখার সভাপতি, ১৯৫৪-৫৫-তে সারা ভারত 'পি. এস. পি.'র যুগ্ম সম্পাদক এবং ১৯৫৬-৫৭-তে সারা ভারত স্যোসালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। আসামের মানুষ হয়েও যৌবনে তিনি এইভাবে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যেটি তাঁর নিজের সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল।

শিক্ষাবিদ হিসাবে বিপিনপাল দাসের অভিজ্ঞতা কম ছিল না। এম. এস. সি. পাশ করার পর ১৯৪৫ সালে কলকাতার আশুতোষ কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর ১৯৪৭ সালে তিনি তেজপুরের দরং কলেজে চলে আসেন এবং ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৮ ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। এই দরং কলেজেই বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক অমলেন্দু গুহ (১৭.১ দ্রষ্টব্য) অধ্যাপনা করতেন। ঐ কলেজে সৃজনশীল কাজে অনেক অধ্যাপকই নিযুক্ত থাকতেন। অসমিয়া জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির শিকড় সন্ধানে বিপিনপাল দাসের লেখা *In Search of Identity* একইভাবে আকর্ষণীয়। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিপিনপালের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা এবং বুদ্ধিজীবী হিসাবে উঁচু মাপের।

১৯৭০ সালের মার্চ মাসে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে রাজ্যসভার সদস্য হন এবং ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে কংগ্রেস সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ঐ বছরেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারতীয় ডেলিগেশন-এর সদস্য হয়ে বিদেশে পাড়ি দেন। ১৯৭৪ সালে বিপিনপাল দাস বৈদেশিক দপ্তরের ডেপুটি মিনিস্টারের পদ গ্রহণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের সুযোগ পান। ১৯৭০ থেকে ১৯৮২ দীর্ঘ বারো বছর তিনি আসামের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন এবং ১৯৭৭-৭৯ রাজ্যসভায় কংগ্রেস দলের চিফ্ হুইপ্। সুদক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ২০০৫ সালের ৩ জুলাই ৮২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৭.৪৫ বিমলাপ্রসাদ চালিহা (১৯১০-১৯৭১) (Bimala Prasad Chaliha : 1910-71)

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গান্ধিবাদী নেতা বিমলা প্রসাদ চালিহা স্বাধীনোত্তর ভারতে আসামের তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রীর পদে ১৯৫৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭০ সালের ৬ নভেম্বর পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর আগে গোপীনাথ বরদোলই (১৭.২০ দ্রষ্টব্য) ও বিষ্ণুরাম মেধি (১৭.৪৮ দ্রষ্টব্য) মন্ত্রীসভারও তিনি সদস্য ছিলেন। নানা কারণে তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বকাল ঘটনাবহুল এবং তাঁর ভূমিকা বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী রবিন কলিতা তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন ধনী চা-বাগান মালিকের সন্তান হয়েও যেভাবে বিমলাপ্রসাদ গান্ধিজির ডাকে সাড়া দিয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন এবং খাদি, মৌ-পালন ও কুটির শিল্পের উপর একাধিক গ্রন্থ লিখে মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছিলেন—সেটি যদি শেষজীবন পর্যন্ত রক্ষা করতে পারতেন এবং পার্লামেন্টারি ও ক্ষমতার রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন—তাহলে হয়তো তিনি একদিন মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র)-এর মতো আসামের অবহেলিত মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থান পেতেন এবং নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারতেন। তা কিন্তু হয়নি। কী আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে, কী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে, তিনি বারবার জটিল অবস্থার মুখোমুখি হয়ে মুক্তির পথ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জন্যই তিনি তাঁর নিজের কেন্দ্র শিবসাগরে একবার পরাজিত হয়ে শেষে বাঙালি-প্রধান এবং মুসলিম প্রভাবিত বদরপুর কেন্দ্র থেকে একটি উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে আসাম বিধানসভায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অথচ তিনিই একদিন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে দলে দলে মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে অসমিয়াদের অস্তিত্ব কীভাবে বিপন্ন হচ্ছে সেই প্রশ্নে

সবচেয়ে বেশি সরব ছিলেন। বিমলাপ্রসাদ চালিহা ঘোষণা করেছিলেন ১৯৫১ সালের জানুয়ারির পর যারা আসামে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের তিনি বলপ্রয়োগ করে হটিয়ে দেবেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু'র 'ধীরে চলো' পরামর্শকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে 'Prevention of Infiltration from Pakistan (PIP) ACT 1964' চালু করার সময় তিনি প্রায় 'যুদ্ধং দেহি' মানসিকতা দেখিয়েছিলেন। অথচ যে মুহূর্তে তাঁরই দলের ২০ জন মুসলিম এম. এল. এ. হুমকি দিলেন, অবিলম্বে এই অভিযান বন্ধ না করলে তাঁরা মন্ত্রীসভার পতন ঘটাবেন, সঙ্গে সঙ্গে কালক্ষেপ না করে PIP আইনটিকে তিনি হিমঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

বিমলাপ্রসাদ চালিহার মুখ্যমন্ত্রীত্ব কালেই সার্কুলার জারি করে অসমিয়া ভাষাকে বাঙালি-অধ্যুষিত বরাক উপত্যকা সহ আসামের সর্বত্র শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাধ্যতামূলক করার সাথে সাথে বরাক উপত্যকায় প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। **১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর রেল স্টেশনের কাছে আসাম পুলিশ গুলি চালায় এবং আন্দোলনকারীদের মধ্যে ১১ জন নিহত হয়। এই ১১ ভাষা-শহিদকে** কেন্দ্র করে গভীর আবেগ সৃষ্টি হলে শেষপর্যন্ত বরাক উপত্যকা থেকে ঐ সার্কুলার প্রত্যাহার করতে চালিহা মন্ত্রীসভা বাধ্য হয়।

আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে ১৯৫৩ সালে নাগা পাহাড়ের অভ্যন্তরে শান্তি-স্থাপনের উদ্দেশ্যে চালিহা পরিভ্রমণ করেছিলেন। এটি সম্ভব হয়েছিল কারণ বেশিরভাগ নাগা বিমলাপ্রসাদকে মিত্র বলেই মনে করতেন। চালিহার মুখ্যমন্ত্রীত্বকালেই ১৯৬৩ সালের ১ ডিসেম্বর আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের ১৬ নম্বর স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে নাগাল্যান্ডের জন্ম হয়। অন্যদিকে মিজোরা বিমলা প্রসাদকে ভিন্ন চোখে দেখতেন। ১৯৫৯ সালে মিজো পাহাড়ে 'মৌতম' (বাঁশ গাছে ফুল ফোটার ফলে ইঁদুরের ভয়ংকর উপদ্রব বৃদ্ধি ও খাদ্য সংকট) বা তীব্র দুর্ভিক্ষের সময় চালিহা সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রেক্ষিতেই মিজো নেতা লালডেঙ্গার নেতৃত্বে Mizo National Front বা MNF নামে জঙ্গি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের জন্ম হয়েছিল। মিজো পাহাড়ে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়া এবং অবশেষে ১৯৮৭ সালে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র মিজোরাম (২৩ নম্বর রাজ্য)-এর জন্মের মূল কারণ হিসেবে অনেকে বিমলাপ্রসাদ চালিহার অনুসৃত নীতিকেই দায়ী করে থাকেন।

এইভাবে বিমলাপ্রসাদ চালিহার মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে নানারকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে মাত্র ৬১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় এবং ঐ বছরেই তিনি 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৭.৪৬ বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া (১৯১০-১৯৭১) (Birinchi Kumar Barua : 1908-64)

বিংশ শতাব্দীতে আসামের আলোকদীপ্ত অন্যতম প্রতিভাধর সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া নওগাঁও জেলার পুরানিগুদাম গ্রামে ১৯০৮ সালের ১৬ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারভুক্ত বিরিঞ্চিবাবুর পিতা বিজয় রাম বরুয়া ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ শিলং-এ অবস্থিত আসাম সেক্রেটারিয়েটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী। অত্যন্ত ধীসম্পন্ন বিরিঞ্চি ১৯২৮-এ নওগাঁও সরকারি হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩২ সালে পালি ভাষায় অনার্স ও ঈশান স্কলারশিপ পেয়ে এবং ১৯৩৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পরীক্ষায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়ে তিনি শিক্ষকতা ও গবেষণাকে জীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে বেছে নেন। যদিও তিনি আইন পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছিলেন, তথাপি তিনি আইনজীবী হননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সময় অসমিয়া ভাষাকে সংস্কৃতের পাঠ্যসূচিতেই অন্তর্ভুক্ত করা হত এবং বিরিঞ্চি কুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমিয়া ভাষার অধ্যাপক হিসাবে (যদিও সংস্কৃত বিভাগে) তাঁর শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া, যতীন্দ্রনাথ দুয়ারা প্রভৃতি ব্যক্তিদের অনলস চেষ্টার ফলেই **১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে অসমিয়া বিভাগ চালু হয়।** অবশ্য ঐ বছরেই দীর্ঘ তিন বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর গুয়াহাটির কটন কলেজে তিনি অসমিয়া ভাষার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৪৫ সালে অধ্যাপক বরুয়া বিলেত যান এবং 'লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' থেকে তাঁর অনবদ্য গবেষণা গ্রন্থ *A Cultural History of Assam*-র জন্য পি.এইচ.ডি. প্রাপ্ত হয়ে ১৯৪৮-এ আসামে ফিরে আসেন। এই গ্রন্থটিকে বলা হয় "a milestone in Assamese literature"। স্বাধীনতার পূর্বলগ্ন থেকে আসামে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে বিরিঞ্চি বরুয়ার নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষকরা সোচ্চার ছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে **১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি ঝালুকবাড়িতে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক (১৭.১৬ দ্রষ্টব্য) উপাচার্য হন।** এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে 'ট্রাস্ট' গঠিত হয়েছিল তার সম্পাদক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী

গোপীনাথ বরদোলই (১৭.২০ দ্রষ্টব্য) এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর অধ্যাপক বরুয়া অসমিয়া বিভাগে যোগ দেন এবং ১৯৫২-তে বিভাগীয় প্রধান, পরে ডিন পদ লাভ করেন।

সুদর্শন, মার্জিত রুচিসম্পন্ন, ছাত্র-দরদী, খ্যাতিমান অধ্যাপক বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। অধ্যাপক বাণীকান্ত কাকতি (১৭.৪৩ দ্রষ্টব্য) ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর পথ-প্রদর্শক। এক সময় বিরিঞ্চি কুমার ছদ্মনাম বীণা বরুয়া হিসেবে লিখতেন। আসামের গ্রাম্য জীবন অবলম্বনে বীণা বরুয়ার উপন্যাস *জীবনর বাটত* (জীবনের রাজপথ) সমাজের অবহেলিত ও নিপীড়িত শ্রেণির জীবন কাহিনি। ঐ একই ছদ্মনামে তাঁর আর একটি উপন্যাস *সেউজি পাতর কাহিনী* (সবুজ পাতার গল্প)-তে আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের মর্মন্তুদ জীবন-যন্ত্রণার ছবি এঁকেছেন বিরিঞ্চি কুমার। নতুন আঙ্গিকে আঁকা বীণা বরুয়ার *পট পরিবর্তন* কিছু ছোটো গল্পের সংকলন, যার অনেকগুলি গল্প কলেজ ছাত্রীদের আবেগ ও সদাপরিবর্তনশীল ভাবালু প্রেমের কাহিনি। গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে বীণা বরুয়ার *অঘোনীবাই* গ্রন্থে নানা ধরনের নরনারীর সুন্দরভাবে গাঁথা বর্ণাঢ্য চরিতমালা পাওয়া যায়। এরই মধ্যে এমনি একটি স্ত্রীচরিত্র আছে যিনি এক অনন্যা মহিলা, যিনি নিজের জীবনের দুঃখকষ্ট, অভাব-অভিযোগ তুচ্ছ করে গ্রামের অন্যদের সাহায্যকারিণী সেবিকার ভূমিকায় অবতীর্ণা। বিরিঞ্চি কুমার বরুয়ার *অসমীয়া কথা সাহিত্য, অসমীয়া ভাষা আরু সংস্কৃতি* ইত্যাদি গবেষণামূলক প্রবন্ধ সাহিত্য আসামের অমূল্য সম্পদ। *অসমর লোক সংস্কৃতি* গ্রন্থটির জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি থেকে পুরস্কারও পেয়েছেন। এছাড়া তিনি কিছু দুষ্প্রাপ্য নব-বৈষ্ণব সাহিত্য গ্রন্থও অসমিয়া ভাষায় সম্পাদনা করেছেন, যেমন *অঙ্কিয়া নট, মহামোহ কাব্য, শ্রীরাম আটা আরু রমানন্দর গীত* ইত্যাদি।

১৯৬২ সালে ভারত সরকারের Cultural Mission-এর সদস্য হয়ে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। ১৯৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Indiana University-তে ভারতীয় লোক কাব্য ও লোক-সংস্কৃতির উপর বিরিঞ্চিকুমার বরুয়ার বিখ্যাত বক্তৃতা পৃথিবীর অনেক গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অধ্যাপক বরুয়া ভারতের মহান সংস্কৃতি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণের সময় বিদেশিদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন, ভারতে প্রতিটি শিশু কথা বলার আগে প্রথমে গান গায়, হাঁটা-শেখার আগে সে প্রথম নাচে। সহমর্মিতা, মমত্ববোধ, সকলের সাথে সুপ্রতিবেশী-সুলভ আচরণ এবং

মানবিকতা ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সুঠাম দেহের অধিকারী বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৬৪ সালের ৩০ মার্চ অপরিণত বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর বার্তা পেয়ে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> ***The passing away of Dr. Birinchi Kumar Barua a short while ago has been one of the greatest losses sustained by Indian scholarship in Assam, and we all mourn the sad untimely demise of such a fine scholar who brought Kudos to Indian scholarship.***

সূত্র ঃ Maheswar Neog and Mukunda Madhava Sharma (ed.) *Professor Birinchi Kumar Barua Commemoration Volume*; বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া, *অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস* (বঙ্গানুবাদ, সাহিত্য আকাদেমি)।

১৭.৪৭ বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা (১৯০৯-১৯৬৯) (Bishnu Prasad Rabha : 1909-69)

অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা ছিলেন একাধারে বিপ্লবী, সমাজ-সংস্কারক, সাহিত্যিক, গায়ক, শিল্পী এবং নিপীড়িত অবহেলিত ও অবজ্ঞাত মানুষের প্রকৃত বন্ধু। এমন মানব—দরদি শিল্পী আধুনিক আসামে খুব বেশি দেখা যায় না। জন্মেছিলেন অধুনা বাংলাদেশ-এর রাজধানী ঢাকায় ১৯০৯ সালে। আসামের তেজপুর হাই-স্কুল থেকে ১৯২৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ার সময় তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শিবনাথ বর্মন সংগত কারণেই বিষ্ণুপ্রসাদ-কে অসমিয়া নবজাগরণের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেছেন।। গজদন্তমিনারে বসে তিনি সাহিত্য বা শিল্পচর্চা করেন নি, যেহেতু প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন, এরই জন্য পিছিয়ে—পড়া মানুষের জীবনের শরিক হিসাবেই সমগ্র জীবন আদর্শের জন্য আত্মনিবেদন করেছিলেন। বাবা গোপাল চন্দ্র রাভা ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ-অফিসার এবং 'রায়বাহাদুর' ও 'অর্ডার অফ্ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার' (ও.বি.ই) খেতাবের অধিকারী। পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ২,৫০০ বিঘা জমির উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও জমিদারি প্রথার প্রতি ছিল বিষ্ণুপ্রসাদের তীব্র বিতৃষ্ণা। ভাগচাষিদের মধ্যে সমস্ত জমি বিলিয়ে দিয়ে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা বেছে নিয়েছিলেন ভূমিহীন যাযাবরের জীবন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন ঃ 'লাঙল যার, জমি তার'। গরিব কৃষক ও উপজাতিদের সংঘবদ্ধ করে তিনি শুধু ব্রিটিশদের হাত থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতাই

নয়, একই সাথে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্যের আওয়াজ তুলেছিলেন। এখানেই আসামের অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে বিষ্ণুপ্রসাদের তফাত। অবশ্য শংকর বরুয়া ও জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য)-র মতো বড়োমাপের শিল্পীরা অনেক সময় তাঁর সাথে হাত মিলিয়েছিলেন, যদিও তথাকথিত বর্ণ-হিন্দুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি থেকে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা প্রথম থেকেই দূরত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

Revolutionary Communist Party of India (RCPI) বা 'ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি'র সাথে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন। RCPI-এর জন্মকাহিনি আবার কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সাথে যুক্ত। ১৯৩৪ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করে ঠাকুর পরিবারের তথাকথিত 'কট্টরপন্থী' সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১-১৯৭৪) প্রথমে 'কমিউনিস্ট লিগ' (১৯৩৪-১৯৩৮) এবং ১৯৩৮ সালে RCPI গঠন করেন। আসামে RCPI-এর শাখা তৈরির উদ্দেশ্যে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কয়েকবার আসাম সফর করেন, যদিও ব্রিটিশ সরকার ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪১-এ তাঁকে আসাম থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেয়। সেই সময় আসামে খগেন বরবরুয়া, হরেন কলিতা, হরিদাস ডেকা, তরুণসেন ডেকা, উমা শর্মা, চিন্তাহরণ কলিতা, শরৎ রাভা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা RCPI-এ যোগদান করেন। আসামের কৃষক আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা পরবর্তী সময়ে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং আজীবন RCPI-এর সদস্য হিসাবে শোষণ-বিরোধী বিভিন্ন সংগ্রামে শরিক হয়ে কিছুদিন কারান্তরালে দিন কাটান। দুঃসাহসিক অভিযানের সময় মাঝে মাঝে তিনি পুলিশের ছদ্মবেশে পুলিশের ব্যারিকেড্ অতিক্রম করেছেন।

বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত 'রাভা'দের উৎপত্তি সম্পর্কে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এন্ডেল-এর মতে, এরা কাছাড়িদের অংশ, ডালটন আবার রাভাদের মধ্যে কাছাড়ি ও গারো জনগোষ্ঠীর অনেক মিল খুঁজে পেয়েছেন, হডসন মনে করেন, এরা মেচ জনগোষ্ঠীরই একটা অংশ ইত্যাদি। বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা বিদেশি নৃবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকদের বিভিন্ন উপজাতি সম্বন্ধে এইসব বিতর্ক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। নেপালি, বোড়ো, বাংলা, অসমিয়া, ইংরেজি ইত্যাদি নানা ভাষায় দক্ষ বিষ্ণুপ্রসাদ আসামের পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে এইসব অনাদৃত, অবহেলিত মানুষের প্রকৃত জীবন-কাহিনি ও সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

সত্য তথ্যের উপর নির্ভর করে সমাধান সূত্র বের করার চেষ্টা এবং সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর সমগ্র জীবনের বিভিন্ন কাজে প্রতিফলিত। বিভিন্ন ছদ্মনামে তিনি এইসব জীবন্ত কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, যদিও খুবই সীমিত সংখ্যক মানুষের দৃষ্টিতেই সেগুলি এসেছিল। ক্ষেত্র-সমীক্ষার উপর নির্ভর করে তাঁর গ্রন্থ *বানো-কোবাঙ* পরবর্তী সময়ে বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা নিঃসন্দেহে "The first anthropologist of Assam" বা আসামের প্রথম নৃতত্ত্ববিদ। তাঁর রচিত এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত *অতীত আসাম, মুক্তি-দেউল, অসমিয়া কৃষ্টির সমু আভাস, মিশিং কোনে. সুনপাহি* ইত্যাদি অসমিয়া গ্রন্থে রাভার পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ এবং আসামের শ্রীমন্ত শংকরদেব ছিলেন রাভার চোখে আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি এবং এঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি তাঁর যাত্রাপথ সুগম করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সাম্যবাদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ সত্ত্বেও তিনি প্রচলিত ধর্মের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করতেন। অনেকের কাছে এটি পরস্পরবিরোধী মনে হলেও বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা-কে তাঁর স্থির বিশ্বাস থেকে কেউ টলাতে পারেননি। সমগ্র জীবন আসামের সাংস্কৃতিক সম্পদ তিনি বৈষ্ণবদের 'নামঘর' ও 'সত্র'র মধ্যে হন্যে হয়ে খুঁজেছেন। তথাকথিত 'আর্য' বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভাবিত অসমিয়া কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রবক্তা বাণীকান্ত কাকতি (১৭.৪৩ দ্রষ্টব্য) বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া (১৭.৪৬ দ্রষ্টব্য), প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী প্রভৃতি খ্যাতনামা অসমিয়া পণ্ডিতদের অভিমতের বিরুদ্ধে **বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, অসমিয়া ভাষা ও সংস্কৃতিতে তথাকথিত 'কিরাত' বা অনার্য উপজাতিদের অবদান সকলের থেকে বেশি**, এমনকি শংকরদের তাঁর গান ও নাচের ডালি সাজিয়েছিলেন মূলত পাহাড় ও সমতলের উপজাতিদের সংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে অফুরন্ত সম্পদ আহরণ করে। এইসব তত্ত্ব তৎকালীন আসামে অনেকেরই মনঃপূত হয়নি। এরই জন্য 'অসম সাহিত্য সভা'র মতো প্রতিষ্ঠান বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা'র নাম উচ্চারণও করেনি তাঁর জীবিতাবস্থায়। একইভাবে, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা'র (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য) মতো ব্যক্তিত্বও ঐরকম মর্যাদাসম্পন্ন সভার কাছে উপেক্ষিতই থেকে গেছে।

সংস্কৃতিকে সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ারে পরিণত করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিনিয়ত গভীরভাবে গবেষণা করেছেন। জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, ভূপেন হাজারিকা (১৭.৫১ দ্রষ্টব্য) ও বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা—এই নামগুলি আসামের ঐতিহ্যসম্পন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এক বিরাট গৌরবের অধিকারী। বারাণসীতে নৃত্যজ্ঞ

বিষ্ণুপ্রসাদের নটরাজ-রূপি তাণ্ডব নৃত্য দর্শনে মুগ্ধ ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে **"কলাগুরু"** হিসেবে সম্বোধন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। সেদিন থেকে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা "কলাগুরু" নামে পরিচিত। সমাজের সমস্তরকম অন্যায়, ভেদাভেদ ও অসাম্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় সভ্যতায় 'নটরাজ'-এর একটি অনবদ্য ভূমিকা আছে। বিশ্ব-বিখ্যাত নৃত্য-শিল্পী উদয়শংকর 'নটরাজ'-এর তালিম নিতে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা'র কাছে ছুটে এসেছিলেন। আসামের প্রথম ছায়াছবি 'জয়মতী' তৈরির সময় প্রিয় বন্ধু ও চিত্রনির্মাতা জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা-কে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। তেজপুরে থিয়েটার আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম কর্ণধার। *এরা বাতর সুর* ছায়াছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন এবং **'সিরাজ'** ছবিতে সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আসামে **জ্যোতিপ্রসাদের 'জ্যোতি-সংগীত'** এবং **বিষ্ণুপ্রসাদের 'রাভা-সংগীত'**—এই দুই প্রসাদের সংগীতের তরঙ্গেই পুষ্ট হয়েছেন ভূপেন হাজারিকার মতো প্রথিতযশা শিল্পীরা, যাঁদের গান আজ ভারতীয় সংগীতে নতুনমাত্রা সংযোজন করেছে। ইচ্ছা করলে কলকাতা বা মুম্বাইয়ে ইদানীংকালের কমার্শিয়াল শিল্পীদের মতো প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতেন বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা, কিন্তু যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে মানুষের মুক্তির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাঁর কাছে অর্থ বা প্রাচুর্যের হাতছানি বারবার ম্লান হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষকে তিনি অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসতেন এবং তাদেরই অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে তাঁর একান্ত অনুরাগী মোহিনী দেবীর সাথে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। আসামের তেজপুর ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। এই তেজপুরেই ছিলেন রূপ-কানোয়ার জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা এবং নটসূর্য ফণী শর্মার মতো অসাধারণ শিল্পীরা। আসলে, একসময় তেজপুর ছিল আসামের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থা না থাকা সত্ত্বেও জীবন-সায়াহ্নে এই তেজপুরের মানুষের সমবেত ইচ্ছার কাছে হার মেনে ১৯৬৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছিলেন। সম্প্রতি নীলমণি সেন ডেকা রচিত একটি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, কীভাবে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সালে আসাম বিধানসভায় দুই শিল্পী বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা ও ভূপেন হাজারিকা—তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা'কে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিলেন, যদিও তাঁদের রাজনীতি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে।

'কলাগুরু' বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা ছিলেন এক অসাধারণ চিত্রশিল্পী। তাঁর জল রং-এ আঁকা শ্রীমন্ত শংকরদেব সহ বেশকিছু বর্ণাঢ্য চিত্র ১৯৬৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর

পরিবারের সদস্যরা 'সত্র' সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করেছিলেন। ফলে তাঁর আঁকা সকল চিত্র এক জায়গায় পাওয়া খুবই কঠিন। তিনি ছিলেন শিল্পী, প্রতি ইঞ্চে শিল্পী এবং শিল্পীর দৃষ্টিতেই আগামীদিনের সুন্দর সাম্যভাবাদর্শে উজ্জীবিত নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। যে কাজ তিনি অনুশীলন করেছেন—সেটি ফুটবল খেলা থেকে ছবি আঁকা—সবই তাঁর সততা ও একনিষ্ঠতার জন্য অনবদ্য রূপ নিয়েছে। এইরকম অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিটির উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ বা জীবনী আছে কি না জানা নেই। সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী মোহিনী রাভা ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন, জীবৎকালে যিনি সমাজকর্তাদের কাছে উপেক্ষিত ও অনাদৃত ছিলেন, আজও সেটি অব্যাহত, কারণ অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী 'কলাগুরু' বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা'র পরিচয়ই হয়তো সঠিকভাবে জানে না।

সূত্র ঃ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও 'ওয়েবসাইট'-এর তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত।

১৭.৪৮ বিষ্ণুরাম মেধি (১৮৮৮-১৯৮১) (Bishnuram Medhi : 1888-1981)

আসামের হাজো এলাকায় দরিদ্র কৃষক ঘরের সন্তান ছিলেন স্বাধীনোত্তর আসামের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুরাম মেধি। কৃষক পিতা সোনারাম এবং মাতা আলেহি কোনোদিন কল্পনা করতে পারেননি তাঁদের সন্তান এইরকম খ্যাতিসম্পন্ন হতে পারবেন। বিষ্ণুরামের জন্ম হয়েছিল ২৪ এপ্রিল ১৮৮৮-তে। গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে অত্যন্ত মেধাবী বিষ্ণুরাম ১৯০৫-এ এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। প্রসঙ্গত কটন কলেজিয়েট স্কুলেই আসামের প্রধানমন্ত্রী (প্রাক-স্বাধীনতা যুগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে 'প্রধানমন্ত্রী' বলার রীতি ছিল) সৈয়দ মহম্মদ শা'দুল্লাহ (২২.৬.১ দ্রষ্টব্য) এবং প্রথম মুখ্যমন্ত্রী 'ভারত-রত্ন' গোপীনাথ বরদোলই শিক্ষালাভ করেছিলেন। ১৯০৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে ১৯১১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে এম.এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন। ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালে বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গুয়াহাটিতে তিনি ওকালতি শুরু করেন। ১৯২১ সালে অন্যান্য অনেকের সাথে আইন-ব্যবসায় ইতি টেনে গান্ধিজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কংগ্রেস সদস্য হন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বিষ্ণুরাম মেধি ছিলেন আসামে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯২৬-এ ঐতিহাসিক পাণ্ডু/গুয়াহাটি কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা কমিটির

যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯৩৮-এ গুয়াহাটি লোকাল বোর্ডের তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করার সময় তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দিয়েছিলেন। গান্ধিজির নেতৃত্বে আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় বিষ্ণুরাম নলবাড়িতে তাঁর বিখ্যাত উদ্দীপক বক্তৃতায় (১ আগস্ট, ১৯৩০) ক্রমাগত 'বয়কট' আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারি যন্ত্রকে পুরোপুরি অচল করে দেওয়ার আহ্বান রেখেছিলেন এবং গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। তিনি অবশ্য এর আগে ১৯২৩-এ চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে তরুণরাম ফুকন (১৭.৩১ দ্রষ্টব্য), গোপীনাথ বরদোলই (১৭.২০ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সাথে স্বরাজ্য দলে অংশ নিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে ১৯৪৬ থেকে গোপীনাথ বরদোলই মন্ত্রীসভায় বিষ্ণুরাম মেধি অর্থ ও রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। গোপীনাথ বরদোলই-এর মৃত্যুর পর ১৯৫০ সালের ৯ আগস্ট থেকে ১৯৫৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিষ্ণুরাম মেধি ছিলেন স্বাধীনোত্তর আসামের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী। অসমিয়াদের মধ্যে তিনিই প্রথম রাজ্যপালের দায়িত্ব নিয়ে ১৯৫৯ থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর তামিলনাড়ুতে অবস্থান করেন। ১৯৬৪-তে আসামে ফিরে এসে আবার সক্রিয় কংগ্রেস রাজনীতিতে অংশ নেন এবং ১৯৬৭'র বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হন। ১৯৮১ সালের ২১ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৮৮ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষে ভারত সরকারের পোস্টাল বিভাগ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে একটি স্ট্যাম্প প্রকাশ করে।

১৭.৪৯ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (১৯২৪-১৯৯৭) (Birendakumar Bhattacharyya : 1924-1997)

আধুনিক আসামের সাহিত্য জগতের সমাজ-সচেতন, অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র ড. বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য একাধারে শিক্ষক, সাংবাদিক, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও প্রবন্ধ লেখক। তাঁর রচিত কুড়িটি উপন্যাস, ষাটটি ছোটোগল্প, শতাধিক কবিতা, দশটি নাটক, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের ধ্রুপদী অসংখ্য গ্রন্থের অনুবাদ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অগণিত প্রবন্থ সহ সবগুলিই সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনিই আসামের প্রথম সাহিত্যিক যিনি তাঁর অসাধারণ উপন্যাস *মৃত্যুঞ্জয়*-এর জন্য ১৯৭৯ সালে 'জ্ঞানপীঠ' সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। এর আগে ১৯৬১ সালে অসমিয়া ভাষায় তাঁর সাড়া-জাগানো উপন্যাস *ইয়ারুইঙ্গম* (Yaruingam)-এর জন্য তিনি 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন স্বাদের গ্রন্থ যেমন, *অমর স্বাধীনতা আন্দোলন*, কিংবা

অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর জীবনী অথবা *Humour and Satire in Assamese Literature* সহ প্রত্যেকটি নতুন আলোকে উদ্ভাসিত। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের দুটি সংকলন *সাতশিরি* এবং *কোলং আজো বই* এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নাম তাঁর বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য হলেও তিনি বীরেন ভট্ট নামেই আসামে সমধিক পরিচিত। তিনি যেমন অন্যের জীবনী লিখেছিলেন, তেমনি তাঁর জীবনী লিখেছেন হৃদয়ানন্দ গোগুই।

সৈয়দ আবদুল মালিক (১৭.৬৯ দ্রষ্টব্য)-এর মতো বীরেন ভট্ট'র রচনায় সমকালীন সমাজের নানারকম দ্বন্দ্ব জীবন্ত রূপ পেয়েছে এবং অন্যদের তুলনায় এই উভয় লেখকের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক চেতনা তাঁদের লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ১৯৫৫ সালে তরুণ বিপ্লবীদের জীবনকথা নিয়ে বীরেনবাবুর প্রথম উপন্যাস *রাজপথে রিঙ্গিয়াই* (রাজপথের ডাক) প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ঐ উপন্যাসের নায়ক সহ অনেকে পুলিশের আক্রমণে আহত হয়ে 'স্বাধীনতা'র প্রকৃত অর্থ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কৃত উপন্যাস *ইয়ারুইঙ্গম* নাগা পাহাড়ের তপ্ত রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রচিত, যেখানে টাংখুল নাগা সমাজের একটি অংশ জাপানি সাহায্য নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধিতায় সম্মুখীন এবং অন্য অংশ গান্ধিবাদী অহিংস পথের পথিক। এই উভয় পক্ষের আদর্শগত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি বিবর্তিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে রচিত জ্ঞানপীঠ পুরস্কৃত *মৃত্যুঞ্জয়,* ১৯৪২-এর 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত, যেখানে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী গান্ধিবাদী ব্যক্তিটি হিংসার রাজনীতির আবর্তে আটকে গেছে। ১৯৭০ সালেই তাঁর আর একটি উপন্যাস *প্রতিপদ* প্রকাশিত হয়েছিল যেটি ১৯৪০-এ ব্রিটিশ অধীনস্থ ডিগবয়ের 'আসাম অয়েল কোম্পানি'র শ্রমিক ধর্মঘট এবং শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল। মার্কসীয় চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি তাঁর রচনার সৌধ সাজিয়েছিলেন। তাঁর বেশকিছু অসমিয়া গ্রন্থ ইংরেজি ও হিন্দিতে অনূদিত হলেও, অন্যান্য অনেক ভাষাতেই বাকি। ১৯৮৩ সালে 'অসম সাহিত্য সভা'র বঙ্গাইগাঁও অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন। আসামের এত বড়ো মাপের সাহিত্যিক বেসরকারিভাবে সম্মানিত হলেও সমকালীন আসাম সরকার তাঁর নাম ভুলেও একবার নিদেনপক্ষে 'পদ্মশ্রী'র জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব করেনি। যাইহোক, সরকারি খেতাব না পেলেও এবং বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ১৯৯৭ সালের ৬ আগস্ট প্রয়াত হলেও তাঁর অমর সৃষ্টির জন্য চিরদিন তিনি উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

১৭.৫০ বীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৩৩-) (Birendranath Datta : 1933-)

আসামের শিক্ষা, সংগীত ও লোক-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম ব্যক্তিত্ব বীরেন্দ্রনাথ দত্ত নওগাঁও-এ ১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শৈশব গোয়ালপাড়াতেই কাটে এবং সেখানকার বিদ্যালয় থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর গুয়াহাটির কটন কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। আই. এস. সি.-তে ভালো রেজাল্ট সত্ত্বেও তিনি অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বিশ্বভারতী থেকে স্নাতক হন। শান্তিনিকেতনের প্রভাব তাঁর রুচি ও চেতনায় চির জাগরুক ছিল। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. করার পর ১৯৫৭ সালে প্রথমে বি. বরুয়া কলেজ, পরে পাণ্ডু কলেজ, গোয়ালপাড়া কলেজ ইত্যাদি বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। গৌরীপুরের প্রমথেশচন্দ্র বরুয়া কলেজের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ। অধ্যাপক প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামীর অধীনে গোয়ালপাড়া লোকসংস্কৃতির উপর গবেষণা করে ১৯৭৪ সালে তিনি পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৭৯ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার পদে যোগাদন করেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পঞ্চাশের দশকে অধ্যাপক বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া (১৭.৪৬ দ্রষ্টব্য) যার সূত্রপাত করেছিলেন এবং অধ্যাপক প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী যেটিকে পল্লবিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেই গোস্বামীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৯৫ পর্যন্ত একনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমে 'ফোক্ রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট'কে উল্লেখযোগ্য স্থান দখলে প্রভূতভাবে সাহায্য করেন। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর নব-প্রতিষ্ঠিত তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৯ পর্যন্ত অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করে দীর্ঘ ৪২ বছরের শিক্ষকতা-জীবনের যবনিকা টানেন। এই সময়ে তিনি মোট ২৫টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত *A Handbook of the Folklore Material of Northeast India, The Bibliography of Folklore Materials of Assam, Folk Toys of Assam, Affinities between Folkloristics and Historiography, Rama-Katha in Tribal and Folk Traditions, Bargeets* ইত্যাদি গ্রন্থ লোক-সংস্কৃতির জগতে উল্লেখযোগ্য উপহার। মৌলিক উপাদনের উপর নির্ভর করে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে গবেষণার ধারা অক্ষত রাখার উদ্দেশ্যে তিনি ফোর্ড-ফাউন্ডেশনের সাহায্যে North Eastern Archival Centre for Traditional Art and Folklore (NEACTAF) নামে একটি প্রতিষ্ঠানও তৈরি করেছেন। বিপুল খ্যাতি জীবনে না জুটলেও লোকসংস্কৃতি চর্চায় এইরকম নিবেদিত-প্রাণ গবেষক সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে বিরল।

প্রথাগত পদ্ধতিতে গান না শিখলেও, কিংবা মঞ্চে বসে গান না গাইলেও, আসামের চিরায়ত গানের শিল্পী হিসেবে বীরেন্দ্রনাথ দত্ত'র অবদান কম নয়। তাঁর কণ্ঠে শ্রীমন্ত শংকরদেবের 'বরগীত' এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিশ্বভারতীতে ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রসংগীতের সাথে লোকসংগীত চর্চা তাঁর জীবনের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিল। তাঁর রচিত *মনর খবর* (যেটিকে নবকান্ত বরুয়া তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন), 'বহুদিন বকুলর গন্ধ পোয়া নাই', 'মেলি দিলো মন' ইত্যাদি রোমান্টিক গানেও লোক-সংগীতের মূর্ছনা আছে। তফজুল আলি ও জ্যোতির্ময় কাকতির সাথে তিনি রোমান্টিক গানের এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। এইচ. এম. ভি. বীরেন্দ্রনাথ দত্ত'র কয়েকটি অসমিয়া গানের রেকর্ডও প্রকাশ করেছিল। ১৯৬১-তে তাঁর গানের গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু এরপর থেকে তিনি গান ছেড়ে গবেষণাতেই বেশি আত্মনিয়োগ করেন। শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কৃতিচর্চার দিকে তাঁর আকর্ষণ দিনদিনই বাড়তে থাকে। ২০০৩ এবং ২০০৪ সালে যথাক্রমে নর্থ লখিমপুর ও হোজাই সম্মেলনে তিনি 'অসম সাহিত্যে সভা'র সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

১৭.৫১ ভূপেন হাজারিকা (১৯২৬-) (Bhupen Hazarika : 1926-)

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিবৃত্তে বর্তমানে ভূপেন হাজারিকা একটি উল্লেখযোগ্য নাম। কবি, সংগীত রচয়িতা, গায়ক, অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা, সাংবাদিক ও লেখক ভূপেন হাজারিকার বর্ণাঢ্য জীবন নানা কারণে আকর্ষণীয়। সম্প্রতি তাঁকে **আসাম-রত্ন** উপাধিতে ভূষিত করার সময় উল্লেখ করা হয়েছে, আসামের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শ্রীমন্ত শংকরদেব এবং রূপ-কানোয়ার জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার পর ভূপেন হাজারিকার স্থান, যিনি আসামের গর্ব ও অহংকার। শুধু আসাম নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে তিনি আজ 'মুকুটবিহীন রাজা'। আসাম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমানা ছাড়িয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ ও প্রতিবেশী বাংলাদেশে তাঁর মত জনপ্রিয় সংগীত-শিল্পীর মর্যাদা এর আগে আসামের আর কেউ অর্জন করতে পারেননি। অসমিয়া, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি ইত্যাদি নানা ভাষায় তিনি গান গাইলেও, প্রথমে লেখেন কিন্তু মাতৃভাষা অসমিয়ায় এবং পরবর্তী সময়ে অনুবাদ করেন। আঞ্চলিকতার সীমানা ছাড়িয়ে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার প্রতীক হাজারিকার মাথায় খুকুরি পিন-সহ কালো নেপালি টুপিটি ইঙ্গিতবহ। অবশ্য তেজপুরের যে এলাকায় সুমধুর প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের মধ্যে তিনি তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন, সেটি ছিল নেপালি-অধ্যুষিত এবং তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ঐ

প্রতিবেশীদেরই উপহার দেওয়া নেপালি টুপি পড়া শুরু করেন। অসমিয়া কাহিনি ও সংস্কৃতি শুধু ভারতবর্ষে নয়, হাজারিকার সৌজন্যে, পৃথিবীর সাংস্কৃতিক মানচিত্রেও স্থান করে নিয়েছে।

১৯২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর আসামের সাদিয়ার এক গ্রামে তাঁর জন্ম। ছয় ভাই ও চার বোনের মধ্যে ভূপেনই ছিলেন জ্যেষ্ঠ, ফলে সংসারের সকলের কাছে, বিশেষত ঠাকুমার কাছে, তিনি ছিলেন নয়নের মণি। পিতামহ শিবসাগরে বংশীধর হাজারিকা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর পিতা নীলকণ্ঠ হাজারিকা ঐ স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন (যদিও পরবর্তী সময়ে গুয়াহাটিতে কটন কলেজে অধ্যাপক হয়েছিলেন)। প্রথমে ঐ স্কুলে এবং পরে তেজপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে ভূপেন শিক্ষালাভ করেন। মায়ের ছেলে-ভুলানো গানের সুরে আকৃষ্ট হয়ে শৈশব থেকেই ভূপেন গানের চর্চা করতেন। যেহেতু শংকরদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত বৈষ্ণব পরিবারে জন্মেছিলেন, এরই জন্য ভক্তিমূলক গানের প্রতিই শৈশবে আকর্ষণ ছিল বেশি। 'রুদালি' ছবির বিখ্যাত কিছু গানের সুর তাঁর মায়ের কাছ থেকেই শৈশবে তিনি পেয়েছিলেন। যাইহোক, কিশোর বয়সে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা'র (১৭.৪৭ দ্রষ্টব্য) কাছে সংগীতের তালিম নিয়ে ভাতখণ্ডি সংগীতে তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন, যদিও দীর্ঘদিন এটি রক্ষা করতে পারেননি। এইভাবে একটি শিক্ষক-পরিবারের সাংগীতিক পরিমণ্ডলে (ভাই-বোন সকলেই গানের চর্চা করতেন) তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল। মাত্র ১০ বছর বয়সে তাঁর মধু-ঢালা কণ্ঠের গানে অনেকেই সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে ১৯৩৯ সালে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য) দ্বিতীয় ছায়াছবি 'ইন্দ্রমালতী'তে তিনি শিশু-শিল্পী হিসেবে অভিনয়ও করেছিলেন। শুধু অভিনয় বা সংগীতই নয়, কৃতি ছাত্র হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। গুয়াহাটির কটন কলেজ থেকে ১৯৪২ সালে আই. এ. পাস করার পর হাজারিকা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যথাক্রমে ১৯৪৪ সালে বি.এ. ও ১৯৪৬ সালে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বারাণসীতে থাকাকালীন সময়েও ওখানকার সংগীত-ভবনে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এরপর তিনি আমেরিকা যান এবং পাঁচ বছর পাশ্চাত্য দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯৫৪ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে গণ-মাধ্যমের ভূমিকা সংক্রান্ত Mass Communication-এ পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Lisle Fellowship-ও পেয়েছিলেন। এতসব সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে চরম বৈষম্য ইত্যাদির দৃশ্য তাঁর মননে বামপন্থী চেতনার জন্ম দিয়েছিল। এরই জন্য দেশে ফেরার পরেই তিনি IPTA-র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

আমেরিকায় পি.এইচ.ডি. করার সময় বিশ্বের অনেক স্বনামধন্য শিল্পীর সাথে তাঁর পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। এঁদের মধ্যে যেমন ফ্রান্সে অমর চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩) আছেন, তেমনি আছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ সংগ্রামী সংগীতশিল্পী পল রোবসন (১৮৯৮-১৯৭৬)। রোবসন-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলেই ভূপেনের গানে আন্তর্জাতিক সুর অত স্পষ্ট, যেটি তাঁর অনেক বিখ্যাত গানে যেমন, "বিস্তীর্ণ দুই পারে, অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে, ও গঙ্গা তুমি বইছ কেন..."-তে (যদিও নদীর নামটি অসমিয়া ভাষায় একরকম অথবা বাংলা বা হিন্দিতে অন্যরকম) পরিলক্ষিত হয়। ভারতের লোকসংগীতের সাথে, (বিশেষত 'কামরূপিয়া লোকগীতি'), পাশ্চাত্যের সুর মিশিয়ে বিভিন্ন ভাষায় তিনি এক অনবদ্য ঘরানা সৃষ্টি করেছেন, যেটি তুলনাবিহীন। ভারতীয় লোকসংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হিসেবে ঐ সময়েই (১৯৫০-এর দশকের প্রথম পর্বে) তিনি নিউইয়র্কে এলিনর রুজভেল্টের দেওয়া Gold Medallion সম্মানে ভূষিত হন। পরবর্তী সময়ে ভারতের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত হিসেবে ইউরোপ, আমেরিকা ছাড়াও পৃথিবীর সবকটি মহাদেশে তিনি তাঁর গানের ডালি নিয়ে অসংখ্য মানুষের সামনে সেগুলি পরিবেশন করেছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ-এর জন্মলগ্নে তাঁর স্বরচিত 'জয় জয় নবজাত বাংলাদেশ' গানটি মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি শুধুমাত্র অসমিয়া জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি, যদিও নিজের জন্মস্থানের মাটি ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধ তাঁর প্রবল। তিনি আসামে অসমিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে বাঙালি, অন্যত্র ভারতীয়, যদিও বিশ্বের দুর্গত মানুষের চোখে তিনি মানবতাবাদী। দক্ষিণ এশিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষকে তিনি তাঁর সংগীতের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করেছেন।

IPTA আন্দোলনের শরিক হয়ে একদিকে যেমন আসামে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা'র মতো অগ্রগণ্যদের কাছ থেকে প্রভূত উৎসাহ পেয়েছিলেন, তেমনি মুম্বাই-এ এই গণশিল্পীকে পাদ-প্রদীপের সামনে যাঁরা টেনে এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরি, বলরাজ সাহনি, নারায়ণ মেনন-এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালাই তাঁকে প্রথম শিখিয়েছিলেন কীভাবে একজন যথার্থ শিল্পীকে বিশ্ব-সাহিত্যের সাথে পরিচিত হতে হবে এবং রীতিমতো পড়াশোনা করতে হবে। উদারহণস্বরূপ, জ্যোতিপ্রসাদের আগ্রহেই ভূপেন হাজারিকা বাধ্য হয়েছিলেন জর্জ বার্নার্ড শ'র *Pygmalion, Arms and the Man, Back to Methuselah, The*

Philanderer, Ceasar and Cleopatra, Heartbreak House ইত্যাদি অসাধারণ নাটকগুলি পড়তে এবং এরফলে নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। হাজারিকার রচিত এক হাজারের বেশি সংগীত এবং ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, কবিতা, শিশুদের ছড়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে পনেরোটির বেশি গ্রন্থ একটি শিল্পীর জীবনে কম কৃতিত্বপূর্ণ নয়। সবই সম্ভব হয়েছে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত নিবিড়ভাবে পড়াশোনার জন্য, কারণ ভালো করে না পড়লে, ভালো করে কেউ লিখতে বা বক্তৃতা দিতে পারেন না।

বিশ্ব-পথিক ভূপেন হাজারিকা এক বর্ণাঢ্য জীবনেরও অধিকারী। তাঁর যখন ২১ বছর বয়স সেই সময় ১৬ বছরের একটি সংগীতজ্ঞা অসমিয়া মেয়ের সঙ্গে প্রণয়-কাহিনির আখ্যান তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেই সময় যথেষ্ট সাহসের অভাবের জন্য প্রেমিকার পিতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিতে ভয় পাওয়ায় অন্যত্র মেয়েটির বিবাহ হয়। এই কষ্ট তাঁকে দীর্ঘদিন ক্ষত-বিক্ষত করেছিল। এরপর কলম্বিয়ায় থাকাকালে প্রবাসী গুজরাটি পরিবারের প্রিয়ংবদা প্যাটেল-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং দীর্ঘ ১৩ বছর বিবাহিত জীবন কাটান। এরপর প্রিয়ংবদা কানাডায় একটি চাকরি নিয়ে চলে যান এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে তাঁদের বিবাহিত জীবনেও বিচ্ছেদ ঘটে। তাঁদের পুত্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তেজ ভূপেন হাজারিকা আমেরিকায় তাঁর মার্কিনী স্ত্রী সহ আছেন। বছরে একবার বিদেশের মাটিতে পিতা-পুত্রের মিলন হয়। বর্তমানে, তাঁর ভাষায়, পুত্র-কন্যা-সেক্রেটারি সবই বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালিকা কল্পনা লাজমি (জন্ম ১৯৫৪) যিনি ছায়ার মতো সব সময় তাঁর সাথে আছেন। কল্পনা লাজমির সকল ছায়াছবিতে সুরকার হিসেবে ভূপেন হাজারিকার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কল্পনা আসামের উপর 'একপল', 'দমন', 'লোহিত কী কিনারে' ইত্যাদি নানা ছবি করেছেন এবং বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উগ্রপন্থী সমস্যার শেকড় সন্ধানের উপর একটি ছবিতে হাত দিয়েছেন। ভূপেন হাজারিকাকে কল্পনা 'দাদা' বলে ডাকেন এবং লতা মঙ্গেশকরকে 'দিদি'। অতীত দিনের বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা গুরু দত্ত'র ভ্রাতুষ্পুত্রী কল্পনা লাজমি পরিচালিত 'রুদালি' (১৯৯৩) ছবিতে সুরারোপ করে ভূপেন হাজারিকা শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বিদেশেও খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিলেন। দীর্ঘ ৪০ বছর গুরু দত্ত'র সাথে ভূপেন হাজারিকার অন্তরঙ্গ বৌদ্ধিক সম্পর্কের ফলেই কল্পনার পক্ষে এইভাবে ছায়াসঙ্গী হওয়া সম্ভব হয়েছে।

অসমিয়া, বাংলা, হিন্দি মিলিয়ে এপর্যন্ত তিনি ১২২টি চলচ্চিত্রে নানাভাবে অংশ নিয়েছেন (নিজেই ছবি তৈরি করেছেন, অথবা পরিচালনা বা সুরকার বা

গায়ক হিসেবে অংশ নিয়েছেন)। অসমিয়া ভাষায় তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি হল, 'এরা বাতর সুর' (১৯৫৬), 'মাহুত বন্ধু রে' (১৯৫৮, এবং বাংলায় ঐ একই নামে), 'শকুন্তলা' (১৯৬০), 'প্রতিধ্বনি' (১৯৬৪), 'লোটি-ঘোটি' (১৯৬৭), 'চিক-মিক্ বিজুলি' (১৯৭১), 'মন প্রজাপতি' (১৯৭৮), 'স্বীকারোক্তি' (১৯৮৬), 'সিরাজ' (১৯৮৮) ইত্যাদি। অরুণাচল প্রদেশের উপর কয়েকটি ডকুমেন্টারি করেছেন যেমন, ইংরেজিতে For Whom The Sun Shines (১৯৭৪) অথবা হিন্দিতে 'মেরা ধরম মেরি মা' (১৯৭৭)। দূরদর্শন কেন্দ্র-র জন্য অনেকগুলি আধ-ঘণ্টার ডকুমেন্টারি করেছেন। অসমিয়া ছবির জন্য পর পর তিনবার—১৯৬০, ১৯৬৪ এবং ১৯৬৭ সালে—রাষ্ট্রপতির জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৭৭ সালে অসমিয়া ছবি 'চামেলি মেমসাহেব' (বাংলাতেও করেছেন)-এর সংগীত রচয়িতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। বাংলা ছবিতে সুরকার হিসেবে অনেক ছবিতে অংশগ্রহণ করেছেন—যেমন, 'জীবনতৃষ্ণা', 'জোনাকির আলো', 'কড়ি ও কোমল', 'অসমাপ্ত', 'এখানে পিঞ্জর', 'দম্পতি', 'দুই বেচারা' ইত্যাদি। হিন্দি ছবির তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই, তবে ১৯৯৮ সালে বিখ্যাত চিত্রকর এম. এফ. হুসেন-এর 'গজগামিনী' কিংবা কল্পনা লাজমির 'দমন' (২০০০) বা 'কউন' (২০০৩) ইত্যাদি ছবিতে সুরারোপ করে তিনি অনেক যশ অর্জন করেন। তাঁর চোখে সংগীতের ভাষাই একমাত্র ভাষা, কারণ সংগীত তাঁর প্রাণ।

ভূপেন হাজারিকার সম্মানের ঝুলিও রীতিমত ভারী। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ বছর তিনি Central Board of Film Censors-এর পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগের চেয়ারম্যান, ভারত সরকারের National Film Development Corporation (NFDC)-র ডাইরেক্টর, Children Film Society-র কার্যকরী সদস্য, তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরের Producer Emeritus ইত্যাদি পদের মর্যাদা পেয়েছেন। ১৯৯৩ সালে 'অসম সাহিত্য সভা'র শিবসাগর অধিবেশনে সভাপতি পদ তিনি অলংকৃত করেছেন। ১৯৭৭ সালে 'পদ্মশ্রী' এবং ২০০১ সালে 'পদ্মভূষণ', ১৯৯৯ থেকে দীর্ঘ পাঁচবছর সংগীত নাটক অকাদেমির চেয়ারম্যান, ICCR-এর ট্রাস্টি, লতা মঙ্গেশকর পুরস্কারে সম্মানিত, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২০০১ সালে সাম্মানিক 'ডি.লিট' উপাধিতে ভূষিত, ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের 'বাংলা চলচ্চিত্র প্রসার সমিতি' এবং 'বাংলা চলচ্চিত্র পুরস্কার সমিতি' কর্তৃক শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসেবে পুরস্কৃত, অনবদ্য ছবি 'সীমান্ত পেরিয়ে'-এর জন্য ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সম্মানিত, ১৯৭৮ সালে গ্রামোফোন কোম্পানির Gold Disc,

১৯৭৯ এবং ১৯৮০-তে 'মহুয়া সুন্দরী' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনি'র জন্য ঋত্বিক ঘটক পুরস্কার, ১৯৭৯ সালে All India Critic Association Award, ১৯৮৭-তে National Citizens Award এবং একই বছরে আসাম সরকারের 'শংকরদেব পুরস্কার', 'Man of the Year' পুরস্কার, 'ইন্দিরা গান্ধি স্মৃতি পুরস্কার', ১৯৯২ সালে শিল্পের জগতে তাঁর অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত এবং সর্বোপরি ১৯৯৩ সালে ভারতীয় অস্কার হিসেবে পরিচিত 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারে তিনি সম্মানিত ও অভিনন্দিত হয়েছেন।

ভূপেন হাজারিকার মতো এত সম্মান, মর্যাদা ও ভালোবাসা অর্জন আমাদের দেশে খুব কম শিল্পীর জীবনেই দেখা যায়। সমগ্র জীবনে যিনি ক্ষুদ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও মৌলবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে 'মানুষ মানুষের জন্য' গান গেয়েছেন, এ হেন ব্যক্তি যখন ২০০৪ সালে বিজেপি-র প্রার্থী হয়ে গুয়াহাটি কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন, সেই সময় বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন অনেকেই, কারণ তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের সৃষ্টিকে নস্যাৎ করার শামিল। তাঁরই গান গেয়ে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছিলেন। আসামের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অমলেন্দু গুহ (১৭.১ দ্রষ্টব্য) মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন, **এই একটি ভুল সিদ্ধান্তের জন্য একটি জাতীয় নায়ক অবশেষে 'জোকার'-এ পরিণত হলেন**, এবং বার্ধক্য সত্ত্বেও তিনি ভূপেন হাজারিকার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রচারে অংশ নেবেন। হাজারিকা যে রাজনীতিতে প্রথম অংশ নিয়েছেন তা নয়, ১৯৬৭-১৯৭২ তিনি 'ইনডিপেন্ডেন্ট' প্রার্থী হিসেবে আসাম বিধানসভা আলোকিত করেছেন, কারণ তাঁর সৃষ্টি ও রাজনীতি ছিল একই সুরে বাঁধা। ২০০৪ সালে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর তাঁর জীবনে প্রথমদিকে কিছুটা হতাশা নেমে এসেছিল, কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল তাঁর প্রিয় আসামের মানুষ তাঁকে বর্জন করেছে। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং রাজনীতি বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। আসলে, আসামের কবি-শিল্পীদের মধ্যে তিনি প্রকৃত অর্থে 'আধুনিক' যা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত। তাঁর গানে যেমন সুন্দর প্রকৃতির ছবি আছে, প্রেম-ভালোবাসার নানাদিক আছে, তেমনি অন্যায়, অসাম্য, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রোধও আছে। এমন সব বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি সংগীত-রচনা করেছেন (যেমন, 'তিরাপ সীমান্ত' বা 'শিলংয়ের গোধুলি') যা এর আগে কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না এবং প্রতিটি গান যেন সুন্দর ছবি। গজদন্ত-মিনারে বসে শিল্পচর্চা তিনি করেননি, মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। তাঁর দ্বার সকলের কাছেই উন্মুক্ত, তাই এত

বড়ো মাপের শিল্পী আজও সকলের কাছে 'ভূপেনদা' হিসেবেই পরিচিত। আধুনিক শিল্পীদের তিনি নানাভাবে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছেন। আজও তাঁর ব্যতিক্রমী সুরেলা কণ্ঠ অসংখ্য মানুষকে আকৃষ্ট করে। তিনি বিশ্বাস করেন, সংগীতের জগতে ভারতের স্বর্ণভাণ্ডার পৃথিবীকে জয় করার যে ক্ষমতা রাখে সেটি পণ্ডিত রবিশংকর, আলি আকবর খান বা জাকির হোসেন-এর মতো শিল্পীরা বারবার দেখিয়েছেন। সুতরাং প্রয়োজন ছাড়া অকারণে পাশ্চাত্যের পপ, রক ইত্যাদি সংগীতের পিছনে অন্ধের মতো ছোটাছুটি করা ঠিক নয়, যেটা প্রয়োজন সেটি হল দুই ধ্রুপদী সংগীতের মেলবন্ধন। সমগ্র জীবন ধরে এটাই তিনি সাধনা করেছেন। জীবনের প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে ২০০৮ সালে তিনি Pramathesh Barua Lifetime Achievement Award অর্জন করেছেন। ২০০৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তাঁর ৮৩ বছরে পদার্পণকে কেন্দ্র করে আসাম সরকার তাঁকে 'আসাম রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আসামে কাউকে এইরকম মর্যাদাদান এই প্রথম নজির সৃষ্টি করল। আজ ভূপেন হাজারিকা, তাঁর ভাষায়, একজন 'তৃপ্ত' শিল্পী।

সূত্র : (১) Arup Kumar Dutta, *Bhupen Hazarika : The Roving Minstrel* এবং (২) পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট ও ইন্টারনেট থেকে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে এটি লেখা হয়েছে।

১৭.৫২ মহেন্দ্রমোহন চৌধুরি (১৯০৮-১৯৮৩) (Mahendra Mohan Chaudhury : 1908-1983)

স্বাধীনোত্তর পর্বে আসামের চতুর্থ মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরি মাত্র ১৪ মাস (১১ নভেম্বর, ১৯৭০ থেকে ৩০ জানুয়ারি, ১৯৭২) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। আসামের বরপেটার দণ্ডিরাম চৌধুরির এই সন্তান ১২ এপ্রিল, ১৯০৮-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং আইনের স্নাতক হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন। বর্তমান বরপেটা জেলাটি ছিল একসময় কোচ-হাজোর অংশ এবং মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি পুণ্যভূমির মতো আসামের পবিত্র সত্রভূমি। ষষ্ঠদশ শতকে শ্রীমন্ত শংকরদেব ও মাধবদেব ঐস্থানে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার ফলে বৈষ্ণব-সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত বরপেটায় অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি (১৭.৩ দ্রষ্টব্য), চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানি (১৭.২৩ দ্রষ্টব্য), কিশোরীমোহন পাঠক সহ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধি ১৯৩৪ সালে এবং জওহরলাল নেহরু ১৯৩৭ সালে বরপেটা পরিভ্রমণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে উত্তাল করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

চৌধুরি তাঁর স্মৃতিকথায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সেইসব দিনগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। অসমিয়া ভাষার অঙ্গ হয়েও বরপেটার উচ্চারণ রীতি কিছুটা ভিন্ন ছিল বলে এটি 'বরপেটিয়া' ভাষা হিসেবে পরিচিত। শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রেও আসামে বরপেটা একদিন তুলনামূলকভাবে এগিয়েছিল এবং কয়েকটি নামকরা বিদ্যালয়ও ছিল। মহেন্দ্রমোহন এইরকম একটা পরিবেশেই বড়ো হয়েছিলেন।

গোপীনাথ বরদোলই-এর একান্ত অনুগত কংগ্রেস-সেবী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরি ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ এবং ১৯৫৮ থেকে ১৯৭২ আসাম বিধানসভার সদস্য, ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ এবং ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ যথাক্রমে বিষ্ণুরাম মেধি ও বিমলাপ্রসাদ চালিহা মন্ত্রীসভার সদস্য, ১৯৫৯-১৯৬৭ বিধানসভার স্পিকার, ১ ডিসেম্বর ১৯৫৬ থেকে ৯ এপ্রিল ১৯৫৮ রাজ্যসভার সদস্য, ১৯৫৬-১৯৫৮ এ.আই.সি.সি.-র সাধারণ সম্পাদক, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৮৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ৭৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৭.৫৩ মহেশ্বর নিয়োগ (১৯১৫-১৯৯৫) (Maheswar Neog : 1915-1995)

১৯১৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আসামের শিবসাগর জেলার দিখৌ নদীর ধারে কামারফারিয়া গ্রামে মহেশ্বর নিয়োগ-এর জন্ম। শৈশব থেকেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন নানা কাজের মাধ্যমে। যখন তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র, সেই সময় ঐ নদীর ও মনোরম প্রকৃতির উপর একটি সুন্দর কবিতা লেখার মাধ্যমে সাহিত্যের জগতে তিনি প্রথম প্রবেশ করেছিলেন। যখন সবেমাত্র স্নাতক হয়েছেন, আসামের বিবাহের গান সংক্রান্ত ইংরেজিতে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ ১৯৩৯ সালে *The Indian Review*-র মতো মূল্যবান সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ছোটোবেলা থেকে বাবার আদর্শে (যদিও তাঁর পিতার প্রথাগত শিক্ষা ছিল না) বড়ো হয়েছেন এবং দাদা ডিম্বেশ্বর নিয়োগ (১৭.৩০ দ্রষ্টব্য)-এর পরামর্শকে শিরোধার্য করে সৃষ্টিশীল কাজে অংশ নিয়েছেন। মহেশ্বর ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, জীবনীকার, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ভাষাতাত্ত্বিক ও বানানবিদ, লিপিতত্ত্ব বিশারদ, নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, গায়ক, চিত্রশিল্পী, নাট্যবিদ ও নৃত্যজ্ঞ। ইংরেজি, অসমিয়া ও সংস্কৃত ভাষায় কমপক্ষে ৫০টি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। মহেশ্বর নিয়োগ-এর জীবনী লিখেছেন তাঁরই প্রিয় বন্ধু ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুকুন্দমাধব শর্মা—

নিজেও একজন বড়োমাপের পণ্ডিত। মহেশ্বর নিয়োগ-এর বিভিন্ন বিষয়ে

অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ও ধ্রুপদী শিল্পবিশারদ কপিলা বাৎসায়ন তাঁকে **'রেঁনেসাস যুগের শেষ ব্যক্তিত্ব'** বলে অভিহিত করেছেন। একইভাবে মহেশ্বর নিয়োগ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ "A scholar of such versatile and at the same time profound erudition is rare"। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শেকড়ের অনুসন্ধান করেছেন এবং সবকিছু একই মালায় গাঁথার উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল সর্বত্রগামী। নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার বর্তমান যুগে এরকম এনসাইক্লোপিডিস্ট হওয়ার প্রবণতা সচরাচর দেখা যায় না। তিনি শুধু ভারততত্ত্বই (indology) নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতে আসামতত্ত্ব (Assamology)-এরও প্রবক্তা এবং সুকুমার শিল্পের অন্যতম স্থপতি।

সরল, অনাড়ম্বর, সময়ানুবর্তী, বাহুল্যবর্জনকারী জীবনযাপনের মধ্যে তাঁর মতো সমাজহিতৈষী ও হাস্যরসিক সমকালীন অসমিয়া সমাজে ছিল বিরল। রোদ, ঝড়, বৃষ্টি, কাদার মধ্য দিয়ে সদাহাস্যময় মহেশ্বর তাঁর প্রিয় বাই-সাইকেলে আসামের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত ঘুরে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের শরিক হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। স্বীয় অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ডক্টর মহেশ্বর নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের মর্যাদালাভ করেছিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮-এ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মহেশ্বর নিয়োগ, মাধবচন্দ্র বেজবরুয়া, ফখরুদ্দিন আলি আমেদ (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি), গোপীনাথ বরদোলই ('ভারতরত্ন') প্রভৃতি ব্যক্তির সমবেত উদ্যোগে। শুরু থেকে দীর্ঘ তিরিশ বছর (১৯৪৮-৭৮) তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। এরপর পাঁচ বছর (১৯৭৮-৮৩) পাতিয়ালায় পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন।

সমাজ ও সংস্কৃতির অনালোকিত অঙ্গন সম্পর্কে আলোকপাত করাই ছিল তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতীয় ভাষা সমিতির সদস্য হিসেবে 'ইউনেস্কো'র সহযোগিতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন এবং সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছেন। জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সমগ্র দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে পুরস্কৃত করার নির্বাচনী বোর্ডের তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। বিশ্ববরেণ্য ইহুদি মেনহুইন, বিসমিল্ল খান-এর মতো বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীদের সাথে মহেশ্বর নিয়োগও ছিলেন দিল্লির অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ সংগীত নাটক আকাদেমির নির্বাচিত ফেলো। আসামের ধ্রুপদী

শিল্প সংস্কৃতিকে সমগ্র ভারত সহ বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তাঁর গবেষণালবদ্ধ গ্রন্থগুলি 'সংগীত নাটক আকাদেমি' তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করেছেন ঃ *স্বর-রেখত বরগীত* (১৯৫৮), *Rhythm in the Vaishnava Music of Assam* (১৯৬২), *Sattriya Dance and their Rhythms* (১৯৭৬)। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শংকরদের প্রবর্তিত আসামের 'সত্র' আশ্রমগুলিতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে 'অঙ্কিয়া নট' (একাঙ্ক নাটিকা)-এর সাথে এই ধ্রুপদী নৃত্য পরিবেশিত হত। মহেশ্বর নিয়োগ এই নৃত্যের নাম দিয়েছিলেন 'সত্রীয়'। ১৯৫৮ সালে নতুন দিল্লির 'বিজ্ঞান ভবনে' একটি আলোচনা-চক্রে মহেশ্বর আসামের তিনটি নৃত্য (নটি, ওজাপালি এবং সত্রীয়) সম্পর্কে অসাধারণ আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং সাথে নৃত্য পরিবেশন করেন কমলাবাড়ির মণিরাম দত্ত মুখতিয়ার, মঙ্গলদৈ-এর ললিতচন্দ্র নাথ প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীরা। ড. ইন্দিরা রাইসম গোস্বামী (১৭.৭ দ্রষ্টব্য) তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ সেদিন ড. ভি. রাঘবন, ড. ডি. জি. ব্যাস সহ বিশিষ্ট দর্শক-ঠেসা মন্ত্রমুগ্ধ 'বিজ্ঞান ভবন' মুহুর্মুহু করতালিতে মুখরিত ছিল। এতদিন মাত্র গুটিকয়েক নৃত্য 'ক্ল্যাসিকাল' বা 'ধ্রুপদী' মর্যাদা পেত। তার মধ্যে তামিলনাড়ুর 'ভরতনাট্যম্', কেরালার 'কথাকলি' ও 'মোহিনীঅট্যম্', ওড়িশার 'ওডিসি', উত্তরপ্রদেশের 'কত্থক', অন্ধ্রপ্রদেশের 'কুচিপুডি', উত্তর-পূর্ব ভারতের 'মণিপুরি' বিখ্যাত। **মহেশ্বর নিয়োগের আজীবন চেষ্টার ফলে আসামের 'সত্রী'য় নৃত্য অবশেষে ১৫ নভেম্বর ২০০০ সালে সংগীত নাটক আকাদেমি কর্তৃক ধ্রুপদী নৃত্যের মর্যাদা লাভ করেছে,** যদিও এই স্বীকৃতির পাঁচ বছর আগেই মহেশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

মহেশ্বর নিয়োগের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যুগপ্রবর্তক শংকরদেব সংক্রান্ত গবেষণা গ্রন্থগুলি। ১৯৬৫ সালে প্রথম প্রকাশিত নিয়োগের সুবিখ্যাত গ্রন্থ *Sankardeva and his Times : Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Assam* সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন ঃ "Undoubtedly one of the great books which have come from Assam"। আমেরিকান মিশনারিদের দ্বারা প্রকাশিত আসামের প্রথম সাময়িকপত্র *অরুণোদয়*-এর পুরোনো সংখ্যার উপর গবেষণা করার সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহেশ্বরকে লিখতে দেখে আমেরিকান বন্ধু Gillespi তাঁকে বিদেশ থেকে পত্রিকাটির ফটো-কপি করিয়ে এনে দিয়েছিলেন (তখনো আমাদের দেশে 'জেরক্স' ইত্যাদি আসেনি)। আর্থিক দিক থেকে মহেশ্বর খুব একটা স্বচ্ছল ছিলেন না (সেইসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের বেতন ছিল নগণ্য), তথাপি এরই মধ্যে

নিজের এক বিশাল গ্রন্থাগার তৈরি করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের লোকজন ৩৪২টি মূল্যবান জার্নাল ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল সহ ২৮৪৪টি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ (এর মধ্যে ২০৯৮টি বাংলা ভাষায়, ৬৯৪টি ইংরেজিতে এবং ৫২টি সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায়) Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA)-এ দান করেছিলেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কয়েকটি (উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া) উল্লেখযোগ্য : (১) *Cultural Heritage of Assam*, (২) *Srihastamuktavali : A Text of Ancient Indian Aescetics*, (৩) *Socio-political events in Assam leading to the militancy of the Mayamaria Vaisnavas*, (৪) *Bhaona, the ritual play of Assam*, (৫) *Nedhi Levi Farwell*, (৬) *Anandaram Dhekiyal Phukan*, (৭) *Lachit Barphukan, the Victor of the battle of Saraighat*, (৮) *Lakshminath Bezbaroa, the Sahityarathi of Assam*, (৯) *Religions of the North-East, Studies in the Formal Religions of North-East India* ইত্যাদি।

সূত্র : Mukunda Madhava Sharma, Satyanarayana Ratha, *Dr. Maheswar Neog : a profile and a short bibliography*,
Navamalati Chakraborty, *Maheswar Neog on his eighty-first birthday*.

১৭.৫৪ মাধবদেব (১৪৮৯-১৫৯৬) (Madhabdeva : 1489-1596)

শ্রীমন্ত শংকরদেবের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য ও উত্তরাধিকারী বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ও বৈষ্ণব সন্ত মাধবদেব লখিমপুর জেলার লেটেকুফুখুরি-তে ১৪৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১০৮ বছরের জীবনের অধিকারী (কিছুটা গুরু শংকরদেবের মতো) মাধবদেবের জীবন ও সাধনা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। প্রথমদিকে শাক্ত ধর্মে বিশ্বাসী হলেও শ্রীমন্ত শংকরদেব (প্রথম খণ্ড, অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যখন ব্রহ্মপুত্রের সুবিখ্যাত মাজুলি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেইসময় মাধবদেবের সাথে তাঁর প্রথম যোগাযোগ ঘটে, যেটি 'মহাপুরুষিয়া' ধর্মে 'মণি-কাঞ্চন সংযোগ' নামে পরিচিত। আসামে বৈষ্ণব সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে মাজুলি দ্বীপের একটি অনবদ্য ভূমিকা আছে। শংকরদেব ও মাধবদেবের যৌথ উদ্যোগে অনেক 'সত্র' একদিন ঐ দ্বীপে নির্মিত হয়েছিল, যার বেশকিছু দীর্ঘ ৫০০ বছরের পরে আজও অক্ষত। শংকরদেব আসামের যেখানে পরিভ্রমণ করেছেন, সবসময় তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছেন মাধবদেব। একসময় শংকরদেব ও মাধবদেব এই দুটি নাম ছিল এক ও অভিন্ন। মাধবদেব তিন বছর বরাদি, উনিশ বছর গণককুচি, প্রায়

পনেরো বছর সুন্দরদিয়া, সাড়ে সাত বছর বরপেটা ইত্যাদি অঞ্চলে থেকে একদিকে যেমন শংকরদেবের আদর্শ ও লক্ষ্য প্রচার করেছেন, তেমনি অসংখ্য 'সত্র' নির্মাণ করেছেন। প্রতিটি 'সত্র' নির্মাণের পিছনে ইতিহাস আছে এবং কাজটি সেদিন খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না।

মাধবদেব সৃষ্ট রচনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য *নাম-ঘোষা* নামে কাব্যগ্রন্থ। ভক্তিরসে আপ্লুত শ্রীকৃষ্ণের বন্দনায় মুখরিত ষষ্ঠদশ শতকের অসমিয়া ভাষায় লিখিত *নাম-ঘোষা* শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণের মাধ্যমে মোক্ষ লাভের সন্ধানের কথা ঘোষণা করেছে। আসলে, শংকরদেব-মাধবদেব নামের সাথে আসামে ভক্তি-আন্দোলন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাঁদের 'বরগীত', 'কীর্তন', 'অঙ্কিয়া নট' বা 'ভাওনা' (ভক্তিমূলক নাটক) আসামের বৈষ্ণব আন্দোলনের সাংস্কৃতিক জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। অসমিয়া ভাষায় মাধবদেব রচিত *আদিকাণ্ড রামায়ণ, অর্জুন-ভঞ্জন, চোরধরা, কথা-গুরু চরিত, দধি-মন্থন, পিপ্পরা-গুচুভা, ভূষণ-হেরোভা, কোটোরা-খেলোভা, ভূমি-লেটুয়া* (ভূমি লুটিভা), *ভোজন-বিহার, হাজারি-ঘোষা* ইত্যাদি আসামের ধর্ম-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। জীবনের শেষদিকে আসাম ত্যাগ করে কোচদের রাজ্য কোচবিহারে মাধবদেব আশ্রয় নিতে বাধ্য হন এবং সেখানেই ১৫৯৬ সালে ভিয়াসত্রে তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়।

১৭.৫৫ মানিকচন্দ্র বরুয়া (১৮৫১-১৯১৫) (Manik Chandra Barooah : 1851-1915)

কায়স্থ পরিবারভুক্ত ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী হবিরাম বরুয়ার পুত্র মানিকচন্দ্র বরুয়া ছিলেন ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত আসামের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের নাম। ১৮৫১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর নওগাঁওয়ে তাঁর জন্মের পর পিতা হবিরাম চাকুরির সূত্রে গুয়াহাটিতে স্থানান্তরিত হন, ফলে মানিকের শৈশব গুয়াহাটিতেই কাটে। গুয়াহাটির বিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স ও এফ.এ. পাশ করে ১৮৬৮ সালে উচ্চশিক্ষার অভিপ্রায়ে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখেই তিনি আসামে ফিরে আসতে বাধ্য হন। অনিবার্য কারণে নিজে স্নাতক হতে না পারলেও তাঁর মত শিক্ষাদরদি সমকালীন আসামে ছিল বিরল। তিনি ছিলেন আধুনিক গুয়াহাটির রূপকার। ১৮৮২-তে ব্রিটিশ সরকার প্রতিষ্ঠিত গুয়াহাটি পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন মানিকচন্দ্র বরুয়া এবং তাঁরই উদ্যোগে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম উচ্চশিক্ষার নিকেতন 'কটন কলেজ', 'আর্ল-ল' কলেজ

(বর্তমান গভর্নমেন্ট ল' কলেজ), 'লতাশিল এম.ই. স্কুল' (বর্তমানে মানিকচন্দ্র বরুয়া হাইস্কুল), 'কার্জন হল' (বর্তমানে নবীনচন্দ্র বরদোলই হল), শুক্রেশ্বর ঘাটে 'নর্থব্রুক গেট' ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছিল।

ছাত্রাবস্থায় কলকাতা থাকাকালীন সময়ে *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* পত্রিকার সম্পাদক এবং সমকালীন কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত কৃষ্ণদাস পাল-এর সহায়তায় মানিকচন্দ্র বরুয়া ও জগন্নাথ বরুয়া (১৭.২৬ দ্রষ্টব্য) তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের সাথে দেখা করে তাঁকে আসাম পরিভ্রমণের জন্য অনুরোধ করেন। দুই তরুণ ছাত্রের এই আন্তরিক আবেদন গভর্নর-জেনারেল উপেক্ষা করতে পারেননি। ১৮৭৩ সালে নর্থব্রুক যখন আসামে আসেন, সেই স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার উদ্দেশ্যে বন্ধুদের সহযোগিতায় মানিকচন্দ্র ব্রহ্মপুত্রের ধারে শুক্রেশ্বর ঘাটে এক মনোরম স্থায়ী তোরণ তৈরি করেন যেটি 'নর্থব্রুক গেট্' হিসেবে আজও অক্ষত আছে। নর্থব্রুকের আসাম পরিভ্রমণের সময় মানিকচন্দ্র সহ অন্যরা গভর্নর-জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানিয়েছিলেন ভারতবর্ষে আসামই একমাত্র প্রদেশ যেখানে কোন কলেজ নেই। মানিকচন্দ্রের উদ্যোগে গুয়াহাটিতে কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, কারণ অসমিয়া বুদ্ধিজীবীদের একাংশ কলকাতা-কেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু *আসাম নিউজ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লিখে মানিকচন্দ্র এই ব্যাপারে গণচেতনা সৃষ্টি করেছিলেন এবং ফণীধর চালিহা, বেণুধর রাজখোওয়া-র মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসেছলেন। ১৮৯৯ সালে আসামের তৎকালীন চিফ্-কমিশনার স্যার হেনরি কটনের কাছে মানিকচন্দ্র আবার একটি স্মারকলিপি পেশ করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এইরকম একটি জনপ্রিয় দাবিকে মেনে নিতে কটন সা'হেব ১৮৯৯ সালের ৩ নভেম্বর বাধ্য হন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯০১ সালের ২৭ মে স্যার হেনরি কটনের নামাঙ্কিত বিখ্যাত কটন কলেজের যাত্রা শুরু হয়।

সাংবাদিকতার জগতে মানিকচন্দ্র বরুয়া নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ১৮৮৩ সালে তাঁরই উদ্যোগে অসমিয়া ও ইংরেজি সাপ্তাহিক *আসাম নিউজ* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হেমচন্দ্র বরুয়া'র সম্পাদনায় ঐ পত্রিকাটি সমকালীন আসামে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮৯৫ সালে মানিকচন্দ্রের নিজের সম্পাদনায় অসমিয়া সাপ্তাহিক *আসাম* পত্রিকাটি কালীরাম বরুয়া প্রকাশ করতে উদ্যোগী ভূমিকা নেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতেও মানিকচন্দ্রের উদ্যোগ কম প্রশংসনীয় নয়। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখার উদ্যোগ নেন। তাঁর ব্যবসার জগৎ যে বাধাহীনভাবে এগিয়েছিল তা নয়। প্রথমে ইউরোপীয়দের সাথে যৌথভাবে বাণিজ্য করতে গিয়ে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর হয়। এরপর নানা উত্থান-পতনের মধ্যদিয়ে তিনি অবশেষে ভোলানাথ বরুয়ার পরামর্শে কয়েকটি চা-বাগান সহ একটি ছোটো জাহাজ, বরফ কল ও কয়েকটি কাঠগোলার মালিক হয়ে অসমিয়া উদ্যোগপতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং আসামের ভাবী প্রজন্মের কাছে অনুকরণযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেন।

মানিকচন্দ্র ছিলেন বর্ণাঢ্য চরিত্রের যাঁর ব্যক্তিত্বে চুম্বকের মতো অনেক আকর্ষণী শক্তি ছিল। একা একা না চলে সাংগঠনিক শক্তির উপর নির্ভর করে তিনি ব্রিটিশ আমলাদের অনিচ্ছুক হাত থেকে অসমিয়াদের অনেক অধিকার ও মর্যাদা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আসামের মানুষের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯০৩ সালে তিনি 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু তিনিই ছিলেন ঐ সংগঠনের প্রাণপুরুষ। আসামে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সহ পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত আসামে (১৯০৫-এর পর) অসমিয়াদের অধিকার সুরক্ষার দাবিতে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' সরব ভূমিকা পালন করেছিল মানিকচন্দ্র বরুয়ার নেতৃত্বেই। তাঁর সক্রিয় ভূমিকায় ব্রিটিশ আমলাদেরও একাংশ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ও সম্মেলনের সম্মানিত সদস্য হিসাবে মানিকচন্দ্রকে যুক্ত করেছিলেন যেমন, Moral and Education Conference, Industrial Conference, Female Education Committee, Ambulance Society ইত্যাদি। দিল্লিতে ১৯০৩ এবং ১৯১১ সালে যথাক্রমে ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড এবং পঞ্চম জর্জের সম্মানে আয়োজিত সভায় আসাম থেকে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে মানিকচন্দ্র বরুয়ারও নাম ছিল। ব্রিটিশ সরকার দু'বার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু দুবারই তিনি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এইরকম একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব সমগ্র আসামের গৌরব। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৯১৫ সালে মাত্র ৬৪ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন।

১৭.৫৬ মোমাই তামুলি বরবরুয়া (Momai Tamuli Borbarua)

আহোম শাসনের প্রথমদিকে আহোম বংশমর্যাদার দিকে লক্ষ রেখে মাত্র দুই পদের পাত্রমন্ত্রী ছিলেন ঃ বুরাগোহাইন ও বরগোঁহাই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বরাহি, চুটিয়া, মোরান প্রভৃতি উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্যই বরপাত্রগোঁহাই মন্ত্রী পদটি

সৃষ্টি করা হয়েছিল। দিনে দিনে আহোম রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন অনেক সমস্যাও সৃষ্টি হয়। সুসেঙ্গফা বা প্রতাপ সিংহ'র রাজত্বকালে (১৬০৩-৪১) আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীপদ সৃষ্টি করা হয় ঃ বরবরুয়া ও বরফুকন (প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মোমাই তামুলি ছিলেন আহোম রাজত্বে **প্রথম বরবরুয়া**। যে পাঁচজন পাত্রমন্ত্রী প্রতাপ সিংহ'র সময়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে মোমাই তামুলি বরবরুয়াই ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কালিয়াবার নদীর পূর্বদিকে আহোম রাজের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং একই সাথে প্রধান সেনাপতির দায়িত্বও পালন করতেন।

মোমাই তামুলি'র প্রকৃত নাম ছিল সুকুতি। নামমাত্র মজুরির বিনিময়ে তাঁর ভাগিনেয়-এর জমিতে সুকুতি দাসত্ব ব্যবস্থায় বন্দি ছিলেন। ভাগিনেয় তাঁকে মোমাই অর্থাৎ 'মামা' বলে ডাকতেন বলে সুকুতি সকলের কাছেই 'মোমাই' নামে পরিচিত হন। আহোম রাজাদের রাজধানী চরাইদেও-র সন্নিকটে ভাগিনার ধান জমিতে সুকুতি কর্তৃক একাগ্রচিত্তে বর্ষার জল আটকানোর জন্য সুন্দর বাঁধ নির্মাণ করার দৃশ্য দেখে স্বর্গদেব প্রতাপ সিংহ মুগ্ধ হন এবং তাঁকে দাসত্ব প্রথা থেকে মুক্ত করে প্রথমে 'তিপামিয়া রাজখোওয়া' এবং পরে 'বড় তামুলি' বা রাজ উদ্যানের প্রধান মালি বা কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ করেন। কর্মদক্ষতার বিনিময়ে অবশেষে তিনি প্রতাপ সিংহ'র আমলে ১৬২১ সালে সৃষ্ট 'বরবরুয়া' পদে উন্নীত হন। অভিজাত না হয়েও এত উচ্চপদে নিয়োগ আহোম রাজত্বে কিছুটা অভিনব বলা যায়। মোমাই ছিলেন অত্যন্ত রাজ-অনুগত এবং কীভাবে আহোম রাজত্বের মহিমা ও শক্তি অক্ষুণ্ণ ও প্রসারিত করা যায় সেটিই ছিল তাঁর সতত চিন্তা। যেহেতু প্রতাপ সিংহ বা সুসেঙ্গফা 'বুড়া রাজা' হিসাবেও পরিচিত ছিলেন, এরই জন্য বার্ধক্য ইত্যাদির কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার মোমাই-এর উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিত থাকতেন। জনৈক মুঘল দূত একবার মুঘল শাসকের কাছে মন্তব্য করেছিলেন, **শিবের এই 'নন্দী'টি (মোমাই) যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন আহোম-শাসিত আসামে মুঘল প্রভাব বিস্তার করা খুবই কঠিন।**

যে 'পাইক' ব্যবস্থা ছিল আহোম শাসনের মেরুদণ্ড (প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) মোমাই তামুলির নেতৃত্বে সেই ব্যবস্থার কিছু সংস্কার সাধিত হয়। আহোম প্রথাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই কিছুটা **মুঘলদের 'মনসবদারি' ব্যবস্থার মতো 'বোরা' (২০ জন পাইকের অধিকর্তা), 'শাইকিয়া' (১০০ পাইকের কর্তা), 'হাজারিকা' (১,০০০ পাইকের নায়ক) ইত্যাদি বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করা হয়।** প্রতিটি গ্রাম যাতে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর থাকে এরই জন্য বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ সমানভাবে সর্বত্র

বণ্টনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তামুলি বরবরুয়া। তাঁরই উদ্যোগে উঁচু-নীচু, জাতপাত, ধর্ম নির্বিশেষে আসামের প্রত্যেক মহিলার ক্ষেত্রে বয়ন-শিল্পকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এর অনিবার্য প্রভাব অর্থনীতিসহ সমাজ-জীবন ও শিল্পে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। এককথায়, সেই সময়ের প্রেক্ষিতে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মোমাই তামুলি বরবরুয়া এইরকম একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যেগুলিকে নিঃসন্দেহে 'প্রগতিশীল' পদক্ষেপ বলা যায়। মোমাই তামুলি বরবরুয়া তাঁর কিংবদন্তি-খ্যাত বীর পুত্র লাচিৎ বরফুকনের মতো অত বড়ো যোদ্ধা ছিলেন কি না, তা নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে (যদিও মুঘলরা তাঁকে শিবের 'নন্দী' হিসেবে বর্ণনা করেছেন)। আসলে, মোমাই তামুলি বরবরুয়ার সময়েই নানা কারণে মুঘলদের সাথে 'অসুরার আলি চুক্তি' (১৬৩৯) সম্পাদিত হয় যার ফলে বর্ণাদী নদী এবং অসুরার বাঁধ আহোম ও মুঘল প্রভুত্বের সীমানা হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং আহোম রাজা কামরূপের উপর মুঘল কর্তৃত্ব মানতে (কিছুদিনের জন্য হলেও) বাধ্য হন। এটিকে কেউ কেউ তামুলি'র পশ্চাদপসরণ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। মোমাই যেখানে থেমেছেন, লাচিৎ বরফুকন (প্রথম খণ্ড ১২.২ দ্রষ্টব্য) সেখান থেকে শুরু করে জয়ের পতাকা ছিনিয়ে এনেছেন। মোমাই তামুলি বরবরুয়া নিজেকে পুঁথিগত ভাবে শিক্ষিত করার সুযোগ পাননি বলে মনে ক্ষোভ ছিল, কিন্তু পুত্র লাচিৎ-কে তিনি মনের মতো করে সেদিনের দৃষ্টিতে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে কোনো উদ্যোগেরই অভাব রাখেননি। ফলে, পিতা ও পুত্রের জীবনের গঠন পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, তবে দুজনেই ছিলেন প্রচণ্ড রাজ-অনুগত এবং দেশের জন্য নিবেদিত—প্রাণ যোদ্ধা। অন্যদিকে মোমাই তামুলি বরবরুয়ার অপর পুত্র লালুকসোলা বরফুকন এবং মোমাই-এর ভ্রাতা বাদুলি ফুকন ছিলেন কিছুটা ভিন্ন ধরনের এবং আসামের ইতিহাসে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে।

১৭.৫৭ যোগেশ দাস (১৯২৭-১৯৯৯) (Jogesh Das : 1927-1999)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৫) থেকে অসমিয়া সাহিত্যে আধুনিকতা, বাস্তবতা, যুদ্ধের ভয়াবহতা, সমাজতান্ত্রিক চেতনা নানাভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া (১৭.৪৬ দ্রষ্টব্য), সৈয়দ আবদুল মালিক (১৭.৬৯ দ্রষ্টব্য), বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (১৭.৪৯ দ্রষ্টব্য), যোগেশ দাস প্রভৃতি লেখকদের উপন্যাসে, যেমনটি কবিতার ক্ষেত্রে হেম বরুয়া (১৭.৭২ দ্রষ্টব্য) বা নবকান্ত বরুয়া (১৭.৩৪ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি কবিদের দেখা যায়। অসমিয়া সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করলেও এঁরা কেউই ক্ষুদ্রতাবোধের শিকার হননি, সকলেই ভারতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই

সাহিত্যসেবায় ব্রতী হয়েছিলেন। অসমিয়া ভাষায় এম. এ. পাশ করার পর যোগেশ দাস প্রধানত সাংবাদিক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন এবং 'অহম সাহিত্য সভা'র পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। *প্রহরী* পত্রিকা তিনি দু'বছর সম্পাদনা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে জোড়হাট/গোলাঘাটের সমাজ-জীবনে যে দারুণ অবক্ষয় নেমে এসেছিল এবং চরম অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল সেটি ক্রমশ কীভাবে কাটল, সেই কাহিনি অবলম্বনে তাঁর *দাবর আরু নাই* (মেঘ কেটে গেছে) একটি বিখ্যাত উপন্যাস। তাঁর *সহারি পাই, জোনাকির জুঁই* ইত্যাদি মিষ্টি-মধুর প্রেমের গল্পকে কেন্দ্র করে চারটি সংকলন এবং আটটি উপন্যাসের প্রায় প্রতিটিতেই কিছুটা সমকালীন সময়ের ছবি পাওয়া যায়। সমাজজীবনের খণ্ড খণ্ড অংশ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসের বড়ো আয়নার মধ্যে।

তাঁর ছোটোগল্পের সংকলন *পৃথিবীর অসুখ*-এর জন্য সাহিত্য আকাদেমি-র পুরস্কার পান। ১৯৮৫ সালে 'অসম সাহিত্য সভা'র বিহাপুরিয়া অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। বি. বরুয়া কলেজে অধ্যাপনার সময় তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ভূপেন হাজারিকা, নির্মলপ্রভা বরদোলই, বীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিত্ত 'অসম সাহিত্য সভা'র সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। গল্প, উপন্যাস ছাড়াও লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও যোগেশ দাসের স্থান প্রথম সারিতে। তাঁর রচিত *Folklore of Assam* বাংলা সহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর (৯.৯.৯৯) তাঁর মৃত্যু হয়।

১৭.৫৮ রজনীকান্ত বরদোলই (১৮৬৭-১৯৩৯) (Rajanikanta Bardoloi : 1867-1939)

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে আসামের যেসব ছাত্র কলকাতায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে অসমিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিকে মর্যাদার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য), চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (১৭.২২ দ্রষ্টব্য), হেমচন্দ্র গোস্বামী (১৭.৭৩ দ্রষ্টব্য), কনকলাল বরুয়া (১৭.১০ দ্রষ্টব্য), পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া (১৭.৩৭ দ্রষ্টব্য) সহ অনেকের সাথে রজনীকান্ত বরদোলই-এর নামও উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে রজনীকান্ত ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্যার ওয়াল্টার স্কট্ এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীতে প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি আহোম যুগের অন্তিম লগ্নের ছবি দার্শনিক ও কল্পনা শক্তির মাধ্যমে আঁকার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং 'উপইন্যাচ্ সম্রাট' হিসেবে আসামে পরিচিত ছিলেন।

১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ বরপেটায় এস.ডি.সি. হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনার সময় রজনীকান্ত পাহাড়ের উপজাতিদের সাথে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। ১৮৯৫-তে তাঁর প্রথম উপন্যাস *মিরিজিয়ারী* রচনা করেন, যাতে মিরি উপজাতির সমাজজীবনের ছবি অসমিয়া সাহিত্যে প্রথম চিত্রিত হয়। মিরি নায়ক ও নায়িকার আকর্ষণীয় উদ্দাম প্রেম কীভাবে উপজাতিদের কিছু বিশ্বাস ও প্রচলিত প্রথার জন্য অবশেষে করুণ কাহিনিতে পরিণত হয় তারই জীবন্ত বর্ণনা আছে এই রোমান্টিক উপন্যাসে। রজনীকান্ত বরদোলইকে অনুসরণ করেই পরবর্তী সময়ে বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (১৭.৪৯ দ্রষ্টব্য) নাগা উপজাতিদের উপর *ইয়ারুইঙ্গম*, কিংবা কৈলাস শর্মা *বিদ্রোহী নাগার হতর, অনামী নাগিনি* ইত্যাদি লিখেছিলেন। আহোম যুগের অন্তিম লগ্নে ৰৰ্মীদের আক্রমণে কীভাবে সমাজ-জীবন ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল সেটি রজনীকান্তর নীচের চারটি উপন্যাসে প্রাণবন্ত রূপ পেয়েছে : (১) ১৯০০ সালে লিখিত *মনোমতী*-তে আছে চরম আরাজকতা ও ঘন-অন্ধকার পরস্থিতির মধ্যেও আহোম রাজা লক্ষ্মী সিংহ-র সাথে মনোমতীর গভীর প্রেমের কাহিনি। (২) ১৯২৫-এ রচিত *রঙ্গিলী* উপন্যাসের পিছনেও আছে সেই কালো ইতিহাসের প্রেতছায়া। বর্মীদের আক্রমণ, রাজ-অমাত্যদের নিত্যনতুন ষড়যন্ত্র, বাতাসে হাহাকারের মধ্যেই আবার উজ্জ্বল দীপ্তিতে আবির্ভূতা এক আদর্শ মহিলা রঙ্গিলীর প্রতিচ্ছবি যে, ঘোর তিমির অন্ধকারে শুধু প্রণয় প্রদীপ্তা বা ঘরের ঘরণীই নয়, দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও একটি স্মরণীয় নারী চরিত্রের প্রতীক। (৩) *রহদাই লিগিরি* (রাজসভায় সখিপর্যায়ে দাসী)-তে অনাচারী আহোম রাজার প্রচণ্ড অত্যাচার-নির্যাতন সত্ত্বেও অতি সাধারণ গোত্রের প্রেমিক-প্রেমিকার (রহদাই ও দয়ারাম) জ্বলন্ত প্রেমশিখা কীভাবে প্রেমিকার প্রেরণায় স্থির ও অবিচলিতভাবে শেষপর্যন্ত জ্বলতে থাকে তার এক আকর্ষণীয় চিত্র আছে। (৪) *নির্মল* ভকত উপন্যাসে নায়ক নির্মল বর্মী সৈন্যদের হাতে বন্দি হয়ে ব্রহ্মদেশে (মায়ানমার) নির্বাসন থেকে পলাতক হয়ে ঘরে ফিরে এসে তার স্ত্রী অন্য এক পুরুষের অঙ্কশায়িনী হওয়ার দৃশ্য দেখে জীবন সম্পর্কে হতাশ না হয়ে অবশেষে বৈঞ্চবভক্তে পরিবর্তিত হল। যদিও রজনীকান্ত বরদোলই-এর উপন্যাস প্রধানত নায়িকা-কেন্দ্রিক, এই একটি উপন্যাস নায়ক-প্রধান। সাহিত্য সমালোচকরা *নির্মল ভকত* উপন্যাসে Tennyson-এর *Enoch Arden*-এর প্রতিচ্ছবি পেয়েছেন। এইভাবে বিশ্ব-সাহিত্যের অঙ্গন থেকে শ্রেষ্ঠ ফুলটি নিয়ে রজনীকান্ত বরদোলই অসমিয়া সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ইতিহাস-ভিত্তিক গল্প-কাহিনি রজনীকান্ত বরদোলই-এর লেখনীতে বারবার জীবন্ত রূপ পেয়েছে। *তাম্রেশ্বরীর মন্দির* উপন্যাসে ধনেশ্বর ও অঘোনী (নায়ক

ও নায়িকা)-র মিলনে প্রচণ্ড বাধা আসে মন্দিরের তান্ত্রিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তান্ত্রিকরা হার মানে বৈষ্ণবদের কাছে এবং আচার-সর্বস্বতার পরিবর্তে সর্বগ্রাসী প্রেমের জয় হয়। ১৯১৯ সালে লেখা *দুন্দুভা দ্রোহ*-তে আছে আহোম কুশাসনের বিরুদ্ধে কামরূপ বিদ্রোহের কাহিনি। আহোম রাজ-প্রতিনিধি বদনচন্দ্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে দুই ভাই বীরদত্ত ও হরদত্ত এবং হরদত্তর কন্যা কীভাবে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন সেই করুণ চিত্র আছে গ্রন্থটিতে। রজনীকান্ত'র আর একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস *রাধা রুক্মিণী* মোয়ামারিয়া বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে লেখা, যেখানে এই দুই তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা রাধা ও রুক্মিণী কীভাবে ঘোর তিমির অন্ধকারে আশার প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন সেই কাহিনি আছে। সাহিত্য-নির্ভর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে রজনীকান্ত বরদোলই-এর প্রতিটি উপন্যাস উৎকৃষ্ট উপাদান হতে পারে। আসামের এই **'সাহিত্য সম্রাট'**-এর অসাধারণ অবদানের জন্য 'অসম সাহিত্য সভা' ১৯২৫ সালে নওগাঁও অধিবেশনে রজনীকান্ত বরদোলই-কে সভাপতি পদে বরণ করেছিল।

১৭.৫৯ রূপনাথ ব্রহ্ম (১৯০২-১৯৬৮) (Rupnath Brahma : 1902-1968)

আসামে বোড়ো সমাজের প্রথম আইন-স্নাতক, প্রথম রাজনৈতিক নেতা (কংগ্রেস দলভুক্ত এম. এল. এ., এম. পি., মন্ত্রী) রূপনাথ ব্রহ্ম অত্যন্ত মেধাবী ও কৃতি ছাত্র ছিলেন। ১৯১৭ সালে ধুবরি থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর যথাক্রমে গুয়াহাটির কটন কলেজ থেকে বি. এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯২৮ থেকে কিছুদিন ধুবরি আদালতে ওকালতি করেন। 'গুরুদেব' কালীচরণ ব্রহ্ম'র (১৭.১৪ দ্রষ্টব্য) একান্ত অনুগত শিষ্য হিসেবে যুগান্তরের অবহেলিত বোরো সমাজের কিছু কুসংস্কার ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে গুরুদেবের অসমাপ্ত সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করা জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। এই জন্য কালীচরণের সাথে কবি রূপনাথের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নানাভাবে উৎপীড়িত ও বঞ্চিত বোড়ো জনগোষ্ঠী এতদিন আদালতের প্রাঙ্গণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয় মনে করতেন। রূপনাথ এই মানসিকতার পরিবর্তন আনার জন্য বিনা পয়সায় বোড়োদের 'কেস'গুলি পরিচালনা করতেন। রূপনাথ ব্রহ্ম, নেপালচন্দ্র ব্রহ্মচারী, সতীশচন্দ্র বসুমাতারি প্রভৃতি নেতাদের উদ্যোগেই বোড়ো মহাসম্মেলনের মঞ্চে চিরাচরিত নৃত্যকলা ও

সংগীত স্থান পেয়েছিল, যদিও পূর্বতন 'ব্যাথু' ধর্মের সাথে ঐগুলি সম্পর্কিত হওয়ার কারণে গুরুদেব কালীচরণ এই ব্যাপারে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। রূপনাথদের জন্যই বোড়ো সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বোড়োদের উৎসাহিত করাও রূপচাঁদের লক্ষ্য ছিল, কারণ রাজনৈতিকভাবেই সমাজ-জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। আসামের সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ১৯৩৭ থেকে আসাম আইনসভার সদস্য হিসাবে প্রায় তিন দশক মন্ত্রীত্ব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ক্যাবিনেট মিশনের (১৯৪৬) সামনে উপস্থিত হয়ে আসামের সমতল উপজাতিদের পক্ষ থেকে তিনি এবং তাঁর বিদগ্ধ জামাতা ভীমবর দেউরি সহ অন্যান্যরা 'গ্রুপিং ব্যবস্থা'র বিরোধিতা করে আসামকে পূর্ব-পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়েছিলেন। একই সাথে দিল্লিতে জওহরলাল নেহরু ও মহম্মদ আলি জিন্নার কাছেও তাঁরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করেছিলেন। রূপনাথ ব্রহ্ম'র উদ্যোগের ফলেই ১৯৬০-এর দশকে বোড়ো অধ্যুষিত কোকরাঝাড় স্বতন্ত্র মহকুমার মর্যাদা পেয়েছিল এবং কোকরাঝাড় শহরটির পরিকল্পনাকারী ছিলেন তিনি নিজে। মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে গুয়াহাটিতে তাঁর সরকারি বাসস্থান 'তপোবন' ছিল অত্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছেও উন্মুক্ত, কারণ তিনি ছিলেন সবসময় সমতল উপজাতিদের সুখ-দুঃখের শরিক। ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নের সময় উপজাতিদের জন্য ষষ্ঠ তপশিল গঠনের প্রশ্নে গোপীনাথ বরদোলই (১৭.২০ দ্রষ্টব্য)-এর নেতৃত্বে যে কমিটি তৈরি হয়েছিল রূপনাথ ব্রহ্মের নাম সেটিরও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ঐতিহাসিক সাংবিধানিক বিতর্কে তিনিও অংশ নিয়েছিলেন। কোকরাঝাড় (এস.টি.) কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে ১৯৬৭ সালে চতুর্থ লোকসভার তিনি সদস্য হয়েছিলেন। কিন্তু মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৯৬৮ সালের ২৩ জানুয়ারি তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোকরাঝাড় হাসপাতালে ৬৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিন মন্ত্রীত্বসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন কপর্দকহীন। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের পক্ষপাতী সুদর্শন, নির্লোভ, সংস্কৃতিমনা, স্পষ্টবক্তা, রূপনাথ ছিলেন বোড়োদের চোখে কলঙ্কবিহীন 'tragic hero' যিনি তাঁর পরিবারে একটার পর একটা মৃত্যু দেখেছেন (তাঁর ৮ মাস বয়সে মাতৃহারা, পরে স্ত্রী, দ্বিতীয় পুত্র, দুই জামাতার মৃত্যু) এবং সংসারে একা হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি বোড়ো সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণে আমৃত্যু তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ যোদ্ধা।

১৭.৬০ রেবতীমোহন দত্ত চৌধুরি/শীলভদ্র (১৯২৪-২০০৮) (Rebati Mohan Dutta Chaudhury/Sheelabhadra : 1924-2008)

বিজ্ঞান জগতের ব্যক্তি হয়েও সাহিত্যের জগতে কীভাবে স্থান করে নিতে হয় সেটি তাঁর সৃষ্টি দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন রেবতীমোহন দত্ত চৌধুরি যিনি তাঁর লেখায় ছদ্মনাম 'শীলভদ্র' ব্যবহার করতেন। জন্ম ১৯২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ধুবরি জেলার গৌরীপুরে। শৈশব থেকেই অত্যন্ত মেধাবী রেবতী রংপুরের (বর্তমান বাংলাদেশ) কারমাইকেল কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রে রৌপ্যপদক পেয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর একে একে গুয়াহাটির কটন কলেজে অধ্যাপনা, *আসাম ট্রিবিউন* পত্রিকার সাব-এডিটর, একটি চা-বাগানে এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার ইত্যাদি নানা বৃত্তিতে কর্মরত থেকে অবশেষে ১৯৫৭ সালে গুয়াহাটিতে আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অঙ্কের অধ্যাপক পদে ফিরে আসেন এবং ১৯৮২-তে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে ৪০ বছর বয়সে দত্ত চৌধুরি সাহিত্যচর্চা ও লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন। এরও একটা প্রেক্ষাপট ছিল। তাঁর 'স্মৃতিচারণ'-এ দত্ত চৌধুরি উল্লেখ করেছেন, তাঁর বাঙালি-ঘেঁষা আচার-আচরণ ও উচ্চারণে সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রায়ই বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য শুনতে হত এবং তিনি কতটুকু অসমিয়া তা নিয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতেন। বেরতীমোহন অসমিয়া ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমেই এর যোগ্য উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি ৭টি উপন্যাস এবং ৪০০-র বেশি ছোটোগল্প লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে ৭টি উপন্যাস হল : *মধুপুর আরু তরঙ্গিনী, আগমনীর ঘট, অনাহতগুড়ি, অবিচ্ছিন্ন, প্রাচীর, গোধুলি* এবং *অনুসন্ধান*। ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেই রেবতীমোহন বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং এর মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল : 'বাস্তব', 'বীর সৈনিক', 'লগরিয়া', 'উত্তর নাই', 'সমুদ্রতীর', 'মেজাজ', 'প্রতীক্ষা', 'উত্তরণ', 'শীলভদ্রর কুড়িটা গল্প', 'বিশ্বাস আরু অন্যান্য গল্প', 'তরুয়া কদম', 'মধুপুরর মধুকর', 'অন্য এক মধুপুর', 'দৈত্য আরু অন্যান্য গল্প' ইত্যাদি গল্প সংকলন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, সাহিত্য অকাদেমি, ভারতীয় জ্ঞানপীঠ ইত্যাদি সংস্থাগুলি শীলভদ্রর ছোটোগল্প সংকলন বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবি, তেলেগু ও ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করে দেশজুড়ে প্রচার করেছে। আসামের খুব কম লেখকই আসামের বাইরে এত মর্যাদা

পেয়েছেন, যদিও ভূপেন হাজারিকার (১৭.৫১ দ্রষ্টব্য) মতো সংগীতশিল্পী এর ব্যতিক্রম। রেবতীমোহনের যোগ্যা ও বিদূষী স্ত্রী নলিনীদেবী তাঁর যে কোনো লেখার পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠিকা এবং যেহেতু তাঁর সমালোচনায় যথেষ্ট ধার আছে, এরই জন্য স্ত্রীর মতামতের উপর নির্ভর করে মাঝে মাঝে গল্পের গঠনশৈলী তিনি পাল্টে দিতেন। দত্ত চৌধুরি ১৯৯০ সালে ভারতীয় ভাষা পরিষদ ও আসাম পাবলিকেশন বোর্ডের পুরস্কার, তাঁর 'মধুপুর বহুদূর' গল্পের জন্য ১৯৯৪ সালে 'আসাম ভ্যালি লিটারারি অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন। সমগ্র আসামে পড়ুয়া যুব সমাজের একটা বড়ো অংশ আজ তাঁর প্রবল অনুরাগী, কারণ তাঁর প্রিয় নাম 'মধুপুর'-এর মধুর সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন।

বিজ্ঞান চেতনায় উদ্দীপ্ত এমন পড়ুয়া লেখক আসামে বিরল। আকাশের দিকে তাকিয়ে যা খুশি মনে এল, তা তিনি লেখেননি (যেটি বেশিরভাগ সাহিত্যিক করে থাকেন) ফলে সমাজ জীবনে তাঁর গল্প উপন্যাসের এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব আছে। বিশ্ব সাহিত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা তিনি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং আসামের সাহিত্যচর্চায় সেই জ্ঞান যথাস্থানে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছেন। অসমিয়া সমাজের ভাষা ব্যবহার করলেও, টেক্‌নিক্‌টি ছিল পাশ্চাত্যের। যৌবনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস পড়ে অভিভূত হয়েছেন এবং তাঁদের কাছে তাঁর ঋণ 'স্মৃতিচারণ'-এ অকপটে স্বীকার করেছেন। **একবার জনৈক অসমিয়া কবিকে একজন সমালোচক জানিয়েছিলেন যে, তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন কবিতার প্রভাব আছে, এতে ঐ**

প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, তিনি জীবনে কোনোদিন রবীন্দ্রনাথ পড়েননি এবং যা কিছু লিখেছেন সবই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি, কারও প্রভাব তাতে নেই। রেবতীমোহন কিন্তু এরকম ধৃষ্টতা বা ঔদ্ধত্য দেখানোর সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, **অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ না করলে কোনো সাহিত্যই প্রকৃত অর্থে সমৃদ্ধ হতে পারে না**। শীলভদ্রের (তাঁর ছদ্মনাম ইঙ্গিতপূর্ণ) মতো এমন ভদ্র, মার্জিত, উন্নত রুচিসম্পন্ন, বিনয়ী লেখক সচরাচর দেখা যায় না এবং এটি সম্ভব হয়েছিল তাঁর উদার মানসিকতা এবং বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে হাঁটাহাঁটির জন্য। বিশ্ব সাহিত্যে কত শ্রেষ্ঠ সম্পদ আছে এবং সেগুলির নীচে তাঁর সামান্য সৃষ্টি যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ—এটি প্রকাশ করার সময় শীলভদ্র মিশরীয় ঔপন্যাসিক মাহফুজ-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করতেন। আরবি সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য Naguib Mahfouz (1911-2006) নোবেল প্রাইজ পাবার পরও নিজেকে ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণির লেখক হিসেবে পরিচয় দিতেন।

একবার অধ্যাপক উপেন শর্মা শীলভদ্র'র কয়েকটি গল্পের মধ্যে আমেরিকান ইহুদি ঔপন্যাসিক সউল বিল্লো (Saul Bellow 1915-2005)-র প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। সাথে সাথে শীলভদ্র সেটি সমর্থন করে জানিয়েছিলেন, বিল্লোর উপন্যাস *Herzog* (১৯৬৪) এবং *Mr. Sammler's Planet* (১৯৭০) তাঁর মনে কত গভীর রেখাপাত করেছে, কারণ বিল্লোর নায়ক সব সময়ই বৃদ্ধ মানুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আধুনিক সাহিত্য শীলভদ্র তন্নতন্ন করে পড়েছেন এবং তাঁর প্রিয় লেখক তালিকায় আছেন আমেরিকার জন স্টিনবেক্ (John Steinbeck, 1902-1968), ফ্রান্সের মোপাসাঁ (Maupassant, 1850-1893), রাশিয়ার ফিওদোর মিখাইলোভিচ দস্তয়েভস্কি (Dostoevsky 1821-1881), লিও তলস্তয় (Tolstoy, 1828-1910), আন্তন প্যাভলোভিচ্ চেকভ্ (Chekov, 1860-1904), ইংল্যান্ডের উইলিয়াম সমারসেট মম্ (Maugham, 1874-1965), চেক্ ও ফরাসি ঔপন্যাসিক মিলান কুন্দেরা (Kundera, 1929-), কিংবা কলম্বিয়ার গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মারকোয়েজ (Marquez, 1927-)। **শীলভদ্রের মতে, শুধু নিজের দেশের ধ্রুপদী সাহিত্যই যথেষ্ট নয়, আধুনিক পৃথিবীর চিন্তা-চেতনার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে গেলে বিদেশি সাহিত্য পাঠ অত্যন্ত জরুরি**। দেশের অভ্যন্তরে এত সাহিত্য সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এবং মহাকবি কালিদাসের একান্ত অনুরাগী হয়েও ঋষি অরবিন্দ একদিন সকলকে অতুলনীয় গ্রিক ট্রাজেডি পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শীলভদ্র মনে করেন, শ্রীঅরবিন্দের সেই উপদেশ আজও কত প্রাসঙ্গিক। **একজন লেখকের লেখনী তখনই ক্ষুরধার হতে পারে যখন তিনি প্রকৃত অর্থে পাঠক হন।**

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এত বড়ো মাপের একজন আধুনিক যুক্তিবাদী অসমিয়া সাহিত্যিক কিন্তু 'অসম সাহিত্য সভা'র মতো গৌরবশালী প্রতিষ্ঠানের সুনজরে আসেননি। ১৯৯২ সালে একবার অবশ্য 'অসম সাহিত্য সভা' *আসাম ট্রিবিউন* পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি মারফত (ব্যক্তিগত আমন্ত্রণপত্র না পাঠিয়ে) শীলভদ্রকে নিজের খরচে গোরেশ্বর অধিবেশনে গিয়ে সভাপতি লক্ষধর চৌধুরির (১৭.৪৬ দ্রষ্টব্য) কাছ থেকে কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা (১৭.৬১ দ্রষ্টব্য) পুরস্কার সংগ্রহ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। শীলভদ্রর মতো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য এইরকম আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অথচ 'ভারতীয় ভাষা পরিষদ' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কত সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে কলকাতায় তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল। নিজের জন্মভূমিতে 'অসম সাহিত্য সভা' তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা না দিলেও মানুষের মনের মণিকোঠায় তিনি তাঁর আসন স্থায়ী করে নিয়েছেন। অরূপ পতঙ্গিয়া

কলিতা, ফণীন্দ্রকুমার দেব চৌধুরি, অপূর্ব শইকিয়ার মতো আধুনিক লেখকরা শীলভদ্র'র একান্ত অনুরাগী। তাঁর ৮৫তম জন্মদিন (২০০৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর) গুয়াহাটির 'ডাউন-টাউন' হাসপাতালে কাটে। ঐ হাসপাতালেই তাঁর জন্মদিনে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে তাঁর শেষ গ্রন্থ *অতীতর খণ্ডিত চিত্র* (দ্বিতীয় খণ্ড) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সময় বিশিষ্ট সাহিত্যিক লক্ষ্মীনন্দন বোরা মন্তব্য করেন, **লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য) সময় থেকে আজকের অরূপ পতঙ্গিয়া কলিতার সময় পর্যন্ত প্রথম যে দশটি ছোটোগল্পের জন্য আসাম গৌরবান্বিত বোধ করে, শীলভদ্রর 'ভিন্ন সমদল' গল্পটি তার অন্যতম**। এই অনুষ্ঠানের কয়েক মাস পরেই ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, রেবতীমোহন দত্ত চৌধুরি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চিরতরে বিদায় নেন।

১৭.৬১ লক্ষধর চৌধুরি (১৯১৫–২০০০) (Lakshyadhar Choudhury : 1915-2000)

শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, অভিনেতা, লেখক, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মন্ত্রী লক্ষধর চৌধুরি উত্তর গুয়াহাটির রংমহলে ১৯১৫-এ জন্মগ্রহণ করেন। ভূধর ও উমা চৌধুরির এই কৃতি সন্তান ছিলেন **'জনতার শিল্পী'** যিনি অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজের নির্মম সত্যের ছবি আঁকতে বেশি আগ্রহী ছিলেন এবং থিয়েটার ছিল তাঁর প্রাণ। গুয়াহাটির কটন কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি বাড়ির কাছে একটি স্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪২-এ 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সময় শিক্ষকতায় ইতি টেনে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন, অরুণা আসফ আলি, আচার্য নরেন্দ্রদেব প্রভৃতি নেতৃবর্গের পরামর্শমতো জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পরে তিনি 'প্রজা স্যোসালিস্ট পার্টি' (পি.এস.পি.)-তে যোগদান করেন। আসামে বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে তাঁরই উদ্যোগে পি.এস.পি. এবং পরবর্তী সময়ে এস.পি'র প্রভাব বিস্তৃত হয়। প্রাদেশিক রাজনীতিতে অংশ নিলেও শিল্প সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর অবদান কম ছিল না। তাঁর রচিত *রক্ষা কুমার, মনুহ বিশারি, আলিবাবা, ওমালা ঘর, থুকোনা, নিমিলা অংকো* ইত্যাদি অসমিয়া গ্রন্থ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি ছায়াছবিতেও অভিনয় করতেন এবং ১৯৫৫ সালে *নিমিলা অংকো* কিংবা ১৯৬০ সালে *বদন বরফুকন* চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। লক্ষধর যখন নবম শ্রেণির ছাত্র

ছিলেন, সেই সময় *একলব্য* নাটকটি লিখে সহপাঠীদের মন জয় করেছিলেন। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯২ সালে 'অসম সাহিত্য সভা'র গোরেশ্বর অধিবেশনে তাঁকে সভাপতি পদে বরণ করা হয়েছিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন পি.এস.পি.-র প্রেসিডেন্ট। ১৯৭৮ সালে আসামে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লক্ষধর চৌধুরি শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন। এর আগে ১৯৭৫ সালে তিনি গুয়াহাটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর দ্বিতীয় মেয়র হয়েছিলেন এবং শাসনকার্যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও 'থিয়েটার'কে তিনি ভোলেন নি, কারণ তাঁর চোখে থিয়েটার ছিল সমাজের দর্পণ। এরই জন্য তিনি 'জনতার শিল্পী' হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত। অভিনয় শিল্পের ঐতিহ্য আসামে দীর্ঘদিনের। শংকরদেব ও মাধবদেব-এর সময় থেকে 'সত্র' ও 'অঙ্কিয়া-নট' এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামেও অভিনয়ের মঞ্চ ছিল এবং 'বিহু' থেকে শুরু করে নানারকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসামের গ্রামগুলি চঞ্চল থাকত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ব্রিটিশ সরকারের নানারকম নিষেধাজ্ঞা ও যত্র-তত্র সেনাবাহিনীর ছাউনি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে থিয়েটার শিল্পের প্রায় যবনিকা নেমে আসে। এরই জন্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে লক্ষধর চৌধুরির প্রধান লক্ষ্য ছিল থিয়েটার সহ অভিনয় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা ও সমাজ পরিবর্তনের গান-গাওয়া। তাঁর স্ত্রী ঊষা ছিলেন লক্ষধরের প্রেরণার প্রধান উৎস। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী নির্লোভ লক্ষধর চৌধুরি স্বপ্ন দেখতেন তাঁর জন্মস্থান রংমহল এলাকায় একটি আধুনিক মঞ্চ তৈরি করার। ২০০০ সালে প্রায় ৮৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর ৬ বছর পরে তাঁর স্বপ্ন ইদানীং কিছুটা বাস্তবরূপ পেয়েছে। লক্ষধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র তথা আসামের বিশিষ্ট পদার্থবিদ ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অমরজ্যোতি চৌধুরি তাঁর পিতার স্বপ্নকে সফল করার জন্য সম্প্রতি সকলের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

১৭.৬২ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৮৬৮-১৯১৮) (Laxminath Bezbarua : 1868-1938)

অসমিয়া সাহিত্যে নবজাগরণের অগ্রদূত। সৃজনশীল প্রবন্ধ নাটক, গল্প, কবিতা, গান ও উপন্যাসের মাধ্যমে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল তাঁর অপ্রতিহত প্রাধান্যের জন্য অসমিয়া সাহিত্যে এটি **'বেজবরুয়া যুগ'** নামে অভিহিত।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া যেমন রোমান্টিক, তেমনি তাঁর জন্মও হয়েছিল বিচিত্র এক প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্রহ্মপুত্রের উপর নওগাঁওর কাছে নৌকা

মধ্যে লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাতে। ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত সুলেখক পিতা ডাঙ্গোরিয়া দীননাথ বেজবরুয়া হঠাৎ বদলির আদেশ পেয়ে তাঁর পরিবার নিয়ে বরপেটা যাচ্ছিলেন এবং পথেই এই ঘটনা ঘটে। লক্ষ্মীনাথ তাঁর আত্মজীবনী *মোর জীবন সোঁওরণ* (সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত এবং আরতি ঠাকুর কর্তৃক বাংলায় অনুদিত *আমার জীবন স্মৃতি*)-এ তাঁর জন্ম ও শৈশবের কাহিনি সহ জীবনের উত্থান-পতনের নানা কথা অকপটে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাড়ির ভৃত্য রবিনাথ মজুদোতর বরুয়া'র কাছে প্রতি সন্ধ্যায় রূপকথা, উপকথা, লোককথা ও রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি শোনার মাধ্যমে কীভাবে শৈশব থেকেই তাঁর কাব্য-প্রীতি সৃষ্টি হয়েছিল সেটি তিনি উল্লেখ করেছেন।

১৮৮৬-তে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি কলকাতায় হিন্দু কলেজ (প্রেসিডেন্সি কলেজ)-এ ভর্তি হন উচ্চশিক্ষার অভিপ্রায়ে। ঊনবিংশ শতকে বাংলার 'নবজাগরণে' উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ১৮৯০-এ স্নাতক হয়ে এবং আইন শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ শুরু করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিদেশে যাত্রার, কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মে প্রভাবিত পারিবারিক নিষেধাজ্ঞার জন্য সেটি কার্যকরী হয়নি। রবীন্দ্রনাথ, শেলি, বায়রণ, কিটস্-এর কবিতা অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে যে নতুন ধারায় তিনি কলকাতায় পুষ্ট হয়েছেন, সেই একই ধারা সমকালীন আসামে প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। অসমিয়া মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধের কারণে ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'অসমিয়া ভাষা উন্নতি সাধিনি সভা'র সম্পাদক হিসেবে নতুন আঙ্গিকে ও নতুন রীতিতে তিনি ভাষাকে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। শুধুমাত্র ভাষার বিশুদ্ধতা নয়, প্রকাশভঙ্গির অনন্যতা ছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার একেবারেই নিজস্ব ও অসাধারণ সম্পদ।

দীর্ঘ চারবছর তিনি *জোনাকি* মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বহু মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ *জোনাকি* আসামের সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করে। জোনাকি-যুগ-এর মধ্যমণি ছিলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। ১৯০৯ থেকে *বাঁহী/বহ্নি* নামে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসিক সাহিত্য পত্রিকার সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। অসমিয়া সাহিত্যে ছোটোগল্পের জনক লক্ষ্মীনাথ 'সাহিত্যরথী' উপাধিতে ভূষিত। তাঁর সর্বত্রগামী সৃষ্টিকে বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া ফরাসি কবি সাহিত্যিক ভিক্টর হুগোর (১৮০২-১৮৮৫) সৃষ্টির সাথে তুলনা করেছেন। 'কৃপাবর বরুয়া' ছদ্মনামে রচিত রঙ্গভঙ্গে ভরা হাস্যরসাত্মক রচনাগুলির জন্য তাঁকে সকলে 'রসরাজ' বলে

সম্বোধন করতেন। সমকালীন সমাজের অন্তঃসারশূন্য আচার ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানা ধরনের হাসিঠাট্টা ও ব্যঙ্গাত্মক করে তুলে ধরেছেন 'বরবরুয়ার ভাবর বুড়বুড়ানি' (বরবরুয়া চিন্তার বুদ্বুদ) ইত্যাদি প্রবন্ধের মাধ্যমে। **লক্ষ্মীনাথই প্রথম শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে শিশু সাহিত্যের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন**। তাঁর রচিত *বুড়ি আইর সাধু, কাকাদেউতা আরু নাতি-লরা, জুনুকা* ইত্যাদি শিশুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ১৯২১ সালে "All Assam Students' Conference"-এর সভাপতি এবং ১৯২৪-এ গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত 'অসম সাহিত্য সভা'র সভাপতি হিসেবে লক্ষ্মীনাথের মরমী অভিভাষণ অসমিয়া জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর রচিত এবং কমলাপ্রসাদ আগরওয়ালা সুরারোপিত '**ও মুর আপুনর দেশ, ও মুর চিকুনি দেশ...**' আজও আসামের জাতীয় সংগীত হিসেবে সর্বত্র গীত হয়। সমালোচনাত্মক ও গবেষণামূলক জীবনী রচনার ক্ষেত্রে লক্ষ্মীনাথ ছিলেন আসামের পথপ্রদর্শক। তাঁর রচিত *শ্রীকৃষ্ণকথা, তত্ত্বকথা, শ্রীশংকরদেব, শ্রীশংকরদেব আরু শ্রীমাধবদেব* ইত্যাদি গ্রন্থে ভক্তিস্নাত মনের সঙ্গে আধুনিক যুগোচিত অনুসন্ধিৎসু যুক্তিবাদী মনের অপূর্ব সমন্বয়ের প্রসঙ্গটি অনেকেই উল্লেখ করেছেন।

বেজবরুয়ার নাট্য প্রতিভার সন্ধান মেলে তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে। পাশ্চাত্য শিল্পের আদর্শে রচিত তিনটি ঐতিহাসিক নাটক (১) *জয়মতী কুঁওরি* (গদাপাণি/গদাধর সিংহর স্ত্রী জয়মতী লোরা-রাজার নির্দেশে অকথ্য নির্যাতনের শিকার এবং এই প্রসঙ্গে সুন্দরী নাগা কন্যা ডালিমীর অনবদ্য ভূমিকা), (২) *বেলিমার* (ব্রহ্মদেশ বা মায়ানমার সেনাবাহিনীর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত আসামের জীবনের সূর্যাস্তের করুণ কাহিনি), (৩) *চক্রধ্বজসিংহ* (আহোম রাজা সুপাঙ্গমুঙ্গা/চক্রধ্বজসিংহর আমলে (১৬৬৩-৭০) সরাইঘাটের যুদ্ধে মুঘলদের বিরুদ্ধে সেনাপতি লাচিত বরফুকনের স্মরণীয় সংগ্রাম ও ঘটনাবহুল বীরত্বপূর্ণ কাহিনি অবলম্বনে) আসামের মঞ্চে একসময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ১৯৩৫ সালে প্রথম 'জয়মতী'র উপর ছায়াছবি তৈরি করে যে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন, সেটি লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া রচিত 'জয়মতী কুঁওরি'র কাহিনি অবলম্বনে। ছবিটি দেখে বেজবরুয়া এত খুশি হয়েছিলেন যে, আগরওয়ালা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। লক্ষ্মীনাথ দেশপ্রেমের ইতিহাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এইসব ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে কৃতিত্ব ও মৌলিকতা প্রদর্শন করেছেন এবং নব নব দ্যোতনায় অসমিয়া কাব্যসাহিত্যকে রমণীয় বরণীয় করেছেন। অসমিয়া সাহিত্যে তিনি ছিলেন '**মুকুটহীন রাজা**'।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া শুধু যে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে আসামে নবযুগ আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা নয়, বিভিন্ন সময়ে নিজের জীবনের বিচিত্র অবস্থান এবং **বিভিন্ন ভূমিকার মাধ্যমে অসমিয়াদের ঘর থেকে টেনে বাইরে আনারও পথিকৃৎ ছিলেন।** ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এবং কর্মোপলক্ষে ওড়িশার সম্বলপুরে এবং বঙ্গদেশেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। গোঁড়া অসমিয়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও কলকাতায় তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং জোড়াসাঁকোর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। **বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে অসমিয়া-বাঙালি মৈত্রীকে ঘনিষ্ঠ করার এই উদ্যোগকে** অনেকেই (যদিও পারিবারিক বাধা ছিল) সাধুবাদ জানিয়েছেন। লক্ষ্মীনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, কীভাবে পিতা দীননাথের নির্দেশ অমান্য করে তিনি পাশ্চাত্য বেশভূষা, আচার আচরণের পক্ষপাতী হওয়ার ফলে মাঝেমধ্যে পিতা ও পুত্রের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হত। প্রতিটি যুগ সন্ধিক্ষণে এইরকম ঘটনা দেশকাল নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি পরিবারেই ঘটে। ১৮৯২ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে আসামের প্রতিনিধি হিসাবে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া আসামের বিচারব্যবস্থায় 'জুরি' প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের জোরালো দাবি উত্থাপন করেছিলেন, কারণ ব্রিটিশ সাহেবদের বিচারালয়ে সাধারণ মানুষ অনেক সময়েই সুবিচার পান না। আজকের আসামে ক্রমবর্ধমান উগ্রপন্থী কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে এটি উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক আসামের অন্যতম স্থপতি রবীন্দ্র আদর্শে উদ্বুদ্ধ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ছিলেন সবরকম সন্ত্রাসবাদী কাজের ঘোরতর বিরোধী। *কৃপাবর বরবরুয়ার ভাবর বুড়বুড়ানি*-তে 'বোম' প্রবন্ধে বাংলার বিপ্লবীদের হত্যার রাজনীতিতে প্রভাবিত না হওয়ার জন্য অসমিয়া যুবকদের কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন। বেজবরুয়া মনে করতেন, গুপ্তহত্যার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই, বরং এটি ভীরুতারই নিদর্শন। এখানেই স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবীদের সাথে তাঁর মতপার্থক্য দেখা যায়।

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, এত বড়ো মাপের একটি ব্যক্তিত্ব আসামে জন্মগ্রহণ সত্ত্বেও জীবৎকালে আসামের বাইরে খুব কম মানুষই তাঁর কথা জানতেন। ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত তাঁর ২৫টি প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল অন্যদের অজানা। ফলে আসামের বিখ্যাত **'সাহিত্যরথী'** ভারতসভায় জীবদ্দশায় তেমন মর্যাদা পাননি। ১৯৩৮ সালের ২৬ মার্চ ডিব্রুগড়ে তাঁর জীবনাবসান হয়। 'অসম সাহিত্য সভা' আজও ২৬ মার্চকে 'সাহিত্য দিবস' হিসাবে চিহ্নিত করে বেজবরুয়াকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে। অবশ্য সম্প্রতি দিল্লির 'সাহিত্য অকাদেমি'

তাঁর কিছু রচনা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছে। ১৯৬৮ সালে তাঁর জন্ম শতবর্ষে ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার উপর একটি ডাক-টিকিট প্রকাশ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

সূত্র ঃ (i) P. C. Bhuyan, *Laxminath Bezbaruah* ; (ii) Anima Dutta, *Assam Vaishnavism : Its twentieth Century Voice, Lakshinath Bezbaruah* ; (iii) C. P. Saikia (ed.), *Laxminath Bezbaruah* ; (iv) বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া, *অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস* (বাংলা অনুবাদ, সাহিত্য আকাদেমি) ; (v) লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, *মোর জীবন সোঁওরন / আমার জীবন স্মৃতি* (বাংলা অনুবাদ, সাহিত্য অকাদেমি) ; (vi) *Assamese Language and Literature and Sahityarathi Laxminath Bezbaruah* ; (vii) Hem Barua, *Lakshminath Bezbarua.*

১৭.৬৩ লীলা গোগুই (১৯৩০-১৯৯৪) (Lila Gogoi : 1930-1994)

বিংশ শতকের ৫০-এর দশক থেকে আসামের শিশুসাহিত্য জগতে ও সামাজিক আচার-আচরণের ব্যাপারে শ্লেষ ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ—ভরা লেখনী এবং ঐতিহাসিক রচনার জন্য লীলা গোগুই (পুরুষ) উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছেন। তিনি অসমিয়া ভাষাতেই অধিকাংশ গবেষণামুলক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং ইংরেজিতে কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৮২ সালে পি.এইচ.ডি. পান তাঁর গবেষণা গ্রন্থ *A Critical Study of Assamese Buranji Literature with Special Reference to Some Unpublished Manuscripts*-এর জন্য। ১৯৫১ সালে আসামের একটি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত। ১৯৭৩ সাল থেকে তিনি ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন Co-ordination Committee for Production of Textbooks in the Regional Language নামক সংস্থার সম্পাদক। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণ না করে ব্যঙ্গ-কৌতুক সৃষ্টিতে এবং যুগান্তরের কিছু সামাজিক ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে লীলা গোগুই অত্যন্ত জনপ্রিয় নাম। রঙ্গভঙ্গে ভরা তাঁর প্রহসনাত্মক রচনার মধ্যে *কাপলিং চিগা রেল* (১৯৫৯), *বিয়ারিং-চিঠি* (১৯৭৬), *ব্রিকোদর বরুয়ার বিয়া* (১৯৭৭-৭৮), *বিশেষ কি লিখিম* (১৯৭৮), *ঘেরগ্রি বাস* (১৯৮১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে উপেক্ষিত শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি একটার পর একটা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, যেমন গল্প সংকলন *শোনতারা* (১৯৫৪), কবিতা সংকলন *খাড়া শিয়ালর বিয়া* (১৯৫৪), গল্প-গ্রন্থ *অনুপম কুঁওরর সাধু* (১৯৫৯), পিঁপড়ের জীবন নিয়ে *রঙ্গমনর কথা* (১৯৬৩) ইত্যাদি।

আসামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও লোককাব্য সম্পর্কে লীলা গোগুই গভীরভাবে অনুসন্ধানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যেমন আসামের প্রাচীন শহরগুলির ইতিবৃত্ত *বুরঞ্জি পরশ নগর* (১৯৫৭), আসামে ১৯২৮-৩০ সালে সংঘটিত বিদ্রোহের কাহিনি অবলম্বনে রচিত *হেরোয়া দিনর কথা* (১৯৫৭), সরাইঘাটের যুদ্ধে প্রবল পরাক্রান্ত মুঘলদের পরাস্ত করার কাহিনির উপর ভিত্তি করে রচিত *লাচিৎ বরফুকন* (১৯৬০), *আহোম জাতি আরু অসমিয়া সংস্কৃতি* (১৯৬১), বর্তমান অরুণাচলের (অতীতে আসামের) উপজাতিদের জীবন নিয়ে লেখা *সীমান্তর মাটি আরু মনুহ* (১৯৬৩), আসামের দুই বীরাঙ্গনার কাহিনি *জয়মতী কুঁয়ারি আরু মুলা গভারু* (১৯৬৩), *অসমিয়া লোকসাহিত্যের রূপরেখা* (১৯৬৮), বিহু সংস্কৃতির উপর সমালোচনামূলক নিবন্ধ *বিহু-এতি সমীক্ষা* (১৯৬৯), আসামে তাই-সংস্কৃতির উপর *তাই-সংস্কৃতির রূপরেখা* (১৯৭১), *সাহিত্য-সংস্কৃতির বুরঞ্জি* (১৯৭২) ইত্যাদি। এছাড়া *অসমিয়া লোকগীতি* (১৯৫৭), *মণিরাম দেওয়ানর গীত* (১৯৫৭), প্রায় দেড় হাজার বিহু গানের সংকলন *বিহুগীত আরু বনঘোষা* (১৯৬১) ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য।

শুধু গুরু গম্ভীর গবেষণাই নয়, লীলা গোগুই কয়েকটি উপন্যাস লিখেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এরমধ্যে *স্বরগর মুকুট* (১৯৫৭), ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস *ডাকাইত কোন্?* (১৯৫৭), *নীলখামর চিঠি* (১৯৬৩) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অসমিয়া ভাষায় তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। লীলা গোগুই পরবর্তী সময়ে আসাম সরকারের Department of Historical and Antiquarian Studies-এর ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। মোট ৬০টি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা গোগুই ১৯৯৪ সালে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর বছরে, মর্যাদাপূর্ণ 'অসম সাহিত্য সভা'র মরিগাঁও অধিবেশনে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

১৭.৬৪ শরৎচন্দ্র সিন্‌হা (১৯১৪-২০০৫) (Sarat Chandra Sinha : 1914-2005)

শিক্ষক থেকে মুখ্যমন্ত্রী (১৯৭২-৭৮) হওয়ার কৃতিত্বের অধিকারী শরৎচন্দ্র সিন্‌হা ১৯১৪ সালের পয়লা জানুয়ারি ধুবরি জেলায় চাপর-এর সন্নিকটে ভকতপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মেছিলেন। বাড়ি থেকে বিলাসিপাড়া হাইস্কুলের দূরত্ব ছিল প্রায় ২৫ কিমি। ঐ স্কুলে তিনি প্রতিদিন কিছুটা হেঁটে, কিছুটা বাই-সাইকেলে যাতায়াত করতেন। এত কষ্ট করে পড়াশোনা খুব কম ছাত্রই আজকের

দিনে করতে পারে। তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গুয়াহাটির কটন কলেজে ভর্তি হন এবং স্নাতক হন। এরপর তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্মজীবনের শুরুতে কিছুদিন ওকালতি করলেও শেষে শিক্ষকতাকেই তাঁর জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাজ করে ১৯৪২-৪৪ সালে তিনি বঙ্গাইগাঁও হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং এরপর নিজের গ্রামের কাছে নবপ্রতিষ্ঠিত চাপর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগের বছর তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। আসামের গোয়ালপাড়া জেলাকে প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯৪৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে ধুবরি'র বিলাসিপাড়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রাক-স্বাধীন আসাম বিধানসভায় প্রবেশ করেন। ঐ একই কেন্দ্র থেকে তিনি চারবার জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি প্রথম কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন এবং এরপর একটানা ১৯৭৮ পর্যন্ত ঐ পদে থাকেন। তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা হল, এক, আসাম কেটে মেঘালয় রাজ্যের সৃষ্টি ; দুই, আসামের রাজধানী শিলং থেকে দিসপুরে স্থানান্তর ; তিন, বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষায় শিক্ষার দাবিতে বিরাট আন্দোলন (১৯৭২ সালে)। তিনি দুইবার আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন (১৯৬৪-৬৭ এবং ১৯৭০-৭১)। তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বকালেই জরুরি অবস্থার কালোদিন নেমে এসেছিল, যদিও তিনি মনে-প্রাণে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির জারি করা জরুরি অবস্থাকে মেনে নিতে পারেননি। ১৯৭৮ সালে তিনি ইন্দিরা কংগ্রেস ত্যাগ করে কংগ্রেস (স্যোসালিস্ট) দলের আসাম শাখা গঠন করেন এবং ১৯৮৭ সালে কংগ্রেস (স্যোসালিস্ট) দল শারদ পাওয়ার-এর ন্যাশানালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এন. সি. পি.)-র সাথে মিশে গেলে তিনি এন.সি.পি.-র প্রাদেশিক শাখার সভাপতি হন। বার্ধক্যজনিত শারীরিক অসুস্থতার কারণে মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেন।

আসামের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে শরৎচন্দ্র সিন্‌হা'র সততা, যোগ্যতা, গান্ধিবাদী আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ইত্যাদি সম্পর্কে নানারকম প্রবাদ আছে। তিনি আসামের **Barefooted Chief Minister** নামে পরিচিত, কারণ অধিকাংশ সময় তিনি খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করতেন। স্ত্রী লাবণ্য এবং দুই পুত্র ও তিন কন্যাকে নিয়ে তাঁর সরল সাধাসিধে সংসারে কোনো বাহুল্য ছিল না। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও

সততায় মুগ্ধ হয়ে লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার পি. এ. সাংমা তাঁর মধ্যে মহাত্মা গান্ধিকে দেখতে পেতেন। সমাজের পিছিয়ে-পড়া অবহেলিত মানুষের জন্য শরৎচন্দ্র সিন্‌হা-র দরদে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না, যদিও তাদের মঙ্গলের জন্য তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেননি। আসামে সমবায় ও পঞ্চায়েত আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি এবং সবসময় তৃণমূল স্তরে মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি আসামের **'জননেতা'** হিসেবে খ্যাত। অবসর সময়ে কিছু লেখালেখিও করতেন। তাঁকে বলা হত *The grand old man of Assam Politics* ২০০৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর ৯২ বছর বয়সে এই প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ (জন্ম ইংরেজি নববর্ষে এবং মৃত্যু বড়োদিনে) পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

১৭.৬৫ সত্যনাথ বোরা (১৮৬০-১৯২৫) (Satyanath Bora : 1860-1925)

আসামের বিশিষ্ট গদ্যলেখক ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রবিদ সত্যনাথ বোরা সমসাময়িক সমাজের কিছু অর্থহীন অহমিকা ও অসংগতির উপাদানগুলি কৌতুক রসে সিক্ত করে ব্যঙ্গচিত্রে রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত *কেন্দ্রসভা* নামে সংকলনটি এই রসেরই সমষ্টি। তাঁর গদ্যলেখার রীতির উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য বহন করে *সারথি, চিন্তাকলি, সাহিত্য বিচার, গীতাবলি* ইত্যাদি গ্রন্থগুলি। **সত্যনাথ আসামের 'ফ্রান্সিস বেকন'** হিসেবে পরিচিত। 'জ্ঞানলাভই মনের অন্ধকারকে দূর করে', 'চিন্তাশক্তিই মানসিক হজমের যন্ত্র', 'কুসংস্কার হচ্ছে প্রকৃত উন্নতির প্রধান বাধা', 'গৃহে গ্রন্থ সঞ্চিত স্বর্ণের মত মূল্যবান', 'এই বসুন্ধরা শুধুমাত্র জলধারার স্রোত', 'দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেক সুযোগ হারায়', 'ক্রমাগত অভিনিবেশের ফলেই কঠিন কাজ হয়ে ওঠে সহজ, যেমনটা সোনা গলে যায় অ্যাসিডে'—বেকনের মতো এই ধরনের সমান্তরাল ভাবে গাঁথা বাক্যযোজনা ও সত্যোপলব্ধির মাধ্যমে সত্যনাথ বোরা অসমিয়া সাহিত্যে একটা নীতি-নির্দেশের কথা বলেছেন এবং অসমিয়া ভাষাকে একটা নিজস্ব রূপ দেবার উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁর নানা প্রবন্ধে নতুন ঘননিবদ্ধ অথচ রক্তবাহী শিরা উপশিরার মতো গতিশীল ছন্দ ও দার্শনিক ভঙ্গিও তিনি প্রদান করেন। সাহিত্য সমালোচনার তুলনামূলক প্রকৃত গ্রন্থ হিসেবে তাঁর রচিত **সাহিত্য বিচারকে** অনেকে প্রাধান্য দেন, কারণ ঐ গ্রন্থে তিনি ভারতীয় ও ইউরোপীয়—এই দুই ধরনের সমালোচনা রীতি ও বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। শান্ত গদ্যরীতির নায়ক কালিরাম মেধি (১৭.১৩ দ্রষ্টব্য) অনেক স্থলে সত্যনাথ বোরার অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

অসমিয়া ভাষায় নতুন ব্যাকরণ ও প্রয়োগনীতি প্রবর্তন করে সত্যনাথ বোরা সাহিত্যের জগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। যদিও শ্রীরামপুর মিশনারিদের পক্ষ থেকে ১৮৩৯ সালে M. Robinson (*A Grammar of the Assamese Language*), ১৮৪৮ সালে Rev. N. Brown (*Grammatical Notice of the Assamese Language*), ১৮৯৪ সালে G. F. Nicholl (*An Assamese Grammar*) ইংরেজিতে অসমিয়া ভাষার ব্যাকরণ সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখেছিলেন এবং ১৮৫৬-তে হেমচন্দ্র বরুয়া (১৭.৭৪ দ্রষ্টব্য) *অসমিয়া ভাষার ব্যাকরণ* অসমিয়া ভাষায় লিখেছিলেন, কিন্তু সত্যনাথ বোরা লিখিত *বহাল ব্যাকরণ*-এর মতো অত সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় ব্যাকরণ গ্রন্থ অন্য কেউ লিখতে পারেননি। দীর্ঘদিন গুয়াহাটির 'কটন কলেজ'-এ শিক্ষকতার সময় সত্যনাথ ছাত্রদের উপযোগী ব্যাকরণ গ্রন্থের অভাব সবসময় অনুভব করতেন এবং নিজেই সেই অভাব পূরণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১৭.৬৬ সতীশচন্দ্র কাকতি (১৯১২-২০০৬) (Satis Chandra Kakati : 1912-2006)

সতীশচন্দ্র কাকতি আসামের একজন বরেণ্য সাংবাদিক যিনি লক্ষ্মীনাথ ফুকন, হরেন্দ্রনাথ বরুয়া, ত্রৈলোক্যনাথ শর্মা, কীর্তিনাথ হাজারিকার মতো সংবাদপত্রের জগৎ আলোকিত করেছিলেন। নলবাড়ির উলাবাড়ি গ্রামে ২৩ অক্টোবর, ১৯১২-তে তাঁর জন্ম। শৈশব থেকেই ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে আসাম সরকার কুখ্যাত 'কানিংহ্যাম সার্কুলার' জারি করে ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনৈতিক কাজকর্ম থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিলে, সতীশচন্দ্র ঐ সার্কুলার-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হয়ে অন্য অনেক ছাত্রের মতো সরকারি স্কুল ত্যাগ করেন এবং তিন মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আসামের প্রথম জাতীয়তাবাদী শিক্ষায়তন গুয়াহাটির 'কামরূপ একাডেমি'তে ভর্তি হন এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৬ সালে কটন কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন এবং গঙ্গাপুখুরি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক হন এবং এরপর তিনি তাঁর নিজের বিদ্যালয় 'কামরূপ একাডেমি'তে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। একইসাথে, তিনি ১৯৪৭ পর্যন্ত 'পি.টি.আই.', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড* প্রভৃতি কলকাতার পত্রিকার সাথে যুক্ত থেকে সাংবাদিক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার

পর তিনি সরকারি চাকুরিতে যোগ দিয়ে সহকারী 'পাবলিসিটি অফিসার' হিসাবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন এবং সেই সূত্রে আসামের তৎকালীন রাজ্যপাল স্যার আকবর হায়দারি, শ্রীপ্রকাশ, জয়রামদাস দৌলতরাম এবং মুখ্যমন্ত্রী লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদোলই, বিষ্ণুরাম মেধি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছাকাছি থেকে ঘনিষ্ঠতার বন্ধন নিবিড় করার সুযোগ পান।

আসলে, সতীশচন্দ্র কাকতি ছিলেন জন্মসূত্রে সাংবাদিক। ১৯৫২ সালে আসামের 'সিংহপুরুষ' নামে খ্যাত রাধাগোবিন্দ বরুয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দেন এবং সুবিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকা *আসাম ট্রিবিউন*-এ যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে ঐ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি অনেক দেশ পরিভ্রমণের এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চক্রে যোগদানের সুযোগ সহ দেশ-বিদেশের অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তির সান্নিধ্য পান। *আসাম ট্রিবিউন* থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি *আসাম বাণী* নামে একটি সাপ্তাহিক অসমিয়া পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন। যদিও 'জার্নালিজম'-এর উপর তাঁর কোনো ডিগ্রি ছিল না, তথাপি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জার্নালিজম' বিভাগে তিনি আমন্ত্রিত অতিথি অধ্যাপক হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দিয়েছেন। সমগ্র জীবন-জুড়ে নির্ভীক সংবাদপত্রের জগতে তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার ১৯৯১ সালে সতীশচন্দ্রকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন। আজকের মতো সাংবাদিকের জীবন সেদিন খুব একটা লোভনীয় বৃত্তি বা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সতীশচন্দ্র এই বৃত্তিটি বেছে নিয়েছিলেন এবং জীবনের শেষদিকে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আসামে বর্তমান প্রজন্মের সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তাঁর একটাই ক্ষোভ ছিল যে, বেশিরভাগেরই কোনো সুস্থ আদর্শ নেই এবং 'স্বাধীনতার'র প্রকৃত অর্থ ও ব্যঞ্জনা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। তিনি মনে করতেন, 'হলুদ-সাংবাদিকতা' একটা অপরাধ। সতীশচন্দ্র কাকতি রচিত *Discovery of Assam* গ্রন্থটি পড়লে অনুভব করা যায় কত গভীর মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা ছিল তাঁর জন্মভূমির প্রতি; অথচ একই সাথে সমগ্র দেশের জাতীয় সংহতির জন্য কত তীব্র তাঁর আকুতি। সাংবাদিক হিসেবে যথেষ্ট মর্যাদা ও খ্যাতির শীর্ষে উঠলেও তিনি তাঁর জন্মস্থান উলাবাড়ি গ্রামের মানুষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং সমাজসেবা সহ সকলের উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে সেতু বা সড়ক ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে অথবা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বেশকিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এরই জন্য তাঁর গ্রামের গর্বের প্রতীক ছিলেন তিনি।

দীর্ঘ প্রায় ৯৪ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। ২০০৬ সালের ২০ জুন তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে অশ্রু-সজল বাঁধভাঙা মানুষের বন্যায় চারিদিক প্লাবিত হয়েছিল।

১৭.৬৭ সীতানাথ ব্রহ্ম চৌধুরি (১৯০৮-১৯৮২) (Sitanath Brahma Chaudhuri : 1908-1982)

শিক্ষক, কবি, সংগঠক, সমাজ-সংস্কারক ও বোড়ো উপজাতিভুক্ত সীতানাথ ব্রহ্ম চৌধুরি কোকরাঝাড় সংলগ্ন ভালুকমারিতে ৮ অক্টোবর, ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। উপজাতি জনগোষ্ঠীর তথাকথিত রাজ-পরিবারের সন্তান হলেও তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা তেমন ছিল না। শৈশবে মাতৃহারা সীতানাথ প্রকৃতপক্ষে দিদিদের কাছেই মানুষ হয়েছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সীতানাথ শিবসাগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৩০-এ কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এবং পরবর্তী সময়ে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গুয়াহাটির আর্ল ল' কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু আইন পরীক্ষা অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে ছাত্র-জীবনে ইতি টানতে হয়। শৈশব থেকেই লঙ্গাই নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতেন এবং এই নদীকে কেন্দ্র করেই তাঁর কাব্য-প্রতিভার জন্ম। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *কমলকলি*-র নামানুসারে তাঁর পরিচিত ছিল **'কমলকলির কবি সিংহপুরুষ'** হিসেবে, যিনি কাব্য ছাড়াও আধুনিক আসামের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর প্রতিভার সাক্ষ্য রেখে গেছেন।

স্নাতক হওয়ার পর তিনি আসামের বঙ্গাইগাঁও এলাকায় চলে আসেন। সেইসময় ঐ এলাকায় কোনো বিদ্যালয় ছিল না। সীতানাথের একক উদ্যোগে অনেক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ১৯৩৯-এ বীরঝোড়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন ছাত্রদরদি শিক্ষক। পরবর্তী সময়ে তিনি বিজনী বিদ্যাপীঠ, বঙ্গাইগাঁও কলেজ ইত্যাদি নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বোড়ো গোষ্ঠীর মানুষ হলেও তিনি অসমিয়া ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। **১৮৩৭ থেকে ১৮৭৩ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের ভেদনীতির ফলে আসামের বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অসমিয়ার স্থলে বাংলা ভাষা চালু ছিল। অসমিয়া ভাষাগোষ্ঠীর কাছে এটি ছিল চরম অপমান।** যাইহোক, শেষপর্যন্ত এটি প্রত্যাহৃত হয়। সীতানাথ তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাঙ্গণে শুধুমাত্র অসমিয়া ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের পদ্ধতি চালু করেছিলেন। ধুবরি লোকাল বোর্ড-এর কর্মকর্তা হিসাবে ধুবরি মহকুমার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার স্থলে

অসমিয়া ভাষাকে বাধ্যতামূলক করেছিলেন। কবিতা, জীবনী, শিক্ষা, গ্রাম সংগঠন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গে অসমিয়া ভাষায় তাঁর মোট ৬টি গ্রন্থ আছে। আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালার (১৭.৫ দ্রষ্টব্য) প্রেরণায় তিনি বেশিরভাগ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর মতো বেশকিছু বোড়ো বুদ্ধিজীবী একসময় অসমিয়া ভাষা ও জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি আসার সুবাদে এবং 'অসম সাহিত্য সভা'র সদস্য হিসেবে রীতিমত গর্ব অনুভব করতেন। কিন্তু ১৯৫০-এর দশক থেকে বিশেষত ১৯৫২ সালে 'বোড়ো সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠার পর থেকে বোড়োদের একটা বড়ো অংশ 'অসমিয়া সম্প্রসারণবাদ'-এর বিরুদ্ধে ক্রমশ সরব হতে শুরু করেন। এই পটভূমির মধ্যে থেকেই দুই ভাষাগোষ্ঠীর সংহতিকে গুরুত্ব দিয়ে সীতানাথ ব্রহ্ম চৌধুরি পরপর দু'বার অর্থাৎ ১৯৮১ এবং ১৯৮২-তে যথাক্রমে তিনসুকিয়া ও ডিফু অধিবেশনে 'অসম সাহিত্য সভা'র সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এঁরই জন্য ২০০৮ সালে আসামে সীতানাথ ব্রহ্ম চৌধুরির জন্মশতবর্ষ ঘটা করে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ হয়েছিল।

১৯৫২ সালে গোয়ালপাড়া গারো হিলস্-এর উপজাতি সংরক্ষিত আসন থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে ভারতের প্রথম লোকসভায় তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাজ্য পুনর্গঠনের সময় গোয়ালপাড়া যাতে কোনোমতেই পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে আসামের অভ্যন্তরেই থাকে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি ভাষাগত জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে এক ব্যাপক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। **এই আন্দোলন সেদিন বঙ্গভাষীদের কাছে সমর্থনযোগ্য না হলেও, অসমিয়াভাষীরা, বিশেষত উপজাতি জনগোষ্ঠী, সীতানাথ ব্রহ্ম চৌধুরিকে সামনে রেখে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন এবং এরই ফলে গোয়ালপাড়া আসামের অঙ্গ হিসেবেই থেকে যায়।** পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে তাঁর মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই নানা কারণে তিনি পদত্যাগ করেন। আসলে, সমকালীন রাজনীতির হালচালে বীতশ্রদ্ধ হয়েই তিনি রাজনীতি ত্যাগ করেন এবং সামাজিক কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শেষদিকে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁর অনেক আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই ১৯৮২ সালের ২৩ নভেম্বর প্রায় ৭৫ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন।

১৭.৬৮ সূর্যকুমার ভুঁইয়া (১৮৯৪-১৯৬৪) (Suryakumar Bhuyan : 1894-1964)

হালিরাম (হোলিরাম) ঢেকিয়াল ফুকন-কে সাধারণত আসামের প্রথম আধুনিক ঐতিহাসিকের মর্যাদা দেওয়া হয়, কারণ তিনিই প্রথম আসামের বাইরে অপরিচিত

ও অবহেলিত *আসাম বুরঞ্জি*'র বঙ্গানুবাদ করে বিনা পয়সায় বাংলার জাগ্রত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গ্রন্থটি বিলি করেছিলেন, যাতে আসামকে জানার আগ্রহ সকলের মধ্যে সৃষ্টি হয়। হালিরাম যে কাজটি শুরু করেছিলেন তাতে পূর্ণমাত্রা সংযোজন করেন আসামের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও কবি সূর্যকুমার ভুঁইয়া। পিতা রবিলাল ভুঁইয়া ও মাত্রা ভুবনেশ্বরী'র প্রিয় সন্তান সূর্যকুমার ১৮৯৪ সালের ২৭ জানুয়ারি আসামের নওগাঁও-এ জন্মগ্রহণ করেন। একদিকে কবির কল্পনা এবং অন্যদিকে ঐতিহাসিকের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে সত্যের অন্বেষণ—এই উভয়ের মিলনে. সূর্যকুমার ছাত্রাবস্থা থেকে ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। ইতিহাসের প্রতি, বিশেষত অনাবিষ্কৃত আসামের অতীত কাহিনির প্রতি, সূর্যকুমারের ছিল গভীর মমত্ববোধ। অসমিয়া ভাষা ছাড়াও বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখালেখি করার ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ তৎকালীন আসামে খুব কমই ছিলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় ইডেন হোস্টেলের একটি অনুষ্ঠানে ১৯১১ সালে তিনি বাংলা সনেট প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারের পর ঐ সভার সভাপতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪) এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, নিজের গলায় ঝোলানো মালা আসামের এই তরুণ কবির গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘতম 'পুরস্কার' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়)। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আপোন সুর'-এ কবির আকুতি কাল ও সীমা পার হয়ে অসীমের সাথে মিলতে চায়। সমকালীন বাংলা পত্র-পত্রিকায় তিনি আসামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। অসমিয়া ভাষায় যৌবনে লেখা তাঁর বিবিধ প্রবন্ধাবলী *আহোমর দিন* গ্রন্থে সংকলিত।

১৯১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এম.এ. পাশ করে সূর্যকুমার গৌহাটির কটন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১৮ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সূর্যকুমার তাঁর কবিতা সংকলন *নির্মালি* উপহার দেন এবং আসাম পরিভ্রমণের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান। সূর্যকুমারের কবি প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি হয়েছিলেন। **১৯১৯-এ রবীন্দ্রনাথ যখন আসামে আসেন, রবীন্দ্র-অনুরাগী সূর্যকুমারের সাথে ঘনিষ্ঠতা আরও নিবিড় হয়।** ১৯২০-তে অসমিয়া ভাষায় সূর্যকুমার ভুঁইয়া রবীন্দ্রজীবনী প্রকাশ করেন। অসমিয়া-বাঙালি মৈত্রী যে একসময় কত ঘনিষ্ঠ ছিল উপরোক্ত ঘটনাগুলি তার প্রমাণ। সূর্যকুমারের লেখা *অসম জিয়ারী* (আসাম কন্যারা), *মীরজুমলার অসম আক্রমণ, কুঁয়ার বিদ্রোহ* (আহোম রাজকুমারের বিদ্রোহ) ইত্যাদি ঐতিহাসিক গ্রন্থ

থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আসামের অনেকে কাব্য, নাটক ইত্যাদি রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আসলে, সূর্যকুমারের প্রথম পরিচয় তিনি ঐতিহাসিক এবং সারাজীবন ঐতিহাসিক গবেষণায় লিপ্ত হয়ে তিনি আসাম ইতিহাসের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গৌহাটির 'রেকর্ড-রুম'-এ বা মহাফেজখানায় অধ্যাপক ভুঁইয়ার মতো আর কোনো গবেষক এর আগে এত ব্যাপক সময় অতিবাহিত করেননি, কারণ এই মহাফেজখানা তাঁর কাছে ছিল স্বর্ণখনির সমতুল্য। সত্যান্বেষী ভুঁইয়ার অনুসন্ধান-পদ্ধতি পাশ্চাত্য ধারার অনুকরণে ছিল মতামত-নিরপেক্ষ, বিশ্লেষণ ও বিষয়ভিত্তিক এবং আধুনিক। যদিও তিনি 'লাচিৎ বরফুকন', 'অতন বুরাগোহাইন', 'স্বর্গদেব রাজেশ্বরসিংহ', প্রভৃতি আহোম নায়কদের জীবনী লিখেছেন, কিন্তু প্রচলিত ধারার মতো 'বীর-পূজা'র (Hero-Worship) মাধ্যমে নয়, বরং আসামের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ধর্মের গতি-প্রকৃতির মাধ্যমে বিশেষ যুগের ইতিকথাকে, বিশেষত সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে, জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

বুরঞ্জি সহ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইতিহাসের অমূল্য উপাদানগুলিকে এক জায়গায় সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে গুয়াহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'Department of Historical and Antiquarian Studies' বা DHAS এবং প্রশ্নাতীতভাবে তিনিই ছিলেন DHAS-এর প্রথম Honorary Director। উত্তর-পূর্ব ভারতে ইতিহাসচর্চা ও গবেষণায় DHAS-এর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সূর্যকুমার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, যে জাতি বা ভাষাগোষ্ঠী তার অতীত জানে না, তারা কোনোদিনই উন্নত হতে পারে না। এরই জন্য ইতিহাস-চেতনা-তৃণমূল স্তর পর্যন্ত প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে DHAS-এর যোগ্য ভূমিকার কথা তিনি ভেবেছিলেন। তিনি শুধু লিখিত দলিলের উপর নির্ভর না করে মৌখিক উপাদানকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তাঁর ধ্রুপদী গ্রন্থ *বরফুকনের গীত*-এর প্রথম (১৯২৪) ও দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯৫০) ভূমিকা সেই সাক্ষ্য দেয়। তিনি আসামের মাঠেঘাটে ঘুরে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে 'অসম সাহিত্য সভা'র শিলং অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন সূর্যকুমার

আধুনিক দৃষ্টিতে আসাম ইতিহাসের উপর আরও ব্যাপক গবেষণার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩৬ সালে বিলেত যাত্রা করেন এবং London School of Oriental and African Studies থেকে 'ডক্টরেট' ডিগ্রি অর্জন করেন। লন্ডনে থাকাকালীন সময়ে ভারত ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ C. H. Philips-এর সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে

ওঠে এবং Philips হয়ে ওঠেন অধ্যাপক ভুঁইয়ার কাজের একান্ত অনুরাগী। সূর্যকুমার ভুঁইয়া রচিত ইংরেজি গ্রন্থ *Anglo-Assamese Studies (1771-1826), Studies in the History of Assam, Report on the Work of the DHAS, Assamese historical literature* ইত্যাদির কপি তিনি নিয়মিতভাবে দেশের তৎকালীন বরেণ্য ঐতিহাসিকদের কাছে পাঠাতেন তাঁদের অভিমত জানার উদ্দেশ্যে। এঁদের মধ্যে ছিলেন ঃ যদুনাথ সরকার, নীহাররঞ্জন রায়, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, প্রতুল গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব। এছাড়া রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথেও তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং পরামর্শ চাইতেন। ১৯৩৭ সালে অধ্যাপক গিউসিপ্পি টুকি'র আমন্ত্রণে রোমের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট-এ আসামের সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়েছেন যা ইতালির দৈনিক পত্রিকা *Popolo D'Italia*-তে ফলাও করে প্রচারিত হয়েছিল। তিনি লন্ডনের সিভিল সার্ভিস ক্লাবেও আসামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর অনেকবার বক্তব্য পেশ করেছিলেন। এইভাবে শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বিদেশের মাটিতেও তিনি আসামকে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন। অধ্যাপক ভুঁইয়ার উদ্যোগেই আসাম-চর্চা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে প্রসারিত হয় এবং শুধু আঞ্চলিক আঙ্গিকে নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে আসাম-সমস্যার পর্যালোচনার এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। সূর্যকুমার ভুঁইয়া মনে করতেন, ১৮২৬ সালের ইয়ান্দাবো চুক্তির পর নয়, বরং তার চার বছর আগে ১৮২২ সালের ২১ জুন যেদিন বর্মীরা আসাম দখল করেছিল সেদিন থেকেই আসাম পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হল এবং একইসাথে সেদিন থেকেই শুরু হল মুক্তি সংগ্রাম।

এক সময় আসামে একটা বিশ্বাস ছিল, 'বুরুঞ্জি' রচনা পুণ্য কাজ। কত ধরনের 'বুরঞ্জি' সমগ্র আহোম শাসনকালে রচিত হয়েছে। (**'বুরুঞ্জি' বানান 'বুরুঞ্জী' লেখার রীতিও আছে।**) দীর্ঘদিন এই বুরুঞ্জিগুলি যখন অনাদরে অবহেলায় প্রায় ধ্বংসের পথে যাচ্ছিল, সেইসময় সূর্যকুমার ভুঁইয়া অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগুলি উদ্ধার করেন পুণ্য কাজ হিসেবে নয়, ইতিহাসের আকর গ্রন্থ হিসাবে। অধ্যাপক ভুঁইয়া *বুরুঞ্জীর বাণী*তে লিখেছেন, "আহোম বুরুঞ্জীর লেখকরা ভাব ও কল্পনাজড়িত বিবরণ লিখতেন না—বরং সেদিকে তাঁরা মুক্ত-পুরুষই ছিলেন—তাঁরা ঘটনাপঞ্জির সততা, দৃঢ়তা ও সত্যভাষণের উপরই বেশি জোর দিতেন, কারণ তাঁদের লেখনী উদ্ভুত বিবরণীগুলি রাজ্যের সমাচারদর্পণ মাত্র এবং রাষ্ট্রশাসনে অঙ্গীভূত তথ্যলিপি, যার জন্য তাঁরা রাজসভার ও মন্ত্রী-সংসদের কাছে দায়ী ছিলেন।" (বিরিঞ্চি কুমার

বরুয়া, *অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস*, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, পৃ. ১০৮-১০৯ থেকে উদ্ধৃত)। আসামে বুরঞ্জি সাহিত্যের উদ্ধারকর্তা পথিকৃৎ ছিলেন সূর্যকুমার ভুঁইয়া। তিনি যেমন একদিকে *পাদশাহী বুরুঞ্জী*র সম্পাদনা করেছেন, তেমনি ১৯৩০ সালে *আসাম বুরুঞ্জী*, *কামরূপ বুরুঞ্জী*, ১৯৩২-এ *দেওধাই বুরুঞ্জী*, ১৯৩৩-এ *তুংখুংঙ্গীয়া বুরুঞ্জী*, ১৯৩৬ সালে *কাছাড়ি বুরুঞ্জী*, ১৯৩৮-এ *ত্রিপুরা বুরুঞ্জী* ইত্যাদি প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৪৮ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় উপাচার্য (১৯৫৭-৬০) ছিলেন সূর্যকুমার ভুঁইয়া এবং ঐ সময় উত্তর-পূর্ব ভারতের এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়টি গৌরবের শিখরে উঠেছিল। যে 'কটন কলেজ'-এ অধ্যাপক ভুঁইয়া তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন, ২০০১ সালে সেই কলেজ প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে কলেজ-সংলগ্ন 'সূর্যকুমার ভুঁইয়া লাইব্রেরি'র প্রসঙ্গটি পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হয়েছিল। প্রায় দেড় লক্ষ দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও গ্রন্থের এই পাঠাগারটি উত্তর-পূর্ব ভারতে বৃহত্তম হলেও একদিনের বুরঞ্জি সাহিত্যের মতো আজও চরম অবহেলায় অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে সূর্যকুমার ভুঁইয়ার একটি প্রতিকৃতিও নেই, যদিও পাঠাগারটি তাঁরই নামে নামাঙ্কিত।

সূত্র : i. Maheswar Neog and H. K. Barpujari (edited), *Prof. Surya Kumar Bhuyan Commemoration Volume*, Gauhati, 1966.

ii. বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া, *অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস*, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ১৯৮৫।

iii. Sudeshna Purakayastha, "Surya Kumar Bhuyan—a great historian", in *The Assam Tribune*, Guwahati, 5 July, 2008.

iv. Yamini Phukan, 'Remembering Surya Kumar Bhuyan', in *The Assam Tribune*, Guwahati, 05.07.2007.

১৭.৬৯ সৈয়দ আবদুল মালিক (১৯১৯-২০০০) (Syed Abdul Malik : 1919-2000)

শিক্ষক, পত্রিকা-সম্পাদক, সাহিত্যিক, অসংখ্য গ্রন্থ রচয়িতা, রাজ্যসভার সদস্য সৈয়দ আবদুল মালিক ১৯১৯ সালের ১৫ জানুয়ারি আসামের গোলাঘাট জেলার নহরানি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ রহমৎ আলি এবং মাতা সৈয়দা লুৎফুন্নিসা পুত্রের লেখনীকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। অভিজাত মুসলিম পরিবারের সন্তান হয়েও আবদুল মালিকের বেশিরভাগ লেখাই সমাজের পিছিয়ে-

পড়া, যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত, নির্যাতিত, দলিত মানুষের মুক্তির সন্ধানে নিবেদিত এবং এরই জন্য অনেকে তাঁর লেখায় মার্কসবাদের সন্ধান পেয়েছেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে অসমিয়া মাসিক পত্রিকা *বহ্নি*তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস *ল সা গু*-তে তিনি দেখিয়েছেন, কুবেরের রত্ন-ভাণ্ডারের নীচে পড়ে আছে ঐ পদদলিত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট, অবহেলিত 'ল সা গু'রা যাদের দিকে ফিরে তাকাবার সময় কারো নেই। তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস *রথর চকরি ঘুরে* (রথের চাকা ঘোরে), *কণ্ঠহার* ইত্যাদি একই সুরে বাঁধা। আবদুল মালিক যে সময় সাহিত্যে হাত দিয়েছিলেন সেই সময় (বিশেষত স্বাধীনোত্তর কালে) যোগেশ দাস (১৯২৭-১৯৯৯), বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (১৯২৩-১৯৯৮) প্রভৃতি সৃজনশীল অসমিয়া লেখকরা একই পথের পথিক ছিলেন। আবদুল মালিক ছিলেন অসমিয়া সাহিত্যে পুরোনো ও নতুন যুগের মধ্যে সেতু বা বন্ধন। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) সমাপ্ত হবার সাথে সাথে তাঁর জন্ম, তথাপি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) প্রস্তুতিপর্ব থেকে পরিণতি সমগ্র অসমিয়া সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল সেইসব শৈশব স্মৃতির উপর নির্ভর করেই তিনি আমৃত্যু লিখে গেছেন এবং সাহিত্যের আঙিনায় নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে তাঁর সৃষ্ট কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, জীবনী, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে সংখ্যার দিক থেকে তিনি নিঃসন্দেহে আসামে প্রথম স্থানে আছেন। অধ্যাপক হেম বরুয়া (১৭.৭২ দ্রষ্টব্য) তাঁর (আবদুল মালিক) সৃষ্টি সম্পর্কে এইভাবে মন্তব্য করেছেন ঃ "an inspiring creator of character" এবং তাঁর শব্দচয়ন ও লেখার স্টাইলকে বলেছেন "examples of skillful and conscious craftmanship in which every word tells and every effect is brought into a natural focus"। সৈয়দ মালিক রচিত ২৫টি গল্পের বই, ৬০টি উপন্যাস, ৫টি কবিতা-সংকলন, ৩টি শিশু পাঠ্য, অসংখ্য প্রবন্ধ, অনুবাদ ও জীবনীর অধিকাংশই অসমিয়া পাঠকের কাছে আদৃত হয়েছে।

আবদুল মালিকের অনেক গ্রন্থে তাঁর জন্মস্থান নহরানি গ্রামের মাটির গন্ধ, গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া ধানসিড়ি নদীর শব্দ ও নদীর পাড়ের সাধারণ মানুষের কল্লোল ও জীবন কাহিনির জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *সূর্যমুখীর স্বপ্ন*-র চরিত্রগুলি আলোর সন্ধানে সূর্যমুখীর মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু জীবনের শেষদিকে সৈয়দ মালিক যে আশাহত হয়েছিলেন সেটি উপলব্ধি করা যায় তাঁর গল্প 'স্বপ্নভঙ্গ' পড়লে, যেখানে ধানসিড়ি নদীর পাড়ে 'ডালিম' গ্রামের হিন্দু-মুসলিম জনগোষ্ঠী স্বাধীনোত্তর কালের কয়েক

দশকের মধ্যেও যোগাযোগ, শিক্ষা, সংস্কৃতি সহ সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের স্বাদ থেকে বঞ্চিত। অসমিয়া ভাষায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক পুরস্কৃত *অঘোরি (যাযাবর) আত্মার কাহিনি, ড. অরুণাভ'র অসম্পূর্ণ জীবনী, কবিতার নাম লাভা, প্রাণ-সমুদ্র, ত্রিশুল, দুখান নদী আরু এখান মরুভূমি*, রূপ কানোয়ার জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস *রূপ তীরর যাত্রী* এবং মহাপুরুষ শংকরদেবের জীবনী অবলম্বনে *ধন্য নর তনু ভাল* ইত্যাদি। তাঁর গল্প ও উপন্যাস শুধু যে গ্রাম-ভিত্তিক ছিল তা নয়, গ্রাম ও শহর, পুরুষ ও নারী সহ সমাজের বিভিন্ন জীবিকার মানুষ যেমন, শিক্ষক, ছাত্র, শিল্পী, ভণ্ড, দুর্বৃত্ত, রাজনীতিবিদ, আমলা, ধনী ব্যবসাদার, বারাঙ্গনা, সাধু, ভিক্ষুক, সমাজসেবী সহ হরেকরকম মানুষের সমাবেশে ও চিত্তাকর্ষক ছবিতে ছিল জমজমাট। তাঁর লেখার স্টাইলটি ছিল নিজস্ব। অনেক গল্পই হঠাৎ করে শেষ করায় অসমাপ্ত বলেই মনে হ'ত, যদিও এটাই ছিল সম্ভবত প্রকৃত শিল্পীর লক্ষ্য, কারণ বাকিটা তিনি পাঠকের উপর ছেড়ে দিতেন। সৈয়দ মালিকের ধর্মনিরপেক্ষ মরমী মনের সাক্ষ্য তাঁর সমগ্র রচনায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর রচিত *যীশু খৃস্টর ছবি*, কিংবা *মরম* (প্রেম) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আসামের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাথে (*বহ্নি, আহ্বান, জয়ন্তী, রামধনু* ইত্যাদি সাহিত্য-পত্র) তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৭ সালে 'অসম সাহিত্য সভা'র অভয়পুর অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং 'সাহিত্যাচার্য' উপাধিতে ভূষিত হন। মূলত সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য তিনি জীবনে মর্যাদা পেলেও (যেমন, সাহিত্য অকাদেমি'র পুরস্কার সহ শংকরদেব পুরস্কার, আসাম উপত্যকার পুরস্কার, 'পদ্মশ্রী' এবং 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রাপ্তি) এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে Asian Writers' Conference-এ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করলেও, তাঁর সংগ্রামী জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা আজও হয়নি এবং আসামের বাইরে অনেকের কাছেই সৈয়দ আবদুল মালিক নামটি আজও অপরিচিত রয়ে গেছে। ২০০০ সালে ২০ ডিসেম্বর ৮১ বছর বয়সে আসামের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

১৭.৭০ হিতেশ্বর বরবরুয়া (১৮৭৬-১৯৩৯) (Hiteshwar Barbarua : 1876-1939)

প্রাচীন আহোম রাজবংশের সন্তান হিতেশ্বর বরবরুয়া আহোম ইতিহাসের প্রাণবন্ত অধ্যায়গুলি তাঁর সুবিখ্যাত *আহোমের দিন* নামে ঐতিহাসিক নাট্য গ্রন্থে উল্লেখ

করেন। দূরদর্শিনী রাজমাতা, উন্নতমস্তক প্রধানমন্ত্রী পূর্ণানন্দ বুরাগোহাইন (প্রথম খণ্ডের নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য), দেশদ্রোহী বদনচন্দ্র বা দুর্বলমনা চন্দ্রকান্ত সিংহের (প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) চরিত্রচিত্রণ এবং আহোম রাজ্যের পতনের দৃশ্য হিতেশ্বর বরবরুয়া নিপুণ হাতেই এঁকেছেন। কিছু কাল্পনিক চরিত্র থাকলেও *আহোমের দিন* গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বাংলা সাহিত্যের মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং নবীনচন্দ্র সেন'কে অনুসরণ করে হিতেশ্বর অমিত্রাক্ষর ছন্দে দীর্ঘ আখ্যান কবিতা এবং ইংরেজি রীতি অনুসারে অনেকগুলি চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট লিখেছেন। যৌবনে রচিত তাঁর সর্বপ্রথম কবিতা সংকলন *ধোপাকলি* (১৯০২) একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর সুদীর্ঘ কাব্য, *কামতাপুর ধ্বংস আরু বিরহিনী বিলাপ* (কামতাপুরের পতন এবং বিরহজর্জর প্রেমিকার বিলাপ) ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়। কীভাবে রাজা নীলাম্বরের সময় মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে গৌড়ের নবাব কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে কামতাপুর রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তার করুণ কাহিনি এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। ১৯১৩-তে প্রকাশিত *তিরোতার আত্মদান* (একটি মহিলার আত্মদান) কাব্যে আহোম রাজমহিষী জয়মতী কীভাবে অত্যাচারী 'লরা রাজা'র অত উৎপীড়নের পরেও তাঁর আত্মগোপনকারী স্বামীর সন্ধান শত্রুকে না দিয়ে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ধীরে ধীরে আত্মাহুতি দেন সেই মর্মস্পর্শী কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ১৯১৫-তে *যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহোম রমণী* বা মূলা গাভরুর দীর্ঘ আখ্যান কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৫৩২-৩৩ সালে মুঘলদের ষষ্ঠ ও সপ্তম অভিযানকালে অসমিয়া বীরাঙ্গনা 'মূলা' কী পরিপ্রেক্ষিতে সৈন্যদলে যোগদান করে দু'জন মুঘল সেনাপতিকে হত্যা করে স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নেন এবং অবশেষে রণক্ষেত্রে নিজে প্রাণবিসর্জন দেন সেই বীরত্বসূচক কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। এককথায়, ইতিহাস-আশ্রিত কাহিনি অবলম্বনে অসাধারণ কাব্যনাট্য রচনার মাধ্যমে হিতেশ্বর বরবরুয়া অসমিয়া সাহিত্যের জগতে একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন।

১৭.৭১ হীরেন গোঁহাই (১৯৩৯) (Hiren Gohain : 1939-)

সাম্প্রতিককালে আসামের অন্যতম প্রতিভাবান ব্যক্তি যিনি সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক প্রশ্নে তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন, যদিও নিজের দেশে হীরেন গোঁহাইকে সরকারি কোনো খেতাব আজও দেওয়া হয়নি। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস করার পর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬২ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ.-তে

প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এবং রেকর্ড নম্বর পেয়ে দিল্লির একটি কলেজে কয়েকবছর অধ্যাপনার পর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ সালে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল 'Milton and the Seventeenth Century Puritan Revolution of England', যা ছিল কোনো ভারতীয় গবেষকের কাছে ইংল্যান্ডের মাটিতে অকল্পনীয়। মিলটন নিয়ে এত গভীরভাবে চর্চা এর আগে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর হয়নি। তাঁর অসাধারণ থিসিস্‌টি পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাকারে *Tradition and Paradise Lost* নামে প্রকাশিত হয়। ইচ্ছা করলে ইংল্যান্ডে ইংরেজি সাহিত্যচর্চা করেই হীরেন গোঁহাই সমগ্র বিশ্বে নিজের স্থান করে নিতে পারতেন, যা তাঁর সহপাঠী গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক্-এর মতো ভারতীয়রা আজ করছেন। কিন্তু হীরেন গোঁহাই পাশ্চাত্য চিন্তার আলোকে অসমিয়া ভাষায় সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাসচর্চাকে প্রাধান্য দিয়ে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক পদেই সমগ্র জীবন কাটিয়ে দিলেন। নিজের মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ কত গভীর হলে এইভাবে পাশ্চাত্য দুনিয়ার লোভনীয় পদের হাতছানিকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব!

একসময় কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক (১৭.১৬ দ্রষ্টব্য) বা বাণীকান্ত কাকতি (১৭.৪৩ দ্রষ্টব্য) পাশ্চাত্য ধারা বা চিন্তার আলোকে অসমিয়া সাহিত্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করার একটা রেওয়াজ তৈরি করেছিলেন ; এতে অসমিয়া ইতিহাস ও সাহিত্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা, অথবা গর্ব করার মতো অধ্যায় বা উন্নত চেতনায় উদ্ভাসিত হওয়ার একটা সুযোগ থাকত বা নতুন কিছু করার প্রেরণাও পাওয়া যেত। এইরকম তুলনামূলক বিশ্লেষণের ধারা ১৯৫২ সালে বাণীকান্ত কাকতির মৃত্যুর পর প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হীরেন গোঁহাই-এর উদ্যোগে এটি পুনঃপ্রবর্তিত হয় এবং অসমিয়া ভাষার গ্রন্থকে বিশ্বের ধ্রুপদী গ্রন্থের পাশে রেখে তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার মাধ্যমে একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। গোঁহাই একা নন, তাঁকে সাহায্য করতে বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া (১৭.৪৬ দ্রষ্টব্য), জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য) মতো প্রতিভাবান সাহিত্যিক, শিল্পীরা এগিয়ে আসেন। অনেক তরুণ লেখক, গবেষককে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়ে হীরেন গোঁহাই বস্তুবাদী দৃষ্টিতে যে কোনো ঘটনাকে বিচার করার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁদের আলোকিত করেছেন। অসমিয়া ও ইংরেজিতে তিনি রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা, সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের চিন্তা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছাত্র জীবন থেকে আজ পর্যন্ত লিখে চলেছেন।

হীরেন গোঁহাই একজন বিশিষ্ট কবি, যদিও তাঁর কবিতাগুলি 'মোর দেশ', 'পাষ্টপাদপ', 'নতুন প্রভা', 'নতুন পৃথিবী' সহ নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে এবং আজও তাঁর কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়নি। অসমিয়া কাব্য, কবিতা, সাহিত্যে বিভিন্ন ধারার প্রভাব-সংক্রান্ত তাঁর রচিত সাহিত্য-সমালোচনার গ্রন্থ এবং ১৯৭০ সালে প্রকাশিত *সাহিত্যের সত্য (The Truth of Literature)* এক অমূল্য সংযোজন। সত্যানুসন্ধানী, মানবতাবাদী গোঁহাই *আধুনিকতার সংজ্ঞা, অতীত আরু অত্যাধুনিক, সেক্সপীয়ার আরু অধ্যাত্মবাদ, সাম্প্রতিক অসমিয়া গল্প সাহিত্যে নতুন বাস্তববোধ, বাস্তবর স্বপ্ন (The dream of reality), অসমিয়া জাতীয়তাবাদের সমস্যা, কবিতার উৎস সন্ধানে, মার্কসবাদ আরু ধর্ম* ইত্যাদি মৌলিক প্রবন্ধ সহ অসমিয়া ভাষায় প্রায় ৪০টি তাত্ত্বিক গ্রন্থ রচনা করেন ; যার মধ্যে *আসাম আন্দোলন ঃ প্রতিশ্রুতি আরু ফলশ্রুতি, মানবতার সন্ধানত, মাজুলিরা জিলিনানি, সাহিত্য সত্ত্ব আরু সাধনা, কালস্রোত আরু কাণ্ডারি, সাগরতলির শঙ্খ ঃ নীলমণি ফুকনর নির্বাচিত কবিতা* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইংরেজিতেও তাঁর অনেক গ্রন্থ আছে যার মধ্যে *The Idea of Popular Culture in the Early Nineteenth Century Bengal, Assam : A Burning Question, Nature and Art in Shakespeare, The Magic Plant* ইত্যাদি অনেকের কাছেই সুবিদিত। গ্রন্থগুলির নাম শুনলেই অনুমান করা যায় যে, শুধু আসামের মধ্যে বিচরণ না করে তাত্ত্বিকভাবে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির কত বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর তিনি অনুসন্ধান করে চলেছেন। এত উন্নত চেতনা-সমৃদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী বর্তমান আসামে দুর্লভ।

হীরেন গোঁহাই-র মতো এই রকম সমাজ-সচেতন অধ্যাপকও বর্তমান বিশ্বে ক্রমশ বিরল প্রজাতিতে পরিণত হচ্ছেন। গজদন্তমিনারে বসে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা তিনি করেননি, আসাম সহ সমকালীন পৃথিবীর প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সমস্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আবেগ-বর্জিত বস্তুবাদী দৃষ্টিতেই তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এরফলে, অপ্রিয় হয়েছেন অনেকের কাছে। **১৯৭৯-৮৫-তে আসামের উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে প্রায় সকল অসমিয়া বুদ্ধিজীবী যখন সরব হয়ে পথে নেমেছেন, ব্যতিক্রম শুধু হীরেন গোঁহাই-এর মতো গুটিকয়েক বুদ্ধিজীবী যাঁদের জীবনে অনেক লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সেদিন নেমে এসেছিল।** দীর্ঘদিন অসমিয়া সমাজে তিনি নিন্দিত ধিকৃত ও একঘরে অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু নিজের স্থির বিশ্বাস থেকে একচুলও সরেন নি। **কী ছিল অধ্যাপক গোঁহাই-এর বক্তব্য?** অসমিয়াদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ সম্পর্কে

আন্দোলনকারীদের সাথে তিনি একমত ছিলেন (যেমন, আসামের প্রতি বঞ্চনা, ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে আসামে অসমিয়াদের সংখ্যালঘু হওয়ার আশঙ্কা, একশ্রেণির বাঙালি আমলার উন্নাসিকতা ও অসমিয়াদের প্রতি তাচ্ছিল্য ইত্যাদি) এবং এই সম্পর্কে তাঁরই প্রকাশিত এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় অনেক লেখালেখিও করেছিলেন, কিন্তু যেভাবে আন্দোলনকারীরা বাংলা-ভাষী জনগোষ্ঠীকে 'বিদেশি' ও 'ভিলেন' আখ্যা দিয়ে ফ্যাসিস্ট কায়দায় উগ্র জাতীয়তাবাদী আওয়াজ তুলে রক্তগঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, তার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন হীরেন গোঁহাই। তাঁর বক্তব্য ছিল, এটি একটি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত, যার বীজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছড়িয়ে দিয়েছিল ১৮৩৬ সালে অসমিয়ার স্থলে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে, যাতে দুই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ স্থায়ী থাকে। যদিও ১৮৭৩ সালে ঐ আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছিল, কিন্তু ১৮৭৪ সালে বাংলা-ভাষী সিলেট (শ্রীহট্ট)-কে আসামের অঙ্গীভূত করে চক্রান্তের জাল প্রসারিত করা হয়েছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতেও শাসকশ্রেণি নানা কায়দায় একই খেলা খেলছে এবং এর বিরুদ্ধে আসাম সহ অন্যত্র তীব্র জনমত গঠন করে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই সমাধান সম্ভব, ফ্যাসিবাদী উগ্র জাতীয়তাবাদী আওয়াজ তুলে নয়। কিন্তু ইতিহাস-সচেতন অধ্যাপক গোঁহাই-এর এইসব যুক্ত সেদিন আসামে গৃহীত হয়নি, বরং তাঁকেই "ঘরের শত্রু বিভীষণ" আখ্যা দিয়ে নানাভাবে নিগৃহীত করা শুরু হয়েছিল। এরকম একটা উত্তাল সময়ে নিজের বিশ্বাসের প্রতি অটল আস্থা রেখে দাঁড়িয়ে থাকা হীরেন গোঁহাই-এর মতো প্রবল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষের পক্ষেই সম্ভব! আশির দশকের ভুল আন্দোলনের ফলে আসাম আজ কত পিছিয়ে গেছে এবং রাজ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস কীভাবে কলঙ্কিত হয়েছে, সেকথা অনেক অসমিয়া বুদ্ধিজীবী আজ স্বীকার করতে বাধ্য হন।

যৌবনে দিল্লির কিরোরিমাল কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঐ আদর্শের বিশ্ব-বীক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে আসাম সহ পৃথিবীর সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলির গভীরে ঢোকার অন্তর্দৃষ্টি পান। মার্কসবাদী আলোকেই তিনি বর্তমান পৃথিবীর সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা করেছেন, যার মধ্যে আমাদের দেশে শিক্ষায় ক্ষতিকর গেরুয়াকরণ থেকে শুরু করে (২০০২ সালে তাঁর লেখা *On saffronization of education*) বিশ্বায়ন-বিরোধী সংগ্রাম (২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুয়াহাটির কটন কলেজে আয়োজিত *Globalization and its impact in backward regions* শীর্ষক কনভেনশনে তাঁর যুগান্তকারী বক্তৃতা) অথবা IPTA-র গৌরবময় দিনের স্মরণ (২০০৮ সালের ১ জুন গুয়াহাটির

'প্রেস ক্লাবে' আয়োজিত Indian People's Theatre Association-এর ৬৫তম বার্ষিকীতে তাঁর বক্তৃতা), সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ধারা ইত্যাদি নানা ব্যাপারে তাঁর সুচিন্তিত মতামত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার (বিশেষত *'নতুন পৃথিবী', 'নতুন প্রভা'য়*) মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। অসমিয়া সংস্কৃতির সহনশীলতা, বিশেষত উপজাতি জনগোষ্ঠীকে আপন করার চেষ্টা, জাতপাতের অসহনীয় বৈষম্য ও উপদ্রব থেকে অনেকটা মুক্ত থাকার ঐতিহ্যের শিকড় অনুসন্ধান করার সময় অধ্যাপক গোঁহাই মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রীমন্ত শংকরদেবের ব্যাপক অবদান ও সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেন। তাঁকে এই কাজে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন অধ্যাপক ভবানন্দ দত্ত। যদিও শংকরদেবের জীবন ও সময় নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু হীরেন গোঁহাই-এর মতো মুক্তমন ও বস্তুবাদী দৃষ্টিতে শংকরদেবের মূল্যায়ন অসমিয়া সাহিত্যে নবতম সংযোজন। তাঁর যুগান্তকারী সৃষ্টি *অসমিয়া জাতীয় জীবনত মহাপুরুখিয়া পরম্পরা*-র জন্য ১৯৮৯ সালে তিনি সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার পান। এছাড়া বেসরকারি 'কমলকুমারী ফাউন্ডেশন' তাঁকে 'কমলকুমারী অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে মর্যাদা দিয়েছেন। **কিন্তু আসামের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত 'অসম সাহিত্য সভা' বর্তমান সময়ে রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ অধ্যাপক হীরেন গোঁহাইকে একবারও সভাপতির আসন অলংকৃত করার আমন্ত্রণ জানায়নি**, যদিও বেশ কয়েকজন অসমিয়া ব্যক্তিত্ব পরপর দুবার, এমনকি তিনবারও সভাপতি হয়েছেন (পরিশিষ্ট 'অসম সাহিত্য সভা' দ্রষ্টব্য)। সম্ভবত হীরেন গোঁহাই-এর 'অপরাধ' তিনি মার্কসবাদী!

১৭.৭২ হেম বরুয়া (১৯১৫-১৯৭৭) (Hem Barua : 1915-1977)

আসামের বিখ্যাত কবি ও রাজনীতিবিদ হেম বরুয়ার জন্ম হয়েছিল তেজপুরে। ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি জোড়হাট জে. বি. কলেজে ইংরেজি ও অসমিয়া ভাষায় অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। ১৯৪২ সালে ঐতিহাসিক আগস্ট আন্দোলনে যোগদান করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। জেল থেকে ১৯৪৩-এ মুক্তি পেয়ে তিনি বি. বরুয়া কলেজে যোগদান করেন এবং পরবর্তী সময়ে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে সোস্যালিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হন এবং প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি'র (পি.এস.পি.) জাতীয় এক্সিকিউটিভে স্থান পান। ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৬৭ সালে মঙ্গলদৈ কেন্দ্র থেকে পি.এস.পি.

প্রার্থী হিসেবে তিনবার লোকসভা আসনে বিজয়ী হন। তৎকালীন ভারতবর্ষে নাথ পাই, মধু লিমায়ে, হীরেন মুখার্জী, জে. বি. কৃপালনি, এম. সি. চাগলা, অশোক মেহতা প্রভৃতি দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান-এর মতো হেম বরুয়ার খ্যাতি দেশের সর্বত্র প্রসারিত হয়। তিনি শুধুমাত্র আসাম নয়, ধর্ম-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমগ্র দেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত দিতেন।

কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে হেম বরুয়ার সুখ্যাতিও কম ছিল না। ১৯৭২ সালে তিনি 'অসম সাহিত্য সভা'র সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আসামে আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম কর্ণধার। অসমিয়া ভাষায় তাঁর রচিত *সাগর দেখিশা, রোঙ্গা করবীর ফুল, মেকং নই দেখিলু, ডাক পোখিলি* ইত্যাদির আকর্ষণ আজও অম্লান। তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ *Red River and the Blue Hill* থেকে অনেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। ঐ গ্রন্থের ১২৯ পৃষ্ঠায় তাঁর একটি মন্তব্য ছিল ঃ ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০-এ মধ্যে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ মুসলমান আসাম ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। হেম বরুয়ার এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে আসামে এক সময় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

সূত্র ঃ Hem Barua, *Assamese Literature*।

১৭.৭৩ হেমচন্দ্র গোস্বামী (১৮৭২-১৯২৮) (Hemchandra Goswami : 1872-1928)

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী যৌবনে *ফুলের ঝাকি* (ফুলের সাজি) নামে একটি আকর্ষণীয় কবিতার গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য), চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (১৭.২২ দ্রষ্টব্য) এবং হেমচন্দ্র গোস্বামী ছিলেন 'জোনাকি যুগের' বিখ্যাত 'ত্রিমূর্তি'। এঁদের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া (১৭.৩৭ দ্রষ্টব্য), সত্যনাথ বোরা (১৭.৬৫ দ্রষ্টব্য), কনকলাল বরুয়া (১৭.১০ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সময় কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় এঁরাই 'অসমিয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা'র মাধ্যমে সাহিত্যের অঙ্গনে নতুন সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। হেমচন্দ্র গোস্বামী অসমিয়া ভাষায় প্রথম সনেট 'প্রিয়তমার চিঠি'র জন্য বিখ্যাত।

অতীতের প্রতি অদম্য আকর্ষণে হেমচন্দ্র আহোম যুগের বহু উল্লেখযোগ্য কাহিনির উপাদন সংগ্রহ করেন এবং *পুরণি অসম বুরুঞ্জি, চ্যাং-রুং ফুকনের বুরুঞ্জি, দেওধাই বুরুঞ্জি* ইত্যাদি ইতিহাসপঞ্জি সম্পাদন করেন। *দরং রাজবংশাবলী*

নামে সূর্যখরী দৈবজ্ঞ লিখিত কোচ নৃপতিদের একটি বংশলতিকাও তিনি সম্পাদন করেন। যদিও এইসব বুরুঞ্জি রচনার সঠিক সময়কাল নিয়ে বিতর্ক আছে, তথাপি হেমচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত *পুরণি অসম বুরুঞ্জি* এইসব আখ্যায়িকার আদিমতম বিবরণী এবং গোস্বামী মহাশয়ের ধারণা যে, এইগুলির সংগ্রহ শুরু হয় গদাধর সিংহ'র রাজত্বকালে (১৬৮১-৯৫)। বুরুঞ্জির লেখকরা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে কিছু লিখতেন না, বরং সেইদিক থেকে তাঁরা মুক্তপুরুষ ছিলেন। তাঁরা সত্যভাষণের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন, কারণ তাঁদের লেখনী উদ্ভূত বিবরণগুলি ছিল রাজ্যের সমাচারদর্পণ এবং রাষ্ট্রশাসনে অঙ্গীভূত তথ্যলিপি মাত্র, অর্থাৎ ইতিহাসের আকর উপাদান। পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কয়েকখণ্ডে প্রকাশিত অসমিয়া সাহিত্যের বিশিষ্ট সংকলন *Typical Selections from Assamese Literature* এবং *A Descriptive Catalogue of Assamese Manuscripts;* যেগুলি গবেষক ও জিজ্ঞাসুদের কাছে অপরিহার্য। পণ্ডিতমশাই আসামে বৈষ্ণবযুগের অবিস্মরণীয় কবি ভট্টদেবের *কথা-গীতা* নির্মোহ দৃষ্টিতে সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। সমকালীন সমাজের ছবি এবং অসমিয়া গদ্যরীতি গঠনের উপর নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হেমচন্দ্র গোস্বামী প্রমাণ করেন *কথা-গীতা* ১৫৯৪ সালের পরে লিখিত হয় এবং *কথা-গীতা* ও *পুরণি অসম বুরুঞ্জি* রচনার মধ্যে ব্যবধান প্রায় একটি শতাব্দীর। কীভাবে ঐসব গ্রন্থ থেকে ইতিহাসের মাল-মশলা সংগ্রহ করতে হয় সেই প্রশ্নে তিনি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন, যেটি পরবর্তী সময়ে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক সূর্যকুমার ভুঁইয়া (১৭.৬৮ দ্রষ্টব্য) নানাভাবে পল্লবিত করেছেন। মাতৃভাষা ও ইতিহাসের প্রতি মমত্ববোধ এবং দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত হয়েই গোস্বামী মহোদয় এইরকম স্বর্ণখণির সন্ধান দিয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টি ও বিরাট অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'অসম সাহিত্য সভা' ১৯২০ সালে তেজপুর অধিবেশনে তাঁকে সভাপতি পদে বরণ করে নেয়।

১৭.৭৪ হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩৫-১৮৯৬) (Hemchandra Barua : 1835-1896)

আসামের খ্যাতনামা সাহিত্যিক। আসামের শিবসাগর জেলায় জন্ম এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মুক্তারাম বরুয়ার পুত্র। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে পিতৃব্য লক্ষ্মীনাথ বরুয়ার গৃহে প্রতিপালিত হন। উচ্চ ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃত ভাষা ছাড়াও গোপনে 'ম্লেচ্ছ' ভাষা ইংরেজিতেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

সমকালীন অসমিয়া সমাজের ভ্রূকুটি ও জাতিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা ও নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে শিবসাগরের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন ব্রোডের উৎসাহে এবং আমেরিকান মিশনারিদের সহায়তায় ইংরেজি শিক্ষার যে স্বাদ পেয়েছিলেন তার ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ডেপুটি কমিশনারের রাজস্ব বিভাগে মাসিক ৪ (চার) টাকা বেতনের অনুবাদকের চাকুরি পান। শুধুমাত্র স্বীয় মেধা ও দক্ষতার বলে তিনি জুডিসিয়াল কমিশনার অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে উন্নীত হন। ১৮৮২-তে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং গুয়াহাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে অসমিয়া সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমদিকে মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত সাপ্তাহিক *অরুণোদয়* পত্রিকায় তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অসমিয়া সাহিত্যে মিশনারি যুগের অবসান ঘটিয়ে গুণাভিরাম বরুয়ার (১৭.১৮ দ্রষ্টব্য) মতো সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেন হেমচন্দ্র বরুয়া। মিশনারিদের প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে এবং তাদের প্রবর্তিত অসমিয়া বানান পদ্ধতিকে সংস্কার করে সংস্কৃতানুসারী করার উদ্দেশ্যে তৎসম ও তদ্ভব শব্দাবলীর বিন্যাস সাধনের জন্য হেমচন্দ্র লেখনী ধারণ করেন। ১৮৬০ সালে তাঁর প্রণীত *অসমিয়া ব্যাকরণ* প্রকাশিত হওয়ার পর অসমিয়া ভাষা শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই জন্য বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো হেমচন্দ্র বরুয়াকে **অসমিয়া গদ্যের জনক**-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। হেমচন্দ্র রচিত *আদিপাঠ* ও *পাঠমালা* গ্রন্থ দুটি অসমিয়া গদ্যরীতির আদর্শরূপে আজও আদৃত।

তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার কীর্তিস্তম্ভ ছিল ২২,৩৪৬টি অসমিয়া শব্দের অসাধারণ অভিধান ***হেমকোষ*** যেটি তাঁর মৃত্যুর পর ১৯০০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই অভিধান প্রণয়নে তিনি ক্যাপ্টেন পি. আর. গর্ডন এবং হেমচন্দ্র গোস্বামীর সহায়তা লাভ করেছিলেন। আজও 'হেমকোষ প্রিন্টার্স' এই অসমিয়া অভিধান প্রকাশ করে চলেছে। এটি অবশ্য অসমিয়া ভাষায় প্রথম অভিধান নয়, কারণ শিবসাগর জেলার আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্যোগে ড. মাইলস্ ব্রনসন প্রণীত অভিধান ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য গুণগতভাবে দুটি অভিধান সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

সাংবাদিকতার অঙ্গনে হেমচন্দ্র বরুয়া ১৮৮৩ সালে *আসাম নিউজ* নামে সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক রূপে অবতীর্ণ হন। সমাজ-সচেতন হেমচন্দ্র অসমিয়া বিবাহ পদ্ধতি সম্পর্কে ইংরেজিতে *Assamese Marriage System* গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সংক্রান্ত একটি ইংরেজি গ্রন্থেরও অনুবাদ করেন।

গুণাভিরাম বরুয়া'র মতো হেমচন্দ্রও ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুরাগী এবং বিধবা বিবাহের প্রবক্তা। হেমচন্দ্রের প্রশ্ন ছিল, পুরুষ যদি স্ত্রীবিয়োগের পর পুনর্বিবাহ করতে পারে, তাহলে মহিলাদের ক্ষেত্রে সেটির প্রয়োগ হবে না কেন? **আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন** (প্রথম খণ্ড, ১২.৪ দ্রষ্টব্য), **গুণাভিরাম বরুয়া** (১৭.১৮ দ্রষ্টব্য) এবং **হেমচন্দ্র বরুয়া—এই 'ত্রিমূর্তি' ঊনবিংশ শতকের আসামের আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের মাধ্যমে 'নবজাগরণ'-এর সূত্রপাত করেছিলেন**। আফিং-এর নেশায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে ব্যঙ্গের কশাঘাত হেনে হেমচন্দ্র মানুষকে জাগানোর সংকল্প নিয়ে তাঁর সমগ্র জীবন নিবেদন করেছিলেন। হেমচন্দ্র মনে করতেন, আসামের সমস্ত দুর্দশা ও অধঃপতনের মূল কারণ ছিল আফিং। ১৮৬১ সালে তাঁর *কানিয়া কীর্তন* (আফিমখোরের কীর্তন) প্রহসনটি আফিং সেবনের বিষময় ফল (*কানিয়া খালে অসম দেশ*) সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।

হেমচন্দ্র বরুয়া'র আর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল *বাহিরে রং চং আরু ভিতরে কোয়াভাতুরি* (কোয়াভাতুরি=মাকাল ফল সদৃশ) যেটি তিলোত্তমা মিশ্র সম্প্রতি অনুবাদ করেছেন *Fair outside and Foul within* নাম দিয়ে। তীব্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে এই উপন্যাসিকায় সমকালীন ধর্ম, সমাজ, আভিজাত্য, নীতিকথার আড়ালে যে ভণ্ডামি লুকিয়ে আছে তাঁর মুখোশ খুলে দিয়েছেন হেমচন্দ্র। কব্জির জোর প্রয়োজন হয় এইরকম উপন্যাস লিখতে। উপন্যাসের কিছুটা শুনলেই উপলব্ধি করা যাবে হেমচন্দ্রের বক্তব্য। আসামের মধুপুরে বৈষ্ণব সত্রের গুরু গোবর্ধন গোঁসাই নিজেকে 'বাক্‌সিদ্ধান্ত' বলে পরিচয় দেন; কথায় কথায় শাস্ত্র আওড়ান, ভক্তদের প্রদত্ত উৎকৃষ্ট সামগ্রী চর্ব্য চোষ্য করেন এবং লঘু পাপে সকলকে গুরু দণ্ড দেন। সকালে স্নান না করে মুখে সুপারি দেওয়ার অপরাধে এক ভক্তকে বাঁশের সাথে বেঁধে রোদে ভাজাভাজা করা এবং ঐ 'মহাপাতক'কে বর্জন করার নির্দেশ দেন গুরু। একবার গোবর্ধন গোঁসাই ভক্তসহ একটি গ্রামে প্রবেশ করে মেধির একটি সুন্দর দুগ্ধবতী গাভীর দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে নজর দেন। গাভীটি ছিল মেধির কাছে প্রাণবৎ, কিন্তু ভক্তদের ঠেলায় মেধি বাধ্য হল প্রভুর ইচ্ছা পূরণ করতে এবং কিছু অর্থসহ গাভীটিকে 'নামঘরে' জমা দিতে। আর একবার ভক্তসহ গোবর্ধন চলেছেন শহরের দিকে কাছারিতে আইনের দরবারে; উদ্দেশ্য ছিল জাল একটা তাম্রপট্টের মাধ্যমে অন্যের অনেক উর্বর জমি ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি হিসাবে দাবি ও আত্মসাৎ করা। শহরে তিনি আশ্রয় নেন অভিজাত পরিবারভুক্ত মর্কটেশ্বর ফুকনের গৃহে। আহোম রাজাদের অধীনস্থ আধিকারিক

নিঃসন্তান মর্কটেশ্বর প্রথমদিকে তান্ত্রিক ধর্মে দীক্ষিত হলেও গোবর্ধন গোঁসাই-এর কাছে স্বামী-স্ত্রী বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন এবং স্বামীর তুলনায় স্ত্রী গভারু দিউ উচ্চকণ্ঠে করতাল বাজিয়ে পুত্র-সন্তান কামনায় দিনরাত কীর্তন করেন। গোবর্ধন প্রভু এই যুবতী গভারুর গদগদ ভক্তিতে বিচলিত হয়ে মর্কটেশ্বর ফুকনের বিশাল প্রাঙ্গণে বৃন্দাবন তৈরির বাসনা ব্যক্ত করেন, যেখানে **'বস্ত্রহরণ'**, **'মানভঞ্জন'** সহ কৃষ্ণলীলার অন্যান্য অংশ প্রতিদিনি অনুষ্ঠিত হবে। যেমন কথা, তেমনি কাজ। 'ভক্তরা লুটায় পথে, করিছে প্রণাম'। **রাধাকৃষ্ণর প্রেমলীলা দেখে শ্রীরাধার স্বামী আয়ান ঘোষের যেরকম অবস্থা হয়েছিল, গোবর্ধন-গভারুর প্রেমলীলা দেখে মর্কটেশ্বর ফুকনেরও সেই একইরকম অবস্থা**! এইভাবে একটার পর একটা কাহিনির মাধ্যমে হেমচন্দ্রের উপন্যাস এগিয়ে চলেছে। প্রাচীন ও নবীন ভাবাদর্শের এবং চিরায়ত ও আধুনিকতার সংঘর্ষের ফলে অসমিয়া সমাজে যে বিপুল দ্বন্দ্ব ও সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং ধর্মের নামে কীভাবে ভণ্ডামি ও নোংরামি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধেছিল, সেটি সম্পর্কে গল্পের মাধ্যমে সকলকে সচেতন করার মহান ব্রতই ছিল সমাজ-সংস্কারক হেমচন্দ্র বরুয়ার প্রকৃত আদর্শ। এরই জন্য আসামের 'নবজাগরণ'-এর অন্যতম 'পুরোহিত' (যদিও তিনি নাস্তিক) হিসেবে তাঁকে মর্যাদা দেওয়া হয়।

১৭.৭৫ হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২-১৯৮৭) (Hemanga Biswas : 1912-1987)

বাংলার মানুষ হয়েও আসামের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কত উজ্জ্বল ভূমিকা একজন পালন করতে পারেন এবং জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য), বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা (১৭.৪৭ দ্রষ্টব্য), ভূপেন হাজারিকার (১৭.৫১ দ্রষ্টব্য) মতো বিশিষ্ট শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস তার অনবদ্য উদাহরণ। **ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যেমন অমলেন্দু গুহ (১৭.১ দ্রষ্টব্য) এক উল্লেখযোগ্য নজির, সংগীতের জগতে তেমনি হেমাঙ্গ বিশ্বাস। সমগ্র আসামে বর্তমানে প্রায় ৭২ লক্ষ বাংলা-ভাষী মানুষ আছেন** এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেকেরই কিছু অবদান আছে। ১৯১২ সালের ১৪ ডিসেম্বর অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট বা সিলেটের হবিগঞ্জে একটি গোঁড়া জমিদার পরিবারে হেমাঙ্গ বিশ্বাস জন্মেছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি ছিলেন নানা ধরনের আন্দোলনের শরিক—প্রথমদিকে গান্ধিবাদী, পরে মার্কসবাদী। গান্ধিজির ডাকে জাতীয় আন্দোলনে অংশ নেওয়ার 'অপরাধে' তিনি সিলেটের মুরারীচাঁদ কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। জেলে বন্দি থাকা

অবস্থায় তিনি কমিউনিস্ট মতবাদে আকৃষ্ট হন। ১৯৪৩ সালে Indian People's Theatre Association বা IPTA প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনিই ছিলেন অগ্রণী যোদ্ধা। আসাম সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক, শ্রমিক, পিছিয়ে-পড়া অবহেলিত ও নির্যাতিত মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে, তাঁদের সংগ্রামের শরিক হয়ে, লোক-সংগীতের সুরে রাজনৈতিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিলেন। নতুন সাহসী শ্রেণি-শোষণ মুক্ত পৃথিবীর জয়গান গেয়ে অনেক শিল্পীকে একটি জায়গায় সমবেত করে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে প্রগতিশীলতার আলো জ্বালিয়েছিলেন। ১৯৫৭-৫৯ চিনে অবস্থানকালে তিনি চিনা ভাষায় দক্ষ হয়ে চৈনিক সহ নানা আন্তর্জাতিক সুরের সাথে পরিচিত হন এবং আমাদের দেশের লোক-সংগীতের সাথে ঐসব সুর মিশিয়ে IPTA আন্দোলনের সুবর্ণযুগ সৃষ্টি করেছিলেন।

১৮৭১ সালে ফ্রান্সে 'পারিস কমিউনের' পতনের পর ইউজিন পতিয়ের-এর কথা এবং পিয়েরি দিগেতার-এর সুরে বিশ্ব-জুড়ে যে 'ইন্টারন্যাশনাল' বা আন্তর্জাতিক গানটি (যেমন, বাংলায় 'জাগো জাগো সর্বহারা, অনশনবন্দী ক্রীতদাস...') গাওয়া হয়, অথবা বিংশ শতকের প্রথমার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'সিভিল রাইট' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে প্রতিবাদী গানটি ('উই শ্যাল ওভারকাম', বা বাংলায় 'আমরা করব জয়') বিশ্ববিখ্যাত হয়, সেগুলি সকলের সামনে আনেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও ভূপেন হাজারিকা। বাংলা, অসমিয়া ও অন্যান্য ভাষায় হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান ঃ 'শঙ্খচিলের গান', 'জন হেনরির গান', 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য', 'নীল সমুদ্রের বুকে লাল পতাকা', 'আজাদি হয়নি আজও তোর', 'কাস্তেরে দিও জোরে শান', 'আমি যে দেখেছি সেই দেশ উজ্জ্বল রঙিন', 'নিগ্রো ভাই আমার, পল রবসন', 'বড়ো ক্ষুব্ধ ঈশানি', 'ভেদি অনশন' ইত্যাদি গণ-সংগীতের জগতে আজও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃত। হেমাঙ্গ বিশ্বাস মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, শ্রেণি চেতনা ও সংগঠিত না থাকলে সাংস্কৃতিক-স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয় এবং সাংস্কৃতিক ডালি দিয়েই রাজনৈতিক আন্দোলনকে আকর্ষণীয় ও নান্দনিক করা সম্ভব এবং আগামীদিনে শ্রেণী-বৈষম্যমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ অবশ্যম্ভাবী। সমগ্র জীবন শিল্পের জন্য নিবেদিত-প্রাণ এই যোদ্ধা ১৯৮৭ সালের ২২ ডিসেম্বর কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৭.৭৬ হেরম্বকান্ত (এইচ. কে.) বরপূজারী (Herambakanta (H.K.) Barpujari :

আসামের গোলাঘাট সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদ্মকান্ত বরপূজারীর সন্তান হেরম্বকান্ত বরপূজারী সাম্প্রতিককালের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ও প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে (১৮৮৮-১৯৮০) হেরম্বকান্ত তাঁর প্রকৃত গুরু বলে মনে করতেন এবং আজীবন তিনি আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসচর্চায় নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। শ্রীহট্টের এম.সি. কলেজে অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত এবং ১৯৬৩ সাল থেকে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং ১৯৭৬ থেকে ১৯৮১ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই ইউ.জি.সি. অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। **তাঁর গুরু রমেশচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘ ৯২ বছরের জীবনে শেষদিন পর্যন্ত অক্লান্ত গবেষণা করেছিলেন, একইভাবে অধ্যাপক বরপূজারী তাঁর ৯০ বছরের জীবনসীমায় প্রতিদিন কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করে আচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন**। বরপূজারীর ২১টি গ্রন্থ এবং অজস্র প্রবন্ধের প্রতিটি সংগৃহীত মূল্যবান দলিলের উপর ভিত্তি করে লিখিত। লন্ডন থেকে পি.এইচ.ডি. প্রাপ্তির পর তাঁর রচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ 'অসম সাহিত্য সভা' তাঁকে **'ইতিহাস আচার্য'** সম্মানে ভূষিত করেছিল। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় এইরকম কৃতি অধ্যাপক ও গবেষকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে ২০০৭ সালে 'এইচ. কে. বরপূজারী ভবন' নির্মাণ করে 'নর্থ ইস্ট স্টাডি সেন্টার' উদ্বোধন করেছে।

অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা অধ্যাপক বরপূজারী চলমান ঘটনাবলীর উপর তাঁর নিজস্ব মতামত মাঝেমাঝে ব্যক্ত করতেন এবং কোনোভাবেই তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে তাঁকে টলানো যেত না। ফলে, তিনি যে খুব জনপ্রিয় ছিলেন তা নয়। অনেক সময় তাঁর বক্তব্য রীতিমতো বিতর্ক সৃষ্টি করত। জীবনের শেষদিকে আসামে অনুপ্রবেশের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে তাঁর উদ্বেগ বিভিন্ন লেখা ও বক্তব্যে প্রতিফলিত হত। ইতিহাস উদ্ধৃত করে তিনি দেখাতেন, কীভাবে ১৮২৬-এ ইয়ান্দাবো চুক্তির পর দলে দলে 'বহিরাগত' আসার ফলে অসমিয়ারা ক্রমশ সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছিল এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর কীভাবে ধুবরি, বরপেটা, গোয়ালপাড়া, হাইলাকান্দি প্রভৃতি জেলাগুলিতে বাংলাদেশি মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়েছে। **তাঁর আশঙ্কা ছিল, হয়তো একদিন আসামের এই জেলাগুলিতে বাংলাদেশের সাথে সংযুক্তিকরণের দাবি উঠবে এবং 'বৃহত্তর বাংলাদেশ' সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করবে**। তিনি প্রচার করতেন, কাশ্মীরের মতো আসামেও স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ করতে সংবিধানের ৫নং অনুচ্ছেদ অনুসরণ করা উচিত এবং ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাইকে নাগারিকত্বের সীমারেখা হিসাবে চিহ্নিত করা দরকার। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, তিনি উগ্র অসমিয়া জাতীয়তাবাদের

সমর্থক ছিলেন। তিনি শুধু যে আসামে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তাই নয়, ১৯৭৮-৭৯ থেকে শুরু হওয়া 'বিদেশি বিতাড়ন' আন্দোলনকে আসামের জাতীয় জীবনের গভীর কলঙ্কজনক কালো-অধ্যায় বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত শেষ গ্রন্থে *North-East India : Problems, Policies and Prospects since Independence* (Spectrum Pub, New Delhi) তিনি সন্ত্রাসবাদ ও শাসকদলের ব্যভিচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ২০০২ সালে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দিল্লির নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এ্যান্ড লাইব্রেরীর (NMML) উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ধনেন্দ্র কুমার উপরোক্ত গ্রন্থটিকে 'শ্রীকান্ত দত্ত মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করে ২০০২ সালে **উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ** হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অতিথি-বক্তা ঐতিহাসিক বরপূজারী আসামের বর্তমান দুর্দশার কারণ হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষত কংগ্রেসের, ভোটের রাজনীতিকে মূলত দায়ী করেন।

এইচ. কে. বরপূজারী ছিলেন North-East India History Association (NEIHA) বা 'নীহা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি। গবেষকদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব তাঁকে পীড়িত করত। তিনি প্রায়ই মন্তব্য করতেন, একদিকে জন-সংখ্যা যেমন অশ্বের গতিতে প্রতিদিন বাড়ছে, অন্যদিকে কর্ম-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ বিপরীত গতিতে কমছে। গবেষণার মান উন্নত করতে তিনি তাঁর অর্থ দিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংস্থায় Endowment Trust গঠন, প্রতি দু'বছর অন্তর বিশেষ বিষয়বস্তুর উপর বক্তৃতার ব্যবস্থা, Indian History Congress-এ শ্রেষ্ঠ গবেষককে National Award প্রদান, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের আধুনিক ইতিহাসের উপর একটি স্থায়ী চেয়ার সৃষ্টি ইত্যাদি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, যেগুলি আজও অব্যাহত। ইতিহাসের প্রতি তাঁর ছিল গভীর মমত্ববোধ, এরই জন্য জীবনের সব সঞ্চয় তিনি উন্নত ইতিহাস রচনার স্বার্থেই ব্যয় করেছিলেন। Indian History Congress-এর বেশিরভাগ বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি উপস্থিত থাকতেন এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে তিনি ছিলেন হিস্ট্রি কংগ্রেসের সভাপতি। **প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে দীর্ঘদিনের অবহেলিত ও উপেক্ষিত আসাম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইতিহাস অবশেষে ভারত ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে পরিণত হয়**, যদিও আজও অনেকের কাছেই এই অঞ্চলের ইতিহাস অজানা রয়ে আছে। সরকারি অফিসারের মাধ্যমে মহাফেজখানা, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অথবা DHAS-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ

বিভাগগুলি পরিচালনার প্রচলিত পদ্ধতির তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী, কারণ অধ্যাপক বরপূজারীর মতে, এইসব সরকারি আমলাদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, তাঁদের ইতিহাস-চেতনা অনুপস্থিত। সুতরাং ইতিহাসের মূল্যবান উপাদানকে রক্ষা ও ব্যবহারের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরই এর দায়িত্ব দেওয়া দরকার।

ঐতিহাসিক বরপূজারীর অধিকাংশ গ্রন্থই ইংরেজিতে লেখা, যাতে একটি বড়ো পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। তাঁর সম্পাদিত ৫ খণ্ডের *The Comprehensive History of Assam, Political History of Assam (1826-1919)*-এর প্রথম খণ্ড এবং তাঁর লেখা তিন খণ্ডের *Problems of the Hill Tribes : North-East Frontier, The American Missionaries and North-East India (1836-1900), An Account of Assam and her Administration (1603-1822), Inner Line to MacMohan Line, Assam in the days of the Company (1826-1858)* ইত্যাদি প্রত্যেকটিই আসাম ইতিহাসের আকরগ্রন্থ। সহজ, সরল অসমিয়া ভাষাতে সকলের বোধগম্য করে তিনি লিখেছেন *আসামের নবজাগরণ, ইতিহাস ঃ রচনাবিধি আরু ক্রমবিকাশ* ইত্যাদি নানা গ্রন্থ।

সূত্র ঃ আসামের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা।

১৭.৭৭ হোমেন বরগোঁহাই (১৯৩২-) (Homen Borgohain : 1932-)

কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্প লেখক, সাহিত্য-সমালোচক ও সাংবাদিক হিসেবে হোমেন বরগোঁহাই-এর খ্যাতি আসামের বাইরেও প্রসারিত, কারণ তাঁর অধিকাংশ রচনা ইংরেজি, হিন্দি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। জীবনের প্রথমদিকে কিছুটা 'বোহেমিয়ান' যাযাবরের মতো চললেও এবং গ্রামীণ জীবনের নানা ছবি আঁকলেও, নাগরিক জীবনের অন্ধ অলিগলি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর গল্পের দুটি সংকলন *বিভিন্ন কোরাস* এবং *প্রেম আরু মৃত্যুর কারণে* এবং বিভিন্ন উপন্যাসে তাঁর নিজের জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক ও মুক্তমনের অধিকারী বরগোঁহাই-এর লেখায় ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান ও অবচেতন মনের প্রভাব দৃশ্যমান এবং তিনি যৌন আবেদন ও অবচেতন সমস্যার খোলাখুলি আলোচনা করেছেন, যদিও সংযত শৈলী এবং শব্দের মিত ব্যবহারের ফলে তাঁর প্রতিটি লেখায় শিল্প-মাধুর্য দেখা যায়। চার্লি চ্যাপলিন-এর 'লাইমলাইট'-এ সেই পরিহাসপ্রিয় বিদূষকের মতো হোমেন বরগোঁহাই মনে

করেন, জীবনে বিশ্বাস বা আদর্শের জন্য নয়, বরং অবদমিত ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যেই আমরা সকলে ছুটছি। অত্যন্ত সহজভাবে এইরকম চরিত্র-চিত্রণে হোমেন বরগোঁহাই অসমিয়া সাহিত্যে একলা পথিক, কারণ তাঁর পূর্বে আর কেউ ঐভাবে গল্প বা উপন্যাস লিখতে সাহস করেননি। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর বিদূষী স্ত্রী ও প্রখ্যাত লেখিকা নিরুপমা বরগোঁহাই (১৭.৩৬ দ্রষ্টব্য)-এর সাথে সম্পর্কছেদ তাঁর লেখনীতে বারবার ছায়া ফেলেছে।

যদিও *সুবলা, পিতাপুত্র, তিমিরতীর্থ, কুশীলব* প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি অনেক বিতর্কিত চিন্তা ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তথাপি তাঁর *অন্তরাগ* এবং *এদিনর ডায়েরি*-তে আঁকা চরিত্রগুলি অনেক বেশি বাস্তব ও জীবন্ত বলে মনে হয়। বার্ধক্যের যন্ত্রণা যে কত নির্মম সেটি *অন্তরাগ*-এ পাঠক প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন এবং দিলীপ ও তাঁর বৃদ্ধ পিতার জন্য মনটা সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। যদিও সকলের ক্ষেত্রেই মৃত্যু অনিবার্য, তবু এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচার আকুতি যে কত তীব্র হয় *অন্তরাগ*-এ চরিত্রগুলি তার প্রমাণ। হোমেন বরগোঁহাই ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করে *এদিনর ডায়েরি*-তে জীবনের অর্থ অন্বেষণের চেষ্টা করেছেন। ঐ উপন্যাসের একটি চরিত্র আদিত্য বরুয়া শেষে স্বগতোক্তি করছেন ঃ "জীবনের নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে, এবং আজ থেকে সেই অর্থ আমি খুঁজব"। তাঁর রচিত *পিতা-পুত্র* (যে উপন্যাসের জন্য ১৯৭৮ সালে তিনি 'সাহিত্য অকাদেমি'র পুরস্কার পেয়েছিলেন) গ্রামীণ আসামের সমাজজীবনে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল এবং চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছিল সেই পটভূমিতে লেখা। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী বরগোঁহাই উপন্যাস লিখলেও আসলে তিনি এক বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ এবং তাঁর প্রতিটি গল্প বা উপন্যাস দীর্ঘ গবেষণার ফসল। সমাজের অবহেলিত মৎস্যজীবীদের জীবন নিয়ে লেখা *মৎস্যগন্ধা* উপন্যাসটিতে তিনি ভিন্ন এক দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। অসাধারণ শিল্পীর মতো তুলির টানে তাঁর গল্প-উপন্যাসের জগৎ শিল্পের মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে।

সমগ্র জীবন ধরে তিনি প্রবন্ধ, কাব্য, কবিতা, গল্পের ক্ষেত্রে একটার পর একটা গ্রন্থ অসমিয়া ভাষায় লিখে চলেছেন জীবনের বিচিত্র দিকগুলি নিয়ে, যেমন, *অস্তিত্ব জ্যোতির্ময় চেতনা, আত্মানুসন্ধান, স্বর্গ আরু নরক, জীবনর সন্ধান, প্রজ্ঞার সাধনা, আনন্দ আরু বেদনার সন্ধানৎ, আধুনিক যুগর জন্ম-কাহিনি* ; অথবা পৃথিবীর বরেণ্য সন্তানদের জীবনী—যেমন, *লুই-পাস্তুর, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, সক্রেটিস* ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডিব্রুগড় ও কলগাছিয়া অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। এর আগে ১৯৯১ সালে আসাম উপত্যকার সাহিত্য পুরস্কারেও তাঁকে ভূষিত করা হয়েছিল। বরগোঁহাই শুধু লেখক নন, একজন বিশিষ্ট প্রকাশকও এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে তরুণ লেখকদের নানাভাবে উৎসাহিত করে চলেছেন। একসময় তিনি ছিলেন সাপ্তাহিক *নীলাচল* এবং *নাগরিক*-এর সম্পাদক এবং *সাতসরি* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাঁর চিন্তাসমৃদ্ধ অসংখ্য প্রবন্ধ ও কবিতা এইসব পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হত। বর্তমানে মর্যাদাপূর্ণ এবং বহুল-প্রচারিত অসমিয়া দৈনিক *অমর অসম*-এর সম্পাদক হিসেবে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিল্পায়ন ও নগরায়ণ

১৮.১ শিল্পায়ন (Industrialization)

প্রকৃতিদত্ত কোনো মৌল সম্পদকে (কাঁচামালকে) শ্রম ও যান্ত্রিক শক্তির উপর নির্ভর করে প্রয়োজন অনুযায়ী রূপ দেওয়ার নামই শিল্প। কৃষিপ্রধান অর্থনীতিকে শিল্পে সমৃদ্ধ করে উৎপন্নের মোট মূল্য বাড়াবার প্রয়াসকে সাধারণত শিল্পায়ন বলা হয়। এরই সাথে জড়িয়ে থাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এবং সবকিছু আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে কৃষিভিত্তিক আসামে শিল্পের সংখ্যা ছিল নগণ্য, যেটুকু ছিল সেটি কুটিরশিল্প এবং প্রযুক্তিও ছিল অতি সরল (প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বাষ্পশক্তি আবিষ্কারের পর থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যন্ত্রশক্তির ব্যাপক প্রয়োগ সহ শিল্পবিপ্লবের অধ্যায় শুরু হয়। ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের প্রয়োজনে আসাম সহ ভারতের কাঁচামাল রপ্তানি জরুরি হয়ে যায় এবং সেইসব প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যেই আসামে বাষ্পীয় স্টিমার, কয়লা, রেলপথ, খনিজ তেল উত্তোলন ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। **এইভাবে ঔপনিবেশিক স্বার্থের জন্যই ব্রিটিশ আসামে কয়েকটি শিল্প গজিয়ে উঠেছিল, প্রকৃত অর্থে ব্যাপক শিল্পায়ন হয়নি। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আসাম শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়েছিল।** এরই জন্য সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে আসাম সহ সমগ্র ভারতবর্ষের গুরুত্ব প্রসঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৮৯৪ সালে এইরকম মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> *India is the pivot of our Empire...If the Empire loses any other part of its Dominion we can survive, but if we lose India the sun of our Empire will have set.*

সপ্তদশ শতকের বিদেশি পর্যটকদের (ফরাসি পরিব্রাজক ট্যাভার্নিয়ার বা বার্নিয়ার, কিংবা ঔরঙ্গজেবের দরবার ভেনিসীয় চিকিৎসক মানুচি) বিবরণী পড়লে দেখা যায়, প্রাক-ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে সমগ্র ভারতবর্ষে কৃষি ও কুটির শিল্পের মধ্যে কীরকম ভারসাম্য ছিল এবং মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষ মানুষের কাছে প্রায় অজানা ছিল (যদিও আসামের ক্ষেত্রে মোয়ামারিয়া বিদ্রোহের সময় জনজীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে এসেছিল)। ট্যাভার্নিয়ার-এর (Travels in India) বর্ণনায় দেখা যায় ঃ *"...even in the smallest villages rice, flour, butter, milk, beans and*

other vegetables, sugar and sweetmeats can be procured in abundance"। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, প্রাক-ব্রিটিশ যুগ 'স্বর্ণযুগ' ছিল, বরং সেইসময় নানারকম ব্যাভিচার, অত্যাচারও ছিল।

Mike Davis (*Late Victorian Holocausts* গ্রন্থে) প্রমাণ করেছেন প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ২০০০ বছরের ইতিহাসে সর্বমোট ১৭টি দুর্ভিক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সাতটি দুর্ভিক্ষে মোট ১৫ লক্ষ মানুষ এবং দ্বিতীয়ার্ধে চব্বিশটি মন্বন্তরে ২ কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। Davis প্রশ্ন তুলেছেন ঃ কী কারণে ব্রিটেনে উনবিংশ শতক থেকে ক্ষুধা ও মন্বন্তরের ইতিহাসে যবনিকাপাত এবং ভারতবর্ষে তার সূত্রপাত? আসলে, ঔপনিবেশিক শক্তির লুণ্ঠন-নীতির জন্যই এটি ঘটেছিল। যদিও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে বিখ্যাত ভারতীয়রা অতীতে এই দিকটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন (যেমন, দাদাভাই নৌরজির *Poverty and Un-British Rule in India*, রমেশচন্দ্র দত্ত'র *Economic History of India*, কিংবা রজনী পাম দত্ত'র *India Today* অথবা এন. কে. সিন্‌হা'র *Economic History of Bengal* ইত্যাদি), তথাপি মহাফেজখানা থেকে আবিষ্কৃত নতুন তথ্যের আলোকে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যে কয়েকজন ইদানীং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ খুলে দিতে নানাভাবে তৎপরতা দেখাচ্ছেন। ১৯০১ সালে অবশ্য William Digby (*Prosperous British India* গ্রন্থে) কয়েকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন।

১৮.১.১ ঔপনিবেশিক আসামে শিল্পায়নের চরিত্র

'ঔপনিবেশিক আসাম' বলতে প্রকৃতপক্ষে ১৮২৬ থেকে ১৯৪৭—এই ১২১ বছরের ইতিহাস বোঝায়। এরমধ্যে প্রথম ১২ বছর (১৮২৬-১৮৩৮) ব্রিটিশ শক্তি নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে আসামকে পুরোপুরি সামরিক শাসনে রেখেছিল। ১৮৩৮ সালে আহোম-রাজা পুরন্দর সিংহ'কে উৎখাত করে ইচ্ছামতো লুণ্ঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ১৮৬১ সালে ফুলাগুড়ি থেকে শুরু করে পতিদরং, নলবাড়ি, লাচিমা, বড়মা, বজালি, ক্ষেত্রি, বরভোগ, রঙ্গিয়া এবং ১৮৯৪ সালে পাথাঁরুঘাট পর্যন্ত প্রসারিত একটার পর একটা কৃষক বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করে আসামে ব্রিটিশ শক্তিকে পাকাপোক্তভাবে কায়েম করা হয়েছিল। এটি ঘটনা, ব্রিটিশ শাসনে সমগ্র আসামে ৪৩৯ মাইল রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল, ডিগবয়ে সমগ্র এশিয়ার মধ্যে প্রথম তৈল উত্তোলন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অরণ্য

ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পায়নের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছিল— কিন্তু এর একটিও আসামের স্বার্থে হয়নি। আসামের অর্থনীতিবিদদের মতে, *"The industrial sector in Assam had been centralised around some particular sectors—like tea, petroleum, coal and forests. During British colonial rule, no effective effort was initiated to develop basic and heavy industries"*। যেহেতু কোনো মৌলিক বা ভারী শিল্প ১২১ বছরের ব্রিটিশ শাসনে আসামে গড়ে ওঠেনি, এরই জন্য শিল্পায়ন-প্রক্রিয়াও অসমাপ্ত থেকে গেছে।

ব্রিটিশ আসামের শিল্পকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) কৃষিভিত্তিক শিল্প—যার মধ্যে চা সহ নানারকম বাগিচা শিল্প, (২) খনিজ-ভিত্তিক শিল্প—যার মধ্যে কয়লা, তেল, রেল, পাথর ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে কিছু কল-কারখানা, (৩) অরণ্যভিত্তিক শিল্প—যার মধ্যে কাঠ, প্লাইউড, দেশলাই, কাগজ ইত্যাদি, (৪) অন্যান্য ছোটখাটো শিল্প—যার মধ্যে ইট ইত্যাদি সহ কুটিরশিল্প। আহোম আমলে প্রচলিত নানারকম বৃত্তির কুটিরশিল্প (তাঁত বস্ত্র, রেশম, মাটির বাসনপত্র, বাঁশ-বেতের কাজ, ভেষজ রং ইত্যাদি) ব্রিটিশ আমলে বিদেশে যন্ত্রের মাধ্যমে তৈরি সামগ্রীর সাথে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে এবং পৃষ্ঠপোষকতা ও বাজারের অভাবে মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মতো 'de-industrialization' বা অব-শিল্পায়ন প্রক্রিয়া আসামেও অব্যাহত ছিল। আসামে প্রচলিত চিরাচরিত শিল্পের এই দুর্দশার প্রেক্ষিতেই ব্রিটিশ-শাসিত আসামের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করতে হবে।

১৮.১.২ আসাম কোম্পানি লিমিটেড (Assam Company Limited [ACL])

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সমর্থন নিয়ে Macneill Group এবং বহির্বাণিজ্যে উদ্যোগী কিছু ব্রিটিশ ও ভারতীয়ের প্রচেষ্টায় ১৮৩৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি 'আসাম কোম্পানি লিমিটেড' (ACL)-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। চা-বাগান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সমগ্র পৃথিবীতে এটিই ছিল প্রথম কোম্পানি এবং ১৮৪৫ সালে মহারানি ভিক্টোরিয়া প্রদত্ত সনদ বলে ACL যাত্রা শুরু করেছিল। প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল প্রমুখ ব্যক্তিরা অন্যদের সাথে ACL-এর ডাইরেক্টর বোর্ড-এর সদস্য ছিলেন। এতদিন চিন থেকে চা আমদানি-রপ্তানির একচেটিয়া অধিকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভোগ করত। কিন্তু ভারতে চা উৎপাদন ও ব্যবসার উদ্দেশ্যেই ACL প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল। বর্তমানে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে) আসামে চা-শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে চা-ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি শিল্পোদ্যোগ-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হবে। আসলে আসামে চা-শিল্পকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন যোগাযোগ, পরিবহন বা রেলপথ নির্মাণের প্রশ্নটি গুরুত্ব পেয়েছিল, অন্যদিকে বাগানের জমি খোঁজ করতে গিয়ে বিশাল অরণ্য-সম্পদ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির সন্ধান মেলায় শিল্পায়নের পথ কিছুটা প্রশস্ত হয়েছিল। এইভাবে ACL-এর গর্ভ থেকেই বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত 'Assam Tea Company' (ATC) 'Assam Railway and Trading Company' (ARTC), 'Assam Oil Company' (AOC), 'Assam River Steam and Navigation Company' (ARSNC) ইত্যাদি বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন সময় গঠিত হয়েছে। এরই জন্য মন্তব্য করা হয় ঃ "Historically, the ACL has been into the business of timber, tea gardens, coal , railways, oil and navigation." এইরকম একটি ঐতিহ্যসম্পন্ন কোম্পানির উদ্যোগের ফলেই ব্রিটিশ-শাসিত আসামে কিছুটা শিল্পায়ন-প্রক্রিয়া (যদিও অত্যন্ত মন্থর গতিতে' সম্ভবপর হয়েছিল। ব্রহ্মপুত্রের মাধ্যমে Assam-Bengal বাণিজ্য (মূলত চা-শিল্পকে কেন্দ্র করে) সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে ১৮৭৪ সালে প্রথম বাষ্পীয় স্টিমার/লঞ্চ চালু হয়েছিল। এর ফলে বঙ্গের সাথে আসামের দূরত্ব কিছুটা কমে এবং পরবর্তী সময়ে রেলপথ প্রসারণের জন্য এই দূরত্ব নাটকীয়ভাবে কমে যায়। অবিভক্ত বঙ্গের সাথে, বিশেষত পূর্ববঙ্গ ও সুরমা উপত্যকার সাথে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক একদিকে যেমন নিবিড় হল, অন্যদিকে আহোম যুগে পূর্ব ও উত্তরদিকের প্রতিবেশীর (ভুটান, তিব্বত, মায়ানমার ইত্যাদি দেশ) সাথে যেটুকু বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল সেটিও ক্রমশ শিথিল হতে শুরু করল।

১৮.১.৩ রেলপথ

ভারতবর্ষে যদিও ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল বোম্বাই থেকে থানে (২১ মাইল বা প্রায় ৩৪ কিমি) প্রথম রেলগাড়ি চালু হয়েছিল, আসামে এটি প্রসারিত হতে অনেক দেরি হয়। 'আসাম রেলওয়ে অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি' (ARTC) ১৮৮১ সালে প্রথম চা-বাগান-কেন্দ্রিক ডিব্রুগড়ের অমলাপট্টি থেকে দিনজাম নদী পর্যন্ত ২০ কিমি এবং ১৮৮৪ সালে মাকুম কয়লাখনি অঞ্চল পর্যন্ত ৬৫ কিমি রেলপথ নির্মাণ করে। সিংফো উপজাতিদের ভাষায় 'মাকুম'-এর অর্থ 'সকলের ঠাঁই'। নদীর উর্ধ্বে সেতুর উপর দিয়ে রেলপথ নির্মাণে ARTC-র অধীনে কর্মরত

ইতালীয় বাস্তুশিল্পী C. R. Paganini তাঁর নিজের দেশের (ইতালি) রানি Margherita (১৮৫১-১৯২৬)-র নামে 'মাকুম' এলাকাটির নতুন নামকরণ করেন এবং সেদিন থেকে অঞ্চলটি লোকমুখে 'মার্ঘারিটা' বা 'মার্গারেটা' নামে পরিচিত। যাইহোক, চা ও কয়লার পরিবহন এবং ব্যবসায়িক স্বার্থেই ডিব্রুগড় থেকে তিনসুকিয়ার মার্ঘারিটা পর্যন্ত রেলপথ ARTC ১৮৮৪ সালে প্রথম স্থাপন করেছিল। ১৮৮৫ সালের পরবর্তী সময়ে ডিব্রু-সাদিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন ইত্যাদি প্রবর্তিত হয়। বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম ও কলকাতা বন্দরের সাথে রেলপথকে যুক্ত করাই ছিল মূল লক্ষ্য। যাতে আসামের চা, তুলা, পাট ও অরণ্য সম্পদ সহ অন্যান্য কাঁচামাল ঐসব বন্দর থেকে জাহাজে সরাসরি ব্রিটেনে রপ্তানি করা যায়। ইউরোপ সহ ব্রিটেনে শিল্প ও কল-কারখানা চালু রাখার জন্যই এইসব কাঁচামাল প্রয়োজন ছিল। **আসামের জনহিতের জন্য নয়, সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই রেলপথ প্রসার জরুরি ছিল**। ব্রিটিশ ভারতের উন্নয়ন সম্পর্কে এজন্য মন্তব্য করা হয় ঃ *"The progress made in India under British rule—like the coming of the Railways, Postal System, Telegraphic Communications etc—were all undertaken to facilitate their rule. The aim of the British policy was to integrate the Indinan economy with that of the British in such a way that India supplied Great Britain with cheap raw material for being manufactured into value–added (costly) finished products"*। এইভাবে আসাম সহ সমগ্র ভারতবর্ষ ছিল Captive market for British goods বা ব্রিটিশ পণ্যের 'বন্দি বাজার'।

পৃথিবীর উন্নত সব দেশেই রেলপথের সাথে দ্রুত শিল্পায়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, কিন্তু ব্রিটিশ-শাসিত আসামসহ ভারতবর্ষ ছিল এই প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম। রেলের পরিকাঠামো এবং অনুসারী শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ভারতবর্ষে সম্ভবপর থাকলেও, সেটি ব্রিটিশ-শাসিত আসাম বা ভারতবর্ষের অন্যত্র গড়তে দেওয়া হয়নি। রেলের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই বিদেশ থেকে আমদানি করা হত। আসামে রেলপথ প্রসারণ সম্পর্কে এরই জন্য মন্তব্য করা হয় ঃ

> *...almost everything needed by the (railway) industry from brushes and paints to iron pans, hoes and bill-hooks were imported from England. Till the middle of the 1850s, packing boxes too continued to come from England, with Chittagong and Calcutta becoming the main centres of such supplies later on.*

১৮.১.৩.১ রেলপথ ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তা

প্রথমদিকে আসামের কাঁচামাল পাণ্ডু থেকে স্টিমারে রপ্তানি করা হত। চা-বাগানের মালিকদের ক্রমাগত চাপের কাছে নতিস্বীকার করে এবং ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য নিয়ে আসাম ও বঙ্গের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে সহজ ও আরও লাভজনক করার উদ্দেশ্যে ১৮৯১ সালে ARTC-র অঙ্গ হিসাবে Assam Bengal Railway (ABR) Company প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯০৪ সালে ABR পুরোপুরি চালু হওয়ার সময় চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আসামের চা, পাট ইত্যাদির মোট বাণিজ্যের আর্থিক পরিমাণ ছিল প্রায় ৪ কোটি টাকার মতো। কিন্তু খুব দ্রুত এটি প্রসারিত হয় এবং ১৯২৮ সালে এটি প্রায় সাড়ে ১৮ কোটি টাকা হয়। ABR-এর মূল কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম বন্দর এবং এই সূত্রে চট্টগ্রাম শহরেরও কিছুটা উন্নতি হয়। রেলে মালপত্রের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে Assam-Bengal Railway Volunteer Rifles (ABRVR) ১৯০১ সালেই গঠিত হয়েছিল, যেটি পরবর্তী সময়ে Assam-Bengal Railway Battalion (ABRB) নামে পরিচিত হয়। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সময় আসাম পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে চট্টগ্রামের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আগে বীর বিপ্লবী সূর্য সেনের (মাস্টারদা)-এর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অবস্থিত ABR-এর 'ট্রেজারি' বা কোষাগারও লুণ্ঠিত হয়েছিল।

ABR-এর 'মিটার গেজ' লাইনের কাজ মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল : (১) **চট্টগ্রাম থেকে বদরপুর** এবং **শিলচর শাখা লাইন** (১৮৯৯ সালে কাজ শেষ হয়)—যেটি 'চিটাগঙ্গ-কাছাড়' লাইন নামে পরিচিত, (২) **বদরপুর থেকে লামডিং পাহাড়-লাইন** যেটি অনেক টানেল-এর মধ্য দিয়ে সমস্যা-সংকুল পরিস্থিতিতে তৈরি করতে কমপক্ষে ১১ বছর সময় লেগেছিল, এবং (৩) **গুয়াহাটি থেকে লামডিং হয়ে সুদূর উত্তরে মাকুম** পর্যন্ত প্রসারিত। একদিকে চা-বাগানের জন্য এবং অন্যদিকে রেলপথ নির্মাণের জন্য প্রচুর শ্রমিক-কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বহিরাগত এইসব শ্রমিক-কর্মচারীদের আসামে সহজে আনার জন্যও আবার রেলপথের প্রয়োজন অনুভূত হয়। শুধুমাত্র কোম্পানির বাণিজ্যিক তাগিদেই যে আসামে রেলপথ বিস্তারের নীতি ব্রিটিশ যুগে গুরুত্ব পেয়েছিল তা নয়, সাম্রাজ্য-রক্ষার স্বার্থে—সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক কারণেও এটি প্রাধান্য পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে Lord Dalhousie'র (১৮৪৮-৫৬) একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য :

It cannot be necessary for me to insist upon the importance of a speedy and wide introduction of railway communication throughout the length and breadth of India,...the expenditure of time, of money, of life, that are involved in even ordinary routine of military movements would convince of the urgency of speedier communication.

১৮.১.৩.২ সামরিক, শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তা

যদিও প্রথমদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ আসামে রেলপথ স্থাপনে তেমন উৎসাহ দেখাননি, কিন্তু আসামের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এবং চা-বাগান মালিকদের ক্রমাগত চাপ সহ সামরিক, শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আসাম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের সামরিক গুরুত্বের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে Mackenzie সাহেব মন্তব্য করেছেন ঃ "As the nineteenth century progressed, the British colonial authorities in mainland India grew extremely conscious of the strategic improtance of the region"। আসামের সীমান্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ-বিরোধী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিবাস অনেক সময় কর্তৃপক্ষের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। ডিব্রুগড় থেকে সাদিয়া পর্যন্ত প্রসারিত অঞ্চলে 'অবর'/'আদি' জনগোষ্ঠীর হামলা ইত্যাদি বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছিল। 'অবর'/'আদি'-দের উত্তেজনা প্রশমিত করার পরেই ডিব্রুগড়-সাদিয়া রেলপথ চালু করা সম্ভব হয়েছিল।

১৮৮৫ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের ফলে 'আপার-বার্মা' বা মায়ানমার-এর উর্ধ্বাংশ দখল করার পর লর্ড ডাফরিন (১৮৮৪-৮৮) সামরিক প্রয়োজনে আসামের মধ্য দিয়ে বার্মা-বেঙ্গল রেলপথ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাতে বঙ্গদেশ থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী দ্রুত যে কোনো স্থানে যেতে পারে। এই প্রশ্নে ডাফরিন পূর্ত দপ্তরের বাস্তুকার Sir Theodore Hope-এর সমর্থন পান, যদিও শেষপর্যন্ত এটি বাস্তবায়িত হয়নি। বদরপুর থেকে লামডিং অনুপম প্রাকৃতিক দৃশ্য শোভিত বিখ্যাত পাহাড়-লাইন তৈরির সময় ARTC-র জনৈক কর্মকর্তা (Mr. Molesworth) মন্তব্য করেছিলেন ঃ

If a feasible route can be found through the hills which separate Cachar from Burma, this branch from Badarpur...may eventually form a portion of a connection between Assam and the Burma Railway system.

সুতরাং ব্রহ্মদেশের সাথে রেলের মাধ্যমে যোগাযোগের উদ্যোগ যে পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়েছিল, সেটি বলা যায় না। মাঝে মাঝে আবার দেখা যায়, সামরিক প্রয়োজনের জন্য রেলের উপর অতিরিক্ত গুরুত্বের ফলে ভাইসরয় সহ ব্রিটিশ কর্মকর্তারা রীতিমত বিরক্ত হতেন। বদরপুর-লামডিং পাহাড়-লাইন তৈরির সময় ভাইসরয় লর্ড কার্জনের (১৮৯৯-১৯০৫) একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ

> *A petty uprising in a quasi-Bengal Village of peasants, was magnified into a menace to the empire, and the immediate construction of the Hill section was regarded as an imperial necessity.*

১৮.১.৩.৩ রেলপথ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর

ARTC-র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'Assam Bengal Rail' (ABR)-কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে (১৯৪২) Eastern Bengal Railway (EBR)-এর সাথে যুক্ত করে নতুনভাবে Bengal-Assam Railway (BAR) তৈরি হয়। এইভাবে ABR অবশেষে BAR-এ পরিণত হয়। ARTC পরিচালনাধীন আরও কয়েকটি বিচ্ছিন্নভাবে চালু রেল—যেমন, Bengal-Dooars Railway, Jorhat Provincial Railway, Chaparmukh–Silghat Rilway, Katakhal-Lalbazar Railway ইত্যাদি শেষপর্যন্ত Bengal-Assam Railway (BAR)-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং কৌশলগত কারণেই এই সংযুক্তি করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে BAR-ও দ্বিধাবিভক্ত হল। যেহেতু রেলপথটি পূর্ববঙ্গের মধ্য দিয়ে পাতা হয়েছিল (যে অংশটি পূর্ব-পাকিস্তান রেল) এরই ফলে আসাম সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের অন্য অংশ থেকে প্রকৃতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কেন উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্ম হল, সেটি অনুসন্ধান করার সময় দেশভাগজনিত এই দুর্দশা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে পরিণত হয়। যাইহোক, অনেক ঘুরে শিলিগুড়ির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা (যেটি 'Siliguri Corridor' বা 'Chicken's neck' বা 'মুরগির গলা' নামে পরিচিত) শেষপর্যন্ত কার্যকরী হয়। রেলের নামও বারবার পরিবর্তিত হয়। প্রথমে এই রেলপথ (১৯৫০ সালে) Assam Railway (AR), ১৯৫২ সালে North Easten Railway (NER) এবং অবশেষে ১৯৫৮ সালে মালিগাঁও-এ কেন্দ্রীয় অফিসসহ Northeast Frontier Railway (NF Rail) হিসেবে অব্যাহত আছে। আসলে, স্বাধীনোত্তর ভারতে রেলপথের সুবিধাকে

প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালে ব্রহ্মপুত্রের উপর বিখ্যাত সরাইঘাট সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালের শেষদিকে এটি উন্মুক্ত হয়। **বর্তমানে ৯টি অঞ্চলে (zone) বিভক্ত ভারতের রেলওয়ে মানচিত্রে NF Railway ক্ষুদ্রতম।**

১৮.১.৪ কয়লাখনি (Coal Mines)

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর অথচ শিল্পে অনুন্নত আসামে কয়লা সম্পদও কম নয়। বর্তমানে মেঘালয়ে অবস্থিত (সেইসময় আসামেরই অঙ্গ) চেরাপুঞ্জিতে ১৮৩৪ সালে সামান্য পরিমাণে 'black-gold' বা কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৪০ সালে ডিব্রুগড় ও শিবসাগরের প্রায় ৪০ কিমি দীর্ঘ জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে Assam Tea Company (ATC) এবং ARTC ব্যাপকভাবে কয়লা উত্তোলন শুরু করে। চা-শিল্পের কারখানার জন্য কয়লার গুরুত্ব ছিল অসীম। তিনসুকিয়া জেলার মাকুম বা লেডো শহর চা এবং কয়লা খনিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। তিনসুকিয়া জেলার সরাইপুঞ্জ—তারাযান অঞ্চল, কার্বি-আংলং-এর কোলিয়াযান, শীলভেটা এলাকা, নর্থ কাছাড় হিলস্-এর খোটা-আর্দা, উমরাংশু, গরমপানি প্রভৃতি পার্বত্য এলাকায় কয়লাখনির জন্যই কিছুটা নগরায়ণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। খাসি ও মিকির পাহাড়েও কিছুটা কয়লা সম্পদ আছে।

প্রথমদিকে কলকাতা-কেন্দ্রিক Coal Committee আসামের কয়লাখনি থেকে উত্তোলনে আগ্রহী হলেও তেমন অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেনি। মেসার্স Malcolm and Browne Wood পাহাড়ের সর্দারদের সাথে চুক্তি করে কয়লা উত্তোলনে কিছুটা অগ্রণী হলেও শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ যুগে ATC এবং ARTC-র কাছে পর্যুদস্ত হয়। ARTC-র উদ্যোগেই ১৮৮২ সালে তিনসুকিয়ায় লেডো কোলিয়ারি চালু হয় এবং সমগ্র আসামে মাকুম কয়লাখনি অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ARTC-র মতো সংস্থাগুলি গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। ১৯৭৩ সালে সমগ্র দেশের কয়লাখনিগুলির জাতীয়করণ হয় এবং ১৯৭৫ সালে Coal India Limited (CIL) গঠিত হয়। CIL-এর অঙ্গ হিসাবে North Eastern Coalfields-এর সদর দপ্তর মার্ঘারিটা (মার্গারেটা)-য় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কয়লা উৎপাদনে সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমান ভারতের স্থান তৃতীয়। CIL (কলকাতায় সদর দপ্তর) সমগ্র পৃথিবীতে কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান (৪.২৫ লক্ষ মানুষ নিযুক্ত) এবং সমগ্র ভারতবর্ষের ৮৫ শতাংশ কয়লা বর্তমানে CIL সরবরাহ করে।

১৮.১.৫ খনিজ তেল ও ডিগবয় (Mineral Oil and Digboi)

আসাম ব্রিটিশ অধিকৃত হওয়ার পর খনিজ তেলের সম্ভাবনার কথা আপার-আসামে কর্মরত তৎকালীন Army Officers—যেমন Lr. R. Wilcox, Major A. White, Capt. Francis Jenkins, Capt. P. S. Hanney-দের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ডায়ারিতে উল্লেখ আছে। দিহিং নদীর পাড়ে কয়লার সন্ধান করতে গিয়ে আসামে প্রথম চা-উৎপাদনের সাথে জড়িত স্বনামখ্যাত C. A. Bruce, কিংবা তৎকালীন Geological Survey of India-র অন্যতম কর্ণধার H. B. Medicott তাঁদের দিনলিপিতে লুক্কায়িত খনিজ তেলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন। যাইহোক, যেভাবে ডিগবয়ে শেষপর্যন্ত তেলের সন্ধান পাওয়া গেল সেটা কিছুটা আকস্মিক বলা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্থানটি ছিল জনশূন্য এবং ঘন অরণ্যবেষ্টিত অন্ধকার অঞ্চল, যেখানে হাতির মাধ্যমে বিশাল কাঠের গুঁড়ি নিয়ে আসা হত ডিব্রুগড়-মার্গারেটা (মার্ঘারিটা) রেলপথ নির্মাণের জন্য স্লিপার তৈরির উদ্দেশ্যে। ১৮৮২ সালে হাতির পায়ে তেলের ছাপ দেখা ও গন্ধ পাওয়ার পর Assam Railway and Trading Co. (ARTC)-র বিদেশি ইঞ্জিনিয়াররা নিশ্চিত হন। মুহূর্তে খনন কাজ শুরু হয় এবং শ্রমিকদের উৎসাহিত করার জন্য ধ্বনি ওঠে ঃ **'Dig boy, dig'** (শ্রমিকদের boy বলা রেওয়াজ ছিল) এবং এই ইংরেজি শব্দ থেকেই **Digboi (ডিগবয়)** শব্দটির জন্ম হয় এবং আসামে খনিজ তেল ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটে।

পৃথিবার প্রথম তেল উত্তোলনের কাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেন্‌সিল্‌ভানিয়ায় Col. William Drake ১৮৫৯ সালে করেছিলেন। পৃথিবীর দ্বিতীয় উদ্যোগটি আসামের ডিগবয়ে শুরু হয়। যদিও Oil India Ltd. (OIL) কোম্পানির ইতিহাসে আসামে হাতির পায়ে তেল-সংক্রান্ত প্রচলিত কাহিনিটির উল্লেখ নেই, তথাপি কলকাতার McKillop Stewart Co-র মিস্টার Goodenough-কে ডিগবয় থেকে প্রায় ৩০ মাইল (৪৮ কিমি) দূরে নাহোরপুঞ্জ এলাকায় ১৮৮৬ সালে তেলের জন্য প্রথম খননকাজের কৃতিত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ARTC-র কানাডীয় ইঞ্জিনিয়ার W. L. Lake-র কৃতিত্বের কথাই এই প্রসঙ্গে বেশি প্রচারিত। বিতর্ক যাই থাক, যেহেতু তেল উত্তোলনে ARTC-র বিশেষজ্ঞ দল প্রথম দিকে ছিল না, এরই জন্য ১৮৮৯ সালে Assam Oil Company (AOC) গঠিত হয় এবং বিংশ শতকের শুরু থেকে উৎপাদন ও পরিশোধন ডিগবয়ে শুরু হয় যেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দিনে ৭০০০ ব্যারেল পর্যন্ত শীর্ষে উঠেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ব্রহ্মদেশ

(মায়ানমার) ব্রিটিশ অধীনস্থ হওয়ার পর Burma Oil Co. (BOC) ১৯২১ সাল থেকে AOC-র পরিচালনার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে এবং দৈনিক উৎপাদন ১৯২৫ সালে ৩০,০০০ গ্যালন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩১ সালে ১,৮০,০০০ গ্যালন হয়।

১৯৮৯ সালে ডিগবয় তেল খননাগারের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ভারত সরকারের পোস্টাল বিভাগ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল। **১৯৮১ সালে ভারতীয় পার্লামেন্টের বিধি অনুযায়ী AOC-কে Indian Oil Corporation (IOC)-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল**। দীর্ঘ শতবর্ষেরও বেশি সময় ধরে ডিগবয় যথারীতি পর্যাপ্ত তেল উৎপাদন করে চলেছে, যার নজির সমগ্র পৃথিবীতে বিরল। লক্ষ লক্ষ টন পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন সহ বিভিন্ন ধরনের পেট্রোলিয়াম পণ্যকে পরিশোধিত করার উদ্দেশ্যে **বর্তমান আসামের চারটি স্থানে পরিশোধনাগার চালু আছে**ঃ তিনসুকিয়া জেলার ডিগবয়, গুয়াহাটির কাছে নুনমাটি, নিউ-বঙ্গাইগাঁও-এর কাছে ধালিগাঁও এবং গোলাঘাট জেলার নুমালিগড়। এর থেকেই অনুমান করা যায়, আসামে খনিজ তেলের ভাণ্ডার কত বিশাল। ব্রিটিশ যুগে উদ্ভাবিত ডিগবয় পরিশোধনাগারকে এরই জন্য বলা হয় ঃ "a technical marvel of the past and present". যদিও এর উৎপাদন সম্প্রতিকালে রীতিমতো হ্রাস পেয়েছে।

১৮.১.৬ অন্যান্য শিল্প (Other Industries)

ব্রিটিশ-শাসিত আসামে চা-শিল্পই ছিল প্রধান (প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। রেলপথ, কয়লা ও খনিজ-তেল ছাড়া আরও ছোটখাটো দু-একটি শিল্প তৈরি হয়েছিল মূলত আসামের অরণ্য-সম্পদের উপর নির্ভর করে। এরমধ্যে ১৯৩০-এর দশকে ধুবরিতে নির্মিত Swedish Match Factory উল্লেখযোগ্য, যেখানে প্রায় ৩০০-র মত শ্রমিক কাজ করত। অনেক কাঠগোলা ও কাঠ-চালাই-মিল বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়েছিল। আসামের Environmental History বা পরিবেশগত ইতিহাস রাজীব হ্যান্ডিক-এর *British Forest Policy in Assam*-এর মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে অধ্যাপিক স্বর্ণলতা বরুয়া মন্তব্য করেছেন ঃ

> *The symbiotic relation between man and forest was disrupted first in England since the 18th century industrialization. This disruption of the man-forest relation spread to all parts of the*

British Empire. By 1860, England had emerged as the world-leader of deforestation.

উপরোক্ত মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়, ব্রিটিশ যুগে আসামের অরণ্য-সম্পদ কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে লুণ্ঠিত হয়েছিল, যদিও বিনিময়ে আসামের মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছিল নিতান্তই নগণ্য (যেটুকু কর্মসংস্থান হয়েছিল সেখানে বহিরাগতর সংখ্যাই ছিল বেশি)। ১৯১১ থেকে ১৯২১ আসামের বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যাটি দেখলেই শিল্পায়নের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

সারণি ৪

১৯১১-২১ আসামের বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা

বছর	সকল শিল্পে মোট শ্রমিক	চা-কেন্দ্রিক বাগান-শ্রমিক	কয়লা শ্রমিক	খনিজ তেল	কাঠ
১৯১১	৫,০১,৬০৬	৪,৯৩,৭৬১	২,৮১০	১,০১০	১,১৭২
১৯২১	৫,৩০,৪৩৫	৫,১৯,২২৫	৩,১৫৮	২,০৮৭	২,১০৬

Source : *Census of India*, 1921, vol. III, Assam, p. 197.

শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে যে শ্রমিকের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের কিছু অংশ সংগঠিত (organised) শিল্পের, এবং বাকি অংশ অসংগঠিত শিল্পের। আসামের চা-বাগানে শ্রমিকরা সংগঠিত শিল্পের হলেও এবং বাগানে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের অস্তিত্ব থাকলেও তাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। দিনে ১০/১২ ঘণ্টা কাজ করে নামমাত্র মজুরির বিনিময়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি জীবনের এই 'কুলি-কাহিনি' ছিল রীতিমতো মর্মন্তুদ। ব্রিটিশ ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে **Whitley Report-এর সূত্র ধরে Mike Davis মন্তব্য করেছেন, ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতের মাথাপিছু আয় বাড়েনি, বরং কমেছে।** Davis-এর ভাষায় ঃ *If the history of British rule in India were to be condensed to a single fact, it is this : there was no increase in India's per-capita income from 1757 to 1947*। এছাড়াও Davis জানিয়েছেন ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু আয় প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গিয়েছিল। সুতরাং যেটুকু শিল্পোদ্যোগ ব্রিটিশ শাসনে হয়েছিল, তার ফলে যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়নি সেটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। মানব-উন্নয়ন মানে শুধু মজুরি বৃদ্ধি নয়,

অন্যান্য প্রসঙ্গও এসে যায়। আসামে ব্রিটিশ-শাসনের যাঁরা স্তুতি করেন, তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কালো-অধ্যায়গুলি সম্পর্কে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না। ১৯১১ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে সাক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা ছিল মাত্র ৬ শতাংশ, আসামের অবস্থা ছিল আরও করুণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে ঐ দেশের শ্রমিক-কৃষকের উন্নত চেতনার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। ১৯৪১ সালে মৃত্যুশয্যা থেকে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য Mrs. Rothbone-কে যে চিঠি লিখেছিলেন তার কয়েকটি লাইন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ

...in the Soviet Union illiteracy was eradicated within two decades, but in India after two centuries of British rule only 15 per cent of Indians were literate.

১৮.২ নগরায়ণ (Urbanization)

প্রাচীন আসামে প্রাগ্জ্যোতিষপুর (গুয়াহাটি), হটপেশ্বর (তেজপুর) প্রভৃতি স্থান নগর হিসাবেই পরিচিত। মধ্যযুগে আহোম-শাসিত আসামের (১২২৮-১৮২৬) রাজধানীগুলিকে নগর বলা হত, যদিও রাজবাড়ি ও দু-চারটি দর্শনীয় বস্তু ছাড়া ঐ জনপদগুলি প্রকৃতপক্ষে গ্রাম ছাড়া কিছু ছিল না। আসলে, যুগে যুগে শহর বা নগর সম্পর্ক সংজ্ঞা ও ধ্যানধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। আজকের দৃষ্টিতে অতীতের নগর বা নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দিককে বিচার করা যথার্থ হবে না।

১৮.২.১ আহোম যুগে রাজধানী-কেন্দ্রিক নগর

যেহেতু আপার-আসাম ছিল আহোম কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র, এরই জন্য বর্তমান শিবসাগর জেলার আশপাশে নদীর তীরে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কারণে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং সেটিকে কেন্দ্র করে কিছুটা নগরায়ণ প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছিল। (১) **চরাইদেও** ছিল আহোমদের প্রথম রাজধানী শহর। শিবসাগর শহর থেকে ৩০ কিমি দূরে নাগা পাহাড়ের তলদেশে প্রথম আহোম রাজা সুকাফা ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। যদিও স্থানটি পরবর্তী সময়ে পরিত্যক্ত হয়েছিল, তথাপি আহোম-শক্তির প্রতীক হিসাবে আজও এটি দর্শনীয়। চরাইদেও-তে ইটে তৈরি আহোম রাজাদের ৪২টি সমাধিস্থল (Maidam/মইদাম)-কে কেউ কেউ মিশরের পিরামিডের সাথে তুলনা করে থাকেন। কিছু ভাষ্য অনুযায়ী,

চরাইদেও হল Jerusalem of the East, (২) ১৭০৭ সালে আহোম রাজা রুদ্রসিংহ বর্তমান শিবসাগর শহর সংলগ্ন দিখৌ নদীর তীরে **রংপুরে** রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। আহোম রাজাদের গৌরবময় অধ্যায়ের সাক্ষী রংপুর শহর, যদিও মোয়ামারিয়া বিদ্রোহের সময় দুবার (১৭৬৯-৭০, ১৭৮৮-৯২) বিদ্রোহীরা এই রাজধানী দখল করেছিল। **রংপুরের ভগ্নদশাপ্রাপ্ত রাজবাড়ি ('কারেং-ঘর', 'তলাতল-ঘর', 'রং-ঘর') দর্শনীয় স্থান। এই পুরাতন শহরের নতুন নাম শিবসাগর যেটি বর্তমানে শিল্প শহর হিসাবে চিহ্নিত**। এখানকার ৩১৮ একর জোড়া সুবিশাল জয়সাগর সরোবর থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে 'কারেং-ঘর'-এ মাটির পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হত। (৩) দিহিং নদীর ধারে **বকট-অঞ্চলে** 'দিহিঙ্গিয়া রাজা' সুহুনমুঙ্গ (১৪৯৭-১৫৩৯) রাজধানী পত্তন করেন, যদিও এটি ক্ষণকাল স্থায়ী হয়েছিল। (৪) সুহুনমুঙ্গের পুত্র সুক্লেনমুঙ্গ (১৫৩৯-৫২) শিবসাগর থেকে প্রায় ১৪ কিমি দুরে দিখৌ নদীর তীরে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে **গোরগাঁও**-এ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং 'গোরগাঁও রাজা' নামে পরিচিত হন। এই রাজধানী শহর দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল। দীর্ঘ ৫ মাইল এলাকা জোড়া শহরে ইটের প্রাচীর এবং ইট ও কাঠের ভগ্ন রাজপ্রাসাদ আজও অবলোকনীয়। প্রাসাদ নির্মাণ সহ বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য বাইরে থেকে, বিশেষত বঙ্গদেশ থেকে, কারিগরদের আনা হত। (৫) রাজেশ্বর সিংহ (১৭৫১-৬৯)-র রাজত্বকালে **তইমুঙ্গ** কিছুদিন রাজধানী ছিল। (৬) তুংখুংগিয়া বংশের শাসনকালে আহোমদের শেষ রাজধানী (The last Capital of the Ahom Kingdom) ছিল **জোড়হাট**। ভোগদই নদীর তীরে এক-জোড়া হাট বা বাজার (চৌকিহাট এবং মাচারহাট)-কে কেন্দ্র করেই জোড়হাট নামটির উৎপত্তি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে চা-বাগান সহ 'টোকলাই' (Tocklai) গবেষণাগার ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে জোড়হাটের খ্যাতি বৃদ্ধি পায় এবং **আসামের সাংস্কৃতিক রাজধানী** (cultural capital of Assam) হিসেবে পরিচিত হয়।

আহোম যুগে অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক, জনসংখ্যা তেমন ছিল না, ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল সীমিত। গুয়াহাটি, ধুবরি বা হাজো এল্যাকায় যেসব হাট-বাজার ছিল সেখানে পান-সুপারি ইত্যাদির বেচাকেনাই ছিল প্রধান। বরপেটা ছিল কুটিরশিল্প প্রধান কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। এই অবস্থায় রাজধানী-কেন্দ্রিক নগর ছাড়া অন্যান্য জনপদগুলির গুরুত্ব ছিল উপেক্ষণীয়।

১৮.২.২ ব্রিটিশ যুগে নগরায়ণ

ব্রিটিশ যুগে চিরাচরিত 'পাইক' ও 'খেল' ব্যবস্থার অবসান ও উচ্চহারে নতুন ভূমি-রাজস্ব নীতির প্রবর্তন, পতিত জমি উদ্ধার ও বিতরণের জন্য Waste Land Regulation এবং চা-বাগিচার উপর গুরুত্ব আরোপ, প্রচলিত বিনিময় অর্থনীতির (barter economy) স্থলে নগদ মুদ্রার মাধ্যমে আদান-প্রদান এবং ঋণ-গ্রহণের ব্যবস্থা, বহির্বাণিজ্যের উপর গুরুত্ব-আরোপ, বাষ্পীয় স্টিমার ও রেল ইঞ্জিন চালু, বহিরাগতদের আমন্ত্রণ, খনিজ-সম্পদ উত্তোলন এবং অরণ্য-সম্পদের ব্যবসা, শ্রমের বিভাজন, অ-কৃষিজীবীদের উপর গুরুত্ব-আরোপ ইত্যাদি অনুসৃত নানা নীতির ফলে নগরায়ণ প্রক্রিয়া কিছুটা গতি পেয়েছিল বলা যায়, যদিও প্রত্যাশা অনুযায়ী ত্বরান্বিত হয়নি।

১৮৮১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কত শতাংশ মানুষ নগরায়ণের সুবিধা ভোগ করতে পেরেছিলেন নীচের সারণি থেকে সেটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

সারণি ৫

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নগরায়ণের পরিমাপ (১৮৮১-১৯২১)

জেলা	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
গোয়ালপাড়া	২.১৫	২.২৭	২.১৭	১.৯৪	২.২৬
কামরূপ	৩.৫৭	২.৭৮	৩.৪৬	৩.৪৮	৪.০৬
দরং	১.০৬	.০১	১.৫০	১.৪২	১.৭৫
নওগাঁও	.১৪	১.৪০	১.৭০	১.৭৯	২.৪০
লখিমপুর	.৪০	৩.৮৯	৩.০২	৩.১১	৩.৭৮
শিবসাগর	.৪০	২.১০	১.৮৩	২.২৯	৮.২৯
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা	২.৫০	২.২৯	২.৩৭	২.৪৫	৪.১১

Source : Keya Dasgupta, 'Urban Centres in the Spatial Structure of the Brahmaputra Valley under Colonialism' in *PONEIHA*, 15 Session, Doimukh, 1994, p. 192.

উপরোক্ত সারণি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কত স্বল্প সংখ্যক মানুষ নগরায়ণের সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নগরবাসীর সংখ্যাও বাড়ে, কিন্তু এক্ষেত্রে সেটিও সবসময় প্রতিফলিত হয়নি। উপরোক্ত ছয়টি জেলায় ১৮৮১ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে জনসংখ্যার হার কীরকম বেড়েছিল, প্রাপ্ত-সেন্সাস্ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কেয়া দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন। (সারণি ৬ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ৬

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নগর-কেন্দ্রের জনসংখ্যা (১৮৮১-১৯২১)

জেলা/শহর	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
গোয়ালপাড়া	৯,৫৯০	১০,২৬৫	১০,০২৪	১১,৭৭২	১৭,২৩০
ক. ধুবরি	২,৮৯৩	৪,৮২৫	৩,৭৩৭	৫,৮০৮	৬,৭০৭
খ. গৌরীপুর	৬,৬৯৭	৫,৪৪০	৬,২৮৭	৫,৯৬৪	৬,২১২
কামরূপ	২২,০২৭	১৭,৬২৫	২০,৪০৮	২৩,২২০	৩০,৯৪৩
ক. গুয়াহাটি	১১,৬৯৫	৮,২৮৩	১১,৬৬১	১২,৪৮১	১৬,৪৮০
খ. বরপেটা	১০,৩৩২	৯,৩৪২	৮,৭৪৭	১০,৭৩৯	১১,৭৩০
গ. পলাশবাড়ি	—	—	—	—	২,৭৩৩
দরং	—	—	—	—	৮,৩৬৪
ক. তেজপুর	২,৯১০	৪,০১১	৫,০৬৭	৫,৩৫৫	৭,৩৪১
খ. মঙ্গলদই	—	—	—	—	১,০২৩
নওগাঁও	৪,২৪৮	৪,৮১৫	৪,৪৩০	৫,৪৩০	৬,৮৮৫
ক. লামডিং	—	—	—	—	২,৬৫৪
লখিমপুর	—	—	—	—	২২,২১৫
ক. ডিব্রুগড়	৭,১৫৩	৯,৮৭৬	১১,২২৭	১৪,৫৬৩	১৬,০০৭
খ. তিনসুকিয়া	—	—	—	—	৩,০৮০
গ. নর্থ লখিমপুর	—	—	—	—	১,৯৬৬
ঘ. দুমদুমা	—	—	—	—	১,১৬২
শিবসাগর জেলা	৮,৭০৮	৯,৬১৯	১০,৯৭০	১৫,৮১৪	১৮,২৪২
ক. শিবসাগর শহর	৪,৫৮৩	৫,২৪৯	৫,৭১২	৫,৭৬৪	৫,৩২৯
খ. জোড়হাট	১,৯৮৪	২,১৫৯	২,৮৯৯	৫,২৩১	৬,৬২৬
গ. গোলাঘাট	২,১৪১	২২১১	২,৩৫৯	২,২৩৬	৩,৬৫৫
ঘ. নাজিরা	—	—	—	২,৫৮৩	২,৬৩২
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা মোট শহর	১০	১০	১০	১১	১৮

Source : Keya Dasgupta, *op. cit.*, p. 193.

নগরায়ণ ও শিল্পায়ন সাধারণত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকে। কৃষিভিত্তিক বৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে শহরের মানুষ অ-কৃষি বৃত্তিকেই বেছে নেয়। সবকিছুই নির্ভর করে উৎপাদনের উপর। কিন্তু ১৯২১ সালে আসামের যে ১৮টি শহরের উল্লেখ আছে (সারণি ৬), সেগুলি উৎপাদনের সাথে কতটুকু যুক্ত ছিল সেটি নিয়ে বিতর্ক

আছে। মূলত চা উৎপাদনকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতকের ব্রিটিশ-আসামে নগরের ব্যাপ্তি হয়েছিল, কিন্তু চা-বাগান কতটুকু শিল্প-পর্যায়ভুক্ত সেটিও কম বিতর্কিত নয়। আপার-আসামে একসময় লখিমপুর ও শিবসাগর জেলার অন্তর্ভুক্ত ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া এবং জোড়হাটের অভ্যুত্থান চা-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। **ডিব্রুগড় শুধুমাত্র আসাম নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে আজ সবচেয়ে বেশি চা-উৎপাদক জেলা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সামরিক ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে ডিব্রুগড়ের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কারণ অদূরেই ছিল তেল ও কয়লা খনি এবং এরই জন্য আসামের প্রথম রেলপথ ডিব্রুগড় থেকেই শুরু হয়েছিল।** দীপালি বরুয়া (*Urban History of India*) তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কীভাবে অর্থনৈতিক আঙ্গিকে ডিব্রুগড়ের গুরুত্ব ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেটির জন্যই নগরায়ণ প্রক্রিয়াও সেখানে শুরু হয়েছিল। কিন্তু ১৮৮১ সালে ডিব্রুগড়ের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৭,১৫৩ জন, এটি ছিল বড়ো সীমাবদ্ধতা। এরই জন্য বাইরে থেকে দক্ষ ও কর্মঠ শ্রমিক আনা জরুরি ছিল। **এই বহিরাগত শ্রমিকদের কেন্দ্র করে নগরায়ণ প্রক্রিয়া একটি নতুন মাত্রা পেয়েছিল।** বর্তমানে ১২ কিমি এলাকা-জোড়া ডিব্রুগড় পৌরসভা এলাকায় প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ বসবাস করেন। অতীত থেকে বর্তমানে নগরায়ণের মাধ্যমে কীভাবে একটি এলাকা পরিবর্তিত হয়েছে, এটি তারই প্রমাণ।

১৮.২.৩ জনসংখ্যা ও নগরায়ণ

আসামের চা-বাগান কেন্দ্রিক শহরগুলির চরিত্র ১৯০১ সালের সেন্সাসে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে B. C. Allen মন্তব্য করেছিলেন, বাগানগুলির অভ্যন্তরে সাহেবদের 'ক্লাব'-কালচার ও মাড়োয়ারি ঋণদাতা থেকে শুরু করে নগর জীবনের কিছু সুবিধে থাকলেও সেগুলি ঠিক নগর ছিল না এবং আশপাশের গ্রামীণ জীবনে তার তেমন প্রভাবও ছিল না, যদিও জেলা সদরগুলির ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছুটা প্রভাব দেখা যেত। আসলে, **চা-বাগানগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন জগৎ এবং স্থানীয় মানুষের সাথে বাগানগুলির সম্পর্ক ছিল নগণ্য।** বিংশ শতকের প্রথমার্ধে আসামের চা-বাগানের জনসংখ্যা ছিল ৬,৫৭,৩৩১ জন, এর মধ্যে বাগানে শ্রমিকের সংখ্যা ৬,২৩,৪১৭ জন। **স্থানীয় মানুষের বাগান-শ্রমিকের কাজে অনীহার কারণে শ্রমিকদের বেশিরভাগই ছিল বহিরাগত** এবং এটিকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী সময়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়। *Imperial Gazetteer*-এর বিবরণ অনুযায়ী, "a town is the commercial centre of a district which

does not produce enough food to feed its foreign population"। বিভিন্ন স্থান থেকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা নগর-প্রধানদের বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের মধ্যে এসে যায়।

শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনেও নগরায়ণের পথ প্রশস্ত হয়েছে। আগের সারণিতে (৫) ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ছয়টি নগর-কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আসামের আরও তিনটি জেলা (কাছাড়, নর্থ কাছাড়, কার্বি আংলং) নিয়ে ব্রিটিশ শাসিত আসামে মোট নয়টি জেলা ছিল। এইসব জেলা সদরগুলিকে কেন্দ্র করে নগরায়ণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিতে হলেও, অব্যাহত ছিল। শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে **বর্তমানে আসামে ২৭টি জেলা এবং ৪৯টি মহকুমা এবং এর সদর দপ্তরগুলিকে কেন্দ্র করে নগরায়ণের চাহিদা ক্রমবর্ধমান।** নলবাড়ি, মঙ্গলদই, কোকরাঝাড়, গোয়ালপাড়া, ধুবরি প্রভৃতি সদর এলাকা শাসনতান্ত্রিক কারণেই নগর পর্যায়ে উন্নীত। একসময় ৫,০০ জন বেষ্টিত অ-কৃষিজীবী এলাকাকে শহর পর্যায়ে অঙ্গীভূত করা হত, পরবর্তী সময়ে এটি ১০,০০০ হয়। এই সংজ্ঞা প্রয়োগ করলে বিংশ শতকের প্রথমদিকে গুয়াহাটি, ডিব্রুগড়ের মতো গুটি কয়েক এলাকাকেই প্রকৃতপক্ষে নগর বলা যায়। **স্বাধীনোত্তর যুগে শিল্প-শহর হিসেবে ডিগবয়, দুলিয়াযান, নামরূপ, মোরান, বঙ্গাইগাঁও, নুমালিগড়, যোগীঘোপা** প্রভৃতি এলাকা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। **বর্তমান আসামে প্রায় ১২৫টি নগর/শহর বিদ্যমান।** অমলেন্দু গুহ ব্রিটিশ যুগে অবিভক্ত আসামের (পাহাড় ও বরাক উপত্যকা সহ) মোট জনসংখ্যার যে চিত্রটি দিয়েছেন সেটি এইরকম ঃ

সারণি ৭

ব্রিটিশ যুগে অবিভক্ত আসামের জনসংখ্যা (হাজার হিসেবে)

সন	মোট জনসংখ্যা
১৮৭২	৪,১৬২
১৮৮১	৪,৯০৮
১৮৯১	৫,৪৭৮
১৯০১	৫,৮৪২
১৯১১	৬,৭১৪
১৯২১	৭,৬০৬
১৯৩১	৮,৮০২
১৯৪১	১০,৪১৮

Source : Amalendu Guha, *Planter Raj to Swaraj*, p. 279.

সারণি (৭) থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় ব্রিটিশ-শাসিত আসামে জনসংখ্যা ক্রমাগত কীভাবে বেড়েছে। ১৯০১ সালের ৫৮ লক্ষ থেকে ১৯৪১ সালে ১ কোটির উপর দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনোত্তর কালে আসাম বারবার খণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, বিশেষত ১৯৭১ সালের পর থেকে, আসামের জনসংখ্যা ক্রম-বর্ধমান। কামরূপ, কাছাড়, নওগাঁও, শোনিতপুর, বরপেটা, ধুবরি, দরং প্রভৃতি জেলায় অভাবনীয়ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির কারণ হিসেবে প্রতিবেশী রাষ্ট্র (পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ) থেকে **'অনুপ্রবেশ'**-এর প্রশ্নটি রাজনৈতিক মানচিত্রকে জটিল করে তুলেছে। **২০০১ সালের জনগণনায় আসামের জনসংখ্যা ২ কোটি ৬৬ লক্ষ এবং বর্তমানে এটি ৩ কোটি অতিক্রম করেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।**

আসামের দুটি প্রধান শহর—গুয়াহাটি ও শিলচরের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূর্বতন 'গৌহাটি', বর্তমানে 'গুয়াহাটি' (গুয়া=সুপারি, অর্থাৎ সুপারির বাজার থেকে নামটির উৎপত্তি) বর্তমানে শুধু আসামের বা উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম শহরই নয়, সমগ্র ভারতে দ্রুত বিকাশমান শহরগুলির মধ্যে পঞ্চম স্থানাধিকারী। রাজধানী দিসপুর প্রকৃতপক্ষে গুয়াহাটিরই অঙ্গ। একদিকে যেমন অতীতের পান-বাজার, পল্টন-বাজার, ফ্যান্সি-বাজার, উজান-বাজার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি আছে, তেমনি উত্তর-পূর্ব ভারতের সিংহদ্বার হওয়ার সুবাদে অত্যাধুনিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও চারিদিকে প্রসারিত। **১৯৭১ সালে গুয়াহাটির জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২ লক্ষ, সেটি বেড়ে ১৯৯১ সালে ৫ লক্ষ, ২০০১ সালে ৮ লক্ষ এবং বর্তমানে ১০ লক্ষ অতিক্রম করেছে বলে বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন।** বরাক উপত্যকায় বাঙালি-অধ্যুষিত কাছাড় জেলার সদরকেন্দ্র **শিলচর আসামের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।** বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে শিলচরের গুরুত্ব বিরাট, কারণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুটি রাজ্য মিজোরাম এবং মণিপুরের একাংশের প্রধান তোরণ বা সিংহদ্বার হল শিলচর। ২০০১ সালের জনগণনায় শিলচর শহরের লোকসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৪৪ হাজারের মতো। কিন্তু ২০০১ সালের পর নানা কারণে **শিলচরের জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে বর্তমানে এটি ৫ লক্ষ অতিক্রম করেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।**

ঊনবিংশ অধ্যায়

মধ্যবিত্ত

১৯.১ মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে নানারকম ধারণা (Different Concepts regarding middle Class)

মার্কসীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ধনতান্ত্রিক সমাজে **দুটি মূল শ্রেণি আছে** ঃ একটি পুঁজিপতি বা 'বুর্জোয়া' (ফরাসি শব্দ) এবং অপরটি 'প্রলেতারিয়েত' (শ্রমিক শ্রেণি)। এই দুই পরস্পর-বিরোধী শ্রেণির সম্পর্ক বৈরিতার হলেও একজনের অস্তিত্ব আবার অন্যের উপর নির্ভরশীল। এই উভয় শ্রেণির মাঝখানে থাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। কেউ মনে করেন, মধ্যবিত্তের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে যদিও ঐ নামে হয়তো বা অতীতে সব সময় পরিচয় থাকত না। যাদের আজ 'বুর্জোয়া' বলা হয়, শুরুতে (এমনকি ১৯ শতকের আগে পর্যন্ত) কিন্তু আভিধানিক অর্থে তাদেরই একসময় 'মধ্যবিত্ত' বলা হত। ধনতন্ত্র আবির্ভাবের আগে অথবা শিল্পবিপ্লবের প্রাক-মুহূর্তে কৃষিভিত্তিক ফরাসি সমাজে অভিজাত এবং কৃষকের মাঝখানে 'বুর্জোয়া'দের অবস্থান ছিল। বণিক, ব্যবসাদার, পেশাদারি প্রভৃতি গোষ্ঠী সেদিন এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৮৯ সালের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী 'মহান ফরাসি বিপ্লব'-এর মত ঘটনা মূলত 'বুর্জোয়া'দের নেতৃত্বেই ঘটেছিল। এরই জন্য কেউ কেউ মধ্যবিত্তদের 'নতুন যুগের অগ্রদূত', 'প্রগতিশীল' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে থাকেন। Aristotle বলতেন ঃ "The most perfect political community is one in which the middle class is in control and outnumbers both of the other classes." George Bernard Shaw মধ্যবিত্তের প্রশংসা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন ঃ "I have to live for others and not for myself : that's middle-class morality." ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে ঃ "Upper classes are a nation's past, the middle class is its future."

আধুনিক যুগে মধ্যবিত্ত আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত ঃ উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত। সকল ভাগের অবস্থানও স্থায়ী নয় ; কেউ উপরে ওঠে, কেউ আবার নীচে নেমে যায়। অর্থাৎ **সামগ্রিকভাবে মধ্যবিত্ত একটি 'fixed category' নয় ; কেউ 'বুর্জোয়া' হওয়ার চেষ্টা করে ; কেউ আবার 'প্রলেতারিয়েত'-এর পর্যায়ে নেমে আসে** এবং এর ফলে চিন্তা-চেতনা ও কাজকর্মে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন

লক্ষ করা যায়। যাদের একসময় 'প্রগতিশীল' বলে মনে হত, তারা মাঝে মাঝে প্রগতি-বিরোধী 'প্রতিক্রিয়াশীল' শিবিরে যোগ দিতে দ্বিধা করে না। ধনতন্ত্রের অগ্রগতির সাথে সাথে পরস্পর-বিরোধী দুটি মৌলিক শ্রেণি অর্থাৎ পাহাড়-প্রমাণ মুনাফার সঞ্চয়কারী 'বুর্জোয়া' ও শোষণ ও বৈষম্যের শিকার 'সর্বহারা' বা 'প্রলেতারিয়েত'-এর মধ্যবর্তী স্তরে সৃষ্টি হয় **'পেটি-বুর্জোয়া', যাদের অন্য নাম 'মধ্যবিত্ত'**। 'পেটি-বুর্জোয়া' নামটি থেকেই আন্দাজ করা যায়, এই শ্রেণির আসল লক্ষ্য বা অভিমুখ কোন দিকে। কেউ কেউ মধ্যবিত্তকে 'Co-ordinating class' আখ্যা দেন। মার্কসীয় দৃষ্টিতে, 'পেটি-বুর্জোয়া'-মার্কা মধ্যবিত্তদের দ্বৈত-চরিত্র থাকে ; সব সময় এই গোষ্ঠী যে প্রগতিপন্থী বা 'নবযুগের অগ্রদূত' হবে এমন গ্যারান্টি নেই ; বরং প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। কারণ সর্বহারা বা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বকে মধ্যবিত্তরা সুনজরে দেখতে অভ্যস্ত নয়। এই কারণেই নানারকম দোদুল্যমানতা মধ্যবিত্ত শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

উৎপাদনের উপাদানের সাথে সম্পর্কের উপর একটি শ্রেণির অবস্থান ও ভূমিকা নির্ভর করে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে একজন অভিজাত অনেক ভূমির মালিক, ধনতান্ত্রিক সমাজে একজন পুঁজিপতি বিপুল অর্থের অধিপতি হওয়ার সুবাদে উৎপাদনের উপকরণের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখে ; অন্যদিকে একজন শ্রমিকের শ্রম করার ক্ষমতা ছাড়া আর কিছু নেই। **শ্রম আবার দুভাগে বিভক্ত :** উৎপাদনশীল শ্রম (productive labour) এবং অনুৎপাদক শ্রম (non-productive labour)। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যেহেতু কায়িকশ্রম কম করে এবং বৌদ্ধিক শ্রমেই বেশি অভ্যস্ত, এরই জন্য কোন্ কাজটি উৎপাদনশীল এবং কোন্‌টি অনুৎপাদক সেই বিতর্ক আজও অব্যাহত। **'উদ্‌বৃত্ত মূল্য' তত্ত্বে** কার্ল মার্কস্ লিখেছিলেন : "....only that labour is productive which creates a surplus value." 'উদ্‌বৃত্ত মূল্যের' সাথে **মধ্যবিত্তদের শ্রমের যোগাযোগ আনতে ইদানীং কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয় :** যেমন, **'labour aristocracy', 'professionals', 'white collar workers', 'Computer coolie'** ইত্যাদি। উনবিংশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের স্থলে পুঁজিপতিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শাসকশ্রেণি (ruling class) হিসেবে পুঁজিপতিদের আবির্ভাব ঘটে। **যুগে যুগে শাসকশ্রেণির ভাবনা-চিন্তাই সেই যুগের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। মার্কস্-এর ভাষায় : "The ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas" এবং মধ্যবিত্তরা এতে প্রভাবিত হয়।**

১৯.২ অসমিয়া মধ্যবিত্ত সমাজের অভ্যুদয় ও বিকাশ (Origin and growth of the Assamese Middle Class)

অসমিয়া মধ্যবিত্ত ঃ তত্ত্ব ও বিতর্ক

অসমিয়া মধ্যবিত্ত সমাজের অভ্যুদয় ও বিকাশ সম্পর্কে অমলেন্দু গুহ (১৭.১ দ্রষ্টব্য), হীরেন গোঁহাই (১৭.৭১ দ্রষ্টব্য), মনোরমা শর্মা, রাজেন শইকিয়া প্রভৃতি গবেষকদের ব্যাখ্যা কিছুটা স্বতন্ত্র মনে হলেও সকলে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতেই অধ্যায়টির পর্যালোচনা করেছেন। ভারতবর্ষে **কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা (যেমন, অনিল শীল, জুডিথ্ ব্রাউন) তাঁদের প্রবর্তিত 'ভদ্রলোক' তত্ত্বের সাথে মধ্যবিত্তকে সমন্বিত করেছেন**। যদিও ব্রিটিশ শাসনের সাথে ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তের অভ্যুদয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ; তথাপি সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে নেতৃত্বদানের প্রশ্নে বিভিন্ন রাজ্যে মধ্যবিত্তদের অবস্থান ভিন্ন রকম। কিছু ক্ষেত্রে তথাকথিত 'অভিজাত ভদ্রলোকদের' অধীনে 'গৃহস্থ ভদ্রলোক' বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভ্যুদয় ঘটেছে। কিছু ক্ষেত্রে আবার স্বাধীন সত্তা নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হয়েছে এবং **রাজেন শইকিয়ার** মতে, এই দ্বিতীয় ধারাটি অসমিয়া মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যদিকে **রমেশ কলিতা** মনে করেন, আসামে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে আহোম রাজত্বে উপর তলার অনুগ্রহে যে বণিক-ব্যবসাদার শ্রেণি (commercial class) ছিলেন, তাঁরাই পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্ত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। যদিও **মনোরমা শর্মা** তাঁর প্রবন্ধে রমেশ কলিতাদের উপরোক্ত ধারণা নস্যাৎ করে দিয়েছেন, তথাপি শর্মার ভাষানুযায়ী, আসামে মধ্যবিত্তদের সামাজিক শিকড় অনুসন্ধান করতে গেলে একদিকে ব্রিটিশ শাসনকালে রাজস্ব-আদায়কারী প্রতিপত্তিশালী 'মৌজাদার' এবং অন্যদিকে সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রচলিত বৈষ্ণবসত্রের পদাধিকারীদের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে ; কারণ উপরোক্ত দুটি প্রতিষ্ঠান মধ্যবিত্ত অভ্যুদয়ে সাহায্য করেছিল।

মনোরমা শর্মার এইরকম বিশ্লেষণে বিস্ময়ান্বিত হয়ে রাজেন শইকিয়া প্রশ্ন তুলেছেন, যেহেতু মধ্যবিত্তের অভ্যুদয়ের সাথে নগরায়ণ (urbanization) প্রক্রিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ; এরই জন্য **'মৌজাদার' বা 'সত্র'-র মতো গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের সাথে মধ্যবিত্তের অভ্যুদয়ের প্রশ্নটিকে যুক্ত করা যথার্থ হবে না**। পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়ার (১৭.৩৭ দ্রষ্টব্য) বিখ্যাত নাটক 'গাঁওবুড়া' উদ্ধৃত করে শইকিয়া দেখিয়েছেন, কীভাবে প্রথম দিকে প্রতিপত্তিশালী হলেও 'মৌজাদার' প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে অনিশ্চিয়তার শিকার হয়ে ক্রমশ করুণার পাত্রে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত,

আসামের অতীত সামাজিক জীবনে 'সত্র'র গুরুত্ব হারাচ্ছিল। **১৯০৫ সালে** *The District Gazetteer of Assam*-এর পরিসংখ্যান **অনুযায়ী, সমগ্র আসামে মোট ২৮৮টি 'সত্র' ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার** (*The Neo-Vaishnavite Movement and the Satra Institutions of Assam*) **হিসাব অনুযায়ী, এই 'সত্র'-র সংখ্যা একসময় ছিল ৩৮০টি। আসলে, মোয়ামারিয়া বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সমাজ-জীবনে 'সত্র'র গুরুত্ব ক্রমশ কমতে থাকে ; যদিও এক সময় 'সত্র' সমাজে একচ্ছত্রর ভূমিকায় ছিল।** সমগ্র ঊনবিংশ শতকে মাত্র চারটি নতুন 'সত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—যেমন, গোনামারা (নওগাঁও), ধর্মপুর (গোয়ালপাড়া), নহিরা (কামরূপ) এবং নসত্র (শিবসাগর)। **রাজেন শইকিয়ার মতে, কী 'মৌজাদার', কী 'সত্র'—সমাজজীবনে এই দুটিই ছিল ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠান। প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন মৃতপ্রায় গাছে ফল আসে না ; এইসব মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠান থেকেও তেমনি নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব অসম্ভব।** শইকিয়ার ভাষায় ঃ "No decadent institution could produce men who were destined to dominate the thought and action of a larger community in a new situation.....The newly evolving society had newer requirements which the *satras* could no longer supply." এইভাবে মনোরমা শর্মার ব্যাখ্যাকে রাজেন শইকিয়া প্রকৃতপক্ষে নাকচ করে দিয়েছেন। বিস্তৃত হিসাবনিকাশ করে সমগ্র ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মৌজাদার এবং সত্র-র প্রতিনিধি হিসাবে মাত্র ৬ জন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীকে শইকিয়া খুঁজে পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে ঘনশ্যাম বরুয়া (১৮৬৭-১৯২৩), পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া (১৮৭১-১৯৪৬, ১৭.৩৭ দ্রষ্টব্য), আব্দুল মাজিদ (১৮৬৭-১৯২৪) ছিলেন মৌজাদার পরিবারভুক্ত ; অন্যদিকে দত্তদেব গোস্বামী (১৮১৮-১৯০৪), হেমচন্দ্র গোস্বামী (১৮৭২-১৯২৮ ; ১৭.৭৩ দ্রষ্টব্য) এবং পীতাম্বরদেব গোস্বামী (১৮৮৫-১৯৬২) এসেছিলেন 'সত্র'র প্রতিনিধি হিসাবে। রাজেন শইকিয়ার মতে, যে তিনটি অঙ্গের মাধ্যমে আসামে মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব হয়েছিল সেগুলি হল ঃ (১) ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র, (২) পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং (৩) চা শিল্প। এই তিনটি অঙ্গ সব সময় যে স্বতন্ত্রভাবে আবির্ভূত হয়েছে তা হয়তো নয় ; এক এক সময় সম্মিলিতভাবেও হয়েছে এবং গুটি কয়েক অসমিয়া আমলা চা শিল্পের রূপকার হিসেবেও শেষজীবনে খ্যাতিলাভ করেছেন।

১৯.২.১ ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র (Colonial Bureaucracy)

ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সময় স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য সহযোগিতার চাহিদা ছিল। আসলে, আসামের মানুষের কাছে ব্রিটিশ শাসনের উপযোগিতা

তাদের মাতৃভাষায় প্রচারের উদ্দেশ্যেও এর প্রয়োজনীয়তা ছিল। যদিও অসমিয়াদের অধিকাংশ সেই সময় ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন না (এরই জন্য সিলেট থেকে ইংরেজি-জানা বাঙালি করণিকদের প্রথম দিকে ব্যাপকভাবে নিয়োগ করা হত) এবং অনেকে প্রথাগত শিক্ষার আঙ্গিকে তেমন শিক্ষিতও ছিলেন না ; তথাপি স্থানীয় প্রথা, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অসমিয়া বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য সহযোগিতা অনিবার্য হয়ে উঠল। নানারকম ট্রেনিং ইত্যাদির মাধ্যমে এবং কাজ চালানোর জন্য কিছুটা ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে অসমিয়াদের অন্তর্ভুক্ত করে এইভাবে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র তৈরি হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় আমলাদের মধ্যে যে ক'জন পরবর্তী সময়ে পদাধিকার বলে শীর্ষে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে যদুরাম ডেকা বরুয়া (১৮০১-৬৯), হালিরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮০২-৩২), যজ্ঞরাম ফুকন (১৮০৫-৩৮), দীননাথ বেজবরুয়া (১৮১৩-৯৫), হরকান্ত শর্মা মজিন্দার বরুয়া (১৮২৯-৫৯), গুণাভিরাম বরুয়া (১৮৩৪-৯৪), হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩৫-৯৬), মাধবচন্দ্র বরদোলই (১৮৪৭-১৯০৭), রজনীকান্ত বরদোলই (১৮৬৭-১৯৪০), কনকলাল বরুয়া (১৮৭২-১৯৪০) প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই, ঔপনিবেশিক আমলা হওয়া সত্ত্বেও, কিছুটা বাঙালি (সিলেট-কেন্দ্রিক) আমলাদের প্রতিযোগী হিসেবে, অসমিয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির অঙ্গনে অনেক অবদান রেখে গেছেন এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

যদুরাম ডেকা বরুয়া ছিলেন অসমিয়া ভাষার প্রথম অভিধান—রচয়িতা এবং সমকালীন বাংলা পত্রিকা 'সমাচার-চন্দ্রিকা' ও 'সমাচার দর্পণ'-এ নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। তিনি শুধু যে সতীদাহ প্রথার (যদিও আসামে তেমন প্রচলিত ছিল না) বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছিলেন তাই নয় ; নিজে বিধবা বিবাহ করে অসমিয়া সমাজে আলোড়ন এনেছিলেন। হালিরাম ঢেকিয়াল ফুকন কীভাবে বাংলা ভাষায় প্রথম 'অসম বুরঞ্জি' প্রকাশ করে বঙ্গের বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আসামের প্রতি আকর্ষণ করেছিলেন সেটি প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ যজ্ঞরাম ফুকন, আমলা হওয়া সত্ত্বেও, সমাজ-জীবনে ছিলেন প্রকৃত অর্থেই 'বিপ্লবী'। দীননাথ বেজবরুয়া সংরক্ষণশীল সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষা প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং লখিমপুরে একটি ইংরেজি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আসামের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি দীননাথের ছিল গভীর মমত্ববোধ এবং এরই জন্য তাঁর মৃত্যুর পর *The Statesman* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : He (Dinanath)

was a living history of reference on all subjects—social, religious and political, of the time of the kings of Assam. আসাম থেকে প্রকাশিত *Times of Assam*-এ উল্লেখ করা হয়েছিল ঃ He took "the lead in all matters of public interest." হরকান্ত শর্মা মজিন্দার বরুয়া সংস্কৃত, ফার্সি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে তাঁর বিখ্যাত *সদর আমিনের আত্মজীবনী* গ্রন্থে ঊনবিংশ শতকের আসামকে নানাভাবে জীবন্ত করেছেন। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব সহ সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই আত্মজীবনী একটি আকর গ্রন্থ। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (দ্বাদশ অধ্যায়ে) আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (গান্ধিজি 'মহাত্মা' নামে পরিচিত হওয়ার অনেক আগেই আসামের একমাত্র 'মহাত্মা' ছিলেন আনন্দরাম) এবং বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে গুণাভিরাম বরুয়া (১৭.১৮ দ্রষ্টব্য), হেমচন্দ্র বরুয়া (১৭.৭৪ দ্রষ্টব্য), রজনীকান্ত বরদোলই (১৭.৫৮ দ্রষ্টব্য), কনকলাল বরুয়া (১৭.১০ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি অসমিয়া আমলাদের অবদান উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে অসমিয়া মননের সাদৃশ্য ও ঐক্য অংকনের ক্ষেত্রে মাধবচন্দ্র বরদোলই-এর মত আমলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শংকরদেব-এর পূর্ববর্তী মাধব কন্দলি রচিত অসমিয়া ভাষার 'রামায়ণ'-কে অনিবার্য অবলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করে পুনঃপ্রচারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন মাধবচন্দ্র বরদোলই। ঊনবিংশ শতকে পূর্ত দপ্তরের করণিক লাখিরাম বরুয়া হারিয়ে-যাওয়া অসমিয়া লোকগীতিকে উদ্ধার ও জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এইসব বরণীয় ঔপনিবেশিক আমলারা একদিকে যেমন আসামে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ মসৃণ করেছিলেন, তেমনি আবার তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে অসমিয়া জাতীয়তাবাদ সহ মুখর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের পথও সুগম বা সহজগম্য করেছিলেন।

ভাষাকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্তদের নেতৃত্বে অসমিয়া জাতীয়তাবাদ ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে বিকশিত হয়নি ; বরং কয়েক দশক পরে এটি ঘটেছিল। আসলে, প্রথম দিকে ব্রিটিশ শাসকদের অসমিয়া ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা মর্যাদা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা ছিল না ; বরং তাঁরা (যেমন, William Robinson) মনে করতেন বাংলা ভাষারই একটি শাখার নাম অসমিয়া। কেউ কেউ মনে করেন এক সময় শুধু আসাম নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে (ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি রাজন্যশাসিত রাজ্যসহ) বাংলাই ছিল প্রকৃতপক্ষে 'রাষ্ট্রভাষা'। ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাফেজখানা থেকে বিভিন্ন দলিল সংগ্রহ করে

তাঁর *প্রাচীন বাংলাপত্র সংকলন* গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে আসাম, কোচবিহার, ভূটান, কাছাড়, মণিপুর, ত্রিপুরার শাসকরা নিজেদের মধ্যে এবং ব্রিটিশদের সাথেও প্রথম দিকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধকদের মাধ্যমে বাংলা ভাষার এই ব্যাপ্তি সেদিন সম্ভবপর হয়েছিল। বর্মী আক্রমণের সময় আসামের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার ব্রিটিশ অধিকৃত রংপুর সহ বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বঙ্গদেশের 'বাবু সংস্কৃতি'র ঢেউ আসামকেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। সমগ্র পূর্ব ভারতে বাংলা ও হিন্দুস্থানি ভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা সম্পর্কে প্রথম দিকে ব্রিটিশ শাসকদের তেমন ধারণাও ছিল না।

১৮৩৬ সালে বাংলা ভাষার মাধ্যমে আসামের বিদ্যালয়ে শিক্ষা চালু করার সময় গভর্নর জেনারেল-এর এজেন্ট ও কমিশনার Francis Jenkins মন্তব্য করেছিলেন ঃ ....*It was expedient under every circumstance of policy, for the gradual amalgamation of the people of Assam with our subjects in Bengal.* ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৩ পর্যন্ত ব্রিটিশদের এই নীতির বিরুদ্ধে আসামের কোথাও প্রতিবাদও ধ্বনিত হয়নি। অসমিয়া ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ সেই সময় অনুপস্থিত ছিল। Jenkins এর ভাষায় ঃ *"I do not recollect that there was a single proposition made to retain Assamese, or that any difficulty was alleged as to the introduction of Bengali as the language of the courts."* প্রকৃতপক্ষে 'আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন'-এর উদ্যোগে ১৮৪৬ সালে *অরুণোদয়* পত্রিকা আত্মপ্রকাশের পরই আস্তে আস্তে অসমিয়া ভাষার জন্য গুঞ্জরন শুরু হয়। ১৮৫৩ সালে A. J. Moffat Mills (সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক) যখন আসাম পরিভ্রমণে আসেন, সেই সময় বিভিন্ন প্রতিবেদনে এটি বাঙ্ময় রূপ পায় ; যদিও ১৮৭৩ পর্যন্ত বাংলা ভাষা চালু ছিল। আসামের ঔপনিবেশিক আমলারা ১৮৩৬ থেকে ১৮৭৩ পর্যন্ত অধ্যায়টির জন্য সরাসরি ব্রিটিশ ভেদবুদ্ধিকে দায়ী না করে এটিকে 'বাঙালি কেরানিদের ষড়যন্ত্র' হিসেবে চিত্রিত করেছেন এবং সমকালীন অসমিয়া সাহিত্যের রথী-মহারথীরাও (যেমন, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া, বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া প্রভৃতি) একই চিন্তার শরিক ছিলেন। ডিম্বেশ্বর নিয়োগ মন্তব্য করেছেন ঃ *"....Bengali usurped the place at the instigation of the Bengali clerks who came to Assam for living."* কিংবা বিরিঞ্চি কুমার বরুয়ার ভাষায় ঃ *Under the influence of these men, recruited*

mostly from Bengal, the British administration made Bengali the language of court and the medium of instruction in the schools of Assam." **এইভাবে তথাকথিত 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' এবং বাঙালি-বিদ্বেষের মধ্য দিয়েই অসমিয়া মধ্যবিত্ত বা অসমিয়া জাতীয়তাবাদ যাত্রা শুরু করেছিল।** অসমিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের অনুসন্ধান করতে গেলে এটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

যেহেতু চরিত্রগত কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণি কায়িক পরিশ্রমে অনিচ্ছুক এবং 'White collar section'-এ যোগ দিতে বেশি আগ্রহী যেহেতু David Scott-এর সময় থেকে ইংরেজি জানা বহিরাগত বাঙালিরা আসামের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সহ অফিস-আদালতে ঐ পদগুলি দখল করেছিলেন, এরই জন্য অসমিয়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রথম বিদ্বেষের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েন বাঙালি পেশাজীবীরা। ব্রিটিশ শাসনে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অসমিয়ারা কিছু ক্ষেত্রে আমলা হওয়ার সুযোগ পেলেও, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইংরেজি জানা সাধারণ বাঙালির তুলনায় তাঁরা পিছিয়ে থাকতেন এবং এরই জন্য অসমিয়া মধ্যবিত্ত সমাজের অভ্যন্তরে কিছুটা উত্তেজনা আন্দাজ করা যায়। অসমিয়াদের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসকদের প্রথম থেকেই একটি বিরূপ ধারণা ছিল। এই প্রসঙ্গে সজল নাগের (*Roots of Ethnic Conflict : Nationality Question in North-East India*) গ্রন্থ থেকে একটি দলিল উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রিটিশ-ভারত সরকারের সচিবকে Henry Hopkinson (যিনি Jenkins-এর পর আসামের কমিশনার হয়েছিলেন) একটি চিঠিতে অসমিয়া আমলাদের সম্পর্কে এইভাবে জাতিবিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেছিলেন ঃ *....I used the phrase 'very inefficient' in a comparative sense to express my opinion that the native of Assam as a body is inferior to those in other parts of India....the Assamese cannot be expected to go more than a certain level of efficiency which their whole race is capabale only....there is nothing as Assamese can do or will do that cannot be got much better done elsewhere.* কিন্তু অসমিয়াদের বিরুদ্ধে বিরূপ এবং বিদ্বেষমূলক ব্রিটিশ ধারণা সত্ত্বেও, অসমিয়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের (আনন্দরাম ঢেকিয়াল, হেমচন্দ্র বরুয়া থেকে শুরু করে অন্যদের) মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মানসিকতা প্রথমদিকে প্রায় ছিল না বললেই চলে। এরই জন্য মন্তব্য করা হয় ঃ ***The Assamese middle class was a complete child of British administration, even more than his***

Bengali counterparts. অসমিয়া মধ্যবিত্তদের অবস্থানের মধ্যে দুটি বিপরীত দিক 'Cooperation and Confrontation' স্পষ্টভাবে দেখা যায়—একদিকে ব্রিটিশ শক্তির সাথে 'Cooperation' বা সহযোগিতা এবং অন্যদিকে সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে বঙ্গভাষীদের সামনাসামনি বা মুখোমুখি হয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া বা 'Confrontation'। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের বা বিংশ শতকের প্রথমার্ধে দুই ভাষা গোষ্ঠী সব সময় সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল মনে করলে ভুল হবে ; বরং মধ্যবিত্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, 'Competition and Unity' বা 'প্রতিযোগিতা ও ঐক্য' ছিল অসমিয়া মধ্যবিত্তদের সহজাত প্রকৃতি। আহোম যুগের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু অংশকে ব্রিটিশ আমলে মুন্সেফ, দারোগা, কেরানি, অথবা রাজস্ব-আদায়কারী মৌজাদার বা চৌধুরী পদে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং এঁদের বেশিরভাগই ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক।

১৯.২.২ পাশ্চাত্য শিক্ষা (Western Education)

বঙ্গদেশের সাথে তুলনা করলে আসামে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব অনেক দেরীতে এসেছিল বলা যায়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই আসামের ধনাঢ্য পরিবারের সন্তানরা কলকাতায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসতেন। **আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯-৫৯) সম্ভবত প্রথম অসমিয়া ছাত্র যিনি কলকাতায় শিক্ষার্থী হিসেবে এসেছিলেন**। এরপর সেই 'ট্র্যাডিশন' আসামে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্ধ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সকলেই যে কলকাতায় শিক্ষা সমাপন করে আসামে ফিরেছিলেন তা হয়তো নয়, অনেকেই মাঝখানে ইতি টেনেছিলেন, তথাপি অসমিয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভ্যুদয়ে এই পাশ্চাত্য শিক্ষা যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল।

যেসব স্বনামধন্য আসামের পাশ্চাত্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী কলকাতায় শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১২.৪ দ্রষ্টব্য), গুণাভিরাম বরুয়া (১৭.১৮ দ্রষ্টব্য), মানিকচন্দ্র বরুয়া (১৭.৫৫ দ্রষ্টব্য), আনন্দরাম বরুয়া (১৭.৬ দ্রষ্টব্য), জগন্নাথ বরুয়া (১৭.২৬ দ্রষ্টব্য), চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (১৭.২২ দ্রষ্টব্য), লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য), রজনীকান্ত বরদোলই (১৭.৫৮ দ্রষ্টব্য), পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া (১৭.৩৭ দ্রষ্টব্য), হেমচন্দ্র গোস্বামী (১৭.৭৩ দ্রষ্টব্য), কনকলাল বরুয়া (১৭.১০ দ্রষ্টব্য), নবীনচন্দ্র বরদোলই (১৭.৩৫ দ্রষ্টব্য), তরুণরাম ফুকন (১৭.৩১ দ্রষ্টব্য), কালিরাম মেধি (১৭.৩৩ দ্রষ্টব্য), সূর্যকুমার ভুঁইয়া (১৭.৬৮ দ্রষ্টব্য), বাণীকান্ত কাকতি (১৭.৪৩ দ্রষ্টব্য), কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক

(১৭.১৬ দ্রষ্টব্য), বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া (১৭.৪৬ দ্রষ্টব্য), হরিবিলাস আগরওয়ালা, প্রিয়লাল বরুয়া, মাধবচন্দ্র বরদোলই, শিবরাম বোরা, রাধাকান্ত হ্যান্ডিক, জালনুর আলি আমেদ, ফটিকচন্দ্র বরুয়া, গোবিন্দচন্দ্র বেজবরুয়া, গোলাপচন্দ্র বেজবরুয়া, বলিনারায়ণ বোরা, রাধিকারাম ঢেকিয়াল ফুকন, ফণীন্দ্র চালিহা, লম্বোদর বোরা, উপেন্দ্রনাথ বরুয়া, চন্দ্রকমল বেজবরুয়া, বেণুধর রাজখোওয়া, জ্ঞানাভিরাম বরুয়া, রাধানাথ ফুকন, লক্ষ্মীপ্রভা বোরা, সুধালতা দুয়ারা, সুখলতা দুয়ারা প্রভৃতি এক ঝাঁক নাম উল্লেখযোগ্য। **বাংলার 'নবজাগরণ'-এর আলোকে উদ্ভাসিত হয়েই এঁরা আসামে ফিরে গিয়েছিলেন।** এরই জন্য রাজেন শইকিয়া মন্তব্য করেছেন ঃ "Calcutta was the first school of the Assamese middle class." এইসব শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা শিক্ষকতা, সরকারি-বেসরকারি চাকরি সহ বিভিন্ন নতুন পেশা, বৃত্তি, ব্যবসা ইত্যাদির সাথে যুক্ত হয়ে এবং চিরাচরিত গ্রামীণ জীবনের সীমানা অতিক্রম করে অসমিয়া সমাজ জীবনকে নানা রং-এ রঙীন করেন। অসমিয়া মধ্যবিত্তদের প্রকৃত দুর্বলতা হল, কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া, বাণিজ্যিক শ্রেণি হিসাবে উদ্ভবের অভাব। এরই জন্য অর্থনৈতিক ক্ষমতা মাড়োয়ারি সহ অ-অসমিয়াদের হাতেই কুক্ষিগত থাকত। এর ফলাফল নানাভাবে সমাজজীবনে প্রতিফলিত হত।

উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া **বিংশ শতকের প্রথমার্ধে আসামে এমন কিছু বিদ্বজ্জনও ছিলেন যাঁরা কলকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণ না করেও সমাজে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিলেন।** এঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র বরুয়া (১৭.৭৪ দ্রষ্টব্য), গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন, রাধানাথ চ্যাংকাকতি, লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতি, ভোলানাথ বরুয়া, শিবপ্রসাদ বরুয়া, কালীপ্রসাদ চালিহা, চন্দ্রনাথ শর্মা প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকেই শুধু যে সাংবাদিকতা ও সৃজনশীল লেখনীর সাথে যুক্ত ছিলেন তাই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে চা-বাগান শিল্পের সাথেও নানাভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অসমিয়া মধ্যবিত্তরা মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, মাঝে মাঝে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সামগ্রিক উদ্যোগে নিজেদের বক্তব্য ও চিন্তাধারা প্রকাশ করতেন। ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'Assam Association' থেকে শুরু মধ্যবিত্তের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন সভা-সমিতির উদ্দেশ্যে ছিল সীমিত এবং সমাজের সর্বস্তরে এইসব সংগঠনকে প্রসারিত করার উদ্যোগ তেমন পরিলক্ষিত হয় না। মধ্যবিত্তদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংগঠন যখন গান্ধিজির নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রতলে আশ্রয় পেয়ে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল কেবলমাত্র তখনই ঔপনিবেশিক-বিরোধী

রাজনৈতিক চেতনা সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রসারিত হল। **অসমিয়া জাতীয়তাবাদ ('little nationalism') ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ('great nationalism') এই বিচিত্র দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্যেই ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনোত্তর পর্বে আসামের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্ব লুকিয়ে আছে।**

১৯.২.২.১ ব্রহ্মপুত্রের দুই ভাগের সম্পর্ক

ঔপনিবেশিক যুগে সমগ্র ভারতবর্ষ যেমন একই ধরনের শাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, মুদ্রাসহ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রেল, পোস্ট-টেলিগ্রাফ্ ব্যবস্থা, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ('ligua franca') এবং অন্যান্য অনেক কারণে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল (যদিও ব্রিটিশ স্বার্থে) এবং বিপরীত দিকে জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত করেছিল, আসামের ক্ষেত্রেও সেটির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা স্পষ্টই দুটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ (১) 'আপার' বা ব্রহ্মপুত্রের উপরিভাগ বা উজানি আসাম বা পূর্ব আসাম—যেটি ছিল আহোম শাসনের মূল কেন্দ্রভূমি। যেহেতু ব্রহ্মপুত্র পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত এবং পূর্বভাগ তুলনামূলকভাবে উঁচু, এরই জন্য **'আপার-আসাম' নামকরণ** ; যেখানে ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, শিবসাগর, জোড়হাট, গোলাঘাট, লখিমপুর প্রভৃতি শহরগুলি বিদ্যমান। ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি লাচিৎ বরফুকনের নেতৃত্বে মুঘলদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত সরাইঘাট যুদ্ধের পর আহোম রাজত্ব পশ্চিমদিকে ব্রহ্মপুত্রের শাখা মানস নদী পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল এবং মোটামুটিভাবে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও এটাই ছিল 'আপার-আসাম'-এর সীমানা। (২) অন্যদিকে, ব্রহ্মপুত্রের নিম্নাংশ বা পশ্চিম দিকটি 'লোয়ার' বা 'নামণি লুইত' (অর্থাৎ বর্তমান গুয়াহাটি, ধুবরি, গোয়ালপাড়া, বরপেটা, দরং, নলবাড়ি, কোকরাঝাড় ইত্যাদি সহ প্রায় ৩২৪৫ কিমি এলাকা) বা প্রাক-আহোম যুগের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপের কোচ শাসকদের ইতিহাস একই কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগোলিক কারণে ব্রহ্মপুত্রের উপরিভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে তেমন ঐক্য ছিল না। আসলে, ব্রহ্মপুত্রের উপরে ও নীচে দুই ধরনের শাসনব্যবস্থার ফলে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রাক-ব্রিটিশ যুগে সামাজিক ইতিহাসে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও অধ্যায় সৃষ্টি করতে পারেনি। হালিরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮০২-৩২)-এর লেখনী থেকে জানা যায়, ব্রহ্মপুত্রের উপরিভাগের আহোম সম্ভ্রান্তরা নিম্নভাগের মানুষকে 'dhekeri'/'ঢেকেরি' হিসাবে অবজ্ঞা করতেন ('ঢেকেরি' কোচ-শাসিত একটি পরগনা, যেখানকার অসমিয়া কথ্য ভাষা কিছুটা

ভিন্ন প্রকৃতির)। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উপর ও নীচের মানুষের সামাজিক সম্পর্ক স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত 'বাঙ্গাল' ও 'ঘটি'র বিভাজনের মতো ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকিত হরিনারায়ণ দত্ত বরুয়া (১৮৮৫-১৯৫৮) পরবর্তী সময়ে এইরকম বিভাজনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে 'আপার' আসামের মানুষ যেভাবে 'লোয়ার' আসামের মানুষকে 'ঢেকেরি' এবং উল্টোদিকে কামরূপের লোকজন যেভাবে শিবসাগর প্রভৃতি এলাকার লোকজনকে 'আহোম বামুন', 'আহোম কলিতা' ইত্যাদিতে সম্বোধন করেন সেটি চিরতরভাবে বন্ধ করার দাবি তুললেন। আসামের *বহ্নি* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হল কামরূপী ও অসমিয়া ভাষা এক ও অভিন্ন। এইভাবে একদিকে সুসংগঠিত ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনে এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু অসমিয়ার প্রচেষ্টায় সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ অব্যাহত ছিল।

১৯.২.২.২ গোয়ালপাড়া প্রশ্ন

একদিকে যেমন ব্রহ্মপুত্র এলাকায় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, অপরদিকে 'Assam Association'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বরুয়ার কিছু কাজ—বিশেষত **গোয়ালপাড়াকে বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগকে কেন্দ্র করে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল**। এই প্রসঙ্গে গোয়ালপাড়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোচ রাজবংশী, রাভা, বোড়ো, গারো, যোগী, গোয়ালা, হীরা, সূত্রধর ইত্যাদি জন-অধ্যুষিত মানস ও ব্রহ্মপুত্রের মিলনস্থলে অবস্থিত গোয়ালপাড়া একসময় বাংলার রংপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতীতের গো-চারণভূমি এবং গোয়ালাদের/গুয়ালি গ্রাম কীভাবে অবশেষে গোয়ালপাড়ায় পরিণত হয়ে কোচ শাসনাধীনে এল তা নিয়ে অনেক মজার বিবরণ আছে (নগেন্দ্রনাথ বসু'র তিন খণ্ডের *The Social History of Kamrup* দ্রষ্টব্য)। বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা প্রমথেশ চন্দ্র বরুয়া (১৭.৩৮ দ্রষ্টব্য) এই গোয়ালপাড়ার সন্তান। গোয়ালপাড়ার কোচ রাজবংশীদের ভাষা 'গোয়ালপাড়িয়া' নামে পরিচিত পলাশির যুদ্ধের (১৭৫৭) পর ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় 'দেওয়ানি' অধিকার লাভ করার সময় গোয়ালপাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশেষে বঙ্গভাষী সিলেটের মতো ১৮৭৪ সালে গোয়ালপাড়াকেও ব্রিটিশ শক্তি আসামের সাথে সংযুক্ত করে এবং এরপর থেকেই গোয়ালপাড়া আসামের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। **অতীতের গোয়ালপাড়া আজ কোকরাঝাড়, বঙ্গাইগাঁও, ধুবরি ও গোয়ালপাড়ায় বিভক্ত**। বিংশ শতকের প্রথম দিকে গৌরীপুরের রাজা

প্রভাতচন্দ্র বরুয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় গোয়ালপাড়ার বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী (মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ) বঙ্গদেশের সাথে সংযুক্তির দাবিতে সরব হয় এবং এই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯১৮ সালে Goalpara Association-এর জন্ম হয়। ভাষাগত কারণে নয়, নিজের অস্তিত্বের তাগিদেই গৌরীপুরের রাজা বঙ্গের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। ১৭৯৩ সালে বঙ্গদেশে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী' জমিদারি ব্যবস্থা চালু থাকলেও ব্রিটিশ শাসনাধীন আসামে কিন্তু ঐ ব্যবস্থা নতুন করে প্রবর্তিত হয়নি। আসামে ভূমি-ব্যবস্থা ছিল ভিন্ন ধরনের রায়তওয়ারি ব্যবস্থা। ফলে, আসামে জমিদারি ব্যবস্থা অবলুপ্তির আশঙ্কায় প্রভাতচন্দ্র বরুয়ার মতো রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি, ভোলানাথ চৌধুরির মতো ভূস্বামীরা দিন কাটাতেন। বঙ্গদেশের সাথে গোয়ালপাড়ার সংযুক্তির প্রশ্নে এইসব ভূস্বামীদের সমর্থনে সেদিন কলকাতার 'Indian Association'-ও এগিয়ে এসেছিল।

পাটনা ন্যাশনাল কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রমথনাথ চক্রবর্তী (১৮৮৩-১৯৬৭) গোয়ালপাড়াকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে বঙ্গদেশের সাথে পুনর্বার সংযুক্তির বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। ১৮৭২ সালে বিদ্যালয়ে ও আদালতে অসমিয়া ভাষা আবার চালু হওয়ার পরেও যেসব বুদ্ধিজীবী পরোক্ষভাবে এর বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধেও ধিক্কার ধ্বনিত হয়। আসলে, **১৮৭৪ সালে বাঙালি-প্রধান সিলেট্‌কে আসামের অবিচ্ছেদ্য অংশ ঘোষণার ফলে দুই ভাষাগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইচ্ছাকৃতভাবেই জিইয়ে রাখে।** ১৯২৭ সালে 'অসম সাহিত্য সভা'র দশম অধিবেশন যাতে গোয়ালপাড়ায় সংঘটিত হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রভাতচন্দ্র বরুয়ার সমস্ত অপচেষ্টা অবশেষে ব্যর্থ হয়। ঐ দশম অধিবেশনের সভাপতি তরুণরাম ফুকন (১৭.৩১ দ্রষ্টব্য) সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মানুষের ঐক্য, গোয়ালপাড়া আসামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং অসমিয়া ভাষার আধুনিকীকরণ সহ সকলের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য রূপের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। যদিও 'আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন' এবং *অরুণোদয়* পত্রিকা একসময় শিবসাগর অঞ্চলের কথ্যভাষার মাধ্যমে অসমিয়া ভাষা চালু করেছিল ; তথাপি পরবর্তী সময়ে আসামের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে গুয়াহাটিকে গুরুত্ব দিয়ে অন্যান্য স্থানের কথ্য ভাষাকে মর্যাদা দানের দাবি ওঠে। কামরূপ ও গোয়ালপাড়ার ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে 'অসম সাহিত্য সভা'র সিদ্ধান্তের অনেক আগেই তারানাথ চক্রবর্তী (১৮৮০-১৯৫৩) তাঁর *আসাম-বান্ধব* পত্রিকায় ১৯১০ সালে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন ; যদিও তিনি তেমন সফল হননি। কলকাতায় পাশ্চাত্য-শিক্ষায়

শিক্ষিত কালিরাম মেধি (১৭.১৩ দ্রষ্টব্য) ১৯১৭ সালে মন্তব্য করেছিলেন, হেমচন্দ্র বরুয়া (১৭.৭৮ দ্রষ্টব্য) প্রণীত 'হেমকোষ'-এ গোয়ালপাড়া ও কামরূপের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ প্রচলিত শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ব্যাকরণ-এর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে নানারকম বিপত্তি সৃষ্টি হচ্ছিল। আনন্দরাম বরুয়া (১৭.৬ দ্রষ্টব্য), বাণীকান্ত কাকতি (১৭.৪৩ দ্রষ্টব্য), লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি সাহিত্যিকদের উদ্যোগে অসমিয়া ভাষাকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করা এবং সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নানারকম সংস্কার কাজ দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। আসামের 'জোনাকি যুগ'-এর সাহিত্যে এর নিদর্শন মেলে। অন্যদিকে বাংলার 'নবজাগরণে' আলোকিত অসমিয়া বুদ্ধিজীবীরা বাল্য-বিবাহ, বিধবা বিবাহ, পুরুষের বহু বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন এবং কলকাতায় বিতর্ক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও আসামে এই প্রশ্নগুলি ব্যক্তি-বিশেষের বিবেকের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তীব্র সংস্কার-আন্দোলনের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেননি।

যদিও প্রভাতচন্দ্র বরুয়াদের নেতৃত্বাধীন 'Assam Association' ও অন্যান্য কয়েকটি সংগঠন ১৯২০ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাথে মিশে যাওয়ার ফলে সংগঠনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়েছিল ; তথাপি গোয়ালপাড়াকে বঙ্গের সাথে যুক্ত করার দাবি আরও কিছুদিন অব্যাহত ছিল। ১৯২৯ সালে 'সাইমন কমিশন'-এর কাছে 'Goalpara Zamindars' Association' ঐ দাবিকে সমর্থন করে প্রতিবেদন পেশ করলেও, বিপরীত দিকে 'Goalpara District Association' পাল্টা দাবিতে—অর্থাৎ গোয়ালপাড়া আসামের অবিচ্ছেদ্য অংশ সোচ্চার হয়। ফলে, 'সাইমন কমিশন'-এর রিপোর্টে গোয়ালপাড়া প্রশ্নটি অনুল্লেখিত থাকে। আসলে, ১৯২৯ সালে Goalpara Tenancy Act চালু হওয়ার সময় থেকেই বঙ্গের সাথে গোয়ালপাড়ার সংযুক্তির দাবিটি গুরুত্ব হারায়। ১৯৩২ সালে 'Communal Award' বা 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' দলিলে সিলেট্ বা গোয়ালপাড়াকে আসাম থেকে পৃথকীকরণের প্রশ্নটি মোটেই উল্লেখ করা হয়নি।

১৯.২.২.৩ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন

অসমিয়া ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নবজাত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আসামে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকার কারণে দলে দলে অসমিয়া ছাত্ররা অসুবিধে সত্ত্বেও কলকাতায় পাড়ি দিতেন। যাঁরা উচ্চশিক্ষিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন

পেশার জন্য জীবন-যুদ্ধে সফল কিছু কৃতি ব্যক্তিও ছিলেন—যেমন, **আনন্দরাম বরুয়া (১৮৫০-১৮৮৯) পঞ্চম ভারতীয় এবং আসামের প্রথম ও একমাত্র আই. সি. এস. অফিসার**, বলিনারায়ণ বোরা (১৮৫২-১৯২৭) কলকাতায় ১৮৭২ সালে গিলক্রিস্ট স্কলারশিপ্ অর্জন করে ইংল্যান্ড থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসেন। চিকিৎসক হিসাবে জালনুর আলি আমেদ (১৮৪৮-১৯৩১) এবং শিবরাম বোরা (১৮৪৭-১৯০৭) 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস'-এ যোগ দেন, মানিক চন্দ্র বরুয়া (১৮৫১-১৯১৫) চা শিল্পের সাথে যুক্ত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে অসমিয়া যুব সমাজকে আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার জন্য এই সুযোগ সকলের কাছে সম্প্রসারিত হত না। ১৮৭২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মোট যে ৯৩৮ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র ৪ জন ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে। এককথায়, বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও আসামে তেমন গুরুত্ব প্রথমদিকে আরোপ করা হয়নি ; ফলে সেই সময়ে যাঁরা কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছেন তাঁরা আসামের বাইরে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়ার জন্যই সেটি সম্ভবপর হয়েছিল। **আসামে কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বি. এ. পাস-করা মোট গ্রাজুয়েটের সংখ্যা মাত্র ২৯ জন ; যদিও ঐ একই সময়ে সুরমা উপত্যকায় ছিল ৬৮ জন**। এর থেকেই প্রমাণিত হয় বাঙালি-প্রধান সুরমা উপত্যকার তুলনায় শিক্ষার প্রশ্নে অসমিয়া-প্রধান ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছিল কত পিছিয়ে।

আসামের কমিশনার (১৮৩৪-৬১) ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস্ জেন্‌কিনস্ ছিলেন প্রথম ব্রিটিশ আমলা যিনি ১৮৩৪ সালে ভারত সরকারের কাছে লেখা এক প্রতিবেদনে অসমিয়া যুবকদের মধ্যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ('to impart English education') গুয়াহাটি, দরং, নওগাঁও ও বিশ্বনাথ এলাকায় চারটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আর্জি জানিয়েছিনেল। জেনকিনস্ নিজে গুয়াহাটিতে (সেই সময় গুয়াহাটির জনসংখ্যা ছিল ৫,৮০০) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ১,৭৪০ টাকা চাঁদা আদায় করেছিলেন। ১৮৩৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ গুয়াহাটির ক্ষেত্রে ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং ঐ বছরেই Mr. Singer কে মাসিক দেড়শো টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করে এবং মোট ৫৮ জন ছাত্র নিয়ে আসামে ইংরেজি স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। কোচবিহারের রাজা, দয়ারাম বরুয়া ও যুগোরাম ফুকন মাথাপিছু ১,০০০ টাকা এবং কুরুয়ার দিহিঙ্গিয়া গোঁহাইন ৫০০ টাকা এই শুভ উদ্যোগের জন্য দান

করেন। গুয়াহাটিতে প্রতিষ্ঠিত ঐ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে শুরু করে এবং ১৮৪০ সালে মোট ছাত্রসংখ্যা ৩৪০-এ দাঁড়ায়। ১৮৫৮ সালে মোট ছাত্র সংখ্যা ৩৪০-এ দাঁড়ায়। ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঐ স্কুলকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি দেয়। স্কুলটির নাম বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়—যেমন, 'গৌহাটি সেমিনারি', 'গৌহাটি স্কুল' এবং কলেজ স্তরে দুটি বর্ষের অনুমতি পাওয়ার পর 'কলেজিয়েট স্কুল' ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে এটি 'কটন কলেজিয়েট স্কুল' হিসাবে খ্যাতিলাভ করে। ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই ম্যাট্রিকুলেশন/ এনট্রান্স পরীক্ষায় বসতে হত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯৪৮ সালে 'গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার পর এই নিয়মের পরিবর্তন ঘটে।

১৯.২.২.৪ 'কটন কলেজ' ও অন্যান্য

Sir Henry John Stedman Cotton আসামের চিফ্-কমিশনার থাকাকালীন সময়ে (১৯০০-১৯০২) প্রধানত তাঁর এবং মানিক চন্দ্র বরুয়ার মতো কিছু বিদ্যোৎসাহীর উদ্যোগে গুয়াহাটিতে প্রতিষ্ঠিত এবং চিফ্ কমিশনারের নামে নামাঙ্কিত সুবিখ্যাত 'কটন কলেজ' ১৯০১ সালের ২৭ মে মাত্র ৩৯ জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে। আসামে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র 'কটন কলেজ'-এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন Frederick William Sudmerson এবং মোট অধ্যাপক ছিলেন মাত্র ৫ জন। প্রথম দিকে শুধুমাত্র 'কলা' বিভাগ ছিল ; কিন্তু ধাপে ধাপে অন্যান্য বিভাগও চালু হয়। **এই মর্যাদাসম্পন্ন কলেজটিকে কেন্দ্র করেই অসমিয়া মধ্যবিত্তদের জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয়।** ইংরেজি শিক্ষাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী চেতনা অঙ্কুরিত হওয়ার ফলে মধ্যবিত্তদের উদ্যোগে নানা সভা-সমিতি সংগঠনের জন্ম হয়। বর্তমানে 'কটন কলেজ' নানাভাবে পল্লবিত হয়েছে এবং ছাত্রসংখ্যা ৫০০০, অধ্যাপক সংখ্যা ২৪৪ সহ শুধু স্নাতক নয়, স্নাতকোত্তর পর্যায়েরও ২০টি বিষয়বস্তুর পঠন-পাঠনের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। **প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ১৯০১ সাল থেকেই উচ্চ-শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়।** যদিও সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আসামে অসংখ্য বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় (বর্তমানে ১৯২টি), ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়, আই. আই. টি., ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়েছে ; তথাপি আসাম সরকার ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করার পরেও ২০০১

সালের জনগণনা অনুযায়ী, সমগ্র আসামে সাক্ষরতার হার মাত্র ৬৪.২৮ শতাংশ (যার মধ্যে পুরুষ ৭১.৯৩ শতাংশ এবং মহিলা ৫৬.০৩ শতাংশ)। এটি নিঃসন্দেহে একটি দুর্বল দিক। যদিও মাতৃভাষা অসমিয়ার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিক্ষারীতি চালু আছে, তথাপি ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকেই ঝোঁক বেশি। উচ্চ শিক্ষা অবশ্য আসামে ইংরেজি মাধ্যমেই অর্জন করতে হয়। 'কটন কলেজ' ভিন্ন বর্তমান আসামের খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকটি কলেজের মধ্যে গুয়াহাটির বি. বরুয়া কলেজ, ডিফু গভর্নমেন্ট কলেজ, তেজপুরের দরং কলেজ, জোড়হাটের জগন্নাথ বরুয়া কলেজ, ডিব্রুগড়ের মনহারি দেবী কানোই কলেজ, নলবাড়ির এম. এন. সি. বালিকা মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটির আর্যবিদ্যাপীঠ, হ্যান্ডিক গার্লস্ কলেজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯.২.৩ চা-শিল্পে অসমিয়া মধ্যবিত্তের ভূমিকা (Role of Assamese Middle Class in Tea Industuy)

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আসামে চা-শিল্প সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এখানে আমরা শুধুমাত্র অসমিয়া মধ্যবিত্তদের চা-শিল্পে ভূমিকার প্রসঙ্গটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব।

ব্রিটিশ অধিকৃত 'ঔপনিবেশিক আসাম' বলতে আমরা ১৮২৬ সালে ইয়ান্দাবো চুক্তির সময় থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝি। এই ১২১ বছরের 'ঔপনিবেশিক আসামে' উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং উৎপাদন সম্পর্কের কিছুটা পরিবর্তন হেতু সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনেও নানারকম পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, আহোম যুগের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি উৎখাত করে ব্রিটিশ শাসনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আসামের সর্বত্র কায়েম করা হয়েছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমগ্র ভারতবর্ষের কোথাও শক্ত ভিত্তিভূমির উপর ইচ্ছাকৃতভাবেই প্রতিষ্ঠা করা হয়নি ; বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের আপোস বা সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। এই কারণেই রেল এলেও শিল্পায়ন হয় না—যেটি আসাম সহ অন্যত্র সমভাবে প্রযোজ্য। এইসব সত্ত্বেও আসামের কৃষি ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক শক্তির ধীর অনুপ্রবেশ অস্বীকার করা যায় না ; এবং এরই জন্য সমাজ ও রাজনীতিতে পরিবর্তনের গতিও ছিল মন্থর। উনবিংশ শতকের আসাম ছিল দুই বিপরীত ধর্মী উৎপাদন ব্যবস্থার সন্ধিক্ষণে একটি ক্রান্তিকালীন সময়।

যদিও উনবিংশ শতকের আসামে চা, পেট্রোলিয়াম ও খনি থেকে কয়লা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের সামনে অনেক সম্ভাবনার দ্বার খুলে গিয়েছিল ; তথাপি অসমিয়া মধ্যবিত্তদের একাংশ শুধুমাত্র চা-শিল্প এবং সেটিকে কেন্দ্র করে ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যেই নিজেদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখেন। প্রথম দিকে Wasteland Rules of 1838 অনুযায়ী, সাধারণ অসমিয়ার পক্ষে চা-বাগান তৈরির জন্য খিলভূমি বা পতিত জমির উদ্ধার ও বিনা পয়সায় অধিকার পাওয়া ছিল সুকঠিন। সবই ছিল ব্রিটিশ সাহেবদের জন্য সুরক্ষিত। এই প্রসঙ্গে মণিরাম দত্ত / বরুয়া / দেওয়ানের তিক্ত অভিজ্ঞতা (প্রথম খণ্ডের ১২.৩ দ্রষ্টব্য) স্মরণীয়। কেউ কেউ **মণিরামকে আসামের 'চায়ের প্রথম শহিদ' ("tea's first martyr")** হিসেবে ছবি আঁকলেও, এই নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। যাইহোক, চা উৎপাদনে পারদর্শী চিনা বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীরা ১৮৪৩ সালে আসাম থেকে বিদায় নেওয়ার পর একদিকে যেমন চা বাগানে স্থানীয় শ্রমিকদের চাহিদা বাড়ে ; অন্যদিকে পতিত জমি উদ্ধার আইনেও কিছু শিথিলতা দেখা যায়। এই কারণেই অসমিয়া মধ্যবিত্তদের একটি অংশ, চা-শিল্পে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই মধ্যবিত্তদের পরিচালনাধীন প্রতিটি চা বাগানের একটা ইতিহাস আছে যেটি অনেক বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে হয় উন্নতির দিকে এগিয়েছে অথবা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। যদিও অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্রিটিশ-আসামে সাহেবদের মালিকাধীন চা বাগানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আয়তনে ছিল বিশাল (কবির দৃষ্টিতে 'চা-সমুদ্র'), কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসমিয়াদের মালিকাধীন বাগানগুলি ঠিক অত বড়ো ছিল না। যেহেতু বাগান তৈরির জন্য পর্যাপ্ত মূলধন ছিল না, এরই ফলে, উৎপাদন থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক ব্যাপারেই অসমিয়া মধ্যবিত্তদের পরিচালনায় চা-বাগানগুলি দ্বিতীয় স্তরে ছিল বলা যায়। আসামে হাজারের বেশি চা-বাগানের ৯৭ শতাংশই ছিল ব্রিটিশ মালিকদের ; বাকি মাত্র ৩ শতাংশ ছিল অসমিয়াদের দখলে।

গুণাভিরাম বরুয়া (১৭.১৮ দ্রষ্টব্য) এবং পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া (১৭.৩৭ দ্রষ্টব্য) তাঁদের প্রণীত 'বুরুঞ্জি'তে আসামের নবজাত চা-বাগানের উল্লেখ করে এইসব বাগানকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ আসামের উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ব্রিটিশ চা-বাগান মালিকদের প্রভূত মুনাফা ইত্যাদি লক্ষ করে অসমিয়াদের একাংশ চা-শিল্পে আকৃষ্ট হলেন এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত থেকে ধনী গোষ্ঠীতে পরিণত হলেন। এই প্রসঙ্গে Rajen Saikia-র একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ

> *Without tea industry a stable middle class would not have come into existence in Upper Assam. Through tea they secured business*

links in Calcutta and London. Time was on their side. The arrival of tea planter in Assam was the arrival of the capitalist. Tea produced the richest Assamese and it seemed as though without tea no Assamese shall be all-time rich at the best of times.

জোড়হাটের ব্রাহ্মণ-পরিবারভুক্ত রসেশ্বর শর্মা বরুয়া ছোট একটি চা-বাগান পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেছিলেন ; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সময় অনেকগুলি বাগানের মালিকানা ছয় পুত্রের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দিয়ে যান। পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়ার বিবরণ অনুযায়ী, রসেশ্বর চা-শিল্পের দৌলতে হয়েছিলেন ঊনবিংশ শতকের আসামে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। রসেশ্বরের এক সন্তান নারায়ণ শর্মা বরুয়া (১৮৬৮-১৯৩৮) ছিলেন আসামের খ্যাতনামা কৃষি-বিজ্ঞানী যাঁকে ব্রিটিশ সরকার 'রায় বাহাদুর' খেতাব দিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ-পরিবারভুক্ত হেমাধর বরুয়া (মৃত্যু ১৮৭১) সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর লেটিকুজান চা বাগান প্রতিষ্ঠা করে ১৮৭০ সালে ঐ বাগানের চা বাজারজাত করেন। হেমাধরের পুত্র জগন্নাথ বরুয়া (১৮৫১-১৯০৭) ছিলেন 'আপার-আসাম'-এর প্রথম ব্যক্তি যিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৭২ সালে স্নাতক হন এবং সকলের কাছে **'বি. এ. জগন্নাথ'** নামে সুপরিচিত হন (১৭.২৬ দ্রষ্টব্য)। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটেরে চাকুরি গ্রহণ না করে জগন্নাথ বরুয়া চা-কে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে সফল ও কৃতি 'রায় বাহাদুর' জগন্নাথ বরুয়া চা-শিল্পে আসামের উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে রাধাকান্ত হ্যান্ডিক, কর্নেল শিবরাম বোরা, চন্দ্রকান্ত গোগুই, চন্দ্রধর বরুয়া প্রভৃতি খ্যাতনামা কিছু ব্যক্তি চা-শিল্পে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জগন্নাথ বরুয়া শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য বা চা শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক চেতনা বৃদ্ধির প্রশ্নে 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'-র মত প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছিলেন (২০.২ দ্রষ্টব্য)। এছাড়া ১৯০৩ সালে 'আসাম অ্যাসোশিয়েসন' প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর ভূমিকা ছিল। জগন্নাথ বরুয়া তাঁর চা-বাগানে যে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন তার মধ্যে ৩০০ বাঙালি, ১০০ স্থানীয় অসমিয়া এবং বাকি ১০০-র কিছু বেশি কামরূপ ও গোয়ালপাড়ার কাছাড়ি সম্প্রদায়েব মানুষ। জগন্নাথ বরুয়ার ভাই 'রায়বাহাদুর' কৃষ্ণকুমার বরুয়া এবং জামাই চন্দ্রোধর বরুয়া চা-বাগানের দৌলতে 'আসাম লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল' এবং 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব স্টেটস'-এর সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। চন্দ্রোধর বরুয়া আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে চা-বাগানে অংশ নিয়েছিলেন। সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য ১৯১৭ সালে 'অসম

সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৮ সালে গোয়ালপাড়ায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। শিক্ষা-অনুরাগী চন্দ্রোধর তাঁর শ্বশুড়মশাই-এর নামে আসামের জোড়হাটে প্রথম বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জগন্নাথ বরুয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইসব ঘটনা প্রমাণ করে শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য বা চা-শিল্পই তাঁদের ধ্রুবতারা ছিল না ; বরং চা বাগান থেকে অর্জিত মুনাফা আসামের উন্নয়ন বা জনহিতকর কাজে ব্যয় করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। অসমিয়া মধ্যবিত্ত চরিত্রের এইদিকটি ছিল রীতিমত আকর্ষণীয়।

জগন্নাথ বরুয়ার মৃত্যুর পর 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'-র নেতৃত্ব যাঁর হাতে ন্যস্ত হয়েছিল কায়স্থ পরিবারভুক্ত সেই দেবীচরণ বরুয়া (১৮৬৪-১৯২৬)-ও ছিলেন কমপক্ষে চারটি চা-বাগানের মালিক। কলকাতায় উচ্চশিক্ষা অর্জন করে তিনি ব্যবহারজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও অবশেষে চা বাগানেই আত্মনিয়োগ করেন। 'রায়বাহাদুর' দেবীচরণ বরুয়া ছিলেন আসামের একমাত্র প্রতিনিধি যিনি ১৯২৬ সালে প্রথম 'Legislative Assembly of India'-তে স্থান পেয়েছিলেন। অসমিয়া ঐতিহাসিকদের চোখে, *"A true representative of the new age, Debicharan Barua had firm faith in representative Government."* ১৮৮৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। দেবীচরণ আর এক চা-বাগান মালিক বিষ্টুরাম বরুয়ার কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। দেবীচরণের পুত্র হেরম্বপ্রসাদ বরুয়া পৈত্রিক বাগানের মালিক হয়েও 'কাউন্সিল অব স্টেট'এর সদস্য (১৯৩৪-৩৬) এবং 'আসাম লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল' (উচ্চ কক্ষ)-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পিতার মতো হেরম্বপ্রসাদ-ও আর এক চা-বাগান মালিক 'রায়াবাহাদুর' নীলাম্বর দত্ত'র কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এইভাবে দেখা যায়, **আসামে চা-বাগান মালিকদের মধ্যে একটা বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার রেওয়াজ গড়ে উঠেছিল।**

আহোম গোষ্ঠীভুক্ত রাধাকান্ত হ্যান্ডিক (১৮৫৭-১৯৫২) কলকাতার 'সিটি কলেজ' থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জনের পর আসামে ১৯১৬ পর্যন্ত সরকারি চাকুরিতেই যুক্ত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি চা-বাগানে আত্মনিয়োগ করেন। 'রায় বাহাদুর' রাধাকান্ত হ্যান্ডিক মাত্র ১০ একর জমিতে 'তিরুয়াল' চা-বাগান শুরু করেন এবং অবশেষে সেটি ১৫০ একরে পরিণত হয়। এছাড়া আরও একটি বাগান ('বর-তিমান') তৈরি করেন। তাঁর দুই পুত্রকে বিলেতে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এবং উভয়কেই দুটি বাগান দান করেছিলেন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক (১৭.১৬ দ্রষ্টব্য) চা বাগানের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন বিখ্যাত

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। এই হ্যান্ডিক পরিবারটি অপর এক বিখ্যাত আহোম : এবং চা শিল্পের পক্ষানুরাগী পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়ার (১৭.৩৭ দ্রষ্টব্য) পরিবারের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাঁর অপর সন্তান চন্দ্রকান্ত হ্যান্ডিকের অকাল বিয়োগের জন্য তাঁর স্মরণে 'অসম সাহিত্য সভা'র নিজস্ব কেন্দ্রীয় অফিস 'চন্দ্রকান্ত হ্যান্ডিক ভবন' নির্মাণ করে দেন। অসমিয়া ভাষার আধুনিক কোষগ্রন্থ 'চন্দ্রকান্ত অভিধান' প্রকল্পের আর্থিক দায়িত্ব তিনিই বহন করেছিলেন। রাধাকান্ত হ্যান্ডিকের বিপুল অর্থ সাহায্য ও উদ্যোগেই আসাম সরকার পরিচালিত 'Department of Historical and Antiquarian Studies'-এর গৃহ 'নারায়ণী হ্যান্ডিক ভবন' এবং **মেয়েদের জন্য আসামের প্রথম মহাবিদ্যালয় 'R. K. Handique Girls' College'** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চা-বাগানের মালিক হয়ে উচ্চশিক্ষা ও সমাজের হিতে এইসব উদ্যোগ উজ্জ্বল উদাহরণ এবং অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে আজও স্মরণ করা হয়।

একই সাথে, পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়ার মতো রাধাকান্ত হ্যান্ডিক ছিলেন 'Ahom Association'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং আহোম জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবর্তক। তবে এই আহোম জাতীয়তাবাদ অন্য জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈরি সম্পর্কের পক্ষপাতী ছিল না ; বরং অসমিয়া সহ সকলের সহযোগিতা ও আদান-প্রদানের উপর ভিত্তি করেই তিনি সৌধ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রাধানাথ হ্যান্ডিকের ভাষায় ঃ

> *Rise of the Ahoms....is very vital for the progress of the Assamese people as a whole. ....The new awakening among the Ahoms will never arouse any feeling of hostility towards the minds of any well-meant Assamese who as a class will, I hope, give this community such assistance of sympathy that it deserves.*

চা বাগানের মালিকদের মধ্যে আহোম এবং অসমিয়া হিসাবে বিভেদের প্রাচীর প্রথম দিকে ছিল না বললেই চলে।

অসমিয়া কায়স্থ পরিবারভুক্ত বিষ্টুরাম বরুয়া শুধু যে ইংরেজি ভাষা জানতেন না তাই নয়, প্রথাগত পড়াশোনাও বেশি ছিল না। কিন্তু বিষ্টুরাম ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। ঊনবিংশ শতকে ব্রিটিশ সরকারের অধীন 'মৌজাদার' হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে তিনি কর্তৃপক্ষের নেকনজরে আসেন এবং 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। 'Williamson Magor Co.'-র খারাপ সময়ে ব্রিটিশ মালিককে নানাভাবে সাহায্য করে তিনি এই আস্থা অর্জন করেন। অবশেষে বিষ্টুরাম সাতটি চা-বাগানের মালিক হন। তাঁর পুত্র শিবপ্রসাদ বরুয়া (১৮৮০-১৯৩৭) আরও

কয়েকটি নতুন বাগানের মালিক হয়ে আসামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। জোড়হাট 'Local Board' এবং আসাম 'Legislative Council'-এর সদস্য শিবপ্রসাদ ১৯৩০-এর দশকে নীলমণি ফুকনের সম্পাদনায় অসমিয়া দৈনিক পত্রিকা 'বাতরি' প্রকাশ করেছিলেন। অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে বিপুল সম্পদের মালিকানা সত্ত্বেও অন্যদের মত জনহিতকর কাজে শিবপ্রসাদ বরুয়ার ত্রুটি ছিল না। পিতার নামে নামাঙ্কিত জোড়হাটে 'বিষ্টুরাম বরুয়া হল্', কিংবা বিষ্টুরাম হাসপাতাল তাঁরই উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল।

অসমিয়া দৈবজ্ঞ পরিবারভুক্ত এবং সরকারি কর্মচারীর সন্তান মলভোগ বরুয়া প্রথাগত শিক্ষালাভের পর ম্যাজিস্ট্রেট পদ গ্রহণ করলেও অবশেষে অনেকগুলি চা বাগানের মালিক হন। মলভোগ-এর পুত্র প্রসন্নকুমার বরুয়া (১৮৮৪-১৯৫৮) এবং জামাতা এন. সি. বরদোলই শুধু যে চা-মালিক হিসাবে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাই নয়, 'আসাম এ্যাসোশিয়েসন' এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকেরর প্রথমার্ধে জাতপাত নির্বিশেষে খ্যাতনামা অসমিয়া মধ্যবিত্তদের অধিকাংশই চা-শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। আসামের প্রথম আই. সি. এস. কায়স্থ পরিবারভুক্ত চিরকুমার আনন্দরাম বরুয়া (১৭.৬ দ্রষ্টব্য) পর্যন্ত চাকুরি থেকে অবসরগ্রহণের পর চা বাগান তৈরির ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। দৈবজ্ঞ পরিবারের সন্তান 'রায় বাহাদুর' মাধবচন্দ্র বরদোলই-এর কৃতি সন্তান আইনজীবী এবং জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক নবীনচন্দ্র বরদোলই (১৭.৩৫ দ্রষ্টব্য) পর্যন্ত ছোট-খাটো বাগানের মালিক ছিলেন। কলিতা পরিবারভুক্ত মৌজাদারের পুত্র আইনজ্ঞ ও মন্ত্রী 'রায়বাহাদুর' ঘনশ্যাম বরুয়া ১৮৯০ সালে দোলইজান চা-বাগান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কায়স্থ পরিবারভুক্ত এবং কলকাতায় উচ্চশিক্ষিত প্রখ্যাত মানিক চন্দ্র বরুয়া (১৭.৫৫ দ্রষ্টব্য) নানা ধরনের ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করেছিলেন, যার মধ্যে চা ও কাঠ ছিল অন্যতম। ব্রাহ্মণ পরিবারের দীননাথ বেজবরুয়া (১৮১৩-৯৫) (লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার পিতা) সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে দুটি চা-বাগানের মালিক হয়েছিলেন। কায়স্থ পরিবারভুক্ত 'রায়াবাহাদুর' কালীপ্রসাদ চালিহা (১৮৬২-১৯১৪) 'আসাম কোম্পানি'র কর্মচারী হয়েও চারটি চা-বাগানের মালিক হয়েছিলেন। কায়স্থ পরিবারের আর একজন 'রায়বাহাদুর' ফণিধর চালিহা (১৮৫৫-১৯২৩) সরকারি চাকুরি থেকে ১৯০৩ সালে অবসর নিয়ে চা-বাগান তৈরি করেও তেমন সাফল্যলাভ করতে পারেননি এবং তাঁর মৃত্যুর পরে বাগানটি

মাড়োয়ারিদের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। আহোম গোষ্ঠীভুক্ত কৃষ্ণকান্ত গোগুই হাতিবরুয়া শুধু যে ১৮৮৩ সালে কলকাতা প্রদর্শনীতে মুগা সিল্কের বস্ত্র-প্রস্তুতের জন্য তাঁত শিল্পের অভিনব যন্ত্র দেখিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাই নয়, শিবসাগর জেলায় চা-শিল্পেও নানা দক্ষতা দেখিয়েছেন। ব্রাহ্মণ পরিবারের গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন (১৮৪১-১৯২৬) শিবসাগবে কয়েকটি বাগানের মালিকসহ চা-কোম্পানির ডাইরেক্টর পদেও উন্নীত হয়েছিলেন। পুরানিগুদামের মুসলিম সম্প্রদায়ের রহমৎ আলি মুন্সি ইংরেজি না জেনেও ম্যাজিস্ট্রেট পদে থাকাকালীন সময়ে ১৮৭০-এর দশকে কয়েকটি বাগানের মালিক হন। ১৮৯৩ সালে রহমৎ আলি মুন্সি ৩০০ একরের দুটি চা-বাগানে ২০০ জন স্থায়ী এবং ১০০ জন অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। শিবসাগরের মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত কবি, বুদ্ধিজীবী চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (১৭.২২ দ্রষ্টব্য)-র পিতা হরিবিলাস আগরওয়ালা (১৮৪২-১৯১৬) শুধু যে মনে-প্রাণে অসমিয়া ছিলেন তাই নয়, চা-বাগান সহ আসামে সম্ভাবনাপূর্ণ নানা রকম ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় কীভাবে অসমিয়া মধ্যবিত্তদের এক ব্যাপক অংশ চা-শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। চা-শিল্প মানেই যে ব্যাপক মুনাফা—সেটি অবশ্য সব সময় সত্য নয়। বাগানের চা বাজারজাত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে দাম নির্ধারণে অসমিয়া মধ্যবিত্তদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না ; ব্রিটিশ মালিকরাই এই ব্যাপারে কলকাঠি নাড়তেন। সুতরাং ব্রিটিশ শক্তির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং একই সাথে সংঘাতের পথে না গিয়ে নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত হওয়া ছিল অসমিয়া মধ্যবিত্তদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মাঝে মাঝে নানা সংকটে জর্জরিত হয়ে মধ্যবিত্ত পরিচালনাধীন কিছু চা-বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ারও দৃষ্টান্ত আছে। চা-শিল্পে হাত দিয়ে হতাশাগ্রস্ত হওয়ার ফলে ১৮৬০-এর দশকে *চা এরা দি* (বিদায় চা) একটি অসমিয়া প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং অসমিয়া মধ্যবিত্তদের একটি অংশ যেমন চা-শিল্পকে কেন্দ্র করে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিলেন, অপর একটি অংশ তেমনি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন।

চা শিল্পকে কেন্দ্র করে আসামের মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়েছিলেন। শ্রমিক ছাড়াও করণিক, টিলা-বাবু প্রভৃতি সকলের ক্ষেত্রে সময়মতো অফিসে উপস্থিত হওয়া, নিয়মকানুন মানা ইত্যাদি ছিল বাধ্যতামূলক। একই সাথে বাংলার 'বাবু সংস্কৃতি' মধ্যবর্তী স্তরের কর্মচারীদের নানাভাবে

প্রভাবিত করেছিল। অসমিয়া মধ্যবিত্তদের সংখ্যা চা-এর জন্যই ক্রমবর্ধমান ছিল। আসামের নগরায়ণ-প্রক্রিয়া নানা কারণে অত্যন্ত শ্লথগতিতে হলেও (urbanization process) চা-শিল্পের জন্যই কিছুটা ত্বরান্বিত হয়েছিল। একদিকে যেমন আহোম যুগের মারঙ্গী, কালিয়াবর, চরাইদেও, খাসপুর, রংপুর, বিশ্বনাথ, যাগী, রাহা প্রভৃতি তথাকথিত নগর, কিংবা দরং রাজাদের মঙ্গলদই গুরুত্ব হারিয়ে ভূতুড়ে স্থানে পরিণত হল, অপরদিকে তেমনি চা-কেন্দ্রিক ডিব্রুগড়, জোড়হাট, তেজপুর, তিনসুকিয়া, ধুবরি প্রভৃতি স্থানে নগরায়ণ প্রক্রিয়া শুরু হল। এইসব নগরগুলিই ছিল মধ্যবিত্তদের প্রধান কেন্দ্রস্থল। নওগাঁও কৃষি-কেন্দ্রিক শহরে পরিণত হল। গুয়াহাটি শহর অতীতেও ছিল (যদিও নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর) ; কিন্তু এটি ছিল মূলত "military town" বা সামরিক-শহর (পল্টনবাজার, চাঁদমাড়ি, ফ্যান্সি বাজার ইত্যাদি গুয়াহাটি শহরের বিশেষ স্থানগুলির নাম সেই ইঙ্গিত দেয়)। চা বাগানের মালিকরা গুয়াহাটিতেই প্রধানত বাজার করতে আসতেন। চা ছাড়াও অন্যান্য শিল্পদ্যোগকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে বিকশিত বঙ্গাইগাঁও, ডিগবয়, দুলিয়াযান, নামরূপ, মার্গারিটা, শিলচর, লখিমপুর, বরপেটা, কোকরাঝাড়, নুমালিগড়, যোগীঘোপা, নলবাড়ি ইত্যাদি ১২৫টি নগর বর্তমান আসামে আছে। যেহেতু নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সাথে মধ্যবিত্তের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, এরই জন্য এইসব শহরে মূলত মধ্যবিত্তেরই অধিবাস এবং রাজনৈতিক তাপ-উত্তাপের কেন্দ্রবিন্দু।

১৯.৩ অসমিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও কৃষক প্রশ্ন (Assamese Middle Class and the Peasant Question)

আসামে কৃষি ও কৃষকের জন্য গঠনমূলক চিন্তাভাবনা সম্ভবত আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯-১৮৫৯)-ই প্রথম করেন। মাত্র তিরিশ বছরের জীবনে ঢেকিয়াল ফুকন (প্রথম খণ্ডের ১২.৪ দ্রষ্টব্য) জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আসামকে আধুনিক করার ক্ষেত্রে কত উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেটি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। নিজে কৃষি-বিজ্ঞানী না হয়েও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তিনি কীভাবে আসামের কৃষি ও কৃষকের সমস্যা দেখেছিলেন এবং ইউরোপীয় মডেলে উন্নত করতে চেয়েছিলেন সেটি ১৮৫২ সালে Moffat Mills-এর কাছে তাঁর জমা-দেওয়া প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের সমর্থক এবং *Bengal Spectators* পত্রিকার গ্রাহক হিসেবে বাংলায় জমিদারি-ব্যবস্থার

কুফল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং ঐ ধরনের জমিদারি প্রথা যাতে আসামে প্রবর্তিত না হয় সে ব্যাপারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি তিনি বারবার আকর্ষণ করেছিলেন। যদিও কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঢেকিয়াল ফুকনের সকল দাবি বা পরামর্শ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেননি ; তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শের যৌক্তিকতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

কামরূপের কালেক্টর Capt. Rowlatt-এর অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে গুয়াহাটির সদর মুন্সেফ্ কেফায়ৎ-উল্লা অসমিয়া কৃষকদের উন্নত পদ্ধতিতে কৃষিকাজের জন্য ১৮৫৩ সালে বাংলায় *কৃষি-দর্পণ* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অসমিয়া পত্রিকা *অরুণোদয়*-এ গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সকলকে এটি পাঠের আবেদন করা হয়। চা-বাগানের মালিক রসেশ্বর শর্মা বরুয়ার পুত্র কৃষি-বিজ্ঞানী 'রায়বাহাদুর' নারায়ণ শর্মা বরুয়া (১৮৬৮-১৯৩৮) অসমিয়া ভাষায় ১৯০৯ সালে *অসমিয়া কৃষিতত্ত্ব*, ১৯১১ সালে যথাক্রমে *অসমিয়া কৃষি-ব্যসন* এবং *অসমিয়া কৃষি-দউল* প্রকাশ করেন। ১৯০৯ সালে এগারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত ২৪৮ পৃষ্ঠার *অসমিয়া ক্ষেতি* গ্রন্থটি ভরত চন্দ্র দাস প্রকাশ করেন। আসামে কৃষি ও শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা এক জায়গায় সন্নিবেশিক করে শ্রীকান্ত চৌধুরির *কৃষি শিল্প বিজ্ঞান* গ্রন্থটি চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (১৭.২২ দ্রষ্টব্য) নানাভাবে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

যদিও কৃষি কাজে অসমিয়া মধ্যবিত্তরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতেন না, তথাপি অসমিয়া কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নে তাঁদের এইসব প্রচেষ্টাকে অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে যেমন দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক রামা কৈবর্ত্য, হাসিম শেখ কিংবা পরাণ মন্ডলরা স্থান পেয়েছিলেন, অসমিয়া সাহিত্যেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ব্রিটিশ শাসনের তেমন বিরোধিতা না করেও উনবিংশ শতকের বিখ্যাত অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত জমিদারি প্রথার কারণে বাংলার কৃষকদের সংকট ও দুরবস্থার যে চিত্র এঁকেছিলেন, আসামের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটি প্রয়োগ করেননি ; কারণ আসামে রায়তওয়ারি-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। আসামের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের দাবির সাথে সংগতি রেখে বোম্বাই বা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অথবা ব্রিটিশ-শাসিত ব্রহ্মদেশের মতো আসামেও রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু হওয়ায় কৃষকের দুর্দশা তুলনামূলকভাবে আপাতদৃষ্টিতে কম মনে হলেও দুর্গতির কিন্তু অন্ত ছিল না। ইতিপূর্বে আসামে বেশ কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এবং বিদ্রোহের মূল কারণগুলিও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং রায়তওয়ারি ব্যবস্থা সত্ত্বেও কৃষকের

দুর্দশা সম্পর্কে অসমিয়া বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে কিছুটা সরব ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯.৩.১ 'রায়ত' ও কৃষিমজুর

'রায়ত' (আরবী শব্দ 'রইয়াত' থেকে জন্ম) সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে মূলত কৃষকদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত। মুঘল যুগে দুই ধরনের 'রায়ত'-এর সন্ধান পাওয়া যায় ঃ (১) *খুদকস্তা (Khudkasta)* বা গ্রামের স্থায়ী কৃষক যাদের জমি থেকে উৎখাত করা কঠিন ; এবং (২) *পইকস্তা (Paikasta)* বা অস্থায়ী ভ্রাম্যমাণ কৃষক। প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে নিম্ন-ব্রহ্মপুত্র এলাকায় এই মুঘল-প্রথা চালু ছিল। আসামে ব্রিটিশ শাসকরা স্থায়ী 'রায়ত' চাইলেও, অতিরিক্ত রাজস্বের ভয়ে অধিকাংশ কৃষক অস্থায়ী বা বাৎসরিক পাট্টা ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। আসামের লোকসংখ্যা কম এবং জমি উর্বর হওয়া সত্ত্বেও ভ্রাম্যমান কৃষক কিংবা ভূমিহীন কৃষি মজুরের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পেল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আসামের কৃষককে 'অলস' এবং 'আফিম-এ নেশাগ্রস্ত' বলে বারবার সমালোচনা করেছেন। Moffat Mills-এর ভাষায় *"The apathy of the people and not the want of land or poverty of the soil, is the cause of the backward state of agriculture in Assam."* আসাম সম্পর্কে ১৮৭৮-৮০ সালের Famine Commission রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে ঃ *"....the Assamese cultivator is well off, and does not probably work during the year two-thirds of the time that a Bengali or Bihari cultivator will do....The wants of the people (of Assam) are few and their habits are not extravagant but they are as a class improvident and the consumption of opium induces indolent habits."* আসামের মাটি ও জমি সম্পর্কে R. B. Pemberton, Willam Robinson, John M'cosh প্রভৃতি সমকালীন ব্রিটিশ আমলারা সকলেই তাঁদের রিপোর্টে আসামের জমির উর্বরতা নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও কৃষকের দারিদ্র্যের কারণ চিহ্নিত করার সময় কৃষিজীবীদের নিষ্ক্রিয়তাকেই দায়ী করেছেন।

যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সমকালীন জনগণনা অনুযায়ী, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ৫টি জেলায় (গোয়ালপাড়া ব্যতীত) কৃষকের সংখ্যা ১৮৯১ সালে প্রায় ১ লক্ষ থেকে ১৯০১ সালে ১ লক্ষ ৬০ হাজার হয়েছিল ; কিন্তু কৃষি মজুরের সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল। কৃষি মজুরের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

সাল	মোট সংখ্যা
১৮৯১	৩৫,৪৯৭
১৯১১	৫০,৬১২
১৯২১	৮২,৩৯৫

ভূমিহীন কৃষি-মজুরের এই সংখ্যা বৃদ্ধি অনেকের কাছেই উদ্বেগের কারণ ছিল। ১৮৭৮-৮০ সালে Famine Commission-এর রিপোর্টে এই প্রশ্নটির প্রতি প্রথম অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়। আহোম যুগের দাস প্রথা (যে সময়ে মোট জনসংখ্যার ৫ থেকে ৯ শতাংশ মানুষ নানাভাবে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা ছিল) ১৮৪৩ সালে অবলুপ্ত হওয়ার পর নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ চা-বাগান মালিকদের আশা ছিল ঐসব মুক্তিপ্রাপ্ত দাসরা দলে দলে বাগানে 'কুলি' বা শ্রমিক হিসেবে ছুটে আসবে। তা কিন্তু হয়নি। ব্রিটিশ চা-মালিকরা সরকারের উপর ভূমি রাজস্বের হার বারবার বৃদ্ধির জন্য চাপ অব্যাহত রেখেছিল এই আশায় যে, ক্ষুদ্র কৃষকরা অবশেষে খাজনা-বৃদ্ধির কারণে জমি-জায়গা ছেড়ে দিয়ে চা-বাগানে যোগ দিতে বাধ্য হবে। সেটির ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ চা-মালিকরা ঠিক সফল হয়নি ; বরং প্রান্তিক চাষি অবশেষে কৃষি বা ক্ষেত-মজুরে পরিণত হয়েছে। আসামের অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক শক্তির অনুপ্রবেশের ফলে অনিবার্যভাবেই যে কৃষি-মজুরের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছিল—এই সরল সত্যটি অসমিয়া বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশ উপলব্ধি করেন এবং কৃষক ও কৃষি মজুরের স্বার্থে কিছুটা সরব ভূমিকা পালন করতে অগ্রণী হন।

১৯.৩.২ মাড়োয়ারি ঋণদাতা

ব্রিটিশ শাসনে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রবর্তিত বিভিন্ন ধরনের ভূমিব্যবস্থার মর্মকথা ছিল ঃ ফসল হোক্ না নাই হোক্, নির্দিষ্ট সময়ে নগদ অর্থে খাজনা মিটিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক ; অন্যথায় জমি হারানো ছিল অবশ্যম্ভাবী। ব্রিটিশ-শাসনে আসামে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব 'মৌজাদার'-দের হাতে ন্যস্ত ছিল এবং আহোম যুগের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজনকে সাধারণত 'মৌজাদার'-এর দায়িত্ব অর্পণ করা হত। যদিও রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ মৌজাদাররা 'কমিশন' হিসেবে পেতেন ; কিন্তু সমাজে কিছু প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ভোগ সত্ত্বেও মৌজাদারদেরও নানারকম সমস্যা ছিল। উদীয়মান অসমিয়া মধ্যবিত্তদের একটা অংশ 'মৌজাদার' পরিবারভুক্ত ছিলেন। মণিরাম দেওয়ানের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, কীভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মানুষ ছাড়াও সিলেটের বাঙালি এবং মাড়োয়ারিদেরও 'মৌজাদার' হিসেবে নিয়োগ করা হত। যেহেতু নগদ অর্থের যোগান সেই সময় আসামে

যথেষ্ট ছিল না, এরই জন্য নগদ অর্থে খাজনা মেটাতে কৃষককে মাড়োয়ারি সহ অন্যান্য ছোটখাটো ব্যবসাদারের কাছে ঋণ ও দাদন ইত্যাদি নিতে হত এবং সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে জমিও হাতছাড়া হত এবং গ্রামীণ ঋণকে কেন্দ্র করে ভূমিহীনের জন্ম হত। ১৮৮৮ সালের একটি সরকারি রিপোর্টের কয়েকটি লাইন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ

> *The Marwari traders.....are to be found in almost every important village (of Assam). They keep supplies of salt, cotton twist and piece-goods, brass vessels,undrained sugar etc. and exchange these commodities for money, but more genrally for paddy, rice, mustard, silk cocoons, silk thread and silk cloth. When required they make advances to the cultivators, and the rate of interest charged is usually one anna per rupee per month or 75 per cent.*

প্রথমদিকে এরিকম মাড়োয়ারি উত্তমর্ণ বা ঋণদাতা খুব বেশি ছিল না। ১৮৯১ সালের জনগণনায় সমগ্র আসামে ঋণদাতার সংখ্যা ছিল মাত্র ৯৮০১ জন (তার মধ্যে শুধুমাত্র কামরূপেই ছিল ১,২১১জন)। কিন্তু ক্রমেই ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বাড়তে থাকে। কৃষককে ধানচাষের উপর নির্ভর না করে তুলা, পাট ইত্যাদি 'Cash crop'-এর দিকে দৃষ্টি ফেরাতে এবং কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ('Commercializaiton of agriculture') প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত ও ত্বরান্বিত করার জন্য ঋণদাতারা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এইভাবে একদিকে সমাজে ঋণদাতাদের আবির্ভাব এবং অন্যদিকে নগদ অর্থের জন্য কৃষকের ঋণ-গ্রহণ এবং ঋণ পরিশোধ করতে না পারার জন্য জমি হারানো, আসামের গ্রামীণ জীবনের স্বাভাবিক চিত্রে পরিণত হয়। এই জন্যই মন্তব্য করা হয় ঃ *"....the requirement of cash payments was ruinons to the cultivator, exposing him to the demands of moneylenders as an alternative to the loss of his land and starvation when crops failed."* অমলেন্দু গুহ'র ভাষায় ঃ *"The fact that the market sector of the peasant economy had been completely in the grip of the well-entrenched Marwari trading capital ever since the advent of the British rule, is beyond dispute."* অন্যত্র গুহ মন্তব্য করেছেন ঃ *"Marwari merchant capital established its octopus-like grip...."* আসামের গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে এইসব পরিবর্তনের নিরিখেই অসমিয়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা বিচার করা প্রয়োজন।

১৯.৪ অসমিয়া মধ্যবিত্ত নিয়ে বিতর্ক

মধ্যবিত্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, অসমিয়া মধ্যবিত্তদেরও দ্বৈত চরিত্র ব্রিটিশ শাসিত আসামে পরিলক্ষিত হয়—সেটি এক সময় 'প্রগতিশীল', আবার অন্য সময় 'প্রতিক্রিয়াশীল' বা 'পরিবর্তন-বিরোধী'। আগের অধ্যায়ে আমরা 'ফুলাগুড়ি ধাওয়া' থেকে শুরু করে 'পাথারুঘাট রণ' পর্যন্ত অনেক কৃষক বিদ্রোহের কাহিনি দেখেছি। ঐসব বিদ্রোহগুলির চরিত্র ছিল প্রকৃতই ব্রিটিশ-বিরোধী। বিদ্রোহে অংশ নেওয়ার জন্য অনিবার্য মৃত্যু জেনেও এবং বারবার বিদ্রোহের ব্যর্থতা সত্ত্বেও কৃষক উত্তেজনা থামানো সম্ভব হয়নি। সেই সময় বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল 'রেইজ-মেল' এবং আসামের মধ্যবিত্তদের তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। আসলে, ঊনবিংশ শতকের শেষ দুতিন দশক আগে শ্রেণি হিসাবে আসামের মধ্যবিত্ত সমাজ ('class in itself', 'class for itself') ঠিক বিকশিত হয়নি। যদিও কেউ কেউ মনে করেন, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগেও আসামে মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব ছিল এবং অমলেন্দু গুহ'র ভাষায়, "*...by the end of the nineteenth century, the Assamese middle class can be broadly divided into two section—(i) bourgeoisie, and (ii) petty-bourgeoisie*" ইত্যাদি ; কিন্তু মনোরমা শর্মা এইরকম বিশ্লেষণের বিরোধিতা করে বিতর্ককে উস্কে দিয়েছেন। মনোরমা শর্মার মতে, অস্তিত্বই যথেষ্ট নয়, নিজের শ্রেণি সম্পর্কে সচেতনতাই আসল কথা। শর্মার ভাষায়, "*To become a class a group must not only be numerically viable but also be canscious of itself as a class and should be able to articulate its interests. That is, the three components of economic viability, class cousciousness and ideological unity must all be present in a group if it is to be called a class.*" শর্মা মনে করেন, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সাথে মধ্যবিত্তের জন্ম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকের আগে আসামে শ্রেণি হিসাবে না ছিল 'বুর্জোয়া', না ছিল মধ্যবিত্ত। এইভাবে অসমিয়া মধ্যবিত্ত নিয়ে বিতর্ক রীতিমত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

১৯.৫ মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে 'রায়ত-সভা'র জন্ম

'মেল্' প্রথার অবসান এবং 'রায়ত সভা'র উত্থানের মধ্য দিয়ে আসামে কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, নগর-কেন্দ্রিক জীবনের সাথে মধ্যবিত্তের যোগাযোগ সাধারণত নিবিড় থাকে ; কিন্তু যেহেতু আসামে নগরায়ণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত শ্লথগতিতে হয়েছিল (এবং যেটুকু

হয়েছিল সেটি চা-শিল্পকে কেন্দ্র করে) ; এরই জন্য অসমিয়া মধ্যবিত্তদের উদ্ভব কৃষি-অর্থনীতির প্রেক্ষাপটেই হয়েছিল। ফলে, কৃষি ও কৃষকের প্রশ্নে মাথা-ঘামানো মধ্যবিত্তের কাছে জরুরি ছিল। 'মেল্'-এর নেতৃত্বে একটার পর একটা জঙ্গী কৃষক বিদ্রোহে উত্যক্ত হয়ে কামরূপের ডেপুটি কমিশনার R. B. McCabe এক সময় 'মেল্'গুলিকে "embodiment of collective strength of the people" হিসাবে চিহ্নিত করেও মন্তব্য করেছিলেন, আসামে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে 'মেল্'-এর ধ্বংস অনিবার্য ("if British paramountcy was to be preserved in Assam, the 'melles' must be crushed")। সেটিই অবশেষে ঘটেছিল এবং ১৮৯৪ সালের পর 'মেল্' এর স্থলে মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কৃষক সহ অন্যান্য গ্রামীণ মানুষ নিয়ে একটার পর একটা 'রায়ত সভা' গঠিত হয়েছিল। 'মেল্' প্রথায় কৃষকের সমবেত কণ্ঠই গুরুত্ব পেত, নেতৃত্ব নয়। অন্যদিকে 'রায়ত সভা'র ক্ষেত্রে নেতৃত্বের কথাই গুরুত্ব পেত। যেহেতু অযথা ঝুঁকি না নিয়ে মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব সাংবিধানিক পথে সমঝোতার মাধ্যমে কৃষক সমস্যার সমাধানে বিশ্বাসী ; এরই ফলে আসামে কৃষক আন্দোলনের জঙ্গি চরিত্রের যবনিকাপাত হল। তেজপুর, শিবসাগর, জোড়হাট, কামরূপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থানের 'রায়ত সভা' ঐক্যবদ্ধভাবে অবশেষে একটি সংগঠনে পরিণত হয়ে ('All Assam Ryot Sabha') ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃত্বের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করল। বিখ্যাত অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র দত্তর অসমিয়া জামাতা বলিনারায়ণ বোরা ('রায়ত সভা'র অন্যতম নেতা) ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন নীতির মাধ্যমে এবং জাতীয় কংগ্রেসের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে অসমিয়া কৃষক সহ গ্রামীণ মানুষের সমস্যা সুরাহার পক্ষপাতী ছিলেন। সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ এবং কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত পেশ ইত্যাদি মধ্যবিত্ত-প্রধান 'রায়ত সভা'র অন্যতম দায়িত্বে পরিণত হল। কৃষকরা যে এতে খুশি হত তা নয় ; বরং বিভিন্ন সভায় যোগদান করতে গেলে তাদের আর্থিক ক্ষতিই হত। বলিনারায়ণ বোরা নিজেই এইভাবে স্বীকার করেছেন ঃ

> *The poor peasant remains as wise as he was when he came to the meeting, his gain is the loss of the four ploughing days lost in coming and going and annas two paid towards the sending of the petition. Such as a matter of fact, are the origin and functions of the peasant meetings of Assam."*

মধ্যবিত্ত নেতৃত্বে গঠিত 'রায়ত সভা'র বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এর কিছু প্রভাব ছিল। "Assam Association" সহ

বিভিন্ন সংগঠন ও সমিতির আত্মপ্রকাশের ফলে এই চেতনা আরও বৃদ্ধি পায়। অসমিয়া মধ্যবিত্তের ভাবনা চিন্তা ও নেতৃত্ব কৃষকসহ সমাজের অন্য অংশকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল সেটি বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ কেউ Antonio Gramci'র 'hegemony' বা চেতনার ক্ষেত্রে একাধিপত্য তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। কেউ আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে এবং 'সমাজহিতৈষী' 'ভদ্রলোক' জমিদারের আশ্রয়ে প্রজারা কত নিশ্চিন্ত ছিল ; কিংবা তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান্ধিবাদী উপন্যাস 'ধাত্রী দেবতা'র নায়কের সাথে অসমিয়া মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের তুলনা করেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে আসামের সামাজিক ইতিহাসে মধ্যবিত্তের 'hegemony' সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কী না, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 'রায়ত-সভা'র উপর কৃষকের আস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি এবং ১৯৩৯-এর পর 'রায়ত সভা'র প্রকৃতপক্ষে কোনও অস্তিত্বই ছিল না। ১৯৩০-এর দশক থেকে কৃষকদের নিজস্ব সংগঠন কৃষক সম্মিলনি (সমিতি), কিষাণসভা ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা সেটিই প্রমাণ করে।

বিংশ অধ্যায়

সভা-সমিতি ও জাতীয় জাগরণ

২০.১ আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি ও সভা-সমিতির জন্ম

আসামে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমদিকে আহোম-অভিজাতদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হারানোর যন্ত্রণা শুধু যে গোমধর কুঁওরদের (১৮২৮) বিদ্রোহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, নিপীড়নমূলক রাজস্বের বিরুদ্ধে 'রেইজ-মেল্'-এর নেতৃত্বে একটার পর একটা কৃষক-বিদ্রোহ, স্বাধীনচেতা উপজাতিদের চিরাচরিত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের কারণে ১৮২৯ সালে খাসি বিদ্রোহ বা পরবর্তী সময়ে সিংফো বিদ্রোহ, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের অগ্নিশিখা সহ বেশকিছু ঘটনা ব্রিটিশ-বিরোধী চেতনারই পরিচয় দেয়। এটি যেমন একটি দিক্, ঠিক তেমনি অপরদিকে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত উদীয়মান মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা মিষ্টি-প্রলেপ দেওয়া প্রতিবাদের নতুন ভাষা খুঁজে পেলেন, যেটি সবসময় ব্রিটিশ-বিরোধী ছিল না, বরং মাঝে মাঝে ব্রিটিশ বন্দনায় তাঁরা মুখর হয়ে উঠতেন। **প্রথমদিকে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন** যেটি ১৮৫৪ সালে A. J. M. Moffat Mills-কে লেখা মণিরাম দেওয়ান-এর চিঠি থেকে পরিস্ফুট। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সংঘবদ্ধ সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভূত হয়। বঙ্গদেশে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত (১৮৮৫) হওয়ার পূর্ববর্তী অধ্যায় যেমন নানারকম সভা-সমিতি-সংগঠনের ইতিহাস, আসামেও তেমনি জাতীয় কংগ্রেস প্রসারিত হওয়ার আগে ও পরে নানা ধরনের সভা বা সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, মানুষের চেতনাকে শাণিত করা। একদিকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং অন্যদিকে সভা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে হালিরাম ঢেকিয়াল ফুকন, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, জগন্নাথ বরুয়া, মানিকচন্দ্র বরুয়া, গুণাভিরাম বরুয়া, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, হেমচন্দ্র বরুয়া, ভোলানাথ বরুয়া, কালীপ্রসাদ চালিহা, বলিনারায়ণ বোরা প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এঁরা বিশ্বাস করতেন, শুধুমাত্র সাংবিধানিক পদ্ধতিতে, জনসভা, দরখাস্ত ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা সরকারের দৃষ্টিতে আনা সম্ভব।

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯-৫৯) আসামে রাজনৈতিক আন্দোলন সূত্রপাতের অন্যতম স্থপতি হিসেবে বিবেচিত হন। আনন্দরাম ও মণিরাম দেওয়ান—দু'জনেই Moffat Mills-এর কাছে তাঁদের বক্তব্য লিখিত আকারে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু উভয়ের বক্তব্যের মধ্যে গুণগত তফাত আছে। বাংলার নবজাগরণের আলোকে-দীপ্ত আনন্দরামের 'Observations on the Administrations of the Province of Assam'-এ তিনি শুধু যে ব্রিটিশ সরকারের শাসনব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করেছেন তাই নয়, গঠনমূলক কিছু সংস্কারের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। ১৮৫৭ সালে আনন্দরাম ও গুণাভিরাম যুগ্মভাবে **নওগাঁও-এ 'জ্ঞান-প্রদায়িনী সভা'** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে। মোট ৫০ থেকে ৬০ জন সদস্য ছিল ঐ সভার এবং সাধারণত প্রতি রবিবারে সদস্যরা মিলিত হতেন। গঙ্গাগোবিন্দ ফুকনের নাম দুটি সংগঠনের সাথে জড়িত এবং এই দুটি হল ঃ ১৮৭২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'অসমিয়া সাহিত্য সভা' এবং ১৮৮০-তে শিবসাগরে প্রতিষ্ঠিত **'Upper Assam Association'**। জগন্নাথ বরুয়া ও মানিকচন্দ্র বরুয়া কলকাতার কলেজে ছাত্রাবস্থায় ঐ সাহিত্য সভা'র পক্ষ থেকে ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক-এর কাছে আসাম-বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের দাবি-সনদ পেশ করেছিলেন। ঐ সময়ে কলকাতায় অবস্থানরত অসমিয়া ছাত্র সম্প্রদায় **'অসমিয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা'**র মাধ্যমে কীভাবে কাজ করতেন সেটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব সভাসমিতিই ইঙ্গিত দেয় কীভাবে সংঘবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে আসামের ছাত্র ও শিক্ষিত যুবকরা অসমিয়া ভাষাসহ সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি প্রশ্নে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। একা একা যে বড়ো সংগ্রাম করা যায় না, এইসব সভাসমিতি গঠন আসামে সেই নতুন চেতনা প্রকাশের প্রতীক।

ধীরে ধীরে সংগঠনগুলির চরিত্রেও কিছুটা পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতকের আশির দশকে কৃষক ও রায়তদের অসন্তোষ প্রকাশের মঞ্চ হিসেবে **তেজপুরে প্রথম 'রায়ত-সভা' আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তী সময়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে**। 'রায়তসভা'র যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হরিবিলাস আগরওয়ালা, লম্বোদর বোরা, লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতি, জয়দেব শর্মা, ঠাকুরদাস শর্মা, মহেন্দ্র দে প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। তেজপুরে নিয়মিতভাবে সভা পরিচালনা সহ কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে সদস্যদের চাঁদা দিয়ে একটি টাউন হলও নির্মিত হয়েছিল।

২০.১.২ সুরমা উপত্যকায় সংগঠন

অন্যদিকে সুরমা উপত্যকায় সংগঠন তৈরির প্রচেষ্টা ১৮৭৪ সালে কাছাড়-শ্রীহট্ট আসামের সাথে যুক্ত হওয়ার অনেক আগেই পরিলক্ষিত হয়। সিলেট ও কাছাড়ের 'পিউপিলস্ অ্যাসোসিয়েশন' বা 'সিলেট অ্যাসোসিয়েশন' ঐ অঞ্চলকে আসামের সাথে যুক্ত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভাইস্‌রয়ের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছিল। ভারতে চরমপন্থী আন্দোলনের তিন উল্লেখযোগ্য নেতার (যাঁরা 'লাল-বাল-পাল' ত্রয়ী হিসেবে পরিচিত) মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন সিলেটের মানুষ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই.সি.এস. অফিসার হিসেবে স্বল্প-মেয়াদি কর্মজীবনে সিলেটে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং সংগঠন গড়ার উদ্যোগকে নানাভাবে উৎসাহিত করতেন। ১৮৭০-এর দশকে সুরেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় শিলচরের কামিনী কুমার চন্দ (১৭.১২ দ্রষ্টব্য) কলকাতায় আনন্দমোহন বসু স্থাপিত 'স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েসন'-এর সদস্য ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কামিনী কুমার চন্দ জমিদারদের সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করোছলেন।

২০.১.৩ জাতীয় কংগ্রেসে আসামের প্রতিনিধি

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ১৮৮৫ সালে হলেও এবং অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের নেতৃত্বে মাত্র ৭২ জন প্রতিনিধি নিয়ে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ের কাছে প্রথম অধিবেশন হলেও এটির চরিত্র যে প্রথম অধিবেশনে ঠিক সর্বভারতীয় ছিল না, এই ব্যাপারে অনেক ঐতিহাসিকই একমত পোষণ করেন। সেই সময় অবিভক্ত বঙ্গের সবচেয়ে উজ্জ্বল জননেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অনেককে উপেক্ষা করেই হিউম সাহেব যেভাবে তড়িঘড়ি প্রথম অধিবেশনের আয়োজন করেছিলেন তাতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের সময় এটি সংশোধন করা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের কিছুদিন পরেই ছোটোখাটো সভা-সমিতি-সংগঠনগুলি ধীরে ধীরে জাতীয় আন্দোলনের স্রোতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে না হলেও ১৮৮৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশন থেকে আসামের দুই উপত্যকার (ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা) প্রতিনিধিরা নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকতেন। সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব আসামকে সেদিন কীভাবে আলোড়িত করেছিল এর থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়। প্রথমদিকে বিভিন্ন গণ-সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবেই জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে

আসামের প্রতিনিধিরা যোগ দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ, ১৮৮৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে আসামের যেসব প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ঃ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে (ক) কালীকান্ত বরকাকতি (শিলং অ্যাসোসিয়েশন), (খ) দেবীচরণ বরুয়া (আপার আসাম অ্যাসোসিয়েশন), (গ) গোপীনাথ বরদোলই (আপার আসাম অ্যাসোসিয়েশন), (ঘ) সত্যনাথ বোরা (নওগাঁও 'রায়ত-সভা')। সুরমা উপত্যকা থেকে গিয়েছিলেন সিলেট ও হবিগঞ্জের ভূম্যধিকারী বা জমিদারদের সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে যথাক্রমে (ক) বিপিনচন্দ্র পাল, (খ) কামিনী কুমার চন্দ, (গ) দীননাথ দত্ত (কাছাড়ের জয়েন্ট স্টক্ কোং-এর ম্যানেজার), (ঘ) জয়গোবিন্দ সোম (সিলেটের আইনজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি)।

২০.২ জোড়হাট সার্বজনিক সভা (Jorhat Sarbajanik Sabha)

১৮৮৪ সালে রায়বাহাদুর জগন্নাথ বরুয়া (১৮৫১-১৯০৭) কর্তৃক স্থাপিত **'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'** ('পুনা সার্বজনিক সভা'র সাথে তুলনীয়) আসামের রাজনৈতিক সংগঠনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল-ফলক। বাংলার নবজাগরণের মধ্যগগনে জগন্নাথ বরুয়া ছিলেন কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। তাঁর পিতা ছিলেন আসামে চা-বাগানের মালিক এবং তিনি নিজেও ১৮৯৩ সালে প্রায় ৫০০ শ্রমিক নিয়োগ করেছিলেন, যার মধ্যে প্রায় ৩০০ বাঙালি, ১০০ স্থানীয় অসমিয়া এবং বাকী ১০০ কামরূপ ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলের কাছাড়ি জনগোষ্ঠী। কলকাতায় তিনি জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে 'আত্মীয়সভা', 'ব্রাহ্ম সমাজ', 'তত্ত্ববোধিনী সভা', 'হিন্দু মেলা', 'জ্ঞানসন্দিপনী সভা', 'Landholders' Society', 'Students' Association' ইত্যাদি বিভিন্ন সভা-সমিতি-সংগঠনের সাথে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু 'British Indian Association' এবং 'Indian Association'-এর কাজকর্ম তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে এবং আসামেও অনুরূপ একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন। প্রথমে নিজেকে সম্পাদক পদে রেখে এবং রাজা নরনারায়ণ সিংহ (যিনি 'মাজুমেলিয়া রাজা' নামে পরিচিত)-কে সভাপতি পদ দিয়ে জগন্নাথ বরুয়া ১৮৮৪ সালে 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'র যাত্রাপথের সূত্রপাত করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে জগন্নাথ বরুয়া (১৭.২৬ দ্রষ্টব্য) নিজে হন সভাপতি এবং দেবীচরণ বরুয়া হন সম্পাদক। আসলে, এই সার্বজনিক সভাটির নামের সাথে জগন্নাথ বরুয়ার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন কেবলমাত্র ততদিনই সভাটি সক্রিয়

ছিল। আসামে রাজনৈতিক সচেতনতা ও নরমপন্থী মানসিকতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'র ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বরুয়া **'P' নীতি** (Petition, Prayer, Please, Pamphlet, Paper, Participate, Passive resistance, Persuasion ইত্যাদি) উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন। নামটি 'জোড়হাট' হলেও সার্বজনিক সভার কাজ সমগ্র আসামেই প্রসারিত ছিল এবং ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের কাছেই উন্মুক্ত ছিল। ১৮৯৩ সালে Royal Commission on Opium-এর কাছে প্রতিবেদন পেশ করার সময় সার্বজনিক সভার উদ্দেশ্য এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন ঃ

> *For the purpose of representing the wishes and aspirations of the people to the government, explaining to the people the objects and policies of the government and generally ameliorating the condition of the people.*

সেই সময় সমগ্র আসামে এর সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০-র মতো। যেভাবে আলোচনা ছাড়াই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ১৮৮৬ সালে ব্রিটিশ সরকার ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের সাক্ষর রেখেছে এই সার্বজনিক সভা। আসামের ব্রিটিশ চিফ্-কমিশনারের হাতে সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকায় যেভাবে একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল এবং বিচারব্যবস্থা প্রায় অর্থহীন প্রহসনে পরিণত হয়েছিল, সেটিও সভার কাছে একটি উদ্বেগের বিষয়বস্তু ছিল। ১৮৯৩ সালে ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব ও কৃষিনীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে যখন গণ-অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, সেইসময় সার্বজনিক সভা 'রায়ত'-এর পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং এরজন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। যেভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গুয়াহাটির দ্বিতীয় 'গ্রেড'-এর কলেজকে 'ব্যর্থ' আখ্যা দিয়ে এবং ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান না করে, বন্ধ করে দিয়েছিল—সেটিও ছিল সার্বজনিক সভার দৃষ্টিতে 'অবিবেচনাপ্রসূত'। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রবৃত্তি কমিয়ে দেওয়ার ফলে সভার মতে স্থানীয় অনেক দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের পক্ষে আসামের বাইরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন ও সরকারি চাকুরি পাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৮৯২ সালের ১৪ ডিসেম্বর সার্বজনিক সভা আসামের চিফ্ কমিশনারের কাছে পেশ করা প্রতিবেদনে ভূমিপুত্রদের ন্যায্য অধিকার কীভাবে সংকুচিত করা হচ্ছে সেটি পরিসংখ্যান দিয়ে উল্লেখ করে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে—যেমন, আরক্ষা, বনদপ্তর, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ্ দপ্তর ইত্যাদি—স্থানীয় প্রার্থীদের অগ্রাধিকারের দাবির প্রতি সার্বজনিক সভা বারবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছিল। এরই জন্য দেখা যায় ১৯০৪ সালের ৬ এপ্রিলে ভারত সরকারের সচিবের কাছে আসামের চিফ্ কমিশনারের সচিব F. G. Monahan লিখছেন :

> *...it is only to be expected that the local feelings should be to oppose to grant to outsiders of what were rightly or wrongly, regarded to be the prizes of life, and it is possible that Assam would have advanced more rapidly than has been the case had employment of foreigners been prohibited on the lines that has been followed for many years past in the Central Provinces.*

স্থানীয় যোগ্য প্রার্থীদের শুধু সরকারি কাজে আরও বেশি নিয়োগের প্রশ্নেই (যাতে আসামের উন্নতি আরও বেশি ত্বরান্বিত হত) সার্বজনিক সভা দাবি সীমাবদ্ধ রেখেছিল তা নয়, যেভাবে উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পরিবর্তে দিনদিন কমানো হচ্ছিল তাতেও সমানভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, ১৮৭৪ সালে আসাম পুনর্গঠনের পর কীভাবে Extra Assistant Commissioner-দের বেতন ৮০০ টাকা থেকে নামিয়ে ৬০০ টাকা করা হয়েছিল এবং এর ফলে অনেক দক্ষ আধিকারিক আসাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ প্রতিবেশী বঙ্গদেশ সহ ব্রিটিশ-ভারতের অন্যত্র এইরকম বেতন হ্রাসের ঘটনা সেইসময় ছিল বিরল।

১৯০০ সালের মার্চ মাসে লর্ড কার্জন আসাম সফরে আসার সময় জগন্নাথ বরুয়ার নেতৃত্বে সার্বজনিক সভা গুয়াহাটিতে ভাইসরয়কে হার্দিক সংবর্ধনা জানিয়ে ১৩ মার্চ যে প্রতিবেদনটি পেশ করেছিলেন (অসমিয়া ভাষায় সত্যনাথ বোরা এবং ইংরেজিতে জগন্নাথ বরুয়া) তাতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি চরম আনুগত্য প্রকাশ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দ্রুত আসাম-বেঙ্গল রেললাইনের কাজ সমাপ্ত করা সহ আরও কিছু দাবি-সনদ ছিল—যেমন, রায়তদের দীর্ঘমেয়াদি 'লিজ' প্রদান, যেহেতু আসামে আইনসভা নেই এরই জন্য আসামের কণ্ঠকে সরকারি নজরে আনার উদ্দেশ্যে Imperial Legislative Council-এ আসামের একটি স্থায়ী আসন ইত্যাদি। সার্বজনিক সভার বিভিন্ন দাবির যৌক্তিকতা কার্জন স্বীকার করলেও কেন্দ্রীয় আইনসভায় আসামের একটি স্থায়ী আসনের অধিকারের প্রশ্নটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কার্জন উল্লেখ করেছিলেন কেন্দ্রীয় আইনসভায় সমগ্র দেশের জন্য এইরকম মাত্র পাঁচটি আসন বরাদ্দ আছে এবং আসামের

জন্য একটি দিলে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হবে। লর্ড কার্জনের ভাষায় ঃ

> *...if I were to undertake permanently to allot one of these to Assam, I should be adopting a course...that would not necessarily be conducive to the representative character of the Council itself.*

তবে খুব শীঘ্র প্রাদেশিক আইনসভা সৃষ্টির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস তিনি সার্বজনিক সভাকে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জগন্নাথ বরুয়ার মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা রায়বাহাদুর কৃষ্ণকুমার বরুয়া এবং জামাতা চন্দ্রধর বরুয়া Assam Legislative Council এবং পরবর্তী সময়ে Indian Council of States-এর সদস্য হয়েছিলেন। যেসব যুক্তি দেখিয়ে লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন, অন্যান্যদের মতো 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'ও প্রথমদিকে তার বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু যখন জগন্নাথ বরুয়া উপলব্ধি করলেন যে উদ্ধত কার্জনকে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত থেকে টলানো অসম্ভব, সেই মুহূর্তে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। শেষদিকে 'সার্বজনিক সভা' নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশে অসমিয়াদের স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয় এবং চাকুরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে আসমিয়াদের অধিকার যাতে সুরক্ষিত থাকে সেইসব প্রশ্নেই সরব ভূমিকা পালন করেছিল।

২০.২.১ আফিম প্রশ্নে 'সার্বজনিক সভা'র ভূমিকা

একটি Petitioning body বা দরখাস্তকারী-সংস্থা হিসেবে 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'র ভূমিকা সীমাবদ্ধ হলেও, আফিম বা 'কানি'র প্রতি নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে ঐ সভার ভূমিকায় অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। যদিও আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন থেকে শুরু করে মণিরাম দেওয়ান, গুণাভিরাম বরুয়া, রাধানাথ চ্যাংকাকতি, আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রবক্তা প্রভৃতি সকলেই ব্রিটিশ সরকারের আফিম নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং রামচন্দ্র বরুয়া তাঁর ব্যঙ্গাত্মক রচনা 'কানিয়ার কীর্তন'-এ আসামের সামাজিক অধঃপতনের জন্য 'কানি' বা আফিমকেই প্রধানত দায়ী করেছিলেন, 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'র জগন্নাথ বরুয়া কিন্তু অন্যদিকে আফিমের সমর্থনে এবং সরকারের আফিম নীতিকে পরোক্ষে সমর্থন জানিয়ে আফিমের উপকারিতা এবং আসামে আফিম চাষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য Lord Brassey-র নেতৃত্বে গঠিত Royal Commission on Opium-এর সামনে

'জোড়হাট সার্বজনিক সভা' যে দীর্ঘ প্রতিবেদনটি জমা দিয়েছিল তার মর্মকথা ছিল এইরকম ঃ

(১) স্মরণাতীত কাল থেকে আসামের মানুষ আফিম ব্যবহারে অভ্যস্ত। আফিম পেটের পক্ষে এবং ম্যালেরিয়া-প্রবণ এলাকায় মহৌষধ, বিশেষত ৪০ বছর বয়সের পরে এবং স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে এবং আয়ু বাড়াতে সাহায্য করে। 'সার্বজনিক সভা'র ভাষায় ঃ

That the people of Assam, in common with those of other provinces of India, have been in the habit of using opium and other narcotics from the remotest times. Opium is an invaluable medicine in many disorders of the stomach; it alleviates pain and possesses a sedative power of restoring health. It is useful after 40 years of age in prolonging life and is an undoubted preventive against malaria. The hard-working classes in the malarious plains of Assam require some stimulant to keep up their powers. On the whole, opium taken in a moderate quantity is beneficial, and positively necessary for a large number of people earning their livelihood by manual labour in the swampy rice fields and in the tea gardens of Assam and of boatmen and others.

(এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এরই জন্য এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হল।)

(২) আসামের পাহাড়ি উপজাতিরা অনেক বেশি আফিম সেবন করে, এজন্য জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু হওয়া সত্ত্বেও তাদের রোগ হয় না এবং বিলেতি ওষুধ গ্রহণ করতে হয় না। একই কথা আফিম সেবী এবং অত্যন্ত সুঠাম দেহের অধিকারী ভারতের শিখ, রাজপুত প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

(৩) যেভাবে আসামে আফিম চাষ হঠাৎ করে ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করেছে তার বিরোধিতা করে 'সার্বজনিক সভা' মন্তব্য করেছিল এর ফলে প্রজার জীবন-জীবিকায় ব্যাপক প্রভাব পড়বে এবং দুর্দশা বাড়বে কারণ আফিমের জন্য বিশাল জমি অন্য ফসল উৎপাদনের পক্ষে অযোগ্য। 'সার্বজনিক সভা'র ভাষায় ঃ

...That the prohibition of the cultivation of opium will deprive a large number of Her Majesty's subjects of the means of livelihood, and set free a large quantity of land which would be unfit for other

purposes, the misery and distress thereby caused to the people concerned being very serious indeed.

(৪) যদিও চিনে আফিমকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও 'আফিম যুদ্ধ'কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সহ পৃথিবীর বিবেকবান প্রতিটি মানুষ একদিন ধিক্কার জানিয়েছিলেন, 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা' কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিতে সমগ্র ঘটনাটির মূল্যায়ন করেছিল। সভার মতে, ভারতীয় আফিম চিনে রপ্তানি বন্ধ হলে শুধু যে ব্রিটিশ শক্তির বাৎসরিক সাত কোটি টাকা আয়ের উৎস বন্ধ হবে তাই নয়, পারস্য এবং অন্যান্য দেশের আফিম চিনের বাজার দখল করবে এবং ঐসব নিম্নমানের আফিম নিয়েই চিনাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

(৫) আসামে আফিম চাষ নিষিদ্ধ করে যেভাবে ব্রিটিশ শক্তি ভারতের অন্যান্য স্থানে উৎপাদিত আফিম আসামে একচেটিয়াভাবে বিক্রির ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছিল, সেটি বন্ধের দাবিকে 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা' অগ্রাহ্য করেছিল। সভার বক্তব্য ছিল, আফিম বিক্রয় হঠাৎ বন্ধ করে দিলে শুধু যে ঐ নেশায় আসক্ত বৃদ্ধ প্রভৃতিদের মৃত্যু অনিবার্য তাই নয়, একটা বড়ো অংশ মদ, গাঁজা, ভাং ইত্যাদির দিকে ঝুঁকবে যেটি হবে এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে আরও বিপজ্জনক।

(৬) আফিম বিক্রয় করে আসাম থেকে ব্রিটিশ শক্তি প্রভূত রাজস্ব আদায় করছিল এবং এটি বন্ধ হয়ে গেল ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ক্ষতিপূরণের জন্য ভূমি-রাজস্ব সহ অন্যান্য রাজস্ব, যেটি ইতিমধ্যে চরমে উঠেছে, আরও বৃদ্ধির উদ্যোগ নেবে এবং এটি হলে মানুষের দুঃখদুর্দশা ও অসন্তোষ আরও সম্প্রসারিত হবে। 'সার্বজনিক সভা'র ভাষায় ঃ

> *That the taxation of the people of India has reached the highest possible limit, and that no further addition can be made to it without generating serious distress and discontent....*

এরই জন্য 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা' আফিম-সংক্রান্ত ব্রিটিশ নীতিকে সমর্থন জানিয়েছিল। সভার মতে ঃ

> *That the policy hitherto pursued by the British Government in respect of opium is the sourdest imaginable...In the opinion of the people of this province there is no reason whatever to make any departure from the policy....*

এইভাবে আমরা দেখি, যদিও চারিদিকে সমালোচনার ঝড়ের মুখে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বাধ্য হয়েছিল ভারতে আফিম সংক্রান্ত ব্যাপারে পর্যালোচনার জন্য

একটি Royal Commission গঠন করতে, কিন্তু কার্যত এই কমিশন অশ্বডিম্ব প্রসব করল। 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'র মতো প্রতিষ্ঠান লিখিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়ে দিল যে, আফিম-সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রিটিশ নীতির মধ্যে ত্রুটি নেই এবং এটি অব্যাহত রাখার প্রয়োজন আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এইভাবে 'সার্বজনিক সভা'র মদতপুষ্ট হয়ে আফিম সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের সঠিক নীতি প্রচারে গুরুত্ব দিতে শুরু করল।

'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'র এই বক্তব্যের পরেও আসামের উদীয়মান বুদ্ধিজীবীদের একটি বড়ো অংশ আফিমের বিষময় ফল সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার কাজে কোনো গলদ রাখেননি। অমলেন্দু গুহ তাঁর "Imperialism of Opium : Its Ugly face in Assam (1773-1921)" গবেষণা পত্রে উল্লেখ করেছেন কীভাবে 'কানি নিবারণী সভা' সমগ্র আসামে তার শাখা বিস্তার করেছিল এবং গান্ধিজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১-২২) সময় আফিমের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযানের ফলে আসামের সমাজে আফিম সেবনের তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। (আফিম সংক্রান্ত ব্যাপারে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় ৫.২.৬ দ্রষ্টব্য)।

১৯০৭ সালে জগন্নাথ বরুয়ার মৃত্যুর পর 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা' ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' এর স্থান দখল করে।

২০.৩ আসাম অ্যাসোসিয়েশন (Assam Association)

জগন্নাথ বরুয়া, দেবীচরণ বরুয়া শুধু যে 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'র সাথে জড়িত ছিলেন তা নয়, 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠার সাথেও জড়িত ছিলেন। এঁদের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন মানিকচন্দ্র বরুয়া, প্রভাতচন্দ্র বরুয়া, রাধানাথ চ্যাংকাকতি, মথুরামোহন বরুয়া, প্রসন্নকুমার ঘোষ, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, ঘনশ্যাম বরুয়া, ফৈজনুর আলি সহ প্রায় ৪০ জন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বুদ্ধিজীবী। আসলে, ১৯০৩ সালে, বঙ্গভঙ্গের দু'বছর আগে, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল-এর সদস্য Denzil Ibbertson-এর গুয়াহাটি সফরের সময় মাত্রাতিরিক্ত ভূমি-রাজস্বের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন তৈরির উদ্দেশ্যেই 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর জন্ম হয়েছিল। যদিও ১৯০৩ সালে সংগঠনটির প্রকৃতপক্ষে জন্ম হয়েছিল, তথাপি ঐ একই নামে গুয়াহাটিতে গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন ১৮৬৭ সালে একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করেছিলেন, যদিও ১৮৮০ সালে শিবসাগরে দীননাথ বেজবরুয়ার সভাপতিত্বে প্রথম সম্মেলনের পর সেটি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়। আসলে, বিভিন্ন

স্থানে শাখা সহ সমগ্র আসাম জুড়ে সংগঠনটি ১৯০৩ সালেই আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং প্রধান উদ্যোক্তা গৌরীপুরের প্রভাতচন্দ্র বরুয়ার সভাপতিত্বে ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে ডিব্রুগড়ে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যে ব্যক্তিটির অপরিসীম চেষ্টায় 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' সূর্যের আলো দেখেছিল সেই মানিকচন্দ্র বরুয়া আমৃত্যু (১৯১৫ পর্যন্ত) এবং ঘনশ্যাম বরুয়া পরবর্তী সময়ে ছিলেন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে। জগন্নাথ বরুয়া ছিলেন 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রথম সহ-সভাপতি। সংগঠনটির কেন্দ্রীয় অফিস গুয়াহাটিতে থাকলেও, সভাপতি প্রভাতচন্দ্র বরুয়া গৌরীপুর ও কলকাতা থেকেই তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'র প্রাণ যেমন ছিলেন জগন্নাথ বরুয়া ঠিক তেমনি মানিকচন্দ্র বরুয়াকে কেন্দ্র করেই 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর কাজকর্ম আবর্তিত হত। এরই জন্য 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর যৌবনকাল ১৯০৩ থেকে ১৯১৫-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কারণ ১৯১৫-তে মানিকচন্দ্র বরুয়ার (১৭.৫৫ দ্রষ্টব্য) মৃত্যুর পর সংগঠনটিতে নতুন যুব নেতৃত্ব আসা সত্ত্বেও ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' এমন একটা সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যখন কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে আকাশ-বাতাস ছিল রীতিমতো তপ্ত। আসামের দুই উপত্যকায় (ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা) তখন প্রতিবাদের ঝড়। তবে **সুরমা উপত্যকায় 'স্বদেশী সভা', 'শ্রীহট্ট স্বদেশী সেবক সমিতি' এবং সর্বোপরি 'Surma Valley Association'** প্রভৃতি সভা-সমিতি-সংগঠনের মাধ্যমে ঝড় যতটা তীব্র আকার ধারণ করেছিল, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সেই তুলনায় কিছুটা কম। আসামের প্রাক্তন চিফ্ কমিশনার Sir Henry Cotton (যাঁর নামে গুয়াহাটির বিখ্যাত কলেজটি প্রতিষ্ঠিত) কলকাতার টাউন হল-এ একটি বড়ো সভায় বঙ্গভঙ্গের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সর্বত্র তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেইসময় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায়—*The Advocate of Assam* এবং *আসাম বন্টিতে*—ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করে ধারাবাহিকভাবে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া (১৭.৩৭ দ্রষ্টব্য) *আসাম বন্টি* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে আসামের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেভাবে বিলুপ্ত হতে যাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'কে পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে আসামের তৎকালীন চিফ্ কমিশনার (১৯০২-১৯০৫) জে. বি. ফুলার 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর অভিমত চেয়েছিলেন। আসামকে যেভাবে পূর্ববঙ্গের সাথে

একত্র করে এবং ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করে একটি নতুন প্রদেশের নীল্-নকশা আঁকা হয়েছিল তার বিরোধিতা 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' করলেও কিছু ব্যাপারে সংগঠনের শাখাসমূহের মধ্যে ভিন্ন মতামত ছিল। যেমন, 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর ডিব্রুগড় শাখার মতে, সামুদ্রিক পথের সুবিধা পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র চট্টগ্রামকে যদি আসামের সাথে যুক্ত করা হয় তাহলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যদিকে, অ্যাসোসিয়েশন-এর গোয়ালপাড়া শাখা মনে করত, সরকারি যুক্তি অনুযায়ী বিশাল বঙ্গকে কার্যকরীভাবে শাসন যদি সত্যিই অসুবিধাজনক হয় তাহলে রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং বগুড়া জেলার কিছুটা আসামের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। যাইহোক, সংগঠনের অভ্যন্তরে নানারকম মতামত সত্ত্বেও 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' খুবই স্পষ্টভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল যে, যতই প্রচার করা হোক্, বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে বৃহত্তর আসামের জন্ম হবে এবং আসামের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকবে, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ঘটনাক্রম ও উদ্দেশ্য ছিল বিপরীত। সুতরাং হেনরি কটন এবং পদ্মনাথ গোঁহাই-এর পরামর্শ অনুযায়ী, সামগ্রিকভাবে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এইসব বিরোধিতা অগ্রাহ্য করেই ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাকে দু'ভাগে ভাগ করলেন এবং আসামকে পূর্ববঙ্গের সাথে জুড়ে দিলেন। শিলং থেকে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হল। 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর পূর্ববাংলা ও আসামের প্রাদেশিক কাউন্সিলে ঐ সংগঠনের প্রতিনিধিত্বের জন্য একটি সংরক্ষিত আসনের দাবিও খারিজ হয়ে গিয়েছিল। মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কারের (১৯০৯) সময় ঐ একই দাবিতে সোচ্চার হয়ে সংগঠনের সভাপতি প্রভাতচন্দ্র বরুয়া কলকাতায় 'সেক্রেটারি অব স্টেট্'-এর কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। ঐ সময় দাবিটিকে কিছুটা মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, কারণ সম্পাদক মানিকচন্দ্র বরুয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকার 'লোক্যাল-বোর্ড'-এর প্রতিনিধি হিসেবে ১৯০৯ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্যপদে মনোনীত হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে 'স্বদেশি' আন্দোলনের প্রভাব ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ধুবরি ও গোয়ালপাড়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর জন্যই এটি সম্ভব হয়েছিল। যাইহোক, অসংখ্য প্রতিবাদের মুখোমুখি হয়ে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ, দুই বঙ্গের আবার ঐক্যবদ্ধ উপস্থিতি এবং আসামের স্বতন্ত্র মর্যাদা পুনঃস্থাপন ইত্যাদি ঘটনার পর সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একটি গুণগত পরিবর্তন আসে এবং অসমিয়াদের দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' বেশ কিছুটা সরব হয়ে ওঠে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলন সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি (ধুবরি ও গোয়ালপাড়া ব্যতিরেকে) এবং প্রথমদিকে নরমপন্থী মানসিকতায় পুষ্ট 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর নেতৃবৃন্দ নানা প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ১৯১২ সালে আসামে চিফ্-কমিশনারের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর ১৪ জন সরকারি এবং ১১ জন বেসরকারি সদস্য নিয়ে গঠিত প্রাদেশিক আইন পরিষদে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর কর্মকর্তারা—যেমন, মানিকচন্দ্র বরুয়া, প্রভাতচন্দ্র বরুয়া, তরুণরাম ফুকন এবং ঘনশ্যাম বরুয়া—বেসরকারি সদস্যপদ লাভ করেছিলেন, যদিও 'অ্যাসোসিয়েশন'-এর সৌজন্যে নয় (বরং বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে)। এই বেসরকারি সদস্যরা আসামের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নানা প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধভাবে সরব হয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে সফল হয়েছিলেন। প্রথমদিকে সাংবিধানিক চৌহদ্দির মধ্যে থেকে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ১৯১৪ সালে আসাম কাউন্সিলে Local self-Government Bill আলোচনার সময় 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্যরা এককণ্ঠে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চা-বাগানের সাহেব মালিক ও সরকারি আমলাদের আধিপত্যের যবনিকা টেনে প্রকৃতই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রশ্নে সরব ভূমিকা পালন করেছিলেন। যদিও Council বা আসাম আইন পরিষদে সরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এইসব দাবি সেদিন গ্রাহ্য হয়নি, তথাপি সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রশ্নে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্যদের রাজনৈতিক দাবি ও বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। Goalpara Tenancy Bill আলোচনার সময় জমিদারি এস্টেটগুলিতে 'রায়ত'-এর প্রতিনিধিত্বের দাবি, কিংবা Assam Land and Revenue Regulation-এর সংশোধনী আলোচনার সময় 'রায়ত'-এর অধিকার এবং বকেয়া খাজনার জন্য 'রায়ত'-এর অধিগৃহীত জমি 'রায়ত'কে ফিরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ও দাবি সাধারণ মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

আসামে আফিমকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার দাবিতে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' সোচ্চার ছিল। এখানে 'জোড়হাট সার্বজনিক সভা'র সাথে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর দৃষ্টিভঙ্গির তফাত লক্ষ করা যায়। ১৯১৯-এর পর বাজেট সংক্রান্ত বক্তৃতায় 'অ্যাসোসিয়েশন'-এর নেতা ফণিধর চালিহা ব্রিটিশ সরকার আফিম থেকে যে বিপুল রাজস্ব আদায় করত, সেটিকে 'কলঙ্কিত অর্থ' বা 'tainted money' আখ্যা

দিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে ডিব্রুগড় অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে নবীনচন্দ্র বরদোলই (১৭.৩৫ দ্রষ্টব্য)—(যদিও পরের বছর তিনি সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন)—সংগঠনটিকে চাঙ্গা করার জন্য আওয়াজ তুলেছিলেন ঃ "Organise, Knock at the door and you find the door opened"। আসলে, প্রথমদিকে নির্ভেজাল, সাংবিধানিক চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর মঞ্চে শেষদিকে যুবকদের প্রাধান্যহেতু কিছুটা জঙ্গিপনা লক্ষ করা যায়। যদিও সংগঠনটির প্রতি বছর নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত অধিবেশন হত না এবং নানারকম সাংগঠনিক দুর্বলতা ছিল, তথাপি 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক শিক্ষা নিয়েই নবীনচন্দ্র বরদোলই, তরুণরাম ফুকন (১৭.৩১ দ্রষ্টব্য), গোপীনাথ বরদোলই (১৭.২০ দ্রষ্টব্য), চন্দ্রনাথ শর্মা প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা পরবর্তী সময়ে পাদ-প্রদীপের আলোর সামনে এসেছিলেন।

গোয়ালপাড়া জেলাকে আসাম থেকে ছিন্ন করে বঙ্গদেশের সাথে যুক্ত করার যে প্রস্তাব ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রায় গ্রহণ করতে যাচ্ছিল, 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর সময়মতো বিরোধিতা ও হস্তক্ষেপের ফলে সেটি কার্যকরী করা যায়নি। ১৯১৮ সালে 'অ্যাসোসিয়েশন'-এর গোয়ালপাড়া অধিবেশনের সভাপতি তরুণরাম ফুকন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, সমগ্র আসাম প্রয়োজন হলে বঙ্গদেশের সাথে যুক্ত হতে পারে, কিন্তু গোয়ালপাড়া জেলাকে আসাম থেকে ছিন্ন করা বরদাস্ত করা হবে না। এইরকম তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে ব্রিটিশ শক্তি পিছু হটতে বাধ্য হয়।

একই সময়ে ভাইসরয় চেমস্‌ফোর্ড এবং ভারত-সচিব মন্টেগু কর্তৃক ভারতের শাসন সংস্কারের খসড়া তৈরির প্রস্তুতিপর্বে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' সংগত কারণেই সন্দেহ করেছিল যে, আসামকে এই শাসন সংস্কারের আওতার বাইরে রাখা হতে পারে, কারণ আসামের বেশ কিছু স্বার্থান্বেষী ও সাম্প্রদায়িক চক্র সেটিই চাইছিল। ১৯১৭ সালে কলকাতায় পার্লামেন্টারি কমিটি ও ভারত-সচিব মন্টেগু'র সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' প্রসন্নকুমার বরুয়ার নেতৃত্বে একটি বড়ো প্রতিনিধিদল পাঠায় (প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য ছিলেন ঘনশ্যাম বরুয়া, গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন, তরুণরাম ফুকন, নবীনচন্দ্র বরদোলই, পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া এবং চন্দ্রধর বরুয়া। প্রতিনিধিদের মূল বক্তব্য ছিল, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতোই যেন আসাম মর্যাদা পায় এবং সেখানে যেন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের পথে কোনো বাধা না থাকে। কিন্তু কোনো স্পষ্ট আশ্বাস না মেলায় 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' দুইজন প্রতিনিধিকে (প্রসন্নকুমার

বরুয়া এবং নবীনচন্দ্র বরদোলই) লন্ডনে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ দুইজন প্রতিনিধি লন্ডনে 'সিলেক্ট কমিটি'র চেয়ারম্যান Lord Selbourne এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে আসামের ন্যায্য দাবির যৌক্তিকতা বোঝাতে সক্ষম হন। এটি ছিল 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর একটি বড়ো জয়। ১৯১৯-এর মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারে আসামের উল্লেখ থাকলেও, ১৯২০-র সেপ্টেম্বরে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সমগ্র সংস্কার নীতিকে বাতিল করে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে 'অসহযোগ আন্দোলন'-এর ডাক ওঠার সাথে সাথে রাজনৈতিক মানচিত্রে গুণগত পরিবর্তন শুরু হয়।

যদিও ১৯১৬ সাল থেকে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রতিনিধি পাঠাতে শুরু করে, ১৯১৯ সালে সর্বভারতীয় রাজনীতির স্তরে বড়ো বড়ো তিনটি ঘটনা—রাওলাট আইন ও সত্যাগ্রহ, খিলাফৎ আন্দোলন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ক্ষুদ্র প্রাদেশিক রাজনীতির সীমানা থেকে সর্বভারতীয় রাজনীতির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে সাহায্য করে। ১৯২০-তে নাগপুরে জাতীয় কংগ্রেসের ৩৫ তম অধিবেশনে এবং একই সালে কলকাতায় বিশেষ অধিবেশনে গান্ধিজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের আওয়াজ এবং ১৯২১ সালে গান্ধিজির প্রথম আসাম সফর অসমিয়া রাজনৈতিক চেতনাকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল পরবর্তী অধ্যায়ে সেটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে। ১৯২১ সালে তেজপুরে অনুষ্ঠিত 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতি প্রসন্নকুমার বরুয়া গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি সর্বতোভাবে গ্রহণ করে জাতীয় কংগ্রেসের সাথে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'কে একীভূত করার আহ্বান রাখেন। যদিও সেই আহ্বান সংগঠনের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত করেছিল এবং একটি অংশ অবশেষে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল, তথাপি সভাপতির আহ্বান অনুযায়ী, অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করেছিল এবং যুবকদের একটা বড়ো অংশ 'স্বরাজ'-এর ডাক দিয়ে সমগ্র ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করার সংকল্প নিয়েছিলেন। এইভাবে দেখা যায়, প্রথমদিকে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' শুধুমাত্র আসামের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সাংবিধানিক চৌহদ্দির মধ্যে যাত্রা শুরু করলেও, পরবর্তী সময়ে বিশেষত ১৯১৯-এর অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শুধু আসাম নয়, সমগ্র দেশের স্বার্থের প্রশ্নে গুরুত্ব আরোপে অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং **রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে ছোটো**

থেকে বড়ো জাতীয়তাবাদের অঙ্গনে এইভাবে উত্তরণ ঘটল। সংগঠনের অতীত অবদানের কথা স্মরণে রেখে দেশে ও বিদেশে প্রবাসী অসমিয়ারা আজও 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর বিভিন্ন শাখার নামে নিজেরা মিলিত হন।

২০.৪ আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন (American Baptist Mission)

মধ্যযুগের আবর্ত থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের ক্ষেত্রে আসামে দুটি প্রভাব লক্ষণীয় ঃ (১) বাংলার 'নবজাগরণ' (ষষ্ঠদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং (২) আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের কার্যাবলী। আসামে খ্রিস্টান মিশনারিদের কাজকর্ম ডেভিড স্কটের আমলেই শুরু হয়েছিল। ডেভিড্ স্কটের আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৮২৯ সালে শ্রীরামপুর মিশন James Rae-কে গুয়াহাটিতে পাঠিয়েছিল এবং অসমিয়া ভাষায় (সংস্কৃত-ঘেঁষা) 'বাইবেল' গ্রন্থটির অনুবাদও হয়েছিল। কিন্তু অসমিয়া সমাজে খ্রিস্টধর্মের আকর্ষণ তেমন দাগ কাটতে পারেনি। উপযুক্ত সমর্থনপুষ্ট না হওয়ার ফলে শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগ তেমন সফল হয়নি। ডেভিড স্কটের পর ফ্রান্সিস জেন্‌কিনস্ আসামের কমিশনারের পদ গ্রহণ করার পর থেকেই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন শুরু হল। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে জেন্‌কিনস্ ব্যক্তিগত উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Home Board-এর সাথে যোগাযোগ করে এবং আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে American Baptist Foreign Mission Society-কে আসামে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আসাম সীমান্তের বিদ্রোহী খামতি ও সিংফো উপজাতিকে কিছুটা প্রশমিত করার উদ্দেশ্যেই জেন্‌কিনস্ আমেরিকার ব্যাপটিস্ট মিশনকে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ১৮৬৬ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত জেন্‌কিনস্ ছিলেন আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রধান প্রবক্তা। অন্যদিকে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) হয়ে চিনকে খ্রিস্টধর্মের আওতায় আনা, আসাম বা উত্তর-পূর্ব ভারত মিশনের নজরে প্রথমদিকে তেমন গুরুত্ব পায়নি। যাইহোক, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষের, প্রধানত আসামের কমিশনার ফ্রান্সিস জেন্‌কিনস্-এর, আগ্রহের জন্যই আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন আসামের মাটিতে পা রেখেছিল।

১৮৩৬ সালে প্রথমে Nathan Brown এবং Oliver Cutter এবং এরপর Miles Bronson, A. H. Danforth, C. Barker, W. J. Ward, A. K. Gurney প্রভৃতি আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা একে একে আপার-আসামে সমবেত হতে শুরু করেন। মাইলস্ ব্রন্‌সন্ নওগাঁও এলাকায় প্রথম যে অসমিয়াকে খ্রিস্টধর্মে

দীক্ষিত করতে সক্ষম হন তাঁর নাম ছিল নিধিরাম—পরবর্তী সময়ে যিনি Nidhi Levi Farwell নামে পরিচিত। যেহেতু সমতলের অসমিয়াদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রতি তেমন অনুরাগ মিশনারিরা সৃষ্টি করতে পারেননি এরই জন্য পাহাড়ি জনগোষ্ঠী—বিশেষত নাগা, খাসি, গারো ইত্যাদি উপজাতিদের মধ্যেই ধর্মপ্রচারের কাজ প্রসারণে তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

ইংরাজির স্থলে মানুষের মুখের ভাষায় ধর্মকাহিনি প্রচারের উদ্দেশ্যেই মিশনারিরা স্থানীয় ভাষা আয়ত্ত করেন এবং সেই সূত্রে উপরোক্ত ভাষাকে বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রন্থিত করতে ব্যাকরণ, অভিধান সহ নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এইভাবে অসমিয়া ভাষার যাত্রাপথের দিক্‌নির্দেশ—বিশেষত *অরুণোদয়* পত্রিকার আত্মপ্রকাশ আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের মারফত হয়েছিল। যদিও বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া (১৭.৪৬ দ্রষ্টব্য) অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমেরিকান মিশনারিদের অবদানকে artificial এবং lacked originality ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করে সমালোচনা করেছেন, তথাপি মধ্যযুগীয় আধিভৌতিক মানসিকতা থেকে অসমিয়া মননকে মুক্ত করার প্রশ্নে মিশনারিদের সাহিত্যকর্ম যে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিল, এটি অস্বীকার করা কঠিন। ডিম্বেশ্বর নিয়োগ (১৭.৩০ দ্রষ্টব্য)-এর ভাষায় : *The Missionaries 'not only liberated the spirit of the Assamese from the bondage of old-world ideas in the domain of thought, but they also removed the confines of the language and made it quite suitable for modern use'.*

নাথান ব্রাউন ও মাইলস্ ব্রন্‌সন্ (যাঁদের অবদানের কথা স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হয়েছে) ছাড়াও যেসব খ্রিস্টীয় ধর্মযাজক এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে William Robinson-এর *Grammar of Assamese Language* (১৮৩৯), S. R. Ward-এর *Anglo-Assamese Vocabulary* (১৮৬৪), H. B. L. Cutter-এর *Anglo-Assamese Phrases* (১৮৭৭), A. K. Gurney-এর *কামিণীকান্ত* (১৮৭৭), Mrs. Gurney-র *ফুলমতি আরু করুণাকান্ত* (১৮৭৭) ইত্যাদি ছাড়াও অসমিয়া ভাষায় দেশ-বিদেশের নানারকম গল্পের বই সমধিক প্রসিদ্ধ। এমনকি Nidhi Levi Farwell সংস্কৃত ও বাংলার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই—যেমন, *ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন* এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কিছু অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। আসামে ছাপাখানা প্রবর্তন থেকে শুরু করে প্রথম মাসিক পত্রিকা প্রকাশ সবই আমেরিকান মিশনারিদের

পাশ্চাত্য-শিক্ষিত মিশনারিদের সংস্পর্শে এসে মহিলাদের সম্পর্কে অসমিয়াদের মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে এতদিনের অনাগ্রহ প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হল। যদিও বঙ্গদেশের মতো সতীদাহ বা কুলীনপ্রথা ইত্যাদি থেকে অসমিয়া সমাজ কিছুটা মুক্ত ছিল, তথাপি বাল্য-বিবাহ, অশিক্ষা, বৈধব্যের যন্ত্রণা, পুরুষের বহু বিবাহ ইত্যাদি ব্যাধি যথারীতি ছিল। আসামে নারীমুক্তির প্রশ্নে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের স্ত্রী ও কন্যাদের (যেমন, মিসেস্ Bronson, Keeler, Brandt কিংবা Pursell Sisters বা নওগাঁও-এ মিস্ Amy অথবা গুয়াহাটিতে মিস্ Rankin এবং Sweet)-এর অবদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে শীলা বোরা তাঁর প্রবন্ধে ('Impact of the American Missionaries on the Women of North-East India 1836-1900') মন্তব্য করেছেন ঃ

> *They had brought a certain social perspective from newly independent America which had much to do with their crusade against the degradation of women. From the beginning, the missionaries, especially the missionary wives were so interested in the condition of women that emancipation of women appreared to have been one of their main objectives. Their genuine concern for the women of Assam was expressed in their letters and reports and books and consquently they acted in various ways to improve the status of women.*

অনেক আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের মধ্যে মাত্র দু'জনের (নাথান ব্রাউন ও মাইলস্ ব্রন্‌সন্) অবদান নীচে উল্লেখ করা হল।

২০.৪.১ নাথান ব্রাউন (Nathan Brown, 1807-1886)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশ্যায়ার রাজ্যে ১৮০৭ সালের ২২ জুন জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৭ সালে উইলিয়ামস্ কলেজ থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে তিনি স্নাতক হন। কিছুদিন শিক্ষকতা ও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনার পর ১৮৩৩ সালে এলিজা ব্যালার্ড-এর সাথে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আমেরিকান মিশনারি কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৩৩ সালে প্রথমে তিনি ব্রহ্মদেশ বা বর্তমান মায়ানমারে যান। আসামের কমিশনার ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস্ জেন্‌কিন্স-এর বিশেষ অনুরোধে তিনি আসামে আসেন। আসার সময় একটি ছাপা যন্ত্রও সাথে এনেছিলেন। Oliver Cutter এবং অন্যান্যদের সাথে কলকাতা থেকে সাদিয়া পর্যন্ত বিঘ্ন-সংকুল জলপথে বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে

১৮৩৬ সালের ২৩ মার্চ অবশেষে নাথান ব্রাউন সাদিয়া অবতরণ করেন। উপযুক্ত স্থান সন্ধানে ১৮৩৯-এ তিনি নাহারকাটিয়া অঞ্চলেও ছিলেন। অবশেষে ১৮৪৩ সালে শিবসাগরে আসার পর জায়গাটি ব্রাউনের খুব পছন্দ হয় এবং শিবসাগর থেকেই তিনি তাঁর সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। জলপথ ছাড়াও হাঁটাপথে দীর্ঘদিন গ্রামের ভিতর দিয়ে পরিভ্রমণ করতে করতে শিবসাগর থেকে গুয়াহাটি চলে আসতেন। প্রধানত নাথান ব্রাউন, মাইলস্ ব্রনসন (Miles Bronson) এবং সাইরাস্ বার্কার (Cyrus Barker)-এর উদ্যোগেই গুয়াহাটির পানবাজারে ১৮৪৫ সালে প্রথম ব্যাপটিস্ট চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টধর্ম প্রচার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলেও Nathan Brown এবং Oliver Cutter ১৮৩৭ সালে সাদিয়া অঞ্চলে মাত্র কুড়িজন ছাত্র সংগ্রহ করে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৫ সালে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের উদ্যোগে নওগাঁও-এ তিনটি, কামরূপে পাঁচটি এবং শিবসাগরে চোদ্দটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রাউন বিশ্বাস করতেন, সকলের কাছে বোধগম্য ভাষায় 'বাইবেল' প্রচার করার স্বার্থেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরি। মায়ানমারে অবস্থানকালে বর্মী ভাষায় 'বাইবেল' অনুবাদের কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেটি অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে আসামে ছুটে আসতে হয়।

অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য নাথান ব্রাউন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আসামে প্রথম ছাপাখানা প্রবর্তনের কৃতিত্ব তাঁরই। শিবসাগরের কথ্য ভাষাকেই তিনি অসমিয়া মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। ১৮৩৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে আসামে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রাউনের নেতৃত্বে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন এই ক্ষেত্রে কোম্পানির নীতির বিরোধিতায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে অবশেষে ১৮৭৩ সালে অসমিয়া ভাষাকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যদিও সেই সময় ব্রাউন আসামে ছিলেন না। ১৮৪৮ সালে নাথান ব্রাউন প্রথম অসমিয়া ব্যাকরণ রচনা করেন। যেহেতু অসমিয়া ভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রায় অনুপস্থিত ছিল, এরই জন্য নাথান ব্রাউন তাঁর স্ত্রী এলিজার সহযোগিতায় প্রাথমিক অঙ্কশাস্ত্র থেকে শুরু করে ভূগোলবৃত্তান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে অসমিয়া ভাষায় স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। প্রধানত ব্রাউনের উদ্যোগেই ১৮৪৬ সাল থেকে আসামের প্রথম মাসিক পত্রিকা *অরুণোদয়*-এর প্রকাশনা শুরু হয়, যেটির জন্য আজও তিনি অসমিয়া মননে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন দখল করে আছেন। ১৮৫০ সালে জরুরি তলব পেয়ে ব্রাউনকে আমেরিকা ফিরে যেতে হয়। তাঁর অসমাপ্ত অনেক কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব আমেরিকান বাপটিস্ট মিশনের অন্যান্য

সদস্যরা গ্রহণ করেন। তবে আমেরিকায় ফিরে যাবার আগে অসমিয়া ভাষায় 'নিউ টেস্টামেন্ট' অনুবাদের কাজটি সম্পূর্ণ করে যান। এর আগে অবশ্য ১৮১৯ সালে কলকাতার সন্নিকটে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি অসমিয়া ভাষায় (যদিও সংস্কৃত ঘেঁষা) 'বাইবেল' প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সেই অনুবাদ তেমন আদৃত না হওয়ায় শিবসাগরের কথ্য ভাষার মাধ্যমে নাথান ব্রাউন অনুবাদের এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

২০.৪.২ মাইলস্ ব্রন্সন্ (Miles Bronson, 1812-1883)

'apostle to Assam', 'Vanguard of Assamese language' ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণে মাইলস্ ব্রন্সন্ বিভূষিত। ১৮১২ সালের ২২ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের কাছে তাঁর জন্ম। হ্যামিলটন লিটারেচ্যার অ্যান্ড থিয়োলজিক্যাল কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে ডক্টর মাইলস্ ব্রন্সন্ আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারি ইউনিয়নে যোগদান করেন। নাথান ব্রাউন-এর পর আসামে খ্যাতিমান পাদ্রি হিসেবে ব্রন্সন্ অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। সেদিনের বিঘ্নসংকুল জলপথে সপরিবারে রেভারেন্ড ব্রন্সন (স্ত্রী রুথ ব্রন্সন্, কন্যা মেরি ব্রন্সন) ১৮৩৭ সালের সাদিয়ার দিকে পাড়ি দিয়ে অনেক দুর্ঘটনার মুখোমুখি হন। পথেই প্রিয় কন্যা মেরি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান এবং গোয়ালপাড়ায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। সঙ্গী রেভারেন্ড জ্যাকব টমাসের মাথায় একটি বিশাল গাছ পড়ায় সাদিয়া পৌঁছানোর আগে তাঁরও জীবনাবসান হয়। ম্যালেরিয়া/কালাজ্বর ইত্যাদি মহামারি সেদিনের আসামে ছিল নিত্যসঙ্গী। এইসব বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই মাইলস্ ব্রন্সন্-এর মতো পাশ্চাত্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁদের আদর্শের জন্য সুদূর আসামে নিজেদের জীবন নিবেদন করেছিলেন। ব্রন্সন্ অবশ্য নওগাঁও অঞ্চলেই জীবনের বেশিরভাগ সময়টা কাটিয়েছিলেন। আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছাড়াও ১৮৪৬ সালে নওগাঁও-এ অনাথদের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তিনি উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। দীর্ঘ ৪২ বছর তিনি আসামে ছিলেন এবং প্রধানত উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে সাফল্যলাভ করেছিলেন। ১৮৮৩ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

অভিধান রচনা

অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্যের 'পিতা' হিসাবে অনেক সময় মাইলস্ ব্রন্সন্-কে আখ্যায়িত করা হয়। নাথান ব্রাউন-এর সাথে মর্যাদাপূর্ণ *অরুণোদয়* পত্রিকায় তাঁর

উল্লেখযোগ্য অবদান ছাড়াও যে কারণে মাইলস্ ব্রন্‌সন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সেটি হল তাঁর দীর্ঘ ১২ বছরের পরিশ্রম লব্ধ ১৪,০০০ শব্দ-বিশিষ্ট **'অসমিয়া আরু ইংরাজি অভিধান'** যেটি ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় ইংরাজি ও অসমিয়া কথ্য ভাষার উপর নির্ভর করে এইরকম অভিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা দুঃসাধ্য বলেই মনে হত (যদিও বর্তমানে এই গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য)। এই অভিধান প্রকাশিত হওয়ার ৩৩ বছর পরে, অর্থাৎ ১৯০০ সালে, ২২,৩৪৬টি শব্দ-বিশিষ্ট হেমচন্দ্র বরুয়ার (১৭.৭৪ দ্রষ্টব্য) অভিধান **'হেমকোষ'** প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশিত হওয়ার ৩২ বছর পরে, ১৯৩৩ সালে, 'অসম সাহিত্য সভা'র উদ্যোগে ৩৬,৮১৬ শব্দ বিশিষ্ট **'চন্দ্রকান্ত অভিধান'** প্রকাশিত হয়। অবশেষে ১৯৭৭ সালে অসম প্রকাশন পরিষদ-এর উদ্যোগে মহেশ্বর নিয়োগ (১৭.৫৩ দ্রষ্টব্য), নবকান্ত বরুয়া (১৭.৩৪ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি পণ্ডিতদের সম্পাদিত **'আধুনিক অসমিয়া অভিধান'** প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে এত গুরুত্বপূর্ণ অসমিয়া অভিধান প্রকাশের পথিকৃৎ কিন্তু ছিলেন মাইলস্ ব্রন্‌সন্।

২০.৫ সুরমা ভ্যালি (Surma Valley Association)

১৮৭৪ সালে অবিভক্ত বঙ্গের অন্যতম প্রধান অঙ্গ সিলেট/শ্রীহট্টকে বঙ্গদেশ থেকে ছিন্ন করে আসামের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল এবং **ব্রিটিশ-ভারতে সেটিই ছিল প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গ**। এর বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রতিবাদ ধ্বনিত হলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করেনি। ১৯০৫-এ কার্জনের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের সময় এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনের সময় সিলেটকে পূর্ববঙ্গের অন্য জেলা হিসেবেই গণ্য করা হত। বঙ্গভঙ্গ বাতিল হবার পর ১৯১২ সালে সিলেটকে আবার আসামের সাথে যুক্ত করা হল। অবশেষে স্বাধীনতার প্রাক-লগ্নে ভারতভাগ উপলক্ষ্যে 'সিলেট রেফারেন্ডাম্' এর মাধ্যমে জেলাটিকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হল। শ্রীহট্টকে 'সুন্দরী শ্রীভূমি' আখ্যা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একসময় লিখেছিলেন ঃ

মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।

সিলেট ও কাছাড় একত্রে এক সময় 'সুরমা উপত্যকা' হিসেবেই পরিচিত ছিল। কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মঞ্চ হিসেবে **'সুরমা ভ্যালি**

অ্যাসোসিয়েশন' (**'সুরমা ভ্যালি পলিটিক্যাল কনফারেন্স'** হিসেবেও পরিচিত) ১৯০৬ সালে 'স্বদেশি' আন্দোলনের ধ্বনির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এটির জন্মের কিছুদিন আগে **'শ্রীহট্ট স্বদেশ সেবক সমিতি', 'কাছাড় স্বদেশি সভা'**, সুনামগঞ্জের **'মাহিষ্য সমিতি'** ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামের সংগঠন প্রতিবাদী মঞ্চ হিসেবে তৈরি হয়েছিল। 'সুরমা ভ্যালি অ্যাসোসিয়েশন' গঠনের প্রধান উদ্যোগ কিন্তু এসেছিল 'শ্রীহট্ট স্বদেশ সেবক সমিতি'-র পক্ষ থেকেই (সম্ভবত কাছাড়ের সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের লক্ষ্যে) এবং সমকালীন বুদ্ধিজীবী, জমিদার, ব্যবসাদার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ সমিতির এই উদ্যোগকে বিপুলভাবে সমর্থন করেছিলেন। উপরোক্ত দুটি সংগঠন ঃ 'শ্রীহট্ট স্বদেশ সেবক সমিতি' এবং 'কাছাড় স্বদেশি সভা' নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলীন করে 'অ্যাসোসিয়েশন'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

১৯০৬ সালের ১১-১২ আগস্ট সিলেটের তেলিহাত্তর জলশুকা এলাকায় কামিনীকুমার চন্দ'র (১৭.১২ দ্রষ্টব্য) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত **'সুরমা ভ্যালি পলিটিক্যাল কনফারেন্স'**-এর এক বিরাট সমাবেশ ও সভার মাধ্যমে 'অ্যাসোসিয়েশন' আত্মপ্রকাশ করেছিল। সংগঠনটির উদ্দেশ্য, লক্ষ ও সংবিধান তৈরির উদ্দেশ্যে ৬৯ জন সদস্য নিয়ে একটি শক্তিশালী 'সাবজেক্ট কমিটি' গঠিত হয়েছিল যার মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, কামিনীকুমার চন্দ, সুন্দরীমোহন দাস, সারদাচরণ শ্যাম, শ্রীশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কাবিহারী দাস, রাধাবিনোদ দাস, ইদ্রিস আলি চৌধুরি, মফুজ আলি চৌধুরি, সতীশচন্দ্র দত্ত, শরৎচন্দ্র চৌধুরি প্রভৃতি সমকালীন সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। যে সংবিধান তৈরি হয়েছিল তাতে সংগঠনটি গ্রাম, মহকুমা ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিভক্ত ছিল। সামগ্রিকভাবে মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়ন এবং বঙ্গভঙ্গ নাকচ সহ সর্বত্র 'স্বদেশি', 'বয়কট' ও 'স্বরাজ'-এর জাতীয়তাবাদী আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া ছিল মূল লক্ষ্য। সমগ্র সুরমা উপত্যকায় এক বিরাট উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল এই 'অ্যাসোসিয়েশন'। হবিগঞ্জ, বানিয়াচং, বদরপুর, করিমগঞ্জ, শিলচর প্রভৃতি এলাকায় একটার পর একটা সভার মাধ্যমে বিপিনচন্দ্র পাল সমগ্র সুরমা উপত্যকায় রাজনৈতিক ঝড় সৃষ্টি করলেন। একদিকে বিলেতি সামগ্রীর বহ্ন্যুৎসব এবং 'বয়কট' বা বর্জনের ডাক এবং অন্যদিকে 'স্বরাজ'-এর প্রকৃত অর্থ —এই নেতিবাচক এবং ইতিবাচক ধ্বনিতে সমগ্র সুরমা উপত্যকা সেদিন মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর, বঙ্গভঙ্গের একবছরে, 'সুরমা ভ্যালি অ্যাসোসিয়েশন'-এর ডাকে সিলেট, মৌলবি-বাজার, হবিগঞ্জ সহ সমগ্র বরাক উপত্যকায় হিন্দু-মুসলিম যৌথভাবে অরন্ধন, মিছিল, সভা ইত্যাদির

মাধ্যমে স্বদেশি জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ সেই সময় এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ১৯০৬ সালে কলকাতায় দাদাভাই নৌরজি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সুরমা উপত্যকা থেকে ৩৯জন যোগ দিয়েছিলেন।

কলকাতার National Council of Education-এর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুরমা উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। বিত্তশালী অনেক ব্যক্তির আর্থিক সাহায্যে একটি তহবিল গঠিত হয় এবং প্রথমে *Weekly Chronicle* পত্রিকার সম্পাদক শচীন্দ্র চন্দ্র সিংহ'র গৃহে যাত্রার সূত্রপাত করে (যদিও পরে সিলেট শহরের কাছে স্থানান্তরিত হয়)। ১৯০৮ সালের ১৮০২০ এপ্রিলে 'সুরমা ভ্যালি অ্যাসোসিয়েশন'-এর দ্বিতীয় সম্মেলন রাধাবিনোদ দাসের সভাপতিত্বে করিমগঞ্জ শহরে মণীমোহন দাসের গৃহে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সিলেটের হবিগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, বানিয়াচং, লাখাই প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকায় কলকাতার National Council of Education-এর পাঠক্রম অনুযায়ী কারিগরি ও আয়ুর্বেদ-এর উপর প্রাধান্য দিয়ে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়। একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব দিয়ে এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে শান্তিনিকেতনে একটি নতুন মডেল চালু করার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন, এবং কলকাতায় সতীশচন্দ্র মুখার্জি তাঁর 'ডন সোসাইটি'র মাধ্যমে চিরায়ত ও আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির মিশ্রণে জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য নতুন পাঠ্যতালিকা প্রণয়নে অনেককে আগ্রহান্বিত করছিলেন। 'স্বরাজ'-এর স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য জাতীয় মডেলের বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সেই সময় সুরমা উপত্যকায় ব্যাপ্ত হয়েছিল ; যদিও নানা কারণে কলকাতার মতোই এই উদ্যোগ সিলেট ও কাছাড়ে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

সংগঠনটির তৃতীয় অধিবেশন ১৯০৯ সালে হবিগঞ্জের জলসুকা গ্রামে শরৎচন্দ্র চৌধুরির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন প্রধান অতিথি। **যদিও প্রথম থেকেই 'সুরমা ভ্যালি অ্যাসোসিয়েশন'-এর সুর (বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি উদ্যোক্তাদের সৌজন্যে) কিছুটা চরমপন্থীদের মেজাজে বাঁধা ছিল ; তথাপি বিপ্লবী কাজকর্মের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না।** কিন্তু তৃতীয় অধিবেশনের পর যুব-মানসে উত্তেজনা লক্ষ করা যায়। ইতিমধ্যে 'স্বদেশি' আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভাঙার জন্য একদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নানারকম নির্যাতন মূলক বিধিনিষেধ এবং অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক অস্ত্র ব্যবহার করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে নষ্ট করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের নানা অপকৌশলের মুখোমুখি হওয়ার ফলে দিন দিন অবস্থা রীতিমতো জটিল আকার ধারণ করে। বঙ্গভঙ্গ পরিত্যক্ত হওয়ার

পর ১৯১২ সালে সুরমা উপত্যকাকে আবার আসামের সাথে যুক্ত করার বিরোধিতা করে **'সুরমা ভ্যালি পিউপিলস্ অ্যাসোসিয়েশন', 'সিলেট বেঙ্গল রি-ইউনিয়ন লিগ'** প্রভৃতি সংগঠন এই অন্যায়ের প্রতিবিধান চাইল এবং বিপ্লবী কাজকর্মও কিছুটা দানা বাঁধতে শুরু করল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর রাজনৈতিক পরিস্থিতির রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি নানা কারণে আরও সমস্যাকণ্টকিত হয়ে ওঠে। যুদ্ধজনিত কারণে **'সুরমা ভ্যালি অ্যাসোসিয়েশন'**-এর সম্মেলনও নিয়মিতভাবে হত না। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে সিলেটের সুনামগঞ্জে বিপিনচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে চতুর্থ সম্মেলন হয় এবং সৌকত আলি প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। ঐ সভায় খিলাফৎ সত্যাগ্রহের মাধ্যমে 'স্বরাজ'-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার শপথ গৃহীত হয়। একই বছরে অর্থাৎ ১৯২০ সালের ১৯-২০ সেপ্টেম্বর সিলেট শহরে আব্দুল করিম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সম্মেলনে সর্বশক্তি নিয়ে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেয়া হয়। মহাত্মা গান্ধি ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের আসাম সফরকে কেন্দ্র করে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ সমগ্র আসামকে সেদিন দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। কিন্তু ১৯২২ সালে চৌরি-চৌরা ঘটনার প্রেক্ষিতে যেভাবে মধ্যগগনে বিরাজমান অসহযোগ আন্দোলনকে গান্ধিজি হঠাৎ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং তাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে হতাশা নেমে এসেছিল, সুরমা উপত্যকা তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

'সুরমা ভ্যালি অ্যাসোসিয়েশন'-এর যুবগোষ্ঠীর বড়ো অংশে গান্ধিজির নেতৃত্ব সম্পর্কে বীতরাগ সৃষ্টি হল এবং বিপ্লবী পথের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল। এদিকে ১৯২৮ সালে সিলেটে সুন্দরীমোহন দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'সুরমা ভ্যালি অ্যাসোসিয়েশন'-এর অষ্টম অধিবেশনে অভ্যন্তরীণ জটিলতার জন্য সিলেটকে আসাম থেকে বঙ্গদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবটি পরাজিত হল। একই বছরে আসাম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলেও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হল। 'সুরমা ভ্যালি অ্যাসোসিয়েশন'-এর অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ জাতীয় বা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাথে যুক্ত থাকলেও এবং কংগ্রেসের প্রায় সকল কর্মসূচিতে অংশ নিলেও সংগঠনটি কিন্তু দীর্ঘদিন নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৩০-এর দশকে বিপিনচন্দ্র পাল, কামিনী কুমার চন্দ প্রভৃতি নেতৃত্বের প্রয়াণ, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, অসহযোগ আন্দোলনের মতো আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা ও হতাশা, মুসলিম নেতৃত্বের 'অ্যাসোসিয়েশন' থেকে সমর্থন প্রত্যাহার (যেমন, আবদুল মতিন চৌধুরি কিংবা মকবুল হুসেন খাবিরুদ্দিন-

এর 'মুসলিম লিগ'-এ যোগদান অথবা আবদুল রসিদ চৌধুরি কর্তৃক স্বতন্ত্র মুসলিম দল গঠন) ইত্যাদির ফলে 'অ্যাসোসিয়েশন'-এ অবশিষ্ট যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই কংগ্রেস কর্মী। এরই জন্য দেখা যায়, শেষদিকে 'সুরমা ভ্যালি অ্যাসোসিয়েশন'-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ক্রমশ বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেল এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস দলের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

২০.৬ অসম সাহিত্য সভা (Asam Sahitya Sabha)

১৮২৬ সালের আগে আসামে আহোম ও কোচ শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৮২৬ সালে ইয়ান্দাবো চুক্তির পর থেকেই আসামে ব্রিটিশ আধিপত্যের অধ্যায় শুরু হয় এবং এরই ফলে আধুনিক আসামের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আঙিনায় নতুন নতুন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। এইসব উদ্যোগ প্রকৃতপক্ষে ১৮৭২ সাল থেকেই প্রতীয়মান হয়, যার মধ্যে বাংলার 'নবজাগরণ'-এর প্রভাব লক্ষণীয়। অসমিয়া ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯১৭ সালে 'অসম সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্যে ছিল—

(ক) অসমিয়া ভাষায় অভিধান, ব্যাকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করা ;

(খ) প্রাচীন সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও প্রকাশ করা ;

(গ) অসমিয়া ভাষায় যেসব বিষয়ে গ্রন্থের অভাব আছে, সেটি পূরণ করা ;

(ঘ) প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উপযুক্ত বিবেচিত গ্রন্থকার অথবা সামর্থ্যহীন সাহিত্যিককে সাহায্য দান করা ;

(ঙ) সংগীত, চিত্রবিদ্যা বা ভাস্কর্যবিদ্যার ক্ষেত্রে উন্নতিসূচক কাজ করা ;

(চ) সভার একটি মুখপত্র এবং ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারপত্র প্রকাশ করা ;

(ছ) অসমিয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা ;

(জ) অসমিয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের স্বার্থে অন্যান্য কাজ করা।

উদার অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য সেবার উদ্দেশ্যে ১৯১৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর শিবসাগর থেকে 'অসম সাহিত্য সভা' যাত্রা শুরু করেছিল। অবশ্য এটি যে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রথম উদ্যোগ সেটি নয় ; কারণ জোড়হাটে ১৯১৫ সালে 'জোড়হাট সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে জোড়হাটের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ—যেমন, চন্দ্রধর বরুয়া, ডিম্বেশ্বর নিয়োগ, মিত্রদেব মোহান্ত ইত্যাদি—'অসম সাহিত্য সভা'র সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। আজও

জোড়হাটেই এই সভার কেন্দ্রীয় কার্যালয় চালু আছে ; যদিও গুয়াহাটি, ডিফু, ধুবরি সহ সমগ্র আসামে এর অসংখ্য শাখা আছে। আগে প্রতি বছর আসামের বিভিন্ন স্থানে 'অসম সাহিত্য সভা'র সম্মেলন হত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সভাপতির পদে বরণ করে সম্মান জানানো হত। ১৯১৭ সালে পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়ার (১৭.৩৭ দ্রষ্টব্য) সভাপতিত্বে এই সভা যাত্রা শুরু করেছিল। ২০০০ সালের পর থেকে ইদানীং বার্ষিক সম্মেলনের স্থলে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের রেওয়াজ চালু হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে অসমিয়া জাতীয় চেতনা বিকাশে 'অসম সাহিত্য সভা'র অবদান অপরিসীম। ধীরে ধীরে এই সভা অসমিয়া সমাজের অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সভার সম্মেলন উপলক্ষ্যে লক্ষ মানুষের সমাগমে রীতিমতো উৎসব শুরু হত। ৫০০-র অধিক প্রকাশনার অধিকারী এই সভাটি।

অসমিয়া জীবনে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এই সংগঠনটির বর্তমান কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে নানারকম বিতর্ক লক্ষ করা যায়। একই ব্যক্তিকে মাঝে মাঝে দু'বার বা তারও বেশি সভাপতি পদ অলংকৃত করার আহ্বান সত্ত্বেও, প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ অসমিয়া লেখক শিল্পী-সাহিত্যিকদের যথোপযুক্ত মর্যাদাদানের ব্যাপারে 'অসম সাহিত্য সভা'-র কার্পণ্য সুবিদিত। ১৯৬০ কিংবা ১৯৭২ সালে অসমিয়া ভাষাকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা, কিংবা ১৯৮০-র দশকে তথাকথিত 'বিদেশি বিতাড়ন' আন্দোলনের সময় ঐ সভার উগ্র জাতীয়তাবাদী ভূমিকায় অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন ; কারণ 'অগপ' অঙ্গ হিসেবেই সভা মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল। ঐ সময় থেকেই অ-অসমিয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মনে 'অসম সাহিত্য সভা'র প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। অ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও 'অসম সাহিত্য সভা'র কার্যকলাপ এরই জন্য ইদানীং নানা বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছে।

সারণি ৮

'অসম সাহিত্য সভা'-র সভাপতিগণ

সন	নাম	সম্মেলনের স্থান
১৯১৭	পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া	শিবসাগর
১৯১৮	চন্দ্রধর বরুয়া	গোয়ালপাড়া
১৯১৯	কালীরাম মেধি	বরপেটা
১৯২০	হেমচন্দ্র গোস্বামী	তেজপুর
১৯২৩	অমূল্যভূষণ দেব অধিকারী	জোড়হাট

সন	নাম	সম্মেলনের স্থান
১৯২৪	কনকলাল বরুয়া	ডিব্রুগড়
১৯২৪	লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া	গুয়াহাটি
১৯২৫	রজনীকান্ত বরদোলই	নওগাঁও
১৯২৬	বেণুধর রাজখোওয়া	ধুবড়ি
১৯২৭	তরুণরাম ফুকন	গোয়ালপাড়া
১৯২৯	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	জোড়হাট
১৯৩০	মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজারিকা	গোলাঘাট
১৯৩১	নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি	শিবসাগর
১৯৩৩	জ্ঞানদাভিরাম বরুয়া	নর্থ লখিমপুর
১৯৩৪	আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা	মঙ্গলদৈ
১৯৩৬	রঘুনাথ চৌধুরি	তেজপুর
১৯৩৭	কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক	গুয়াহাটি
১৯৪০	মইদুল ইসলাম বোরা	জোড়হাট
১৯৪৪	নীলমণি ফুকন	শিবসাগর
১৯৪৭	নীলমণি ফুকন	ডিব্রুগড়
১৯৫০	অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি	মার্গারেটা
১৯৫৩	সূর্যকুমার ভুঁইয়া	শিলং
১৯৫৫	নলিনীবালা দেবী	জোড়হাট
১৯৫৬	বেণুধর শর্মা	ধুবড়ি
১৯৫৮	পদ্মধর চালিহা	তিনসুকিয়া
১৯৫৯	অতুল চন্দ্র হাজারিকা	নওগাঁও
১৯৬০	ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী	পলাশবাড়ি
১৯৬১	ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী	গোয়ালপাড়া
১৯৬৩	রত্নকান্ত বরকাকতি	নাজিরা
১৯৬৪	মিত্রদেব মোহান্ত	ডিগবয়
১৯৬৫	ডিম্বেশ্বর নিয়োগ	নলবাড়ি
১৯৬৬	বিনন্দচন্দ্র বরুয়া	নর্থ লখিমপুর
১৯৬৭	নকুলচন্দ্র ভুঁইয়া	ডিব্রুগড়
১৯৬৮	জ্ঞাননাথ বোরা	তেজপুর
১৯৬৯	আনন্দচন্দ্র বরুয়া	বরপেটা
১৯৭০	উপেন্দ্র চন্দ্র লেখারু	ধিং
১৯৭১	তীর্থনাথ শর্মা	মাকুম
১৯৭২	হেম বরুয়া	ধুবড়ি
১৯৭৩	গিরিধর শর্মা	রঙ্গিয়া

সন	নাম	সম্মেলনের স্থান
১৯৭৪	মহেশ্বর নিয়োগ	মঙ্গলদৈ
১৯৭৫	সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা	তিতাবোর
১৯৭৬	যজ্ঞেশ্বর শর্মা	তিহু
১৯৭৭	সৈয়দ আব্দুল মালিক	অভয়পুর
১৯৭৮	প্রসন্নলাল চৌধুরি	গোলাঘাট
১৯৭৯	অতুলচন্দ্র বরুয়া	সুয়ালকুচি
১৯৮০	যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী	রাহা
১৯৮১	সীতানাথ ব্রহ্ম চৌধুরি	তিনসুকিয়া
১৯৮২	সীতানাথ ব্রহ্ম চৌধুরি	ডিফু
১৯৮৩	বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য	বঙ্গাইগাঁও
১৯৮৫	যোগেশ দাস	বিহাপুরিয়া
১৯৮৬	বীরেন বরকটকি	কামপুর
১৯৮৭	মহেন্দ্র বোরা	পাঠশালা
১৯৮৮	কীর্তিনাথ হাজারিকা	হাইলাকান্দি
১৯৮৯	মহিম বোরা	ডুমডুমা
১৯৯০	নবকান্ত বরুয়া	বিশ্বনাথ চরিয়ালি
১৯৯১	নির্মলপ্রভা বরদোলই	ধুধনৈ
১৯৯২	লক্ষধর চৌধুরি	গোরেশ্বর
১৯৯৩	ভূপেন হাজারিকা	শিবসাগর
১৯৯৪	লীলা গোগুই	মরিগাঁও
১৯৯৫	হিতেশ ডেকা	সার্থেবাড়ি
১৯৯৬	লক্ষ্মীনন্দন বোরা	বোরকাখাট
১৯৯৭	নগেন শইকিয়া	বিলাসিপাড়া

—

২০.৭ আসামে ব্রাহ্ম সমাজ

বাংলার 'নবজাগরণ'-এর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন। যদিও ঊনবিংশ শতকে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন কলকাতায় শুরু হয়েছিল ; কিন্তু অনতিকালের মধ্যে এটি আসামসহ ভারতের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দু ধর্মে প্রচলিত কুসংস্কার ও কুপ্রথা সংস্কারের উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট উত্তর কলকাতার ৪৮ নং আপার চিৎপুর রোডে (বর্তমান রবীন্দ্র সরণি) প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। উপনিষদে 'ব্রহ্ম' হতে জাত 'ব্রাহ্ম' শব্দটিকে রামমোহন 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের পূজারি' অর্থে ব্যবহার করতেন। উদারনৈতিক এক ঈশ্বরে বিশ্বাস সহ সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা, নারী শিক্ষা ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন ইত্যাদি নানাবিধ সামাজিক সংস্কারের দিকে লক্ষ রেখে ব্রাহ্মসমাজ যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু রামমোহনের ইংল্যান্ড যাত্রা এবং সেখানে মৃত্যুর কারণে ব্রাহ্ম আন্দোলন শুরুতেই কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)। ১৮৩৯ সালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠার পর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর (৭ পৌষ, ১৭৬৫ শক) দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ কুড়িজন ব্যক্তি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট প্রথম ব্রাহ্ম মন্ত্রে দীক্ষা নেন এবং এইভাবে ব্রাহ্ম সমাজ অবশেষে ব্রাহ্ম ধর্মে পরিণত হয়। বিশ্বভারতীর বর্তমান পৌষ মেলা এই ঘটনারই স্মরণিকা। দীক্ষা গ্রহণ প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে মূর্তি-পূজা-বিরোধী ব্রাহ্মরা একটি স্বতন্ত্র সমাজরূপে সুসংবদ্ধ হলেন।

ব্রাহ্ম-আন্দোলনের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নায়ক ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) যাঁর সাথে দেবেন্দ্রনাথের নানা প্রশ্নে মতভেদ হওয়াতে ব্রাহ্ম আন্দোলনে ভাঙন প্রক্রিয়া শুরু হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত সমাজটি 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' এবং কেশব সেন পরিচালিত সংগঠনটি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' নামে পরিচিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬) প্রভৃতি যুবকদের সঙ্গে কেশব সেনের ব্রাহ্মসমাজ নিয়মতন্ত্র পালন প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতকের সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আবার মতভেদ শুরু হয়। কেশব সেন নিজের নাবালিকা কন্যা সুনীতিকে হিন্দুমতে কোচবিহারের মহারাজার সাথে বিবাহ দিলে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। ১৮৭৮ সালের ১৫ মে বিজয়

কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে নব্য সম্প্রদায় 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' ১৮৮০ সাল থেকে 'নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ' নামে পরিচিত হয়। যদিও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের ব্রাহ্ম সমাজকে একটি ছাতার নীচে আনার জন্য 'ব্রাহ্ম সম্মিলনী সমাজ' তৈরির উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল ; তথাপি ঊনবিংশ শতকে যে ঐতিহাসিক পটভূমিতে 'ব্রাহ্ম সমাজ' যাত্রা শুরু করেছিল, ক্রমশ সেটির প্রাসঙ্গিকতা দুর্বল হতে শুরু করে। ১৮৯৭ সালে একদিকে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ ও পরবর্তী সময়ে বিপ্লবী ও মহাত্মা গান্ধির আন্দোলন ইত্যাদি সহ নানা কারণে পৌত্তলিকতা বিরোধী নিরাকার একেশ্বরের উপাসনার আকর্ষণ সাধারণ মানুষের মনে তেমন দাগ কাটতে পারেনি। প্রথম দিকে ব্রাহ্ম সমাজের নানা সাফল্য সত্ত্বেও, ক্রমাগত বিভাজন এবং তত্ত্ব ও কাজের মধ্যে ফারাক ইত্যাদির ফলে কী বঙ্গদেশ কী আসামে মুষ্টিমেয় আলোক-দীপ্ত মানুষের মধ্যেই ব্রাহ্ম আন্দোলন সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের উত্থান পতনের উপরোক্ত পটভূমিকার কথা মনে রেখেই আসাম এর প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব বিবেচনা করা দরকার। ব্রাহ্ম সমাজের ঐতিহাসিক শ্রীমতী Sophia Dobson Collet ১৮৭২ সালে যে *Brahmo Year Book* তৈরি করেছিলেন তাতে দেখা যায়, ঐ সময় সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম সমাজের যে ১০২টি শাখা ছিল তার মধ্যে আসামে ছিল মোট ৫টি (নওগাঁও, শিবসাগর, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া ও তেজপুরে) এবং সবগুলিই ছিল কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামীদের প্রভাবাধীন। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস থেকে জানা যায়, আসামে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রথম প্রচারক ছিলেন অঘোরনাথ মুখার্জি যিনি ১৮৭০ সালে নওগাঁও-এ কয়েকজনকে আকর্ষণ করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পদ্মহাস গোস্বামী নামে একজন স্কুল শিক্ষক। আসলে, ব্রাহ্ম সমাজের বার্তা এর আগে থেকেই কলকাতা প্রবাসী অসমিয়া ছাত্র, সিলেট থেকে আগত বাংলা-ভাষী সরকারি আমলা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে আসামে আসতে শুরু করেছিল। প্রথম দিকে আসামে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ ছিল (যেমন, নওগাঁও-এর শরৎচন্দ্র মজুমদার, গুরুনাথ দত্ত প্রভৃতি) ; কিন্তু ক্রমে অসমিয়া জনগোষ্ঠীর একটি অংশও ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে আকৃষ্ট হন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : নওগাঁও-এর রঘুনাথ বোরা, পদ্মহাস ও আনন্দরাম গোস্বামী, ব্রজনাথ বোরা, রামদুর্লভ মজুমদার ; তেজপুরের লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতি ; ডিব্রুগড়ের লক্ষ্মীনাথ দাস প্রভৃতি। খাসি পাহাড়ে 'সাধারণ ব্রাহ্ম

সমাজের' বার্তা বয়ে নিয়ে যান নীলমণি চক্রবর্তী এবং ১৮৭৪-৭৫ সালে শিলং-এ এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন আসামের রাজধানী শিলং-এর মধুকান্ত বরুয়া, হরেকৃষ্ণ শর্মা, উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার লক্ষ্মীপ্রভা বোরা, 'সাহিত্যরথী' লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য), 'মহর্ষি' কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭.১১ দ্রষ্টব্য), অমিয়কুমার দাশ (১৭.২ দ্রষ্টব্য)-এর পিতা ড. উদয়রাম দাস সহ অনেক প্রথিতযশা অসমিয়া ব্যক্তিত্ব ব্রাহ্ম সমাজে অন্তর্ভুক্ত হন। গুণাভিরাম বরুয়া (১৭.১৮ দ্রষ্টব্য)-র মতো আসামের উজ্জ্বল রত্ন কীভাবে কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার আন্দোলনে আকৃষ্ট ও যুক্ত হয়েছিলেন সেইসব কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে আসামে ব্রাহ্ম সমাজের অবদান উপেক্ষণীয় নয়। ১৮৭২ সালে গুয়াহাটি থেকে কেশবচন্দ্র সেনের একান্ত অনুগত যদুনাথ চক্রবর্তী বাংলা-ইংরাজি দ্বিভাষী সাপ্তাহিক পত্রিকা *আসাম মিহির* প্রকাশনা শুরু করেন। গুয়াহাটির চিদানন্দ প্রেসে এটি ছাপা হত। ১৮৭৩ সালে তেজপুর থেকে লক্ষ্মীনাথ বরকাকতির সম্পাদনায় অসমিয়া পত্রিকা *আসাম দর্পণ* এবং পরবর্তী সময়ে পাক্ষিক *আসাম বান্ধব* এবং মাসিক *চন্দ্রোদয়* প্রকাশের ফলে ব্রাহ্ম আন্দোলন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ পায়। ১৮৭৫-৭৬ সালে পদ্মহাস গোস্বামীর *জ্ঞানোদয়* পত্রিকাটিও এই প্রসঙ্গে কম উল্লেখযোগ্য নয়। এছাড়া পদ্মহাস ব্রাহ্ম ধর্মের লক্ষ্য এবং ব্রাহ্ম ধর্ম কাকে বলে—ইত্যাদি প্রসঙ্গে দুটি প্রচার পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ও মহাদেব শর্মার যুগ্ম সম্পাদনায় অসমিয়া ভাষায় *অসম হিতৈষী পত্রিকা*-র অবদানও কম নয়। গুণাভিরাম বরুয়া সম্পাদিত *আসাম বন্ধু* (১৮৮৫-৯৬) বুদ্ধিজীবী মহলে গভীর রেখাপাত করেছিল। 'জোনাকি যুগ'-এর অনেক লেখায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাব লক্ষণীয়। দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, রান্না-বান্না থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে কীভাবে মার্জিত রুচির ছাপ থাকে—এটি ব্রাহ্ম আন্দোলনের নায়করাই আসামে প্রথম গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার স্ত্রী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী রন্ধন শিল্পের উপর গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

আসামের সমাজে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা সহ অসবর্ণ বিবাহ জনপ্রিয় করার নানা উদ্যোগ ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ নিয়েছিলেন। শোনা যায়, গুণাভিরাম বরুয়ার কন্যা স্বর্ণলতার (যিনি কলকাতার বেথুন স্কুলে প্রথম অসমিয়া ছাত্রী) সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ অনেক দূর এগিয়েও শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। লক্ষ্মীনাথ

বেজবরুয়ার স্ত্রী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী কিন্তু জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারেরই কন্যা ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত নওগাঁও-এর আনন্দরাম গোস্বামী একজন খ্রিস্টান তনয়া অম্বিকা সুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। নওগাঁও সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী গুরুনাথ দত্ত তাঁর কন্যাকে তেজপুরের লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতি'র পুত্রের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন।

আসামে শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রশ্নে ব্রাহ্মদের অবদান কম উল্লেখযোগ্য নয়। ধুবরি ও নওগাঁও-এ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁরা ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ধুবরির বালিকা বিদ্যালয়ের ব্রাহ্ম মতাবলম্বী নিবেদিত-প্রাণ শিক্ষক অম্বিকাচরণ মুখার্জির নাম আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। নওগাঁও জেলা স্কুলের সংস্কৃত ভাষার স্বনামধন্য ব্রাহ্ম শিক্ষক পদ্মহাস গোস্বামীর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর সমালোচকরাও প্রশংসা করেছেন। শিশুদের মন যাতে কোনোভাবে কুসংস্কারে আক্রান্ত না হয় এই উদ্দেশ্যেই পদ্মহাস *অসমিয়া লোরার শিক্ষাসার* লিখেছিলেন। ডিব্রুগড়ে ছাত্র দরদি ব্রাহ্ম শিক্ষক লক্ষ্মীনাথ দাস তাঁর সারল্যের জন্য শিক্ষার্থীদের মন জয় করতে পেরেছিলেন। লক্ষ্মীনাথ প্রথম দিকে পোস্ট মাস্টার ছিলেন। পরে শিক্ষক হন।

১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯০৬) উদ্যোগে গঠিত Indian Association বা 'ভারতসভা'য় ব্রাহ্ম আন্দোলনের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অংশ নিয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-তে প্রতিষ্ঠার আগে এই রকম সংগঠনের মাধ্যমে দেশ সেবায় অংশগ্রহণ করার একটা রেওয়াজ ছিল। Indian Association-এর দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি সহ অন্য নেতৃবৃন্দ আসাম সফরে এলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হয়ে উঠতেন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির প্রেরণায় ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী রামকুমার ভট্টাচার্য (বিদ্যারত্ন) (১৮৩৬-১৯০১) আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের মর্মন্তুদ জীবনকাহিনি সম্পর্কে সমীক্ষা করেন এবং সমকালীন *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, তত্ত্বকৌমুদী, সঞ্জীবনী, Brahmo Public Opinion, Bengalee* প্রভৃতিতে ধারাবাহিকভাবে এই অভিজ্ঞতা লিবিপদ্ধ করেন। চা-বাগানের সাহেব মালিকরা কীভাবে শ্রমিকদের হত্যা করলেও ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা নির্বাক ভূমিকা নিত, সেটি ১৮৮৮ সালে কলকাতায় প্রকাশিত রামকুমার বিদ্যারত্নের বিখ্যাত গ্রন্থ *কুলি কাহিনি* থেকে পরিস্ফুট হয়। রামকুমারের লেখা ইংরাজিতে অনূদিত হত এবং *Race and Ryots* সাময়িকীতেও প্রকাশিত হত। রামকুমারের গ্রন্থ ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও Indian Association-এর পক্ষ থেকে ১৮৮৮ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিটিশ সরকারে কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করেন তাতে

স্পষ্টভাবে আসামের অত্যাচারিত চা শ্রমিকদের প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন ঃ "....the *Coolies* were in a state of quasi-slavery; no state of recognized slavery could be worse."

নিজেরা ব্রাহ্ম না হয়েও ঊনবিংশ শতকে আসামের বেশ কিছু আলোক-দীপ্ত বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। জোড়হাটের মুন্সেফ এবং পরবর্তী সময়ে বরপেটার সদর আমিন যদুরাম ডেকা বরুয়া ব্রাহ্মদের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের উগ্র সমর্থক ছিলেন এবং নিজে বিধবা-বিবাহ করেছিলেন। বিখ্যাত *হেমকোষ* প্রণেতা হেমচন্দ্র বরুয়া (১৭.৭৪ দ্রষ্টব্য) শুধু যে স্ত্রী-শিক্ষার প্রশ্নে ব্রাহ্মদের উদ্যোগকে নানাভাবে পুষ্ট করেছেন তাই নয়, রামকুমার বিদ্যারত্নের চা-শ্রমিকদের দুরবস্থা সমীক্ষার সময়ও রামকুমারকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। অবিভক্ত বঙ্গদেশের মতো আসামের সমাজ অত গোঁড়া না হলেও শংকরদেবের আদর্শ-পুষ্ট প্রচলিত প্রথা বা বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। এরই জন্য দেখা যায়, হেমচন্দ্র বরুয়ার মতো অত বড়োমাপের ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর দেহ সৎকারের জন্যও যথেষ্ট সংখ্যায় মানুষ এগিয়ে আসেনি। রাজেন শইকিয়া (*Social and Economic History of Assam 1853-1921* গ্রন্থে) দেখিয়েছেন, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অসমিয়া ব্রাহ্মরা (যেমন, গুণাভিরাম বরুয়া, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া প্রভৃতি) সমাজের গোঁড়াপন্থীদের আক্রমণের শিকার তেমনভাবে না হলেও অত্যন্ত সাধারণ জীবিকার মানুষ যদি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হতেন তাহলে তাঁদের উপর নেমে আসত নানারকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্রাহ্মধর্মভুক্ত পদ্মহাস গোস্বামী (যিনি ১৮৭৯ সালে প্রয়াত হন), কমলাকান্ত ভট্টচার্য (১৮৫৫-১৯৩৬), জ্ঞানদাভিরাম বরুয়া প্রভৃতি ব্যক্তির করুণ অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এটিও শইকিয়া উল্লেখ করেছেন, ঊনবিংশ শতকে অবিভক্ত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্মে নব-দীক্ষিতদের উপর যেভাবে দৈহিক অত্যাচার ও নিপীড়ন কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় (যেমন, ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর গ্রাম শান্তিপুরে যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন, কিংবা কলকাতার সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্তকে শারীরিক নির্যাতনের পর ঝোপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল)—সেইরকম কিন্তু আসামে হয়নি।

অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ সত্ত্বেও ব্রাহ্ম আন্দোলন আসামে তৃণমূল স্তরে নামতে পারেনি ; আলোক-দীপ্ত কিছু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই এটি শেষপর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, যেহেতু বঙ্গভূমিতেই ব্রাহ্ম-আন্দোলন বিকশিত হয়েছিল, এরই জন্য আসামের মাটিতে এটি স্থান পায়নি।

আসলে, আসামে পরবর্তী সময়ে বঙ্গ-বিদ্বেষ মাঝে মাঝে তীব্র আকারে দেখা গেলেও (যেমন, ১৯৮০-র দশকে আসাম আন্দোলনের সময়) ঊনবিংশ শতকে এই বৈরিতা প্রায় অনুপস্থিত ছিল। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রগতিশীল বার্তা অসমিয়া উচ্চশিক্ষিতদের একাংশেই বরং প্রথমে গ্রহণ করেছিলেন (যাঁরা আবার বিংশ শতকের শেষার্ধে অসমিয়া উগ্র জাতীয়তার প্রবক্তা হয়েছিলেন)। নানাবিধ সামাজিক সাংস্কৃতিক কারণে আসামে ব্রাহ্ম সমাজ তেমন গভীর শিকড় বিস্তার করতে না পারলেও এর প্রভাব কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। রাজেন শইকিয়ার ভাষায় ঃ

> *The Brahmo Samaj in Assam did not become, unlike Bengal, a popular movement. But by introducing significant aesthetic values in the social, cultural and religious life, the Brahmo Samaj, despite restrictive following, exercised a wholesome effect on Assamese life. It helped to reduce the hold of orthodoxy on society and made, for the first time, religious faith an object of doubt and debate. It popularized professional life of the new middle class.*

অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি (১৭.৩ দ্রষ্টব্য) তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করছেন কীভাবে বরপেটায় 'হিতসাধিনী সভা'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্রাহ্ম-সংগীত পরিবেশন করা হত যেগুলি ছিল অসমিয়া সংগীতের পূর্বসূরি।

২০.৭.১ বোড়োদের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব (Impact of Brahmo religion on the Boros)

আসামের সবচেয়ে বড়ো উপজাতি জনগোষ্ঠীর নাম 'বোডো' বা 'বোড়ো'। বর্তমানে সমগ্র ভারতে সংখ্যার দিক থেকে উপজাতিদের মধ্যে বোড়োদের স্থান অষ্টমে আছে। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে (৩.১০ দ্রষ্টব্য) 'বোড়ো-কাছাড়ি'-দের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বপুরুষকে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে বোড়ো সমাজে প্রচলিত 'Bathou' 'ব্যাথু' ধর্মের মধ্যে নানা প্রকার ব্যাভিচার, 'সারনিয়া' পদ্ধতির মাধ্যমে হিন্দুধর্মের আঙ্গিনাভুক্ত হওয়ার জন্য বোড়োদের অনেক অর্থ ব্যয় (এবং কোচ, রাজবংশী, চৌধুরি, দাস, ডেকা, মণ্ডল, শৈব্যা, কার্জি ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ), খ্রিস্টান মিশনারিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইত্যাদি পটভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে বোড়ো নেতা 'ওক্রা' কালীচরণ মেচ্ (১৮৬০-১৯৩৮), যিনি কালীচরণ ব্রহ্ম নামে সুপরিচিত (১৭.১৪ দ্রষ্টব্য), প্রথম ব্রাহ্মধর্মের দিকে আকৃষ্ট হলেন। যেহেতু প্রচলিত 'ব্যাথু' ধর্মকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আচার

অনুষ্ঠানে ব্যাপক পশু-হত্যা, অবাধে 'জৌ' বা 'জুমাই' (ঘরে প্রস্তুত একপ্রকার মদ)-এর ফোয়ারা ছুটত এরই জন্য প্রতিবেশী হিন্দু ধর্মভুক্ত অধিকাংশ মানুষ বোড়োদের খুব একটা সুনজরে দেখতেন না। কালীচরণ এই শোচনীয় অবস্থার যবনিকা টেনে একটি একটি নতুন ধর্মের সূত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত বোড়োদের এক জায়গায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। A. R. Desai একেই বলেছেন 'religio-reform movement' যেটি জাতীয়তাবাদ বিকাশের প্রথম স্তর। অন্যদিকে Nirad C. Chaudhuri ব্রাহ্মধর্মকে 'Hindu Protestantism' হিসেবে চিত্রিত করেছেন। ১৯০৫ সালে কলকাতায় সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহের বাড়িতে এবং ফণিভূষণ চ্যাটার্জি সহ অনেকের উপস্থিতিতে কালীচরণ দীক্ষা নিলেন পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী'র (যাঁর বিস্তৃত পরিচয় অজ্ঞাত) কাছ থেকে। কলকাতা থেকে আসামের কোকরাঝাড়ে ফিরে এসে একদিকে বৈদিক-হোমযজ্ঞ-আহুতি এবং অন্যদিকে ঔপনিষদিক নিরাকার এক ব্রহ্মের সাধনার মাধ্যমে বোড়োদের মধ্যে খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে 'ওঁ সৎ-গুরু' মন্ত্র নিয়ে নতুন ধর্মের প্রচার শুরু করলেন। বোড়ো সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের ২৬টি দেবতার পূজা সহ, মদ-মাংস গ্রহণ, শূকর-পালন ইত্যাদি অনেক কিছুই গুরু কালীচরণের নির্দেশে নিষিদ্ধ হল।

গুরু কালীচরণ সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে প্রচলিত অনেক সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে বোড়োদের সচেতন করার প্রয়াস নিলেন। অশিক্ষার অন্ধকার থেকে বোড়ো সমাজকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে এবং হাতের কাজসহ ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালুর দাবিতে তিনি নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রেখেছিলেন। বর্তমান কোকরাঝাড় জেলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ধুবরিতে বোড়ো শিশুদের জন্য ব্রাহ্ম বোডিং হাউস স্থাপন ইত্যাদি বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে ব্রাহ্মধর্মের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাকে একটা আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন। ১৯১১ সালে গোয়ালপাড়ার ডেপুটি কমিশনার A. G. Lainy-র কাছে আবেদন জানিয়ে ব্রাহ্ম ধর্মভুক্ত বোড়োদের 'ব্রহ্ম' উপাধি ব্যবহারের অনুমতি আদায় করেছিলেন। সেদিন থেকে কালীচরণ ব্রহ্ম, রূপনাথ ব্রহ্ম (১৭.৫৯ দ্রষ্টব্য), সীতানাথ ব্রহ্ম (১৭.৬৭ দ্রষ্টব্য), উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম (১৭.৯ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি একাধিক বোড়ো নেতা আবির্ভূত হন। অবশ্য বোড়োদের মধ্যে 'ব্রহ্ম'ই যে একমাত্র উপাধি তা নয় ; আরও অনেক উপাধি আছে—যেমন, 'বোড়ো', 'বসুমাতারি', 'নারজাড়ি', 'মুশাহারি', 'দইমারি', 'বিয়ুসমুথিয়ারি', 'খাক্‌লারি' ইত্যাদি। ব্রাহ্ম ধর্মভুক্ত গুণাভিরাম বরুয়ার (১৭.১৮ দ্রষ্টব্য) একান্ত অনুগত বোড়োরা একসময় অসমিয়া ভাষাকেই নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে গণ্য করতেন

এবং অসমিয়া ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষালাভ করতেন ; কিন্তু ইদানীং এই ধারায় কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্ম ধর্মের অনুগামী হয়েও কিছু বোড়ো নেতা (যেমন, জয়নারায়ণ বসুমাতারি, সতীশচন্দ্র বসুমাতারি প্রভৃতি) পরবর্তী সময়ে চিরাচরিত 'ব্যাথু' ধর্মের অনেক আচার অনুষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ব্রাহ্মধর্মের মূল উদ্দেশ্যই ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছে। বোড়োদের একটা অংশ আবার খ্রিস্টান ধর্মের ছত্রতলে আশ্রয় খুঁজছেন। ফলে, বিশেষ একটি ধর্মগোষ্ঠী হিসাবে জাতীয় চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে নানারকম জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। কালীচরণ ব্রহ্মকে একদিন ব্রহ্ম ধর্মকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটির প্রাসঙ্গিকতা বর্তমানে বিরাট প্রশ্নের মুখোমুখি।

কেন ব্রাহ্ম ধর্ম বোড়ো সমাজের অভ্যন্তরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে তেমন সফল হল না, সেটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বোড়ো ঐতিহাসিক R. N. Mosahary কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে একটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। জয়নারায়ণ ও সতীশচন্দ্র বসুমাতারি প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্ম ধর্মের বিরুদ্ধেই অভিযানে নেমেছিলেন। চিরায়ত ব্যাথু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাঁরা পরোক্ষভাবে চেয়েছিলেন। (দুই) বোরোদের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মের অগ্রগতি প্রতিহত করার পরিবর্তে যেসব স্থান থেকে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল সেইসব স্থানে, বিশেষত গোয়ালপাড়া এলাকায়, থেক্‌লো বসুমাতারি নামে জনৈক বোড়ো ধর্মযাজক খ্রিস্টধর্মের জয়ধ্বনি প্রচার করায় বোড়োদের একটা বড়ো অংশ খ্রিস্টধর্মের আঙিনা-ভুক্ত হয়েছিলেন। (তিন) জগৎচন্দ্র মুশাহারি নামে হিন্দু ধর্মভুক্ত ('সারনিয়া' প্রথায়) প্রতিপত্তিশালী বোড়ো মৌজাদার যেভাবে 'ব্রহ্ম' উপাধির মাধ্যমে বোড়োদের একত্রিত করার উদ্যোগ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিল—সেটির তীব্র বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। (চার) মদ-মাংস সহ আমিষ ভোজে অভ্যস্ত একটি জনগোষ্ঠীকে যেভাবে ব্রাহ্ম নায়করা সামাজিক রীতি-নীতি ও বিশ্বাস থেকে রাতারাতি সরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেটি অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। চিরায়ত বিধানে বিশ্বাসীদের আশঙ্কা ছিল, যেভাবে তণ্ডুল/চাউল ইত্যাদি যজ্ঞে আহুতির কথা কালীচরণ সহ অন্যান্য ব্রাহ্মরা প্রচার করছিলেন তাতে মা-লক্ষ্মী দেবী অসন্তুষ্ট হবেন এবং সামগ্রিকভাবে এতে বোড়োদের ক্ষতি হবে।

২০.৮ বোড়ো সাহিত্য সভা (Bodo Sahitya Sabha)

'অসম সাহিত্য সভা'র মতো আসামের বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠী নিজেদের জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ঐ রকম 'সাহিত্য সভা' ইদানীং গঠন

করেছে ঃ যেমন 'তিওয়া সাহিত্য সভা', 'মিশিং সাহিত্য সভা', 'বোড়ো সাহিত্য সভা' ইত্যাদি। অন্যান্য উপজাতিদের মতো 'বোড়ো'দের নিজস্ব ভাষা থাকা সত্ত্বেও লিপি ছিল কি না সেটি বিতর্কিত। আসলে **উপজাতি সত্তার সাথে লিপিহীনতা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত**। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত অসমিয়া বা বাংলা ভাষার মাধ্যমেই বোড়ো শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করতে হত। কিন্তু প্রত্যেকের কাছেই "মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মতো" হিতকর ও প্রিয়। মূলত বোড়ো ভাষার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়েই ১৯৫২ সালের ১৬ নভেম্বরে কোকরাঝাড় নির্বাচনী কেন্দ্রের লোকসভা সাংসদ ধরণীধর বসুমাতারির সভাপতিত্বে কোকরাঝাড় জেলার বসুগাঁও-এ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে আসামের বিভিন্ন স্থানে (যেমন, বর্তমান নাগাল্যান্ড, মেঘালয়), পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, নেপাল প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বোড়োরা সমবেত হন। এই সভা থেকেই ১৯ নভেম্বর, ১৯৫২-তে 'বোড়ো সাহিত্য সভা'র জন্ম হয় যার প্রথম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে জয়ভদ্র হ্যাগজার এবং সোনারাম থাওসেন।

বোড়ো ভাষার মাধ্যমে বোড়ো ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষার দাবিতে প্রথম 'বোড়ো সাহিত্য সভা' আন্দোলন শুরু করে। ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে ১৯৬৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষায়, ১৯৬৮ সালে মাধ্যমিক স্তরে বোড়ো ভাষার মর্যাদা মেনে নিতে আসাম সরকার বাধ্য হয়। এরপর শুরু হয় স্নাতক স্তরে বোড়ো ভাষাকে 'মডার্ন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ' (MIL) হিসেবে স্বীকৃতির দাবি এবং সেটিও ১৯৭৭ সালে গৌহাটি ও ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় মেনে নেয় ; যদিও 'নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি' (NEHU) ১৯৮৪ থেকে প্রি-ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করে। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৬ সাল থেকে স্নাতকোত্তর স্তরেও বোড়ো ভাষার স্থানকে স্বীকৃতি দেয়। শুধু শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেই নয়, 'বোড়ো সাহিত্য সভা'-র ক্রমাগত আন্দোলনের সামনে নতিস্বীকার করে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ইংরেজি ও অসমিয়ার সাথে বোড়ো ভাষা নিজের স্থান করে নেয় এবং ১৯৮৫ সালে কোকরাঝাড় জেলায় এবং ওদালগুড়ি মহকুমায় বোড়ো ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা পায়। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলে প্রথম সমগ্র দেশের ১৪টি ভাষা সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছিল (তার মধ্যে বোড়ো ভাষার স্থান ছিল না), কিন্তু বর্তমানে এটি বেড়ে ২২টি হয়েছে
সালে বোড়ো ভাষা সংবিধানের অষ্টম তপশিলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং দিল্লির 'সাহিত্য অকাদেমি' বোড়ো ভাষাকে 'ভাষা সম্মান' মর্যাদা দিচ্ছে। এসবই

সম্ভবপর হয়েছে 'বোড়ো সাহিত্য সভা'-র ঐক্যবদ্ধভাবে ক্রমাগত আন্দোলনের ফসল হিসেবে।

যেহেতু বোড়ো ভাষার নিজস্ব লিপি নেই (যদিও কেউ কেউ দাবি করেন, 'দেওধাই' নামে একটি লিপি নাকি অতীতে ছিল) এরই জন্য কোন্ লিপির মাধ্যমে এই ভাষা লিখিত হবে—রোমান হরফ, অসমিয়া, বাংলা, দেবনাগরী—সেটিকে কেন্দ্র করে 'বোড়ো সাহিত্য সভা'র মধ্যে বিতর্ক আজও অব্যাহত। এক সময় রোমান হরফেই কাজ শুরু হয়েছিল ; কিন্তু অনেকেই এর মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাব লক্ষ করে রোমান হরফের বিরোধিতা করেন। তিব্বতী-ব্রহ্মী গোষ্ঠীর উপভাষা হিসাবে বোড়ো ভাষার জন্ম হলেও এর সাথে আসামের দিমাসা ভাষা, মেঘালয়ের গারো ভাষা কিংবা ত্রিপুরার ককবরক ভাষা বা বোড়োদের সমগোত্রীয় অনেক ভাষার গঠন, ধ্বনি ইত্যাদির যথেষ্ট মিল আছে। লিপির প্রশ্নকে কেন্দ্র করে 'বোড়ো সাহিত্য সভা'র অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব মাঝে মাঝে রক্তাক্ত অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। **সর্বোদয় আন্দোলনের নেতা আচার্য বিনোবা ভাবের পরামর্শমতো ১৯৭৫ সালে বোড়ো সাহিত্য সভা' দেবনাগরী লিপিকে গ্রহণ করলেও, বর্তমানে বোড়ো ছাত্র-যুবদের এক ব্যাপক অংশ এর তীব্র বিরোধী**। বিভিন্ন লিপির মাধ্যমে 'বোড়ো সাহিত্য সভা' জন্মলগ্ন থেকে কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনি, শিশু-সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক বোড়ো গ্রন্থ প্রকাশ করলেও সাহিত্যের মাধ্যমে বোড়ো-জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ ঘটিয়েছিল, সেটি ইদানীং কিছু ক্ষেত্রে জঙ্গি চেহারা নিয়ে শান্ত বোড়ো সমাজকে ক্রমশ অশান্ত করার দিকে এগিয়ে চলেছে। ১৯৮০-র দশক থেকে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-র (১৭.৯ দ্রষ্টব্য) নেতৃত্বে (যিনি 'বোড়ো-ফা' বা বোড়োদের পিতা হিসেবে পরিচিত) আত্মশাসনের অধিকার (**প্রথমদিকে 'উদয়াচল' বর্তমানে 'বোড়োল্যান্ড'** এবং পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলাকে ঐ নতুন রাজ্যে অন্তর্ভুক্তি) দাবি এবং 'বোড়ো সাহিত্য সভা'-র সমর্থন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল এবং দিন দিন তপ্ত হয়ে উঠছে। 'All Bodo Students Union' (ABSU) এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে 'Bodo Liberation Tigers' (BLT)-এর 'বোড়োল্যান্ড' তৈরির রণহুংকার, বোড়োদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার মেনে নেওয়ার পর এবং ২০০৩ সালে ষষ্ঠ তফশিল মোতাবেক অত্যন্ত ক্ষমতাশালী 'Bodoland Territorial Council' (BTC) গঠিত হওয়ার পর আত্মগোপনকারী BLT-র প্রকাশ্য বিচরণ এবং ক্রমাগত হুমকির ফলে সমগ্র বোড়ো সমাজে আজ চরম অস্থিরতার শিকার। 'বোড়ো সাহিত্য সভা'র প্রাথমিক উদ্দেশ্যে (ভাষার মর্যাদা স্বীকৃতি) সফল হলেও,

প্রকৃত উদ্দেশ্য (যদিও 'সাহিত্য সভা'-র অভ্যন্তরে বিতর্ক আছে এবং মাঝে মাঝে 'সভা'টি নানা প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়) সম্পর্কে অর্থাৎ স্বতন্ত্র 'বোড়োল্যান্ড' গঠন সম্পর্কে জটিলতা দিনদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০.৯ আহোম অ্যাসোসিয়েশন (Ahom Association)

আসাম ইতিহাসের ছাত্রদের পক্ষে **'আহোম' এবং 'অসমিয়া'দের মধ্যে পার্থক্য টানা রীতিমতো কঠিন**। আহোম রাজাদের দীর্ঘ ৬০০ বছরের রাজত্বে নানাভাবে মিশ্রণের মাধ্যমে যে একটি জাতিসত্তা সমগ্র আসামে ধীরে ধীরে গঠিত হয়েছিল, ১৮৯৩ সালের ১৩ মে All Assam Ahom Sabha (AAAS) গঠনের মাধ্যমে সেটির ফাটল বা ভেদরেখা প্রথম দৃষ্ট হয়। **আহোমরা যে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী এটি প্রথম উচ্চারিত হয়**। ১৯১০ সাল থেকে 'আহোম সভা'র স্থলে 'আহোম অ্যাসোসিয়েশন' বা পুরোনাম **All Assam Ahom Association (AAAA)**-টির ব্যবহার প্রচলিত হয়। 'আহোম সভা'র প্রথম সভাপতি ছিলেন পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া (মজার কথা, ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিদ্বন্দ্বী 'অসম সাহিত্য সভা'রও প্রথম সভাপতি ছিলেন তিনি)। আসলে, **প্রথমদিকে 'আহোম সভা'র সাথে 'অসম সাহিত্য সভা'র তেমন বিরোধ ছিল না এবং নানাভাবে আহোম ও অসমিয়াদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করাই ছিল লক্ষ্য, কিন্তু ক্রমে নানা কারণে উভয়ের মধ্যে তিক্ততা লক্ষ করা যায়**। পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া (১৭.৩৭ দ্রষ্টব্য) শুধু যে 'আহোম সভা'র প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন তা নয়, পরবর্তী সময়ে, অর্থাৎ ১৯৪১ সালে AAAA-এর সভাপতি হিসেবে দাবি করেছিলেন, নির্বাচনে আহোমদের স্বতন্ত্র মর্যাদা না দিলে রাজনীতির আঙিনায় আহোমরা অর্থহীন হয়ে যাবে। তাঁর ভাষায় ঃ

"On the basis of the past, present and the near future, I state confidently that the Ahoms need separate electorate, else they will be insignificant in the political arena", এই দাবিটিকে কেন্দ্র করেই AAAA দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছে।

আসামে আহোমদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা মর্যাদা রক্ষার জন্য শুধু যে একা 'আহোম সভা' সংগ্রাম করেছে তা নয়, পরবর্তী সময়ে একই দাবিকে কেন্দ্র করে **আরও অনেক আহোম সংগঠনের জন্ম** হয়েছে ঃ যেমন, All Assam Ahom Students Federation (১৯৪৪), The Tai Historical and Cultural Society of Assam (১৯৫৫), All Assam Mohan Deodhai Bailung Sanmillan

(১৯৬২), All Assam Tai Students Association (১৯৬৪), Ahom Tai Mongoliya Rajya Parishad (১৯৬৭), Purbanchal Tai Sahitya Sabha (১৯৮১), All Ahom Students Union (১৯৮৮), The Tai Ahom Council (১৯৮৭) ইত্যাদি। হরেকরকম সংগঠনের মাধ্যমে (multidirectional and multivoiced) **স্বতন্ত্র আহোম জাতিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করাই প্রধান লক্ষ্য। স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র তৈরির দাবিও তুলেছিল AAAA,** যেটি শিবসাগর জেলার আমগুড়িতে ১৯৪৭ সালে ৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সিদ্ধান্তে স্পষ্ট ছিল ঃ

> ***The All Assam Ahom Association has been agitating since Sept. 1944 for the establishment of a separate sovereign state of Assam—a demand which was later endorsed by Assam's Tribes and Races".***

সম্প্রতি Yasmin Saikia (তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Fragmented Memories : Struggling to become Tai-Ahom in India* ছাড়াও 'The Tai-Ahom Connection' প্রবন্ধে) প্রমাণ করেছেন কীভাবে সাম্রাজ্যবাদের প্রচলিত নীতি 'divide and rule' (ভাগ করো, শাসন করো) প্রয়োগ করে **ব্রিটিশ শাসকরা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন এনেই ক্ষান্ত হননি, এমনকি আসামের ক্ষেত্রেও আহোম এবং অসমিয়াদের মধ্যেও প্রথম ভেদরেখা টেনেছিলেন**। Yasmin Saikia-র তথ্য অনুযায়ী, আসামে প্রথম ব্রিটিশ রেসিডেন্ট J. P. Wade-এর নির্দেশমতো Walter Hamilton-Buchannan প্রথম ১৮২৮ সালের *East India Gazetteer*-এ 'Ahom' শব্দটি ব্যাপকভাবে চালু করলেন। যদিও ব্রিটিশ সমাজতত্ত্ববিদ ও প্রশাসকরা (E. T. Dalton, Alexander Mackenzie, H. H. Risley, L. A. Waddell) আহোম ও অসমিয়াদের মিশ্রণের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তথাপি একই সাথে তাঁদের লেখায় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল কীভাবে এর ফলে এক সময়ের 'গৌরবশালী' 'শান' জাতির উত্তরাধিকারীরা অসমিয়াদের মতো অবশেষে 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পশ্চাদপদ, অলস' জাতিতে পরিণত হয়েছে। যদিও আহোম রাজাদের কাছ থেকে ব্রিটিশ শাসকরা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার পর নানাভাবে আহোমদের দীর্ঘদিনের প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত করার অধ্যায় শুরু হয়েছিল, কিন্তু এরপরও আহোমদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনের অন্ত ছিল না। আসামের চিফ্ কমিশনার Lt. Col. P. R. T. Gurdon মন্তব্য করেছিলেন ঃ

"The condition of the old Ahom aristocracy becomes worse and worse each year, owing chiefly to the failures of its members to realize the new conditions of life...In educational matters the Ahoms are more backward than even the ordinary Assamese Hindus". (একই ধরনের কুম্ভীরাশ্রু মুঘল সম্রাটদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার পর ভারতীয় মুসলিমদের জন্য ব্রিটিশ শাসকরা বিসর্জন দিয়েছিলেন)। যাইহোক, **একইসঙ্গে আহোমদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং অন্যদিকে আসামের সমাজে আহোমদের শোচনীয় অধঃপতনের চিত্র অঙ্কনের ফলেই AAAA-এর মতো সংগঠনের জন্ম সম্ভব হয়েছিল**। দেবব্রত শর্মা তাঁর "Tai-Ahoms : From Social Mobility to Political Aspirations" প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, কীভাবে ব্রিটিশ-অনুসৃত নীতি *...had soon turned the Ahom overnight from princes into paupers, from benefactors into beneficiaries, from lords into untouchables, thus had to fight a bitter struggle for survival and re-emergence.*

চিন এবং থাইল্যান্ড থেকে ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) হয়ে আহোমরা আসামে প্রবেশ করে ১২২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে দীর্ঘ ৬০০ বছর রাজত্ব করেছিল। মঙ্গোলীয় 'তাই' জনজাতির শাখা হিসাবে কীভাবে 'আহোম' নামের আগে 'তাই' শব্দটি যুক্ত হল, বর্তমান গ্রন্থের (প্রথম খণ্ড) তৃতীয় অধ্যায়ে সেই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ১৯৬৮ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ্মেশ্বর গোগুই-এর *Tai and the Tai Kingdoms with a Fuller Treatment of the Tai-Ahom Kingdom in the Brahmaputra Valley* গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। গ্রন্থটির নাম থেকেই আন্দাজ করা যায় 'তাই'দের সম্পর্ক অনেক অজানা তথ্য গ্রন্থটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। **এই 'তাই' তত্ত্বকে কেন্দ্র করে বর্তমান 'তাইল্যান্ড'/'থাইল্যান্ড'-এর সাথে আহোমদের নাড়ির সম্পর্ক টানার অধ্যায় সেদিন থেকে শুরু হয়েছিল** AAAA-এর প্রত্যক্ষ উদ্যোগে। কিন্তু এটি হল স্বাধীনোত্তর কালের চিত্র।

ব্রিটিশ আসামে AAAA-র প্রধান স্থপতি পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন (Indian Councils Act) চালু হওয়ার আগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে নানা প্রতিবেদনের মাধ্যমে Assam Legislative council বা বিধান পরিষদে আহোমদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের দাবি তোলেন এবং ব্রিটিশ শাসকরা সেই দাবি মেনে নেন। **সংখ্যালঘু আহোম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া ১৯১২ সালে Assam Legislative Council-এর**

সদস্যপদ লাভ করেন এবং ১৯১৬ সাল পর্যন্ত আসাম বিধান পরিষদে আহোমদের নানা সমস্যার সমাধান চান। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট অনুযায়ী The Government of India Act (919) চালু হওয়ার আগে ১৯১৮ সালে কলকাতায় Lord Southborough (Chairman of the Franchise Committee)-র কাছে আসামে সরকারি চাকুরি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সহ সমস্ত গণতান্ত্রিক সংস্থায় আহোমদের যথাযোগ্য স্থান প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ ১২ পৃষ্ঠার এক প্রতিবেদন AAAA নেতা পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া পেশ করেন। **এইভাবে Muslim League-এর সুরে AAAA নানা প্রতিবেদন ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করে, যার মধ্যে আহোমদের জন্য আসামে স্বতন্ত্র অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত হয়।** প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সেই সময় শিবসাগর এবং লখিমপুর জেলায় (বর্তমানে এটি ৭টি জেলায় বিভক্ত ঃ শিবসাগর, লখিমপুর, জোড়হাট, গোলাঘাট, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া ও ধেমাজি) অর্থাৎ **'আপার-আসামে' ছিল মূলত আহোমদের অধিবাস। শুধু তাই নয়, সেন্সাস্ রিপোর্ট সহ সরকারি দলিলে আহোমদের 'হিন্দু' হিসাবে চিহ্নিত না করার জন্যও AAAA জোরালো দাবি উত্থাপন করে।** গিরিন ফুকন তাঁর এক প্রবন্ধে ('Search for Ahom Identity in Assam : In Retrospect') উল্লেখ করেছেন ঃ

> *They (Ahom Association) opposed, rather strongly, the proposed scheme for tabulaing the Ahom as 'Hindu', and demanded that the word 'Ahom' be retained in the census Report of 1941.*

১৯৪১ সালে (৫-৬ এপ্রিল) শিবসাগরে অনুষ্ঠিত AAAA-এর সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে রায় বাহাদুর রাধাকান্ত হ্যান্ডিক আগামীদিনের ভারত সংবিধানে আহোমদের জন্য 'separate electorate'-এর উপর সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

AAAA-এর একজন খ্যাতিমান আহোম নেতা ছিলেন কলকাতা থেকে আইনের স্নাতক হয়ে ফিরে আসা সুরেন্দ্রনাথ বুরাগোহাইন। প্রথমদিকে সুরেন্দ্রনাথ বুরাগোহাইন (১৯০৪-৫৩) AAAA-এর কর্মসূচির সাথে একমত ছিলেন না, বরং তিনি ১৯৪১ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসেরই সক্রিয় সদস্য ছিলেন (কারণ তাঁর ধারণা ছিল কংগ্রেস মঞ্চ থেকেই আহোমদের ন্যায়সংগত দাবি আদায় সম্ভব)—এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন রমেশ বুরাগোহাইন তাঁর সাম্প্রতিক এক প্রবন্ধে। রমেশ বুরাগোহাইন-এর মতে, যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুরেন্দ্রনাথ বুরাগোহাইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায় সেটি এইরকম ঃ ১৯৩৫ সালের আইন মোতাবেক সৃষ্ট আসাম বিধানসভায় শিবসাগর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস দলের আহোম নেতা ভুবনচন্দ্র

গোগুই নির্বাচিত হয়েছিলেন। যদিও AAAA-এর দাবিমতো আহোমদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী/আসন ব্রিটিশ সরকার গ্রাহ্য করেনি ; তথাপি ১৯৪১ সালে ভুবনচন্দ্র গোগুই-এর মৃত্যুর পর উপ-নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস যে আহোমদেরই কাউকে ঐ আসনের প্রার্থী করবে এইরকম প্রত্যাশা আহোমদের ছিল। আসামে কংগ্রেস নেতাদের কাছে AAAA অনেক আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও সেই প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের নির্বাচনে স্বতন্ত্রভাবে AAAA অংশগ্রহণ করে এবং যে কজন আহোমকে প্রার্থী করা হয়েছিল, তারা সকলেই জয়ী হন এবং সুরেন্দ্রনাথ বুরাগোহাইন বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। এই ঘটনার পরই আহোম রাজনীতির ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যদিও সুরেন্দ্রনাথের সাথে আসামে মুসলিম লিগের শাদুল্লাহ মন্ত্রীসভার ঘনিষ্ঠতা অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখতেন ; তথাপি AAAA-এর বৃহত্তর রণকৌশলের অঙ্গ হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ আবার কংগ্রেস দলে ফিরে যান। স্বাধীনোত্তর ভারতে জওহরলাল নেহরুর প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আসাম থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথ স্থান পেয়েছিলেন। AAAA-এর দুই কর্ণধার রাধাকান্ত হ্যান্ডিক এবং সুরেন্দ্রনাথ বুরাগোহাইন-এর যথাক্রমে ১৯৫২ এবং ১৯৫৩ সালে মৃত্যুর ফলে সমগ্র সংগঠন সহ আহোম রাজনীতিতে গভীর শূন্যতা নেমে আসে।

১৯৮০-র দশক থেকে AAAA-এর নেতৃত্বে আহোম জাতীয়তাবাদ আবার সক্রিয় হয়। অসমিয়াদের সাথে আহোমদের ভেদরেখা আরও স্পষ্ট করার জন্য পুরাতন অনেক তত্ত্ব বাতিল করার সুপারিশ করে AAAA—যেমন, জাতপাত-বিহীন আহোমদের ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ইত্যাদি অনেক কিছুই হিন্দু ধর্মভুক্ত অসমিয়াদের থেকে ভিন্ন। বর্তমানে আহোমরা তাদের ধর্মকে 'Phra Lung' নামে প্রচার করে—যার মধ্যে প্রকৃতি সহ পূর্বপুরুষের আরাধনা, বন্দনা ইত্যাদি অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত। এই ধর্মের চরিত্র, অমলেন্দু গুহ'র ভাষায়, "a form of animism tinged with elements of ancestor-worship with that of degenerated Tantric Buddhism and tribal fertility cults." হিতেশ্বর শইকিয়ার (যিনি নিজেকে 'Ahom-Assamese' বলতেন) মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে (১৯৮৩-৮৫, ১৯৯১-৯৬) AAAA-এর অধিনায়কত্ব আহোমদের পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। যদিও আসামে বর্তমানে আহোমদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষের মতো ; তথাপি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা 'তাই' জনগোষ্ঠীকে একটি মঞ্চে আনা সহ ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে ৮০-র দশক থেকে থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং পাশ্চাত্যের নানা দেশে আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার রেওয়াজ

শুরু হয়। 'তাই' জনগোষ্ঠীর প্রধান কেন্দ্র। পূর্বতন 'শ্যাম'দেশ (Siam)—যেটি ১৯৩৯ সাল থেকে তাইল্যান্ড/থাইল্যান্ড নামে পরিচিত—'তাই-আহোম' পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎসস্থল ছিল। ২০০৫ সালে AAAA সহ বিভিন্ন আহোম সংগঠনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে **'ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স' গুয়াহাটি-ব্যাংকক্ (থাইল্যান্ডের রাজধানী) উড়ান চালু করতে বাধ্য হয়েছিল** ; যদিও সেটি লাভজনক না হওয়ার কারণে শেষপর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। যাইহোক, আহোমদের পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন যে আন্তর্জাতিক মদতপুষ্ট সেটি সহজেই অনুমান করা যায়। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে থাইল্যান্ডের রানি Maha Chakri Sirindhorn তিন দিনের আসাম সফরে আসার সময় সমগ্র আপার-আসাম (আহোমদের মূল বাসস্থান) উৎসবের সাজে সেজেছিল।

আসামে যেহেতু ব্যক্তির নাম থেকে অনেক সময় আহোম কিংবা অসমিয়া বোঝা কঠিন হয়, এরই জন্য AAAA ইদানীং আহোম নাগরিকের নামের আগে 'Chao'/'চাও' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী—যেমন, চাও লোকেশ্বর ফুকন, চাও মৃদুপবন লাহন, চাও হীরালাল বরফুকন, চাও হেম বুরাগোহাইন ইত্যাদি। **আসলে আহোম রাজাদের অসমিয়া ভাষায় 'স্বর্গদেও' বলা হলেও, আহোম ভাষায় কিন্তু 'চাও-পা' বলা হত।** রাজাদের বংশধরদের কাছে এরই জন্য 'চাও' নামটি বড়ো প্রিয়।

AAAA-এর বর্তমান সভাপতি চাও কিরণকুমার গোগুই-এর ভাষ্য অনুযায়ী, আহোমদের দুটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আসামের বর্তমান রাজনীতিতে রীতিমতো উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটি হল, স্বাধীনোত্তর ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী, যদিও সংখ্যালঘু **আহোমরা বর্তমানে OBC গোষ্ঠীভুক্ত** ; কিন্তু চাকুরিসহ বিশেষ কিছু সুবিধা ও সংরক্ষণের রক্ষাকবচের লক্ষ্যে আহোমরা ST বা তপশিল উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতির দাবি জানাচ্ছে। এই ব্যাপারে 'তাই-আহোমরা' আসামের অন্যান্য জনগোষ্ঠী—যেমন, মোরান, মটক, চুটিয়া, কোচ রাজবংশী, সিংফো, তাই-খামতি সহ চা বাগানের আদিবাসীদেরও সাথী হিসেবে পেয়েছে। দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি নিয়ে AAAA বর্তমানে বেশি সরব সেটি **আসামের নাম পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি** হয়েছে। ২০০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর আসাম বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে **'আসাম' নামের পরিবর্তে 'অসম' করার প্রস্তাব গৃহীত হয়** ; যদিও এটি পার্লামেন্টের অনুমোদন এখনো না পাওয়ায় কার্যকরী হয়নি। প্রস্তাবে উল্লেখ ছিল 'Assam'/ 'আসাম' একটি ইংরেজি নাম ; অতীতে হালিরাম ঢেকিয়াল ফুকন সহ অনেক পণ্ডিত অসমতল ভূমির জন্য রাজ্যটির প্রকৃত নাম যে এক সময় 'অসম' ছিল এই

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু AAAA এইরকম ব্যাখ্যার ঘোরতর বিরোধী এবং 'আসাম' শব্দটি যে ব্রিটিশ যুগের অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল (যেমন, মুঘল দলিলে কিংবা আহোম বুরঞ্জিতে, কিংবা ১৬৬২-তে প্রকাশিত ওলন্দাজদের মানচিত্রে ইত্যাদি) সেটি নানাভাবে প্রমাণ করে, এটি যে ইংরেজি শব্দ নয়—সেই ব্যাপারে শক্তিশালী জনমত গঠন করতে পেরেছে। ২০০৭ সালে আহোম রাজাদের এক সময়ের রাজধানী রংপুর শহর প্রতিষ্ঠার ৩০০ বছর পূর্তি উৎসবের সময় নাম-পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। আসলে, AAAA মনে করে, 'আসাম' নামটির সাথে আহোমদের অস্তিত্ব জড়িত (আহোম ভাষায় 'আ' = জমি বা স্থান, 'সাম' = আসলে, 'শান' জনগোষ্ঠীর অপভ্রংশ এবং আহোমরা মঙ্গোলীয় 'শান্'-দেরই বংশধর) এবং এইরকম ভাষ্য অনুযায়ী, নামটি পরিবর্তন করে 'অসম' করলে (যেটি 'অসম সাহিত্য সভা' ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু থেকে করে আসছে) আহোম জাতিসত্তা পুরোপুরি বিনষ্ট হবে বলে AAAA আশঙ্কা করে। এইভাবে 'আসাম' নামটি কেন্দ্র করেও আহোম এবং অসমিয়াদের বিতর্ক আজ সৃষ্টি হয়েছে।

একবিংশ অধ্যায়

জাতি, জাতীয়তাবাদ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও আসাম (Nation, Nationality, World War I and Assam)

২১.১ জাতি ও জাতীয়তাবাদ

'Nation' শব্দটি থেকেই এসেছে 'Nationalism', যদিও 'Nation'-এর সঠিক কোনো বাংলা প্রতিশব্দ হয় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমরা অবশ্য 'জাতি', 'জাতীয়তা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। 'জাতি' শব্দের সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজ ঐতিহাসিক Hugh Seton-Watson (১৯১৬-৮৪), যিনি সমগ্র জীবন জাতিতত্ত্ব এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে গবেষণা করেছেন শেষ পর্যন্ত 'বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা' সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন :

> *I am driven to the conclusion that no 'scientific definition' of a nation can be devised; yet the phenomenon has existed and exists.*

এইসব জটিলতা ও বিতর্ক সত্ত্বেও যে দুটি মূল উপাদান ছাড়া একটি জাতিকে চিহ্নিত করা যায় না, সে দুটি হল ঃ (১) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (২) সেই ভূখণ্ডে বসবাসকারী এক নির্দিষ্ট জনসম্প্রদায়। এই দুটি ব্যাপারে পণ্ডিতদের মধ্যে তেমন বিতর্ক নেই। মোটামুটিভাবে বলা যায়, একটি জনসম্প্রদায় তখনই জাতি হয়ে ওঠে যখন তারা এক মানসিক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আপন স্বকীয়তা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে এবং সমাজের অভ্যন্তরে নানারকম বহুত্ব ও বিভেদের প্রাচীর অতিক্রম করে বিরুদ্ধ-শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের সংহতির জয়গান গায়। কিন্তু এই ঐক্যের উৎসটা কী? এটা কি ভাষাগত? ধর্মগত? সংস্কৃতিগত? বৈষয়িক স্বার্থগত ঐক্য?—ভারতবর্ষের মতো দেশে শুধু একটামাত্র মানদণ্ডে জাতি-গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা প্রতিমুহূর্তে হোঁচট খাব। 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান'-এর এই দেশে জাতি-গঠনের মূল উপাদান নিহিত থাকে এক আত্মিক উৎসে, যাকে ঠিক একটি মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না। উজ্জ্বল কোনো ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বা সাংস্কৃতিক পরম্পরা, ইতিহাসের কোনো বিশেষ সংকট, অথবা বিশেষ এক চিন্তাস্রোতে সম-অবগাহন থেকেই এই আত্মিক শক্তি তথা জাতি জন্ম নিতে পারে।

২১.২ ভারত কি 'এক জাতি'?

ভারতবর্ষে জাতি ও জাতীয়-চেতনা নিয়েও নানা মুনির নানা মত। (১) কিছু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক (বিশেষত কেমব্রিজ-গোষ্ঠী) মনে করেন, ভারতবর্ষে জাতি-গঠন প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও প্রকৃতপক্ষে হয়নি। ভারতবর্ষের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্বার্থপর ও হতাশাগ্রস্থ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের হট্টগোল বা 'চিলচিৎকার' হিসেবে চিহ্নিত করে শুধু যে ঐসব ঐতিহাসিক হেয় করেছেন তাই নয়, এক কথায় বাতিলও করে দিয়েছেন। নিজেদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ঐসব কেমব্রিজ ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, ১৯২৫ সালে যখন ভারতবর্ষে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মধ্য-গগনে ; সেই বছরেই 'রাষ্ট্রগুরু' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ *A Nation in the Making* ('একটি জাতি তৈরির পথে') প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং তাঁদের সিদ্ধান্ত হল, জাতিই যেখানে পুরোপুরি তৈরি হয়নি ; সেখানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুরাশা মাত্র। (২) ভারতের জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্পর্কে দ্বিতীয় ধারণাটি—অর্থাৎ, 'এক দেশ, এক জাতি, এক প্রাণ' একটি জনপ্রিয় তত্ত্ব। (৩) তৃতীয় যুক্তিটি ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমানে বিভক্ত 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'—মুসলিম লিগের যে 'পাকিস্তান তত্ত্বের' উপর নির্ভর করে দেশভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। (৪) চতুর্থ ধারণাটি হল ঃ আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম এবং জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ভারতবর্ষ যেখানে অনেক জাতি ও উপজাতি বিদ্যমান। বর্তমানে ২৮টি অঙ্গরাজ্য এবং ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত ভারতবর্ষ আসলে একটি 'বহুজাতিক' ('multination') বহুভাষাভাষী, বহুধর্মাবলম্বীর দেশ—যেখানে 'ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ' ('little nationalism')—(যেটিকে সাধারণত 'আঞ্চলিকতাবাদ' বলা হয়) এবং 'বৃহৎ জাতীয়তাবাদ' ('great nationalism')-এর ধারা একই সাথে প্রবহমান। জাতীয়তাবাদী চিন্তার এই বিচিত্র গতিপথ সম্পর্কে সচেতন না থাকলে অসমিয়া জাতীয়তাবাদ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক সঠিকভাবে উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে যায়। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' ('Unity in diversity') শুধু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রশ্নেই নয়, সমগ্র ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিরও মর্মবাণী। আসলে, শুধুমাত্র ভারতবর্ষই নয়, পৃথিবীর অনেক দেশই 'বহুজাতিক' এবং 'Nationalism is a strong social phenomenon in the world'—সেটি ছোটো বড়ো যে কোনো জাতীয়তাবাদী চেতনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

২১.৩ জাতি ও জাতীয়তাবাদের উৎস ও চরিত্র

'জাতি ও 'জাতীয়তাবাদ' নিয়ে যেমন নানারকম ধারণা আছে, ঠিক তেমনি জাতীয়তাবাদের কারণ ও চরিত্র সম্পর্কেও নানারকম মতামত আছে। তবে জাতীয়তাবাদ যে একটি আধুনিক চেতনা এবং ইউরোপ থেকে উদ্ভূত—এই ব্যাপারে মোটামুটি অনেক পণ্ডিতই একমত। একটা দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অতীতের অনেক 'মিথ্' বা প্রতীক (Symbol) ব্যবহৃত হলেও, প্রাচীন বা মধ্যযুগের ইতিহাসে আমরা যদি প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সন্ধান করতে যাই, তাহলে পদে পদে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদিও আধুনিক ইউরোপের কোন্ দেশে কীভাবে প্রথম জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল সেটি সম্পর্কে কিছুটা বিতর্ক আছে, তথাপি সামন্ত-যুগের অবসানের পর ইউরোপে ধনতন্ত্র বিকশিত হওয়ার সাথে সাথেই যে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ হয়েছিল সেই প্রশ্নে তেমন তীব্র মতভেদ নেই। এই ব্যাপারে 'মহান ফরাসি বিপ্লব'-কে (১৭৮৯) একটি মাইল-ফলক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এক কথায়, জাতীয়তাবাদ একটি আধুনিক এবং ইউরোপীয় ধারণা এবং সেখান থেকেই সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, 'গুটেনবার্গ বিপ্লব'-এর সাথে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আন্দোলনের যে নাড়ির সম্পর্ক—এই রকম অভিমত কেউ কেউ ব্যক্ত করেন। জার্মান স্বর্ণকার ও মুদ্রাকর গুটেনবার্গ (১৩৯৮-১৪৬৮) পঞ্চদশ শতকে (আনুমানিক ১৪৩৯ খ্রিস্টাব্দে) যেদিন মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রচলন করলেন (যেটি 'গুটেনবার্গ বিপ্লব' নামে প্রচলিত) এবং সাধারণের মতামত ব্যক্ত করার জন্য সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটল—সেই সময় থেকেই জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। আসামের ক্ষেত্রে *অরুণোদয়* পত্রিকা (১৮৪৬-৮৩) এই প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যেহেতু 'জাতি' একটি 'কাল্পনিক জনগোষ্ঠী' ('Imagined Community') এরই জন্য মন্তব্য করা হয়—*The spread of print technology made it possible for enormous number of people to know each other indirectly, for the printing press became the middle man to the imagination of the community.* প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ইতিহাস থেকে সংগৃহীত আসামের যুদ্ধজয় সহ গৌরবময় কাহিনির পরিবেশন ইত্যাদি জাতীয় চেতনাকে নানাভাবে পুষ্ট করেছিল।

তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদী চেতনার অভ্যুদয়ের সাথে ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশ, যোগাযোগ সম্প্রসারণ, শিল্পায়ন, নগরীকরণ, শিক্ষা, মধ্যবিত্তের উদ্ভব ইত্যাদি প্রশ্নগুলি কত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি ; কিন্তু একই সাথে একটা শত্রু-প্রতিকল্পও ভিতরে কাজ করে, কারণ একটা প্রবাদ আছে ঃ "We are one people—our enemies have made us one." সমাজ ও অর্থনীতিতে যে বৈষম্য পরস্পরের মধ্যে আছে সেটি কিছুটা উপেক্ষা করে একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী মাঝে মাঝে তথাকথিত কাল্পনিক বা বাস্তব 'শত্রু'র বিরুদ্ধে জাতি-চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়। **ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মুখর প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদ জন্ম নিয়েছিল**। এই কারণেই মন্তব্য করা হয় ঃ "The 'nation' exists only in the minds and hearts of people. it is an idea."

চতুর্থত, জাতীয়তাবাদের ভালো এবং মন্দ—এই উভয় দিকের প্রতি পণ্ডিতরা বারবার অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। দেশপ্রেম বা স্বাদেশিকতার ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ কখনোই অকল্যাণকর নয় ; বরং সেটি কাম্য। ঔপনিবেশিক আসামে অসমিয়া জাতীয়তাবাদের চরিত্র ছিল কিছুটা ঐরকম ; কারণ একটি জনগোষ্ঠীর ভাষা ও লিপি, নিজস্ব সংস্কৃতি বা স্বাতন্ত্র্যবোধ হুমকির মুখোমুখি হলে তার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে 'আসাম আন্দোলন'-এর সময় (১৯৭৯-৮৫) 'বিদেশি-বিতাড়ন' দোহাই দিয়ে যে উগ্র-জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল সেটি জাতীয়তাবাদের এক নগ্ন বীভৎস মূর্তি এবং নিঃসন্দেহে অকল্যাণকর। এইভাবেই উগ্র-জাতীয়তাবাদ থেকে জন্ম নেয় ফ্যাসিবাদ, যেটিতে ইতালি, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন সময়ে আক্রান্ত হয়েছিল। সুতরাং **জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দুটি রূপ আছে ঃ একটি দেশপ্রেম** থেকে উদ্ভূত (বাংলায় যেমন রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি", কিংবা **আসামের ক্ষেত্রে যেমন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া রচিত এবং কমলাপ্রসাদ আগরওয়ালা সুরারোপিত "ও মুর আপুনর দেশ"** ইত্যাদি জাতীয়-সংগীতের মাধ্যমে প্রতিফলিত) এবং অন্যটি **উগ্র জাতীয়তাবাদ** থেকে উপজাত (সমগ্র ভারতবর্ষে যেমন বিভিন্ন উগ্র সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের নানা নজির আছে)।

উপরোক্ত কাঠামোর উপর ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রামে আসামের ভূমিকার বিচিত্র গতি আলোচনা করা যেতে পারে।

২১.৪ ব্রিটিশ-আসামের ক্রমবর্ধমান সীমানা

১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানি অধিকার লাভ করার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে উত্তর-পূর্ব ভারতের—বিশেষত মণিপুর, জয়ন্তিয়া, কাছাড় ও আসাম—এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। এইসব অঞ্চলগুলি সেই সময় বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত হিসেবেই গণ্য হত। বর্মীরা যখন আসাম আক্রমণ করে, সেই সময় বর্মীদের বিতাড়ন করতে এসে গভর্নর জেনারেল-এর এজেন্ট ডেভিড স্কট্ ১৮২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রচারপত্রের মাধ্যমে আশ্বাস দিয়েছিলেন ঃ আসাম দখল করতে কোম্পানির সেনাবাহিনী আসেনি ; বর্মী দুঃশাসন থেকে আসামের মানুষকে মুক্ত করাই কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য (বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১০.৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ডেভিড্ স্কটের সেই প্রতিশ্রুতি কোম্পানি রক্ষা করেনি ; বরং বর্মীদের সাথে কোম্পানির ১৮২৬ সালের ইয়ান্দাবো চুক্তির সূত্র ধরে আসাম দখলের অধ্যায় শুরু হল। আহোম-শাসিত আসাম ছাড়াও জয়ন্তিয়া, কাছাড়, খাসি পাহাড়, নর্থ কাছাড় হিলস্, নাগা পাহাড়, গারো পাহাড়, লুসাই (মিজো) পাহাড় ইত্যাদি একে একে আসামের অঙ্গীভূত হল—সেই কাহিনি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগে আসামের সীমানা ক্রমাগতই প্রসারিত হয়েছে। অমলেন্দু গুহ'র ভাষায় ঃ

> *The boundaries of the British power in Northeast India were in fact always moving, always in a flux, right up to its last days in India.*

যে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে একটি নির্দিষ্ট জাতি ও জাতীয়তাবোধ বিকশিত হয়, সেটি আসামের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন-গোত্রের ছিল। যাইহোক, ঔপনিবেশিক যুগে 'আসাম'-এর যে রাজনৈতিক মানচিত্র তৈরি হয়েছিল সেটি মোটামুটি ১৮৭৪ পর্যন্ত ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করেই গঠন করা হয়েছিল বলা যায়। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে এত বড়ো ভূখণ্ডের উপর কোনো একজন রাজা বা শাসকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা দেখা যায়নি। **১৮২৬ থেকে ১৮৭৩ পর্যন্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'র অঙ্গ হিসেবেই আসাম ছিল** এবং কলকাতা থেকেই সবকিছু পরিচালিত হত। **১৮৭৪ সালে শিলং-এ রাজধানী সহ চিফ-কমিশনার শাসিত রাজ্য হিসেবে আসাম স্বতন্ত্র মর্যাদা পায় ; যদিও বঙ্গদেশের সিলেট/শ্রীহট্টকে আসামের অঙ্গীভূত করা হয়েছিল,** যেটি ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

২১.৫ সিলেট্ ও আসামের গঠন প্রক্রিয়া

সিলেট্-কে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার নানা যুক্তি/অজুহাত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দেখিয়েছেন। মূল কারণটি ছিল : পাহাড় ও সমতল নিয়ে ১৮৭৪ সালে বিশাল আসামের জনসংখ্যা তেমন ঘন ছিল না এবং প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য ভূমি রাজস্ব আদায় হত নামমাত্র। এই রাজস্বের বৃদ্ধিসহ 'divide and rule' ('ভাগ করো, শাসন করো') নীতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়েই **বাঙালি-অধ্যুষিত শ্রীহট্ট/সিলেটকে ১৮৭৪ সালে আসামের অঙ্গীভূত করা হয়েছিল।** বাংলার সমকালীন জনমত (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) এই অন্তর্ভুক্তির তীব্র বিরোধী ছিল—যেটি ১০ আগস্ট ১৮৭৪-এ ভাইসরয়ের কাছে লেখা প্রতিবেদনে স্পষ্ট। *Hindu Patriot* পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্টদাস পাল (৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ সম্পাদকীয়) 'স্বর্ণগর্ভা' সিলেটকে আসামের প্রশাসনিক ব্যয় সংকুলানের জন্য এইভাবে বিসর্জনের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন : "মমতাবিহীন কালস্রোতে/বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে/নির্বাসিতা তুমি/সুন্দরী শ্রীভূমি।" এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অবিভক্ত বঙ্গের অনুভূতি সহজেই অনুমেয়। একইভাবে আসামের মানুষও এই ব্রিটিশ পদক্ষেপকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি ; কারণ জমি-জায়গা সহ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে উন্নত বাঙালিদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রশ্নটি জড়িয়ে ছিল যেক্ষেত্রে আসামের মানুষ তুলনামূলকভাবে দুর্বল ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোনো আবেদন বা প্রতিবাদকে আমল দেননি। **যদিও ১৮৩৭ সালে আসামে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার প্রবর্তন অবশেষে ছোটোলাট George Campbell-এর নির্দেশে ১৮৭৩ সালে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল এবং অসমিয়া ভাষা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ; তথাপি মূলত ভাষার উপর ভিত্তি করেই অসমিয়া জাতীয়তাবাদ (linguistic nationalism) যাত্রা শুরু করেছিল। যাইহোক, ১৮৭৪ সালে সৃষ্ট আসামের গঠনটি ছিল এইরকম :** (১) প্রাক-সাক্ষর বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চল ; (২) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমিয়া-ভাষী পাঁচটি জেলা (কামরূপ, দরং, নওগাঁও, শিবসাগর ও লখিমপুর)—যেটি প্রকৃতপক্ষে আসাম হিসেবে চিহ্নিত (পরবর্তী সময়ে ঐ পাঁচটি থেকে আরও অনেক জেলার উৎপত্তি হয়েছে) ; (৩) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গোয়ালপাড়া—যেখানে বাঙালি ও অসমিয়া সংস্কৃতি প্রায় মিশ্রিত; (৪) সুরমা উপত্যকার দুটি বাঙালি-অধ্যুষিত জেলা—সিলেট্ (শ্রীহট্ট) এবং কাছাড়। ঔপনিবেশিক শাসনে আসামের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে গেলে রাজ্যটির এই গঠন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন।

সারণি ৯
আসামের বিভিন্ন উপত্যকা ও পাহাড়ের জনসংখ্যা (হাজার হিসাবে)

সন	ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা (মিকির পাহাড়সহ)	সুরমা উপত্যকা (নর্থ কাছাড় পাহাড়সহ)	পার্বত্য জেলা (মিকির ও নর্থ কাছাড় ছাড়া)	মোট
১৮৭২	১,৯১৭	১,৯৫৫	২৯০	৪,১৬২
১৮৮১	২,২৫১	২,২৮৫	৩৭২	৪,৯০৮
১৮৯১	২,৪৭৬	২,৫৩৪	৪৫৯	৫,৪৭৮
১৯০১	২,৬১৮	২,৭০০	৫২৪	৫,৮৪২
১৯১১	৩,১০৭	২,৯৭৩	৬৩৪	৬,৭১৪
১৯২১	৩,৮৫৬	৩,০৭০	৬৮০	৭,৬০৬
১৯৩১	৪,৭২৩	৩,২৯৫	৭৮৪	৮.৮০২
১৯৪১	৫,৭৬২	৩,৭৫৮	৮৯৮	১০,৪১৮

Source : Amalendu Guha, *Planter Raj to Swaraj*, p. 279, Appendix 2.

উপরোক্ত সারণি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, ১৯০১ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তুলনায় বাঙালি অধ্যুষিত সুরমা উপত্যকার জনসংখ্যা বেশি ছিল। ১৮৭৪ সালে এই সুরমা উপত্যকাকে আসামের সাথে যুক্ত করার ফলেই জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে আহোমদের শাসিত অঞ্চলই 'আসাম' নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে ক্রমাগত সীমানাবৃদ্ধির ফলে আসাম শুধুমাত্র বিভিন্ন ভাষা-ভাষী অঞ্চলেই নয়, জাতি-উপজাতি অধ্যুষিত একটি রাজ্যেও পরিণত হল। ধর্মের আঙ্গিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হিন্দু-গরিষ্ঠ, সুরমা উপত্যকা মুসলিম-গরিষ্ঠ থাকায় সমগ্র আসামে সেই সময় এক তৃতীয়াংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিল। এক কথায়, ঔপনিবেশিক আসামের জনগোষ্ঠী ছিল "multi-ethnic, multi-religious, multi-linguistic." এক সময় আহোম রাজাদের অধীনস্থ সকলেই 'অসমিয়া' হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং 'অসমিয়া' শব্দটি ছিল একটি 'political category'। কিন্তু কালক্রমে শব্দটি 'Cultural and linguistic category' তে পরিণত হয় এবং 'আহোম' ও 'অসমিয়া' শব্দের মধ্যে ভেদরেখা দেখা যায় (**বিংশ অধ্যায়ে 'আহোম অ্যাসোসিয়েশন' দ্রষ্টব্য**)। বোরো, মিশিং, রাভা, লালুং, দেউরি, মোরান, মটক, বোরাহি, চুটিয়া প্রভৃতি আদিবাসী ছাড়াও বাংলাভাষী জনসংখ্যাও আসামে কম ছিল না। উপরোক্ত নানা কারণে আসামে জাতীয়তাবাদের চরিত্র কিছুটা জটিল হয়ে যায়।

২১.৬ ব্রিটিশ-বিরোধিতার প্রথম পর্ব

১৮২৬ সালে ইয়ান্দাবো চুক্তির দু-তিন বছরের মধ্যেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সশস্ত্র বিরোধিতায় আহোম অভিজাতদের প্রতিনিধি হিসাবে প্রথম গোমধর কুঁওর এবং রূপচাঁদ কুঁওর যথাক্রমে ১৮২৮ এবং ১৮২৯ সালে এগিয়ে আসেন। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনা নায়করা খুব সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহে নেতৃত্বদানের অভিযোগে ১৮২৯ সালে পিয়ালি বরফুকনের ফাঁসি হয়।

১৮৩০-৩৬ সালে ব্রহ্মদেশের সীমান্তে অবস্থিত সিংফো উপজাতি বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ব্রিটিশ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সিংফো সর্দাররা উপরোক্ত আহোম অভিজাতবর্গের সাথে এবং খাসি স্বাধীনতা সংগ্রামের (১৮২৯-৩৩) বিখ্যাত নেতা U. Tirot Singh (১৮০২-৩৪)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের সময় আসামের ভূমিকা এবং মণিরাম দেওয়ান ও পিয়ালি বরুয়ার ফাঁসির কাহিনি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৬০-এর দশকে ফুলাগুড়ি থেকে শুরু হওয়া একটার পর একটা কৃষক-বিদ্রোহের বীরত্বপূর্ণ কাহিনি কম উল্লেখযোগ্য নয়। যদিও ঐসব বিদ্রোহ ছিল শ্রেণিভিত্তিক ; কিন্তু একই সাথে ঐসব অভ্যুত্থান ছিল সামগ্রিক অসন্তোষেরই প্রতিফলন। যদিও উন্নত শক্তির মুখোমুখি হয়ে এইসব বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানের বিপর্যয় অনিবার্য ছিল ; তথাপি ঐসব প্রতিবাদের অধ্যায় যে জাতীয় চেতনার উন্মেষকে প্রভূতভাবে সাহায্য করেছিল —একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভারতবর্ষে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলিই যে পরোক্ষভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারে সহায়ক হয়েছিল—এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চরমপন্থী আন্দোলনের অন্যতম নেতা লালা লাজপৎ রাই মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> *....the methods of the English Government in India, their educational system, their press, their laws, their courts, their railways, their telegraphs, their post offices, their steamers, had much to do with it as the native love of country.*

যে তত্ত্বটি সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আসাম তার ব্যতিক্রম নয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ উন্মেষের ক্ষেত্রে এরই জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাকে **'ইতিহাসের অবচেতন যন্ত্র' "Unconscious tool of history"** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

২১.৭ আধুনিক রাজনৈতিক সচেতনতার প্রতিফলন

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আধুনিক রাজনৈতিক সচেতনতার প্রথম প্রমাণ দেখা যায় ১৮৫৩ সালে যখন সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক A. J. Moffat Mills-এর কাছে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯-৫৯) এবং মণিরাম দেওয়ান (১৮০৬-৫৮) লিখিত প্রতিবেদন পেশ করেন। (১২.৪ ও ১২.৩ 'আনন্দরাম ও মণিরাম' দ্রষ্টব্য)। যদিও মণিরাম আহোম রাজাদের অধীনে পুরাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তৎপরতা দেখিয়েছেন এবং পুনরুজ্জীবনবাদের প্রতীক হয়ে গিয়েছিলেন ; অন্যদিকে বাংলার নবজাগরণে আলোকদীপ্ত আনন্দরাম ছিলেন আধুনিকতার প্রতীক। আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের সাহায্য নিয়ে আনন্দরাম আসামে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ১৮৩৭ সালে প্রবর্তিত বাংলা ভাষার পরিবর্তে অসমিয়া ভাষাকে প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে লেখালেখির মাধ্যমে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং ভাষাকে কেন্দ্র করেই আসামে জাতীয়তাবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

যে আধুনিক শিক্ষার হাত ধরে ভারতবর্ষের অন্যত্র জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারিত হয়েছিল, সেটিও আসামে অনেক দেরিতে শুরু হয়। আসামে প্রথম ও দ্বিতীয় 'হাইস্কুল' (উচ্চ বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৮৩৫ এবং ১৮৪১ সালে। বিংশ শতকের শুরুতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রথম 'কলেজ' (মহাবিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৭ সালে ; কিন্তু আসামে স্বাধীনোত্তর পর্বে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৮) স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষার পরিকাঠামোর এই অভাব সত্ত্বেও আসামে কিন্তু জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারের পথ রুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় শিক্ষিত এক-ঝাঁক যুবক আসামে ফিরে এসে অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে মনোনিবেশ করেন। ১৮৭২ সালে কলকাতায় এইসব অসমিয়া ছাত্রদের উদ্যোগেই Assamese Literary Society প্রতিষ্ঠিত হয়। এই Society'র পক্ষ থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র জগন্নাথ বরুয়া (১৮৫১-১৯০৭) (১৭.২৬ দ্রষ্টব্য) এবং মানিকচন্দ্র বরুয়া (১৮৫১-১৯১৫) (১৭.৫৫ দ্রষ্টব্য) ১৮৭২ সালের ২১ মে ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুকের কাছে আসামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ এক গুচ্ছ দাবি-সনদ পেশ করেন। আসামে আধুনিক রাজনৈতিক সচেতনতার এটি ছিল আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যদিও ১৮৭৪ সালে শ্রীহট্ট/সিলেট-কে আসামের অঙ্গীভূত করা হয়েছিল, তথাপি কলকাতায়

পাঠরত কাছাড় ও সিলেটের ছাত্ররা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শুধু যে বাংলার রাজনৈতিক কাজকর্মের সাথে নিজেদের বেশি যুক্ত রাখতেন তাই নয়, মূলত তাঁদেরই উদ্যোগে **১৮৭৭ সালে কলকাতায় 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।**

২১.৮ জাতীয় আন্দোলনের সামনে বাধা

ব্রিটিশ-শাসিত আসামে রেলপথ সহ যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্পায়ন, নগরীকরণ, ঊনবিংশ শতকে পত্র-পত্রিকার অভ্যুদয়, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উত্থান ইত্যাদি—যেগুলি জাতীয়তাবাদী চেতনা-প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আসলে, ১৮২৬ থেকে ১৮৭৩ পর্যন্ত সময়কাল ছিল আসামের প্রাক-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ঔপনিবেশিক স্বার্থে উত্তরণের সন্ধিক্ষণ এবং এর প্রভাব মানুষের মননেও প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রাথমিক স্তরে মধ্যবিত্তদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তেমন সরব ছিল না ; বরং নানাভাবে ঐ শাসনের সমর্থনেই কাজ করত। বিংশ অধ্যায়ে বিভিন্ন সংগঠনের কাজকর্ম পর্যালোচনার সময় আমরা এটি উপলব্ধি করেছি। আসলে, আসামে উদীয়মান মধ্যবিত্তের সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং শ্রেণি হিসেবে সংহত না থাকার কারণে ছিল দুর্বল। কিন্তু ১৯২০ সালে গান্ধি নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিল সেই সময় থেকেই আসামে জাতীয় আন্দোলনের একটি নতুন ধারা সংযোজিত হল। **ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ('great nationalism') এবং অসমিয়া জাতীয়তাবাদ ('little nationalism') মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। আসামের উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনেক অভিজ্ঞতার বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদের কুফল সম্পর্কে সচেতন হতে অনেকটা সময় অতিবাহিত করতে হয়েছিল।** আসলে, ১৮৭৪ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত চিফ-কমিশনারের শাসনে আসামে না ছিল আইনসভা, না ছিল বিরুদ্ধ কোনো মতপ্রকাশের মঞ্চ। চিফ-কমিশনার ছিলেন সর্বেসর্বা এবং তিনি আবার প্রভাবিত হতেন চা-বাগানের ইংরেজ মালিকদের কথায় ('pressure group') কারণ **ঐসব বাগান-মালিকদের স্বার্থেই আসামের সরকারি চাকা ঘুরত। বাংলা-আসাম সীমান্ত প্রশ্নে সামান্য প্রতিবাদ করার অপরাধে Sir Henry Cotton (১৮৪৫-১৯১৫)-এর মতো জবরদস্ত ব্রিটিশ আমলাকেও (যিনি নিজেই ১৮৯৬ থেকে আসামের চিফ-কমিশনার ছিলেন) ১৯০২ সালে সরকারি চাকুরি হারাতে হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চিফ-কমিশনারকেও রেহাই**

দেননি। উদীয়মান অসমিয়া মধ্যবিত্তদের পক্ষে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া খুব একটা সহজ ছিল না। অবশ্য Sir Henry John Stedman Cotton ছিলেন 'ভারতবন্ধু' এবং ১৯০৪ সালে মুম্বাই-এ অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিংশতি অধিবেশনের সভাপতি। **আসামের প্রথম কলেজ ('কটন কলেজ') ১৯০১ সালে তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল**। সুতরাং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ভয়-পাওয়ার সাথে সাথে কটন সাহেবের জীবন ও সংগ্রাম ছিল উদীয়মান অসমিয়া মধ্যবিত্তদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস।

২১.৯ অসমিয়া জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে ব্রিটিশ ইন্ধন

একদিকে ভাষা, অন্যদিকে ধর্ম—এই দুটি প্রশ্ন উস্কে দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একদিকে যেমন আসামে গৃহযুদ্ধ প্রস্তুতির সূত্রপাত করেছিল, অপরদিকে অসমিয়া জাতীয়তাবাদ যাতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে থাকে সেটিতেও সচেষ্ট ছিল। আসামের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতিপথ শুধু যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুরমা উপত্যকার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয় ; সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থানের জন্যও অনেক কিছু জটিল আকার ধারণ করেছিল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যবিত্ত অংশে শুধু যে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের সাথে নিজেদের জড়িত করেছিলেন তা নয়, মুসলমান মধ্যবিত্তদের বড়ো অংশ মুসলিম লিগের মধ্যে নিজেদের সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে (ভারত সরকারের ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত বিধানসভায়) পাঁচবার মহম্মদ শাদুল্লাহ'-র নেতৃত্বে মুসলিম লিগ আসামে প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও ফখরুদ্দিন আলি আমেদ (ভারতের পঞ্চম রাষ্ট্রপতি), মৌলানা তায়েবুল্লা'র মতো মুসলিম নেতারা জাতীয় কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন ; তথাপি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় হিন্দু-মুসলমানের এই ভেদরেখা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সামনে হুমকি হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলার মতো আসামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তেমন দেখা যায় না ; যদিও শাসকশ্রেণির পক্ষ থেকে উস্কানির অভাব ছিল না। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় আসামকে পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত করে এবং ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করে একটি মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছিল (২০.৫ 'বঙ্গভঙ্গ' দ্রষ্টব্য)। সেই সময় থেকে আসামে দলে দলে বাঙালি-মুসলিম কৃষকদের অনুপ্রবেশের অধ্যায় শুরু হয় (যেটি বর্তমান আসামের এক জ্বলন্ত সমস্যা)। এই প্রসঙ্গে ১৯৩১ সালের Census-এ সেন্সাস্ কমিশনার C. S. Mullan-এর একটি সতর্কীকরণ উল্লেখযোগ্য ঃ

Probably the most important event in the province during the last 25 years (i.e. since 1905)—an event, moreover, which seems likely to alter permanently the whole future of Assam and to destroy more surely than did the Burmese invaders of 1820 the whole structure of Assamese culture and Civilization—has been the invasion of hordes of land-hungry Bengali immigrants, mostly Muslims, from the districts of Eastern Bengal and in particular Mymensingh.

ধর্মীয় আঙ্গিকে ১৯১১ সালের জনগণনায় আসাম উপত্যকায় মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৩,৫৫,৩২০ জন। ব্রিটিশ-শাসনের শেষ জনগণনায়, অর্থাৎ ১৯৪১ সালে, আসাম উপত্যকায় মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩,০৫,৯০২ জনে। এই বৃদ্ধি অসমিয়া হিন্দু মননে গভীর শঙ্কা সৃষ্টি করেছিল। এইভাবে একদিকে ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি এবং অন্যদিকে হিন্দু-মুসলিম বৈরি সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত হানার সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপোক্তভাবে তৈরি করেছিল।

২১.৯.১ হিন্দু-মুসলিম তিক্ততা সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

সেন্সাস্ কমিশনার এবং ব্রিটিশ আমলা C. S. Mullan ইচ্ছাকৃতভাবেই ১৯৩১ সালে অসমিয়াদের কাছে সংখ্যালঘু হয়ে যাবার এমন এক ভয়াবহ চিত্র উপস্থিত করেছিলেন যাতে সকলে উপলব্ধি করতে পারেন যে, শিবসাগর ও লখিমপুর ছাড়া অসমিয়া-ভাষীরা আসামের অন্যান্য জেলায় বাংলা-ভাষীদের (বিশেষত ময়মনসিংহের মুসলমান কৃষকদের) অবারিত অনুপ্রবেশের ফলে খুব শীঘ্রই সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে চলেছেন। ময়মনসিংহের কৃষকরা প্রথমে গোয়ালপাড়া এলাকায় এবং ১৯১১ সাল থেকে নওগাঁও ও কামরূপ সহ আসামের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১১ থেকে ১৯৩১-এ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন জেলায় বাংলাভাষী মানুষ (হাজার হিসাবে) এবং ময়মনসিংহ'র বাঙালিদের (বন্ধনি'র মধ্যে) এইভাবে দেখানো হয়েছে ঃ

সারণি ১০

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিভিন্ন জেলায় বাংলাভাষী

(বন্ধনিতে ময়মনসিংহের) মানুষ (হাজার হিসাবে) ১৯১১-১৯৩১

সাল	গোয়ালপাড়া	কামরূপ	দরং	নওগাঁও	শিবসাগর	লখিমপুর
১৯১১	৭৭ (৩৪)	৪ (১)	৭ (১)	৪ (১)	১৪(–)	১৪(–)
১৯২১	১৫১ (৭৮)	৪৪ (৩০)	২০ (১২)	৫৮ (৫২)	১৪ (–)	১৪ (–)
১৯৩১	১৭০ (৮০)	১৩৪ (৯১)	৪১ (৩০)	১২০ (১০৮)	১২ (–)	১৯ (২)

একই অস্ত্রে Mulian সাহেব দুটি দিক্ (একদিকে বাঙালির আধিপত্য এবং অন্যদিকে মুসলিম আদিপত্য, যেহেতু ময়মনসিংহ থেকে আগত অধিকাংশই মুসলিম) ঘায়েল করার অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এরই জন্য অমলেন্দু গুহ এইরকম মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> *Mullan tried to peer into the future and mischievously forecast the future course of this 'invasion'. He prophesied that Sibsagar would ultimately remain the only district where an Assamese race would find home of its own. The motivation behind such irresponsible and unfounded utterings was clear. He wanted the Assame.e and the immigrants to be set against each other.*
>
> (*Planter Raj to Swaraj*, p. 172.)

Mullan সাহেবের অনুমান ও ভবিষ্যদ্‌বাচন পরবর্তী সময়ে মিথ্যা প্রমাণিত হলেও সেই মুহূর্তে কিন্তু অসমিয়া বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করেছিল এবং উগ্র অসমিয়া জাতীয়তাবাদ (ভারতীয় জাতীয়তাবাদ থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে) সৃষ্টিতে রীতিমত সাহায্য করেছিল। তথাকথিত সংরক্ষণী আন্দোলনের মুখপত্র জোড়হাট থেকে প্রকাশিত *দৈনিক বাতরি* পত্রিকায় ১৯৩৭ সালে জ্ঞাননাথ বোরা আসামে অসমিয়াদের 'করুণ' অবস্থার জন্য শুধু অশ্রু-বিসর্জন করেই ক্ষান্ত হননি, অবিলম্বে আসামের সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অসমিয়া ভাষা পুনঃপ্রবর্তন, সিলেটকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্নকরণ সহ একাধিক দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। সমকালীন *The Assam Tribune* (১৯৩৯) সহ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অনেক পত্র-পত্রিকাতেই একই ধ্বনি শোনা যায়। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে ১৯৩১ সালের সেন্সাস বিবরণীর পরেই অসমিয়া জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধেছিল। আমরা আগেই লক্ষ করেছি ব্রিটিশ-শক্তির নানা জন-বিরোধী সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপের ফলে উনবিংশ শতক থেকে অত্যন্ত ন্যায্য দাবিকে কেন্দ্র করে আসামের বৌদ্ধিক জগৎ কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। **লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য) ছিলেন অসমিয়া জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ এবং ভাষা-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ, ধর্ম-বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকে এই আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ সেদিন মোটামুটি মুক্ত ছিল।** *অরুণোদয়* (১৮৪৬), *অসম বিলাসিনী* (১৮৭১), *জোনাকি* (১৮৮৯), *বিজুলি* (১৮৯০), *উষা* (১৯০৭), *বহ্নি* (১৯০২), *অসমিয়া* (১৯১৮), *চেতনা* (১৯১৯), *The Times of Assam* (১৯২৩), *বন্টি* (১৯২৭), *আবাহন* (১৯২৯) ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা নানাভাবে আসামের স্বদেশ প্রীতিকে সাহায্য করেছিল। ১৯১৬ সালে

'অসম ছাত্র সম্মিলন' এবং ১৯১৭ সালে 'অসম সাহিত্য সভা'র প্রতিষ্ঠা অসমিয়াদের স্বাতন্ত্র্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপের ফলেই হয়েছিল। অসমিয়া জাতীয়তাবাদের মঞ্চ 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' ১৯২০ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে অসমিয়া জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। যেহেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছিল উভয় জাতীয়তাবাদেরই প্রধান শত্রু, এরই জন্য গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় (১৯২০-১৯২২) আসামে অত উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। এই ঘটনা প্রবাহকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই ১৯৩১ সালে জনগণনার রিপোর্টে Mullan সাহেব অসমিয়াদের মননে আসামে আগত বাঙালি এবং বিশেষত ময়মনসিংহের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা-বৃদ্ধি সম্পর্কে ঐরকম ভীতিকর চিত্র এঁকেছিলেন।

চিফ্-কমিশনার শাসিত আসাম বলতে একসময় ১২টি জেলা বোঝাত ঃ (১) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ৬টি জেলা (লখিমপুর, শিবসাগর, দরং, নওগাঁও, কামরূপ ও গোয়ালপাড়া), (২) সুরমা উপত্যকার ২টি জেলা (সিলেট এবং কাছাড়), (৩) পার্বত্য অঞ্চলের ৪টি জেলা (গারো, খাসি-জয়ন্তিয়া, লুসাই এবং নাগা-অধ্যুষিত পাহাড়)। **এই তিনটি ভৌগোলিক বিভাগ নিয়ে ঔপনিবেশিক আসাম গঠিত হয়েছিল। নানা ধরনের জনগোষ্ঠী একই রাজ্যে থাকার ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ছিল ভিন্ন রকমের। ব্রিটিশ শক্তি ১৮৩৭ সালে ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাভাষা চাপিয়ে দিয়ে ভাষা-বৈরিতার বীজ বপন করে দিয়েছিল। ১৮৭৪ সালে বঙ্গভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাভাষী তিনটি জেলা— গোয়ালপাড়া এবং সুরমা উপত্যকার সিলেট ও কাছাড়কে আসামের সাথে যুক্ত করে জাতি-বৈরিতার পথ ব্রিটিশ শাসকরা প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন।** চা-বাগান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অ-অসমিয়াদের অবাধে আসামে বসবাস করার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা হত। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন ঃ কেন ময়মনসিংহের কৃষকরা ঐরকমভাবে দলে দলে আসামে এসেছিলেন? এটির ক্ষেত্রেও যে ব্রিটিশ শাসকদের অঙ্গুলি নির্দেশ ছিল সেটি আজ জলের মত স্পষ্ট। ১৯২১ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে আসামে আগত বাঙালি অভিপ্রয়াণকারীর সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষের মধ্যে ৮৫ শতাংশ ছিলেন মুসলমান। আসামে ধর্মীয় বিদ্বেষ তৈরি করার ক্ষেত্রে এটি একটি উপযুক্ত অস্ত্র হিসাবে ব্রিটিশ আমলারা ব্যবহারের অপচেষ্টার কসুর করেননি। ময়মনসিংহ থেকে মুসলমান কৃষকদের অধিকাংশই ব্রিটিশের প্রয়োজন/চাহিদা মেটাতেই সেই সময় আসামে এসেছিলেন। কলকাতার সন্নিকটে হুগলি নদীর পাড়ে ব্রিটিশ মূলধনে গড়ে ওঠা পাটকলগুলিতে (Jute Industry) কাঁচামাল হিসাবে পাটের চাহিদা

ছিল বিরাট। অবিভক্ত বঙ্গদেশে যে পাট উৎপাদন হত ব্রিটিশ মালিকদের কাছে সেটি পর্যাপ্ত বলে মনে হত না। বেশি পরিমাণ পাট উৎপাদনের জন্য আসামের জমির প্রতি ব্রিটিশ আমলাদের দৃষ্টি পড়ে। মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ, বর্মী আক্রমণ, কালা-জ্বরসহ নানারকম মহামারি ইত্যাদির কারণে অনেক গ্রাম প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল এবং জমিও অনাবাদী অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে চারিদিক জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় থাকত। এইসব জমিতে পাটসহ অন্যান্য ফসলের চাষ-আবাদের এবং ভূমি-রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কৃষকদের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ উৎসাহ দিতেন এবং অনুপস্থিত কৃষকরাও অনেক সময় নিজেদের জমি বিক্রি করে দিতেন। বলিনারায়ণ বোরা, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিরাম বরুয়া, নবীনচন্দ্র বরদোলই প্রভৃতি আসামের আলোকদীপ্ত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা এই উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। উন্নত পদ্ধতিতে বাংলার কৃষকরা চাষ-আবাদে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন কৃষি-উৎপাদন বেড়েছিল, অন্যদিকে সরকারের আদায়ীকৃত ভূমি রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ১৯০৫-১৯০৬ সালে ময়মনসিংহের মুসলিম কৃষকরা মোট ৩০,০০০ একর জমিতে পাট উৎপাদন করেছিলেন ; ১৯১৯-১৯২০-তে এটি বেড়ে ১,০৬,০০০ একর দাঁড়িয়েছিল। বিপুল পরিমাণ পাট উৎপাদনের ফলে ব্রিটিশ মালিকানাধীন পাটকলগুলির চাহিদাও মিটেছিল। আসামের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশদের উদ্যোগকে অসমিয়া মধ্যবিত্তদের একাংশ সমর্থন জানালেও অবশেষে এটি ব্রিটিশদেরই চক্রান্তে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে পরিণত হয় এবং অসমিয়া জাতীয়তাবাদ এক জটিল আবর্তে চলে যায়।

পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ এলাকায় অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু এবং প্রজারা মুসলিম। ভূমিহীন কৃষিমজুর, ছোটো কৃষক ইত্যাদি অনেকের মধ্যেই নানা কারণে উত্তেজনা ছিল ; যেটি বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী সহ ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি ব্যবহারের সুযোগ পেতেন। জমি-ক্ষুধার্ত কৃষকদের দৃষ্টি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ময়মনসিংহে আসন্ন বিদ্রোহ/ গোলযোগ ইত্যাদি এড়ানোর লক্ষ্যে এটিকে **'জমিদার ও সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র' হিসাবে মহম্মদ ওয়ালিউল্লা তাঁর 'যুগ-বিচিত্র' গ্রন্থে চিত্রিত করেছেন।**

ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিহীন করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কীভাবে মদত দিত সেটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী, ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বাধিকার (provincial autonomy) আসামকে প্রত্যর্পণ এবং আসাম বিধানসভা গঠিত হওয়ার সময়

থেকে আসামে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ মুখোমুখি নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এর থেকে ফায়দা তুলেছিল। ভাষা, ধর্ম, জাতীয়তা ইত্যাদি নানা বিভেদমূলক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অসমিয়া জাতীয়তাবাদ সেই সময় খুব একটা সংহত শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল। ঐ সময় থেকে ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যার প্রশ্নটিই আসামের রাজনীতিতে মুখ্য প্রশ্ন ছিল। ১৮৮১ সালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ছিল ৯ শতাংশ, ১৯৩১ সালে ১০ শতাংশ, ১৯৪১ সালে ২৩ শতাংশ। ১৯১১ সালে বরপেটা মহকুমায় মুসলিম জনসংখ্যা ১ শতাংশেরও কম ছিল ; কিন্তু ১৯৪১ সালে সেটি বেড়ে ৪৯ শতাংশে দাঁড়ায়। যেভাবে সেন্সাসে ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম জনসংখ্যা (অসমিয়া মুসলমান সহ) সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় (গারো পাহাড় সহ) ব্রিটিশ-শাসিত আসামের দেখানো হয়েছে সেটি এইরকম ঃ

সারণি ১১

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মুসলিম জনসংখ্যা (১৯১১-১৯৪১)

সাল	মুসলমান জনসংখ্যা
১৯১১	৩,৫৫,৩২০
১৯২১	৫,৮৫,৯৪৩
১৯৩১	৯,৪৩,৩৫২
১৯৪১	১৩,০৩,৯৬২

যেহেতু স্বাধীনতার পূর্ব-লগ্নে আসামে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই ছিলেন মুসলিম লিগের সমর্থক (যদিও জাতীয় কংগ্রেসের সাথেও দু-একজন নেতৃস্থানীয় মুসলিম ছিলেন) এবং যেহেতু প্রস্তাবিত পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে আসামকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নে মুসলিম লিগের সমর্থন ছিল ; এরই ফলে আসামের রাজনীতি জটিল আকার ধারণ করেছিল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে মহম্মদ শাদুল্লাহ'র নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভা তিনবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ফলে আসামে সাম্প্রদায়িক বিভাজন খুবই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যেটি অতীতে ছিল না। সেই সময় *Assam Tribune* সহ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন গণ-মাধ্যমে যে বার্তাটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হত সেটি হল ঃ শা'দুল্লাহ-সরকারের 'ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প' ('Land Development Scheme') আসলে পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের আসামে আমন্ত্রণ প্রকল্প যাতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসামকে পাকিস্তানের হাতে সমর্পণ

করা যায়। এইভাবে আসামে জাতীয়তাবাদী চেতনা স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে কেন্দ্র করে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল।

ভাষা, ধর্ম, বহিরাগত, অনুপ্রবেশ ইত্যাদি নানা জটিল সমস্যায় আক্রান্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউকে প্রতিহত করার অপচেষ্টার মধ্যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ক্ষান্ত থাকেনি ; এটি যাতে আসামের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে আটকে যায় সেজন্যও একাধিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলারা গ্রহণ করেছিলেন।

২১.৯.২ 'ইনার-লাইন'-এর বাধা

ঔপনিবেশিক-বিরোধী কোনও আন্দোলনের ঢেউ যাতে আসামের পাহাড়গুলিকে স্পর্শ করতে না পারে সেটির ব্যাপারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। আসামের পাহাড়গুলিকে সমতল থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ১৮৭৩ সালে প্রথম 'The Bengal Eastern Frontier Regulation' অনুযায়ী 'ইনার-লাইন পারমিট্' প্রথা চালু করা হয়েছিল। এই প্রথা অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি বা 'পারমিট' ভিন্ন আসামের পাহাড়ে অবাধ যাতায়াতের সমস্ত পথ বন্ধ করা হয়েছিল। ১৮৭৪ সালের Scheduled Districts Act অনুযায়ী, সমতলের কোনো আইন (দেওয়ানি বা ফৌজদারি) আসামের পাহাড়ে প্রযোজ্য হবে না। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ ভারত-সরকারের আইন মোতাবেক নাগা পাহাড় জেলা, লুসাই (মিজো) পাহাড় জেলা, কাছাড়া জেলার নর্থ কাছাড় পাহাড়, মহকুমা এবং 'ফন্ট্রিয়ার ট্র্যাক্ট' বা স্বাধীনোত্তর 'নেফা' (অর্থাৎ বর্তমান অরুণাচল প্রদেশ) প্রভৃতি এলাকাকে পুরোপুরি Excluded বা বহির্ভূত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হল। অন্যদিকে গারো-খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলা (শিলং ব্যতিরেকে), নওগাঁও-এর মিকির পাহাড়, শিবসাগর জেলা এবং লখিমপুর ও দরং-এর পাহাড় অঞ্চলকে 'Partially Excluded' বা আংশিকভাবে বহির্ভূত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হল, যেখানে বিশেষ 'পারমিট' ছাড়া প্রবেশ করা বা বেরিয়ে আসা দুঃসাধ্য ছিল। আসামের সমতল ও পাহাড়ের এই পৃথকীকরণ বা বিচ্ছিন্নকরণকে বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শিবাণী কিঙ্কর চৌবে ব্রিটিশদের 'policy of segregation' নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যদিকে কিছু গবেষকের (রামতনু মৈত্র, সুশান মৈত্র) চোখে এই 'ইনার-লাইন' প্রথা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশদের প্রবর্তিত apartheid বা বর্ণ-বিদ্বেষমূলক ব্যবস্থার অনুরূপ। এইভাবে সমতল ও পাহাড় যাতে একই সুরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শরিক হতে না পারে সেটি ব্রিটিশ শাসকরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই তৈরি করেছিলেন।

ব্রিটিশ শাসকদের মনে যে উদ্দেশ্যই থাক, বাইরে কিন্তু 'ইনার-লাইন' চালুর কারণ হিসেবে যেসব যুক্তি দেখানো হত সেগুলি এইরকম ঃ (১) পাহাড়ের উপজাতিদের সমতলের মানুষ যাতে শোষণ করতে না পারে ; (২) পাহাড়ের মানুষ যখন-তখন যাতে সমতলে আক্রমণ হানতে না পারে ; (৩) প্রতিবেশি রাষ্ট্রে সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত 'বহির্ভূত' এলাকাগুলিকে 'buffer region' হিসেবে চিহ্নিত করা, যাতে বাইরের শত্রু সরাসরি সমতল এলাকায় আক্রমণ করতে না পারে, (৪) উপজাতিদের চিরায়ত সংস্কৃতি, সমাজ-ব্যবস্থা, সর্দারি প্রথা প্রভৃতি সমতলের প্রভাবে যাতে কলুষিত না হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। লর্ড মিন্টো কিংবা লর্ড কার্জনের মতো ভাইসরয়দের পক্ষ-সমর্থনকারী ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের তুলনায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং সীমান্ত-নীতির অঙ্গ হিসাবেই 'ইনার-লাইন' চালু হয়েছিল। আসলে, এইসব 'বহির্ভূত' বা 'আংশিকভাবে বহির্ভূত' এলাকাগুলি প্রকৃতপক্ষে বিদেশি খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছে হয়ে উঠেছিল 'Virgin Soil' বা অহল্যা-ভূমি। নাগা পাহাড়ের অধিবাসী সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে William Robinson তাঁর *Descriptive Account of Assam* গ্রন্থে ১৮৭৫ সালের একটি সরকারি দলিল এইভাবে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

> *Among a people so thoroughly primitive, and so independent of religious profession, we might reasonably expect missionary zeal would be most successful.*

ব্রিটিশ-শাসকদের সেই প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়নি। ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে আসামের অন্তর্ভুক্ত (যদিও দেশের অন্য অংশ থেকে 'বহির্ভূত' এলাকা হিসাবে চিহ্নিত) নাগা, লুসাই (মিজো) ইত্যাদি পাহাড়ের অধিবাসীদের প্রায় সকলেই খ্রিস্টান মিশনারিদের ছত্রছায়ায় এসেছিলেন। এই ব্যাপারে খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে কেন্দ্রভূমি করে Welsh Presbyterians, নাগা ও লুসাই পাহাড়ে British Baptist Mission, আপার-আসামে American Baptist Mission প্রভৃতি সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'ইনার-লাইন পারমিট'-এর আড়ালে নিঃসঙ্গ পাহাড়ের আদিবাসীদের ধর্মান্তরিত করার গোপন উদ্দেশ্য দীর্ঘদিন চাপা থাকেনি।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রবাহ থেকে 'ইনার-লাইন'-এর অন্তর্ভুক্ত অধিবাসীদের দূরে রাখার অভিপ্রায়ে ঐ অঞ্চলের মানুষকে সংগঠিত করে সীমান্ত-রক্ষীবাহিনী গঠনের কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়েছিল। একদিকে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ধর্মান্তরিতকরণের ঢেউ এবং অন্যদিকে নিঃসঙ্গ মানুষকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত

করে ব্রিটিশ-অনুগামী করার প্রচেষ্টা—এই দ্বিবিধ কৌশল 'ইনার-লাইন' অন্তর্ভুক্ত 'বহির্ভূত' বা 'আংশিকভাবে বহির্ভূত' এলাকায় প্রয়োগ করার ফলে পাহাড়ে জাতীয় আন্দোলনের গতি রুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। সীমান্ত অঞ্চল প্রহরার প্রশ্নটি লঘু করে না দেখেও এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আহোম রাজত্বেও ঐ অঞ্চলে খুব বেশি হলে ৯ 'কোম্পানি'র বেশি প্রহরী ছিল না (আধুনিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী)। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে, ঐ 'কোম্পানি'গুলিকে 'ব্যাটেলিয়ান' পর্যায়ে উন্নীত করা হল। (প্রসঙ্গত, পদাতিক বাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী প্রায় ১০ জন নিয়ে 'স্কোয়াড', ১৬ থেকে ৪৪ জন সৈনিক নিয়ে 'প্ল্যাটুন', দুই বা তিন 'প্ল্যাটুন' নিয়ে একটি 'কোম্পানি' এবং ৫০০ থেকে ১৫০০ সৈনিক নিয়ে 'ব্যাটেলিয়ান' তৈরির মোটামুটি রেওয়াজ আছে)। ৯ ব্যাটেলিয়ান সৈনিক সংখ্যায় যে নগণ্য নয়, সেটি সহজেই অনুমেয়। নাগা, মিজো প্রভৃতি পাহাড়ি বাহিনী ব্রিটিশ শক্তির সৈনিক হিসাবে দুটি বিশ্বযুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছিল।

২১.৯.২.১ এলউইন-তত্ত্ব

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরেও 'ইনার-লাইন' সহ পাহাড়ি এলাকাকে নিঃসঙ্গ রাখার নীতি চালু ছিল (এবং আজও কিছু ক্ষেত্রে অব্যাহত)। উপজাতি জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ব্রিটিশ ধর্মযাজক (প্রথমদিকে) Verrier Elwin/ ভেরিয়ার এলউইন (১৯০২-৬৪) ছিলেন একজন নৃতত্ত্ববিদ এবং Anthropological Survey of India-র প্রধান। এলউইন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, আধুনিকতা বা উন্নয়নের প্রচণ্ড শব্দের মাধ্যমে পাহাড়ের শান্ত, স্বাধীন, নিরুপদ্রব জীবন ও সমাজে বিঘ্ন আনা ঠিক নয়, কিংবা এলউইন-এর ভাষায় ঃ "...that freedom and happiness are more to be treasured than any material gain". ভেরিয়ার এলউইন ছিলেন উপজাতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু (১৮১৮-১৯৬৪) এলউইনের তত্ত্বে প্রথমদিকে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যাইহোক, পরবর্তী সময়ে উপরোক্ত তত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়, যদিও নানা কারণে 'ইনার-লাইন'-এর বাধা সর্বত্র পরিত্যক্ত হয়নি (বরং কিছুক্ষেত্রে আবার নতুন করে প্রবর্তনের দাবি উঠেছে)। নেহরু এবং এলউইন একই বছরে (১৯৬৪) প্রয়াত হয়েছিলেন।

কেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ ব্রিটিশ-অধিকৃত আসামের পাহাড় অঞ্চলকে স্পর্শ করতে পারেনি এবং কেন পরবর্তী সময়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন (Separatist movement) উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রসারিত হয়েছিল—এইসব প্রশ্নের উত্তর উপরোক্ত প্রেক্ষাপটেই আমাদের বিচার করা প্রয়োজন। আসলে, ব্রিটিশ

শাসনে প্রবর্তিত বিভিন্ন নীতির মধ্যেই আজকের অনেক উত্তেজনার বীজ নিহিত আছে।

২১.১০ একনজরে ব্রিটিশ-অধিকৃত আসামের (১৮২৬-১৯৪৭) সংক্ষিপ্ত শাসনতান্ত্রিক কাঠামো

(১) দীর্ঘ ৬০০ বছর আহোম রাজত্বে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করার পর ১৮২৬ সালে **ব্রিটিশ-অধীনস্থ হওয়ার পর ১৮২৬-১৮৭৩ সাল পর্যন্ত আসাম ছিল 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'র অঙ্গ। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের নির্দেশমতোই সবকিছু পরিচালিত হত।**

(২) **১৮৭৪-১৯০৫** আসাম চিফ্-কমিশনার শাসিত স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে এবং 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'র আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়। সিলেট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি আসামের সাথে যুক্ত হয়। আসামের রাজধানী হয় শিলং। ১৮৩৭ সালে অসমিয়া ভাষার স্থলে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা-ভাষা চালু করা হয়েছিল। সেটি ১৮৭৩ সালে প্রত্যাহৃত হওয়ার পর অসমিয়া ভাষা স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে একটার পর একটা কৃষক বিদ্রোহে আসাম ক্ষত-বিক্ষত হয়।

(৩) ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের ফলে **১৯০৫-১৯১১** আসামকে পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত করা হয় এবং রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফ্‌ট্যানেন্ট-গভর্নর বা ছোটোলাট-এর অধীনে শাসিত হওয়ার ফলে অসমিয়াদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ক্ষুণ্ণ হয়। বাংলায় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের কিছু ঢেউ আসামেও অনুভূত হয়। এই সময়কালে পূর্ববঙ্গের (বিশেষত ময়মনসিংহের) মুসলিম কৃষকদের আসামে অনুপ্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয় যেটি পরবর্তী সময়ে আসামের জনবিন্যাসকে প্রভাবিত করে এবং ১৯৭৯ সালে শুরু হওয়া 'আসাম আন্দোলন'-এর পটভূমি তৈরি করে। ১৯১১ সালে 'দিল্লি-দরবার'-এ বঙ্গভঙ্গ নাকচ হয়ে যায় এবং আসাম ১৯০৫-এর আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

(৪) চিফ্-কমিশনার-শাসিত আসামে (বাংলাভাষী সিলেট ইত্যাদি সহ) **১৯১২-১৯২০** সালে 'Assam Legislative Council' বা বিধান-পরিষদ যুক্ত হয়। ২৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট এই 'কাউন্সিল'-এ চিফ্-কমিশনার ও ১৩ জন ছিলেন ব্রিটিশ-সরকারের মনোনীত সদস্য এবং অন্যদের স্থানীয় বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, চা-বাগানের মালিক এবং মুসলিমরা প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাতেন। এই 'কাউন্সিল' ছিল বিতর্ক করার প্রতিষ্ঠান (Debating Society), প্রকৃতপক্ষে কোনো ক্ষমতা ছিল না।

(৫) ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন প্রবর্তনের আগে ও পরে গভর্নর-এর শাসনাধীন ব্রিটিশ-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো মর্যাদার দাবিতে আসামের আলোক-দীপ্ত মধ্যবিত্ত সমাজ সোচ্চার হন। ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'Assam Association' এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আঞ্চলিক দাবিই ছিল রাজনীতির প্রধান বিষয়বস্তু। ১৯২০-২১ সালে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যুক্ত হওয়ার পর থেকে আন্দোলন ও দাবি-সনদের কিছু গুণগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ভারত সরকারের ১৯১৯-এর আইন অনুযায়ী **১৯২১-১৯৩৭** পর্যন্ত গভর্নর-এর অধীনে 'কাউন্সিল'-এর সদস্য সংখ্যা ৫৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং কিছুটা দ্বৈত-শাসন (Dyarchy) প্রক্রিয়া চালু থাকে, যদিও 'কাউন্সিল' প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাহীন অবস্থাতেই থাকে।

(৬) ভারত সরকারের ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী 'কাউন্সিল'কে প্রসারিত করে নির্বাচিত ১০৮ সদস্যের 'Assam Legislative Assembly' বা আসাম বিধানসভা ১৯৩৭-১৯৪৭ পর্যন্ত ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অধীনে শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আসামের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঐসময় দৃষ্ট হয়। একদিকে জাতীয় কংগ্রেসের গোপীনাথ বরদোলই এবং অন্যদিকে মুসলিম লিগের মহম্মদ শাদুল্লাহ'র মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ঐসময়ে আসাম রাজনীতির মুখ্য আলোচ্য বিষয়। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পূর্ব মুহূর্তের মাত্র এই দশ বছরে (১৯৩৭-৪৭) গোপীনাথ বরদোলই-এর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস দু'বার (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮—১৭ নভেম্বর ১৯৩৯ এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-১৪ আগস্ট ১৯৪৭) এবং শাদুল্লাহ'র নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ তিনবার (১ এপ্রিল ১৯৩৭-১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮, ১৮ নভেম্বর ১৯৩৯-২৫ ডিসেম্বর ১৯৪১, এরপর কিছুদিন রাষ্ট্রপতির শাসন অতিবাহিত হওয়ার পর ২৫ আগস্ট ১৯৪২-১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬) আসামের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। স্বাধীনোত্তর পর্বের কাহিনি ছিল আলাদা।

২১.১১ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ও আসাম (World War I (1914-18) and Assam

২১.১১.১ ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত

একটি বড়ো যুদ্ধের মাধ্যমে অসংখ্য ছোটো যুদ্ধের যবনিকা টানার উদ্দেশ্যেই ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে এত বড়ো যুদ্ধ আর হয়নি। ৭০ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) সৈনিক এতে অংশ নিয়েছিলেন। দীর্ঘ চার বছর ব্যাপী স্থায়ী এই যুদ্ধে ১৫ মিলিয়ন মানুষ নিহত

হয়েছিলেন। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল অস্ট্রিয়ার যুবরাজ (অর্থাৎ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী) ফার্ডিনান্ডকে ২৮ জুন ১৯১৪ সালে সেরাজিভোতে হত্যা। হত্যাকারী ছিল সার্বিয়ার উগ্র জাতীয়তাবাদী এক যুবক গ্যাব্রিলো প্রিন্সিপ্। মুহূর্তে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। আসলে, যুদ্ধের প্রকৃত কারণ লুকিয়ে ছিল অনেক গভীরে। যে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ, যার সাথে সাধারণ মানুষের স্বার্থ জড়িত ছিল না। যুদ্ধ শুরুর অনেক আগেই ইউরোপ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল—একদিকে ছিল 'Triple Alliance' (ত্রি-শক্তি চুক্তি—জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও ইতালি) এবং অন্যদিকে ছিল 'Triple Entente' (এই তিনটি দেশের 'আঁতাত' বা মৈত্রীর মধ্যে ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া)। যেহেতু যুদ্ধের মাঝখানে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক নভেম্বর বিপ্লব হয়েছিল, এজন্য রাশিয়া নিজেকে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। ১৯১৮-তে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরাজিত জার্মানিকে অত্যন্ত অপমানকর ভার্সাই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করা হয়েছিল, যার মধ্যে আবার পরবর্তী সময়ের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) বীজ লুকিয়ে ছিল।

২১.১১.২ ভারতবর্ষ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। ভারতবাসীর কোনা স্বার্থ এই বিশ্বযুদ্ধের সাথে জড়িত ছিল না। বরং সেইসময় ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা (যাঁদের এতদিন 'টেররিস্ট' বা 'সন্ত্রাসবাদী' বলা হত) অবিভক্ত বঙ্গদেশে সহ ভারতের বিভিন্ন অংশে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। ব্রিটিশ-শাসকদের সন্দেহ ছিল, ভারতবর্ষের মানুষ এই যুদ্ধে মোটেই ব্রিটিশদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে সম্মত হবে কিনা। কিন্তু তাঁদের সেই আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হল। ভারতবর্ষে ৪ আগস্ট ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করা হল সেই সময় ভারতীয় রাজনীতিতে প্রভাবশালী নেতৃত্বের প্রায় সকলেই ব্রিটিশ-সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল অহিংসার পূজারী গান্ধিজির (১৮৬৯-১৯৪৮) ভূমিকায়, যিনি দীর্ঘ কুড়ি বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর ১৯১৫-তে ভারতে ফিরে আসেন এবং অচিরেই গোপালকৃষ্ণ গোখলে কিংবা বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির সমপর্যায়ের জাতীয় নেতা হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করে নেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধি যেমন ব্যুয়র যুদ্ধ কিংবা জুলু-যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শক্তির সমর্থনে অ্যাম্বুলেন্স ইউনিটে অংশ নিয়েছিলেন, একইভাবে ভারতবর্ষে পা রেখেই তিনি ভারতীয়

যুবকদের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আহ্বান রাখলেন। গান্ধি-জীবনীকার এরই জন্য গান্ধিজিকে 'recruiting-sergeant' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। আসলে, গান্ধিজির ব্রিটিশ-প্রীতি তখন ছিল তুঙ্গে। ১৯১৫-তে মাদ্রাজে তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

> *I discovered that the British empire had certain ideals with which I have fallen in love...*

১৯১৪-তে অবিভক্ত ভারতের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে একত্রিশ কোটির মতো। এর মধ্যে পনেরো লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক এবং অস্ত্রধারী ব্রিটিশ শক্তির পক্ষ নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বিপুল পরিমাণ অর্থও ইম্পিরিয়াল যুদ্ধ ভাণ্ডারে জমা পড়েছিল। সমকালীন লন্ডনে *The Times* পত্রিকায় অভিভূত ব্রিটিশ জাতির বার্তা এইভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

> *The Indian empire has overwhelmed the British nation by the completeness and unanimity of its enthusiastic aid.*

কিন্তু কেন এত অযাচিতভাবে ব্রিটিশ সামরিক শক্তিকে এইভাবে সেদিন সমর্থন জানানো হয়েছিল? আসলে, সমকালীন জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের ধারণা ছিল, এত সমর্থনের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যদি অনুমোদন নাও করে, নিদেনপক্ষে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভারতবাসীর হাতে ছেড়ে দেবে। যদিও বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি জাতীয় নেতৃত্বের এই অনুরাগ (গান্ধিজির ভাষায় '...fallen in love' বা প্রেমে পড়ে যাওয়া) মোটেই সমর্থন করতেন না, বরং ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক ও অস্ত্রধারীদের ব্রিটিশপক্ষ ত্যাগের জন্য নানাভাবে প্ররোচিত করতেন এবং প্রচারপত্র বিলি করতেন, কিন্তু তাতে কেউই তেমন প্রভাবিত হয়নি।

২১.১১.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আসামের অংশগ্রহণ

উপরোক্ত সর্বভারতীয় চিত্রের সাথে সংগতি রেখেই আসামের মানুষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সেইসময় 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন' (২০.৩ দ্রষ্টব্য)-এর দুই নেতা মানিকচন্দ্র বরুয়া (১৭.৫৫ দ্রষ্টব্য) এবং তরুণ রাম ফুকন (১৭.৩১ দ্রষ্টব্য)—ব্রিটিশ শক্তিকে সমর্থনপুষ্ট করতে সোচ্চার প্রচার আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। বুরুয়ার ভাষায় ঃ "Great Britain and India have common cause"। অন্যদিকে ফুকন আসামের যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য সেনাবাহিনীর একটি 'ট্রেনিং ক্যাম্প' আসামে গঠনের আবেদন জানিয়েছিলেন। যেহেতু বিশ্বযুদ্ধ ছিল 'total war' বা

'সামগ্রিক যুদ্ধ', সুতরাং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকলেরই সমর্থন প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে না গেলেও সামরিক-বেসামরিক সকলেই কিন্তু যুদ্ধের জন্য নিবেদিত, যেখানে কলমও অস্ত্রের কাজ করে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে কৃষকের খাদ্য উৎপাদন বা শ্রমিকের শিল্প-উৎপাদন—সবই যুদ্ধের চাহিদা অনুযায়ী সময়মতো সরবরাহের প্রয়োজন হয়। এইরকম 'সামগ্রিক যুদ্ধের' প্রভাব মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতিতে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। আসাম বিধান পরিষদ (Legislative Council)-এর ১০ নভেম্বর ১৯১৪-র অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে এই যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিকে পূর্ণ সমর্থনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। আসামের ২৩৯ জন যুবক Royal Artillery এবং Bengal Regiment-এ যোগ দিলেন। Assam Valley Light Horse এবং Surma Valley Light Horse-এর ৩১ জন শ্রমিক হিসাবে যুক্ত হয়ে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি'কে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। আসামে—বিশেষত বরাক উপত্যকায় অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ইত্যাদি রক্ষার উদ্দেশ্যে 'Cachar Levy' নামে আধা-সামরিক বাহিনী ১৮৩৫ সালে গঠিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালে এটির নাম পরিবর্তন করে 'Assam Rifles' করা হয় এবং প্রায় ৩,০০০ বাহিনী রণাঙ্গণে প্রেরিত হয়। আসামের ১৭৪ জন অফিসারও যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত হলেন। যুদ্ধ ভাণ্ডারে আসাম সরকারের পক্ষ থেকে ২৫,০০০ টাকা এবং আসামের সাধারণ মানুষের দান ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত ৯,০০,০০০ টাকা সেইসময় জমা পড়েছিল। এছাড়া ৪৫,০০০ টাকা মূল্যের নানা সাজ-সরঞ্জাম যুদ্ধে সৈনিকদের জন্য পাঠানো হয়েছিল। আজকের দৃষ্টিতে এই অর্থ যতই নগণ্য মনে হোক্, আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে এর মূল্য ছিল বিরাট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে ১৯১৮ সালে আসামের তৎকালীন চিফ্ কমিশনার N. D. Beatson Bell যুদ্ধে সহযোগিতার জন্য আসামের মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ঃ "I must congratulate Assam on what she has done and is doing in this war..."

২১.১১.৪ *বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্কে অসমিয়া মধ্যবিত্তদের বিরূপ ধারণা*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' গোষ্ঠীভুক্ত অনেক আত্মগোপনকারী বিপ্লবী আসামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যদিও ব্রিটিশ শাসকদের সতর্ক দৃষ্টির জন্য তেমন বড়ো ধরনের কোনো ঘটনা সেই সময় ঘটেনি। তবে সুরমা উপত্যকায় বিপ্লবীরা ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারে রীতিমতো সক্রিয় ছিলেন।

১৯০৫ সালে কার্জনেব বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধের যে 'স্বদেশি' ও 'বয়কট' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তার অন্যতম প্রচারক ছিলেন অবিভক্ত বাংলার চারণ কবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪) যিনি গান, যাত্রাপালা ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯১৮ সালে এক সরকারি আদেশে মুকুন্দ দাসকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে করিমগঞ্জ ত্যাগের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। শ্রীহট্টের হবিগঞ্জের অধিবাসী মোহিনীমোহন রায়-বর্মন, হেমচন্দ্র সেন ও তাঁর ভাই, উত্তর শ্রীহট্টের বিপিনবিহারী দে সহ অনেককে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আটক-আইন প্রয়োগ করে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ১৯১৫ সালে বালেশ্বরে বাঘাযতীন (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)-এর মৃত্যু হলে 'যুগান্তর' দলের কর্ণধার হয়েছিলেন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৭৬)। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে গোপন খবর ছিল, যাদুগোপাল আসামে আশ্রায় নিয়েছেন এবং আসাম-ভূটান সীমান্ত দিয়ে নাকি ১৯১৭ সালে চিনে গিয়ে সেখান থেকে অস্ত্র-সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯১৫-১৬ সালে যাদুগোপাল-এর মাথার দাম কুড়ি হাজার টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল (অর্থাৎ জীবিত বা মৃত অবস্থায় কেউ যাদুগোপালকে ধরিয়ে দিলে ঐ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিপ্লবী যাদুগোপালকে ধরার জন্য আসামে ব্যাপক জাল বিস্তার করা হয়েছিল। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও সেদিন যাদুগোপালকে আসামে ধরা সম্ভব হয়নি। *Political History of Assam* (vol I, p. 213)-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৮-১৯ জানুয়ারি ১৯১৮ সালে গুয়াহাটির ফ্যান্সি-বাজার সহ কয়েকটি এলাকায় আত্মগোপনকারী নলিনী ঘোষ ও কয়েকজন বিপ্লবীর সাথে পুলিশের গুলি বিনিময় হয় এবং পাঁচজন বিপ্লবী ধরা পড়েন। প্রচলিত Arms Act অনুযায়ী নলিনী ঘোষ সাত বছর এবং বাকি চারজন তিন বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। যে দু'জন পলাতক বিপ্লবীকে পুলিশ সেদিন গুয়াহাটিতে গ্রেফতার করতে পারেনি তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সতীশচন্দ্র পাকড়াশি (১৮৯৩-১৯৩১) যাঁকে ফেব্রুয়ারি ১৯১৮-তে বঙ্গদেশ থেকে পাকড়ানো হয়েছিল। সতীশচন্দ্র তাঁর *অগ্নিযুগের কথা* গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। তরুণরাম ফুকন সহ অসমিয়া বুদ্ধিজীবীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলার বিপ্লবীদের কাজকে মোটেই সমর্থন করতেন না, তার অনেক প্রমাণ আছে। আসাম কাউন্সিল-এর প্রভাবশালী সদস্য রোহিণী কুমার চৌধুরি (১৮৮৯-১৯৫৫) অত্যন্ত গর্বের সাথে ঘোষণা করেছিলেন, কীভাবে আসামের সাধারণ মানুষ বিপ্লবীদের ধরতে ব্রিটিশ পুলিশকে সাহায্য করেছিল। চৌধুরির ভাষায় ঃ

"The citizens and the public of Gauhati cooperated in the arrest and captured all the revolutionary party"। যুদ্ধের সুবাদে Defence of India Act, 1915 সমগ্র দেশে চালু থাকায় বিপ্লবীদের ধরপাকড় করা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল।

২১.১১.৫ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া/ফলাফল

ভারতবর্ষ থেকে যে পনেরো লক্ষ মানুষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নানাভাবে অংশ নিয়েছিলেন, তার মধ্যে তেরো লক্ষ সৈনিক প্রথম ফ্রান্সে এবং ১৯১৫ সালের শেষদিক থেকে মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন রণাঙ্গণে যুদ্ধ করেছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে এই যুদ্ধে ৪৭,৭৪৬ জন হয় নিহত বা নিখোঁজ এবং ৬৫,০০০ মারাত্মকভাবে জখম বা আহত হয়েছিলেন। আসাম থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন তার মধ্যে কেউ কেউ কৃতিত্বের জন্য মেডেল পেলেও অধিকাংশই আর ফিরে আসেননি। আসামের সেইসব বীর যোদ্ধাদের স্মরণে কোথাও স্মৃতি-স্তম্ভ নেই এবং রাজ্যের মানুষের কাছে তাদের নাম ও কাহিনি আজও অজানাই রয়ে আছে।

সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে হাল হয়েছিল, আসাম তার থেকে স্বতন্ত্র ছিল না। যেহেতু সামরিক খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল, এরই জন্য উন্নয়নের খাতে বরাদ্দ অভূতপূর্ব হ্রাস করা হয়েছিল। শিক্ষা, পূর্ত দপ্তরের কাজে, রেল ও সেচ দফতরের ক্ষেত্রে বরাদ্দ যুদ্ধের সময়ে ১৪ মিলিয়ন থেকে কমে ৩ মিলিয়নে নেমে এসেছিল। প্রাদেশিক বাজেটে অস্বাভাবিক ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। ১৯১৬ সালের ৬ এপ্রিল তরুণরাম ফুকন তাঁর বাজেট বক্তৃতায় মন্তব্য করেছিলেন, এইরকম কম ও শূন্য অর্থ নিয়ে তৈরি বাজেট আলোচনা যেন 'হ্যামলেট'-এর অনুপস্থিতিতেই 'হ্যামলেট' অভিনয়ের শামিল ঃ

> *To have a budget discussion when there is very little or no money is, to my mind, like acting Hamlet without Hamlet himself.*

কৃষকসহ সাধারণ মানুষের জীবনে এর প্রভাব কত গভীরভাবে দাগ কেটেছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

লবণ, বস্ত্র, কেরোসিন ইত্যাদি সামগ্রী—যেগুলি বাইরে থেকে আসামে আসত—সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। লবণের দাম দ্বিগুণ, কাপড়ের দাম চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একশ্রেণির অসৎ ব্যবসায়ী ও কালোবাজারি ও মজুতদার মাঝে মাঝে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে খুশিমতো নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া করে দিত। চাল সহ খাদ্যদ্রব্যের দাম যুদ্ধের

শেষদিক থেকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে যেতে শুরু করল। আসামের চিফ্-কমিশনারের এক আদেশ অনুযায়ী, যুদ্ধে নিযুক্ত **সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে চাল সহ খাদ্যদ্রব্য ব্যাপকভাবে আসামের বাইরে রপ্তানির ফলে সংকট ঘনীভূত** হল। ১৯১৯ সালে সুরমা উপত্যকায় চালের দাম উঠেছিল ১২ টাকায় ১ মণ (যদিও আজকের দৃষ্টিতে এটিকে নগণ্য বলে মনে হতে পারে)। **জিনিসপত্রের এই অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি এবং সমাজে কালোবাজারি ও মুনাফাখোরদের রমরমা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ**, কারণ এর সাথে চিরাচরিত মূল্যবোধ ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আসামের সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকা ছিল বিরাট।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের **সমকালীন সময়ে একটার পর একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ** আসামের সাধারণ মানুষের দুর্গতি চরমে নিয়ে গিয়েছিল। ক্রমাগত ভয়াবহ বন্যা, কালা-জ্বরের মহামারি, গো-মড়ক ইত্যাদির ফলে গ্রামীণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ১৯১৫-১৬ সালে ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার তিন-চতুর্থাংশ 'রায়ত' প্রায় সর্বস্ব হারিয়ে যৎসামান্য সরকারি অনুদান ও খয়রাতি সাহায্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলেন। ১৯১৫-১৭ সালে কিছুক্ষেত্রে আসাম সরকার ভূমিরাজস্ব আদায় বন্ধ করতে বাধ্য হয়। **এই সময় থেকে উপরোক্ত দুই উপত্যকার গ্রামীণ সমাজে মহাজন শ্রেণির অভ্যুদয় ও দাপটের অধ্যায় শুরু হয়**। বিপন্ন কৃষক নানা কারণে অনেক সুদের বিনিময়ে মহাজনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়। সুদসহ ঋণ সময়মত পরিশোধ করতে অক্ষম হওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কৃষকের হাত থেকে জমি মহাজন-জোতদারের হাতে চলে যাওয়ার প্রক্রিয়া (land alienation process) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে।

জিনিসপত্রের আকাশ-ছোঁয়া দামের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত বেতনের সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেও নানারকম উত্তেজনা দেখা যায়। শিলং মহাকরণের কর্মচারীরা ১৯১৭ সালে কর্তৃপক্ষের কাছে খয়রাতি সাহায্য এবং অন্তর্বর্তীকালীন মহার্ঘভাতার আবেদন জানালে চিফ্-কমিশনার অক্ষমতা প্রকাশ করেন। সরকারি ছাপাখানার কর্মচারীরা প্রতিবাদে ধর্মঘটে শামিল হওয়ার ফলে ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসের *Assam Gazette* প্রকাশনা বন্ধ থাকে। 'Assam Labour Enquiry Report'-এর তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, ঐসময় ডিব্রু-সাদিয়া রেলের সংগঠিত কর্মচারীরা ১০ দিনের ধর্মঘটের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু আর্থিক সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হন। এই সময় থেকে আসামে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের

প্রয়োজনীয়তা শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। ১৯১৮ সালের ১৩ মার্চ আসাম বিধান পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে ফণিধর চালিহা বোম্বাই এবং পাঞ্জাব সরকারের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত বিলি বণ্টনের জোরালো দাবি পেশ করেন। কিছু ক্ষেত্রে লবণ ও বস্ত্র ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত বিক্রির প্রশ্নে আসামের স্থায়ী অধিবাসীদের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত হলেও বহিরাগত চা-শ্রমিকদের দুর্দশার প্রশ্নটি উপেক্ষিত ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে **আসামে চা বাগান শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় স্তর অতিক্রম করেছিল**। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'আরকাট্টি' ও 'সর্দারি' পদ্ধতির মাধ্যমে বহির্রাজ্য থেকে শ্রমিক সংগ্রহ অভিযান (১৩.১৩)-এর ফলে চা-বাগানের শ্রমিক সংখ্যা কীভাবে বাড়ছিল সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'সেন্সাস্'-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৯০১ সালে সমগ্র আসামের জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ ছিল এইসব বহিরাগত শ্রমিক যাদের মধ্যে ৮৩ শতাংশ চা-বাগানে তথাকথিত 'কুলি'র কাজে নিযুক্ত ছিলেন। যুদ্ধশেষে ১৯১৯ সালে আসামে বহিরাগত শ্রমিকের সংখ্যা ১০ লক্ষ অতিক্রম করেছিল। ১৯১৩ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে বাজারে অগ্নিমূল্য সত্ত্বেও চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি এক পয়সা বাড়েনি, বরং কিছুক্ষেত্রে কমে গিয়েছিল—যেমন, ১৯১১-১২ সালে মাসিক বেতন ১০ টাকা ১০ আনা ৯ পয়সা থেকে ১৯১৮-১৯ সালে ১০ টাকা ৮ আনা ১ পয়সায় এসেছিল। অন্যদিকে গগনচুম্বী মুনাফার ফলে চা-বাগানের ইউরোপীয় মালিকদের অবস্থা দিনদিনই রমরমা। এরই প্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষপর্ব থেকে আসামে **'বাজার-লুঠ'** করার এক নতুন দৃশ্য দেখা যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চা-শ্রমিকদের এর নেতৃত্বে দেখা যায়। ১৯১৯ সালে গোয়ালপাড়ার একাধিক স্থানে লবণ ও বস্ত্র লুণ্ঠনের কাহিনি, কিংবা ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২০-তে আসামের সীমান্ত অঞ্চলের হুকানজুড়ি চা বাগান শ্রমিকদের বোরাহ্পজ্বান সাপ্তাহিক 'হাট'-লুটের মতো অনেক কাহিনি আছে। প্রশাসনিক ভাষায় এগুলি 'ক্রাইম' বা চরম অপরাধ হিসাবে চিত্রিত হলেও, মানুষের অবস্থা কী পর্যায়ে এলে তবে এগুলি ঘটে সেটি বিচার করার কথা কাউন্সিলের সভায় উল্লেখ করেছিলেন ফণিধর চালিহা ঃ "Such economic crimes would not have been committed by an essentially peace-loving people like ours unless driven to the course from sheer necessity". এই সময় থেকে বিভিন্ন চা-বাগানে অশান্ত শ্রমিকরা মাঝেমাঝেই ধর্মঘটের আশ্রয় নিতে শুরু করেন।

একদিকে যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সামগ্রিক পরিণাম হিসাবে আসামের সমাজ-জীবন চরম অস্থিরতা চলছিল, ঠিক তখন মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার আইনের প্রস্তুতি পর্বকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত নেতৃবৃন্দ আসামকে স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা-দানের দাবিতে সরব হয়ে উঠলেন। আসলে, যুদ্ধের শুরুতেই ব্রিটিশ শাসকরা বারবার ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা যুদ্ধ করছেন পৃথিবীকে গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে ("to make the world safe for democracy")। **মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন-এর স্বাধীনতা, স্ব-শাসন ইত্যাদি সংক্রান্ত ১৪ দফা কর্মসূচি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের মানুষের মনে অনেক প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছিল**। এরই প্রেক্ষিতে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার সম্পর্কে সকলের অনেক প্রত্যাশা ছিল। বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তি বিপুল জয় সত্ত্বেও ভারতীয়দের সেই প্রত্যাশা কতটুকু মিটেছিল এবার সেটি লক্ষ্য করা যাক।

২১.১২ মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বরাজ্যের দাবিতে সোচ্চার হলে, সেই অবস্থাকে কিছুটা প্রশমিত করতে তদানীন্তন ভারত সচিব এডুইন মন্টেগু এবং ভাইসরয় লর্ড চেম্‌সফোর্ড যে শাসন সংস্কার আইন প্রবর্তন করেন সেটি মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার বা Government of India Act, 1919 নামে অভিহিত। মন্টেগু ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে বিলেত থেকে ভারতে আসেন এবং ভাইসরয় চেম্‌সফোর্ডের কাছে তাঁর পরিকল্পিত শাসন-সংস্কারের খসড়া উপস্থিত করেন। ১৯১৮ সালে উভয়ের আলোচনার পরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলি গঠনের পদ্ধতি সংক্রান্ত রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় এবং তারই সূত্রে আসামের রাজনীতি চঞ্চল হয়ে ওঠে। আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশের এবং গভর্নর-নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক আইনসভা গঠনের দাবিতে অনড় থাকায় কিছুটা জটিলতা সৃষ্টি হয়। ১৯১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর কলকাতায় মন্টেগু'র সাথে Assam Association-এর প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে ভারতের অন্যান্য বড়ো প্রদেশের মতো আসামের স্বতন্ত্র মর্যাদা দাবি করেছিলেন। একইভাবে, সুরমা উপত্যকার হিন্দু-মুসলিম মিলিতভাবে তৎকালীন প্রভাবশালী ব্যক্তি আব্দুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩)-এর নেতৃত্বে মন্টেগুর কাছে সাংবিধানিক সংস্কারের সাথে সিলেট-কে বঙ্গদেশে পুনরায় অন্তর্ভুক্তির দাবিও পেশ করেছিলেন। একই দাবিতে সোচ্চার ছিল Sylhet People's Association এবং মন্টেগু ও চেমস্‌ফোর্ড-এর কাছে প্রতিবেদনও জমা দিয়েছিল। ১৯১৮ সালে কামিনী কুমার চন্দ (১৭.১২ দ্রষ্টব্য)

Imperial Legislative Council-এ সিলেটকে বঙ্গের সাথে যুক্ত করার প্রশ্নে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবি জানান, যদিও তাঁর প্রস্তাব শেষপর্যন্ত নাকচ হয়ে যায়। ১৯১৮ সালে Bengal Provincial Conference-ও কামিনী কুমারের মতো একই দাবি জানিয়েছিল। আসলে, **১৯১৭ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রশ্নটিতে (যদিও অন্ধ্র, সিন্ধ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে) গুরুত্ব আরোপের পরেই সিলেট-এর দাবিটি সামনে চলে আসে। ১৯২০-তে Sylhet Reunion League গঠিত হয়েছিল।**

এইভাবে একদিকে সিলেট্-কে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলার সাথে সংযুক্তির দাবি (যেটিতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিকাংশ মানুষের আপত্তি ছিল না) এবং অন্যদিকে আসামকে স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা-দানের দাবি নিয়ে দুই উপত্যকা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করায় একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রতিনিধিদের সামনে যে যুক্তিটি তুলে ধরেন সেটি হল ঃ সিলেটের দাবি মানলে কাছাড় ও গোয়ালপাড়াও বাংলার সাথে সংযুক্তির দাবি করবে এবং এইসব গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি আসাম থেকে বেরিয়ে গেলে শুধু যে অর্থনৈতিকভাবে আসাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাই নয়, আসামের আয়তন এতই ক্ষুদ্র হবে যে সেটি স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদার প্রশ্নে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, গোয়ালপাড়ার রাজা প্রভাতচন্দ্র বরুয়া—যিনি নিজেই একসময় ছিলেন Assam Association-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—তিনিই অন্যান্য জমিদারদের সাথে হাত মিলিয়ে গোয়ালপাড়াকে বাংলায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে সরব হয়েছিলেন। এই কারণেই ১৯১৮ সালে মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্টে আসামের প্রাদেশিক মর্যাদার দাবিটি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি এবং এর ফলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় হতাশা নেমে আসে। এছাড়া সুরমা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার 'Muhammedan Association', 'Ahom Association', সুনামগঞ্জের 'মাহিষ্য সমিতি' ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্মের সংগঠন প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার আইনে তাদের সম্প্রদায়ের জন্য উপযুক্ত আসন সংরক্ষণের দাবিও তুলেছিল। কিন্তু ১৯১৮'র রিপোর্টে কিছুই প্রায় গুরুত্ব পায়নি।

ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ১৯১৮-র মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে একটি খসড়া বিল লন্ডনে 'সিলেক্ট কমিটি'র চেয়ারম্যান লর্ড সেল্বোর্ন (Lord Selbourne) খতিয়ে দেখবেন এবং তারপর এটি ২২ মে ১৯১৯-এ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হবে। এরই প্রেক্ষিতে Assam Association লন্ডনে 'সিলেক্ট কমিটি'র কাছে আসামের সামগ্রিক চিত্র এবং আসামের প্রাদেশিক

মর্যাদা দাবির যৌক্তিকতা যথাযথভাবে পেশ করার জন্য দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সময় আসামের রাজনীতিতে বর্ণাঢ্য চরিত্রের অধিকারী ছিলেন ব্যারিস্টার তরুণরাম ফুকন (১৭.৩১ দ্রষ্টব্য) এবং লন্ডনে আসামের প্রতিনিধিত্ব করার প্রশ্নে তাঁরই নাম সর্বাগ্রে থাকার কথা। কিন্তু ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে Assam Association-এর গোয়ালপাড়া অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তরুণরাম ফুকন ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে কিছু রূঢ় মন্তব্য করেছিলেন, যেমন ঃ

> *The Government is bad and bureaucratic...The English officers and English traders and also a section of Indians do not advocate popular government, and Lord Sydenham and others say that India is not fit for self-government...If India is not fit for self-government even after a century and a half of British rule, who is responsible for this? It is the British rule which is to blame.*

এরই জন্য নরমপন্থী মনোভাবাপন্ন Assam Association-এর সদস্যরা ফুকন-এর স্থলে নবীনচন্দ্র বরদোলাই (১৭.৩৫ দ্রষ্টব্য) এবং তাঁর শ্যালক চা-বাগানের মালিক প্রসন্নকুমার বরুয়াকে লন্ডনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। আসলে, Assam Association ব্রিটিশদের না চটিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে কাজ উদ্ধারে গুরুত্ব দিয়েছিল। যাই হোক, নানা কারণে তরুণরাম ফুকন ১৯১৯ থেকে কিছুদিন রাজনৈতিক কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিনে নেন। Assam Association যতই নরমপন্থার সমর্থক হোক্, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষদিক থেকে একটার পর একটা ঘটনার ফলে আসামের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল কিন্তু ক্রমশ তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ১৯১৯ সালে তেজপুরে অনুষ্ঠিত 'আসাম ছাত্র সম্মিলন'-এর চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে 'স্বদেশি' ও 'বয়কট'কে সমর্থন জানানো হল। ঐ একই বছরে *চেতনা* নামে একটি নতুন সাময়িকপত্রের প্রকাশ পরিবর্তিত মানসিকতার সাক্ষ্য দেয়। এদিকে 'আসাম মিশন'-এর দূত নবীনচন্দ্র বরদোলই এবং প্রসন্নকুমার বরুয়া সেই সময় লন্ডনে অবস্থিত জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ—বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, তেজবাহাদুর সপ্রু, শঙ্করম নায়ার, সরোজিনি নাইডু-র সাথে প্রথমে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের সহযোগিতায় 'সিলেক্ট কমিটি'র চেয়ারম্যান লর্ড সেলবোর্ন সহ অন্যদের কাছে ১৯১৯ সালে আগস্টের শেষদিকে আসামের প্রতিবেদন পেশ করেন এবং সাফল্যলাভ করেন। 'বরদোলই-মিশন'-এর দৌলতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১৯ সালে যে 'মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন' বা 'Government of India Act, 1919' পাশ হয় তাতে আসামকে

গভর্নর শাসিত প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সিলেট এবং গোয়ালপাড়া ইত্যাদি যথারীতি আসামের অঙ্গ হিসাবেই থাকে।

আসামে প্রাদেশিক মর্যাদা লাভ করলেও এবং ১৩ মার্চ ১৯২০-তে Assam Legislative Council সর্বসম্মতভাবে ব্রিটিশ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলেও যেভাবে নির্বাচিত বিধানসভার পরিবর্তে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সরকার-মনোনীত গুটিকয়েক কাউন্সিলার (৩৩ থেকে বৃদ্ধি করে ৫৩ জন কাউন্সিল সদস্য) ও মন্ত্রীর মাধ্যমে আসামের গভর্নর **দ্বৈত-শাসন** (Dyarchy) চালাতেন (যেখানে ইউরোপীয় এবং চা-বাগান মালিকদের প্রাধান্য ছিল) এবং যেভাবে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইনে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল তাতে নবীনচন্দ্র বরদোলই নিজেই অখুশি ছিলেন। অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলনের নরমপন্থী নেতারা মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারকে স্বাগত জানালেও এবং গান্ধিজি প্রথমদিকে আপত্তি না করলেও জাতীয় কংগ্রেস কিন্তু শেষপর্যন্ত এই সংস্কার-আইন বর্জন করে। কার্যত সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন একটার পর একটা ভয়ংকর ঘটনার জন্য শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

২১.১৩ ১৯১৯ সালের গুরুত্ব

সেই সময় যে ঘটনাগুলি সমগ্র ভারতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে সেগুলি হল (১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নিপীড়নমূলক Defence of India Act-এর দোহাই দিয়ে যাকে খুশি গ্রেফতার করা যেত। যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য ঐ আইনের বিরোধিতা কেউ করেননি। সকলেই আশা করতেন যুদ্ধ শেষে ঐ আইন প্রত্যাহৃত হবে, কিন্তু সেই আশা বিলীন হয়ে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে শান্তিচুক্তির ৬ মাস পরে, তথাকথিত ভারতরক্ষা আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে, বিচারপতি লর্ড রাউলাটের নেতৃত্বে গঠিত Sedition Committee-র সুপারিশ অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতবর্ষে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করা, গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা, সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি সংক্রান্ত দুটি বিল পেশ করা হয়। রাউলাট কমিটির সুপারিশ মতো বিল দুটি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পাশ করেছিল বলে এটি 'রাউলাট অ্যাক্ট' বা আইন হিসেবে পরিচিত। এই আইনের বিরুদ্ধে সারা ভারতে ১৯১৯ সালের ৬-১৩ এপ্রিল 'প্রতিবাদ দিবস' পালিত হয়। ধর্মঘট, বিক্ষোভে সমগ্র দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে এবং আসাম এর ব্যতিক্রম ছিল না।

(২) অত্যন্ত কালিমা-লিপ্ত রাউলাট আইনের বিরোধিতা করতে গিয়েই ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানের সমাবেশে উন্মত্ত ও'ডায়ার-এর নির্দেশে সরকারি পরিসংখ্যান মতেই ঘটনাস্থলে ৩৭৯ জনের মৃত্যু এবং ১২০৮ জন গুরুতরভাবে আহত হন। এটি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে কলঙ্কিত দিন। এমনকি ভারত-বিদ্বেষী Winston Churchill পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই ন্যক্কারজনক অমানবিক ঘটনার নিন্দা করে এটিকে *"...greatest blot that has been placed upon it (England) since the days gone by when we burned down Joan of Arc"* হিসাবে চিত্রিত করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কী ভয়ংকর ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছিল, সেটি কারও অজানা নয়। যদিও ব্রিটিশ সরকার ঘটনার শেষে গভীর ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিচারপতি হান্টারকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল, ভাইসরয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের স্থলে লর্ড রিডিং-কে পরবর্তী ভাইসরয় হিসাবে নিয়োগ করেছিল, রাউলাট আইন বাতিলসহ ভারতীয়দের দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছিল, কিন্তু এ যন্ত্রণা কোনোদিনই ভোলবার নয়। **আসামের নরমপন্থী নেতৃত্বের মধ্যেও ধীরে ধীরে ব্রিটিশ শক্তি সম্পর্কে মোহমুক্তির অধ্যায় শুরু হয়।** নরমপন্থী নেতা নবীনচন্দ্র বরদোলই লন্ডন থেকে দেশে ফিরে যে মন্তব্যটি করেছিলেন সেটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ

> *...I returned to India only to see the blood-stained field of Jallianwalabagh and the callous indifference of our rulers. I travelled to that place—I walked on the field and while there, I knelt down and said—O'God, if this is what came out of our being partners of the same Empire then save me from the Empire.*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিঃশর্তভাবে সমর্থনের 'পুরস্কার' এইভাবে হাতে হাতে মিলেছিল।

(৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক যোগ দিয়েছিল জার্মানির মিত্র হিসাবে। ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, যাঁরা সেইসময় মূলত ব্রিটিশপ্রেমী ছিলেন, দোটানায় পড়েন, কারণ তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু বা 'খলিফা'। ব্রিটিশ সরকার ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের দোদুল্যমানতার কথা চিন্তা করে সেই সময় আশ্বাস দিয়েছিল, যুদ্ধশেষে তুরস্কের প্রশ্নটি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু ব্রিটেন যুদ্ধে জয়লাভের পর তুরস্কের সুলতানের 'খলিফা' পদসহ সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তুরস্ককে হাইকমিশনের অধীনস্থ করায় ভারতীয়

মুসলমানরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। গান্ধির চোখে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার এমন ঐতিহাসিক সুযোগ খুব কমই আসে। মুসলিম আবেগকে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শামিল করার উদ্দেশ্যে ২৩ নভেম্বর ১৯১৯ সালে দিল্লিতে সারা ভারত খিলাফৎ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং গান্ধিজি ঐ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হয়, যতদিন না ব্রিটিশ শক্তি তুরস্কের সুলতানকে 'খলিফা' পদ ফিরিয়ে দেবে এবং তুরস্ক-সমস্যার স্থায়ী সমাধান না করবে ততদিন ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশদের বয়কট ও অসহযোগিতা করবে। খিলাফৎ আন্দোলনের দু'জন উল্লেখযোগ্য মুসলিম নেতার মধ্যে ছিলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয়—মহম্মদ আলি ও শওকৎ আলি। এইভাবে গান্ধিজি প্রদর্শিত অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে একদিকে আকাশ-ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য, খাদ্য-দাঙ্গা, ধর্মঘট, বেকারি ইত্যাদি এবং অন্যদিকে নিপীড়নমুলক রাউল্যাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, খিলাফৎ আন্দোলনের ডাক ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আসামের আকাশ-বাতাস রীতিমতো তপ্ত হয়ে উঠেছিল। **এতদিন আসামের বেশিরভাগ নেতৃবৃন্দ নরমপন্থী মনোভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু ১৯১৯ থেকে সেটির দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।** যে তরুণরাম ফুকন কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন, তিনিও আবার সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন। তরুণরাম ফুকন ও নবীনচন্দ্র বরদোলই ১৯ মার্চ ১৯২০-তে গুয়াহাটি শহরে একটি খিলাফৎ সভা আহ্বান করেন। ১৯২০ সালের ১ আগস্ট 'লোকমান্য' বালগঙ্গাধর তিলক-এর মৃত্যু কীভাবে আসামকে উদ্বেল করেছিল সেটি উপলব্ধি করা যায় ১৯২০ সালের ৫ আগস্ট গুয়াহাটিতে আয়োজিত তিলকের স্মরণে বিরাট শোকসভার আয়তন দেখে। **যেহেতু কলকাতা থেকে প্রকাশিত ব্রিটিশ শক্তির মুখপত্র *The Statesman* পত্রিকা 'লোকমান্য'র বিরুদ্ধে অনেক অবমাননাকর মন্তব্য করত, এজন্য ঐ সভা থেকেই পত্রিকাটিকে আসামে বয়কট-এর ডাক দেওয়া হয়। একইসাথে Assam Legislative Council বয়কটের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।** ফুকন ও বরদোলই একজন যোগ্য সেনাপতি সেই সময় খুঁজে পেয়েছিলেন, যাঁর নাম চন্দ্রনাথ শর্মা (১৮৮৯-১৯২২)। এই শর্মাই ছিলেন আসামে খিলাফৎঞ্চ ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃত রূপকার। এইরকম একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তে আসামে এলেন গান্ধিজি এবং আকাশ-বাতাস মুখরিত করে দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের গানে ও প্লাবনে—যেটি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আসামে স্বাধীনতা সংগ্রাম
(Freedom Struggles in Assam)

২২.১ আসাম প্রদেশে কংগ্রেসের অভ্যুদয় (Emergence of Assam Provincial Congress 1921)

ইতিপূর্বে (বিংশ অধ্যায়) আসামের বিভিন্ন সভা-সমিতি সংগঠনের কথা আলোচিত হয়েছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৮৬) আসামের প্রতিনিধিদের নামও (২০.১.৩) উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে, আসামের সমস্যাকে জাতীয় স্তরে উন্নীত করতে গেলে সর্বভারতীয় সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রশ্নটি প্রথম থেকেই অনুভূত হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন (১৮৮৬) থেকে শুরু করে ১৯২০ পর্যন্ত আসামের যেসব ব্যক্তি বিভিন্ন অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বিভিন্ন সংগঠনের/সমিতির প্রতিনিধি হিসাবেই গিয়েছিলেন, কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব পায় এবং আঞ্চলিক সংগঠন ও সর্বভারতীয় সংগঠন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সেই সময় আসামের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্যরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৮ এপ্রিল ১৯২১-এ জোড়হাটে অনুষ্ঠিত 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভায় ছবিলাল উপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র বরদোলই, কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ (প্রশ্নটি নিয়ে বিতর্ক শেষে) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অনুমোদিত Assam Provincial Congress Committee (APCC)-এর সাথে 'আসাম অ্যাসোসিয়েশন'-এর সংযুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ছবিলাল উপ্যাধ্যায়কে সাময়িকভাবে সভাপতিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৯২১ সালের জুন মাসে APCC-এর 'অ্যাড্-হক্ কমিটি' গুয়াহাটিতে গঠিত হয় এবং কুলধর চালিহা (১৭.১৫ দ্রষ্টব্য) ও তরুণরাম ফুকন (১৭.৩১ দ্রষ্টব্য) যথাক্রম এই কমিটির সভাপতি হন। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন গোপীনাথ বরদোলই (১৭.২০ দ্রষ্টব্য), বিমলাপ্রসাদ চালিহা (১৭.৪৫ দ্রষ্টব্য), চন্দ্রনাথ শর্মা, কৃষ্ণনাথ শর্মা এবং কনকচন্দ্র শর্মা। APCC-র আমন্ত্রণেই গান্ধিজি ১৯২১ সালে আসাম সফরে আসেন এবং অসহযোগ

আন্দোলনের ঝড় সমগ্র আসামকে আলোড়িত করে। **আসলে, ১৯২১-এর জুন মাসের আগে আসামে আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস সংগঠন ছিল না।**

২২.১.১ প্রাক-১৯২১ পরবর্তী চিত্র

১৯২১ সালের আগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে আসামের যেসব প্রতিনিধি বিভিন্ন সভা-সমিতির মুখপত্র হিসাবে অংশ নিতেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন শহরের পাশ্চাত্য-শিক্ষিত উদীয়মান মধ্যবিত্তদের অংশ—যাঁরা হয় চিকিৎসক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, চা-বাগানের ম্যানেজার বা ভারতীয় মালিক অথবা ছাত্র এবং কদাচিৎ কৃষক শ্রেণির প্রতিনিধি। এই নবজাত মধ্যবিত্তের অভ্যুদয় কিন্তু প্রাক-ব্রিটিশ যুগের গ্রামীণ সম্পন্ন ব্যক্তি ও কর্মকর্তাদের উত্তরসূরি হিসাবেই হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় কংগ্রেসের (প্রাক-১৯২১) অধিবেশনে আসামের প্রতিনিধিদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু-ধর্মভুক্ত, যদিও ১৯০৬ সালের অধিবেশনে জনৈক মুসলিম ধর্ম-প্রচারক অংশ নিয়েছিলেন। এক কথায়, ১৯২১ সালে আসামে কংগ্রেস সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে গড়ে ওঠার আগে থেকেই অসমিয়া মধ্যবিত্তদের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। প্রথমদিকে জাতীয় কংগ্রেস যেভাবে আঞ্চলিক ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করত এবং ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি করত, আসামের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে তার প্রভাব দেখা যায় এবং কংগ্রেসের প্রতি সমর্থনও বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্বে আসামে অনেক কৃষক বিদ্রোহের কাহিনি এবং 'রায়ত-সভার' ভূমিকা এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব 'রায়ত-সভা'র নেতৃত্বে মোটামুটি মধ্যবিত্ত শ্রেণিই ছিল। এই মধ্যবিত্তরা কৃষক দরদি ভূমিকা পালন করলেও জঙ্গি আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখতেন। ১৮৬০ থেকে ১৮৯০-এর দশকে আসামের রায়তওয়ারি এলাকায় ব্রিটিশ সরকারের খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দুর্বার কৃষক আন্দোলন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আসলে, আসামের কৃষক শ্রেণি যেভাবে ব্রিটিশ শক্তির মুখোমুখি হয়েছিল, অন্যত্র তেমনটি দেখা যায় না। *The Indian Nation* পত্রিকায় (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪) *Amrita Bazar Patrika*-র রিপোর্ট উদ্ধৃত করে মন্তব্য করা হয়েছিল ঃ "Perhaps for the first time, the Indian ryots have rebelled against the Government in Assam"। এর আগে *Amrita Bazar Patrika*-তে উল্লেখ করা হয়েছিল ঃ

In the Deccan, the fury of the ryots was directed against money-lenders, in Bengal against indigo planters in 1860 and in Pabna against the Zamindars in 1872. But in Assam, at this moment, it is open rebellion against Government.

(অর্থাৎ, দাক্ষিণাত্যে যে সময়ে রায়তের উত্তেজনা ছিল ঋণদাতা মহাজনের বিরুদ্ধে, বাংলায় নীলকুঠি সাহেবদের বিরুদ্ধে, পাবনায় জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, আসামে কিন্তু সেই সময় প্রকাশ্য বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে)।

আসামে গ্রামীণ মানুষের উত্তেজনা অতীতে সংগঠিত রূপ পেত 'রেইজ-মেল্'-এর মাধ্যমে এবং পরবর্তী সময়ে 'রায়ত-সভা'র নেতৃত্বে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাস জীবনে ইতি টেনে ভারতের মাটিতে প্রথমে বিহারের চম্পারণ কিংবা বর্তমান গুজরাটের খেদায় গান্ধিজি যখন গ্রামীণ মানুষকে সংগঠিত করে ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আন্দোলন শুরু করলেন, সেই সময় থেকে ঐসব আন্দোলনের আবেদন আসামে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। গান্ধিজির নেতৃত্বে আন্দোলনের 'idioms and techniques'-এর সাথে আসামের প্রচলিত 'রেইজ-মেল্'-এর যথেষ্ট মিল ছিল। এরই জন্য বলা হয় "By 1917-20 Gandhi's impact was deeply felt in Assam"। **কী কারণে গান্ধির মতো একজন অ-অসমিয়া ব্যক্তিত্ব অসহযোগ আন্দোলন সূত্রে ১৯২১ সালে আসামে তাঁর প্রথম সফরের সময় সাধারণ মানুষের চিত্ত জয় করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন** সেটি উপলব্ধি করতে গেলে রায়ত বা কৃষকের প্রশ্নে সহমর্মিতার প্রশ্নটিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতকে বাংলার 'নবজাগরণ'-এ উদ্বুদ্ধ আসামের আলোকদীপ্ত উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণি নানা কারণে কৃষক দরদি হওয়ার ফলে এটি কিছুটা সহজ হয়। জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ-বিরোধিতা (সেটি নরমপন্থী বা চরমপন্থী যে উপায়েই হোক) আসামে নতুন ভাষা পায়। ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সংগ্রাম করতে গিয়ে যেসব ব্যক্তি শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের নানাভাবে মহিমান্বিত করার উদ্যোগে এটি প্রতিফলিত। ১৮৯০-এর দশকেই প্রথম রত্নেশ্বর মোহান্ত ঘোষণা করলেন, আসামে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রথম শহিদ ও জাতীয় বীর ছিলেন মণিরাম দেওয়ান, যিনি ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছিলেন। অসমিয়া কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উত্তেজক কবিতা প্রকাশ করতে শুরু

করলেন। ১৯০৫-১১ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে বঙ্গদেশ উত্তাল হলেও এবং আসামকে পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত করার ফলে অসন্তোষ-উত্তেজনা থাকলেও এর বহিঃপ্রকাশ কিন্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তেমন দেখা যায়নি। ঐ সময়ে বাংলার 'স্বদেশি' বা 'বয়কট' আন্দোলন বা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ বা বিপ্লবীদের প্রভাব আসাম-বাংলার সীমান্ত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে প্রভাবিত করতে পারেনি (যদিও ১৯২১ সালে গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বা তার ফলশ্রুতিতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এটি কিছুটা দাগ কেটেছিল)।

২২.১.২ ১৯২১-এর পরবর্তী চিত্র

আসামে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে প্রাক-১৯২১ এবং ১৯২১-এর পরবর্তী অধ্যায়ের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন আনা যায়। ১৯২১ সালে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর জেলা, মৌজা, শহর ও গ্রামে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হল এবং কংগ্রেসের শিকড় সমাজের গভীরে বিস্তৃত হল।

যদিও দেশের অন্যান্য অংশের মতো আসামেও কংগ্রেসের নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতেই মূলত কুক্ষিগত ছিল, কিন্তু প্রধান সমর্থক-শক্তি ছিল গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়। এরফলে কংগ্রেস সংগঠন ও আন্দোলনের শক্তি যেমন ছিল, তেমনি আবার দুর্বলতাও ছিল। দুর্বলতা প্রধানত আর্থিক সংকটকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমদিকে আসামের প্রদেশ কংগ্রেস-এর নিজস্ব অফিসঘর বা উল্লেখযোগ্য তহবিল না থাকার কারণে জওহরলাল নেহরু রীতিমতো বিরক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য ১৯৩৫ সালে গুয়াহাটিতে জনৈক সমর্থকের দান-করা জমিতে কংগ্রেস অফিস প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়েছিল।

১৯২৬ সালে গুয়াহাটির পান্ডুতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৪১তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার-এর সভাপতিত্বে। সেই সময় গুয়াহাটি শহরের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২০,০০০ এবং এত বড়ো অধিবেশন সংগঠনের ক্ষেত্রে আর্থিক সংগতি সেদিনের ঐ ছোট্ট শহরের ছিল না। ৪১তম কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য সংগৃহীত ৪০,৯৭৫ টাকার ৩/৪ অংশ চাঁদা কৃষকদের কাছ থেকে এসেছিল। **মতিলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলি, শওকত আলি, সরোজিনী নাইডু, আবুল কালাম আজাদ, এস. সত্যমূর্তি প্রমুখ জাতীয় নেতার উপস্থিতিতে পান্ডু অধিবেশন বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।** পরবর্তী সময়ে বিষ্ণুরাম মেধি (১৭.৪৮ দ্রষ্টব্য), অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি

(১৭.৩ দ্রষ্টব্য), সিদ্ধিনাথ শর্মা, মৌলানা তায়েবুল্লা প্রমুখ আসামের নেতৃবৃন্দ জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচি রূপায়ণে সক্রিয় ভূমিকা নেন। ১৯২০'র দশকে আসামে কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা কত ছিল, সেটি সঠিকভাবে বলা সম্ভব না হলেও, নগর-শহর নয়, বরং কৃষক এবং গ্রামই ছিল কংগ্রেস সংগঠনের প্রধান ভিত্তি এবং সেটি সদস্য সংখ্যা ও চাঁদা উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়েছিল। অবশ্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব মধ্যবিত্তের হাতেই ছিল। ১৯২৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে ৭৫০ স্বেচ্ছাসেবকের অধিকাংশই ছিলেন গ্রামের যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়। ১৯৩০ সালে বিষ্ণুরাম মেধি আনুষ্ঠানিকভাবে APCC'র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং দীর্ঘ ৯ বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ব্রিটিশ-শাসনাধীন আসামে কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বরদোলই প্রথমে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-১৭ নভেম্বর ১৯৩৯) এবং পরে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার (১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-১৪ আগস্ট ১৯৪৭) প্রধান মন্ত্রীত্বের পদ (সেই সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে 'প্রধানমন্ত্রী' বলা হত) অলংকৃত করেন। ১৯৪৬ সালে যখন 'ক্যাবিনেট মিশন' আসাম সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে 'গ' শ্রেণিভুক্ত রাজ্য হিসাবে পূর্ববঙ্গের (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের) সাথে 'গ্রুপিং সিস্টেম'-এর আয়োজন প্রায় সমাপ্তির পথে এনেছিল এবং জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটা অংশের এই ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন সমর্থনও ছিল, সেইসময় গোপীনাথ বরদোলই-এর নেতৃত্বে APCC তীব্রভাবে বিরোধিতা না করলে আসাম হয়তো শেষপর্যন্ত পাকিস্তানেরই অন্তর্ভুক্ত হত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদোলই-এর নেতৃত্বেই কংগ্রেস দল আসামে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।

১৯৩০-এর দশকের শেষদিক থেকে কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা আসামে যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল সেটি এইরকম ঃ

সাল	সদস্য সংখ্যা
১৯৩৫-৩৬	২,৬২০
১৯৩৬-৩৭	১৫,৬৪৬
১৯৩৮-৩৯	৩৭,৩২১
১৯৩৯-৪০	৫৬,৬৩৩

মাত্র ৫ বছরে (১৯৩৫-১৯৪০) এই বৃদ্ধি গভীর ইঙ্গিতবহ। কংগ্রেস দল আসামে ক্ষমতায় থাকার কারণে স্বাধীনোত্তর যুগে কংগ্রেস সদস্য সংখ্যা বিদ্যুৎগতিতে বাড়তে থাকে।

সারণি ১২
আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি (১৯২১-১৯৫৯)

ছবিলাল উপাধ্যায়	এপ্রিল, ১৯২১
কুলধর চালিহা	জুন, ১৯২১
তরুণরাম ফুকন	জুলাই, ১৯২১
বিষ্ণুরাম মেধি	১৯৩০-১৯৩৮
যাদবপ্রসাদ চালিহা	(ভারপ্রাপ্ত ১৯৩০)
হেমচন্দ্র বরুয়া	১৯৩৮, ১৯৪১
মৌলানা তায়েবুল্লা	১৯৪০
দেবেশ্বর শর্মা	১৯৪৮
সিদ্ধিনাথ শর্মা	১৯৫০, ১৯৫৯
বিমলাপ্রসাদ চালিহা	১৯৫২, ১৯৫৬
মহেন্দ্রমোহন চৌধুরি	১৯৫৪, ১৯৫৭

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসামে মূলত তিনটি বড়ো আকারের আন্দোলন হয়েছিল ঃ (১) ১৯২০-এর দশকের প্রথমার্ধে অসহযোগ আন্দোলন, (২) ১৯৩০-৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন, (৩) ১৯৪২ সালে 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন।

২২.২ আসামে অসহযোগ আন্দোলন (Non-Cooperation Movement in Assam)

২২.২.১ প্রেক্ষাপট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার সংক্রান্ত বিতর্ক ইত্যাদির প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের মতো আসামেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছিল। ১৯২০ সালের ১৭ এপ্রিল গান্ধিজি সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলনে প্রথম সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, আদালত, খেতাব, উপাধি ইত্যাদি বর্জনের এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও মৈত্রীর ডাক দিয়েছিলেন। যদিও সুরমা উপত্যকায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নানা কারণে তিক্ত ছিল, কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলনের ঢেউয়ে উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে শুরু করে। হিন্দু মনন যাতে আহত না হয় এজন্য মুসলিম নেতা আব্দুল গফুর তাঁর সম্প্রদায়কে গো-হত্যা থেকে নিরস্ত্র করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতেও নবীনচন্দ্র বরদোলই, তরুণরাম ফুকন, চন্দ্রনাথ শর্মা, সৈয়দ

শাদুল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে অনেক জনসভায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯২০ সালের পয়লা আগস্ট থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি শুরু হয় এবং খিলাফৎ ও অসহযোগ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

২২.২.২ কর্মসূচি

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে লালা লাজপত রাই-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে আন্দোলনের খসড়া কর্মসূচি পেশ করা হয় এবং ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে সি. বিজয়রাঘবচারিয়া ইসমাইল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নাগপুর কংগ্রেসে এটি গৃহীত হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল ঃ

১. ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি, খেতাব ইত্যাদি ফিরিয়ে দেওয়া এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পদত্যাগ।

২. সরকারি সভা-সমিতি, দরবার অথবা আধাসরকারি অনুষ্ঠান বর্জন।

৩. সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীদের ধীরে ধীরে প্রত্যাহার এবং বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ।

৪. ব্রিটিশ আদালত বর্জন।

৫. মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার আইন অনুযায়ী গঠিত বিভিন্ন প্রাদেশিক কাউন্সিলের সভ্যপদ ত্যাগ এবং কংগ্রেসের নির্দেশ অমান্যকারী প্রার্থীদের বর্জন।

৬. বিদেশি দ্রব্য বয়কট ইত্যাদি।

২২.২.১ নেতিবাচক ও ইতিবাচক কর্মসূচি

শুধু নেতিবাচক কর্মসূচিই নয়, অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠা (যদিও 'স্বরাজ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ নিয়ে নেতৃত্বের মধ্যে নানারকম ভাষ্য ছিল)। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের মধ্যে একদিকে বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, মহম্মদ আলি জিন্না, অ্যানি বেসান্ত, গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগের কর্মসূচি সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করতেন এবং অন্যদিকে মুসলিম নেতৃত্ব যেমন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মুখতার আহমদ আনসারি, হাকিম আজমল খান, আব্বাস তায়েবজি, আলি ভ্রাতৃদ্বয় সহ অধিকাংশ যুবক অসহযোগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সেই সময় Assam Association (১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত) ছিল একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন, যদিও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের প্রশ্নে ঐ সংগঠনটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়।

শিক্ষিত অসমিয়া যুবকদের অধিকাংশ এক বছরে 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে গান্ধিজির নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) অংশগ্রহণে এগিয়ে এলেও, ঘনশ্যাম বরুয়া, ফৈজনুর আলি, প্রসন্নকুমার বরুয়া, ডালিমচন্দ্র বোরা প্রভৃতি প্রবীণ নেতারা নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এক কথায়, অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয় কংগ্রেসের মতো আসাম অ্যাসোসিয়েশনের অভ্যন্তরেও তীব্র বিতর্কের অধ্যায় শুরু হয়েছিল। অ্যাসোসিয়েশনের তেজপুর সম্মেলনে (২৬-২৮ ডিসেম্বর ১৯২০) বিতর্ক শেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই বিতর্ক থাকলেও সুরমা উপত্যাকায় কিন্তু কোনো বিতর্ক ছিল না, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেখানে সকলে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। আসলে, সুরমা উপত্যকায় খিলাফৎপন্থী মুসলিমরা অগ্রণী ভূমিকায় থাকায় খিলাফৎ-অসহযোগের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচিই নয়, আর্থ-সামাজিক সংস্কারও অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়। বিদেশি দ্রব্য ও প্রতিষ্ঠান বয়কট-এর সাথে 'স্বদেশি'কে যুক্ত করে হস্তচালিত তাঁত ও চরকা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, হিন্দু মুসমলান ঐক্য, মদ সহ নেশা জাতীয় দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান, লোকমান্য তিলকের স্মৃতি রক্ষার্থে 'স্বরাজ্য তহবিলে' দান, জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠন, খাদি বস্ত্র পরিধান, গ্রামস্তরে বিবাদ-মীমাংসার জন্য সালিশি-বোর্ড গঠন ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচি অসহযোগ আন্দোলনে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এক নতুন জাগরণের সূত্রপাত হয়। বাগ্মী চন্দ্রনাথ শর্মা, হেমচন্দ্র বরুয়া, অমিয়কুমার দাশ, অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি, ত্রিগুণাচরণ বরুয়া, এবং মুহিবুদ্দিন আহমদ ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকার ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কটন কলেজ ও অন্যান্য সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার ইতি টেনে অনেক ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিতে দ্বিধা করেননি। একইভাবে সুরমা উপত্যাকার মুরারীচাঁদ কলেজ সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার অভিপ্রায়ে এবং এক বছরে 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার মন্ত্রে অনেক ছাত্র দীক্ষিত হন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গুয়াহাটি, নলবাড়ি, জোড়হাট, তেজপুর, শিবসাগর, নওগাঁও-এ এবং সুরমা-বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ, শিলচর, রাজনগর, মৌলবীবাজার প্রভৃতি এলাকায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তরুণ আইনজীবী চন্দ্রনাথ শর্মা, নবীনচন্দ্র বরদোলই,

কৃষ্ণনাথ শর্মা, কুলধর চালিহা, তরুণরাম ফুকন কিছুদিনের জন্য ব্রিটিশ আদালত বর্জন করে আন্দোলনে অংশ নেন। সুরমা উপত্যকাতে মহেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, কামিনীকুমার চন্দ আইন ব্যবসায় যবনিকা টেনে কংগ্রেস দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে যোগ দেন।

২২.২.২ আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস

এতদিন আসামে জাতীয় কংগ্রেসের স্বতন্ত্র কোনো শাখা ছিল না, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অংশ হিসেবেই কাজ চলত। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে এবং ডিসেম্বরে নাগপুর অধিবেশনে ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠনের এবং সদস্যপদ গ্রহণের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক সকলের কাছে চার আনা 'ফি ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর দেশব্যাপী কংগ্রেস সদস্যপদ গ্রহণের হিড়িক শুরু হয়। আলোকদীপ্ত গুটি কয়েক মানুষের সংগঠন থেকে কংগ্রেস সাধারণ মানুষের সংগঠনে পরিণত হয়। এরই ফলে, ১৯২১ সালের ৫ জুন Assam Provincial Congress Committee গঠিত হয়। এর আগে জোড়হাটে ছবিলাল উপাধ্যায়-এর সভাপতিত্বে ১৮ এপ্রিল ১৯২১-এ অনুষ্ঠিত Assam Association-এর সভার নবীনচন্দ্র বরদোলই, কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি নেতৃবর্গ সর্বভারতীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে আসামের সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা ও সংগ্রামের অংশ হিসেবে উপস্থিত করার যৌক্তিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মোটামুটি একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন। আসামে কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হওয়ার (১৯২১) ফলে আসাম অ্যাসোসিয়েশনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে বিলীন হয়ে যায়। যেহেতু ছবিলাল উপাধ্যায় আসাম অ্যাসোসিয়েশনের শেষসভার সভাপতি ছিলেন, এরই জন্য তিনি কিছুদিন নব গঠিত আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাপতি হিসাবে কাজ চালিয়ে যান। এরপর একে একে কুলধর চালিহা, তরুণরাম ফুকন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গুয়াহাটিতে সদর দফতর সহ আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এইভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আত্মপ্রকাশ করে। খিলাফৎ আন্দোলন নানা কারণে স্তিমিত হয়ে গেলেও সর্বভারতীয় অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আছড়ে পড়ে। এরই জন্য মন্তব্য করা হয় ১৯২০-২২ সালের "The non-cooperation movement marked the beginning of Assam's active participation in all-India politics"।

২২.২.৩ গান্ধিজির প্রথম আসাম সফর

অসহযোগের বার্তা সমগ্র দেশ জুড়ে প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধি নিজে। ১৮-৩০ আগস্ট ১৯২১-এ তিনি প্রথম আসাম সফর করেন। এর আগে নবগঠিত আসাম প্রদেশে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নবীনচন্দ্র বরদোলই, তরুণরাম ফুকন, কুলধর চালিহা, চন্দ্রনাথ শর্মা প্রভৃতি নেতৃত্ব বোম্বাইয়ে গিয়ে গান্ধিজিকে আসাম পরিভ্রমণের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তরুণরাম ফুকনের কাছ থেকে গান্ধিজি যখন অবগত হলেন, আসামের প্রতিটি বাড়িতে (ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে) তাঁত আছে এবং প্রতিটি মহিলা তাঁত বস্ত্র তৈরিতে দক্ষ, সেই মুহূর্তে আসামকে স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা তাঁর প্রবল হল, কারণ খাদি ও চরকাসহ প্রত্যেকের নিজ বস্ত্র তৈরির কর্মসূচি ছিল অহিংস অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ১৮ আগস্ট ১৯২১-এ কলকাতা থেকে দার্জিলিং মেলে গান্ধিজি যখন গুয়াহাটিতে অবতরণ করলেন, সেই সময় সমগ্র শহর উৎসবের সাজে সেজেছিল, শত শত তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের কলকাকলিতে গুয়াহাটি স্টেশন-চত্বর মুখরিত হয়ে উঠেছিল। গান্ধিজির সাথে ছিলেন মহম্মদ আলি ও তাঁর স্ত্রী, আজাদ শোভানি, যমুনালাল বাজাজ, আচার্য কৃপালিনি প্রভৃতি নেতৃবর্গ। জন-জাগরণের বার্তা নিয়ে গান্ধিজি গুয়াহাটি, নওগাঁও, তেজপুর, জোড়হাট, ডিব্রুগড় প্রভৃতি প্রধান শহরের বিভিন্ন সমাবেশে হিন্দিতে উদ্দীপক বক্তৃতা দিতেন এবং সেটি অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হত। ১৯ আগস্ট ১৯২১ সালে অসমিয়া বুদ্ধিজীবীদের সাথে কথোপকথন-এর সময় গান্ধিজি অকপটে স্বীকার করেছেন, কীভাবে তিনি ১৯০৮ সালে অজ্ঞতাবশত অত্যন্ত অন্যায়ভাবে *হিন্দ্-স্বরাজ* পত্রিকায় অসমিয়াদের সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন এবং অসমিয়াদের পশ্চাদপদতার সাথে ভীল, পিন্ডারি এবং ঠগীদের তুলনা করেছিলেন। গান্ধিজি এই ভুলের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন এবং ১ সেপ্টেম্বর ১৯২১-এ *Young India* পত্রিকায় 'Lovely Assam' প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা ও বাধাদান, ১৪৪ ধারা জারি ইত্যাদি সত্ত্বেও গান্ধিজির ডাকে প্রতিটি জনসভায় হাজার হাজার ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন এবং সভাশেষে বিদেশি দ্রব্য ও বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করত। তেজপুর, জোড়হাট, ডিব্রুগড় প্রভৃতি এলাকার জনসভায় চা-বাগানের শ্রমিকরা কাতারে কাতারে উপস্থিত থেকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করতেন। জোড়হাটের জনসভায় গোর্খা সিপাইরা পর্যন্ত উপস্থিত থেকে গান্ধিজির জয়ধ্বনি তুলেছিলেন। আসামে দীর্ঘ ১২ দিন সফরের শেষদিকে (২৫ আগস্ট ১৯২১) ডিব্রুগড়ে গান্ধিজি চা-বাগানের মালিকদের

সংগঠন Planters' Association-এর সভ্যদের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করে চা-শ্রমিকদের কল্যাণে জনহিতকর কিছু কাজ করার পরামর্শ দেন। একইভাবে, গান্ধির প্রতিনিধি হিসাবে যমুনালাল বাজাজ মাড়োয়ারি বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সাথে মিলিত হয়ে স্বদেশি কাপড়ের সরবরাহ ও ব্যবসার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গুয়াহাটিতে ৬৫ জন বস্ত্র ব্যবসায়ী যমুনালাল বাজাজ ও মহম্মদ আলিকে আশ্বাস দেন যে, তাঁরা বিলাতি বস্ত্র ব্যবসার সাথে আর জড়িত থাকবেন না। ডিব্রুগড় থেকে গান্ধিজি তাঁর সঙ্গীসাথী সহ ট্রেনে বদরপুর হয়ে বরাক উপত্যাকার শিলচরে উপস্থিত হন। শিলচরে কামিনীকুমার চন্দ'র আতিথেয়তা গ্রহণ করেন এবং যথারীতি জনসভায় বক্তৃতা দেন। শিলচরে সমস্ত মাড়োয়ারি ব্যবসাদার বিলাতি বস্ত্র 'বয়কট'-এর প্রশ্নে তাঁর কাছে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর ৩০ আগস্ট ১৯২১ সালে সিলেট হয়ে কলকাতার পথে গান্ধিজি পাড়ি দেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তুলনায় সুরমা উপত্যকায় বিলাতি বস্ত্র বর্জনের প্রশ্নে কম উৎসাহ লক্ষ করে গান্ধির সঙ্গী মহম্মদ আলি এত বিরক্ত হয়েছিলেন, সিলেটের জনসভায় কয়েকজন মুসলিম শ্রোতার বিলাতি কাপড় ও টুপি নিয়ে তিনি টানাটানি শুরু করে দেন।

২২.২.৩.১ গান্ধি সফরের প্রভাব

প্রথম পর্বে গান্ধিজির মাত্র ১২ দিনের আসাম সফর আসামের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং চারিদিকে অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। **আসামের ইতিহাসে এই প্রথম ক্ষুদ্র গণ্ডির সীমানা অতিক্রম করে সর্বভারতীয় সংগ্রামের সাথে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মানুষ একাত্মতা অনুভব করলেন। আসামের বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী অমিয় কুমার দাশ (১৭.২ দ্রষ্টব্য)-এর মতে, সবটাই সম্ভব হয়েছিল শুধু একটিমাত্র ব্যক্তির জন্য, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় গান্ধিজি প্রথম এলেন, অবাক-বিস্ময়ে সবকিছু দেখলেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় জয় করে চলে গেলেন।** আসাম সহ সমগ্র ভারতবাসীকে এই প্রথম একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শক্তির সামনে সত্যের জয়গান গেয়ে নির্ভীক হওয়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করে গেলেন। গান্ধিজি আসাম থেকে বিদায় নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই নওগাঁও-এর নুরউদ্দিন আহমদ তাঁর 'খান বাহাদুর' উপাধি ত্যাগ করেন। অবশ্য, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিভিন্ন ব্রিটিশ খেতাবে ভূষিত ১৬১ জনের মধ্যে গান্ধির ডাকে মাত্র ২ জন উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। এর মধ্যে নুরউদ্দিন আহমদ অন্যতম। অনেক সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারী, স্কুল শিক্ষক, কোর্ট ইন্সপেক্টর, সেরেস্তাদার, পুলিশ কর্মচারী, মণ্ডল,

মৌজাদার, গাঁওবুড়া, পদত্যাগ করেন। গান্ধিজি নিজেই উল্লেখ করেছেন, তাঁর ১২ দিনের সফরের সময় আসামের মোট ৭৫ জন আইনজীবীর মধ্যে ১৫ জন আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। ক্রমশ এই সংখ্যাটি বৃদ্ধি পায়। ১৯২১ সালের ১ সেপ্টেম্বর একমাত্র গুয়াহাটি শহরেই আইন ব্যবসা ত্যাগকারী ব্যবহারজীবীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯ জন। 'তিলক মেমোরিয়াল স্বরাজ্য ফান্ড' বা তহবিল থেকে ঐসব ব্যবহারজীবীকে জীবন নির্বাহের জন্য মাসিক ৫০ টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হলেও অনেকেই সেটি গ্রহণ না করে অসহযোগ আন্দোলনের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে নাম লিখিয়েছিলেন। গ্রামের দিকে এইসব আইনজীবীরা পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সুরমা উপত্যকাতেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। স্কুল ও কলেজ ছাত্রদের মধ্যেও একই উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। গান্ধিজির উপস্থিতিতেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন কলেজের প্রায় ৫০০ ছাত্র উচ্চশিক্ষায় ইতি টেনে অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন।

২২.২.৩.২ আদিবাসীদের অংশগ্রহণ

১৯২১ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমতলে অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদর দফতর গুয়াহাটি থেকেই সমগ্র রাজ্যের আন্দোলন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হত। এমনকি গারো পাহাড়েও কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী জেলা প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে কিছু মহাজন ও ব্যবসায়ীর সাহায্যপুষ্ট হয়ে বিদেশি বস্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান অক্ষত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আপার-আসামের অভ্যন্তরেও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে প্রচার অভিযান অব্যাহত থাকায় মিরি গোষ্ঠীর মতো অনেক সমতলের আদিবাসীও আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। তরুণরাম ফুকন মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> *...when I recall the enthusiasm and the determined and concerted action of the Kacharis of Boko, their ready response, their sacrifices and suffering, my heart bleeds even now. The Miris of Sibsagar, the Duflas of North Lakhimpur became the best workers and gave such splendid demonstration of their sincerity and ability that the trained soldiers of the Government had the look at them with awe and admiration.*

তথাকথিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের রুদ্র-রূপ দেখে ব্রিটিশ আরক্ষা বাহিনী কত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিল, আসামের উপজাতিদের অংশগ্রহণের এই অধ্যায় সেটিই প্রমাণ করে। ব্রিটিশ সরকার এর ফলে কত চিন্তিত ছিল কামরূপ জেলা সম্পর্কে গোয়েন্দা দফতরের গোপন রিপোর্টে সেটি উপলব্ধি করা যায় ঃ

> *The whole district (Kamrup) including the ignorant Kachari population in the northern part has been perceptibly affected by disloyal preachings and the local officers report that some decisive action is necessary to restore authority and prestige of the Government.*

২২.২.৩.৩ আফিং প্রশ্নে সাফল্য

অসহযোগ আন্দোলনের গঠনমূলক কর্মসূচির মধ্যে মদ-আফিং ইত্যাদি নেশার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের দাবি এবং ব্যাপকভাবে খাদি-বস্ত্র পরিধানের প্রচার আসামে বিশেষভাবে সাফল্যলাভ করেছিল। আসামে ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল, আফিং থেকে যত বেশি রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়, যদিও বাইরে আফিং ব্যবহারের বিরুদ্ধে লোক দেখানো প্রচার ছিল ("maximum revenue with minimum of consumption")। এরই জন্য মহাত্মা গান্ধির একান্ত অনুরাগী C. F. Andrews আসামের ব্রিটিশ সরকারকে Opium Government বা আফিং-সরকার নামে বিদ্রূপ করতেন। গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম বার্তা ছিল, আসামকে আফিং মুক্ত করে 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত করে তোলা। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের মদ-আফিং-এর ধ্বংসাত্মক ফলাফল সম্পর্কে সচেতন করা থেকে শুরু করে ঐসব নেশা জাতীয় দ্রব্যগুলির বিক্রয় কেন্দ্রের সামনে 'পিকেটিং' ইত্যাদির ফলে কিছুটা কাজ হয়েছিল। নওগাঁও-এ কনকচন্দ্র শর্মার আফিং-বিরোধী আবেগপূর্ণ বক্তৃতার পর অনেকে নেশার সাজসরঞ্জাম সভাস্থলেই জমা দিয়েছিলেন। ডিব্রুগড়ে প্রচার এত তুঙ্গে উঠেছিল যে, মদ-আফিং ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ২১ নভেম্বর ১৯২১-এ Criminal Law Amendment Act জারি করে মদ-আফিং ইত্যাদি দোকানের সামনে পিকেটিং, বাধাদান ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করে বাধাদানকারী স্বেচ্ছাসেবীদের চরম শাস্তিদানের

সুপারিশ করা হয়েছিল। ইউরোপীয় ম্যানেজারদের দৌরাত্ম্যে চা-বাগানের প্রবেশ পথ সহ বিভিন্ন এলাকায় যেখানে নেশাদ্রব্যের ফলাও ব্যবসা চলত বাধাদানকারী কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এতসব সত্ত্বেও একদিকে আসাম কাউন্সিল-এর অভ্যন্তরে J. J. M. Nichols-Roy, পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া, নীলমণি ফুকন প্রভৃতি ব্যক্তিদের আফিং-এর বিরুদ্ধে অভিযান এবং অন্যদিকে বাইরে গান্ধিজির ডাকে নেশার বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। ১৯২০-২১ সালে আসামে মোট ১,৬১৫ মন আফিং ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯২১-২২ সালে ১,৪০৮ মন ১৫ সের এবং ১৯২২-২৩ সালে ৯৯৩ মন ৩৭ সের-এ নেমে আসে। পরবর্তী সময়ে এই ক্রমহ্রাসমান ধারা অব্যাহত ছিল। আফিং-এর উপর রাজস্ব বারবার বৃদ্ধি সত্ত্বেও সেক্ষেত্রেও এই ক্রমহ্রাসমান ধারা লক্ষ করা যায়। যেমন, ১৯২০-২১ সালে আদায়ীকৃত রাজস্ব ছিল ৪৪,১২,৩০৮ টাকা, ১৯২১-২২ সালে ৩৯,১৬,৫৭০ টাকা এবং ১৯২২-২৩ সালে ৩৫,৮৬,০২৭ টাকা ইত্যাদি। শুধু আফিং-এর ক্ষেত্রেই নয়, সরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী বিভিন্ন নেশা দ্রব্য থেকে সরকার কর্তৃক আদায়ীকৃত মোট আবগারি শুল্কের পরিমাণ ১৯২১-২২ সালে ১৮.২৭ শতাংশ কমে গিয়েছিল। আসামে মদ্যপানের পরিমাণ ৪৯.৮ শতাংশ এবং গাঁজা ধূমপানের পরিমাণ ২৪.৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। সব মিলিয়ে আবগারি শুল্ক এবং বনবিভাগ থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব আসামে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ১৯ লক্ষ টাকা কমে গিয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের আফিং-এর বিরুদ্ধে অভিযানকে কেন্দ্র করে ১৯২৩-২৪ সালে C. F. Andrews-কে প্রাথমিকভাবে সমস্যাটি তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর কুলধর চালিহাকে সভাপতি এবং রোহিণীকান্ত হাতিবরুয়াকে সম্পাদক করে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি Assam Opium Enquiry Committee গঠন করে। কুলধর চালিহাকে জেনেভায় অনুষ্ঠিত International Opium Conference-এ পাঠানোর সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়, যদিও শেষপর্যন্ত সেটি বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯২৫ সালের মার্চ মাসে জোড়হাটে বিস্তারিতভাবে Assam Opium Enquiry Committee Report প্রকাশিত হওয়ার পর আসাম বিধান পরিষদের অভ্যন্তরে সদস্যরা ব্রিটিশ সরকারকে আফিং সেবন সংক্রান্ত কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বাধ্য করেন, যদিও আফিংকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে ব্রিটিশ আমলারা (কিছু অজ্ঞাত কারণে) কিছুতেই রাজি হতে অস্বীকার করেন। যাইহোক, সীমাবদ্ধ হলেও আফিং-নিষিদ্ধকরণের প্রশ্নে যতটুকু সাফল্য আসামে

এসেছিল, সেটি অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রবল জনমতের জন্যই সম্ভব হয়েছিল।

২২.২.৩.৪ খাদি প্রশ্নে সাফল্য

অসহযোগ আন্দোলনের সূত্র ধরে দ্বিতীয় যে গঠনমূলক কর্মসূচি আসামকে প্রভাবিত করেছিল সেটি খাদি বস্ত্র ব্যবহারকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছিল। আসামের প্রতিটি গৃহে তাঁত থাকলেও হস্তচালিত চরকার মাধ্যমে খাদি বস্ত্র তৈরি পদ্ধতির প্রচলন তেমন ছিল না এবং অনেকের কাছে 'খাদি' ব্যাপারটিই অজানা ছিল। আসামে গান্ধিজির প্রথম সফরের পরই খাদি-গ্রাম তৈরির উদ্যোগ গৃহীত হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অসমিয়া মহিলাদের বস্ত্র তৈরির দক্ষতার কথা শুনে গান্ধি কীভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। *Young India* পত্রিকায় প্রকাশিত 'Lovely Assam' প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ

Every women of Assam is a born-weaver. No Assamese girl who does not weave can expect to become a wife. And she weaves fairy tales in cloth। কিন্তু এইসব তাঁতে সাধারণত মুগা, সিল্ক, এন্ডি ইত্যাদি বস্ত্র তৈরি হত, যেগুলি ঠিক তুলা-চাষের ওপর নির্ভর ছিল না।

অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিদেশি বস্ত্র বর্জন এবং ব্যাপকভাবে স্বদেশি খাদি বস্ত্র গ্রহণের প্রচার। এটি যে কিছুটা সফল হয়েছিল সেটি উপলব্ধি করা যায় যখন দেখা যায়, ১৯২০-২১ সালে সমগ্র দেশে আমদানিকৃত বিদেশি বস্ত্রের মূল্য ১০২ কোটি টাকা থেকে কমে ১৯২১-২২ সালে ৫৭ কোটিতে নেমে এসেছিল। ১৯২১ সালে এ.আই.সি.সি. ২৫ হাজার টাকা আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির হাতে তুলে দিয়েছিল খাদিকে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে। নবীনচন্দ্র বরদোলই, কনকচন্দ্র শর্মার উদ্যোগে গুয়াহাটিতে খাদি বস্ত্র তৈরির একটি কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে 'আসাম খাদি বোর্ড' গঠিত হয়েছিল এবং গুয়াহাটি ছাড়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আরও আটটি খাদি বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র যথাক্রমে বরপেটা, নওগাঁও, বরকাঠানি, দেরগাঁও, চেলেংঘাট, চারিং, কাকতিগাঁও, চুঙ্গি প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথমদিকে এটি তেমন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেনি। আসলে তুলার অপর্যাপ্ত সরবরাহও উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে কিছুটা রুগ্ন করেছিল। সুরমা উপত্যকাতেও গান্ধিবাদী সতীশচন্দ্র দেব-এর ব্যাপক উদ্যোগ সত্ত্বেও চিত্রটি প্রায় একইরকম ছিল। এই পরিস্থিতিতে এ.আই.সি.সি.-র পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে তুলাচাষের

উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আসামের দরং ও কামরূপ জেলায় ব্যাপকভাবে তুলা-চাষ প্রবর্তিত হওয়ার ফলে কাঁচামাল সরবরাহ সংকটের কিছুটা নিরসন হয়। 'তেজপুর জাতীয় মহামেল' গ্রামীণ কুটিরশিল্পের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করার উদ্যোগ নেয়। ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাটনায় অনুষ্ঠিত এ. আই. সি. সি. অধিবেশনে গান্ধিজি সমগ্র দেশের খাদি কর্মীদের আমন্ত্রণ জানান এবং All India Spinners' Association গঠন করেন এবং আসামের প্রতিনিধি হিসাবে কৃষ্ণনাথ শর্মা ও শংকর বরুয়া ঐ সংগঠনে যোগ দেন। ১৯২৫ সালের কানপুর কংগ্রেসে পরবর্তী সম্মেলন গুয়াহাটিতে করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রাক্-প্রস্তুতি হিসাবে খাদি কর্মসূচি আসামে কীভাবে অনুসৃত হচ্ছে সেটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য রাজেন্দ্রপ্রসাদ আসামে আসেন এবং তাঁর সুপারিশ মতো খাদিকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে All India Spinners' Association নবীনচন্দ্র বরদোলই-এর হাতে ৬ হাজার টাকা তুলে দেন। **গান্ধিজির কাছে চরকা/খদ্দর শুধু অর্থনৈতিক অস্ত্রই নয়, হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে 'স্বরাজ'-এর জন্য প্রস্তুত ও উদ্বুদ্ধ করার একটি উপযুক্ত অস্ত্র।**

১৯২৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের পাণ্ডু/গুয়াহাটি অধিবেশনের সময় খাদি কর্মসূচি তুঙ্গে উঠেছিল। বিশাল মণ্ডপসহ প্রদর্শনী সবই খাদির কাপড়ে এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যে স্থানটি "a city under *Khadi* canvas" নামে পরিচিত হয়েছিল। মদনমোহন মালব্য, রাজেন্দ্রপ্রসাদ থেকে শুরু করে জাতীয় নেতাদের সকলেই সেইসময় আসামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। পাণ্ডু/গুয়াহাটি অধিবেশনের সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার-এর ভাষায় ঃ "The spinning wheel has by its persuasiveness affected to a visible extent the national psychology, and has lent a new dignity to our menhood and womanhood...(the *Khaddar*) became the radiant symbol of our self-reliance and of our power of resistance". ১৯২৬ সাল থেকে খাদি কর্মসূচি আসামে অক্ষত রাখার জন্য নানা উদ্যোগ থাকলেও শেষপর্যন্ত অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে খাদি আন্দোলনে ভাটা পড়ে। ১৯৩০-৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৩৪ সালে গান্ধিজির দ্বিতীয়বার আসাম সফরের সময় 'খাদি সংঘ' তৈরির কিছু উদ্যোগ দেখা গেলেও ১৯২০'র দশকের মতো অত উৎসাহ লক্ষ করা যায় না। তথাপি শিবসাগরে বিমলাপ্রসাদ চালিহা, জোড়হাটে কৃষ্ণনাথ শর্মা, গোলাঘাটে শংকর বরুয়া, কামরূপ ও নওগাঁও-এ মহেন্দ্রনাথ হাজারিকা, শংকরলাল বাংকার প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা শেষদিন পর্যন্ত খাদি ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

২২.২.৪ আসামে চা-বাগান শ্রমিকদের অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ (Participation of Tea-Workers in Non-Cooperation Movement)

২২.২.৪.১ পটভূমি

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ের (between the two world wars) দুটি দশকে (১৯১৯-১৯৩৯) চা-বাগান থেকে শুরু করে আসামের সীমাবদ্ধ কলকারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ ও উত্তেজনা এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। Assam Labour Enquiry Committee (1921-22)-র রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) ফলে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ৩৩ থেকে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকের মজুরি কিন্তু বাড়েনি, বরং কিছুক্ষেত্রে কমে গিয়েছিল। ডিব্রুগড়ের চা-বাগানে ১৯২১-২২ সালে চাউলে ভর্তুকি সহ একজন শ্রমিকের গড়ে আয় ছিল ১০ টাকা ১০ আনা ৯ পয়সা (১০-১০-৯)। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮-১৯ সালে (চাউলে ভর্তুকির অজুহাত দেখিয়ে) এটি কমে দাঁড়ায় ১০-৮-৮ পয়সায়। ১৯২০ সালের অক্টোবরে (চাউলে ভর্তুকি ব্যতিরেকে) গড়ে একজন পুরুষ শ্রমিকের মাসিক নগদ বেতন ছিল ৫ টাকা, মহিলা শ্রমিকের ৪ টাকা এবং শিশু শ্রমিকের ২ থেকে ৩ টাকা। সুতরাং চা-বাগানের শ্রমিকদের উত্তেজনা উপলব্ধি করতে অসুবিধে হয় না। (বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে আসামে চা শ্রমিকদের উপর অমানবিক ও অবর্ণনীয় অত্যাচারের কাহিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)। ১৮৮৫ সালে লখিমপুর জেলায় ৯১ মাইল দীর্ঘ ডিব্রু-সাদিয়া রেললাইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২০ সালের জুলাই মাসে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ডিব্রু-সাদিয়া রেল শ্রমিকরা দীর্ঘ ১০ দিন লাগাতার ধর্মঘট করে সবকিছু অচল করে দেওয়ায় কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত রেল শ্রমিকদের (যাদের মাসিক বেতন ১০০ টাকার নীচে) ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। রেল শ্রমিকদের এই সাফল্য চা বাগানের শ্রমিকদের নানাভাবে প্রভাবিত করে, কারণ ঐ রেল বিভিন্ন চা-বাগানের পাশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং রেল শ্রমিকদের অধিকাংশ পারিবারিক সূত্রে চা-বাগানের শ্রমিকদের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু রেলের ক্ষেত্রে যেটি সম্ভব হয়েছিল, নানা কারণে চা বাগানের ক্ষেত্রে সেটি দুরাশায় পরিণত হয়। আপার-আসামে ১৯২০-তে লখিমপুর জেলার দুম-দুমা চা-বাগান, দরং জেলার মোনাবাড়ি এবং কাতনিবাড়ি প্রভৃতি চা-বাগানের শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির প্রশ্নে ব্রিটিশ মালিকের

দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। চা-বাগানের ইউরোপীয় মালিকদের বক্তব্য ছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আন্তর্জাতিক বাজার লণ্ডভণ্ড হওয়ার ফলে চা থেকে অর্জিত মুনাফা ক্রমহ্রাসমান ছিল এবং ঐ কারণেই শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি অসম্ভব। চা শিল্পের উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরূপ প্রভাব মেনে নিলেও, আসামের বেশ কিছু বাগান ঐ অবস্থার মধ্যে মুনাফা রীতিমতো বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু অজ্ঞ ও অশিক্ষিত চা-বাগান শ্রমিকদের অধিকাংশ এই সম্পর্কে এবং আন্তর্জাতিক বাজারের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকার কারণে আন্দোলন সফল হয়নি। Assam Labour Enquiry Report (1921-22) অনুযায়ী শিবসাগর সহ আপার-আসামের উত্তেজিত ও দিশাহারা চা-শ্রমিকরা ৩০টি হাট্ লুঠ, সুদখোর মহাজনদের বেধড়ক ধোলাই ইত্যাদি দেওয়ার ফলে ব্রিটিশ পুলিশের আক্রমণের শিকার হয়ে কারান্তরালে দিন কাটাতে বাধ্য হন। আসলে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে সেইসময় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা-শ্রমিকদের কোনো ধারণাই ছিল না। সকল বাগানের শ্রমিক একসাথে সংগ্রাম না করার ফলে এবং যোগ্য নেতৃত্বের অভাব হেতু প্রথম দিকের এইসব বিচ্ছিন্ন আন্দোলন রীতিমত দুর্বল ছিল এবং বিদেশি বাগান-মালিকদের পক্ষে এইসব উত্তেজনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করা সম্ভবপর হয়েছিল। উপরোক্ত পরিস্থিতির মধ্যেই এসেছিল অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান।

২২.২.৪.১ চারগোলা বহির্গমন ও চাঁদপুর ট্র্যাজেডি (Chargola exodus and Chandpur Tragedy

অসহযোগ আন্দোলন কীভাবে প্রথম সুরমা উপত্যকার চা-বাগানে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ আন্দোলনে সাহসী করে তুলেছিল সেটি উপলব্ধি করা যায় করিমগঞ্জ মহকুমার চারগোলার চা-বাগান শ্রমিকদের গণহারে বাগান-ত্যাগ ('Chargola exodus') এবং 'চাঁদপুর ট্র্যাজেডি' থেকে। যদিও গান্ধিজিসহ জাতীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ শ্রমিক ধর্মঘটের পক্ষপাতী ছিলেন না, তথাপি ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে Surma Valley Conference-এর চার নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চা-শ্রমিকদের প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দেওয়া হত বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে অসহযোগিতা করার প্রশ্নে। মজুরি বৃদ্ধিসহ নানা ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে চা বাগান-শ্রমিকরা বারবার আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে বাগান কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হওয়ায় সহ্যের প্রায় শেষ সীমায় এসেছিলেন। করিমগঞ্জ মহকুমার চারগোলা ও লঙ্গাই উপত্যকার ১৩টি চা-বাগানের ৮,৭৯৯ শ্রমিক ১৯২১ সালের ২ মে "মহাত্মা গান্ধি কী জয়" ধ্বনি দিয়ে (ঐ সময় একটা

বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল, ব্রিটিশ শাসনের শেষ লগ্ন এসে গেছে এবং দেশে 'গান্ধিবাদ' প্রবর্তিত হওয়ার পথে) বাগান থেকে বেরিয়ে শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে আসাম-বেঙ্গল রেল-এর মাধ্যমে চাঁদপুর স্টেশনে মিলিত হয়েছিলেন। শ্রমিকদের লক্ষ্য ছিল, স্টিমারে পদ্মা নদী পেরিয়ে ওপারে গোয়ালন্দ থেকে সোজা নিজের গৃহে ফিরে যাওয়া। **বন্দি-জীবন থেকে মুক্তির জন্য এত বড়ো আকারের বহির্গমন ('exodus') এর আগে শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে আর হয়নি।** প্রায় শ্রমিক-শূন্য বাগানের চেহারা দেখে বাগান কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুণতে শুরু করেছিল। সেই সময় সমগ্র সুরমা উপত্যকায় ৩১৯টি চা-বাগানের মধ্যে ১৯টি ছিল চারগোলা এবং লঙ্গাই উপত্যকায়। ১৩টি বাগানের চা-শ্রমিকদের অভিযান যদি সফল হত, তাহলে সেই বার্তা অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ত এবং ব্রিটিশ প্রভুত্বাধীন চা-শিল্পে পুরোপুরি বিপর্যয় নেমে আসত। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, সমগ্র ঘটনাটির পিছনে ছিল অসহযোগ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবীদের ইন্ধন। সরকারি নিষেধাজ্ঞা এবং বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারি সত্ত্বেও, গোয়েন্দা দফতরের তথ্য অনুযায়ী, রাতাবাড়ি এবং অন্যান্য চা-বাগান সংলগ্ন এলাকায়, রাত্রে অসহযোগ আন্দোলনকারীদের সাথে গোপনে বাগান শ্রমিকরা মিলিত হয়ে বিভিন্ন সভায় দাবি তুলেছিলেন প্রতি পুরুষ শ্রমিককে দৈনিক আট আনা, স্ত্রী শ্রমিকদের ছয় আনা এবং শিশু শ্রমিকদের চার আনা মজুরি বৃদ্ধির। কিন্তু সেটি বাগান কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করার ফলেই চারগোলা উপত্যকা থেকে এইরকম ব্যাপক শ্রমিক বহির্গমনের অধ্যায় শুরু হয়েছিল।

এই রকম একটি ঘটনায় উৎকণ্ঠিত হয়ে চট্টগ্রামের 'ডিভিশনাল কমিশনার' (ডি. সি.) এবং সিলেটের 'ডেপুটি কমিশনার' ১৯২১ সালের ৬ মে চাঁদপুর ছুটে গিয়ে ইউরোপীয় বাগান মালিকদের সাথে একটার পর একটা বৈঠক করেন এবং শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেন। C. F. Andrews মনে করতেন, রাজনৈতিক নয়, বরং অর্থনৈতিক কারণেই ঘটনাটি ঘটেছিল। European Tea Association of Assam-এর প্রতিনিধি Macpherson সাহেব করিমগঞ্জ ও চাঁদপুরে সমবেত চা শ্রমিকদের নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে আবার বাগানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে সেটিও ব্যর্থ হয়। এদিকে করিমগঞ্জে ও চাঁদপুরে 'শাসনব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছিল ; স্টেশন চত্বরে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থী শ্রমিকদের মধ্যে কলেরা মহামারি আকার ধারণ করার ফলে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে আর্তদের ত্রাণ ও চিকিৎসা শুরু হলেও সেটি ছিল

অপর্যাপ্ত। ২১ মে ১৯২১-এ চাঁদপুর স্টেশন চত্বরে স্টিমারের জন্য অপেক্ষমাণ শ্রমিকদের উপর মধ্যরাতে চট্টগ্রাম ডিভিসনের ডি. সি.'র নির্দেশে শুরু হল পুলিশের নির্মম অত্যাচার। C. F. Andrews-এর বিবরণ অনুযায়ী, ব্রিটিশ আমলারা গোর্খাবাহিনীর মাধ্যমে স্টেশন চত্বর পরিষ্কার অভিযানে নেমেছিলেন। Andrews-এর ভাষায় ঃ

> *....These Gurkhas used the butt-ends of their rifles on sick and helpless women and children, who were too weak to move rapidly. It was a brutal attack and it was entirely unprovoked.*

এই ঘটনায় কতজন চা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল সেটির সঠিক সংখ্যা জানা গেলেও, সরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী (যদিও সেটি অত্যন্ত কম করে দেখানো হয়েছিল), **পুলিশের আঘাত এবং কলেরায় আক্রান্ত হয়ে কমপক্ষে ৩০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এই ঘটনাটিই 'চাঁদপুর ট্র্যাজেডি' হিসাবে পরিচিত।** এই মর্মান্তিক অত্যাচারের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত কমিশন গঠনেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেন।

ব্রিটিশ পুলিশের এই বর্বর অত্যাচারের বার্তা পেয়ে চট্টগ্রাম থেকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কুমিল্লা থেকে অখিলচন্দ্র দত্ত, কলকাতা থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছিলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে ছাত্র, যুবক ও ডাক্তারদের একটি দলও বিপন্ন শ্রমিকের পাশে দাঁড়িয়েছিল। **ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে যতটুকু সমর্থন সাধারণ মানুষের ছিল, এই ঘটনার পর সেটির ভিত্তিও আলগা হতে শুরু করে।** সর্বক্ষেত্রে কংগ্রেস দলের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকায় অসহায় চা শ্রমিকদের জন্য চাঁদা তোলা শুরু হয়। কংগ্রেসের কর্মসূচির কেউ বিরোধিতা করলে তার কাছে জিনিসপত্তর বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ এই নির্দেশ পালন করেন। **ব্রিটিশ শাসনকে ধিক্কার জানিয়ে সিলেটে লাগাতার চারদিন হরতাল পালন করা হয়। আসাম-বেঙ্গল রেল এবং স্টিমার সার্ভিসে ২৪ মে ১৯২১ থেকে লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়। দীর্ঘ ৬ সপ্তাহ স্টিমার সার্ভিস বন্ধ থাকে এবং ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর ঐ সার্ভিসের প্রতিটি শ্রমিক কর্মচারীকে পুনর্বহাল করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়। অন্যদিকে রেলের ধর্মঘট ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকার ফলে দীর্ঘ প্রায় তিন মাস স্থল ও জলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।** পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি অচল করার প্রধান কারিগর ছিলেন তরুণরাম ফুকন। আসাম-বেঙ্গল রেলে সেই

সময় প্রায় ১১,০০০ কর্মচারী কাজ করতেন ; অসহযোগ আন্দোলনের জন্য ৪,৫০০ জন কর্মচ্যুত হন এবং এর ফলে বহু পরিবারে চরম দুর্দশা নেমে আসে। যদিও এইসব লাগাতার ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই বিতর্ক ছিল, কারণ গান্ধিজি এর ঘোর-বিরোধী ছিলেন, তথাপি আসামের উদীয়মান নেতৃত্ব ধর্মঘটকে প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে ব্রিটিশ শক্তিকে ঘায়েল করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু Broomfield (*Elite Conflicts in a Plural Soceity : Twentieth Century Bengal*) যেভাবে চাঁদপুর ট্র্যাজেডি থেকে শুরু করে স্থল ও জলপথের যানবাহন ধর্মঘটকে ভারতীয় 'ভদ্রলোকদের ষড়যন্ত্র' হিসাবে অভিহিত করে সমগ্র আন্দোলনে জল ঢেলে দিতে চেয়েছেন সেটি মোটেই যথার্থ নয়। শুধু Broomfield একা নন, **কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অস্তিত্বই অস্বীকার করেন এবং সবকিছুর মধ্যেই তথাকথিত হতাশাগ্রস্ত 'ভদ্রলোকদের' অসন্তোষ উত্তেজনাকেই প্রকৃত কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন।** চাঁদপুর ট্র্যাজেডি'র প্রেক্ষিতে গুয়াহাটির আইনজীবীরা ৩ জুন ১৯২১ একটি প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়ে তিনদিন আদালত বর্জন করেন। আসলে, সুরমা উপত্যকার চা শ্রমিকদের অসন্তোষ অর্থনৈতিক কারণে শুরু হলেও এবং অসহযোগ স্বেচ্ছাসেবী ও নেতৃত্বের কিছু ইন্ধন থাকলেও **অবশেষে এটি রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়।** অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ'র ভাষায় ঃ *It was the product of an interaction between the Gandhian impact on primitive minds and the incipient class militancy.*

২২.২.৪.২ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চা শ্রমিকদের উত্তেজনা

চারগোলা এবং চাঁদপুরের ঘটনা সমগ্র আসামের বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে কীরকম প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটি আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ করেছি। আসলে, সুরমা উপত্যকার ঘটনাবলীর আগে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন চা বাগানে একটার পর একটা ঘটনা ঘটেছিল। প্রধানত অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে ১৯২১ সালের এপ্রিল ও মে মাসে ডিব্রুগড় ও পানিতোলা গ্রুপের বিভিন্ন বাগানে এবং ২২ জুন সুন্তক চা বাগানে হরতাল হয়েছিল। **চাঁদপুরের ঘটনায় উত্তেজিত প্রধানত রাঁচি থেকে আগত সুন্তক বাগানের শ্রমিকরা মাড়োয়ারি ব্যবসাদারদের দোকান লুট থেকে শুরু করে সর্দারদের প্রহারের মাত্রা এমনি বৃদ্ধি করেছিলেন যে ইউরোপীয় ম্যানেজার ও কর্মকর্তারা বাগান ত্যাগ করে ভঁয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটি উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, গান্ধিজির অহিংস**

অসহযোগের বার্তা ও আদর্শের সাথে এইসব ঘটনা সংগতিপূর্ণ ছিল না। চারগোলার মতো শিবসাগর জেলার কিছু চা শ্রমিক শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধাপে ধাপে ১৯২১ সালের এপ্রিলে বাগান ত্যাগ করে রেলের মাধ্যমে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন স্থানে তাদের গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন। **সুতরাং বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনা শুধু যে সুরমা উপত্যকাতেই ঘটেছিল এমনটা নয় ; ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতেই ঘটছিল। তবে বেশিরভাগ ঘটনা গান্ধিজি'র ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রেই ঘটেছিল।** দরং জেলার হালেম চা-বাগানে, ঠাকুরবাড়ি গ্রুপের বাগানগুলিতে, কিংবা সোনাজুলি বা কাছারিগাঁও বাগানগুলিতে ১৯২১ সালের বিভিন্ন সময়ে মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদির দাবিতে **শান্তিপূর্ণ হরতাল বা অহিংস আন্দোলন অবশেষে মারমুখি হয়ে উঠেছিল এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাহেব ম্যানেজার/মালিকরা শ্রমিকদের হাতে প্রহৃত হয়েছিলেন।** তবে মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল ধেনদাই চা বাগানে যেখানে উত্তেজিত শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে এসে স্বয়ং পুলিশের সুপার শ্রমিকদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। **আসলে, সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 'British Raj'** এবং **'Planter Raj' সমার্থক ছিল ; কারণ চা-বাগানের ইউরোপীয় ম্যানেজার/ মালিকরাই ছিলেন সবকিছুর হর্তা-কর্তা-বিধাতা। সুতরাং চা-বাগানে আঘাত হানার অর্থ ছিল আসামে ব্রিটিশ শক্তির মেরুদণ্ডে আঘাত হানা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চা শ্রমিকদের এই সংগ্রামে আলোক-দীপ্ত বুদ্ধিজীবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তেমন সহানুভূতি (যেটি সুরমা উপত্যকায় লক্ষ করা যায়) পরিলক্ষিত হয়নি।**

আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ গান্ধিজির নির্দেশ মান্য করে চা-বাগান শ্রমিকদের হরতাল বা জঙ্গি আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখা শ্রেয় মনে করতেন। চা-বাগান সংলগ্ন 'হাট' (সাপ্তাহিক/অর্ধ সাপ্তাহিক বাজার) গুলিতে সাধারণত চা-বাগান শ্রমিকদের সাথে স্থানীয় গ্রামের মানুষের যোগাযোগের কিছুটা সুযোগ ছিল। কিন্তু সেখানেও বাগান কর্তৃপক্ষের নানারকম স্বৈরাচারী নির্দেশ ও শোষণ গ্রামের মানুষকেও মুখ বুজে সহ্য করতে হত। তাছাড়া ঐসব 'হাটে' অসহযোগ আন্দোলনকারীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। গান্ধিজির কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে কিছু তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামী যখন চা-বাগান সংলগ্ন 'হাট' বয়কট করে কিছুটা দূরে বিকল্প 'হাট'-এর আয়োজন করলেন, তখন সেটির উপরও আক্রমণ নেমে এল এবং ১৪৪ ধারা ইত্যাদি জারি করে সেটিকেও ব্যর্থ করার অপচেষ্টা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অব্যাহত রাখলেন। **আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাজ্ঞ নেতৃবৃন্দ এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে তেমন সরব ভূমিকা পালন করলেন**

না। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে প্রত্যেক প্রদেশকে নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী আন্দোলনের রূপরেখা তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত জাতীয় কংগ্রেস নেতা মদনমোহন মালব্য ১৯২২ সালের জুন মাসে আসামে এসে **চা শ্রমিকদের আন্দোলন থেকে কংগ্রেসিদের দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দিলেন।** চন্দ্রনাথ শর্মার মতো আসামের নেতা—যিনি চা শ্রমিকদের সভায় বক্তৃতা দিতেন—তিনিও ইউরোপীয় বাগান মালিকদের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য এড়িয়ে যেতেন। আসলে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে কুলধর চালিহা (১৭.১৫ দ্রষ্টব্য), যাদবপ্রসাদ চালিহা (১৮৯৭-১৯৬৪), নবীনচন্দ্র বরদোলই (১৭.৩৫ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি ব্যক্তিরা সকলেই ছিলেন চা বাগানের মালিক এবং ইউরোপীয় মালিকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রশ্নে আগ্রহী হওয়ার ফলে চা শ্রমিকদের আন্দোলনকে মনে প্রাণে সমর্থন জানাতে পারেননি। **এটিই ছিল একটি বড়ো সীমাবদ্ধতা। আসামে অসহযোগ আন্দোলন এটিই প্রমাণ করে দিল যে, শ্রমিকদের নিজস্ব শ্রেণি সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন ভিন্ন শ্রমিক সমস্যার সুরাহা বা সাফল্য আনা কঠিন।**

২২.২.৫ আসামে অসহযোগ আন্দোলনের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক

সমগ্র দেশে অসহযোগ আন্দোলনের তুমুল ঝড় কিছুটা প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ ভারত সফরে আসেন। কিন্তু এ. আই. সি. সি.-র ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ ১৭ নভেম্বর ১৯২১ (বোম্বাই) মুম্বাই বিমানবন্দরে অবতরণের সাথে সাথে শহর জুড়ে হরতাল ও বিলেতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়েছিল। মুম্বাই-এর মতো অত উত্তেজনা আসামে পরিলক্ষিত না হলেও ১৭ নভেম্বর ১৯২১ গুয়াহাটি শহরেও শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে অংশগ্রহণের ফলে সমগ্র গুয়াহাটি শহর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঐদিন বিকালে তরুণরাম ফুকন একটি বড়ো সভায় বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ঃ গান্ধিজির স্বপ্নের "এক বছরে স্বরাজ" আগামী এক মাসের মধ্যেই বাস্তবায়িত হতে চলেছে। সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল, **আসামের ছাত্র-যুবকদের অসহযোগ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ।** 'স্বরাজ'-এর নতুন মন্ত্রে উদ্দীপ্ত ছাত্র-যুবদের বিপুল উৎসাহ ও আশা ছিল আসামে অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ. আই. সি. সি.-র নির্দেশ অনুযায়ী গুয়াহাটিতে ২৭ নভেম্বর ১৯২১-এ Assam National Volunteer Corps (ANVP) গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং

৭০,০০০ যুবক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদানের অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষরদান করেন। তরুণকুমার ফুকন এবং নবীনচন্দ্র বরদোলই-এর হঠাৎ গ্রেফতারের কারণে আসামের অন্যান্য জেলাতেও একইভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকে।

২২.২.৫.১ আহমেদাবাদ কংগ্রেসের প্রভাব

১৯২১ সালে (২৭-২৮ ডিসেম্বর) হাকিম আজমল খান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আহমেদাবাদ কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দীপনাকে তুঙ্গে তুলে দিয়েছিল। আসাম থেকে চন্দ্রনাথ শর্মা, গোপীনাথ বরদোলই, পরমানন্দ আগরওয়ালা, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা সহ আরও ১৫ জনের বিশাল বাহিনী আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ৩৬ তম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। নেতৃবৃন্দ আসামে ফিরে আসার পর চারিদিকে রটে যায় খুব শীঘ্রই ব্রিটিশ রাজের যবনিকাপাত হচ্ছে এবং সমগ্র দেশে 'গান্ধিরাজ' প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠিত হলে সকল ধরনের অন্যায় কর-ব্যবস্থা উঠে যাবে এবং ভূমি রাজস্ব ৭৫ শতাংশ হ্রাস পাবে—এই বার্তাও আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। **কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গ্রামের অভ্যন্তরেও "গান্ধি মহারাজ কী জয়" ধ্বনি দিয়ে এমনভাবে আহমেদাবাদ কংগ্রেসের আশার বাণী প্রচার করেছিলেন** যে, Plains Division-এর ব্রিটিশ কমিশনার B. C. Allen ১৯২২ সালের জানুয়ারিতে শিবসাগর জেলা পরিভ্রমণের পর বিস্মিত হয়ে উল্লেখ করেছিলেন **কীভাবে শান্তিপ্রিয় মিত্রভাবাপন্ন জনগণের প্রায় সকলেই 'স্বরাজ' ধ্বনির প্রভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন ঃ**

> *What is surprising is that this idea has permeated the whole district so completely reaching even the remotest villages, and to old residents of Assam, it is distressing to find a peaceful and friendly people turing against Government and the European.*

আসামের বেশ কিছু স্থানে ব্রিটিশ সরকারকে **ভূমি-রাজস্ব প্রদান বন্ধ** করে দেওয়ার ফলে অবস্থা জটিল আকার ধারণ করল। মৌজাদররা খাজনা-আদায়ে ব্যর্থ হয়ে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নজরে আনলে B. C. Allen দরং জেলার মহাভৈরব ও হলেশ্বর মৌজায় সেনাবাহিনীর সাহায্য নিতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু **সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতেও কিছু কাজ হল না। ১৯২২ সালের ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত শিবসাগর জেলার দুটি মহকুমায় রাজস্ব আদায় হয়েছিল মাত্র ২,৪০০ টাকা, যদিও আগের**

বছরে এটি ১৮,০০০ ছিল। আসামে অসহযোগ আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষের চেতনা ও মানসিকতা এত দৃঢ় ছিল যে, ব্রিটিশ শাসকদের পেশি শক্তির আস্ফালন তার সামনে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকদের আক্রমণ সাফল্যের সাথে প্রতিরোধের প্রশ্নে শিবসাগর জেলার ঝান্‌জি-বামুনা-পুখুরি প্রভৃতি স্থান, কামরূপ জেলার বোকো, কিংবা বরপেটা জেলার বরনগর প্রভৃতি এলাকা উজ্জ্বল স্থান দখল করে আছে।

২২.২.৫.২ 'অহিংস' ও সহিংস

নামে 'অহিংস অসহযোগ' হলেও আসামে আন্দোলন যে মাঝে মাঝে সহিংস হয়ে উঠত, চা বাগানের ঘটনাবলিতে আগেই আমরা সেটি লক্ষ করেছি। এত বড় মাপের আন্দোলনে নানারকম উত্তেজনা বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে এবং বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ঘটনাও আসামে ঘটা অস্বাভাবিক ছিল না। নওগাঁও-এ একজন সাব-ডেপুটি কালেক্টরকে আন্দোলনকারীদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। **যমুনামুখ এলাকায় উত্তেজিত জনতা একটি মেলট্রেন থামিয়ে ঢিল পাটকেল ছুঁড়েছে এবং ৫৮ জন রাজনৈতিক বন্দিকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে।** রাহা এলাকায় কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকরা ব্রিটিশ সরকারের সমর্থকদের সামাজিকভাবে বয়কটের ডাক দিয়েছে। জোড়হাট মহকুমার তিয়ক এলাকায় একজন পুলিশের ইনস্পেক্টরকে জনতা বেধড়ক প্রহার করেছে। তিনসুকিয়াতেও পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ হয়েছে. গোলাঘাট মহকুমাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। গোলাঘাটের মারঙ্গীতে একজন অত্যাচারী মৌজাদারের বাড়ি স্বেচ্ছাসেবকরা পুড়িয়ে দিয়েছে। এরকম ছোটোখাটো অনেক ঘটনা আসামের বিভিন্ন স্থানে ঘটেছে। এক কথায়, আসামে অসহযোগ আন্দোলন যে আগাগোড়া শান্তিপূর্ণ ছিল—এটি দাবি করা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে না।

২২.২.৫.৩ অসহযোগ আন্দোলনে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছাত্রদের ভূমিকা (Role of the Brahmaputra-Valley Students in the Non-Cooperation Movement)

অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমগ্র আসামের দুটি উপত্যকায় যে প্রবল রাজনৈতিক ঝড় সৃষ্টি হয়েছিল তার সামনে ছাত্র সমাজ নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। ১৯১৬ সালে ছাত্রদের নিজস্ব সংগঠন 'আসাম ছাত্র সম্মিলন' গুয়াহাটিতে হয়েছিল মূলত বাণীকান্ত কাকতি (১৭.৪৩ দ্রষ্টব্য) এবং লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার (১৭.৬২ দ্রষ্টব্য) পরামর্শ অনুযায়ী। এর আগে ১৮৮৮ সালে 'অসমিয়া ভাষার

উন্নতি সাধিনী সভা'র অঙ্গ হিসাবে এটি 'অসমিয়া ছাত্রর সাহিত্য সন্মিলন' নামে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত ছিল এবং কলকাতায় প্রবাসী অসমিয়া ছাত্রদের উদ্যোগেই এটি গঠিত হয়েছিল। ১৯০১ সালে গুয়াহাটিতে কটন কলেজ এবং ১৯১২ সালে আর্ল ল' কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শক্তি সম্পর্কে আসামের অভ্যন্তরে ছাত্রদের নতুন চেতনা বিকশিত হতে শুরু করে। ১৯১৯ সালে তেজপুরে অমিয়কুমার দাশ (১৭.২ দ্রষ্টব্য), হেম বরুয়া (১৭.৭২ দ্রষ্টব্য), লক্ষ্মীধর শর্মা প্রভৃতি ছাত্র-নেতাদের উদ্যোগে আয়োজিত 'আসাম ছাত্র সন্মিলন'-এর চতুর্থ বার্ষিক সভার সভাপতি বাংলার বরেণ্য বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর উদ্দীপক ভাষণে ছাত্র-সমাজ দারুণভাবে উদ্দীপ্ত হয়। ১৯২০ সালের অক্টোবরে ঐ সংগঠনের গোলাঘাটে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বাৎসরিক সম্মেলনের সভাপতি ভারততত্ত্ববিদ বি. আর. ভাণ্ডারকরও অসমিয়া ছাত্রদের কাছে 'স্বদেশি' চেতনা-বৃদ্ধির আবেদন জানান। গান্ধিজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে কলেজ ছাত্রদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের জন্য ২৫-২৬ ডিসেম্বর ১৯২০-তে নাগপুরে লালা লাজপৎ রাই-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত All India College Students' Conference-এ আসাম থেকে একটি বড়ো প্রতিনিধিদল চন্দ্রনাথ শর্মার নেতৃত্বে যোগ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, চন্দ্রনাথ শর্মা সেইসময় আইন ব্যবসায় ইতি টেনে ছাত্রদের জাতীয় আন্দোলনে শামিল করতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

নাগপুরে ছাত্র সম্মেলনের বার্তা কটন কলেজে প্রতিধ্বনিত হয়। চন্দ্রনাথ শর্মা, অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি, ত্রিগুণাচরণ বরুয়া, মহিবুদ্দিন আহমেদ অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচি 'স্বদেশি' ও 'বয়কট' সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রশ্নে ছাত্রদের আবেদন জানালে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। তরুণরাম ফুকন, কুলধর চালিহা, নবীনচন্দ্র বরদোলই হঠাৎ করে বিদেশি দ্রব্য ইত্যাদি 'বয়কট'-এর পক্ষপাতী ছিলেন না। অন্যদিকে বিষ্ণুরাম মেধি, রোহিণীকুমার চৌধুরি, কামাখ্যারাম বরুয়া প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ অবিলম্বে সবকিছু বিদেশি বর্জনের পক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন। **যেহেতু 'স্বদেশি' ছিল ইতিবাচক এবং 'বয়কট' নেতিবাচক**—এরই জন্য ছাত্রদের মতামত গ্রহণের প্রশ্নে ভোটাভুটির প্রয়োজন হয়েছিল। ভোটে 'বয়কট'-এর প্রস্তাবটি গৃহীত না হলেও ১৯২১ সালের জানুয়ারি থেকে কটন কলেজের ছাত্ররা আস্তে আস্তে 'বয়কট' আন্দোলনের সমর্থক হতে শুরু করেন। কেউ কেউ মনে করতেন। জাতীয় কলেজ স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের ব্রিটিশ প্রভাবাধীন কলেজ 'বয়কট' কর্মসূচি স্থগিত থাকা প্রয়োজন। যাইহোক, ১৯২১ সালের

জানুয়ারি থেকেই জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় তহবিল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। গোপীনাথ বরদোলই ২৫০ টাকা এবং চন্দ্রনাথ শর্মা তাঁর সমস্ত সম্পদ ঐ তহবিলে দান করে নতুন উৎসাহ সৃষ্টি করেন। **সমগ্র আসামে ১৯২১-২২ সালে মোট ৩৮টি জাতীয় স্কুল চালু হয়েছিল যার ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৯০৮ জন।** কটন কলেজের অধ্যক্ষ এই 'আত্মঘাতী' পথ অনুসরণ না করার জন্য ছাত্রদের আবেদন জানিয়েও ব্যর্থ হন। বয়কটকারী ছাত্রদের অবস্থানের জন্য 'আসাম ক্লাব' এবং উজানবাজারে মানিকচন্দ্র বরুয়ার গৃহ নির্ধারিত হয়েছিল। ১৯ জানুয়ারি ১৯২১-এ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছাত্র ধর্মঘট হয় এবং তিলকচন্দ্র শর্মার নেতৃত্বে তেজপুরের ছাত্ররা কটন কলেজের ছাত্রদের 'বয়কট' অভিযানে শামিল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে এগিয়ে আসেন। গান্ধিজির আসাম সফরের সময় দলে দলে আসামের ছাত্ররা বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন। **আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মূল প্রাণ ছিল ছাত্র-সমাজ। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে কটন কলেজসহ অন্যান্য কলেজ দীর্ঘ একমাস বন্ধ থাকে এবং ছাত্রদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ জারি করা হয়।** খিলাফৎ আন্দোলনের সূত্রে মুসলমান ছাত্ররাও Muslim Students Conference গঠন করেছিলেন এবং 'আসাম ছাত্র সম্মিলন'-এর সাথে যৌথভাবে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর উপর গুরুত্ব দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন।

২২.২.৫.৩.১ সুরমা উপত্যকায় ছাত্র সমাজ

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মতো সুরমা উপত্যকাতেও ছাত্র-সমাজের মননে অসহযোগ আন্দোলন গভীর রেখাপাত করেছিল। ১৯২১ সালের জানুয়ারিতে সিলেটের মুরারীচাঁদ কলেজ থেকে অনেক ছাত্র বেরিয়ে এসেছিলেন। সিলেট মাদ্রাসার অনেক ছাত্র পড়াশোনায় ইতি টেনে খিলাফৎ আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। সিলেট শহরের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৮ জন ছাত্র আর বিদ্যালয়ে ফিরে যাননি। একদিকে মহম্মদ আবদুল্লা, অন্যদিকে ক্ষিরোদচন্দ্র দেব একটার পর একটা বক্তৃতায় খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সিলেটের ১৫০ জন ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মতো সুরমা উপত্যকাতেও চারদিকে জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। বরাক উপত্যকাতেও একই চিত্র দেখা যায়।

২২.২.৫.৩.২ উপসংহার

এক কথায়, সমগ্র আসাম-জুড়ে ছাত্রসমাজের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক ও আদর্শ গভীর প্রভাব ফেললেও সেটি কিন্তু সর্বত্র দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিছুটা আবেগে আপ্লুত হয়ে যেমন দলে দলে ছাত্ররা সরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, তেমনি আবার কিছুদিনের মধ্যে অনেকেই ফিরেও গিয়েছিলেন। আসামের ১৯২০-২১ সালের *Administration Report*-এ তাই মন্তব্য করা হয়েছে, সরকারি স্কুল-কলেজ 'বয়কট'

> ***attained a certain measure of success in January, but the effect rapidly wore off and at most institutions the attendance was only temporarily affected.***

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দুটি কলেজের মাত্র ৩৮ জন ছাত্র ১৯২১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কলেজে অনুপস্থিত ছিলেন। সেই তুলনায় বরং স্কুল থেকে ব্যাপক সাড়া মিলেছিল। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারির শেষপর্যন্ত কামরূপ জেলার অর্ধেক ছাত্র সরকারি স্কুল বর্জন করেছিলেন। ঐ সময়ের শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ আব্দুল মাজিদ-এর তথ্য অনুযায়ী, অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে থাকার সময় আসামের সরকারি স্কুল ও কলেজে ৯ থেকে ১০ শতাংশ ছাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে Director of Public Instructions (DPI), **J. Cunningham একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছিলেন। আসামে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে স্কুল কলেজের যত ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রায় ১৫,০০০ আর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসেনি। এটি যদি প্রকৃত সংখ্যা হয়, তাহলে আসামে অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্র সমাজের অংশগ্রহণ যে ব্যাপক মাত্রায় হয়েছিল সেটি স্বীকার করতেই হবে।** অসহযোগ আন্দোলনের ময়দানে সৃষ্ট আসামের যেসব ছাত্র-নেতা পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায়ে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অমিয়কুমার দাশ, হেমচন্দ্র বরুয়া, কৃষ্ণনাথ শর্মা, ভুবনেশ্বর বরুয়া, রোহিণীকান্ত হাতিবরুয়া, কনকচন্দ্র শর্মা প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আসামের ছাত্র সমাজের এই উজ্জ্বল ঐতিহ্য স্বাধীনোত্তর কালে নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হতে শুরু করে এবং নানা কারণে 'বৃহৎ' ভারতীয় জাতীয়তাবাদ থেকে 'ক্ষুদ্র' অসমিয়া জাতীয়তাবাদে অবতরণের অধ্যায় শুরু হয়। 'আসাম ছাত্র সম্মিলন'-এর উত্তরসূরি হিসাবে স্বাধীনোত্তর পর্বে "All

Assam Students' Union" বা AASU'র জন্ম হয়। ১৯৬০ এবং ১৯৭২ সালে AASU'র নেতৃত্বে অসমিয়া ভাষার অধিকারকে কেন্দ্র করে তুমুল আন্দোলন ও দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত 'বিদেশি বিতাড়ন'-এর নামে ছাত্র আন্দোলনের ফলে আসামে চরম অরাজকতার অধ্যায় শুরু হয়। ১৯৮৫ সালে আসাম চুক্তি সম্পাদনের পর AASU'র নেতৃত্ব 'Asom Gana Parishad' বা AGP নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। দুবার (১৯৮৫-১৯৮৯ এবং ১৯৯৬-২০০১) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও যে উদ্দেশ্যে একদিন AASU যাত্রা শুরু করেছিল সেই তথাকথিত 'বিদেশি অনুপ্রবেশ'-এর প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থাকে এবং সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়। ছাত্র-শক্তি অভিনব ভঙ্গিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেও আসামের দুর্দশা মেটাতে কোনোভাবে উদ্যোগ গ্রহণ না করার ফলে ক্রমশ জনসমর্থন হারাতে থাকে।)

২২.২.৫.৪ অসহযোগ আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা

অবিভক্ত বঙ্গে যেমন ১৯২০-২২-এর অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী বাসন্তী দেবী এবং ভগিনী ঊর্মিলা দেবী অথবা জে. এম. সেনগুপ্ত'র স্ত্রী নেলি সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে মোহিনী দেবী, লাবণ্য প্রভা চন্দ প্রভৃতি অভিজাত মহিলারা খদ্দরের কাপড় পরিধান করে পথে নেমেছিলেন, আসামেও সেই একই দৃশ্য দেখা যায়। **গান্ধিজির ডাকে এই প্রথম আসামের মহিলারা দলবদ্ধভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে নামলেন।** চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানি, রাজাবালা দাস, হেমপ্রভা দাস, বিজুতি ফুকন, বিদ্যুৎপ্রভা দেবী, নলিনীবালা দেবী, সুন্দরী কাকতি, রত্নেশ্বরী ফুকনানি, খগেন্দ্রপ্রিয়া বরুয়া, স্বর্ণলতা বরুয়া, দুর্গাপ্রভা বোরা প্রভৃতি এক ঝাঁক মহিলা অসহযোগ আন্দোলনের শরিক হলেন। আসামের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি ছিল অভূতপূর্ব দৃশ্য! **১৯২৬ সালে আসামে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় 'অসম মহিলা সমিতি' গঠিত হয় এবং পাণ্ডু/গুয়াহাটি অধিবেশনে মহিলারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।** শুধু যে সম্পন্ন ঘরের লাজুক মহিলারা আন্দোলনের শরিক হয়ে সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তা নয়, অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের মহিলারাও সাথী হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালের ১৫ জুন বড়বাড়ি চা বাগানের ১৫০ জন মহিলা শ্রমিক ডিব্রুগড় পর্যন্ত মিছিল করে এসে তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রশ্নটি জেলা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনতে সাহস দেখিয়েছিলেন, যেটি অসহযোগ আন্দোলন পর্বের আগে কল্পনাও করা যেত না। **আসলে, ভয়মুক্ত চেতনা সৃষ্টি করাই ছিল গান্ধি-আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো অবদান।** শিবসাগর জেলার ডেপুটি কমিশনার ঐ সময় মন্তব্য

করেছিলেন "...had there been no agitation, the *Coolies* might have been a little slower to disclose their grievances."

২২.২.৫.৫ আন্দোলন প্রত্যাহার ও তারপর

এইভাবে ১৯২০ সালের শেষার্ধ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো আসামেও উত্তাল হয়ে উঠেছিল। **বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ, শ্রেণি নির্বিশেষে এত বড়োমাপের আন্দোলন আসামে এর আগে আর হয়নি। শুধু আসাম নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে এটিই ছিল প্রথম জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান।** সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে গান্ধি-আন্দোলনের আবেদন (**"multi-class appeal"**) ছিল সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় দিক। 'স্বরাজ'-এর লক্ষ্যের দিকে যখন সমগ্র দেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় বর্তমান উত্তরপ্রদেশের চৌরি-চৌরায় ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ সালে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। থানার সামনে দিয়ে প্রায় ৩,০০০ আন্দোলনকারী যখন মিছিল নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। থানায় অগ্নিসংযোগ সহ ২৫ জন পুলিশ ও ১ জন দারোগার মৃত্যু এত বড়ো সর্বভারতীয় আন্দোলনের গতিপথকে রুদ্ধ করে দেয়। ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তটি অনুমোদন করে। জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি ব্যক্তিরা প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্তে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আসামেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। সেই সময় পুরীতে বিশ্রামরত অসুস্থ গান্ধিবাদী আসামের চন্দ্রনাথ শর্মা তাঁর চরম হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। ভগ্নহৃদয় চন্দ্রনাথ শর্মা ২০ জুলাই ১৯২২ সালে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে প্রয়াত হন। **যে উদ্দেশ্য নিয়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার সবগুলিই অসমাপ্ত ও অধরা রয়ে গেল।** তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ কামাল পাশা'র অভ্যুত্থানের পর খিলাফৎ-এর গুরুত্ব এমনিতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার হল না। 'এক বছরে স্বরাজ'-এর ধ্বনি ও প্রতিশ্রুতি অর্থহীন ব্যঙ্গে পরিণত হল। হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর মন্ত্রও ক্রমশ ফ্যাকাশে হতে শুরু করল, কারণ ১৯২৩ সাল থেকে 'তানজিম' ও 'তব্‌লিগ্' আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিমদের স্বতন্ত্র সম্প্রদায়গত ধ্বনি এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আসামসহ অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ল। মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ কাউন্সিলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ১৯২৩ সালে 'স্বরাজ্য পার্টি' (যদিও জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকেই) গঠন করলেন ; ফলে কাউন্সিল বয়কটের ধ্বনিও অর্থহীন হয়ে গেল।

২২.২.৫.৬ সরকারি নিপীড়ন ও অত্যাচার

দেশের অন্যান্য অংশের মতো আসামেও ব্রিটিশ সরকার এইরকম একটি অবস্থার প্রতীক্ষাতে দিন গুনছিল। গান্ধিজিকে যেমন ৬ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল, আসামেও তেমনি তরুণরাম ফুকন, নবীনচন্দ্র বরদোলই থেকে শুরু করে নেতৃস্থানীয় সকলকেই গ্রেফতার করা হল। এই অন্যায় আটকের বিরুদ্ধে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হলে ANVP, Khilafat Volunteer Corps, 'শান্তি সেনা', 'সেবক সম্প্রদায়' ইত্যাদিকে বেআইনি ঘোষণা করা হল, Prevention of Seditious Meeting Act জারি করে ঐ জাতীয় সভাসমিতি নিষিদ্ধ করা হল। এছাড়া সমস্ত ধরনের প্রতিবাদের কণ্ঠকে রুদ্ধ করার লক্ষ্যে Criminal Law Amendment Act, Press Act, Police Act ইত্যাদি নতুন করে চালু করা হল। ডিব্রুগড়ের সাপ্তাহিক পত্রিকা *অসমিয়াকে* নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মানহানির মামলা দায়ের করা হল। আসামের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেস অফিস ভেঙে দেওয়া হল এবং সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ঐ সময়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে ৪৯৭ জন আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে যেমন সন্ত্রাসের রাজত্ব সমগ্র দেশে কায়েম করা হয়েছিল ; ১৯২০-২২-এর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর একই অবস্থা আবার ফিরে এল।** বেসরকারি একটি হিসাব অনুযায়ী, ২২ জন আইনজীবী সহ মোট ৯৯৬ জনকে ২৪ নভেম্বর ১৯২১ থেকে ৩০ মার্চ ১৯২২ পর্যন্ত অর্থাৎ মাত্র তিন মাসে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। বেশিরভাগ স্বাধীনতা সংগ্রামীকে Criminal Law Ammendment Act অনুযায়ী গ্রেফতার করা হয়েছিল। অন্যদিকে Assam Congress Opium Enquiry Report অনুযায়ী, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বন্দি আন্দোলনকারীর সংখ্যা ছিল ১,১০০ জন। আবার K. N. Dutt-এর হিসাব অনুযায়ী, অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের 'অপরাধে' সমগ্র আসামে ৪,০০০ বেশি মানুষকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। **এক কথায়, আসামে প্রকৃত বন্দির সংখ্যা আজও অজানা রয়ে গেছে।** মোটকথা, আসামের সমস্ত কারাগারে রাজনৈতিক বন্দিদের সংখ্যা এত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল যে স্থান-সংকুলানকে কেন্দ্র করে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল এবং **আসাম একটি জেলখানায় পরিণত হয়েছিল।**

১৯২২ থেকে সমস্ত রকম আন্দোলন নির্মমভাবে দমন করার জন্য আধা-সামরিক বাহিনী Assam Rifles-কে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হত। আন্দোলনের সময় যেসব এলাকা থেকে রাজস্ব কম আদায় হয়েছিল—যেমন, ঝান্‌জি, বোকো,

বরনগর, পাথারুঘাট ইত্যাদি—সেখান থেকে আবার নির্দয়ভাবে রাজস্ব আদায় চালু হল এবং কৃষককে অনিবার্য ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হল। চা-বাগান এলাকায় ইউরোপীয় মালিকদের স্বৈরাচার আবার নতুন করে ফিলে এল।

২২.২.৫.৭ সুরমা উপত্যকায় নিপীড়ন

সুরমা উপত্যকাতেও একই ধরনের নিপীড়নের অধ্যায় আবার চালু হল। কংগ্রেস ও খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবীদের কারাগারে স্থানান্তরিত করা হল, আন্দোলনকারীদের অফিসগুলি সিল করে দেওয়া হল এবং গুরুত্বপূর্ণ দলিল ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হল। সিলেটের কানাইয়ারঘাট এলাকায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ সালে ছোটোখাটো জালিয়ানওয়ালাবাগ অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছিল। স্থানীয় একটি মাদ্রাসার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সমবেত শান্তিপূর্ণ জনতার উপর কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ পুলিশের গুলি চলে এবং ঐ স্থানেই ৬ জনের মৃত্যু এবং ৩৬ জন গুরুতরভাবে আহত হন। এছাড়াও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মতো সিলেট জেলা এবং করিমগঞ্জ মহকুমায় ব্রিটিশ পুলিশের নানারকম জুলুম অব্যাহত থাকে। Press Act প্রয়োগ করে সিলেটের *জনশক্তি* কিংবা শিলচরের *সুরমা* পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়। আসামের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী অমিয়কুমার দাশ ব্রিটিশ পুলিশের বর্বর অত্যাচারের কাহিনি ১৯২২ সালের মার্চ মাসে এ.আই.সি.সি.'র গোচরে আনার পর মে মাসে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মদনমোহল মালব্য সরেজমিন তদন্তে আসামে আসেন।

২২.২.৫.৮ বিপ্লববাদের দিকে

অসহযোগ আন্দোলনের আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থতা কিছু ক্ষেত্রে হতাশার জন্ম দেয় এবং গান্ধিবাদী অহিংস পথ সম্পর্কে যুব মনে বেশ কিছু প্রশ্ন সৃষ্টি করে। **যে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ এতদিন আসামে প্রায় অনুপস্থিত ছিল সেটি সম্পর্কে কিছু আকর্ষণও সৃষ্টি হয়।** বাংলার 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' গোষ্ঠী কিংবা ঢাকার 'শ্রীসংঘ'-এর শাখাও আসামে বিস্তৃত হয়। ধুবরিতে 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি'র পক্ষ থেকে কয়েকটি ঘটনা ঘটে। নওগাঁও-তেও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর ঘটনা ঘটতে শুরু করে। ডিব্রুগড়ের 'প্রভাত-সমিতি' বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের মুখপত্র হয়। কামরূপ জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদকে মদত দেওয়া শুরু হয়। **এতসব সত্ত্বেও বিপ্লবী কাজকর্ম বাংলার মতো আসামে তেমন শিকড় বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। ১৯২৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের গুয়াহাটি/পাণ্ডু অধিবেশনের মাধ্যমে গান্ধিবাদকে নতুনভাবে মহিমান্বিত করার উদ্যোগ লক্ষ করা যায়।**

২২.৩ আসামে আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience Movement in Assam)

২২.৩.১ 'সিভিল ডিস্‌ওবিডেন্স'

জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্ব ছিল নরমপন্থীদের নেতৃত্বাধীন (Moderate Phase), দ্বিতীয় পর্বে ছিল চরমপন্থীদের প্রাধান্য (Extremist Phase) এবং তৃতীয় পর্বে মহাত্মা গান্ধি ছিলেন অবিসংবাদী নেতা (Gandhi leadership)। ১৯২০-২২-এ গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের (Non-cooperation Movement) পর রাজনৈতিক পরিমণ্ডল কিছুদিন শান্ত থাকলেও ১৯৩০-এর দশকে আইন অমান্য আন্দোলনকে (Civil Disobedience Movement) কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনীতি আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। মার্কিন চিন্তাবিদ্ থোরো (Henry David Thoreau, 1817-1862) ১৮৪৯ সালে *Civil Disobedience* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে সমগ্র পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেচিলেন। থোরো'র বক্তব্য ছিল ঃ অতি-শাসন বা অত্যাচার নয়, যে সরকার খুব কম শাসন করে, সেটাই শ্রেষ্ঠ সরকার ("That government is best which governs not at all")। এই বক্তব্য অনুযায়ী, অত্যাচারী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার (কিছুটা রুশোর দর্শনের মতো)। থোরোর এই অভিমতের বিরুদ্ধে কিছু সমালোচনা থাকলেও, লিও তলস্তয় থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধি, মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র) প্রভৃতি অনেকেই গভীরভাবে এই দর্শনে প্রভাবিত হয়েছিলেন। **১৯৩০-এর দশকে ভারতবর্ষে গান্ধিজির নেতৃত্বে Civil Disobedience movement থোরোর দর্শনেরই প্রতিফলন।**

২২.৩.২ দুটি পর্ব

আইন অমান্য আন্দোলন দুটি স্পষ্ট পর্বে বিভক্ত ঃ (১) ১৯৩০-১৯৩১, (২) ১৯৩২-১৯৩৪ সাল। এই আন্দোলনের প্রথম পর্বে ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড আরউইন (১৯২৬-৩১) এবং দ্বিতীয় পর্বে লর্ড উইলিংডন (১৯৩১-৩৬)। প্রথমজনের সাথে গান্ধির সম্পর্ক মধুর ছিল, কিন্তু দ্বিতীয়জনের সাথে ছিল তিক্ত। গান্ধি ও ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কও অনেক সময় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করত। দুটি পর্যায়ের এই আইন অমান্য আন্দোলন শেষপর্যন্ত স্থগিত রাখতে গান্ধিজি বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে, **অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-২২) মতো আইন অমান্য আন্দোলনও (১৯৩০-৩১, ১৯৩২-৩৪) একটি অসমাপ্ত**

আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলন যদি 'নিষ্ক্রিয় সত্যাগ্রহ' হয়, তাহলে আইন অমান্য আন্দোলন ছিল 'সক্রিয়' এবং কিছুটা বৈপ্লবিক। ব্রিটিশ সরকারের জনবিরোধী নির্যাতনমূলক আইনের বিরোধিতা করে সরকারকে পুরোপুরি অকেজো করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং জনগণের স্বাধীনতালাভের স্পৃহাকে দুর্বার করে তুলেছিল। এটিই ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব।

২২.৩.৩ প্রেক্ষাপট

যে পটভূমিতে আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল সেটি ছিল এইরকম ঃ

১. যদিও বিশ্বব্যাপী **অর্থনৈতিক মহামন্দা** বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে শুরু হয়েছিল, তথাপি ১৯২৯ সাল থেকে এর ভয়াবহ প্রভাব জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। কৃষিভিত্তিক ভারতে কৃষিপণ্যের দাম মারাত্মকভাবে নিম্নমুখী হওয়ার ফলে কৃষকের মাথায় হাত পড়ে। অভাবী কৃষকের পক্ষে ভূমি রাজস্ব বা খাজনা নির্দিষ্ট সময়ে জমা দিতে না পারার ফলে বিভিন্ন স্থানে জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। মহামন্দার প্রেক্ষিতে কৃষকের এই দুর্গতি জাতীয় নেতৃত্বকে চিন্তিত করে তোলে।

২২.৩.৩.১ আসামে 'সাইমন কমিশন'

২. যেহেতু ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার বা Government of India Act, 1919-এর দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা ভারতীয়দের খুশি করতে পারেনি, এরই জন্য ঐ সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, দশ বছর পরে (ঐ সংস্কার আইনের কার্যকারিতার ভিত্তিতে এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের পর) একটি কমিশন ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রশ্নটি পুনর্বার বিবেচনা করবে। ১৯২৯-র নির্বাচনে ব্রিটেনের টোরি দল বা 'কনজারভেটিভ পার্টি'র সরকারের ক্ষমতা হারানোর ভয় ছিল। 'লেবার পার্টি'র কাছে ক্ষমতা হারানোর আগে তড়িঘড়ি ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে স্যার জন সাইমন-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাতজন সদস্য নিয়ে টোরি দল ভারতবর্ষের জন্য একটি কমিশন গঠন করে, যেটি **সাইমন কমিশন** নামে পরিচিত। কিন্তু যেহেতু ঐ কমিশনে একজনও ভারতীয় সদস্য ছিল না, এরই জন্য জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'সাইমন কমিশন'কে বয়কটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯২৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি 'সাইমন কমিশন' ভারত সফরে এলে সমগ্র দেশ জুড়ে হরতাল পালিত হয় এবং চারিদিকে 'Go Back Simon' ধ্বনি ওঠে।

'সাইমন কমিশন' ভারতে আসার পর আসামে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। যদিও ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮-এ ডিব্রুগড় শহর হরতালের ফলে সম্পূর্ণ অচল হয়ে গিয়েছিল, ধুবরি ও শিবসাগরে ছাত্ররা স্কুল বয়কট করেছিল, গুয়াহাটিতে স্থানীয় বোর্ড ও পৌরসভা বন্ধ ছিল, সুরমা উপত্যকাতেও হরতাল পালিত হয়েছিল, তথাপি মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা অংশ 'সাইমন কমিশন' বয়কটের পক্ষপাতী ছিলেন না। যদিও সুরমা উপত্যকায় সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল এবং স্বরাজ্য দলের সমর্থকরা এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তরুণরাম ফুকন থেকে শুরু করে 'গোয়ালপাড়া ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি সংগঠন 'সাইমন কমিশন' বয়কটের প্রশ্নে তীব্র জনমত গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তথাপি দুই উপত্যকার মুসলিম নেতৃত্ব বিশেষত আব্দুল মতিন চৌধুরি, মহম্মদ তায়েবুল্লা প্রভৃতি নেতারা ভিন্ন মত পোষণ করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জাতীয় কংগ্রেসের মতো সর্বভারতীয় মুসলিম লিগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ কিন্তু 'সাইমন কমিশন' বয়কটের পক্ষপাতী ছিলেন। **সাইমন কমিশন-এ প্রস্তাব ও সাক্ষ্য দানের প্রশ্নে আসামে হিন্দু-মুসলিম ভেদরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল।** চা-বাগানের মালিক অসমিয়া মুসলিম নেতা সইদুর রহমান মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং কাউন্সিলকে (৩ এপ্রিল ১৯২৮) স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন ঃ *It is the sincerest desire of our community at the present moment, despite what hon. members like Mr. Jinnah may say, that this separate electorate is absolutely vital to our existence.* এই উদ্দেশ্যেই আসামের মুসলিমরা 'সাইমন কমিশন'-এর সাথে সহযোগিতা চেয়েছিলেন। ফলে, **অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২)-এর সময় যে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী গড়ে উঠেছিল, আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩১)-এর পূর্বলগ্নে সেটির অনুপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র আন্দোলনকে দুর্বল করে দিয়েছিল।** কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ-শাসিত আসাম সরকারের উদ্যোগে ঐ প্রদেশের কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, 'সাইমন কমিশন'কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সাত সদস্যের একটি কমিটি ৯ এপ্রিল ১৯২৮ সালে গঠিত হল। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন W. D. Smiles এবং অন্যান্য সদস্যদের নাম যথাক্রমে অর্জন আলি মজুমদার, কেরামত আলি, মুনাওয়ার আলি, সদানন্দ দোয়েরা, মুকুন্দনারায়ণ বরুয়া এবং অমরনাথ রায়। নামগুলি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, আসামে মুসলিম ছাড়াও অ-মুসলিমদের একটা অংশ 'সাইমন কমিশন'-এর সাথে সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন।

শ্বেতাঙ্গদের 'সাইমন কমিশন' আসামের রাজধানী শিলং-এ ২ জানুয়ারি ১৯২৯ সালে সফর যখন শুরু করে সেই সময় জাতীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ শিলং-এ অনুপস্থিত ছিলেন। ১৯২৮ সালে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ৪৩তম অধিবেশনে আসামের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের পক্ষে দ্রুত শিলং ফিরে এসে 'সাইমন কমিশন'-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠিত করা কিছুটা কঠিন ছিল। ফলে 'সাইমন কমিশন'-এর সদস্যদের পক্ষে নির্বিঘ্নে আসামের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা ইত্যাদি সম্ভব হয়েছিল। **শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, জাত ইত্যাদির নিরিখে মোট ২৭টি সংগঠন আসামের কাউন্সিলে তাদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণ সহ নানা দাবিতে 'কমিশন'-এর কাছে প্রতিবেদন পেশ করেছিল।** মুসলমানদের নানা সংগঠন ছাড়াও 'টি অ্যাসোসিয়েশন্স' 'ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন', গোয়ালপাড়া জমিদার অ্যাসোসিয়েশন', 'সুরমা ভ্যালি যোগী সম্মিলনী', বোড়ো, খাসি, জয়ন্তিয়া, কাছারি, নাগা প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতিদের সংগঠন, আহোম ও মাড়োয়ারিদের সংগঠন, 'মাহিষ্য সমিতি', 'প্রাগজ্যোতিষপুর ব্রাহ্মণ সমাজ', 'গোয়ালপাড়া প্রান্তিক-ক্ষত্রিয় সমিতি', 'সনাতন ধর্মসভা' ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন স্তরের সংগঠন 'সাইমন কমিশন'-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে **আসামের সমাজ আড়াআড়ি ও খাড়াখাড়িভাবে কত বিভক্ত সেটি প্রমাণ করে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষের এই অনৈক্যের সুযোগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পুরোপুরি নিজের স্বার্থে ব্যবহারের ত্রুটি রাখেনি।** সেইসময় আসামে সরকার যে গোপন রিপোর্ট 'সাইমন কমিশন'কে পাঠিয়েছিল সেটি ফাঁস করে *Amrita Bazar Patrika*-তে মন্তব্য করা হয়েছিল ঃ "the constitution evolved by the Assam Government is admirably united **to keep up the antagonism** between the forces of nationalism and communalism"। ২ থেকে ১০ জানুয়ারি ১৯২৯-এ **আসাম সফরের পর 'সাইমন কমিশন' ১১ জানুয়ারি প্রস্থানের সাথে সাথে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আসামে নতুন শক্তি অর্জন করল। সিলেট ও কাছাড়কে আসাম থেকে আলাদা করে বঙ্গের সাথে যুক্ত করার যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেটির তীব্র বিরোধিতায় শাদুল্লাহ'র নেতৃত্বে আসামের মুসলিম নেতৃবৃন্দ এগিয়ে এলেন।** শাদুল্লাহদের যুক্তি ছিল, যতদিন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সিলেট আসামে থাকবে (সেই সময় সিলেট ও কাছাড়ের জন্য আসামের এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা ইসলাম ধর্মভুক্ত ছিলেন), ততদিন সংখ্যালঘু রাজনীতির মাধ্যমে আসামে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায়

রাখা সম্ভব হবে, কিন্তু সিলেটকে বঙ্গদেশের সাথে যুক্ত করলে সেই সুযোগ থাকবে না। এরই জন্য ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্বলগ্নে অবিভক্ত আসামের ধ্বনি মুসলিম নেতৃবৃন্দ তুলেছিলেন এবং সমকালীন কাউন্সিলে এইরকম নানা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তীব্র মতভেদ শুরু হয়েছিল। **এইভাবে 'সাইমন কমিশন' ভারতের অন্যত্র বয়কট করা হলেও আসামে কিন্তু ভিন্ন চিত্র দেখা যায়।**

২২.৩.৩.২ নেহরু রিপোর্ট

৩. জাতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ভারতীয় সংবিধানের খসড়া রচনার জন্য একটি সর্বদলীয় কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী মতিলাল নেহরু (১৮৬১-১৯৩১)-কে মনোনীত করা হয়। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে এই কমিশনের রিপোর্ট সকলের সামনে পেশ করা হয়। এটিই 'নেহরু সংবিধান' বা 'নেহরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত। গান্ধিজির ইচ্ছা অনুযায়ী, ঐ রিপোর্টে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র স্থলে ভারতে অবিলম্বে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' বা অধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চাওয়া হয়েছিল। জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ জাতীয় কংগ্রেসের তরুণ নেতৃত্ব 'পূর্ণ স্বাধীনতা' ছাড়া অন্য কিছু মানতে নারাজ হলেও শেষপর্যন্ত গান্ধিজির ইচ্ছা মেনে নিতে কিছুটা বাধ্য হয়েছিলেন। যাইহোক, অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এর দাবিটি এবং 'নেহরু রিপোর্ট'-এর ধারা মেনে না নিলে দেশজোড়া আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে। ভাইসরয় আরউইন এই ব্যাপারে আশ্বাস দিলেও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদর্থক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার ফলেই আইন অমান্য আন্দোলন অনিবার্য হয়ে উঠল। আসলে, আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমি বল্লভভাই প্যাটেল ১৯২৮ সালে জমির খাজনা না দেবার জন্য কৃষকদের নিয়ে গুজরাটের বরদৌলিতে শান্তিপূর্ণ এবং মোটামুটি সফল সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তৈরি করে দিয়েছিলেন। গুজরাটের জনগণ বল্লভভাই-এর সাহস ও সেবায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'সর্দার' বা সেনাপতি উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং সেদিন থেকেই তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নামে পরিচিত।

২২.৩.৩.৩ পূর্ণ স্বরাজ

৪. ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে সম্ভব না হলেও, **১৯২৯-এর ডিসেম্বরে জওহরলাল নেহরু-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লাহোর কংগ্রেসে 'পূর্ণ স্বরাজ' বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে দেশের অন্যান্য অংশে**

যেমন তুমুল উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল, আসামে কিন্তু মিশ্র প্রতিক্রিয়া (যেমনটি 'সাইমন কমিশন'-এর ক্ষেত্রে হয়েছিল) লক্ষ করা যায়। আসামে কংগ্রেস নেতৃত্বের লাহোর কংগ্রেসের প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে দ্বিমত স্পষ্ট হয়ে উঠল। লাহোর কংগ্রেসে প্রতিটি ভারতীয় সদস্যকে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভা বা কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ এবং ভবিষ্যতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার আহ্বান রাখা হয়েছিল। এছাড়া ১৯৩০ থেকে শুরু করে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি সমগ্র দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের আহ্বানও ছিল। অবিলম্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার দায়িত্ব এ.আই.সি.সি.-র কাছে অর্পণ করা হয় এবং এ.আই.সি.সি. সেটি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০-এ গান্ধিজির হাতে সমর্পণ করে। **আসাম থেকে যে আটজন লাহোর কংগ্রেসে অংশ নিয়েছিলেন** তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় তিনজন (তরুণরাম ফুকন, গোপীনাথ বরদোলই এবং রোহিণীকুমার চৌধুরি) আসামে ফিরে এসে দুটি পৃথক প্রেস-বিজ্ঞপ্তিতে কাউন্সিল বয়কটের ক্ষেত্রে লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন, কারণ তাঁদের কাছে এটি 'অর্থহীন' সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়েছিল। প্রসঙ্গত, তরুণরাম ফুকন সেইসময় ছিলেন 'আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি'র সভাপতি, সুতরাং তাঁর এই বক্তব্যে জনমনে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে সুরমা উপত্যকায় সিলেট জেলা কংগ্রেস এতদিন বাংলার প্রদেশ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও নানা কারণে উভয় কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি (১৮৮২-১৯৭২), শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস (১৮৭১-১৯৪৬) প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস কর্মীরা 'কংগ্রেস লিগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল তৈরি করেন, যদিও সেটি জাতীয় কংগ্রেসের অনুমতি পায়নি (১৯৭৪ সালে শিলচর থেকে প্রকাশিত নীরদকুমার গুপ্তর *স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি* গ্রন্থে সিলেটে কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে 'আইন অমান্য আন্দোলন'-এর পূর্বলগ্নে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী চিন্তার শরিকদের দ্বন্দ্ব ইত্যাদির উল্লেখ আছে)। সিলেটে কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯)-এর সবকটি সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ পুরোপুরি বাস্তবায়িত করার প্রশ্নে কিন্তু সকলে একমত ছিলেন। **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সাথে সুরমা উপত্যকার এখানেই তফাত।**

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা কাউন্সিল বয়কটের প্রশ্নে মতদ্বৈধতা থাকলেও ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি (এবং প্রতি বছর একইদিনে) 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপনের প্রশ্নে কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃত্বের মধ্যে মতভেদ ছিল না। গুয়াহাটিতে জেলা কংগ্রেস কমিটি এবং স্থানীয় 'যুব সংঘ'র যৌথ উদ্যোগে জুবিলি উদ্যানে অনুষ্ঠানটির

আয়োজন করা হয়েছিল। নানা সরকারি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তরুণরাম ফুকন নির্দিষ্ট সময়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে জাতীয় তেরঙা পতাকা উত্তোলন করলেন। অনুষ্ঠানটি 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের মাধ্যমে সমাপ্ত হল। 'কটন কলেজ'-এর অধ্যক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ঐ কলেজের ছাত্ররা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর গুয়াহাটি শহরে একটি মিছিলেও শরিক হলেন। সিলেটে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি পতাকা উত্তোলন করলেন। শিলচরেও সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিভিন্ন অফিসে জাতীয় পতাকা উড্ডীন ছিল। এককথায়, **দুই উপত্যকার সর্বত্র পরাধীন ভারতে উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপন আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল**। কিন্তু এই প্রেক্ষাপট তৈরি সত্ত্বেও কাউন্সিল বয়কট প্রশ্নে মতভেদ এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে, তরুণরাম ফুকন লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় আইনসভা থেকে পদত্যাগ করলেও শেষপর্যন্ত কংগ্রেস থেকেই পদত্যাগ করে বাংলার চিত্তরঞ্জন দাশ-এর মতো ১৯৩০-এর ৯ ফেব্রুয়ারি 'আসাম স্বরাজ্য পার্টি' গঠন করলেন এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় পুনর্নির্বাচিত হলেন। গোপীনাথ বরদোলই 'গুয়াহাটি জেলা কংগ্রেস কমিটি'র সভাপতি পদ থেকে এবং জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন। রোহিণীকুমার চৌধুরিও একই পথ অনুসরণ করলেন। **আসামে কংগ্রেসের এই তিন শীর্ষ নেতা 'আইন অমান্য আন্দোলন'-এর পূর্ব মুহূর্তে দল থেকে ইস্তফা দেওয়ায় কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই হতাশা নেমে এসেছিল। ফুকন-বরদোলই-চৌধুরি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, আসাম 'আইন অমান্য আন্দোলন'-এর জন্য মোটেই প্রস্তুত নয়।** কুলধর চালিহা কিংবা নবীনচন্দ্র বরদোলই-এর মতো ব্যক্তিরাও একই চিন্তার শরিক ছিলেন। ১৯২০-২২-এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা আসামে দেখা গিয়েছিল, ১৯৩০-এর 'আইন অমান্য আন্দোলন'-এর পূর্ব মুহূর্তে সেটির অভাব পরিলক্ষিত হল। **সেই সময়ে আসামে কংগ্রেস দল ছিল 'মাথা ছাড়া একটি দেহ'** ("what survived of the Congress in Assam now was a body without a head, and that too on the eve of the Civil Disobedience movement")।

২২.৩.৪ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব

১৯৩০-এর দশকে ভারতীয়দের গড়ে দৈনিক আয় ছিল মাত্র সাত পয়সা। এই সামান্য আয়ের অনেকটা ভূমি রাজস্ব ও লবণ কর দিয়ে গরিব মানুষ প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। গ্রামীণ কুটিরশিল্পগুলি প্রায় ধ্বংস হওয়ায় বছরে কমপক্ষে চারমাস

সাধারণ মানুষকে প্রায় কর্মহীন অবস্থায় দিন কাটাতে হত। এই অবর্ণনীয় দুরবস্থা ও ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যেই গান্ধিজি আইন অমান্যের ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের ৩১ জানুয়ারি যে **১১ দফা দাবি সনদ** সামনে রেখে ভাইসরয় আরউইন-এর কাছে গান্ধিজি চরমপত্র পেশ করেছিলেন তার মধ্যে একদিকে যেমন লবণ কর প্রত্যাহার, ৫০ শতাংশ ভূমি-রাজস্ব হ্রাস, চিরাচরিত কুটিরশিল্প রক্ষা ইত্যাদি অগণিত গ্রামীণ মানুষের দাবি ছিল, তেমনি আবার সমাজের অন্য অংশের দাবি অন্তর্ভুক্ত করতে গান্ধিজি ভোলেন নি—যেমন, পাউন্ড-স্টার্লিং-এর সাথে টাকার বিনিময় হার হ্রাস, সামরিক ক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দের বাজেট ৫০ শতাংশ কমানো, উপকূলবর্তী অঞ্চলে জাহাজ-ব্যবসা ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষণ, ভারতীয় বস্ত্রশিল্প রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, রাজনৈতিক বন্দি-মুক্তি, রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে ছাঁটাই সরকারি কর্মচারীদের পুনর্বহাল, বিদেশি বা মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং বা আন্দোলনকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য না করা ইত্যাদি। **এটি লক্ষণীয় যে, এইসব দাবি-সনদের মধ্যে লাহোর কংগ্রেসে (১৯২৯) ঘোষিত 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর ধ্বনিটি কিন্তু অনুপস্থিত ছিল**। জওহরলাল নেহরু জমিদার-বিরোধী কর্মসূচি এবং খাজনা-বয়কটের প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে গান্ধিজি সেটিতেও বাধা দেন। লবণ কর প্রত্যাহারের প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কারণ এটি সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থকে ঘা দিত এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। এরই জন্য মন্তব্য করা হয় ঃ "The issue of salt cut across class, caste, regional and ethnic distinctions and Gandhi could unite the entire country bound by a single cause"। ১৮৩৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লিভারপুল থেকে লবণ আমদানি শুরু করার পর থেকে লবণ ব্যবসার উপর একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। ১৮৫৮ সালে কোম্পানির হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেলেও ব্যবস্থাটি অপরিবর্তিত থাকে এবং ভারতীয়রা লবণ প্রস্তুত করলে ব্রিটিশ সরকারকে বিশেষ কর দিতে বাধ্য হতেন। ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ ভারতে আদায়ীকৃত রাজস্বের ১০ শতাংশ আসত লবণ থেকে। ১৮৮০ সালে লবণ থেকে ব্রিটিশ সরকারের আয় হয়েছিল ৭ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৯২৩ সালে ভাইসরয় লর্ড রিডিং-এর আমলে লবণ করের মাত্রা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এইসব নানা কারণে গান্ধিজি লবণের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং সমাজের নানা শ্রেণি থেকে সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে ১১ দফা দাবি সনদ সত্ত্বেও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম

পর্বটি 'লবণ সত্যাগ্রহ' আন্দোলন নামে পরিচিত। গান্ধিজি প্রেরিত ১১ দফা দাবি সনদকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করলে আন্দোলন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

২২.৩.৪.১ আসামে ডান্ডি অভিযানের প্রভাব

ঐতিহাসিক ১২ মার্চ ১৯৩০-এ গুজরাটের আমেদাবাদ শহর থেকে কিছুটা দূরে সবরমতী নদীর ধারে গড়ে-ওঠা গান্ধি-আশ্রম (যেটি 'হরিজন আশ্রম' বা 'সত্যাগ্রহ আশ্রম' নামে পরিচিত এবং স্বাধীনোত্তর পর্বে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত) থেকে মাত্র ৭৯ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে ২৪১ মাইল দূরে আরব সাগরের তীরে ডান্ডি অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা শুরু করলেন। পথিমধ্যে অগণিত মানুষের সমর্থন-পুষ্ট হয়ে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহের মাধ্যমে ব্রিটিশের লবণ-আইন ভঙ্গ করতে গান্ধিজি এগিয়ে চললেন। ৬ এপ্রিল ১৯৩০ গান্ধিজি ডান্ডিতে পৌঁছে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সমুদ্রের জল থেকে লবণ প্রস্তুতিতে হাত দেওয়ার সাথে সাথে সমগ্র দেশে তুমুল উত্তেজনা দেখা দিল। ৬ থেকে ১২ এপ্রিল লবণ করের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় প্রতিবাদ সপ্তাহ সর্বত্র পালিত হল। গান্ধিজির অসম সাহসী এই প্রতিবাদ-মূর্তি এবং জনপ্রিয়তা দেখে সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন। জওহরলাল নেহরু ডান্ডি অভিযান সম্পর্কে গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিলেন ঃ "Here was the pilgrim on the quest of truth—peaceful, determined and fearless—...regardless of consequences"। শিল্পী নন্দলাল বসু তাঁর অসাধারণ 'লিনোকাট'-এর মাধ্যমে ডান্ডি অভিযানকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। **অনেকের মতে, ১৯৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহ ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত**। এই সময়ে দুটি ভিন্ন ঘটনা সমগ্র দেশকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল ঃ (১) ১৮ এপ্রিল ১৯৩০-এ সূর্য সেন (১৮৯৪-১৯৩৪) বা 'মাস্টারদা'র নেতৃত্বে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন'-এর অমর কাহিনি, (২) গান্ধিজির ডান্ডি অভিযানের সূত্র ধরে দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে অকুতোভয় খান আব্দুল গফ্‌ফর খান (১৮৯০-১৯৮৮) বা বাদ্‌শা খান বা 'সীমান্ত গান্ধি'র নেতৃত্বে 'লাল কুর্তা' (Red Shirts) বাহিনীর দীর্ঘ ১০ দিন (২৫ এপ্রিল—৪ মে ১৯৩০) পেশোয়ার দখল এবং **ব্রিটিশ নির্দেশ অমান্য করে সত্যাগ্রহীদের উপর গারোয়ালি রাইফেলস্‌ বাহিনীর গুলি চালাতে অস্বীকারের অভূতপূর্ব অধ্যায়**। এককথায়, আসাম আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত না থাকলেও (যদিও সেটি আসামের এক অংশের ধারণা ছিল), ১৯৩০ সালে কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ব্রিটিশ বিরোধী উত্তেজনায় মানুষ কাঁপছিলেন। **এরই জন্য দেখা**

যায়, গোপীনাথ বরদোলই-এর মতো সংগঠক কংগ্রেস ছেড়ে দীর্ঘদিন থাকতে পারেননি, আবার ফিরে এসেছিলেন। যাইহোক, সাংগঠনিক নানা দুর্বলতার জন্য বিদেশি বস্ত্র বয়কট, মাদকদ্রব্য বিক্রির দোকানের সামনে পিকেটিং, ১৯ এপ্রিল ধুবরি সরকারি স্কুলে 'হরতাল' ইত্যাদি সাধারণ কর্মসূচির মাধ্যমেই আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৩০-এর মার্চ মাসে ২০৭ সদস্য বিশিষ্ট আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের এক সভায় গুয়াহাটি থেকে ১৩ জন এবং নওগাঁও থেকে ১জন উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস সংগঠনের তহবিল থেকে শুরু করে সবকিছু ঐ সময় শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছিল। যদিও জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ কয়েকটি পত্রিকা (*Asamiya, Amrita Bazar Patrika, Sylhet, Chronicle*) মানুষের চেতনাকে শাণিত করার প্রশ্নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিল, তথাপি এইসব পত্রিকার প্রভাবও খুবই সীমিত ছিল। আসামে কংগ্রেস সংগঠনের এইরকম একটি দুর্বল মুহূর্তে বিষ্ণুরাম মেধি সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচি আসামে বাস্তবায়নের জন্য একাধিক জনসভার আয়োজন করেছিলেন, যদিও প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তবে ১৯৩০-এর ১৪ এপ্রিল জওহরলাল নেহরু এবং ৫ মে গান্ধিজির গ্রেফতারের পর চারিদিকে প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্বের অন্তিম-লগ্নে আসামে ১৯৩০ সালের ৬ থেকে ১৫ মে অবশ্য ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। কারণ উত্তর লখিমপুর, ডিব্রুগড়, গোলাঘাট, শিবসাগর, নাজিরা, জোড়হাট, নওগাঁও, তেজপুর, গুয়াহাটি, নলবাড়ি, পলাশবাড়ি এবং ধুবরিতে ঐ সময়ে প্রতিবাদ আন্দোলন ও হরতালের ফলে জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তুলনায় বরং সুরমা উপত্যকায় প্রথম থেকেই স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। সিলেট শহরে কংগ্রেস নেতৃত্ব 'কংগ্রেস সংঘ' এবং 'কংগ্রেস কমিটি'তে দ্বিধাবিভক্ত হলেও ১৯৩০-এর মে মাসে উভয় গোষ্ঠীর উদ্যোগে একটার পর একটা পিকেটিং, হরতাল ও মিছিলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সিলেটের স্বেচ্ছাসেবকরা নোয়াখালি গিয়ে ১৯৩০-এর ৬ এপ্রিল লবণ আইন ভঙ্গ করেছিলেন। যেসব সংঘ/সমিতি থেকে আইন অমান্যকারী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রথম থেকে মনোনীত করা হত তার মধ্যে 'তরুণ সংঘ', 'যুবক সংঘ', 'সবুজ সংঘ', 'ছাত্র সম্মিলন', 'ব্রতী বালক সমিতি' ইত্যাদি ছিল প্রধান। ঐসব সভা-সমিতির সদস্যদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়, ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন-জ্যাক-এর সামনে যেন কোনোভাবেই মাথা নত না করা হয়। ১৯৩০ সালের ৩ মে সিলেটের এড়গ্নে আদালতে ২০০ আইনজীবীর মধ্যে মাত্র ২৬ জন উপস্থিত

ছিলেন, ব্রিটিশ আদালতকে বর্জন করার মানসিকতা সেইসময় তুঙ্গে উঠেছিল। গান্ধিজিকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৭ মে সিলেট শহরে আয়োজিত বিশাল মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জ ও বর্বরোচিত আচরণে কমপক্ষে ১৬ জন (যদিও বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী মোট ৪১ জন) গুরুতরভাবে জখম হয়েছিলেন। নেতৃস্থানীয় সকল আন্দোলনকারীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

এক কথায়, আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রথমদিকে ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকায় কিছু সাংগঠনিক দুর্বলতা সত্ত্বেও ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ব্রিটিশ অত্যাচারে জর্জরিত উভয় উপত্যকায়ই ক্রমশ তপ্ত হতে শুরু করে। অবশ্য ১৯৩০-এর মার্চ মাসে গুয়াহাটির কার্জন হল-এ দেশপ্রেমিক চন্দ্রনাথ শর্মার একটি বড়ো তৈলচিত্রে আবরণ যখন কামাখ্যারাম বরুয়া উন্মোচন করেন, সেই সময়েও যথেষ্ট উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ছাত্র-সমাজের ক্রমশ ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের অংশগ্রহণের ফলে উদ্‌বিগ্ন ব্রিটিশ আমলারা ধুবরি, নওগাঁও, তেজপুর, শিবসাগর প্রভৃতি এলাকার সমস্ত সরকারি স্কুলে দীর্ঘমেয়াদি ছুটি ঘোষণা করে বন্ধ করে দেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পলাতক বিপ্লবীরা ধুবরি শহরে আশ্রয় নিয়েছে—এইরকম গুজব রটিয়ে দিয়ে ১১ মে ১৯৩০-তে বাড়ি বাড়ি তল্লাশির অজুহাতে ব্রিটিশ পুলিশের ব্যাপক নির্যাতন নেমে আসে। ১২ মে ধুবরি-গৌরীপুরের জাগ্রত জনতা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে চারিদিকে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করে এবং বিদেশি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়। ১৪ মে ধুবরিতে বিশাল ছাত্রবাহিনী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল নিয়ে এগিয়ে আসার সময় পুলিশের লাঠির ঘায়ে অনেকেই লুটিয়ে পড়েন। ধুবরির ঘটনার প্রেক্ষিতে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তরুণরাম ফুকন, রোহিণীকুমার চৌধুরি তাঁদের একাধিক বক্তৃতায় ছাত্রদের শিক্ষায়তনে ফিরে যাবার আবেদন জানালে কিছুটা কাজ হয়েছিল, কিন্তু আন্দোলনের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল 'কানিংহ্যাম সার্কুলার'।

২২.৩.৪.২ 'কানিংহ্যাম সার্কুলার' ও তারপর

১৯৩০ সালের ১৯ মে Director of Public Instruction (DPI) কানিংহ্যাম সাহেব একটি সার্কুলার জারি করে ঘোষণা করলেন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আন্দোলনকারীদের স্থান নেই। যেসব ছাত্র ইতিমধ্যে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন ভবিষ্যতে এটি না করার মুচলেকা তারা/অভিভাবকরা দিলে তবেই বিদ্যায়তনে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হবে। এইরকম স্বৈরাচারী ফরমানের বিরুদ্ধে চারদিকে

প্রতিবাদ শুরু হয়, বিশেষত গ্রীষ্মাবকাশের পর কটন কলেজ খুললে এটি তীব্র আকার ধারণ করে। চারিদিকের চাপে অবশ্য ২০ জুন সার্কুলারটি কিছুটা সংশোধিত হয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ১ সেপ্টেম্বরে সরকার-নিয়ন্ত্রিত আসামের স্কুলগুলিতে ৮৫ শতাংশ ছাত্র ফিরে আসে। অপর একটি সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গ্রীষ্মের ছুটির আগে আসামে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫,১৮৬ জন, কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রে ৩,১১৭ জন বিদ্যালয় থেকে বিদায় নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করে। একইসাথে, আসামের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ থেকে মুক্ত জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (যেমনটি অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেখা গিয়েছিল) আবার শুরু হয়। ইতিমধ্যে ১৯৩০-এর জুন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ আগে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এর আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও ঐ রিপোর্টে সেটির উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না। সরকারি নির্দেশে *Asamiya* এবং *Sylhet Chronicle*-এর প্রকাশনা দীর্ঘদিন বন্ধ রাখতে হয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য আসামে ১৮ আগস্ট যে ৬৭১ জনকে বন্দি করা হয়েছিল তার মধ্যে ১০০'র বেশি ছিলেন ছাত্র। আগস্টের শেষ সপ্তাহে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও নওগাঁও শহরে ১২ নভেম্বর সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই একটি বড়ো মিছিল হয়েছিল। ১৩ নভেম্বর স্কুল গেটে জেলা শাসকের প্রবেশাধিকারে বাধাদানের জন্য ১৮ জন ছাত্রীকে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছিল। নওগাঁও শহরে বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীর বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে এমনকি Edmund Burke-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *French Revolution* পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। নওগাঁও-সহ আসামের বিভিন্ন জেলার গ্রামের মহিলারা যেভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের অংশ নিতে এগিয়ে এসেছিলেন, সেটি এক অভিনব দৃশ্য। এই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার 'অপরাধে' **প্রথম যে দু'জন মহিলা জেল খেটেছিলেন তার মধ্যে নওগাঁও-এর গুণেশ্বরী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য।** অন্যান্য যেসব অগ্নিকন্যারা এই সময়ে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নওগাঁও-এর মুক্তাবালা বৈষ্ণবী, দরবারি মেচ, মোহিনী গোহাইন, কিরণবালা বোরা, গুয়াহাটির অমলপ্রভা দাস, দরং-এর চন্দ্রপ্রভা সইকিয়ানি, শিবসাগরের কমলাবালা কাকতি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

২২.৩.৪.৩ প্রথম গোলটেবিল বৈঠক

১৯৩০-এর ৭ জুন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে প্রথম গোলটেবিল

বৈঠক (নভেম্বর ১৯৩০-জানুয়ারি ১৯৩১)-এর আয়োজন করেন। ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সমর্থক ৫০ জনকে ঐ বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, যদিও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ কোনো নেতা আমন্ত্রিত হননি। ফলে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের বিরুদ্ধে চারিদিকে ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছিল এবং ঐ বৈঠককে বয়কটের আহ্বানও রাখা হয়েছিল। আসাম থেকে ইংল্যান্ডে ঐ বৈঠকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন চন্দ্রধর বরুয়া (১৮৭৪-১৯৬১) নামে জনৈক চা-বাগান মালিক। সমবেত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ৪ অক্টোবর ১৯৩০ যখন চন্দ্রধর বরুয়া পান্ডু থেকে বোম্বাই-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন সেইসময় চন্দ্রধরের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে গুয়াহাটি শহরে কালো পতাকা প্রদর্শিত হয়েছিল। এইরকম বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যান্য স্থানের তুলনায় গুয়াহাটি ১৯৩০ সালে বরং শান্ত ছিল বলা যায়। ১৯৩০-এর জুন মাসে বিধানচন্দ্র রায় গুয়াহাটিতে এসে সংগঠনকে শক্তিশালী করার নানা পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং এরপরই জেলা কংগ্রেস কিছুটা সক্রিয় হয়েছিল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন সত্রগুলিও আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যান্য কর্মসূচিকে নানাভাবে পুষ্ট করেছিল। যেমন, বরপেটা সত্র'র সত্রাধিকার আফিং, গাঁজাসহ মাদক দ্রব্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে কিছু লাভ হয় এবং বরপেটা থেকে আদায়ীকৃত আবগারি শুল্ক ১৯৩০-৩১ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে বিষ্ণুরাম মেধি, হেমচন্দ্র বরুয়া, তায়েবুল্লাহ, অমিয়কুমার দাশ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ আইন অমান্য আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি।

২২.৩.৪.৪ অভিজ্ঞ নেতৃত্বের অনুপস্থিতি

১৯৩০ সালের ২১ আগস্ট বিষ্ণুরাম মেধিকে গ্রেফতার করে ৬ মাস জেল এবং ২০০ টাকা জরিমানায় দণ্ডিত করা হয়। জরিমানার টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে মেধির মোটর গাড়িটি নীলামে বিক্রি করা হয়। এরপর হেমচন্দ্র বরুয়া, সিদ্ধিনাথ শর্মাসহ প্রায় সকল নেতাকেই গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার বরণের আগে গোপীনাথ বরদোলইকে নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণের জন্য বিষ্ণুরাম মেধি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু বরদোলই অনিচ্ছুক হওয়ার জন্য শিবসাগরের যাদবপ্রসাদ চালিহাকে (১৮৯৭-১৯৬৪) আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করতে হয়। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্বের বাকি সময় কংগ্রেসের সদর দপ্তর শিবসাগরেই স্থানান্তরিত ছিল। এইভাবে দেখা যায়, আইন অমান্য আন্দোলনের

প্রথম পর্বে আসামের অভিজ্ঞ ও পোড়খাওয়া নেতৃত্বের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের—বিশেষত ছাত্রসমাজের উৎসাহ-উদ্দীপনা কিছু কম ছিল না। ১৯৩০-এর ১ আগস্ট নলবাড়ির এক জনসভায় বিষ্ণুরাম মেধি 'বয়কট' অস্ত্রটি ব্যবহার করে ব্রিটিশ সরকারকে পুরোপুরি অচল করে দেওয়ার উদাত্ত আহ্বান রেখেছিলেন। আগের দিন একইস্থানে হেমচন্দ্র বরুয়া একইভাবে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি করেন ঃ "The British Government should either be mended or ended and since mending was impossible it should be ended"। ব্রিটিশ সরকারের বল্গাহীন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যে নওগাঁয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছিল এবং ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩০ আসামের রাজ্যপালকে কালো পতাকা প্রদর্শন এবং পুলিশের এস.পি.-র দিকে তীর নিক্ষেপসহ নানা ঘটনা সেইসময় ঘটেছিল। ১৯৩১-এর জানুয়ারিতে উত্তর কামরূপসহ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে Assam Rifles বাহিনীর 'ফ্ল্যাগ-মার্চ' ইত্যাদি সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মনে ব্রিটিশ বিরোধী উত্তেজনা দমানো সম্ভব হয়নি, বরং দিনদিনই সেটি বাড়ছিল।

২২.৩.৪.৫ সুরমা উপত্যকায় আন্দোলন

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যেমন বিষ্ণুরাম মেধিসহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেফতার-এর পর জনমনে উত্তেজনা বেড়েছিল, একইভাবে ১৯৩০-এর ৩ মে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি'কে আটকের পর সিলেট শহর উত্তাল হয়ে উঠেছিল। আইন-অমান্য আন্দোলনের যে দুটি কর্মসূচি নিয়ে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি গ্রামের কৃষকের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছিলেন তার একটি হল ভূমি রাজস্ব অর্ধেক করার দাবি এবং অন্যটি নিপীড়নমূলক চৌকিদারি-কর-এর বিরোধিতা। যেসব সংগ্রামী মানুষকে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর সাথে পেয়েছিলেন তার মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুরেশচন্দ্র দেব, অবলাকান্ত গুপ্ত, হেমন্তকুমার গুপ্ত, বসন্তকুমার দাস, শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মতো সুরমা উপত্যকাতেও আইন অমান্য আন্দোলন দমনের জন্য Assam Rifles বাহিনীকে মাঝেমাঝেই ব্যবহার করা হত। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ সুনামগঞ্জ বা হবিগঞ্জ মহকুমায় যেখানে শেষ করেছিলেন, তাঁর সহকর্মীরা ১৯৩০-এর জুন মাসে সেখান থেকে শুরু করে খাজনা না দেওয়ার জন্য গ্রামের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ব্রত গ্রহণ করেন। এই অভিযানে একদিকে যেমন ছিল তহবিল-সংগ্রহ, অন্যদিকে দেশপ্রেমের সংগীত। ১৯৩০-এর জুলাই মাসে বেহালি, পলিগাঁও প্রভৃতি এলাকার মানুষ চৌকিদারি কর দেওয়া বন্ধ করে দেন এবং সুনামগঞ্জের অহিরপুর এলাকায় পাঁচজন চৌকিদার একযোগে

পদত্যাগ করেন। সুনামগঞ্জ মহকুমার করুণাসিন্ধু রায়, নলিনী চৌধুরি, নীরদ গুপ্ত, উপেন্দ্র দেব-এর মতো কিছু সংগ্রামী এবং সিলেট শহরে রথীন্দ্রনাথ সেন-এর মতো কিছু যোদ্ধা সেইসময় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে জুলাই মাসের সমকালীন *বঙ্গবাণী* পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল কীভাবে খাজনা-বন্ধ ও তহবিল-সংগ্রহ অভিযানে অংশ নিতে গিয়ে সতীন্দ্রনাথ দে, হেমাঙ্গমোহন বিশ্বাস (১৭.৭৫ দ্রষ্টব্য), দীনেশচন্দ্র পালিত, হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, মথুরা রাহা, হীরালাল রায়, শচীন্দ্রমোহন দত্ত প্রভৃতি ব্যক্তি পুলিশ অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং গ্রেফতার বরণ করেছিলেন। আসলে, **সুরমা উপত্যকায় কৃষক আন্দোলনের নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিল ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলন।**

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যেমন 'রায়ত-সভা' কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সুরমা উপত্যাকাতেও তেমনি অনেক স্থানীয় সংগঠন গড়ে উঠেছিল, যদিও সবগুলিই যে রাজনৈতিকভাবে স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল তেমনটি নয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩১-এ কোনওয়ারপুর মৌজায় 'হিতসাধিনী সভা' খাজনা-কমানোর দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল। অ-রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত 'কাছাড় জেলা কৃষক সম্মিলনী'র ১৯৩১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ৬০ বিঘা জমির মালিক ও আইনজীবী খান সাহেব রশিদ আলি নস্কর। আবার অন্যদিকে **যদিও গান্ধিজি জমিদার-বিরোধী আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না, তথাপি সুরমা উপত্যকায় সেটি আটকে রাখা সম্ভব হয়নি।** বাংলার কৃষক-শ্রমিক দলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৩০-এর দশকে কুলাউরা কিংবা ভানুবিলে কৃষক সংগ্রাম কিছুটা শ্রেণি সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব প্রত্যাহার করার সাথে সাথে ১৯৩১-এর জুলাই মাসে সিলেটে 'সাম্যবাদী সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় যাতে সভাপতিত্ব করেন বাংলার বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভানুবিল সহ অন্যত্র কৃষকদের (বিশেষত মণিপুরী কৃষকদের) প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান রাখা হয়। বিপ্লবী বামপন্থী যুবক দ্বারকানাথ গোস্বামী আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে শুধুমাত্র ব্রিটিশ নিপীড়নের বিরুদ্ধেই নয়, জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও একইভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

কানিংহ্যাম সার্কুলার জারি হওয়ার পর সুরমা উপত্যকায় ছাত্র উত্তেজনাও নানাভাবে বিস্ফোরিত হয়েছিল। গুয়াহাটির 'কটন কলেজ'-এর মতো সিলেটের 'মুরারীচাঁদ (এম. সি.) কলেজ'-এর ছাত্ররাও আইন অমান্য আন্দোলনের নানাভাবে

অংশ নিয়েছিলেন। তবে 'কটন কলেজ'-এর তুলনায় 'এম. সি. কলেজ'-এর সাহেব অধ্যক্ষ ছিলেন অনেকবেশি কড়া। কলেজের প্রবেশদ্বারে ছাত্রদের 'পিকেটিং' আটকানোর দায়িত্ব 'এম. সি. কলেজ'-এর অধ্যক্ষ পালাক্রমে অধ্যাপকদের উপর অর্পণ করেন। জ্যোতিষ দাস নামে জনৈক অধ্যাপক এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার সাথে সাথেই তাঁর চাকুরি হারান। ১৯৩০-এর ১৪ জুলাই আসামের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এবং ডি. পি. আই. কানিংহ্যাম সাহেব যৌথভাবে সিলেট শিক্ষায়তন পরিদর্শনে আসার আগে ও পরে চারিদিকে বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়। ৯ জুলাই হবিগঞ্জের যোগেন্দ্রকিশোর ইনস্টিটিউশন, ১৪ জুলাই সিলেটে রাজা গিরিশচন্দ্র হাইস্কুল, ১৩ আগস্ট মৌলবিবাজারে সরকারি হাইস্কুল অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হয়: ১৯৩০-এ শিলচরের সাধ্য প্রেস থেকে বৈকুণ্ঠচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'মাতৃ-আদেশ' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে পুলিশকে উপরের কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার ডাক দেওয়া হয়। এতে সাড়া দিয়ে এবং সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে লাঠি চালাতে অস্বীকার করে করিমগঞ্জের তিনজন পুলিশ কনস্টেবল চাকুরিতে ইস্তফা দেন। স্বাভাবিকভাবেই 'মাতৃ আদেশ' গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং প্রেসের মালিকের ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। সমাজের নীচেরতলার মানুষও সেই সময় কীরকম উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সেটি উপলব্ধি করা যায় চর্মকারদের একটি সিদ্ধান্ত থেকে। করিমগঞ্জের চর্মকাররা ১৯৩০-এর জুলাই মাসে একটি সভায় সমবেত হয়ে তাদের চিরাচরিত মদ্যপান প্রথা বর্জনের প্রতিজ্ঞা করেন এবং কেউ ঐ সিদ্ধান্ত অমান্য করলে তাদেক সামাজিকভাবে বয়কটেরও প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বর থেকে সুরমা উপত্যকার সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারাও পথে নামেন এবং বিদেশি পণ্য ও বস্ত্রের দোকানের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং-এ অংশ নেন। এরফলে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিদেশি পণ্য বিক্রির প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে নেমে আসে। আসাম সরকার পিকেটিং-কে নিষিদ্ধ করে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও সুরমা উপত্যকায় এইরকম সত্যাগ্রহ আন্দোলন একটার পর একটা নিয়মিতভাবে ঘটতে থাকে। ১৯৩০-এর ১২ নভেম্বর সুরমা উপত্যকায় যখন প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহীরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছিলেন, সেইসময় শুধুমাত্র সিলেট শহর থেকেই ৭০ জনকে গ্রেফ্তার করা হয়েছিল। ১৯২০-২২-এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় যেমন শিবসুন্দরী দেবী, সৌদামিনী দেবী সুরমা উপত্যকায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আইন অমান্য আন্দোলনের সময় 'মহিলা সংঘ'র প্রতিষ্ঠা এবং স্নেহলতা দেব, মাতঙ্গিনী দাস, নরেশনন্দিনী দত্ত, মোহিনীবালা সরকার, কিরণবালা দেবী, সুনীতিবালা

দাস, গিরিজাবালা গুপ্ত, লাবণ্যপ্রভা দত্ত, বিনোদিনী পাল প্রভৃতি মহিলার অগ্রণী ভূমিকা উল্লেখ্য।

উপরোক্ত ঘটনাবলী প্রমাণ করে, সাংগঠনিক নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব কীভাবে দুই উপত্যকাতেই দিনদিন জোরদার হচ্ছিল।

সরকারি পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ নীচের সারণিটি তৈরি করেছেন।

সারণি ১৩

আসামের বিভিন্ন স্থানে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথমপর্বে গ্রেফতারিকৃত এবং দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা

১লা এপ্রিল থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

জেলা	মোট গ্রেফতার	মোট শাস্তিপ্রাপ্ত
সিলেট	৮৯২	৬১৬
কাছাড়	২২	১৮
গোয়ালপাড়া	১৬০	৬৭
কামরূপ	৫২২	২৭৭
দরং	৫০	১৪
নওগাঁও	৫৫৫	১৩০
শিবসাগর	৯৮	৬০
লখিমপুর	৭৪	৩৭
মোট	২,৩৭৩	১,২১৯

সূত্র ঃ Amalendu Guha, *Planter Raj to Swaraj*, p. 142

উপরের সারণি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, আসামে যতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তার এক-তৃতীয়াংশ এবং যতজন কঠিন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তার অর্ধেক ছিলেন বাঙালি-অধ্যুষিত সিলেটের মানুষ। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে নওগাঁও ও কামরূপ জেলা শীর্ষে ছিল।

২২.৩.৪.৬ গান্ধি-আরউইন চুক্তি (১৯৩১)

এত বড়ো মাপের একটি আন্দোলন ধীরে ধীরে যখন শক্তি সঞ্চয় করছিল, সেই সময় ৯ মার্চ ১৯৩১-এ গান্ধি-আরউইন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গান্ধিজির ডাকে

আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়। ১৯৩০-৩১-এর আইন অমান্য আন্দোলনে সমগ্র দেশ লক্ষাধিক সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন এবং অবিভক্ত বঙ্গদেশ ছিল এই ব্যাপারে শীর্ষে। ১৯৩১ সালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত করাচি কংগ্রেস গান্ধি কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করার সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে। ভাইসরয় আরউইন-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী, সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দেওয়া হয়, যদিও বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং (১৯০৭-১৯৩১), সুখদেব, রাজগুরু (২৩ মার্চ ১৯৩১ যাঁদের ফাঁসি হয়) প্রমুখ বিপ্লবীদের মুক্তির প্রশ্নটি নিয়ে গান্ধিজির মাথাব্যাথা ছিল না। ইংল্যান্ডে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে (১২ নভেম্বর ১৯৩০-১৯ জানুয়ারি ১৯৩১) জাতীয় কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। গান্ধি-আরউইন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী **দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৩১)** জাতীয় কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে গান্ধিজি সেই বৈঠকে যোগ দিতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে নিয়ে ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। আসলে, আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্বে এটিই ছিল একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মতো গান্ধিজি এবং কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত আসামেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। যদিও প্রবীণরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তরুণরা এর বিরোধিতা করেন। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্বে আসামের মহিলাদের উজ্জ্বল ভূমিকাকে অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে ২৯ এপ্রিল ১৯৩১ সালে ধুবরি'তে একটি বিরাট জনসভা আয়োজিত হয় যাতে ৫০০'র বেশি অসমিয়া মহিলা অংশগ্রহণ করেন। ঐ জনসভায় শহিদ ভগৎ সিং-এর দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সর্বসম্মতিক্রমে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সময় আসামের Chief Secretary তাঁর এক গোপন রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন ঃ

> *A few years ago it would have been considered incredible that 500 Assamese ladies should have met in a conference with men and should have passed a resolution applauding the patriotism of Bhagat Singh.*

আসামে জাতীয় চেতনা অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটি ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো অবদান যদিও গান্ধিজি পাঞ্জাবের ভগৎ সিং-এর আদর্শের সাথে সহমত ছিলেন না এবং ভাইসরয় আরউইন-এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের সময়

অনেকের আবেদন সত্ত্বেও অনিবার্য ফাঁসির হাত থেকে ভগৎ সিং-কে বাঁচাতে কোনো উদ্যোগও গ্রহণ করেননি।

২২.৩.৫ আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৩২-৩৪)

১৯৩১ সালের ২৮ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে শূন্যহাতে গান্ধিজি ভারতে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে আরউইনের বিদায়ের পর লর্ড উইলিংডন ১৭ এপ্রিল ১৯৩১ ভাইসরয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে লন্ডনের নির্দেশে ভারতে ভবিষ্যৎ আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। উইলিংডন তাঁর এক চিঠিতে নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি কীভাবে "becoming a sort of Mussolini in India" এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের নানা অজুহাতে গ্রেফতার ও নির্যাতন শুরু করেছেন। গান্ধিজির সাথে উইলিংডন সাক্ষাৎ করতে পর্যন্ত অস্বীকার করলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১ জানুয়ারি ১৯৩২ গান্ধিজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন পুনর্বার শুরু করার ডাক দেয়। ৩ জানুয়ারি ১৯৩২-এ গান্ধিজি ও বল্লভভাই প্যাটেল কারারুদ্ধ হন। ৪ জানুয়ারি সমগ্র দেশে চারটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়—Press Ordinance, Unlawful Instigation Ordinance, Unlawful Intimidation Ordinance এবং Unlawful Association Ordinance—এবং **১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২-এ একটি বিশেষ গেজেটে কংগ্রেস সংগঠন নিষিদ্ধ হয়। একই দিনে 'আসাম সেবা দল', 'আসাম যুবক সংঘ' প্রভৃতি সংগঠনকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।** এর আগে ৪ জানুয়ারি ১৯৩২-এ আসাম কংগ্রেস প্রাদেশিক কমিটি সংগঠনের সভাপতিকে 'ডিক্টেটর'-এর ক্ষমতা অর্পণ করে এবং সিলেট জেলা কংগ্রেস কমিটির ক্ষেত্রেও একই ধরনের সিদ্ধান্ত সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯৩২ সালে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে গান্ধিজিসহ জাতীয় নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে ভয়-ভীতি অগ্রাহ্য করে হরতাল পালনের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের উদ্বোধন হয়।

২২.৩.৫.১ অর্থনৈতিক চালচিত্র

আইন অমান্য আন্দোলন এমন একটা সময়ে শুরু হয়েছিল যখন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দার প্রভাব ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মতো আসামেও তীব্রভাবে অনুভূত হত। আসামে কৃষকের বকেয়া ভূমি রাজস্ব কীভাবে ৩০-এর দশকে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল সেটি সারণি ১৪-তেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

সারণি ১৪

আসামে কৃষকের বকেয়া ভূমি রাজস্ব

সাল (১ জুলাই)	লক্ষ টাকা
১৯২৮	২
১৯২৯	৩
১৯৩০	৭
১৯৩১	২১
১৯৩২	৩৬
১৯৩৩	৩৭

১৯৩২ সালের ১ জুলাই মোট ভূমি রাজস্বের মাত্র ৩৭ শতাংশ আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। বকেয়া খাজনা সময়মত পরিশোধ করতে না পারায় কৃষকের জমি ও সম্পত্তি হারানোর প্রক্রিয়া দ্রুত বাড়তে থাকে—যেমন, ১৯৩২-৩৩ সালে সংখ্যাটি ছিল ৮১,৯৫৮ এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে সেটি বেড়ে হয় ৯৮,১২২, একই সাথে ১,৬০,০০০ ক্ষেত্রে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে কৃষকের ভূমিকা সম্পর্কে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় ঃ *True it is that Assam has not been able to take up no-tax campaign. But the incapacity of the Rayats to pay up their taxes forced Government into an automatic no-tax campaign. The attachment and auction of property went on everywhere.* সময়মতো খাজনা দিতে না পারার অজুহাতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় স্থানীয় মানুষের মালিকানাধীন ৮টি ছোটো চা-বাগান সরকার বাজেয়াপ্ত করে। শুধু ভূমি রাজস্ব থেকেই নয়, আবগারি শুল্কের ক্ষেত্রেও ঐ সময় ব্রিটিশ সরকারের আয় ক্রমশ কমতে থাকে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ১৯২৯-৩০ সালে আবগারি শুল্ক থেকে আয়ের পরিমাণ ছিল ৬.৫ মিলিয়ন টাকা, যেটি ১৯৩৩-৩৪ সালে ৩.৪ মিলিয়নে নেমে আসে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদায়ীকৃত রাজস্ব দিনদিন যত কমতে থাকে (অবশ্যই বিশ্ব মহামন্দার কারণে) ততই আসামে ব্রিটিশ সরকার মারমুখী ভূমিকা গ্রহণ করে। একদিকে স্বৈরাচারী ভাইসরয় উইলিংডন (১৯৩১-১৯৩৬) এবং অন্যদিকে আসামের দুই অত্যাচারী গভর্নর E.L.L. Hammond (1927-1932) এবং Michael Keane (1932-1935)-র নিপীড়নমূলক আচরণে আসামের দুই উপত্যকাই দিনদিন তপ্ত হয়ে উঠছিল। ৯ জানুয়ারি ১৯৩২ আসাম সরকার Prevention of Molestation and Boycott Ordinance, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২,

Unlawful Association এবং Unlawful Instigation ইত্যাদি অর্ডিন্যান্স জারি করার পর আসামে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করাই কঠিন ছিল। সেইসময় আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন বিষ্ণুরাম মেধি, যাদবপ্রসাদ চালিহা, ধনিরাম তালুকদার, হেমচন্দ্র বরুয়া, অমিয়কুমার দাশ এবং বেলিরাম দাস। এঁরা সকলেই বিশেযত হেমচন্দ্র বরুয়া ও বিষ্ণুরাম মেধি আসামের সর্বত্র ঘুরে মানুষকে নির্ভীক হওয়ার জন্য উদ্দীপ্ত করতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আইনজ্ঞ, যদিও আইনব্যবসা করতেন না। তবে প্রয়োজনে জেলা/প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিকে সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হত।

লাহোর কংগ্রেসের (১৯২৯) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বন্দি ভারতবর্ষের প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদার পালন করার আহ্বান ছিল। ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকায় অস্ত্রধারী ব্রিটিশ পুলিশের সাথে নিরস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সংঘর্ষ শুরু হয় ১৯৩২ সালের ২৬ জানুয়ারি, অর্থাৎ তৃতীয় **'স্বাধীনতা দিবসে'**। ধুবরি ও নওগাঁও-এ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এবং স্বাধীনতার ধ্বনি তুলে মিছিল যখন এগিয়ে যাচ্ছিল সেইসময় পুলিশ গতিরোধ করে এবং নেতৃস্থানীয় সকলকে কারারুদ্ধ করে। নবীনচন্দ্র বরদোলই—যিনি এতদিন নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন—জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অপরাধে (ভুবনেশ্বর বয়ুরায় মত) গ্রেফতার এড়াতে পারেননি। কিছুদিনের জন্য মুক্তি পেলেও নবীনচন্দ্র বরদোলইকে ২৬ এপ্রিল আবার গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁর মোটর গাড়িটি পুলিশ নীলামে বিক্রি করে দেয়। ১৯৩২-এর জুন মাসে জোড়হাটে Assam Provincial Political Conference-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন গারমুর-এর সত্রাধিকার। **স্বাধীনতা সংগ্রামে আসামের সত্রগুলি কত উদ্দীপক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, এই ঘটনা সেটিই প্রমাণ করে**। তৃতীয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন এবং মাদক বিক্রয় কেন্দ্রে পিকেটিংকে কেন্দ্র করে গোলাঘাটে আসামের মহিলারা ১৯৩২ সালের বিভিন্ন সময়ে যেভাবে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিলেন সেটিও কম আকর্ষণীয় নয়। **গোলাঘাটের প্রতিটি বাড়ি থেকে কমপক্ষে ১ জন মহিলা পিকেটিং-এর অংশ নিয়েছিলেন এবং ১৯৩২-এর মার্চ পর্যন্ত যতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তার ৪০ শতাংশ ছিলেন মহিলা**। আফিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে দ্বারিকা বরুয়া (দাসী) ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২-এ গ্রেফতার হন এবং ২৬ এপ্রিল ১৯৩২-এ শিবসাগর জেল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর দাবিতে কালিয়াবোর-এ গুণেশ্বরী দেবী, মুক্তাবালা প্রভৃতি নারীদের গ্রেফতার করে তৃতীয় শ্রেণির বন্দি হিসেবে রাখা হয়। অনেক অসমিয়া মহিলাদের মধ্যে এই আন্দোলনে সবচেয়ে

দৃপ্ত ভূমিকা পালন করেছিলেন দরং-এর চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানি (১৭.২৩ দ্রষ্টব্য)। **অত্যন্ত মৃদু স্বভাবের অসমিয়া মহিলাদের এই নতুন ভূমিকা ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যতম আকর্ষণ।**

২২.৩.৫.২ রানি গৈডিনলিউ'র ভূমিকা (১৭.১৯ দ্রষ্টব্য)

আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে মণিপুর এবং অবিভক্ত আসামের নাগা পাহাড়ে রানি গৈডিনলিউ-র অসমসাহসী ভূমিকার কথা প্রথম প্রচারিত হয়। গান্ধিজির ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে নাগাদের একাংশের ন্যায্য দাবিকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের জন্য অসম সংগ্রাম করতে গিয়ে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে গৈডিনলিউ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আইন-অমান্য আন্দোলন শেষ হলেও ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালাভের আগে কিন্তু তিনি জেল থেকে মুক্তি পাননি। নাগা অগ্নিকন্যা গৈডিনলিউ-র নাম ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে কীরকম অনুপ্রেরণার উৎস ছিল সেটি উপলব্ধি করা যায় সিলেট থেকে বাংলায় প্রকাশিত একটি ছোটো পুস্তিকায় (যেটির উল্লেখ ১৯৩৩-৩৪ সালে তৎকালীন আসাম সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে আছে), যেটি ১৯৩৩ সালের ৪ জানুয়ারি এক সরকারি আদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

২২.৩.৫.৩ প্রতিবাদের ফলে নির্যাতন

সুরমা উপত্যকার সিলেট শহরে ও সুনামগঞ্জে তৃতীয় বছরের 'স্বাধীনতা দিবসে' (বিভিন্ন সরকারি অফিস ও আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন) পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে পরের দিন (অর্থাৎ ২৭ জানুয়ারি ১৯৩২) হরতাল পালিত হয়েছিল। এই পর্বে ব্রিটিশ পুলিশ ব্যাপকভাবে গ্রেফতারের পরিবর্তে আন্দোলনকারীদের চাবুক দিয়ে প্রহারের পথ বেছে নেওয়ায় নির্যাতন দিনদিনই তীব্র হচ্ছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জনের স্থলে 'পিকেটিং'-এর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হত। স্বদেশি কর্মসূচি যেমন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় গুয়াহাটি, তেজপুর, ধুবরি, নওগাঁও, মঙ্গলদৈ, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে পালিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি সুরমা উপত্যকাতেও 'প্রভাত ফেরি' এবং ব্যাপক সংখ্যায় মহিলা সমাবেশের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছিল। ১৯৩২ সালে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিলেটের মুসলমান সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট আন্দোলনের শরিক হওয়ার ফলে আইন অমান্যের জনভিত্তি গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। ঐ সময় সিলেটে পোস্ট অফিস বয়কট করার প্রচারপত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেস অফিসগুলি সরকারি দখলে চলে গিয়েছিল। ব্রিটিশ আসামে

কারাগারের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়, প্রায় নরকের মত অবর্ণনীয়। যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামী কারারুদ্ধ হতেন, তাঁদের দুর্গতির অন্ত ছিল না। আসামে জেলের অভ্যন্তরে কত রকমের নির্যাতন হত সেটি বর্ণনা করলে দীর্ঘ এক অধ্যায় হয়ে যাবে। আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে (৩১ আগস্ট ১৯৩২ পর্যন্ত) সরকারি হিসাব অনুযায়ী আসামে ১,৪৯৪ জনকে (যদিও আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের মতে প্রকৃত সংখ্যাটি ছিল ১,৭০০)। ১,৪৯৪ জনের মধ্যে ৮০ জন মহিলাসহ ১,০৭৬ জনকে কারান্তরালে রেখে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানি (১৭.২৩ দ্রষ্টব্য) থেকে শুরু করে হেমচন্দ্র বরুয়া (১৭.৭৪ দ্রষ্টব্য), মহেন্দ্রমোহন চৌধুরি (১৭.৫২ দ্রষ্টব্য), বিজয়চন্দ্র ভগবতী, গহনচন্দ্র গোস্বামী, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি, বিমলাপ্রসাদ চালিহা (১৭.৪৫ দ্রষ্টব্য), পূর্ণচন্দ্র শর্মা, রবীন নবিস্, সুধাংশু ব্যানার্জি প্রভৃতি কেউই ব্রিটিশ কোপানল থেকে রক্ষা পাননি। আসামে সেইসময় তরুণ তিনজন খ্যাতনামা শিল্পীও—জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য), হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৭.৭৫ দ্রষ্টব্য) এবং ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (১৯১২-৭২)—কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। **এই পর্বে গ্রেফতার বরণকারী স্বাধীনতা সংগ্রামীর এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন সিলেট জেলার মানুষ।** ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তেজপুর, গোলাঘাট এবং গুয়াহাটি আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। অন্যান্য মহকুমার তুলনায় লখিমপুর ও কাছাড় অবশ্য অনেকবেশি শান্ত ছিল এবং সেখানে আন্দোলনের প্রভাব তেমন পড়েনি।

আন্দোলনকে নিস্তেজ ও নষ্ট করার জন্য ব্রিটিশ শাসকরা বলপ্রয়োগ ছাড়াও নানারকম অপপ্রচার এবং কিছু স্থানীয় মানুষের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেননি। ব্রিটিশ মদতে সিলেটে, বিশেষত করিমগঞ্জ মহকুমায়, কয়েকটি সভাসমিতি আইন অমান্য আন্দোলনকে ধিক্কার জানিয়ে এবং আসাম সরকারকে সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। করিমগঞ্জে এই উদ্দেশ্যে একটি 'শান্তি কমিটি' গঠিত হয়েছিল এবং ১৩ মার্চ ১৯৩২-এ বালাগঞ্জে একটি সভায় প্রায় তিন হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ১০ ফেব্রুয়ারি **১৯৩২ সালে *জনশক্তি* পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশের জন্য এক হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল, অবশ্য পত্রিকাটি মাথা নত না করে হাইকোর্টে আপিল করে শেষপর্যন্ত মুক্তি পায়।**

২২.৩.৫.৪ 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' (১৯৩২) ও তারপর

এইভাবে সরকারি দমননীতি ও নির্যাতন চরমে উঠলেও সমগ্র আসামে আন্দোলন যখন ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল সেই সময়ে (১৭ অক্টোবর ১৯৩২) ব্রিটেনে

র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড সরকার Communal Award বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করে আইন অমান্য আন্দোলনকে শক্তিহীন করে দিলেন। উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী, শুধু যে মুসলিম, শিখ ও ইউরোপীয়দের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী থাকবে তাই নয়, হিন্দু সমাজের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে ঘোষণা করে আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের সিদ্ধান্তও ছিল। পরের দিন হিন্দু সমাজকে এইরকম কৃত্রিমভাবে ভাগ করার বিরুদ্ধে ম্যাকডোনাল্ড-এর কাছে তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে গান্ধিজি পত্র পাঠালেন এবং ঘোষণা করলেন, অবিলম্বে এটি পুনর্বিবেচনা না করলে 'হরিজন' প্রশ্নটি নিয়ে তিনি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ থেকে আমরণ অনশন করবেন। ব্রিটিশ সরকার যথারীতি এই দাবি উপেক্ষা করায় ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত গান্ধিজি নির্দিষ্ট দিনে পুনাতে অনশন শুরু করলেন। পাঁচ দিন পর দলিত নেতা বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রমুখ নেতাদের সাথে আলোচনা পর 'হরিজন' প্রশ্নে 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নীতি কিছুটা সংশোধন করে 'পুনা চুক্তি' গৃহীত হলে গান্ধিজি অনশন ত্যাগ করেন। মুক্তিলাভের পর গান্ধিজি হিন্দুসমাজের আশুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা বর্জন, 'হরিজন'দের কল্যাণসাধন ইত্যাদি প্রশ্নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের ফলে লাহোর কংগ্রেসে (১৯২৯) গৃহীত 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর আদর্শটি ক্রমশ গৌণ হতে শুরু করে এবং সমগ্র দেশে এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ১৯৩৩-এর ২৬ জানুয়ারি 'চতুর্থ স্বাধীনতা দিবস' একমাত্র নওগাঁও ও সিলেট ছাড়া আসামের অন্যত্র তেমন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালিত হয়নি। অবশ্য আসামের তৎকালীন গভর্নর Michael Keane সহ অন্যান্য পদস্থ ব্রিটিশ আমলাদের চোখে, গান্ধির অস্পৃশ্যতা-বিরোধী ভূমিকা 'রাজনৈতিক চমক্' ছাড়া অন্য কিছু ছিল না *(The untouchability campaign is also looked on by nine people out of ten as a mere political stunt)*।

২২.৩.৫.৫ আন্দোলন প্রত্যাহার

আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে গান্ধিজি বারবার কারারুদ্ধ হন এবং অনশন সত্যাগ্রহ করেন, কারণ ১৯৩৩ সালের ৩১ মার্চ জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনেও স্বাধীনতার ধ্বনি শোনা গিয়েছিল। কিন্তু ভারত সরকার নিশ্চিত হতে শুরু করে যে, আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি গান্ধির আস্থা ক্রমশ কমছে এবং অস্পৃশ্যতা, 'হরিজন' ইত্যাদি প্রশ্নকে নিয়েই তিনি বেশি চিন্তিত। এরই জন্য ১৯৩৩ সালের ৮ মে গান্ধিজিকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে মন্তব্য করা হয় "...he (Gandhi) has lost all interest in Civil

Disobedience and intends to devote himself solely to work connected with the social and religious problems of untouchability"। ব্রিটিশ আমলাদের অনুমান অবশ্য মিথ্যে হয়নি, কারণ **জেল থেকে মুক্তি পেয়েই জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির কাছে গান্ধিজি ছয় সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য স্থগিত রাখার সুপারিশ করেন এবং সেইমত ১৪ জুলাই ১৯৩৩ থেকে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। আপাতদৃষ্টিতে আইন অমান্য আন্দোলন সর্বক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছিল**, কারণ 'পূর্ণ স্বরাজ' বা স্বাধীনতা প্রাপ্তি থেকে শুরু করে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী (যেটি ১৯২০-২২-এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় দৃষ্ট হয়েছিল) কিছুই এই আন্দোলনের ফলে মজবুত হয়নি। বরং এই আন্দোলনের পর বিভেদকামী নানারকম সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশের বিভিন্নস্থানে মাথাচাড়া দিয়েছিল। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে **লন্ডনে তৃতীয় ও শেষবারের মতো গোলটেবিল বৈঠক (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৩২)** আয়োজিত হলেও জাতীয় কংগ্রেসের কেউ সেখানে ছিলেন না। ঐতিহাসিক **তারাচাঁদ** উল্লেখ করেছেন, আন্দোলন স্থগিত হওয়ার ফলে চারদিকে বিশৃঙ্খলা, হতাশা ইত্যাদি লক্ষ করে কীভাবে গান্ধিজির ব্যর্থ নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সুভাষচন্দ্র বসু এবং প্যাটেল এক যৌথ বিবৃতিতে দাবি করেছিলেন ঃ *The time, therefore, has come for a radical reorganisation of the Congress on a new principal with a new method, for which a new leader is essential.* জওহরলাল নেহরুও 'Whither India' প্রবন্ধে গান্ধির সাথে মতপার্থক্য ব্যক্ত করেন। এই রকমের সমালোচনার মুখোমুখি হয়ে গান্ধিজি ১৯৩৩-এর ১৭ আগস্ট থেকে ১৯৩৪-এর মার্চ পর্যন্ত **গণ-আন্দোলনের পরিবর্তে ব্যক্তিগতভাবে আইন-অমান্যের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আসাম সহ অন্যত্র তেমন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেনি** এবং যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রথমে ছিল সেটিও ক্রমশ স্তিমিত হয়ে যায়। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে প্রায় সকল আইন অমান্যকারী জেল থেকে মুক্তি পান। ১৯৩৪-এর ৩১ মার্চ M. A. A. Ansari-র নেতৃত্বে আসন্ন কাউন্সিলের নির্বাচনে অংশগ্রহণে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নেয় এবং গান্ধির অনুমতি নিয়ে এ. আই. সি. সি. এটি অনুমোদন করে। **'স্বরাজ্য দল' আবার নবজন্ম পায়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নবীনচন্দ্র বরদোলই, তরুণরাম ফুকন সহ অনেকেই আবার উৎসাহিত হয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে এগিয়ে আসেন। অবশেষে গান্ধিজির সুপারিশ অনুযায়ী, জাতীয় কংগ্রেস ২০ মে ১৯৩৪ আনুষ্ঠানিকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়।**

যদিও আইন অমান্য আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছিল, তথাপি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এটি ছিল **একটি গুরুত্বপূর্ণ 'মাইল ফলক'। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ গান্ধিজি রীতিমতো প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কংগ্রেস দল ত্যাগ করেন** এবং জাতীয় আন্দোলনকে নীচে থেকে উপরে গড়ে তোলার জন্য (bottom-up) একাধিক সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। এর মধ্যে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির মঙ্গলের প্রশ্নটিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, **গান্ধিজি মাত্র একবার কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন (১৯২৪-এ বেলগাঁও কংগ্রেসে) এবং গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিলেন না।** তথাপি ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত (এমনকি কংগ্রেস সদস্যপদ ত্যাগের অধ্যায়ের পরেও) তিনিই ছিলেন কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতা ও সর্বময় কর্তা, কারণ **১৯২০-র দশক থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায়টি নানা কারণে 'গান্ধি যুগ' নামেই পরিচিত।** আইন অমান্য আন্দোলন যখন স্তিমিত হয়ে আসছিল, সেই পর্বে 'হরিজন' প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে ১০ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল ১৯৩৪ গান্ধিজি দ্বিতীয়বার মোট দশদিনের জন্য আসাম সফরে এলেন।

২২.৪ গান্ধিজি'র দ্বিতীয়বার আসাম সফর (১৯৩৪)

'হরিজন' আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২০ এপ্রিল ১৯৩৪-এর মধ্যরাতে গান্ধিজি ট্রেনে আসামে আসেন এবং ড. হরেকৃষ্ণ দাস-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন। দীর্ঘ দশদিন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সফরে গান্ধিজি যেসব স্থানে গিয়ে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এবং 'হরিজন' কল্যাণে মানুষকে উদ্দীপ্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেই স্থানগুলি এইরকম ঃ

১১ এপ্রিল ঃ রূপসি, ধুবরি, বরপেটা, গৌরীপুর, বাঁশবাড়ি, সরভোগ, হাউলি, সরুপোতা।

১২ এপ্রিল ঃ গোরেশ্বর, টাংলা, উদলগুড়ি, বিন্দুকুড়ি, রঙ্গাপাড়া, তেজপুর।

১৩ এপ্রিল ঃ গুয়াহাটিতে জনসভা, সেবা আশ্রমের উদ্বোধন, কুষ্ঠরোগীদের বিশ্রামাগার এবং হরিজনদের আবাসস্থল পরিভ্রমণ।

১৪ এপ্রিল ঃ গুয়াহাটিতে মহিলা ও মাড়োয়ারি ব্যবসাদারদের সভায় ভাষণদানের পর চাপারমুখ, ক্ষেত্রি, নওগাঁও ও ফুরকাটিং-এ জনসংযোগ।

১৫ এপ্রিল ঃ গোলাঘাটের জনসভায় ভাষণদানের পর গণকপুখারি, দেরগাঁও এবং জোড়হাট।

১৬-১৭ এপ্রিল ঃ জোড়হাটে অবস্থান এবং 'হরিজন' নেতৃত্বের সাথে দীর্ঘ আলাপ।

১৮ এপ্রিল ঃ আমেরিকান মিশনারিদের সাথে কথাবার্তার পর চারিং এবং শিবসাগর।

১৯ এপ্রিল ঃ ডিব্রুগড়, ডিমু, কোয়াং, দিহিং পরিদর্শন।

২০ এপ্রিল ঃ চাবুয়া ও তিনসুকিয়া। তিনসুকিয়া থেকে ট্রেনে বিহার যাত্রা।

২২.৪.১ 'হরিজন' কল্যাণ ও অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন

১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীদের ধর্ম, বর্ণ, জাত ইত্যাদিতে চিরবিভক্ত রাখার কৌশল হিসাবে 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' ঘোষণা করার পরই গান্ধির চেতনায় অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সংগ্রাম এবং 'হরিজন' কল্যাণের প্রশ্নটি প্রধান স্থান দখল করে। যদিও আসামে পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতকে শংকরদের ও মাধবদেব প্রচারিত বৈষ্ণব আদর্শের জন্য অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি সমস্যা তেমন তীব্র ছিল না, তথাপি হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে মন্দিরে প্রবেশাধিকার ইত্যাদি থেকে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষকে বঞ্চিত করা হত। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে গান্ধিজি 'হরিজন সেবক সংঘ' প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই আসামে পীতাম্বর দেব গোস্বামী নামে জনৈক সত্র-প্রধানের উদ্যোগে সংঘটিত প্রাদেশিক শাখা গঠিত হয়। ১৯৩৪ সালে গান্ধিজি আসাম পরিভ্রমণের আগে থেকেই পীতাম্বরদেব গোস্বামীর নেতৃত্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকে এবং ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। এই প্রসঙ্গে 'আসাম প্রাদেশিক হরিজন সেবক সংঘ' কীভাবে আসামের উপজাতি জনগোষ্ঠী ও চা-বাগানের তথাকথিত 'কুলি'দের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল সেই অধ্যায়ও কম আকর্ষণীয় নয়। হিন্দু ধর্মের স্বার্থে এই কাজ করার প্রেক্ষিতে তৎকালীন 'হিন্দু মহাসভা'ও নানাভাবে সাহায্য করেছিল এবং 'হরিজন সেবক সংঘ'র তহবিলেও ২০,০০০ টাকা 'হিন্দু মহাসভা' দান করেছিল। ১৯৩৪ সালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় গান্ধি ১০ দিনের পরিভ্রমণের সময় আসামে ঐ আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে এবং 'হরিজন' কল্যাণ তহবিলে আরও ২০,০০০ টাকা দান সংগৃহীত হয়। অনুন্নত শ্রেণির জন্য অবৈতনিক শিক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, পানীয় জল, ওষুধ ইত্যাদি সরবরাহের জন্য সংগৃহীত তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়। 'হরিজন সেবক সংঘ'র উদ্যোগে অনুন্নত শ্রেণির জন্য (বিশেষত চা-শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য) আসামের বিভিন্ন স্থানে শুধু যে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নয়, গুয়াহাটিতে একটি

শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে এইচ. কে. দাস, বি. বরুয়া, জে. সি. মেধি, গৌরীকান্ত তালুকদার-এর মতো সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ক্লাস নিতেন। সমাজের নিপীড়িত শ্রেণির উদ্যোগে আরও কয়েকটি সংগঠনও ঐ সময় গুয়াহাটিতে গড়ে উঠেছিল।

সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের মতো মহিলারাও যুগ ধরে অনাদৃত, অবহেলিত বলে ১৯৩৪ সালে গান্ধিজি দ্বিতীয়বার আসাম সফরের সময় উভয় অংশের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। গোঁড়া ব্রাম্মণ সম্প্রদায়ের মহিলা হওয়া সত্ত্বেও জোড়হাটের গিরিবালা দেবী গান্ধিজির ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মন্দিরের দ্বার গান্ধিজিকে দিয়েই তিনি 'হরিজন'দের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। 'হরিজন' কল্যাণের কাজে জোড়হাটের স্বর্ণলতা দেবী এমন আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে তিনি 'আসামের কস্তুরবা' নামে পরিচিত। নলবাড়ির উত্তমাসুন্দরী, বিদ্যাভারতী প্রভৃতি মহিলারা 'হরিজন' সহ সকল বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জন্য 'মহামণ্ডপ' তৈরি করেছিলেন। গোলাঘাটের স্বর্ণলতা বরুয়া গান্ধি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দিকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য যে উদ্দীপনা গান্ধিজি আসামে সৃষ্টি করেছিলেন সেটি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। আইন ও সাংবিধানিক রক্ষাকবচের অভাবে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন অথবা 'হরিজন' কল্যাণের উদ্যোগ ১৯৩৬ সাল থেকেই স্তিমিত হতে শুরু করে। তাছাড়া জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে হিন্দুধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করার কর্মসূচি নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়।

২২.৫ আসামে জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানে বামপন্থীদের ভূমিকা (Role of the Leftists in the Nationalist Upsurge in Assam)

২২.৫.১ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও মার্কসবাদী দর্শনের প্রভাব

ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির (সি.পি.আই.) জন্মলগ্ন নিয়ে কমিউনিস্টদের মধ্যেই মতদ্বৈধতা আছে। একটা অংশের (সি.পি.আই.(এম) সহ অন্যান্যদের) মতে, ১৭ অক্টোবর ১৯২০-তে রাশিয়ার তাসখণ্ডে, অর্থাৎ প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। অন্য একটা অংশের (সি.পি.আই. সহ অন্য কয়েকটি দল) ধারণা, ভারতের মাটিতেই ২৬ ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে প্রকৃতপক্ষে পার্টি জন্মলাভ করে। ১৯২০ বা ১৯২৫ যাইহোক, ব্রিটিশ শক্তি যে নবজাত কমিউনিস্ট পার্টিকে তাদের ঘোরতর শত্রুপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল সেটি ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে একটার পর একটা তথাকথিত 'ষড়যন্ত্র মামলা'য়

(যেমন পেশওয়ার, কানপুর, মিরাট ইত্যাদি মামলা) প্রমাণিত। আমরা আগেই লক্ষ করেছি, গান্ধিজির নেতৃত্বে ১৯২০'র দশকে অসহযোগ কিংবা ১৯৩০'র দশকে আইন অমান্য আন্দোলন যে মুহূর্তে তুঙ্গে উঠেছে, সেইসময় নানা অছিলায় আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে। গান্ধিজির ভয় ছিল, আন্দোলন দীর্ঘায়িত হলে নেতৃত্ব বামপন্থীদের হাতে চলে যেতে পারে। জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই বামপন্থী শক্তি ক্রমশ দানা বাঁধছিল এবং গান্ধিজির অনুগত প্রিয়জনদের মধ্যে কয়েকজন সেইসময় বামপন্থী চিন্তার শরিক ছিলেন। যেমন, জওহরলাল নেহরু প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ব্রিটিশ-আমলাদের চোখে "the high-priest of communism" হিসেবে চিত্রিত এবং এজন্য বারবার তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে। অবশ্য গান্ধিজি ব্রিটিশদের এই আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন করার জন্য ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ সালে *Bombay Chronicle* পত্রিকায় কথোপকথনের সময় মন্তব্য করেছিলেন ঃ "His (Jawaharlal's) communist views need not...frighten anyone"। আসলে, আইন অমান্য আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত এবং অবশেষে প্রত্যাহারের পর ভারতবর্ষের অধিকাংশ শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে গান্ধি নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা এবং 'সন্ত্রাসবাদী' বা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের স্থলে গঠনমূলক মার্কসবাদী দর্শনের প্রভাব লক্ষ করা যায় এবং আসাম এর ব্যতিক্রম ছিল না।

২২.৫.২ আসামে বামপন্থী চিন্তা

১৯২৭ সালে গুয়াহাটির 'কটন কলেজ'-এর কিছু ছাত্র বাংলার কৃষক-মজদুর দলের (Workers' and Peasants' Party) নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছিলেন এবং তাঁদের কাছ থেকেই প্রগতিশীল ও কমিউনিস্ট আদর্শে রচিত সাহিত্যপত্র ইত্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমেই যাত্রার সূচনা হয়েছিল। ১৯৩৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি দরং জেলার ডেপুটি কমিশনার (D. C.) এক চিঠিতে আসামের চিফ্-সেক্রেটারিকে লিখেছিলেন, কীভাবে তাঁর জেলার শ্রদ্ধেয় ও গণ্যমান্য (respectable and reputable) ব্যক্তিরা ক্রমশ মার্কসবাদী দর্শনে প্রভাবিত হচ্ছেন (the tendency in future will be towards communism in one form or another)। ঐ চিঠিতেই D. C. উল্লেখ করেছিলেন, কীভাবে কংগ্রেস দল ক্রমশ কমিউনিস্টদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছে। D. C.-র নিজের ভাষায় ঃ

> *It has been obvious for years that the Congress has gradually been becoming more and more sympathetic (to put it mildly) to*

the Communist propaganda. (Political History of Assam, vol. II, p. 247.

২২.৫.৩ জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রীরা

জন্মলগ্ন থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তথাকথিত 'ষড়যন্ত্র' মামলাসহ নানা আক্রমণের শিকার। **১৯৩৪ থেকে জুলাই ১৯৪২ পর্যন্ত সি.পি.আই. নিষিদ্ধ ও বেআইনি ছিল**। কমিউনিস্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ সংগ্রামী মানুষকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকেই (১৯৩৫ সালে 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' বা 'কমিন্টার্ন'-এর নির্দেশ অনুযায়ী) কাজ করতে হত। আসলে, ১৯৩৪-এ আনুষ্ঠানিকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের পর **'ফেবিয়ানপন্থী' সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরেই 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি' (সি.এস.পি.) গঠন করার পর (প্রথম সম্মেলন ২২-২৩ অক্টোবর ১৯৩৪ বোম্বাই) কমিউনিস্টরা দলে দলে 'সি.এস.পি.'র সদস্য হয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নীতি-নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।** 'সি.এস.পি.'র মাধ্যমে 'এ.আই.সি.সি.'র অভ্যন্তরে ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্টরা ২০টি সদস্যপদ পান। সি.এস.পি.-র উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ (১৯০২-১৯৭৯), আচার্য নরেন্দ্র দেব (১৮৮৯-১৯৫৬), রামমনোহর লোহিয়া (১৯১০-১৯৬৭), যোগেন্দ্র শুক্লা (১৮৯৬-১৯৬৬), অশোক মেহেতো (১৯১১-১৯৮৪), কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় (১৯০৩-১৯৮৮), মিনু মাসানি (১৯০৫-১৯৯৮) প্রমুখ। এঁরা প্রায় সকলেই গান্ধিবাদী হলেও গান্ধিজির মধ্যযুগীয় কিছু চিন্তা-ভাবনার বিরোধী, আবার অন্যদিকে **সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও শ্রেণি সংগ্রামের বিরোধী এবং এখানেই কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের সাথে সি.এস.পি.-র তফাত। তবে আদর্শগত বিরোধ যতই থাক, ১৯৩০ এর দশকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রগতিশীল প্রতিটি কর্মসূচির পিছনে সি.এস.পি. ও কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল বিরাট**। যদিও সুভাষচন্দ্র বসু কিংবা জওহরলাল নেহরুর মতো ব্যক্তি সি.এস.পি. বা সি.পি.আই.-এর সদস্য ছিলেন না, তথাপি জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এই শক্তির সাথে সবসময় সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন এবং জাতীয় আন্দোলনে বামপন্থী দিশার উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। **১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও সি.এস.পি.'র সাথে কমিউনিস্টদের আদর্শগত মতপার্থক্য শুরু হয় এবং কমিউনিস্টরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে সি.পি.আই.-এর পতাকা নিয়েই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন**। অন্যদিকে, স্বাধীনোত্তর পর্বে সি.এস.পি. নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস দল ত্যাগ করে বিভিন্ন দলে যোগদান করেন, যার মধ্যে সোস্যালিস্ট পার্টি ছিল প্রধান।

২২.৫.৪ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 'আর.সি.পি.আই.'-এর প্রভাব

জাতীয় কংগ্রেসের সাথে সি.পি.আই.-এর 'পপুলার ফ্রন্ট' তৈরি করার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১-৭৪)-এর নেতৃত্বে ১৯৩৪ সালেই 'কমিউনিস্ট লিগ' নামে একটি আলাদা দল গঠিত হয়, যেটি Revolutionary Communist Party of India বা RCPI নামে ১৯৪৩ থেকে পরিচিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের সাথে কোনোরকম সহযোগিতার বিরোধী ছিল এই দলটি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ১৯৩০-এর দশকে এই দলটির সমধিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর.সি.পি. আই. অবশ্য কংগ্রেসের সাথে ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশ নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর.সি.পি.আই.-এর অভ্যন্তরে নানারকম দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং দলটির সাধারণ সম্পাদক পান্নালাল দাশগুপ্ত ১৯৪৮ সালে তাঁর অনুগতদের নিয়ে আর একটি আর.সি.পি.আই. গঠনসহ নানা উপদলে বিভক্ত হওয়ার ফলে দলটি ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। যাইহোক, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ১৯৩৭ সালের শেষদিক থেকে বিভিন্ন দলের মার্কসীয় চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। 'কমিউনিস্ট লিগ'-এর নেতা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতায় 'কটন কলেজ'-এর ছাত্ররা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে ১৯৩৮ সালের প্রথমদিকে হরেন কলিতাকে সম্পাদক করে 'কমিউনিস্ট লিগ'-এর আসাম শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য যাঁরা সেইসময় অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে হরিদাস ডেকা, দেবেন্দ্রনাথ শর্মা, গোকুল মেধি, তারাচরণ মজুমদার, উপেন শর্মা, খগেন বরবরুয়া প্রমুখ নাম উল্লেখযোগ। মার্কসীয় দর্শন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে গুয়াহাটির পানবাজারে 'র‍্যাডিক্যাল ইনস্টিটিউট' নামে একটি পাঠচক্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮-৪২ 'কটন কলেজ'-এর ছাত্র ইউনিয়ন এই র‍্যাডিক্যালপন্থী ছাত্ররাই দখল করেছিলেন এবং ১৯৩৯-৪০ সালে এঁরাই Assam Provincial Students' Federation তৈরি করেন। এককথায়, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মার্কসবাদী আদর্শে প্রথম সংগঠিত করার ক্ষেত্রে 'কমিউনিস্ট লিগ'/'আর.সি.পি.আই.'-এর একটা ভূমিকা ছিল। অবশ্য কৃষকদের 'কমিউনিস্ট লিগ'-এর পতাকাতলে আনার উদ্যোগও একইসাথে অব্যাহত ছিল এবং ১৯৪০ সালে কৈদারনাথ গোস্বামীকে সভাপতি এবং উপেন দাসকে সম্পাদক করে 'কৃষক বানুয়া পঞ্চায়েত' গঠিত হয়েছিল।

২২.৫.৫ 'সি.এস.পি.'র প্রভাব

২২.৫.৫.১ ছাত্র-যুবদের মধ্যে প্রভাব

১৯৩৮ সালে সিলেট সহ গোলাঘাট, ডিব্রুগড় ও গোয়ালপাড়ায় কমিউনিস্ট প্রভাবিত 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি' (সি.এস.পি.) সক্রিয় ছিল। গোলাঘাটের যদুনাথ শইকিয়া (১৯০৯-১৯৮০) (যিনি বেনারসে ছাত্রাবস্থায় কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং গোলাঘাটে Progressive Literary Club তৈরি করেছিলেন) এবং ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (১৯১২-১৯৭২), ডিব্রুগড়ের নীলমণি বরঠাকুর (১৯১২-২০০১) এবং বিনয়ভূষণ চক্রবর্তী (১৮৯৭-১৯৬৭), বাংলার পবিত্র রায় (যিনি সেই সময় গোয়ালপাড়ায় থাকতেন) এবং গুয়াহাটির জনপ্রিয় যুবনেতা শ্রীমন প্রফুল্ল গোস্বামী—কমিউনিস্টদের প্রচাবিত 'জাতীয় ফ্রন্ট'-এর সমর্থক ছিলেন এবং শুধুমাত্র চারটি জেলায় সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র আসামে সি.এস.পি.-র প্রাদেশিক শাখা গঠনে প্রভূত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এঁদেরই উদ্যোগে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সি.এস.পি.-র নামে কমিউনিস্ট মতাদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। আসামের সি.এস.পি.-র প্রাদেশিক শাখা গঠনকে অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ 'ট্রয়ের ঘোড়া'র সাথে তুলনা করেছেন ঃ "It was, of course, a Trojan horse hiding in its belly the first CPI group of the Brahmaputra Valley"। ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকার মধ্যে গোলাঘাটে প্রথম ১৯৩৯ সালের ৭ নভেম্বর একটি জনসভার মাধ্যমে 'নভেম্বর বিপ্লব' দিবস উদযাপিত হয় এবং হবেন দুয়ারা, খগেশ্বর তামুলি, চিদানন্দ শইকিয়া, সদানন্দ চালিহা প্রভৃতি তরুণ কমিউনিস্টরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। গোলাঘাটের কাছে মিসামারাতে ২৯-৩১ জানুয়ারি ১৯৪০-এ বাংলার সোমনাথ লাহিড়ির (১৯০৯-১৯৮৪) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে শ্রীমন প্রফুল্ল গোস্বামী 'আসাম প্রদেশ সি.এস.পি.'র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। বাংলার আরও যে দু'জন কমিউনিস্ট নেতা ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন বিশ্বনাথ মুখার্জি এবং সেই সময়ের ছাত্রনেতা অমিয় দাসগুপ্ত। ছাত্র সমাজের মধ্যে গোপনে মার্কসাবাদী আদর্শ প্রচারের সাথে সাথে আসামে সি.এস.পি. গান্ধি-নেতৃত্বের ত্রুটির দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ১৯৩৬ সালের ১২ আগস্ট 'স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতি'কে ধ্রুবতারা করে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লখনউ কংগ্রেসের (১৯৩৬) এর সাথে All India Students Federation/AISF বা 'ভারতের ছাত্র ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠার পর দেশের অন্যান্য অংশের মতো আসামেও ছাত্র সমাজের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। 'আসাম ছাত্র সম্মিলন' জোড়হাটে ১৯৩৯-এর এপ্রিলে সম্মেলনের

মধ্যে দিয়ে AISF-এর অঙ্গীভূত হয় এবং গৌরীশংকর ভট্টাচার্য (১৯১৫-২০০২) সাধারণ সম্পাদক এবং সংগঠনের মুখপত্র *মিলন*-এর সম্পাদনার দায়িত্বে দধি মোহান্ত (১৯১৫-১৯৮৭) নির্বাচিত হন। যদিও আত্মগোপনকারী বাংলার সি.পি.আই. নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী AISF নেতা অমিয় দাসগুপ্ত সাংগঠনিক স্বার্থে আসামে অবস্থান করছিলেন, সরকারি নির্দেশে ১৯৪০-এর জুন মাসে তাঁকে আসাম থেকে বহিষ্কার করা হয়। মার্কসবাদী আদর্শকে আসাম সরকার কত বিপজ্জনক মনে করত এই ঘটনায় সেটি প্রমাণিত হয়। নীলমণি বরঠাকুর, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য সহ অনেক ছাত্র-নেতার গতিবিধির উপর ব্রিটিশ গোয়েন্দা-দপ্তর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে শুরু করে। গুয়াহাটিতে ছাত্র যুবকদের জন্য Progressive Union নামে একটি মার্কসবাদী পাঠচক্রের প্রতিও ব্রিটিশ পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি পড়ে। যদুনাথ শইকিয়ার উদ্যোগে জোড়হাটের জে. বি. কলেজে প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ গড়ে ওঠে এবং দধি মোহান্ত, কীর্তি বরদোলই, ভদ্রকৃষ্ণ গোস্বামীর মতো ছাত্র-নেতা তৈরি হয় যাঁরা পরবর্তী সময়ে আসামে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এককথায়, ১৯৩৮ সাল থেকে আসামের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-যুবদের মধ্যে মার্কসবাদী দর্শনের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে **সবকিছুই হত সি.এস.পি.-র ছত্রতলে, কারণ সি.পি.আই. সেইসময় ছিল নিষিদ্ধ দল।**

২২.৫.৫.২ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কৃষক ও সি.এস.পি.

১৯৩৭ সালের নভেম্বরের শেষদিকের আসাম সফরে এসে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু ব্রিটিশ শাসনে আসামের কৃষকদের দুর্গতির প্রশ্নটির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপের জন্য সকলের কাছে আহ্বান রেখেছিলেন। জোড়হাট থেকে ১ ডিসেম্বর ১৯৩৭ তৎকালীন আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি বিষ্ণুরাম মেধির কাছে লেখা এক পত্রে নেহরু এইরকম পরামর্শ দিয়েছিলেন ঃ

> *The basis of your organisation will inevitably be the peasantry and, therefore, you should keep the agrarian reforms ever before you and discuss with the peasantry.*

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গান্ধিজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের ১১ দফা কর্মসূচির মধ্যে ভূমি রাজস্ব ৫০ শতাংশ কমানো থেকে শুরু করে কৃষকের স্বার্থে যেকটি দাবি স্থান পেয়েছিল তার বেশিরভাগটাই সম্ভব হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন কিছু সদস্যের ক্রমাগত চাপের

জন্য। আসলে, ১৯৩০-এর শুরু থেকেই আসামের কৃষকের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠছিল। বামপন্থী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সি.এস.পি. সদস্যদের মধ্যে ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, জিউরাম হাজারিকা, প্রেমানন্দ শর্মা ১৯৩৬ সালে কৃষকের স্বার্থে গোলাঘাটে 'হালোয়া সংঘ' গঠন করেন এবং ১৯৩৭ সালে নীলমণি ফুকন-এর সভাপতিত্বে এটির প্রথম অধিবেশনেরও আয়োজন করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে সংগঠনের নামটি যদুনাথ শইকিয়ার (১৯০৯-১৯৮০) উদ্যোগে ১৯৩৮ সালে পরিবর্তন করে 'গোলাঘাট জিলা কৃষক সভা' রাখা হয়, সর্বভারতীয় সংগঠনের সাথে সম্পর্ক রাখার উদ্দেশ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কৃষক সংগঠন All India Kisan/(Krishak) Sabha/AIKS বা 'সারা ভারত কৃষক/কিষাণ সভা'র জন্ম হয়েছিল ১৯৩৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের লখনউ অধিবেশনে (পরবর্তী সময়ে এই দুটি সংগঠনই বামপন্থীদের দখলে চলে যায়)। ১৯৩৬ সালে AIKS-এর সভাপতি নির্বাচিত হন স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, এবং সি.এস.পি.-র অন্যান্য প্রভাবশালী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এন. জি. রঙ্গা, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, রামমনোহর লোহিয়া, বঙ্কিম মুখার্জি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। আসামে গোয়ালপাড়া ও সিলেটে কৃষকের দুর্দশার কারণ ছিল জমিদারদের লাগামহীন অত্যাচার (ঐ দুটি স্থানে জমিদারী ব্যবস্থা কায়েম ছিল)। আসামের অন্যত্র ব্রিটিশদের ক্রমবর্ধমান ভূমি রাজস্বের দাবি, জমি উন্নয়নে উদাসীনতা, বন কর, হাট কর, নজর ইত্যাদি নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার ফলে কৃষকের অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। আসাম কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে উভয় উপত্যকায় কৃষকের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য আইন অমান্য আন্দোলনের পরবর্তী স্তরে বিভিন্ন রায়ত সভার স্বতন্ত্র অবস্থানের অবসান ঘটিয়ে All Assam Rayat Sabha এবং অবশেষে AIKS-র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল এবং কৃষকের মুক্তির প্রশ্নটি কিছু সময়ের জন্য আসামে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪০ সালের ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শালকোচায় নিখিল গোয়ালপাড়া কৃষক সমিতির পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠনের সভাপতি স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী। **কংগ্রেসের আওতাধীন ঐ সংগঠনের এটিই ছিল প্রকৃতপক্ষে শেষ অধিবেশন। এরপর কৃষকের স্বার্থ নিয়ে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে কংগ্রেস নেতৃত্ব অনিচ্ছুক হওয়ার ফলে কিষাণ সভা ক্রমশ কমিউনিস্ট আদর্শের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে এবং বাংলা থেকে বহিষ্কৃত মার্কসবাদী পবিত্র রায় সহ প্রাণেশ বিশ্বাস, নন্দেশ্বর তালুকদার (১৯২১-২০০৩), জলবিন্দু সরকার প্রভৃতি কমিউনিস্টরা আসামে কৃষক সংগ্রাম পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা নেন।**

কমিউনিস্টদের চোখে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার মতো অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

২২.৫.৫.৩ সুরমা উপত্যকায় সি.এস.পি. ও কৃষক

১৯৩৫ সালের ২৬ মে সুরমা উপত্যকায় সি.এস.পি. গঠিত হয়েছিল এবং সুরেশচন্দ্র দেব সম্পাদকের দায়িত্ব পান। সমাজতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সুরমা উপত্যকায় সি.এস.পি. সদস্যদের জমিদার-বিরোধী আন্দোলন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বলগ্নে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কৃষক সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে 'লাঙ্গল যার, জমি তার' ধ্বনি প্রভূতভাবে সাহায্য করে। ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত 'সুরমা ভ্যালি প্রাদেশিক কৃষক সম্মিলন'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে সর্বভারতীয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ও স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সময় সুনামগঞ্জের প্রগতিশীল কংগ্রেস প্রার্থী করুণাসিন্ধু রায় আসাম বিধানসভায় কৃষকের স্বার্থে নতুন আইন প্রণয়নের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। আর একজন কংগ্রেস নেতা বীরেশচন্দ্র মিশ্র (যদিও পরবর্তী সময়ে এঁরা সকলেই মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন) ১১ জানুয়ারি ১৯৩৮ সিলেটের এক জনসভায় জমিদারদের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে আইনানুগ পদ্ধতিতে লড়াই-এর জন্য একটি বড়ো তহবিল গঠনের ডাক দিয়েছিলেন। গান্ধিজি জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না চাইলেও সিলেট ও গোয়ালপাড়ার সি.এস.পি. নেতৃবৃন্দ সেই আবেদন অগ্রাহ্য করেছিলেন। সুরমা উপত্যকায় কৃষক উত্তেজনা দিনদিনই তুঙ্গে উঠছিল। ১৯৩৮-এর পর সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সুরমা উপত্যকার ৩০০ কৃষকের এক মিছিল কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কংগ্রেস পতাকা সামনে রেখে রাজধানী শিলং-এ শাদুল্লাহ সরকারের কাছে কৃষকদের কিছু ন্যায্য দাবি পেশ করার জন্য যাত্রা শুরু করায় প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য সবসময় জমিদারদের পক্ষ নিয়ে কৃষকদের উপর অত্যাচার করতে কসুর করেনি। ১৯৩৮ সালে সিলেটের ভাটিপাড়া কিংবা সুনামগঞ্জ মহকুমার সেলবোর এলাকায় জমিদারের লেঠেল বাহিনীর সাথে কৃষকদের সংঘর্ষ শুরু হলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে ব্রিটিশের সশস্ত্র পুলিশ ছুটে গিয়েছিল। বীরেশ মিশ্র, প্রাণেশ বিশ্বাস, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য প্রভৃতি প্রথিতযশা আসামের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে সুরমা উপত্যকার বীর কৃষকদের সংগ্রাম AIKS-এর উদ্যোগে একটি ছোটো পুস্তিকায় *(Struggle of the Surma Valley Peasantry)* লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মণিপুরের প্রবাদপ্রতিম কমিউনিস্ট নেতা হিজম্ ইরাবত্ সিংহ (১৮৯৬-১৯৫১) কৃষক আন্দোলনের সূত্রে

শিলচর সহ বিভিন্ন জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় বীরেশ মিশ্র ও জ্যোতির্ময় নন্দীর সাথে গভীর সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে সম্ভাবনাময় আন্দোলনে ছেদ ঘটে। ১৯৪০ সালে সিলেটে 'ভারত রক্ষা আইন' প্রয়োগ করে প্রথমে যে ১৫ জন কৃষক আন্দোলনের নেতাকে আটক করা হয়, তার মধ্যে ৯ জন ছিলেন কমিউনিস্ট (যদিও সি.এস.পি.'র ছত্রতলে)। পরবর্তী সময়ে কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের অনেককেই ব্যাপকভাবে গ্রেফতার শুরু হয়।

২২.৫.৬ আসামে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন

২২.৫.৬.১ 'এ. আই. টি. ইউ. সি.'-র প্রতিষ্ঠা

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে দেশের প্রাচীনতম ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন "All India Trade Union Congress" (AITUC) ১৯২০ সালে বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর ভার্সাই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, পৃথিবীতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একদিকে যেমন 'লিগ অব নেশনস্' গঠিত হয়, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রমিক-সংগঠনকে একটি পতাকার নীচে সমবেত করার লক্ষ্যে 'লিগ'-এর শাখা হিসাবে 'International Labour Organization' (ILO)-র জন্ম হয়। ILO-তে অংশগ্রহণ এবং ব্রিটিশ প্রাধান্য খর্ব করার লক্ষ্যেই বোম্বাই-এর Joseph Baptista (১৮৬৪-১৯৩০) উদ্যোগে AITUC গঠিত হয়। Baptista (১৯২৫-এ বোম্বাই-এর মেয়র) ছিলেন লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের (১৮৫৬-১৯২০) একান্ত অনুরাগী এবং কেউ কেউ মনে করেন, তিলকের বিখ্যাত উক্তি 'স্বারাজ আমার জন্মগত অধিকার'-এর প্রকৃত স্রষ্টা ছিলেন Baptista নিজে যিনি সকলের কাছে 'কাকা' নামে পরিচিত ছিলেন। আসলে ILO আহূত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যেই ১৯২০-তে AITUC গঠিত হয়েছিল এবং প্রথমদিকে জাতীয় কংগ্রেসের ধ্বনিই এই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে গুরুত্ব পেত।

২২.৫.৬.২ ব্রিটিশ শ্রমিক নেতাদের পরামর্শ ও ধর্মঘট

যদিও জাতীয় কংগ্রেস AITUC গঠন করেছিল, আসামে কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রশ্নে প্রথমদিকে তেমন আগ্রহ দেখাননি। ফলে, চা-বাগানের শ্রমিক থেকে শুরু করে অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা অবর্ণনীয় দুর্দশা সত্ত্বেও APCC'র কাছ থেকে সাহায্য-সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত ছিলেন। ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের আইনগত বৈধতাও প্রথমদিকে ছিল না। ১ জুন

১৯২৭ সাল থেকে ভারতের সর্বত্র Indian Trade Unions Act, 1926 (Act XVI of 1926) বলবৎ হওয়ার পর থেকে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ১৯২৭ সালে কানপুরে অনুষ্ঠিত AITUC'র সম্মেলনে ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে ব্রিটিশ এম.পি. Purcell এবং ব্রিটিশ শ্রমিক সংগঠনের নেতা Hallswarth ভারতে আসার পর *অসমিয়া* পত্রিকার সম্পাদক অমিয়কুমার দাশ তাঁদের আসাম পরিদর্শনে আমন্ত্রণ জানান। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে আসামের বিভিন্ন চা-বাগান পরিভ্রমণের সময় শ্রমিকদের 'horrible condition' (তাঁদের ভাষায়) দেখে বিস্মিত হন। এছাড়া মার্ঘারিটার কয়লা খনি, ডিগবয়ের তেল কূপে নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর ২২ ডিসেম্বর ১৯২৭-এ গুয়াহাটির কার্জন হলে একটি জনসভায় Purcell এবং Hallswarth বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের সাথে আসামের শ্রমিকদের তুলনা করে অবিলম্বে বঞ্চিত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই ঘটনার পরেই আসামে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পরবর্তী সময়ে AITUC নেতৃত্ব হরিকৃষ্ণ সাহু'কে আসামে পাঠিয়েছিলেন চা-বাগান শ্রমিকদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে। ১৯২৮-২৯ সালে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ডিব্রুগড়, শিবসাগর, লখিমপুর, নওগাঁও প্রভৃতি এলাকায় চা-শ্রমিকদের হঠাৎ-ধর্মঘট থামাতে ব্রিটিশ পুলিশ কমপক্ষে ছয়বার হস্তক্ষেপ করেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সম্পাদক কেদারনাথ গোস্বামীকে কারান্তরালে দিন কাটাতে হয়েছিল। ১৯২৮ সালে ডিব্রু-সাদিয়া রেলের ৪৩০ জন শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ১৭দিন ব্যাপী ধর্মঘট করে সফল হয়েছিলেন। একইভাবে ১৯২৯ সালে ডিগবয় তেল-কূপের ৮০০ জন শ্রমিক হঠাৎ-ধর্মঘটের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। **যেহেতু আসামের কংগ্রেস নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণির ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না, এরই জন্য AITUC-তে কমিউনিস্টদের পক্ষে প্রাধান্য বিস্তার তুলনামূলকভাবে সহজ হয়।**

২২.৫.৬.৩ অরুণ কুমার চন্দ'র সতর্কীকরণ

১৯৩০-এর দশকে বিশেষত আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের পর, শ্রমিক উত্তেজনা এত তুঙ্গে উঠেছিল যে সেই সময় বামপন্থী চেতনা-দৃপ্ত শিলচরের তরুণ ব্যারিস্টার অরুণ কুমার চন্দ্র (১৭.৪ দ্রষ্টব্য) এটিকে শ্রেণি সংগ্রামের ভয়াবহ ইঙ্গিত বলে আসাম বিধানসভায় (১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭) আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ঃ

The spectre of class war is worrying the world and I can see that this spectre is looming larger and larger on the horizons of this country everydy। শ্রীচন্দ্রের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না সমকালীন ঘটনাবলী সেটিই প্রমাণ করে। কয়েক বছর আগে ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরে সুভাষচন্দ্র বসু জামশেদপুর থেকে চৌকা সিংকে তিনসুকিয়া পাঠিয়েছিলেন Assam Oil Company (AOC)-র শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত করতে। চৌকা সিং এবং স্বামী জিতানন্দ হিন্দি ও অসমিয়া ভাষায় প্রচারপত্র বিলি সহ সভা সমিতির মাধ্যমে AOC শ্রমিকদের নানাভাবে সচেতন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে ঐ শ্রমিকরা আলোড়ন সৃষ্টিকারী আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন।

২২.৫.৬.৪ ধুবরি ও ডিব্রুগড় শ্রমিকদের ধর্মঘট

১৯২৫ সালে **ধুবরিতে সুইডিশ মালিকানাধীন দেশলাই কারখানা** প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রায় পাঁচশ শ্রমিক সেখানে কর্মরত ছিলেন। মালিকদের বিরাট মুনাফা সত্ত্বেও শ্রমিকদের বেতন বাড়ার পরিবর্তে দিনদিন কমতে শুরু করে। ১৯৩৫ সালে Bengal Labour Association **বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তীকে** আসামে পাঠান ঐসব দেশলাই শ্রমিকদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে। অর্থনৈতিক স্বার্থে লড়াইয়ের সাথে চেতনার মান উন্নত করার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে মার্কসবাদ প্রচারেও বিপিন চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ৬ জানুয়ারি ১৯৩৬ তাঁরই নেতৃত্বে কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘটে অংশ নেন। চক্রবর্তীর উদ্যোগে কলকাতার আলম বাজারে একই মালিকের আর একটি কারখানার শ্রমিকরা সংহতি জানাতে এগিয়ে আসেন। আসামে এটি ছিল রীতিমতো নতুন অভিজ্ঞতা। প্রথমদিকে কারখানার কর্তৃপক্ষ ধুবরির সংলগ্ন গ্রাম থেকে নতুন শ্রমিক নিয়োগ করে ধর্মঘট ব্যর্থ করার অপকৌশল নিলে বিপিন চক্রবর্তী সেটি ব্যর্থ করে দেন। দীর্ঘ দু-মাস এই ধর্মঘট অব্যাহত থাকার পর, শেষপর্যন্ত কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই জয়ে শ্রমিকরা উল্লসিত হলেও কারখানা কর্তৃপক্ষসহ আসাম সরকারের কাছে বিপিন চক্রবর্তীর নাম আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। ঐ দেশলাই কোম্পানির নানারকম জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ১৯৩৬-এর ডিসেম্বর থেকে দ্বিতীয়বার ধর্মঘট শুরু হয় এবং প্রায় এক বছর সেটি স্থায়ী হয়। এইবার কর্তৃপক্ষ নির্দয়ভাবে শ্রমিক ঐক্য ভাঙার জন্য নানারকম অপকৌশলের আশ্রয় নেয় এবং ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। বিপিন চক্রবর্তী অনশন ধর্মঘটের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে আসামে কংগ্রেস-বিরোধী মুসলিম লিগ সমর্থনপুষ্ট

শাদুল্লাহ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। আসাম বিধানসভায় তীব্র বিতর্কের পর আসাম সরকার একটি Board of Conciliation গঠন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু কারখানার কর্তৃপক্ষ ঐ বোর্ডের মীমাংসা সূত্রও মানতে অস্বীকার করায় ধর্মঘটি শ্রমিকরা অবশেষে কাজে ফিরে আসতে বাধ্য হন। দ্বিতীয়বারের ধর্মঘট সাফল্যলাভ না করলেও শ্রেণি হিসাবে শ্রমিকের চেতনা, ঐক্য ও সংহতি নানাভাবে বিকশিত হয়। ধুবরি অধ্যায়ের পর ডিব্রুগড়ে কেদারনাথ গোস্বামীর (১৯০১-১৯৬৫) নেতৃত্বে স্টিমারঘাট শ্রমিকদের ধর্মঘট সফল হয়। যদিও ধুবরি ও ডিব্রুগড়ের সংগ্রামে মাত্র কয়েকশত শ্রমিকের সংঘবদ্ধ সংগ্রাম, তথাপি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রথমদিকে কিছুটা উদ্‌বিগ্ন ছিল, কিন্তু পরবর্তী স্তরে ডিগবয়ে হাজার হাজার তেল শ্রমিকের ধর্মঘট কর্তৃপক্ষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।

২২.৫.৬.৫ ডিগবয় তেল শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট

ব্রিটিশ মালিকানাধীন Burmah Oil Company (BOC)-র শাখা হিসাবে Assam Oil Company (AOC) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তেল উত্তোলনের কাজে যুক্ত ছিল। ১৮৮৯ সালে Assam Railways and Trading Company ডিগবয়ের গভীর জঙ্গলে তেল সন্ধানের পর ১৮৯৯ সালে AOC প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যেহেতু সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তেল উত্তোলনের ব্যাপারে BOC-র পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা ছিল অনেকবেশি, এরই জন্য AOC অবশেষে BOC-র দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয় এবং প্রায় শাখা হিসাবেই কাজ শুরু করে। ১৯১০-এর দশকে লখিমপুর জেলার ডিগবয়ে ৬,০০০-এর বেশি শ্রমিক এবং তিনসুকিয়া AOC-র টিনের পিপা তৈরি সহ অন্যান্য কাজে প্রায় ৪,০০০ শ্রমিক (সর্বমোট ১০,০০০ শ্রমিক) নিযুক্ত ছিলেন। কম মজুরি, কাজের সময় থেকে শুরু করে নানা ব্যাপারে এইসব শ্রমিকরা সাহেব কর্তৃপক্ষের আচরণে ও অত্যাচারে ক্ষুব্ধ ছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সুভাষচন্দ্র বসু ১৯২৯ সালেই শ্রমিক নেতা চৌকা সিং-কে ডিগবয়ে পাঠিয়েছিলেন শ্রমিকদের অবস্থা সরেজমিনে তদন্তের জন্য। ১৯৩৭ সালে আসাম সফরের সময় জওহরলাল নেহরু ডিগবয় শ্রমিকদের প্রশ্নটি মোরান, খোয়াং, ডিব্রুগড়, চাবুয়া, তিনসুকিয়া, দুমদুমা ও ডিগবয়ের বিভিন্ন জনসভায় উত্থাপন করে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে আসামের বিভিন্ন স্থানে সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু, কমিউনিস্ট নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়, শ্রমিক সংগঠক জালাউদ্দিন হাসমি, দিনকর মেহেতা, সুধীন্দ্র প্রামাণিক প্রভৃতি বড়ো মাপের নেতৃত্বের উপস্থিতি শ্রমিকদের মনে সাহস জুগিয়েছিল। AOC-র ১০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে ৬,০০০ প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানির

অধীনে এবং বাকিরা কোম্পানির সাথে যুক্ত কনট্র্যাকটরের অধীনে কাজ করতেন। সকলে মিলে ১৯৩৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি AOC Labour Uniuon গঠন করেন এবং Trade Union Act, 1926 অনুযায়ী, ৭ আগস্ট ১৯৩৮ উপরোক্ত শ্রমিক ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রিকৃত হয়। ঐ সময়েই বাংলার দক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সুধীন্দ্র প্রামাণিক (যিনি ১৯২০-র দশকে টাটানগর ইস্পাত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সফল নেতৃত্ব দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন) শ্রমিকদের আমন্ত্রণে ডিগবয়ে আসেন এবং ধর্মঘট কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

২২.৫.৬.৫.১ ডিগবয় শ্রমিক ধর্মঘটের সূত্রপাত

যেহেতু অনেক শ্রমিক প্রথমদিকে ধর্মঘটের পক্ষে ছিলেন না, এরই জন্য ন্যায্য অধিকার সংক্রান্ত ১২ দফা সনদ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার সেগুলি বাস্তবায়িত করার অনুরোধ রাখা হয়। Trade Dispute Act, 1929 অনুযায়ী তেল কোম্পানি কর্তৃপক্ষ একটি Court of Enquiry গঠনের জন্য তৎকালীন আসাম সরকারকে অনুরোধ করায় মহ. শাদুল্লাহ'র নেতৃত্বাধীন সরকার ১৬ আগস্ট ১৯৩৮-এ J. G. Higgins নামে জনৈক ICS অফিসারের সভাপতিত্বে এবং অমিয়কুমার দাশ এবং সইদুর রহমানকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে তিনজনের একটি Court of Enquiry গঠন করে দেন। কিন্তু এই Court-এর নেতৃত্বে শ্রমিক অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধানের সময় উদ্ধত AOC কর্তৃপক্ষ একজন বাংলো-কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করলে শ্রমিক উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে এবং শ্রমিকরা Higgins-এর সাথে সহযোগিতা বন্ধ করে দেন। এই অবস্থার মধ্যে ১৯৩৮ সালের ২৯ আগস্ট থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত কাজ করে Higgins-এর নেতৃত্বাধীন Court of Enquiry তাঁদের সুপারিশ ৭ জানুয়ারি ১৯৩৯ সালে আসাম সরকারের কাছে পেশ করেন। ইতিমধ্যে আসামে মহ. শাদুল্লাহ সরকারের পতন এবং গোপীনাথ বরদোলই (১৭.২০ দ্রষ্টব্য) আসামের প্রধানমন্ত্রীত্বের (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-১৬ নভেম্বর ১৯৩৯) দায়িত্ব গ্রহণ করায় শ্রমিকদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু বরদোলই মন্ত্রীসভা ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ Higgins-এর কিছু সুপারিশের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, কাজের সময় কমানো, অন্যায়ভাবে ছাঁটাই-শ্রমিকদের পুনর্বহাল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি সম্পর্কে নীরব থাকায় বরদোলই মন্ত্রীসভার প্রতি AOC শ্রমিকদের অনাস্থা ও হতাশা ক্রমশই বাড়ছিল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে আসাম সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে উৎসাহিত হয়ে AOC কর্তৃপক্ষ ১৪ নভেম্বর ১৯৩৮ থেকে ১ এপ্রিল ১৯৩৯-এর মধ্যে ৫৬ জন

শ্রমিককে অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করায় শ্রমিকদের ক্ষোভ নানাভাবে বিস্ফোরণের সুযোগ পেল। যদিও AOC কর্তৃপক্ষ ২০ মার্চ ১৯২৯ AOC Labour Union-কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কিন্তু Union-এর সাথে জড়িত নয় এমন ধরনের শ্রমিকরা যাতে ব্যক্তিগতভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারেন সেই সুযোগও রেখেছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে এইভাবে দুর্বল করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে AOC Labour Union ৩ এপ্রিল ১৯৩৯ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডাকতে বাধ্য হয়।

২২.৫.৬.৫.২ ধর্মঘটিদের উপর আক্রমণ ও হাজরা কমিটির রিপোর্ট

এই ধর্মঘটে ডিগবয়ের ৬,০০০ এবং তিনসুকিয়ার ৪,০০০ শ্রমিক অংশ নেওয়ায় এটি ছিল সর্বাত্মক ধর্মঘট। শুধুমাত্র ১৩৮ জন শ্রমিককে অত্যাবশ্যকীয় কিছু কাজকর্মের জন্য রেহাই দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে ৩ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল অর্থাৎ ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে ছাঁটাই শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪ জন হয়েছিল। ১৪ এপ্রিল গোপীনাথ বরদোলই ডিগবয় ও মাকুম পরিদর্শনে এসে প্রকাশ্যে ঐ লাগাতার ধর্মঘটের নিন্দা করে অবিলম্বে এটি প্রত্যাহারের আবেদন করেন। কারখানার অভ্যন্তরে ও বাইরে Assam Rifles বাহিনীর তাণ্ডবে ও গুলির আঘাতে ১৮ এপ্রিল তিনজন শ্রমিকের মৃত্যু হলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হয়। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয়ে সমগ্র আসাম জুড়ে সরকার-বিরোধী উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের রিপোর্ট শ্রমিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার এবং চারিদিক থেকে আসাম মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ধিক্কার আসায় অবশেষে ১০ জুলাই ১৯৩৯-এ বরদোলই মন্ত্রীসভা কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মন্মথনাথ মুখার্জির নেতৃত্বে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। এই সময় সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে নবগঠিত 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলের প্রতিনিধি হিসাবে (যদিও সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা আসামে ছিল, কিন্তু তাঁর দলের তেমন প্রভাব ছিল না) G. E. Gibbon-ও ডিগবয়ে ছুটে আসেন। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের মাধ্যমে **সুধীন্দ্র প্রামাণিক জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্তব্য করেন, এই ধর্মঘট ব্যর্থ হলে ভারতবর্ষে আর অন্য সংগঠনের পক্ষে উঠে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না** (If it be a failure, the other organisation of India would not be able to carry on any longer)। রাজেন্দ্রপ্রসাদও নানাভাবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন একটি মীমাংসা-সূত্র বের করতে, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। জে. বি. কৃপালনি এবং প্রফুল্ল ঘোষও নানাভাবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু একদিকে AOC কর্তৃপক্ষ এবং

অন্যদিকে গোপীনাথ বরদোলই-এর অনমনীয়তার জন্য সেটিও সফল হয়নি। প্রচলিত আইন অনুযায়ী এত বড়ো একটা ঘটনার পরেও Board of Conciliation গঠন না করার জন্য শেষে যখন AOC কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে AICC সরব হয়, তখন কিছুটা টনক নড়ে। শ্রমিকদের সাথে বিরোধ মেটানোর উদ্দেশ্যে ২৩ জুলাই একজন ICS অফিসার K. K. Hajra-এর নেতৃত্বে একটি Board of Conciliation গঠিত হয়। সুধীন্দ্র প্রামাণিক সহ AOC Labour Union-এর সভাপতি জে. এন. উপাধ্যায়, সহ-সভাপতি সাধু সিং এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এম. এ. চৌধুরি, প্রীতম সিং, যদুনাথ ভুঁইয়া প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বোর্ডের সামনে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন।

৮ আগস্ট ১৯৩৯ K. K. Hajra তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন যেটি শ্রমিকদের পক্ষে যায়। ঐ রিপোর্টে সমস্ত ধর্মঘটি শ্রমিককে কাজে পুনর্বহাল এবং ধর্মঘটিদের স্থলে যেসব নতুন ব্যক্তি নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের ছাঁটাই করার কথাও বলা হয়। AOC কর্তৃপক্ষ Hajra Report গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে স্বাভাবিক কারণেই শ্রমিক উত্তেজনা ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে বরদোলই সরকারও এব্যাপারে অনীহা দেখিয়ে শ্রমিক-হত্যা সংক্রান্ত মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টটি প্রকাশও স্থগিত করে দেয়। **একদিকে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সহানুভূতি এবং অন্যদিকে রাজ্য নেতৃত্বের এইরকম বিমাতৃসুলভ আচরণে ডিগবয় শ্রমিকরা ক্রমাগত বিভ্রান্ত হতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) শুরু হয়ে যায় এবং ভারতীয়দের সাথে আলোচনা না করেই ৩ সেপ্টেম্বর ঐ যুদ্ধে ভারতকে 'মিত্র শক্তির' অংশ হিসাবে ভাইসরয় লিন্‌লিথ্‌গো ঘোষণা করে দেন।** ৪ সেপ্টেম্বর 'ভারত রক্ষা আইন'-এর নামে সমগ্র ডিগবয় তিনসুকিয়া এলাকা 'সংরক্ষিত এলাকা' হিসাবে ঘোষিত হয়। মিটিং, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারিসহ ধর্মঘট ইত্যাদিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ঐভাবে ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জড়ানোর বিরোধী ছিল এবং এরই জন্য প্রতিবাদস্বরূপ কংগ্রেস পরিচালিত প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। যেহেতু আসামে কংগ্রেসের গোপীনাথ বরদোলই পরিচালিত কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ১৬ নভেম্বর ১৯৩৯ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল, এরই জন্য সুধীন্দ্র প্রামাণিক শেষ চেষ্টা হিসাবে ৭ অক্টোবর ১৯৩৯ AICC-র কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে চিঠি লেখেন। ঐ চিঠির বক্তব্য ছিল ঃ জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেন আসামের কংগ্রেস পরিচালিত বরদোলই সরকারকে ডিগবয়-তিনসুকিয়া এলাকাকে যুদ্ধকালীন অবস্থা

থেকে রেহাই সহ AICC-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী Hajra Report অবিলম্বে কার্যকরী করার নির্দেশ দেয় ঃ

...to resist firmly...undue application of war emergency measures and to implement without further delay the AICC's last resolution 'to forthwith undertake legislation for making the acceptance of the decision of the conciliation Board obligatory. কিন্তু প্রামাণিক-এর এই শেষ আবেদনেও কিছু লাভ হয়নি, ফলে ঐ পরিস্থিতিতে যা অনিবার্য সেটিই শেষপর্যন্ত ঘটে।

২২.৫.৬.৫.৩ ডিগবয় ধর্মঘটের ব্যর্থতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা হবার আড়াই মাস পরে বরদোলই মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং ১৭ নভেম্বর ১৯৩৯ তৃতীয়বার শাদুল্লাহ মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় ফিরে আসে। বরদোলই মন্ত্রীসভার অনুকরণেই শাদুল্লাহ মন্ত্রীসভা AOC কর্তৃপক্ষকেই সমর্থন জানায়। আসামের তৎকালীন গভর্নর Robert Niel Reid শ্রমিক-বিরোধী অভিযানে অতিরিক্ত তৎপরতা দেখাতে শুরু করেন। **১০,০০০ শ্রমিকের দীর্ঘ ৬ মাসের বেশি ধর্মঘটের মেরুদণ্ড ভাঙার জন্য ৬,০০০-এর বেশি সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়।** ইতিমধ্যে ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট (হাজরা রিপোর্টের সম্পূর্ণ বিপরীত) প্রকাশিত হয় এবং **এই দীর্ঘ ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। AOC Labour Union-এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়। ইউনিয়ন-এর সমস্ত নেতাকে ডিগবয় এবং ডিব্রুগড় ডিভিসন থেকে বহিষ্কার করা হয়। ধর্মঘট কমিটির সম্পাদক সুধীন্দ্র প্রামাণিককে আসাম থেকে বহিষ্কার করা হয়। আসামের এত বড়ো মাপের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের এরকম শোচনীয় পরিণতিতে চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসে।** তবু এই অন্ধকারের মধ্যে থেকেই বামপন্থী চেতনা ও শক্তি নতুনভাবে উদ্ভাসিত হওয়ার সুযোগ পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমকালীন *অসমিয়া* পত্রিকায় উদ্দীপক লেখনী সেটির সাক্ষ্য দেয়।

২২.৫.৬.৫.৪ চা-বাগানে ডিগবয় ধর্মঘটের প্রভাব

ডিগবয় শ্রমিক ধর্মঘটের কাহিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এবং চলাকালীন সময় উভয় উপত্যকায় নানাভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ মালিকানাধীন Assam Railways and Trading Company (ARTC) শুধু যে ডিব্রু-সাদিয়া রেল-এর উপর জুলুম বজায় রাখত তা নয়, ARTC-র অধীনে আসামে অনেকগুলি

খনি, কাঠচেরাই কারখানা, ডিগবয় তেল শিল্পের শেয়ার এবং চারটি বড়ো চা-বাগান ইত্যাদিও ছিল এবং প্রতিটি স্থানে শ্রমিক অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। ARTC-র মালিকানাধীন একটি চা-বাগানের ডাক্তার বিনয়ভূষণ চক্রবর্তী (১৮৯৭-১৯৬৭) চা-শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশা দেখে চাকুরি থেকে ইস্তফা দিয়ে প্রগতিশীল শ্রমিক নেতা কেদারনাথ গোস্বামী (১৯০১-১৯৬৫) এবং 'সি.এস.পি.'-র অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন নীলমণি বরঠাকুর (১৯১২-২০০১)-এর সাথে যৌথভাবে ARTC Workers' Union গঠন করেন এবং ২৯ মার্চ ১৯৩৯ সালে এটির রেজিস্ট্রেশন হয়। ডিগবয় তেল শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রমিকদের প্রতি সংহতি জানাতে এবং নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে এই 'ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' ARTC-র মালিকানাধীন সমস্ত সংস্থায় ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই আহ্বান ARTC শ্রমিকদের বাইরেও প্রভাব ফেলে এবং ১৯৩৯ সালের ২৩ মে একসাথে ২১টি চা-বাগানের শ্রমিক ধর্মঘটে শামিল হন। অবস্থা বেগতিক বুঝে Indian Tea Association এই প্রথম শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং এই সুযোগে ১৯৩৯-৪০ সালে কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়নেরও জন্ম হয় (যদিও বেশিরভাগই ছিল কাগুজে)।

সারণি ১৫

বাগান শ্রমিকদের ইউনিয়ন ১৯৩৯-১৯৪০

নাম	কেন্দ্রীয় অফিস	রেজিস্ট্রেশনে তারিখ
আপার আসাম টি কোং লেবার	ডিব্রুগড়	২৭ এপ্রিল, ১৯৩৯
রাজমাই টি কোং লেবার ইউনিয়ন	ডিব্রুগড়	২৭ এপ্রিল, ১৯৩৯
গ্রিনউড্ টি কোং লেবার ইউনিয়ন	ডিব্রুগড়	৬ মে, ১৯৩৯
মাকুম (আসাম) টি কোং লেবার ইউনিয়ন	মার্ঘারিটা	৩০ মে, ১৯৩৯
সিলেট-কাছাড় চা-বাগান মজদুর ইউনিয়ন		২৭ এপ্রিল, ১৯৩৯

সূত্র ঃ অমলেন্দু গুহ, *Planter Raj to Swaraj*, পৃ. ১৯৬।

একদিকে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির প্রশ্নে কর্তৃপক্ষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের War Fund বা যুদ্ধ ভাণ্ডারের জন্য দুঃস্থ শ্রমিকদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ আদায়ের ফলে শ্রমিকশ্রেণির দুর্গতি চরমে পৌঁছেছিল। ১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারিতে লখিমপুর থেকে যুদ্ধ ভাণ্ডারের জন্য যে ৯,৭৫,২০১ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে ২,১৫,১১৭ টাকা ছিল শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক দান। দুই উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে ছিল একই চিত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

জন্য সর্বত্র Defence of India Rules (DIR) চালু থাকার ফলে শ্রমিকদের স্বাধীন গতিবিধিও খর্ব হয়েছিল। তবু এরই মধ্যে গোপনে ও সংগোপনে কমিউনিস্টরা (সি.পি.আই. নিষিদ্ধ থাকার ফলে 'সি.এস.পি.'-র নামে কমিউনিস্টরা কাজ চালাতেন) বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে অমিয়কুমার দাশ আসাম বিধানসভায় ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সালে চা-শ্রমিকদের স্বাধীন গতিবিধি সংক্রান্ত একটি বিল উত্থাপনের চেষ্টা করেও সফল হননি। DIR চালু থাকা সত্ত্বেও ১৯৪০-এর ১২ জানুয়ারি কেদারনাথ গোস্বামী ARTC Labour Union-এর দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের ২৩ আগস্ট থেকে কমিউনিস্ট নেতা নীলমণি বরঠাকুরের ভাই গিরীন্দ্র বরঠাকুর ARTC শ্রমিকদের হৃত মনোবল পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ARTC Labour Union-এর কার্যকরী কমিটির সদস্য মহেন্দ্র দে ডিব্রুগড় থেকে তিনসুকিয়া এবং গিরীন্দ্র বরঠাকুর তিনসুকিয়ার পর থেকে লেডো পর্যন্ত শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। AOC-র ছাঁটাই শ্রমিক গিরিজা রায়, হরনাম সিং প্রভৃতি শ্রমিক নেতারা প্রীতম সিং-এর মাধ্যমে আসামের ছাত্র ফেডারেশন-এর সাহায্য নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ব্রহ্মপুত্র ও **সুরমা উপত্যকায় ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে বীর শ্রমিকদের সংগ্রাম গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।**

২২.৫.৬.৫.৫ সিলেট ও কাছাড়ে চা-বাগানে প্রভাব

সিলেট ও কাছাড়ের চা-বাগানেও শ্রমিক অশান্তি একইভাবে পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের আগে সিলেটের তিনটি চা-বাগানে এবং কাছাড়ের পাঁচটি চা-বাগানে একদিন করে ধর্মঘট হয়েছিল। বারীন দত্ত, প্রবোধচন্দ্র কর প্রভৃতি সংগ্রামী ব্যক্তিদের উদ্যোগ ১৯৩৮ সালে 'সিলেট-কাছাড় চা মজদুর সংগঠক কমিটি' গঠিত হয়েছিল এবং ধর্মঘটি শ্রমিকদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা নানাভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে ৯০০-র বেশি সদস্য নিয়ে এই সংগঠনটি অরুণ কুমার চন্দ-কে সভাপতি এবং সনৎকুমার আহীর-কে সহ-সভাপতি করে 'সিলেট-কাছাড় চা মজদুর ইউনিয়ন' এই নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করে ২৭ এপ্রিল ১৯৩৯-এ রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ডিগবয় তেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জানিয়ে এবং নিজস্ব কিছু দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে ঐ মজদুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে অরুণাবন্দ টি এস্টেটের চা-শ্রমিকরা সুশৃঙ্খলভাবে ১৯৩৯ এপ্রিলের প্রথমদিক থেকে দীর্ঘ ৪০ দিনের লাগাতার ধর্মঘটে

শামিল হয়ে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। উভয় উপত্যকার চা-শ্রমিকরা ক্রমশ বামপন্থার দিকে ঝুঁকছেন এই আশঙ্কা করে আসামের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বরদোলই অবশেষে ২৩ মে ১৯৩৯ একটি Tea Garden Labour Unrest Enquiry Committee গঠন করতে সম্মত হন। F. W. Hockenhull-এর নেতৃত্বে বৈদ্যনাথ মুখার্জি, অরুণ কুমার চন্দ, দেবেশ্বর শর্মা এবং হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত এই কমিটির আবেদনে সাড়া দিয়ে ৪০ দিনের ধর্মঘট স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু প্রথম থেকেই এই কমিটির সাথে সরকারি ও বাগান কর্তৃপক্ষের মতপার্থক্য শুরু হয়। ১ জুলাই ১৯৩৯ Indian Tea Association উপরোক্ত কমিটির সাথে সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নিলে Hockenhull পদত্যাগ করেন এবং স্বাভাবিকভাবে কমিটি অর্থহীন হয়ে যায়। এই উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সেই সময় জনমনে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটি উপলব্ধি করা যায় ১৯৪০-এ শিলচর উপ-নির্বাচনের ফলাফলে। ঐ নির্বাচনে 'সিলেট-কাছাড় চা-মজদুর ইউনিয়ন'-এর সহ-সভাপতি সনৎ কুমার আহীর (যদিও আপাতদৃষ্টিতে কংগ্রেস প্রার্থী, কিন্তু কমিউনিস্ট সমর্থিত) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় বাগান-মালিকদের প্রতিনিধিকে বিপুল ভোট পরাজিত করে আসাম বিধানসভায় নির্বাচিত হন। আসলে কাছাড় ও লখিমপুরের চা-শ্রমিকরা ছিলেন সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত ও অত্যাচারিত। এরই জন্য দেখা যায়, ১৯৩৭ সালে যেখানে ১৩টি চা-শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল, ১৯৩৮-এ সেটি বেড়ে হয় ১৭টি এবং ১৯৩৯ সালে ৩৫টি। মোট ৬৫টি ধর্মঘট ভাঙার জন্য ১৯টি বাগানে সশস্ত্র পুলিশের অকথ্য নির্যাতন সত্ত্বেও বারবার শ্রমিক উত্তেজনা বিস্ফোরিত হয়েছে।

২২.৫.৬.৫.৬ অন্যান্য আন্দোলনের প্রভাব

শুধু চা-বাগানেই নয়, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ-বিরোধিতা নানারকম ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। ১৯৩৯ সালে রাজধানী শিলং-এ পৌরসভা কর্মচারীদের ধর্মঘট এবং স্থানীয় ছাত্রদের সমর্থন, ১৯৪০ সালে সরকারি প্রেস কর্মচারীদের ধর্মঘট, এছাড়া বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের উত্থান—যেমন, Shillong Drivers' and Mechanics' Associations (১৯৩৮-এর ৫ ডিসেম্বর রেজিস্ট্রিকৃত), Assam Provincial Shop Employees' Union (১৩ জুলাই ১৯৪০-এ রেজিস্ট্রিকৃত) ইত্যাদি এটিই ইঙ্গিত দেয় যে, ডিগবয়ে তেল-শ্রমিকদের ঐতিহাসিক আন্দোলনের পরাজয় সহ অত অত্যাচার সত্ত্বেও বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত সংগ্রামী মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

২২.৬ ১৯৩৫-এর নয়া সংবিধান ও আসাম

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে ২ আগস্ট ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে Government of India Act 1935 অনুমোদিত হয়। এটি ছিল সেই সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত দীর্ঘতম আইন। বোম্বাই থেকে সিন্ধ-কে পৃথকীকরণ, ভারত থেকে ব্রহ্মদেশ (Burma)-কে বিচ্ছিন্নকরণ, বিহার ও উড়িষ্যাকে আলাদা রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতিদান, রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলি নিয়ে 'ফেডারেশন' গঠনের পরিকল্পনা (যদিও সেটি বাস্তবায়িত হয়নি) ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মধ্যে ঐ নয়া সংবিধানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেই সময় অখণ্ড ভারতবর্ষে যে কয়েকটি রাজ্য ছিল সেখানে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতীয়দের প্রাদেশিক সরকার গঠনের অধিকারদান (গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা ও রক্ষাকবচ রেখে)। ভারতীয়দের ক্রমাগত দাবি ও ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত করার উদ্দেশ্যেই প্রাদেশিক স্ব-শাসনের অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার আইনে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ব্রিটিশ গভর্নরের হাতে কুক্ষিগত রেখে ছিটেফোঁটা ক্ষমতা কাউন্সিলের মনোনীত সদস্যদের দিয়ে যে 'দ্বৈত-শাসন' চালু হয়েছিল, সেটি ১৯৩৫ সালের সংবিধানে কিছুটা সংশোধিত হয়। ১৯৩৫-এর সংবধিান গ্রহণের প্রশ্নে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তীব্র মতদ্বৈধতা এবং আগের মত 'নো-চেঞ্জার' এবং 'প্রো-চেঞ্জার'-দের বিতর্ক জারি থাকলেও অবশেষে ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস অংশগ্রহণে সম্মত হয় এবং গান্ধিজিও অনুমতি দিতে বাধ্য হন। প্রাদেশিক সরকার মূলত নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের হাতে থাকবে, এই বিধানে কংগ্রেসের অনেকেই সেদিন আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে কংগ্রেস দল প্রকৃতপক্ষে ৫টি রাজ্যে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে প্রথম মন্ত্রীসভা গঠন করতে পেরেছিল। এই রাজ্যগুলি হল (সেই সময় আজকের মতো এত রাজ্য ছিল না) ঃ মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ বা উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ('সেন্ট্রাল প্রভিন্স'), বিহার, এবং উড়িষ্যা। বোম্বাই-এ কংগ্রেসপন্থীদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে মোটামুটি ক্ষমতা দখলের অবস্থায় কংগ্রেস ছিল। আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও মুসলিম ও কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির মতপার্থক্য ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় আসে। পাঞ্জাব, সিন্ধ্ ও বঙ্গদেশে কংগ্রেস কোনোভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। আসলে, রাজ্য মন্ত্রীসভা গঠন ও ক্ষমতা দখল এবং কেন্দ্রে ব্রিটিশ-বিরোধিতা এই বিরাট অগ্নি পরীক্ষায় ১৯৩৭ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রবেশ করে। আসামসহ ভারতের মোট

৬টি প্রদেশে দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা—অর্থাৎ Legislative Council (Upper House) বা বিধান পরিষদ এবং Legislative Assembly (Lower House) বা বিধানসভা ছিল। অসামে কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করা হলেও (৫৩ জন সদস্য), প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল নির্বাচিত ১০৮ সদস্যবিশিষ্ট আসাম বিধানসভায়। সেই সময় রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে 'প্রধানমন্ত্রী' বলার রেওয়াজ ছিল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ ব্রিটিশ-শাসিত আসামের এই শেষ দশবছরে একদিকে মুসলিম লিগ সমর্থিত কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রধান মহঃ শাদুল্লাহ এবং অন্যদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রধান গোপীনাথ বরদোলই-এর সাথে অন্য যে কজন মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের তালিকা সারণি ১৬-তে উল্লেখ করা হল। (ইতিপূর্বে সারণি ৩-এ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রধানদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।)

সারণি ১৬

১৯৩৭-১৯৪৭ আসামে 'কোয়ালিশন' মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ

১ এপ্রিল ১৯৩৭—৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮
(১) মহ. শাদুল্লাহ (প্রধান) (২) মহ. ওয়াহিদ্, (৩) জে. জে. এম. নিকলস্ রায়, (৪) রোহিণী কুমার চৌধুরি, (৫) আলি হায়দার খান।
৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮—১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮
(১) মহ. শাদুল্লাহ (প্রধান) (২) জে. জে. এম. নিকলস্ রায়, (৩) রোহিণী কুমার চৌধুরি, (৪) মুনাব্বর আলি, (৫) আব্দুল মতিন চৌধুরি, (৬) অক্ষয় কুমার দাস।
১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮—১৭ নভেম্বর ১৯৩৯
(১) গোপীনাথ বরদোলই (প্রধান) (২) অক্ষয় কুমার দাস, (৩) রামনাথ দাস,

(৪) কামিনীকুমার সেন, (৫) রূপনাথ ব্রহ্ম, (৬) ফখরুদ্দিন আলি আমেদ, (৭) মামুদ আলি, (৮) আলি হায়দার খান।
১৮ নভেম্বর ১৯৩৯—২৫ ডিসেম্বর ১৯৪১ (১) মহ. শাদুল্লাহ (প্রধান) (২) রোহিণী কুমার চৌধুরি, (৩) মুনাব্বর আলি, (৪) হীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, (৫) মুদাব্বির হোসেন চৌধুরি, (৬) মহেন্দ্রনাথ শইকিয়া, (৭) আব্দুল মতিন চৌধুরি, (৮) সইদুর রহমান, (৯) মাভিস্ ডুন, (১০) রূপনাথ ব্রহ্ম।
২৫ ডিসেম্বর ১৯৪১—২৫ আগস্ট ১৯৪২ **গভর্নরের শাসন (১৯৩৫ আইনের ৯৩ নং ধারা বলে)**
২৫ আগস্ট ১৯৪২—২৩ মার্চ ১৯৪৫ (লিগ মন্ত্রীসভা) (১) মহ. শাদুল্লাহ (প্রধান) (২) মুনাব্বর আলি, (৩) মুদাব্বির হোসেন চৌধুরি, (৪) সইদুর রহমান, (৫) আব্দুল মতিন চৌধুরি, (৬) হীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, (৭) মাভিস্ ডুন, (৮) মহেন্দ্রনাথ শইকিয়া, (৯) রূপনাথ ব্রহ্ম, (১০) নবকুমার দত্ত।

২৩ মার্চ ১৯৪৫—১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ (কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা)
(১) মহ. শাদুল্লাহ (প্রধান) (২) বৈদ্যনাথ মুখার্জি, (৩) মুনাব্বর আলি, (৪) রোহিণী কুমার চৌধুরি, (৫) মুদাব্বির হোসেন চৌধুরি, (৬) সুরেন্দ্রনাথ বুরাগোহাইন, (৭) সইদুর রহমান, (৮) অক্ষয় কুমার দাস, (৯) আব্দুল মতিন চৌধুরি, (১০) রূপনাথ ব্রহ্ম।
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬—১৪ আগস্ট ১৯৪৭ (কংগ্রেস মন্ত্রীসভা)
(১) গোপীনাথ বরদোলই (প্রধান) (২) বসন্ত কুমার দাস, (৩) বিষ্ণুরাম মেধি, (৪) আব্দুল মতলিব মজুমদার, (৫) বৈদ্যনাথ মুখার্জি, (৬) জে. জে. এম. নিকোলস্ রায়, (৭) রামনাথ দাস, (৮) ভীমবর দেউরি (৯) আব্দুর রসিদ

সূত্র ঃ *Political History of Assam*, vol. II, III, (Appendix B')

উপরোক্ত সারণি '১৬' থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বাধিকারের জন্য গঠিত আসাম বিধানসভায় মহ. শাদুল্লাহ-ই বেশিরভাগ সময় কর্তৃত্ব ছিলেন। অন্যদিকে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট (অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্বলগ্ন) পর্যন্ত সময়ে কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বরদোলই প্রথমবার ১৪ মাস (সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-নভেম্বর ১৯৩৯) এবং দ্বিতীয়বার ১৮ মাস (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-আগস্ট ১৯৪৭) প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছিলেন। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর উত্থান ও পতন এবং এই স্বল্প সময়ের মধ্যে নাটকীয়ভাবে বারবার মন্ত্রীসভা পরিবর্তনের পিছনে নানারকম

রাজনৈতিক সমীকরণ কাজ করেছিল। শাদুল্লাহ্ এবং বরদোলই-এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও পারস্পরিক সম্পর্ক কিন্তু তিক্ত ছিল না। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় বরদোলইকে মুক্ত করার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে গোপন চিঠিতে শাদুল্লাহ লিখেছিলেন (১ অক্টোবর ১৯৪৩) ঃ "I know Mr. Bardoloi personally. He was my student for a year.....and then a colleague in the Gauhati Bar. He has been pitchforked into this position by adventitious circumstances. He was not a keen Congressman ever and did not go to jail in 1921 or 1931 movements." তাঁর প্রাক্তন ছাত্র ও সহকর্মী বরদোলই-এর পক্ষে কিন্তু বলতে গিয়ে শাদুল্লাহ্ প্রকৃতপক্ষে বরদোলই-এর কংগ্রেস-আনুগত্য নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। তাছাড়া অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গোপীনাথ জেল খাটেননি—এটিও তথ্যগতভাবে সঠিক নয়, কারণ ১৯২১ সালে গোপীনাথকে জেল খাটতে হয়েছিল।

২২.৬.১ মহম্মদ শাদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৫৫)

কথিত আছে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খ্রিস্টাব্দ)-এর সাথে বংশ-পরম্পরায় যুক্ত সৈয়দ মহম্মদ শাদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৫৫)-এর পূর্বপুরুষ ১৬৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে আসামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। শাদুল্লাহ্‌র পিতা ছিলেন গুয়াহাটিতে আরবি ও ফারসি ভাষার শিক্ষক। শাদুল্লাহ গুয়াহাটিতেই ২১ মে ১৮৮৫-তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গুয়াহাটির সোনারাম হাইস্কুলের ছাত্র শাদুল্লাহ ১৯০৫ সালে কটন কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে ১৯০৭ সালে রসায়নশাস্ত্রে এম. এস-সি. এবং পরে গুয়াহাটির আর্ল ল কলেজ থেকে আইনের ডিগ্রি অর্জন করেন। অসমিয়াদের মধ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তৃতীয় ব্যক্তি। কিছুদিন গুয়াহাটিতে তাঁর পুরোনো স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতার পর তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। ১৯২৪ সালে তিনি প্রথম রাজনীতিতে অংশ নিয়ে কাউন্সিলর ও মন্ত্রী হিসেবে কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে সংঘাতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না ; বরং ব্রিটিশসহ উভয় উপত্যকার মানুষের সাহায্য নিয়ে কীভাবে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল অসমিয়া মুসলমানদের আরও উন্নত করা যায় সেটিই ছিল তাঁর রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য ; যেটি তাঁর প্রথম মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীদের নাম থেকেই স্পষ্ট। যদিও ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লিগ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ; তথাপি প্রথমদিকে নরমপন্থী, শাদুল্লাহ্ ঐ দলের সাথে তেমন

ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন না ; বরং ব্রিটিশ আমলা ও চা-বাগানের ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের সাথে শেষদিন পর্যন্ত মধুর সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল তিনি আসামের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বিরোধী কংগ্রেস দলের সদস্য দক্ষিণারঞ্জন গুপ্ত-চৌধুরি ১০ আগস্ট ১৯৩৭ আসাম বিধানসভায় শাদুল্লাহ্ মন্ত্রীসভা সম্পর্কে যে ঝাঁঝালো ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছিলেন সেটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য ঃ

> *The white bureaucrats speak through their brown successors—the grip of imperialism—the chains of slavery tighten. It was well, Sir, that the new constitution was inaugurated on 'All Fools' Day'—I mean the 1st of April—and the country had been befooled."*

ব্রিটিশ সরকার ১৯২৮ সালে শাদুল্লাহকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তিনি স্যার মহম্মদ শাদুল্লাহ্ নামে পরিচিত হন। প্রথম দিকে 'মুসলিম লিগ'-এর সাথে তেমন ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও পরবর্তী সময়ে 'মুসলিম লিগ'-এর নেতা হিসাবেই তিনি আসাম সরকার পরিচালনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিধানসভায় সমস্ত মুসলিম সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন লাভের উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৩৭-এর অক্টোবরে লখনউ-এ অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় লিগ-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করেন। **পাকিস্তান-এর প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলি জিন্না'র (১৮৭৬-১৯৪৮) মতো শাদুল্লাহও ধর্মের ভিত্তিতে 'দ্বি-জাতি' তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন ; তবে উভয়ের ক্ষেত্রেই চিন্তার এই বিবর্তন পরবর্তী সময়ে হয়েছিল।** প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জিন্না কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর উপর নির্ভর করে অখণ্ড ভারতের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের সৈনিক হিসাবেই জীবন শুরু করেছিলেন এবং ১৯১৩ সালের আগে 'মুসলিম লিগ'-এর সাথে তাঁর কোনো সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়নি। আসামে 'মুসলিম অনুপ্রবেশ' সংক্রান্ত বিতর্কিত প্রশ্নে এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রসারে শাদুল্লাহ সরকারের ভূমিকা নিয়ে আজও নানারকম ভিন্নমত অব্যাহত থাকলেও আইনজ্ঞ হিসাবে শাদুল্লাহ'র খ্যাতি বিতর্কের ঊর্ধ্বে এবং সংবিধান সভায় গোপীনাথ বরদোলই-এর মতো তিনিও ছিলেন আসামের প্রতিনিধি। ৮ জানুয়ারি ১৯৫৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ভি. ভি. রাও এবং এন. হাজারিকা তাঁদের গ্রন্থ *A Century of Government and Politics in North-East India* (vol. I) গ্রন্থে শাদুল্লাহ'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁকে *...an outstanding personality both on account of his experience, ability and honesty.*

In fact, he was in a different class from any other politician in Assam. হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

২২.৬.২ ১৯৩৫-এর আইন অনুযায়ী আসামে প্রথম বিধানসভা নির্বাচন

১৯৩৫-এর আইন যে কত শূন্যগর্ভ এটি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই গান্ধিজির সম্মতি নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩৭ সালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই সময় আসামে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে ভোট গ্রহণের ফলে রকমারি দল গজিয়ে উঠেছিল এবং ১০৮ সদস্য বিশিষ্ট বিধানসভায় কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। সারণি ১৭, ১৮ ও ১৯-এর দিকে দৃষ্টিপাত করলে রাজনৈতিক চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। সরকারি বিধান অনুযায়ী, যেভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আসামের ১০৮টি আসন বণ্টিত হয়েছিল সেটি এইরকম ঃ

সারণি ১৭

১৯৩৭-এর নির্বাচনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আসামে আসন বরাদ্দ

	সাধারণ আসন	
১.	অ-মুসলিম সাধারণ আসন	৪৬
২.	মুসলিম আসন	৩৪
৩.	খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় (শিলং সহ)	২
৪.	গারো পাহাড় আসন	২
৫.	মিকির পাহাড় আসন	১
৬.	সমতলের অনুন্নত আদিবাসী (কাছাড়ি, মিরি, লালুং ও অন্যান্য) আসন	৪
৭.	দলিত গোষ্ঠী (সুরমা উপত্যকা) আসন	৩
৮.	দলিত গোষ্ঠী (ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা) আসন	১
	বিশেষ আসন	
৯.	ইউরোপীয় বাগান মালিক আসন	৮
১০.	ভারতীয় বাগান মালিক আসন	২
১১.	কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রিজ (ভারতীয়) আসন	১
১২.	চা বাগান শ্রমিক আসন	৪
	মোট	১০৮

এইভাবে আসন বণ্টন স্বাভাবিকভাবেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। নাগা, কুকি ইত্যাদি কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীকে ভোটের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল।

সারণি ১৮

১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর আসাম বিধানসভায় দলগত চিত্র

	দল	আসন
১.	কংগ্রেস	৩৩
২.	ইনডিপেন্ডেন্ট হিন্দু	১০
৩.	মুসলিম প্রজা পার্টি	১
৪.	ইউনাইটেড পিউপিলস্ পার্টি	৩
৫.	আসাম ভ্যালি মুসলিমস্	৫
৬.	সুরমা ভ্যালি মুসলিমস্	৫
৭.	ইউরোপিয়ান	৯
৮.	পশ্চাদপদ আদিবাসী	৪
৯.	শ্রম	৪
১০.	নির্দল	১৪
১১.	অন্যান্য	২০
	মোট	**১০৮**

সারণি ১৯

সংক্ষিপ্তভাবে প্রথম বিধানসভায় বিভিন্ন সময়ে দল ও গোষ্ঠীর অবস্থান

১.	অ-মুসলিম (তফশিলি জাতিসহ) (কংগ্রেস ৩৩, অ-কংগ্রেস ১৪)	৪৭
২.	মুসলিম (মুসলিম লিগ ১০, মুসলিম পার্টি ২৪)	৩৪
৩.	ইউরোপীয়ানসহ অন্যান্য	২৭
	মোট	**১০৮**

২২.৬.৩ আসামে প্রথম বিধানসভার চিত্র

সুরমা উপত্যকার ৭ জন সহ মাত্র ৩৩ জন কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়েছিলেন এবং অ-মুসলিমদের মধ্যেই কংগ্রেসের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। যেহেতু নিরঙ্কুশ

সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে জাতীয় কংগ্রেস সেই সময় কোনো রাজ্যে সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিল না ; এরই জন্য আসামে প্রথম সেই প্রশ্ন ওঠেনি। তবে কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন দল কিছু আসনে জয়ী হয়েছিল। যেমন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা তরুণরাম ফুকনের 'ইউনাইটেড্ পিউপিলস্ পার্টি'র যদিও স্বয়ং ফুকন সহ বড়ো বড়ো নেতারা পরাজিত হয়েছিলেন (একমাত্র রোহিণী কুমার চৌধুরি ছিলেন ব্যতিক্রম), মাত্র ৩টি আসনে ঐ দল জয়ী হয়েছিল। গোপীনাথ বরদোলই ও সেই সময় ঐ দলে যুক্ত হয়েছিলেন এবং শেষ মুহূর্তে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সম্মত হন। **গান্ধিজি যেমন বারবার কংগ্রেস ত্যাগ করে আবার ফিরে এসেছিলেন, গোপীনাথ বরদোলইও সেটিই অনুসরণ করলেন।** ফখরুদ্দিন আলি আমেদ-এর মতো অনেকেই নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন এবং পরে কংগ্রেসে যোগ দেন। মুসলিম লিগের প্রতিনিধি সংখ্যাও সীমিত ছিল ; প্রথমে ছিল মাত্র ৪ জন এবং পরে প্রথম বিধানসভায় এটি বেড়ে ১০ হয়। আদিবাসী ও চা-বাগান শ্রমিকদের মধ্যেও প্রথমে কংগ্রেস-এর প্রভাব ছিল নগণ্য। আসামের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মহ. শাদুল্লাহ 'আসাম ভ্যালি মুসলিমস্' দলের নেতা ('মুসলিম লিগ'-এর নয়) হিসাবেই জয়ী হয়েছিলেন এবং প্রথম বিধানসভায় ঐ দলের ঝুলিতে ছিল মাত্র ৫টি আসন। ১৯৩৭ সালে আসাম বিধানসভার এইরকম বিচিত্র অবস্থানের মধ্যে কোনো দলের পক্ষেই সরকার গঠনের দাবিদার হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

২২.৬.৪ শাদুল্লাহ'র প্রথম ও দ্বিতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা

সাংবিধানিক সংকট এড়ানোর কথা উল্লেখ করে সেই সময় আসামের গভর্নর Sir Robert Neil Reid তাঁর প্রথম পছন্দ মহ. শাহদুল্লাহ-কে ১৫ মার্চ ১৯৩৭-এ শিলং-এ ডেকে পাঠান এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। প্রথমে কিছুটা বিস্মিত হলেও ১ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে মহ. শাদুল্লাহ আসামে প্রথম অ-কংগ্রেসি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। **প্রথম থেকেই নবগঠিত মন্ত্রীসভা ভাঙা নৌকার মতো যাত্রা শুরু করায় পদে পদে অনাস্থা-প্রস্তাবের মুখোমুখি হয়ে কোনোমতে টিকে থেকে ছিল**। ফলে, শাদুল্লাহ'র নেতৃত্বে প্রথম কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা মাত্র ৯ মাস স্থায়ী হয়েছিল। আসলে, ঐ মন্ত্রীসভা মূলত ইউরোপীয়দের সমর্থনের উপরই নির্ভরশীল ছিল। যদিও সেই সময় সমগ্র আসামে ৩,০০০-এর বেশি ইউরোপীয় জনসংখ্যা ছিল না, তথাপি ঐসব বাগান মালিকদের জন্য ৮টি আসন বরাদ্দ ছিল ; অথচ চা-

বাগানের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জন্য ১০৮ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪টি আসন। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য একদিকে ইউরোপীয় সদস্য এবং অন্যদিকে নিজ ধর্মভুক্ত সুরমা উপত্যকার মুসলিম সদস্যদের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হওয়ার ফলে 'মুসলিম লিগ'-এর সাথে শাদুল্লাহ'র সম্পর্ক ক্রমশ নিবিড় হতে শুরু করে। ১৯৩৭-এর অক্টোবরে শাদুল্লাহ 'মুসলিম লিগ'-এর লখনউ সম্মেলনে যোগ দেন। এরপরেই শাদুল্লাহ তাঁর মন্ত্রীসভায় 'ইউনাইটেড় পিউপিলস্ (মুসলিম) পার্টি'র দু'জন সদস্যকে (মহম্মদ ওয়াহিদ্ এবং আলি হায়দার খান) পদত্যাগের জন্য পীড়াপীড়ি করলে উক্ত দুজন মন্ত্রী অগ্রাহ্য করেন। ফলে, শাদুল্লাহ নিজেই পদত্যাগ করেন এবং ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ সালে শাদুল্লাহ'র প্রথম কোয়লিশন মন্ত্রীসভার পতন হয়। পরের দিনই ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ 'মুসলিম লিগে'র দুজন সদস্যসহ শাদুল্লাহ'র নেতৃত্বে দ্বিতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় সেটি ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ পর্যন্ত স্থায়ী হয় (সারণি '১৬' দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণের ১৫দিন পরেই আবার মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঐ সময় বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্য বসন্তকুমার দাস 'স্পিকার' বা অধ্যক্ষ ছিলেন। শাদুল্লাহ-এর নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে 'ক্ষমতালোভী অযোগ্য' আখ্যা দিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ অনাস্থা প্রস্তাবের সপক্ষে বক্তব্য পেশ করার সময় অ-কংগ্রেসি বিধায়ক আব্দুল রহমান এইরকম মন্তব্য করেন ঃ

> *....He (Sir Muhammad Sadullah) has given the House for one year no idea of his policy except the policy to keep himself in power.*

যাইহোক মাত্র ১ ভোটের ব্যবধানে কোনোমতে দ্বিতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা সে যাত্রায় রক্ষা পায়। **আসলে, সেই সময় থেকেই আসামে অর্থের বিনিময়ে বিধায়ক কেনা-বেচার 'ঘোড়া-ব্যবসা' শুরু হয়।** গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, "....there is reason to believe that a considerable amount of money passed in the purchase of votes." সরকার পক্ষ ও বিরোধী দলের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং কংগ্রেসের সমর্থনে বিধায়কের পাল্লা ক্রমশ ভারী হতে থাকে। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এ শাদুল্লাহ সরকারের বিরুদ্ধে আবার অনাস্থা প্রস্তাব পেশ হলে বিতর্কের আগেই ১৩ সেপ্টেম্বর শাদুল্লাহ তাঁর পদত্যাগ পত্র পেশ করেন এবং নতুন সরকার গঠন সাপেক্ষে গভর্নর তাঁকে কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। এইভাবে নাটকের সূত্রপাত হয়।

২২.৬.৫ সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে বরদোলই-এর নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা

বিধানসভা না ভেঙে অধিবেশন কিছুদিন স্থগিত বা মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোয়লিশন মন্ত্রীসভা গঠনের সম্ভাবনা দেখা দেয়, যদিও সেটি জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির বিরোধী ছিল। শাদুল্লাহ সরকারের পদত্যাগের আগে থেকেই এর জন্য আসাম কংগ্রেসে পর্দার অন্তরালে তোড়জোড় চলছিল। ১৯৩৮-এর ১৩ আগস্ট আসাম কংগ্রেসের সভাপতি বিষ্ণুরাম মেধি এক টেলিগ্রামে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন উদ্যোগী হয়ে আবুল কালাম আজাদ-কে পাঠিয়ে আসামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্ত করে 'জনবিরোধী' শাদুল্লাহ সরকারকে অবিলম্বে উৎখাত এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ঐ অনুরোধ অনুযায়ী, আজাদ আসাম-পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ছুটে আসেন এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ছাড়াও শাদুল্লাহসহ বিভিন্ন মুসলিম নেতাদের সাথেও আলোচনা করেন। কিন্তু আজাদ-এর ধারণা হয়, একটি সরকার গঠনের জন্য যে প্রয়োজনীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রয়োজন হয় সেটি কংগ্রেসের নেই ; অন্যান্য দল বা শক্তির সমর্থনপুষ্ট হয়েও আরও ২ জনের সমর্থন দরকার। আজাদ এইভাবে জোড়াতালি দিয়ে এবং অনৈতিকভাবে কংগ্রেসের উদ্যোগে সরকার গঠনের তীব্র বিরোধিতা করেন। আজাদের এই ভূমিকায় হতাশ হয়ে বিষ্ণুরাম মেধি, গোপীনাথ বরদোলই প্রভৃতি আসামের নেতৃবৃন্দ তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি (১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেসে নির্বাচিত) সুভাষচন্দ্র বসু'র হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। আন্তর্জাতিক সীমানায় অবস্থিত আসামের সমস্যাকে সুভাষচন্দ্র বসু একটু ভিন্ন চোখে দেখতেন ; কারণ আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হুমকির প্রেক্ষিতে স্থানটি সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। (প্রকৃতপক্ষে সেটিই পরবর্তী সময়ে হয়েছিল)। এইসব ধারণার বশবর্তী হয়েই জাতীয় কংগ্রেসের সামগ্রিক নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ একটি প্রাদেশিক সরকার আসামে প্রয়োজন বলে তিনি অনুভব করতেন এবং যদি সেই সুযোগ থাকে তাহলে কোয়ালিশন সরকার গঠনেও তাঁর আপত্তি ছিল না। স্বাধীনতা-সংগ্রামী লক্ষ্মীধর বোরা তাঁর স্মৃতিকথায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আগামীদিনে আসামের সামরিক গুরুত্ব যে কত বিরাট হতে পারে সেই সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রভূত আলোকপাত করেছেন। মেধি ও বরদোলই-এর তারবার্তা পেয়ে কালক্ষেপ না করে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র শিলং-এ ছুটে আসেন। প্রথমেই তিনি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নেতৃবৃন্দের সাথে সুরমা উপত্যকার নেতৃবৃন্দের

যে দ্বন্দ্ব ছিল সেটি মেটাতে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং সফল হন। অসমিয়া ঐতিহাসিক H. K. Barpujari এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ

> *Bose arrived in Shillong and played an important role by assigning the party with his wise counsel. Bose not only helped Bardoloi in forming the ministry but also helped in ironing out the differences with the Congressmen of the Surma valley over the composition of the ministry.*

স্বাধীনতা সংগ্রামী মহ. তায়েবুল্লা তাঁর *কারাগারোর চিঠি* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যেভাবে বজ্রের মতো কঠোর এবং ফুলের মতো কোমল ভূমিকা নিয়ে সুভাষচন্দ্র ঐ সময় বিভিন্ন সমস্যা মিটিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নেতার সাথে দূরভাষের মাধ্যমে আলোচনা করে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারকে আসামে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেটি অনেকের পক্ষেই ছিল অকল্পনীয়। ১০৮ সদস্য বিশিষ্ট আসাম বিধানসভায় কংগ্রেস কীভাবে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করবে তার একটা নীল-নক্‌শা ছিল মোটামুটি এইরকম ঃ 'স্পিকার'-কে বাদ দিয়ে কংগ্রেস সদস্য ৩২ ; আলি হায়দার খান-এর অনুগামী ১০ ; সুরমা উপত্যকার নির্দল (হিন্দু) ৬, আসাম উপত্যকার আদিবাসী ৪ ; আসাম উপত্যকার নির্দল ৩ = মোট ৫৫ জন। সুভাষ শিলং-এ গভর্নরের সাথে দেখা করে তাঁকে সম্মত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় সাময়িকভাবে ভারপ্রাপ্ত গভর্নরের দায়িত্বে ছিলেন Gilbert P. Hogg (২৫ জুন ১৯৩৮-২৪ অক্টোবর ১৯৩৮) এবং তিনি অবশেষে রাজি হন।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ গোপীনাথ বরদোলই প্রথমে পাঁচজনের একটি মন্ত্রী তালিকা (পরবর্তী সময়ে আরও তিনটি নাম ঃ ফখরুদ্দিন আলি আমেদ, মামুদ আলি এবং হায়দার খান যুক্ত হয়ে মোট আটজনের) শপথ গ্রহণের জন্য পেশ করেন এবং ১৯ সেপ্টেম্বর সরকারি গেজেটে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐদিনই Hockenhull-এর নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান লবির চাপে শাদুল্লাহ ৫৬ জন বিধায়কের স্বাক্ষর নিয়ে বরদোলই-এর নেতৃত্বে হবু মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব স্পিকার-এর কাছে পেশ করায় ঘটনা নাটকীয় মোড় নিতে শুরু করে। Hogg সাহেব শপথ অনুষ্ঠান স্থগিত করার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়েই ফেলেছিলেন। কিন্তু ঐ সময় শিলং-এ সুভাষের উপস্থিতির ফলে অবশ্য সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়। যে মন্ত্রীসভা তখনও গঠিত হয়নি, তার বিরুদ্ধে এইরকম অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায় না এই ঘোষণা দিয়ে স্পিকার সেটি বাতিল করে দেন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

গোপীনাথ বরদোলই-এর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করে। বরদোলই-এর পরামর্শ মতো স্পিকার বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দেন। ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে বিধানসভার অধিবেশন যখন আবার শুরু হয় তখন আবার বরদোলই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ৮ ডিসেম্বর অনাস্থা প্রস্তাব এলে ৫৪-৫০ ভোটে খারিজ হয়ে যায় ; কারণ ইতিমধ্যে ঐ মন্ত্রীসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। পর্দার অন্তরালে থেকে তরুণরাম ফুকন (যদিও তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন) বরদোলই মন্ত্রীসভা গঠনে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলেন।

যেভাবে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে প্রথম বরদোলই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল (যদিও সেটি মাত্র ১৪ মাস স্থায়ী হয়েছিল ; অর্থাৎ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ থেকে ১৬ নভেম্বর ১৯৩৯) তাতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতান্তর শুরু হয়েছিল। রাজেন্দ্র প্রসাদ ও আবুল কালাম আজাদ ঐভাবে মন্ত্রীসভা গঠনের মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস দলের 'পার্লামেন্টারি সাব কমিটি'র চেয়ারম্যান সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আসাম প্রশ্নে সুভাষের সাথে পুরোপুরি একমত ছিলেন এবং এই ব্যাপারে গান্ধিজিও শেষপর্যন্ত সুভাষকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ২১ ডিসেম্বর ১৯৩৮ সুভাষচন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠিতে গান্ধিজিকে লিখেছিলেন ঃ

> *.....But if Sardar Patel had not providentially come to my rescue, Maulana Sahib could never have given in at Shillong and perhaps you would not have supported my view-point against Maulana Sahib when the Working Committee met at Delhi. In that case there would not have been a Coalition Ministty in Assam.*

মৌলানা আজাদ আসাম প্রশ্নে এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে, 'পার্লামেন্টারি সাব-কমিটি' থেকে পদত্যাগে উদ্যত হয়েছিলেন। শেষে গান্ধিজি'র হস্তক্ষেপে আজাদ ক্ষান্ত হন। গান্ধিজি আশ্বাস দেন, বিধায়কদের সমর্থন আদায়ের জন্য আর্থিক লেনদেন হয়েছে কি না সেটি সরেজমিনে তদন্তের জন্য কিছুদিন পরে আজাদ ও সুভাষ উভয়েই আবার আসামে যাবেন এবং সেটি প্রমাণিত হলে বরদোলই মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হবে। এইভাবে ঐ রাজনৈতিক নাটকের পরিসমাপ্তি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার (১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) পর ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২২ অক্টোবর দেশের সমস্ত রাজ্যের কংগ্রেস মন্ত্রীদের অবিলম্বে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। সর্বত্র এটি কার্যকরী হলেও গোপীনাথ বরদোলই প্রথমে পদত্যাগে অনিচ্ছুক ছিলেন। পদত্যাগের শেষদিন ধার্য হয়েছিল ১৫ নভেম্বর

১৯৩৯ এবং শেষদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর নানা চাপের মুখোমুখি হয়ে অবশেষে বরদোলই ১৭ নভেম্বর পদত্যাগে বাধ্য হন। শূন্যস্থান পূরণের জন্য যথারীতি শাদুল্লাহ ক্ষমতায় ফিরে আসেন।

২২.৬.৫.১ সুভাষ ও আসাম

আসামের অগণিত মানুষের চোখে, সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয় নাম। কটন কলেজের ছাত্র সম্প্রদায় এবং নব গঠিত 'All Assam Progressive Youth Association' (AAPYA)-এর আন্তরিক আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে না পেরে হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি দ্বিতীয়বার আসামে এসেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার একমাসের মধ্যে (৬ অক্টোবর ১৯৩৯)। এই সালটি ছিল সুভাষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ ১৯৩৯ সালে গান্ধিজির ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত্রিপুরি কংগ্রেসে দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর অন্যদের অসহযোগিতার কারণে সুভাষকে শেষপর্যন্ত এপ্রিল মাসে কংগ্রেস ত্যাগ করে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দল গঠন করতে হয়। যাইহোক, দ্বিতীয়বার একদিনের আসাম সফরে যখন সুভাষচন্দ্র পান্ডুঘাটে অবতরণ করেন, সেই সময় কংগ্রেস সভাপতি না হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র গুয়াহাটি শহর উৎসবের সাজে সেজেছিল। অসমিয়াদের অভ্যর্থনার রীতি অনুযায়ী, সর্বত্রই তাঁকে 'গামুচা', 'জাপি' ইত্যাদি উপহার দিয়ে বরণ করা হয়েছিল। গুয়াহাটিতে AAPYA-র জাতীয়তাবাদীরা সমবেত হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শর্মাকে সভাপতি এবং উপেন্দ্রনাথ শর্মাকে সাধারণ সম্পাদক করে ঐ সভা থেকেই AAPYA আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। আসামে সুভাষচন্দ্রের এটিই ছিল শেষ সভা। সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার আসাম সফরের একমাস পরে জাতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বরদোলই-এর নেতৃত্বাধীন সরকারকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জনিত ব্রিটিশ বিরোধিতার কারণে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, যদিও সুভাষ আসামকে জাতীয় কংগ্রেসের ঐ সিদ্ধান্তের বাইরে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

২২.৭ আসামে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রভাব (Impact of 'Quit India Movement' on Assam)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে গান্ধিজি স্বাধীনতার দাবিতে ইংরেজ সরকারকে বিব্রত করার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> *How are we to fight for independence with those whose own independence is in grave peril?*

২২.৭.১ 'আগস্ট আন্দোলন'-এর সূত্রপাত

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মিত্রশক্তির সাময়িক পশ্চাদপসরণ, হিটলার-মুসোলিনি-তোজো প্রভৃতি ফ্যাসিস্ট শক্তির ক্রমাগত অগ্রগতি ও ঝোড়ো উত্থান সমগ্র পৃথিবীতে এক অভূতপূর্ব অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল। জওহরলাল নেহরু সহ অনেকেই ফ্যাসিবাদকে সর্বশক্তি দিয়ে মোকাবিলা করার জন্য উদাত্ত-আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই বিশেষত 'ক্রিপস্ মিশন' (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪২)-এর ব্যর্থতার পর গান্ধিজির মত পরিবর্তন হয়। ইংলন্ডে চার্চিলের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেটের সদস্য হিসেবে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের প্রস্তাব ছিল, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলে, যুদ্ধ শেষে কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো 'ডোমিনিয়ন' মর্যাদা ভারতকে দেওয়া হবে। জাতীয় কংগ্রেস ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। 'পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবি ইংরেজ সরকারকে মানতে বাধ্য করার জন্য ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে ওঠে। গান্ধিজির ইচ্ছা অনুযায়ী, ১৯৪২ সালের ৭-৮ আগস্ট বোম্বাই (মুম্বাই)-এ অনুষ্ঠিত এ. আই. সি. সি. অধিবেশনে ব্যক্তিগত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জওহরলাল নেহরুকেই 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব পেশ করতে হয় এবং বল্লভভাই প্যাটেল সেটি সমর্থন করেন। আসলে, **আন্দোলনের সময় নির্বাচন নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যেই যথেষ্ট মতপার্থক্য ছিল। ব্রিটিশ বিরোধিতা ও স্বাধীনতার প্রশ্নে সকলে একমত হলেও জওহরলাল, মৌলানা আজাদ, রাজাগোপালাচারী, সরোজিনী নাইডু, ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ মনে করতেন যে, ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ব্রিটিশ ভারতত্যাগ করলে অনিবার্যভাবেই আগ্রাসী জাপান এগিয়ে আসবে ভারত দখল করতে।** ১৯৪২-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুর, ৭ মার্চ রেঙ্গুন, ১২ মার্চ আন্দামান দখলের পর জাপানি সেনাবাহিনী ভারতের দরজায় কড়া নাড়ছিল। অন্যদিকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনি, প্যাটেল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই ধারণার সাথে একমত ছিলেন না এবং গান্ধিজির ইচ্ছাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। যাইহোক, শেষপর্যন্ত সকলে একমত হয়ে গান্ধিজিকে সমর্থন করেন এবং ৮ আগস্ট ১৯৪২-এর মধ্যরাতে মুম্বাই-এর 'গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে' (যেটি 'ক্রান্তিময়দান' নামে পরিচিত) গান্ধিজি আওয়াজ তুললেন **'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'** (করব অথবা মরব); যেটি মুহূর্তে সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হল। এইভাবে গান্ধিজি'র ডাকে সমগ্র ভারত-জোড়া স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম শুরু হল—যেটি **'আগস্ট আন্দোলন'** বা **'ভারত-ছাড়ো আন্দোলন'** নামে পরিচিত।

২২.৭.২ ব্যাপক গ্রেফতার ও অগ্নিগর্ভ আসাম

ব্রিটিশ পুলিশ ওৎ পেতে বসেছিল এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গান্ধিজি, নেহরু, আজাদ থেকে শুরু করে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম স্তরের নেতৃত্বের প্রায় সকলকেই একসাথে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৯ আগস্ট থেকে আন্দোলনের দাবাগ্নি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আসামে ৯ থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে কংগ্রেসের অগ্রণী নেতাদের অধিকাংশ গ্রেফতার-বরণ করতে বাধ্য হলেন ; তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মহ. তায়েবুল্লা, গোপীনাথ বরদোলই, সিদ্ধিনাথ শর্মা, লীলাধর বরুয়া, বিষ্ণুরাম মেধি, ফখরুদ্দিন আলি আমেদ, পদ্মধর চালিহা, দেবেশ্বর শর্মা, অরুণ কুমার চন্দ, কেদারনাথ ভট্টাচার্য, লখেশ্বর বরুয়া, হরেকৃষ্ণ দাস, পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত, চঞ্চলকুমার শর্মা ও অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্য (শেষ দুজন—অর্থাৎ শর্মা ও ভট্টাচার্য—কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকার কারণে কংগ্রেস সংগঠনের পদাধিকারী ছিলেন) প্রমুখ। অমিয়কুমার দাশ অসুস্থ থাকার কারণে এবং গান্ধিবাদী অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য প্রথমে রেহাই পেলেও শেষে গ্রেফতার হয়েছিলেন। **১০ আগস্ট আসাম সরকার কংগ্রেস দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় এবং শাদুল্লাহ'র নেতৃত্বাধীন সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় ইংরেজদের পক্ষে আন্দোলন দমন করা সহজ হয়েছিল।** গান্ধিবাদী অহিংস পথে সত্যাগ্রহ, মিছিল, হরতাল, সরকারি ভবনে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও **মুহূর্তে এটি সহিংস রূপ ধারণ করেছিল** এবং সরকারি ভবনে অগ্নি সংযোগ, পোস্ট ও টেলিগ্রাফের লাইন ছিন্নভিন্ন করা, রেল লাইন উড়িয়ে দেওয়া, থানা আক্রমণ, সামরিক বাহিনীর সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি নানা ঘটনায় উত্তেজনাও বেড়েছিল। প্রথম স্তরের নেতৃবৃন্দ কারাবন্দি থাকার ফলে এবং অধিকাংশ স্থলে ছাত্র-যুবরা নেতৃত্বে আসায় আসামসহ অন্যত্র হিংসাত্মক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো উদ্যোগ তেমন ছিল না। আগস্ট মাসের শেষদিকে কামরূপ, নওগাঁও, দরং, শিবসাগর প্রভৃতি জেলার একটার পর একটা লোমহর্ষক ঘটনায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। **আসলে, সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি না থাকায় আসামে আগস্ট আন্দোলন কিছুটা দিশাহীন ছিল।** K. N. Dutt তাঁর গ্রন্থে (*Landmarks of the Freedom Struggle in Assam*) দেখিয়েছেন, কীভাবে কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে এবং গান্ধিজির জয়ধ্বনি দিয়ে সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাবলীতে মর্মাহত গান্ধিবাদী নেতা অমিয়কুমার দাশ আন্দোলনকারীদের ধিক্কার জানিয়েছিলেন। আসামসহ ভারতের অন্যত্র একই ধরনের ঘটনার কথা জেনে ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরে জেল থেকে এক চিঠিতে

গান্ধিজি নিজেই মন্তব্য করেছিলেন ঃ "People had gone wild with rage to the point of loosing self-control" কংগ্রেসের সরকারি ঐতিহাসিক পট্টভি সীতারামাইয়া তাঁর গ্রন্থে (*History of Indian National Congress*, vol. II) উল্লেখ করেছেন কীভাবে "People grew insensate and were maddened with fury" এইসব গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও মন্তব্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, ১৯৪২-এর অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে গান্ধিজির অহিংস নীতি কীভাবে আকর্ষণ হারিয়েছিল এবং উপেক্ষিত হয়েছিল। P. N. Chopra সম্পাদিত *Quit India Movement* গ্রন্থে ব্রিটিশ সরকারের সেই সময়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গোপন দলিলসহ ব্রিটিশ প্রতিনিধি T. Wickenden-এর রিপোর্টের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ

> ***The (1942) movement also showed the end of Gandhian era. Gandhi's non-violence proposals were no longer popular.***

১৯৪২-এ আসাম আন্দোলনের দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ (১) আন্দোলনের বর্শামুখ ব্রিটিশ শাসনের দুটি প্রতীক ঃ থানা ব্রিটিশ আদালতের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত ছিল। (২) উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ওপার থেকে সম্ভাব্য জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত রকম বিপর্যয় ঠেকাতে সকলকে সাহসী করার ব্রত এবং একই সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির জন্ম। জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, লক্ষ্মীপ্রসাদ গোস্বামী, শংকরচন্দ্র বরুয়া, মহেন্দ্র হাজারিকা, ব্রজনাথ শর্মা, গহনচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি নতুন নেতৃত্ব গ্রেফতারি পরোয়ানা অগ্রাহ্য ও আত্মগোপন করে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। মেদিনীপুরের তমলুকের মতো আসামেও কিছু ক্ষেত্রে 'শান্তি সেনা' গঠন করে গ্রামীণ স্তরে বিকল্প সরকার গঠনের উদ্যোগও ছিল। যদিও বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলি ব্যাপক জনসমর্থনের অভাবে আসামে খুব বেশি সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পায়নি; তথাপি 'আগস্ট আন্দোলনে' সমিতিগুলির প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। অসুস্থ কংগ্রেস নেতা হেমচন্দ্র বরুয়া বিভিন্ন সমিতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন।

২২.৭.৩ বিভিন্ন জেলার চিত্র

২২.৭.৩.১ কামরূপ

১৯৪২-এর ১৫ আগস্ট থেকে কামরূপে উত্তেজনা বাড়তে শুরু করে। বিশেষ করে বরপেটা মহকুমায় (তখনও স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে বরপেটা আত্মপ্রকাশ করেনি) সরকারি সম্পত্তি, মৌজাদার-সরকারি উকিল-সামরিক কনট্র্যাকটর-মণ্ডল-

প্রভৃতির ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। ব্রজনাথ শর্মার নেতৃত্বে একদল আন্দোলনকারী সরভোগে ২৬ আগস্ট বেকি নদীর পাড়ে এক মাস আগে থেকে নির্মীয়মাণ 'সপ্না' বিমানবন্দরে হানা দিয়ে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ধ্বংস করে দেন। সরভোগ শহরও ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে মুক্তি পায়নি। শর্মা ও তাঁর অনুগামীরা রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যান। কামরূপ জেলার বজালি-নলবাড়ি-তিহু-পট্টচারকুচি প্রভৃতি স্থান সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের জন্য শীর্ষস্থানে চলে আসে। বরপেটার 'অহিংসা বিপ্লবী সংঘ', কিংবা জালা এলাকার 'হনুমান' দল, অথবা বজালির 'কর্ম পরিষদ' প্রভৃতি গুপ্ত সংস্থার ব্রিটিশ বিরোধী কাজকর্মে শান্তিপ্রিয় গ্রামীণ এলাকার কেউ কেউ অবশ্য উদ্‌বিগ্ন ছিলেন। ১৯৩৪ সালে গান্ধিজি এবং ১৯৩৭ সালে জওহরলাল নেহরু বরপেটায় এসে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বরপেটাতেই এক সময় প্রকাশ্যে কাজ করে কংগ্রেসকে অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি, মহেন্দ্রমোহন চৌধুরি, দেবেন্দ্র শর্মা, চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানি অক্ষয়কুমার দাস, ধনীরাম তালুকদার, সোনারাম চৌধুরি, উমেশচন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ব্যক্তি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। খাজনা-বন্ধ অভিযানের ফলে নলবাড়ি, তিহু সহ অনেক তহশিল থেকে ১৯৪৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একটি পয়সাও রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়নি। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর থেকে কামরূপ জেলার বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতে শুরু করে ; স্থানগুলির মধ্যে পাণ্ডু, গুয়াহাটি, নলবাড়ি ও পাঠশালা রেল স্টেশন, নলবাড়ি স্কুল, কটন কলেজ, গুয়াহাটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অন্যতম। যদিও সরকারি সম্পত্তি ক্ষতির পরিমাণ খুব একটা বিরাট ছিল না ; তথাপি প্রতিটি ঘটনার পিছনে ছাত্রদের একাংশ জড়িত ছিল বলে পুলিশের সন্দেহ। কামরূপ জেলার পানিখাতি—পানবাড়ি বিভাগে ২৪ নভেম্বর ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্য বিশেষ একটি ট্রেনে অন্তর্ঘাতের জন্য দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু এবং ৪১ জন জখম হয়েছিলেন। একই ধরনের আরও দুটি ট্রেন দুর্ঘটনা ১৯৪৩ সালে জানুয়ারি ও মার্চ মাসে ঘটেছিল। ঐ ডিভিসনের কমিশনার C. S. Gunning ৩ এপ্রিল ১৯৪৩-এ একটি গোপন চিঠিতে আসামের চিফ সেক্রেটারিকে জানিয়েছিলেন ঃ

> *It is at present probably the most disorderly area in the province. This open defiance is setting a very bad example to disturbers of the peace elsewhere.*

২২.৭.৩.২ নওগাঁও

গুয়াহাটি থেকে মাত্র ১২৩ কিমি দূরে প্রায় ৪,০০০ বর্গ কিমি বেষ্টিত নওগাঁও ছিল একসময় আসামের অন্যতম বৃহৎ জেলা। নাগা, মিকির, উত্তর কাছাড় পার্বত্য

এলাকার অধিকাংশ এই জেলার অঙ্গীভূত ছিল। ১৮৬১ সালে ঐতিহাসিক ফুলাগুড়ি কৃষক বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে নওগাঁও-এর সংগ্রামী ঐতিহ্যে গান্ধিজি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জওহরলাল নেহরু সহ জাতীয় নেতাদের অনেকে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মাইলস্ ব্রনসন, নাথান ব্রাউন প্রভৃতি আমেরিকান মিশনারিরা এই জেলাতেই আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন থেকে শুরু করে গুণাভিরাম বরুয়া প্রভৃতি আসামের বরেণ্য সন্তানদের অনেকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এই জেলাতেই কাটিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে এ. আই. সি. সি.-র সভাপতি দেবকান্ত বরুয়া থেকে শুরু করে অনেক প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ-এর জন্মভূমি ছিল নওগাঁও। ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়া, নবকান্ত বরুয়া, সহিস বোরা, যোগেশ্বর শর্মা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অসমিয়া সাহিত্যিকরা এই জেলাতেই জন্মেছিলেন। সুতরাং গর্ব করার মতো অনেক কিছুই নওগাঁও-এ আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নওগাঁও-এর সংগ্রামী ঐতিহ্য ১৯৪২-এ আগস্ট আন্দোলনের সময় মূলত সহিংস পদ্ধতিতেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

নওগাঁও-এ আন্দোলনকারীদের মূল টার্গেট ছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও কেন্দ্রগুলির উপর আক্রমণ হানা এবং এর ফলে, নানারকম অঘটন, পুলিশের গুলি ও জীবনহানিও ঘটেছিল। **শিলঘাটে** এরকম একটি সামরিক গুদাম-ঘর নষ্ট করে সামরিক পেট্রোল ডিপোতে আগুন ধরানোর চেষ্টা হয়েছিল। শিলঘাট-চাপারমুখ রেল-লাইন সব সময় পাহাড়া দেবার জন্য আসাম সরকার দুই প্লেটুন 'আসাম রাইফেলস্'-এর বাহিনী নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিল। সামরিক বাহিনীর সড়ক যোগাযোগ নিরাপদ রাখতে একই ধরনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। এই অবস্থায় বিচলিত হয়ে সেই সময় পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল নওগাঁও জেলায় **"an atmosphere of rebellion"** তৈরি হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছিলেন।

২৫ আগস্ট ১৯৪২-এ ঐ জেলার কামপুর এলাকায় ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে আন্দোলনকারীরা মিছিল করার সময় পোস্ট অফিস, রেল স্টেশন, সার্কেল অফিসে ভাঙচুর করে পুলিশের দারোগা থেকে সরকারি বড়ো অফিসারদের সকলের মাথায় গান্ধি-টুপি পড়িয়ে 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি দিতে বাধ্য করেছিলেন এবং সিপাইদের একদিন আটকে রেখেছিলেন। অন্যদিকে ফুলাগুড়িতে আর একদল আন্দোলনকারী রেল-স্টেশনসহ রেলকর্মীদের আবাসস্থলে অগ্নিসংযোগ করে, জাজোরি-তে পোস্ট অফিস, কাটিয়াতোলি'তে সরকারি বাংলো, রাহা-তে সার্কেল অফিস, পুরানিগুদাম, ব্যাবেজিয়া ও কালিয়াবোরে সরকারি সম্পত্তি ও মাদক-

ব্যবসায়ীদের দোকান ইত্যাদি প্রায় ধ্বংস করে একটা চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। অন্তর্ঘাতের কারণে ২৪ আগস্ট ব্যাবেজিয়ায় এবং ২৫ আগস্ট কামপুরে দুটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছিল। সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, কীভাবে অরাজকতার মুখোমুখি হয়ে যমুনামুখ থানার পুলিশ 'ঠুঁটো জগন্নাথ' হয়ে বসেছিলেন (...the police station "appeared to be paralysed by the lawlessness and police did nothing")। ২৫/২৬ আগস্ট ব্যাবেজিয়ায় একটি কাঠের সেতু ধ্বংস করার পরবর্তী অধ্যায়ে পূর্ত দপ্তরের কারিগররা মেরামতি করতে এলে উত্তেজিত আন্দোলনকারীরা তাদের তাড়িয়ে দেন। পরে পুলিশ এসে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে গুলি চালালে কোলাই কোচ এবং হেমোরাম বোরা'র ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এবং ছয় জন গুরুতরভাবে জখম হন। একই দিনে জঙ্গলবলাহুগড় এলাকায় দিঘালিয়াতি সেতুর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে এবং পুলিশের গুলিতে হেমোরাম পটর এবং গুণাভিরাম বরদোলই-এর জীবনহানিসহ তিনজন গুরুতরভাবে আহত হন। শান্তিবিঘ্নকারীদের সন্ধানে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গ্রামে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন এবং চারিদিকে তল্লাশি অভিযান শুরু হলে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বড়পুজিয়া গ্রামে ২৮ আগস্ট রাত্রে পুলিশ-অভিযানের আগামবার্তা সম্পর্কে মোষের শিঙা ফুঁকিয়ে 'শান্তিসেনা'র স্বেচ্ছাসেবক তিলক ডেকা সকলকে যখন সতর্ক করে দিচ্ছিলেন সেই সময় পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। এইভাবে ১৯৪২-এর আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশের গুলির আঘাতে নওগাঁও জেলায় ৫ জন শহিদ হন এবং তাঁদের স্মরণে ১৬ সেপ্টেম্বর **'পঞ্চবীর দিবস'** উদযাপিত হয়। এইসব যোদ্ধাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ গৃহীত হয়। 'শান্তিসেনা'র যেসব ডেরা পুলিশ ভেঙে দিয়েছিল সেগুলি আবার নতুন করে তৈরি হয় এবং বরহাসপুরে ১৮ সেপ্টেম্বরে আন্দোলনকারী একটি আনন্দ উৎসবে মিলিত হয়ে যখন নতুন শিবির তৈরি করছিলেন সেই সময় পুলিশের সাথে বচসা শুরু হয়। এই সময় একদল মহিলা কংগ্রেসি-ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে শ্লোগান দিয়ে এগিয়ে এলে এবং সামরিক অফিসাররা সেগুলি কেড়ে নিতে চেষ্টা করলে **ভোগেশ্বরী ফুকনানি** নামে একজন বয়স্ক মহিলা তাঁর কন্যাকে পুলিশের অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য ঐ বাহিনীর অফিসার Capt. Finish-কে ঝাণ্ডার লাঠি দিয়ে আঘাত করলে সামগ্রিক অবস্থার অবনতি শুরু হয়। প্রথমে বেত্রাঘাত, লাঠি চার্জ এবং অবশেষে Capt. Finish এর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর নির্বিচারে গুলিবর্ষণের ফলে লক্ষ্মীকান্ত হাজারিকা, যোগিরাম সুত, বোলোরাম সুত ঘটনাস্থলেই নিহত হন। গুলির গুরুতর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ভোগেশ্বরী ফুকনানি তিনদিন পরে মৃত্যুবরণ করেন।

নওগাঁও-এ ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে যে দুজন আত্মগোপনকারী নেতাকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তন্ন-তন্ন করে সর্বত্র খুঁজেছে তাদের একজন **মহেন্দ্রনাথ হাজারিকা** এবং অন্যজন **লক্ষ্মীপ্রসাদ গোস্বামী**-যাঁরা ১৬০০ সদস্য বিশিষ্ট তথাকথিত 'শান্তিসেনা'র নেতা। মহেন্দ্রনাথ অবশ্য ছোটো একটা 'মৃত্যুবাহিনী'ও তৈরি করেছিলেন। ব্রিটিশ সামরিক অফিসারদেরর চোখে, মহেন্দ্রনাথ হাজারিকা ছিলেন নওগাঁও-এর "Public Enemy No. 1" এবং লক্ষ্মীপ্রসাদ গোস্বামী ছিলেন "the brain behind the campaign" এবং দুজনেরই মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল কয়েক হাজার টাকা। প্রত্যেক সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত-সংগঠনের ক্ষেত্রে যা হয়, এক্ষেত্রেও স্বল্প দিনের মধ্যেই সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হল। ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে পাণিগাঁও-এ এক গোপন সভায় গোস্বামী এইসব সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের পথ-পদ্ধতি-পরিণতি সম্পর্কে সমালোচনামূলক বক্তব্য পেশ করার পর হাজারিকা ঘোষণা করলেন, ভারতের এই শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো পথকেই (সন্ত্রাসবাদী ইত্যাদি যাইহোক) অন্যায় বলা অথবা প্রশ্ন করা উচিত নয় এবং আগামীদিনে আরও বড়ো আক্রমণ হানার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। দুই নেতার এই বিরোধের ফলে 'শান্তিবাহিনী' বা 'মৃত্যুবাহিনী'র কাজকর্ম নওগাঁও-এ নানাভাবে বিঘ্নিত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩-এ রূপাহি থানার অধীনস্থ একটি গ্রামে রাত্রে মহেন্দ্রনাথ হাজারিকা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সেই সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সামরিক বাহিনী গ্রামটি ঘিরে ফেলে এবং সহজেই হাজারিকাকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়। এদিকে লক্ষ্মীপ্রসাদ গোস্বামী গ্রেফতার এড়ানোর জন্য কলকাতায় পালিয়ে যান। এরপর হাজারিকার প্রায় সকল অনুগামীকে পুলিশ একে একে গ্রেফতার করলে নওগাঁও-এর আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হতে শুরু করে।

২২.৭.৩.৩ দরং

ব্রিটিশ শাসনাধীন আসামে ১৮৩৩ সালে দরং জেলাটির সৃষ্টি হয়। প্রথমে মঙ্গলদই এবং ১৮৩৫ সালে তেজপুরে সদরদফতর স্থানান্তরের পর ৩৪৮১ কিমি জোড়া এই জেলাটি—বিশেষত তেজপুর আসামের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯২১ এবং ১৯৩৪ সালে আসাম সফরের সময় গান্ধিজি তেজপুরের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ধ্বনি দরং জেলাতে গভীরপ্রভাব বিস্তার করেছিল। **গান্ধিবাদী পথে আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৪২ সালে এই জেলাতেই স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে বেশি মানুষকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল।** আন্দোলন শুরুর সাথে

সাথে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের ফলে যুবকদের হাতেই দায়িত্ব ন্যস্ত হয় এবং জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, গহনচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি যুবকরা প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে এগিয়ে আসেন। 'আগস্ট আন্দোলন'-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এই জেলার তেজপুর, সুতিয়া, গোহপুর, ঢেকিয়াজুলি এবং এবং জামুগুড়িতে ঘটেছিল। আত্মগোপনকারী আন্দোলনকারীরা 'শান্তি সেনা'র কর্মকেন্দ্র তেজপুর থেকে কটেকিবাড়ি, পাতালরচুক, জামুগুড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় সময়ের তালে তালে পরিবর্তন করেছেন। **সুতিয়া ও জামুগুড়িতে কিছুদিনের জন্য জনগণের 'রাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রথমদিকে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী পর্যন্ত নিরাপত্তার অভাবজনিত কারণে ঐ এলাকায় প্রবেশ করতে ইতস্তত করত।** ১৯৪২ সালে আসামের শাদুল্লাহ সরকার দরং জেলার সুতিয়া-কে আইন শৃঙ্খলা অবনতির প্রশ্নে 'plague spot' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। আসামের অন্যান্য জেলার তুলনায় দরং-এ সবচেয়ে বেশি মহিলা পিকেটিং, মিছিল ইত্যাদিতে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৪২-এ দরং জেলায় দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ **নারী জাগরণ** হয়েছিল বলা যায়।

আত্মগোপনকারী জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ও পুষ্পলতা দাশ-এর নেতৃত্বে দরং জেলার আন্দোলনকারীরা সর্বসম্মতভাবে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ জেলার সর্বত্র ব্রিটিশ শাসনের প্রতীক থানা ও আদালতে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দীর্ঘ মিছিল সমাবেশের জন্য চারিদিকে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করে দেন। সুরেন্দ্রনাথ বরুয়া (তাঁর *Kanaklata : A Heroine and Martyr* গ্রন্থে) উল্লেখ করেছেন ঃ

> *The whole atmosphere from Dhekiajuli to Howajan was surcharged with a high sense of partiotism and a sense of unity of purpose.*

২০ সেপ্টেম্বর সুতিয়া, বিহালি, জামগুড়ি প্রভৃতি এলাকায় পুলিশের বাধা অগ্রাহ্য করে থানায় কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন সম্ভব হলেও ঢেকিয়াজুলিতে পুলিশের প্রচণ্ড বাধার মুখোমুখি আন্দোলনকারীদের হতে হয়। যদিও কমলাকান্ত দাস-এর নেতৃত্বে পাঁচ হাজার মানুষের জঙ্গি মিছিল প্রথম দিকে **ঢেকিয়াজুলি থানা** দখল করতে সক্ষম হয়েছিল ; কিন্তু বাহিনীর শক্তি-বৃদ্ধির পরই শুরু হয় আন্দোলনকারীদের উপর নির্বিচারে বেত্রাঘাত, পাশবিক অত্যাচার ও **বেপরোয়া গুলি বর্ষণ। ১১ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়, যার মধ্যে ৩ জন ছিলেন মহিলা**— তিলেশ্বরী বরুয়া, কুমালি দেবী, খেহুলি নাথ।

একই দিনে (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪২) দরং জেলার **গোহপুর থানার** সামনে একই ধরনের ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রায় ৫,০০০ মানুষ

গোহপুর থানা ঘেরাও করে রাখে। একজন থানার একটি রান্নাঘরে অগ্নিসংযোগ করে এবং অন্যরা পুলিশের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং এরই মাঝে ১৮ বছরের মেয়ে **কনকলতা বরুয়া** থানায় কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। কনকলতার দুই সঙ্গী মুকুন্দরাম কাকতি এবং হেমকান্ত বোরা গুরুতরভাবে জখম হওয়ার পর আন্দোলনকারীরা ঐ দুটি দেহ নিয়ে স্থানীয় ইউরোপীয় চা বাগানের এবং লোকাল বোর্ডের ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে প্রত্যাখ্যাত হন। ফলে, পথিমধ্যে মুকুন্দরাম কাকতির মৃত্যু ঘটে। শুধু তাই নয়, মুকুন্দরামের ভাই তাঁর দাদার সন্ধানে থানায় খোঁজ খবর নিতে গেলে পুলিশ তাঁকেও গ্রেপ্তার করে। **১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে সমগ্র আসামে যে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছিল, তার মধ্যে কনকলতা'র প্রাণ বিসর্জন আসামের অগণিত মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে।**

২২.৭.৩.৩.১ কনকলতা বরুয়া

১৯২৪ সালের ২২ ডিসেম্বর দরং জেলার গোহপুর থানার অন্তর্গত বরঙ্গবাড়ি গ্রামে একটি সাধারণ 'দোলাকাশারিয়া' গোঁড়া পরিবারে কনকলতার জন্ম হয়েছিল। ৫ বছর বয়সে বাবা-মা'কে হারিয়ে অনাথ কনকলতা ছোটোবেলা থেকেই অত্যন্ত দায়িত্বশীল ছিলেন। নিজের ভাই-বোনদের প্রতি কনক-এর মমত্ববোধ ছিল অপরিসীম। এই দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি অবশেষে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন এবং ভাই বোনদের না জানিয়ে 'মৃত্যুবাহিনী'-তে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে অন্য দিনের মতো ঘরের প্রাত্যহিক কাজকর্ম শেষ করে বরঙ্গবাড়ি চারিয়ালি'তে মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য ছোটেন এবং মেয়েদের সারিতে সকলের সামনে তেরঙা ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ১২ কিমি দূরে গোহপুর থানার দিকে শ্লোগান দিয়ে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে আরও অনেকে যোগ দেওয়ায় মিছিলটি আয়তনে বেশ বড়ো হয়। থানার সামনে আসার পর স্থানীয় নেতৃত্ব মহিলাদের একটু পিছনে দ্বিতীয় সারিতে রাখার নির্দেশ দিলে কনকলতা সেটির বিরোধিতা করে একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন এবং প্রয়োজনে মহিলাদেরই প্রথম প্রাণ বিসর্জনের আহ্বান জানান। ইতিমধ্যে গোহপুর থানার অন্তর্ভুক্ত কলাবাড়ি, কামদেউল, দুবিয়া প্রভৃতি এলাকা থেকে গোলোক পূজারি, নিরোদবরণ দাস, চন্দ্র বরদোলই, মিলেশ্বর কাকতি, উমা বরদোলই, ভুবনেশ্বর কাকতি প্রভৃতি স্থানীয় নেতৃত্বের উদ্যোগে

মিছিল থানার সামনে সমবেত হলে পুলিশ প্রমাদ গুণতে শুরু করে এবং হতভম্ব হয়ে যায়। কনকলতা তেরঙা পতাকা হাতে নিয়ে প্রথম পুলিশকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবেই থানার উপর ঐ পতাকা উড্ডীন করতে চান। কিন্তু পুলিশ বাধা দিলে কনকলতা বন্দুকধারী পুলিশকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যান। গুলি করার নির্দেশ উপর থেকে না আসা সত্ত্বেও হতবুদ্ধি জনৈক পুলিশ কনস্টেবল গোপাল চিপাহি ট্রিগার টিপে দেওয়ায় ঘটনাস্থলেই কনকলতার মৃত্যু হয়। মাথায় আঘাত পাওয়ার জন্য কনক-এর সঙ্গী মুকুন্দরাম কাকতি ২০ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় প্রাণ হারান। ঐ ঘটনায় যাঁরা গুরুতরভাবে জখম হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হেমকান্ত বোরা, ফুলেশ্বর রাজখোওয়া, ভোলা বরদোলই প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। ঐদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে রামপতি রাজখোওয়া থানার উপরে পতাকা উড়িয়ে কনকলতার অসমাপ্ত কাজের যবনিকা টানেন। বরঙ্গবাড়ি গ্রামে কনকলতার মৃতদেহ সৎকারের জন্য আনা হয় এবং রাত্রে মুকুন্দ কাকতির মৃতদেহ এলে একই স্থানে দাহ করা হয়।

কনকলতার আত্মত্যাগ এবং জীবনবিসর্জনের কাহিনি আসামের সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও গভীর প্রভাব ফেলে। এই বীরাঙ্গনাকে কেউ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের অন্যতম নায়িকা ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ; কেউ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের কিংবদন্তি সমবিদ্রোহী নায়িকা জোয়ান-অব-আর্ক-এর সাথে তুলনা করেছেন। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে আসামে যে কজন শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষত দুটি নাম—দরং-এর কনকলতা বরুয়া এবং গোলাঘাটের কুশল কুঁওর সমগ্র আসামের জনমনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল ও উদ্‌বেলিত করেছিল (কুশল কুঁওর-এর মৃত্যু কাহিনি 'শিবসাগর' পর্বে দ্রষ্টব্য)।

২২.৭.৩.৪ শিবসাগর

আসামের সবচেয়ে পুরাতন শহর শিবসাগর আহোম যুগে ছিল প্রধান কর্মকেন্দ্র। ব্রিটিশ শাসনে অবিভক্ত **শিবসাগর জেলার অভ্যন্তরেই গোলাঘাট, জোড়হাট, কার্বি-আলং প্রভৃতি অঞ্চলগুলি ছিল (যেগুলি বর্তমানে স্বতন্ত্র জেলা)। আসামের অন্যান্য জেলার মতো শিবসাগরেও অহিংস এবং সহিংস-এই উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন পরিচালিত হত—একদিকে ছিল 'শান্তিবাহিনী', অন্যদিকে 'মৃত্যুবাহিনী'।** ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ ৫০০ মানুষ একত্রিত হয়ে ডেরাগাঁও থানায় কংগ্রেস পতাকা উড়িয়ে দিয়ে সাব ডেপুটি কালেক্টর-এর মাথায় গান্ধিটুপি পড়িয়ে দিয়েছিলেন। জোড়হাটে সরকারি অফিসগুলি

আন্দোলনকারীদের দখলে চলে গিয়েছিল এবং কর্মচারীদের পদত্যাগের নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। ৮ সেপ্টেম্বর শিবসাগর শহরে তিনটি বড়ো মিছিলে সমগ্র এলাকা প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহিলাদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় ; পুলিশের লাঠি বেত্রাঘাতও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দমাতে পারেনি। তিয়োক থানায় ২৭ সেপ্টেম্বর ও ১৫ অক্টোবর মহিলারাই তেরঙা পতাকা উড্ডীনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

শিবসাগর জেলার মধ্যে ১৯৪২ সালে গোলাঘাট হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে বেশি অশান্ত। ঐ সময় গোলাঘাটে অগ্রণী নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন কুশল কুঁওর, কমলা মিরি, শংকরচন্দ্র বরুয়া, তারাপ্রসাদ বরুয়া, রাজেন্দ্রনাথ বরুয়া, দ্বারিকানাথ গোস্বামী, গৌরীলাল জৈন, গঙ্গারাম বড় মেধি প্রমুখ। কুশল কুঁওরের ফাঁসি সমগ্র আসামে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কারান্তরালে বন্দি অসুস্থ মিশিং নেতা কমলা মিরিকে রাজনীতি না করার শর্তসাপেক্ষে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মুক্তির প্রস্তাব দিলে মিরি ঘৃণাভরে সেটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং ২২ এপ্রিল ১৯৪৩-এ জোড়হাট জেলে তাঁর মৃত্যু হয়। 'মৃত্যুবাহিনী'র নেতা শংকরচন্দ্র বরুয়া বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি প্রভৃতি সর্বভারতীয় নেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং এই 'অপরাধে' তাঁর সমগ্র পরিবারের সদস্যদের উপর নানারকম নির্যাতন নেমে এসেছিল। আসলে, শংকরচন্দ্র বরুয়া'র অনুগামীরা, পুলিশের সন্দেহ অনুযায়ী, একাধিক রেল দুর্ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন। গোলাঘাটের স্বর্ণলতা বরুয়া, হরিপ্রিয়া দত্ত, উমা বরুয়া, উত্তরা বোরা প্রভৃতি নেত্রী এবং কেশবচন্দ্র সোনায়াল, ভোলা বরুয়া, অপিরাম গোগুই, গোকুল হাজারিকা, বিষ্ণুরাম কাকতি প্রভৃতি অগণিত নেতা 'আগস্ট আন্দোলন'-এর সূত্রেই সকলের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন। গোলাঘাটে জনরোষের এবং আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইউরোপীয় বাগান-মালিকদের বাংলো এবং মৌজদারদের আবাসস্থল, ইউরোপীয় ক্লাব, রেল-স্টেশন ইত্যাদি। ১৪ সেপ্টেম্বর শিবসাগরে দিখৌনদীর সেতু, সার্কিট হাউস, পুলিশ ইন্সপেক্টরের গৃহে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছিল। একদিকে যেমন শংকরচন্দ্র বরুয়া নানারকম সহিংস কাজের সাথে জড়িত বলে পুলিশের সন্দেহ ছিল, ঠিক তেমনি গরমুর সত্রের সত্রাধিকার পীতাম্বর দেব গোস্বামী'র কাজকর্মের উপর গোয়েন্দা দৃষ্টি সব সময় নিবদ্ধ থাকত, কারণ পুলিশের আশঙ্কা ছিল, ঐ সত্রের অভ্যন্তরেই সহিংস কাজের প্রস্তুতি চলত। **জোড়হাটের লখেশ্বর বরুয়া চারিগাঁও মৌজায় কিছুদিনের জন্য 'স্বাধীন সরকার' প্রতিষ্ঠা করে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। ১৯৪২ সালের ১০ অক্টোবর গভীর**

রাতে গোলাঘাটের সরুপাথর স্টেশনের কিছুটা দূরে যে ভয়ংকর রেল-দুর্ঘটনা অন্তর্ঘাতের কারণে ঘটেছিল, সেটিই ছিল শিবসাগর জেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত কুশল কুঁওর সহিংস কাজের সাথে জড়িত না থাকা সত্ত্বেও ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছিলেন। 'আগস্ট আন্দোলন'-এর সাথে জড়িত থাকার 'অপরাধে' সমগ্র ভারতবর্ষে এরকম ফাঁসি কোথাও হয়েছিল বলে জানা নেই।

২২.৭.৩.৪.১ কুশল কুঁওর (১৯০৫-১৯৪৩) (Kushal Konwar)

শিবসাগর জেলার গোলাঘাট মহকুমায় (তখনো জেলাস্তরে উন্নীত হয়নি) সরুপাথর স্টেশনের নিকটবর্তী ঘিলাধাড়ি মৌজায় চৌদাং চরিয়ালি গ্রামে ১৯০৫ সালের ২১ মার্চ এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে কুশল কুঁওর-এর জন্ম। বাবা সোনারাম ও মা কনকেশ্বরী কুঁওর-এর পঞ্চম সন্তান ছিলেন কুশল। গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে গোলাঘাটে 'বেজবরুয়া ইংলিশ স্কুল'-এ ভর্তি হয়েছিলেন ; কিন্তু গান্ধিজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২১) সাড়া দিয়ে স্কুল-জীবনের ইতি টানেন। ১৯২৫ সালে কুশল নিজেই বেঙ্গমাই-এ স্বদেশি ভাবনায় নিবেদিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ; কিন্তু অর্থাভাবের কারণে কিছুদিনের মধ্যেই ঐ বিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয়। পারিবারিক অসচ্ছলতার জন্য এরপর বলিয়ান চা বাগানে কেরানির চাকরি নিয়ে কয়েক বছর কাজ করেন ; কিন্তু সুদর্শন ও স্বাধীনচেতা কুশলের পক্ষে ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রতি মুহূর্তে পালন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ১৯২৯ সালে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত-বংশীয় প্রেমানন্দ দুয়ারা'র সুন্দরী কন্যা প্রভাবতী'র সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। আদর্শ দম্পতি হিসাবে কুশল-প্রভাবতী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁদের দুটি পুত্র সন্তানও হয়। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর কুশল সংসারের সব দায়িত্ব প্রভাবতীকে সঁপে দেন। ১৯৩৬ সালে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কুশল সর্বক্ষণের কংগ্রেস কর্মী হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আসলে, ১৫ এপ্রিল ১৯৩৪-এ গান্ধিজি যখন দ্বিতীয়বার আসাম সফরে গোলাঘাটে আসেন, সেই সময় গান্ধির নিত্য-সঙ্গী হিসাবে পরিচয় সূত্র গভীর হয় এবং এরপরেই কুশলের মনোজগতে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। গান্ধিজির অহিংস আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কুশল আমিষ ত্যাগ করে পুরোপুরি নিরামিষাশী হন এবং ঈশ্বর সাধনা ও দেশভক্তি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সরুপাথরে কুশল কুঁওর রায়তদের একটি মঞ্চ তৈরি করেন। ১৯৪২ সালে 'আগস্ট আন্দোলন'-এর সময় কুশল কুঁওর সরুপাথরের স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন।

১০ অক্টোবর ১৯৪২-এ গভীর রাত্রির অন্ধকারে 'মৃত্যুবাহিনী'র কিছু সদস্য যখন সরুপাথর স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে রেল লাইন উপড়ে ফেলার কাজে ব্যস্ত, সেই সময় খবর পেয়ে অহিংসার পূজারি কুশল কুঁওর ছুটে গিয়ে নানাভাবে তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। **কিছুক্ষণের মধ্যেই ইঙ্গ-আমেরিকান সেনা ভর্তি একটি সামরিক ট্রেন স্থানটি অতিক্রম করার সময় গুরুতর দুর্ঘটনায় পতিত হয়। অনেক সৈনিকের মৃত্যু ঘটে (কিছু লেখকের মতে মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার)।** সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে এবং ব্যাপক ধর-পাকড় অত্যাচার শুরু হয়। কুশল কুঁওর সহ ৪৩ জনকে বন্দি করে জোড়হাট জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। বিচারের নামে শুরু হয় প্রহসন (mock-trial)। উপযুক্ত প্রমাণাভাব সত্ত্বেও শিবসাগর জেলার ডেপুটি কমিশনার (ডি. সি.) C. A. Humphrey ৬ মার্চ ১৯৪৩ তাঁর রায়-এ ঘোষণা করেন ঃ

> *Only the maximum sentence appears to be proper in the case of Kushal Chandra Konwar and Dharma Kanta Deka and Kanakeswar Konwar and Thopor alias Ghanasyam Saikia and under sec 109 IPC I direct that they be hanged by the neck till they are dead.*

পরবর্তী সময়ে ধর্মকান্ত ডেকা, কনকেশ্বর কুঁওর এবং ঘনশ্যাম শইকিয়া (ওরফে 'থোপোর')-র ফাঁসি দণ্ড মকুব হলেও, কুশল চন্দ্র কুঁওর-এর ক্ষেত্রে ফাঁসির আদেশ বহাল থাকে। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী কুশল ১৫ জুন ১৯৪৩ মুখে কীর্তনের সুর নিয়ে জোড়হাট জেলে হাসিমুখে "ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান" গেয়ে গেলেন। **সমগ্র দেশে 'আগস্ট আন্দোলনে' অংশ নিতে গিয়ে এই একটিমাত্র বীরকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল।**

২২.৭.৩.৫ অন্যান্য জেলার চিত্র

আসামের উপরোক্ত জেলাগুলি ছাড়াও গোয়ালপাড়া, লখিমপুর, সিলেটেও ১৯৪২ সালে অনেক ঘটনা ঘটেছিল এবং অনেক ব্যক্তিকে গ্রেফতার বরণ করতে হয়েছিল—যেগুলি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করার অবকাশ এখানে নেই। তবে পরবর্তী সময়ে আসাম বিধানসভায় বেসরকারি বয়ান হিসাবে যে চিত্র পেশ করা হয়েছিল (যদিও সংখ্যাগুলি যথেষ্ট কম করে দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ আছে) সেটির দিকে নজর দিলে আসামের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

সারণি ২০

আসামে জেলাভিত্তিক বন্দির সংখ্যা

জেলা	৩১.১২.১৯৪৩ পর্যন্ত গ্রেফতারির সংখ্যা	৩১.১২.১৯৪৩ পর্যন্ত দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তের সংখ্যা	বিভিন্ন সময়ে ডি. আই. আর. (ভারত-রক্ষা) আইনে শাস্তি প্রাপ্ত
নওগাঁও	৮১৬	৫০২	৭৮
শিবসাগর	২৮৫	২৮৫	২০২
কাছাড়	১৫	১১	২১৮
সিলেট	৫২৪	৩৪৩	৩২৬
কামরূপ	৯৫৫	২৫০	১৮৪
লখিমপুর	৪৭৯	১০২	৮৫৫
গোয়ালপাড়া	৯	৯	১,০৩০
দরং	৪৪৮	১৭৭	৩২২
খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়	—	—	১৪৯
মোট	৩,৫৩১	১,৬৭৯	৩,৩৬৪

সূত্র : *Political History of Assam*, vol. III, p. 108.

২২.৭.৩.৫.১ 'আগস্ট আন্দোলন'-এর মূল্যায়ন

সরকারি রিপোর্টে ৯ আগস্ট ১৯৪২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৩ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে আসামে নিহত হয়েছিলেন মাত্র ১৫ জন। কিন্তু K. N. Dutt (*Landmarks of the Freedom Struggle in Assam* গ্রন্থে) দেখিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে ঐরকম মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ২৭ জন। আসামের যেসব স্থানে বড়ো ধরনের গণ্ডগোল হয়েছিল সেইসব এলাকার সকলের উপর এই 'অপরাধের' জন্য বাধ্যতামূলক কর চাপিয়ে (পরবর্তী সময়ে যাকে 'পিটুনি-কর' বলা হত) আদায় করা হয়েছিল ৩,৩৯,৪৮৭ টাকা ; অথচ সরকারি হিসাব অনুযায়ী মোট সরকারি সম্পত্তি 'আগস্ট আন্দোলনের' জন্য নষ্ট হয়েছিল মাত্র ২,৮৪,৫৮২ টাকা। বিভিন্ন স্থানে 'আসাম রাইফেলস্'সহ সামরিক বাহিনীর অকথ্য অত্যাচারে অনেক আন্দোলনকারী চিরদিনের

মতো পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কীভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র কুশল কুঁওর 'আগস্ট' আন্দালনের জন্য ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আসাম এত রক্ত ঢেলেছিল এবং এত অত্যাচার সহ্য করেছিল ; অথচ ভারতের অন্যত্র এখনো সেটি অনেকের কাছেই অজানা। K. N. Dutt তাঁর গ্রন্থে ১৯৪২-এর আন্দোলন সম্পর্কে গোপীনাথ বরদোলই-এর একটি মর্মস্পর্শী উক্তি উল্লেখ করেছেন। উক্তিটি এইরকম ঃ

> *....These deaths, injuries, humiliations and atrocities are the price of liberty, a price the country is asked to pay for its desire to be free. Our people know that and therefore they are determined as never before to 'do or die'. Untold miseries may be heaped on our people, but the caravan of India goes on to its desired goal—independence full and undiluted.*

নওগাঁও জেলাতে পুলিশের অত্যাচার মাত্রাতিরিক্ত অবস্থায় চলে গিয়েছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 'আগস্ট আন্দোলনে' যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি, রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন, সাদিক আলি, সুচেতা কৃপালনি প্রভৃতি ব্যক্তিরা—আত্মগোপন করে অনেক ঝুঁকি সত্ত্বেও যেমন বিভিন্ন স্থানে ছুটে গেছেন, আসামেও তেমনি তেজপুরের জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা এবং গহনচন্দ্র গোস্বামী, কিংবা নওগাঁও-এর মহেন্দ্রনাথ হাজারিকা এবং লক্ষ্মীপ্রসাদ গোস্বামী কিংবা গোলাঘাটের শংকরচন্দ্র বরুয়া প্রভৃতি আত্মগোপনকারী তরুণ নেতৃত্ব সরকারি ব্যবস্থাকে অচল করার ডাক দিয়ে অবিশ্বাস্য সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। শারীরিকভাবে অসুস্থ হলেও হেমচন্দ্র বরুয়া লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন সংগঠনগুলির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। অসংগঠিত হলেও আসামে 'আগস্ট আন্দোলনে' প্রকৃত শক্তি ছিল ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের হাতে। শোনা যায়, সাদিক আলি ও অরুণা আসফ আলি ছদ্মবেশে গুয়াহাটি এসে আত্মগোপনকারী অসমিয়া আন্দোলনকারীদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। আন্দোলনকারীদের সহিংস পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে যতই মত পার্থক্য ও বিতর্ক থাক, দেশের জন্য আত্মবলিদানের প্রশ্নে তাঁরা যে অসম সাহসের মূর্ত প্রতীক এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। আসলে, **১৯৪২-এর আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত** ; এগিয়ে যাওয়ার প্রকৃত কর্মসূচি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাবে অনেক স্থানেই এটি স্থানীয় নেতৃত্বের ডাকে দিশাহীন অবস্থায় ছিল। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের প্রথম স্তরের নেতৃত্ব (কি কেন্দ্রে, কি

রাজ্যে) গ্রেফতার-বরণের ফলে, সাধারণ স্তরের আন্দোলনকারীদের মধ্যে 'যা খুশি তাই' করার ('free hand') প্রবণতা আসামসহ দেশের অন্যত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল। এরই জন্য জওহরলাল নেহরুর জীবনীকার ঐতিহাসিক S. Gopal কিছুটা সমালোচনার সুরেই মন্তব্য করেছেন ঃ "It was almost as if the (Congress) Working Committee wished to escape to prison and to avoid decision at that crucial hour." জওহরলাল নেহরুও একই অনুযোগ তাঁর *Discovery of India* গ্রন্থে করেছেন ঃ "...neither he (Gandhijee) nor the CWC issued any kind of directives.....(and made) no arrangements for the functioning of the Congress after they had been removed from the scene." 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে আসামের মহিলারা যেমন উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, তেমনি কমপক্ষে ৮০ জন মহিলা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের বর্বর অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। যে কংগ্রেসের নামে 'আগস্ট আন্দোলন'-এর ডাক দেওয়া হয়েছিল, নেতৃত্ববিহীন (কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অসাবধানতার জন্য জেলে থাকার কারণে) সেই কংগ্রেস দলের তখন ছিল ছন্নছাড়া অবস্থা! ফলে ১৯৪২-এ বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল।

২২.৭.৬.৫.১.১ কমিউনিস্টদের ভূমিকা প্রসঙ্গ

'আগস্ট আন্দোলন'-এর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল, একদিকে 'মুসলিম লিগ' এবং অন্যদিকে আর. এস. এস. নেতৃত্বাধীন 'হিন্দু মহাসভা'র ঐ আন্দোলনের প্রতি তীব্র বিরোধিতা ছাড়াও কমিউনিস্টদের ঐ আন্দোলন বর্জন। এই বর্জনকে কেন্দ্র করে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতকতার' অভিযোগ কেউ কেউ করেন ; যদিও জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে ১৯৪২-এর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি'র মাধ্যমে কীভাবে পর্দার অন্তরালে থেকে কমিউনিস্টরা স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্শামুখ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করেছিলেন সেটি ভুলেও উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু হঠাৎ করে ভারতীয় কমিউনিস্টরা কেন 'আগস্ট আন্দোলন'-এর বিরোধিতা করলেন (যদিও 'মুসলিম লিগ', 'হিন্দু মহাসভা' সহ আরও অনেক সংগঠনও একই ধরনের বিরোধিতা করেছিল)?—আসলে, কমিউনিস্টদের এই দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে যে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ ছিল সেটি উল্লেখ করা দরকার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-৪৫) ভারতীয় মতামতের তোয়াক্কা না করে যেভাবে ব্রিটিশ শাসকরা ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়িয়ে দিয়েছিলেন তাতে কেউই খুশি হয়নি। ভারতীয়দের মধ্য থেকে যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ তহবিল গঠন ও সেনা সংগ্রহের যে ব্রিটিশ নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, তার তীব্র বিরোধিতা করে আত্মগোপনকারী কমিউনিস্টদের (যেহেতু সি. পি. আই. নিষিদ্ধ) নেতৃত্বেই গড়ে উঠেছিল **'না এক পাই না এক ভাই' আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পরিণত করার** ("transformation of imperialist war into a war of national liberation") আহ্বান জানিয়েছিল। কমিউনিস্টদের মতো এতটা যুদ্ধ-বিরোধী না হলেও গান্ধিজি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের সমর্থন করতে গররাজি ছিলেন না, যদি ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে আশ্বাস পাওয়া যেত যে, যুদ্ধ শেষে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি সহানুভূতির সাথে বিবেচিত হবে। কিন্তু ক্রিপস-দৌত্যের ব্যর্থতার পর সেটিও বিলীন হয়ে যায়। তথাপি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে গান্ধিজি ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি নিয়ে বেশি চাপ দিতে বা আন্দোলন শুরু করতে চাননি ; কারণ সেই সময় বিভিন্ন রণাঙ্গণে ব্রিটিশের নেতৃত্বাধীন 'মিত্রশক্তি' পরাজিত হচ্ছিল হিটলারের নেতৃত্বাধীন 'অক্ষশক্তির'র হাতে। ২২.৭ প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে গান্ধিজির সেই বিখ্যাত মন্তব্যটি যাদের (ব্রিটেন) নিজের স্বাধীনতাই গভীরভাবে বিপন্ন ; তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করা যাবে?—কিন্তু সেই গান্ধিজিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে হঠাৎ করে 'আগস্ট আন্দোলন'-এর প্রস্তাব দিলেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে অনেক বিতর্ক সত্ত্বেও সেটি অবশেষে গৃহীত হল। **আন্দোলনের যথার্থতা নিয়ে বিতর্ক না থাকলেও সময় নির্বাচনের প্রশ্নে কমিউনিস্টদের সাথে বিতর্ক শুরু হল।**

সি. পি. আই.-এর তত্ত্ব অনুযায়ী ১৯৪১ সালের ২২ জুন ফ্যাসিস্ট হিটলারের ৩০ লক্ষ সেনাবাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে সমকালীন পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র পাল্টে গিয়েছিল। পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক দেশটিকে রক্ষা করাই কমিউনিস্টদের প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য হল, কারণ **এতদিনের 'সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ' ২২ জুনের পর প্রকৃতপক্ষে 'জনযুদ্ধে' (people's war) পরিণত হয়েছিল। যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐ সময় ব্রিটিশ শক্তির নেতৃত্বাধীন 'মিত্রশক্তি'র অভ্যন্তরে ছিল, এরই জন্য সি. পি. আই.-এর কাছে, ঐ মুহূর্তে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধিতা পরোক্ষভাবে**

সোভিয়েত বিরোধিতারই শামিল। এরই জন্য ১৯৪২ সালে গান্ধিজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যেই মতপার্থক্য ছিল। **কিন্তু যে জওহরলাল নেহরু কমিউনিস্টদের চিন্তাধারার সাথে সেই সময়ে অনেক ব্যাপারেই একমত ছিলেন তাঁকেই ঘটনাচক্রে, গান্ধিজির ইচ্ছা অনুযায়ী, 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাবটি মুম্বাই অধিবেশনে পেশ করতে হয়েছিল। যাই হোক, 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার প্রশ্নে কমিউনিস্টদের যুক্তি যাই থাকুক, সাধারণ মানুষ কিন্তু সেটি গ্রহণ করেনি। 'আগস্ট আন্দোলন'-এর উত্তাল তরঙ্গে আসাম সহ দেশের অনেক স্থানই প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। যদিও আসামের মতো বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন বেশ কিছু ব্যক্তি 'আগস্ট আন্দোলন'-এর শরিক হয়েছিলেন ; তথাপি ঐ সময় থেকেই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে 'দেশদ্রোহিতা'র কুৎসা প্রচার শুরু হয়েছিল।**

১৯৪২ সালে সাধারণ মানুষের মনে স্বাধীনতা স্পৃহা যে কত তীব্র ছিল, ভারতবর্ষের অন্য অংশের মতো আসামের ঘটনাবলীই সেটির সাক্ষ্য দেয়। ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ ভারতের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাইসরয় লিন্‌লিথগো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে যে তারা বার্তা পাঠিয়েছিলেন সেটি এইরকম ঃ ".....by far the most serious rebellion since that of 1857, the gravity and extent of which we have so far concealed from the world for reasons of military security." সাধারণ মানুষের এই আকুতিকে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ যে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি, সেই ত্রুটি পরবর্তী সময়ে ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি স্বীকার করেছে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সি. পি. আই.-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে উল্লেখ করা হয়েছিল, "The total underestimation of the role of imperialism in the period of 'People's War' made us lose sight of the task of exposing imperialism and fighting it within the framework of support for anti-fascist War." আত্মসমালোচনার সুরে আরও মন্তব্য করা হয় যে, ১৯৪৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি স্তালিনগ্রাদ-এর ঐতিহাসিক যুদ্ধে লাল-ফৌজ হিটলারের ষষ্ঠ ব্যাটেলিয়ানের অবশিষ্টাংশকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত করার পর সমাজতন্ত্রের বিপদ সাময়িকভাবে অপসারিত হয়েছিল। অন্তত সেই সময়েও যদি সি. পি. আই. 'আগস্ট আন্দোলনে' অংশগ্রহণ সম্পর্কে নতুনভাবে মূল্যায়ন করত, তাহলেও অনেক অপবাদের হাত থেকে কমিউনিস্টদের কিছুটা মুক্তি পাওয়া

সম্ভব হত। সেটি কিন্তু হয়নি। বরং ১৯৪২ সালে বিভিন্ন ঘটনাকে ধূর্ত ব্রিটিশ আমলারা একদিকে জাতীয় কংগ্রেসকে নিষিদ্ধকরণ এবং অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে আরও জটিল করতে সাহায্য করেছিলেন কারণ, এর ফলে জনগণের মধ্যে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ভুল বার্তা পৌঁছেছিল। জেল থেকে কমিউনিস্ট বন্দিদের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও মুক্তি দেওয়ার সময় ভারতীয় কমিউনিস্টদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিত জাতীয়তাবাদী শক্তি হিসাবেই মনে করতেন এবং আমলাদের গভীর সন্দেহ ছিল কমিউনিস্টরা বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়েও ব্রিটিশদের প্রতি মোটেই আনুগত্য দেখাবেন কিনা। সরকারি বয়ানটি ছিল এইরকম ঃ "It (C. P. I.) is primarily a nationalist party working for Indian independence. It is clearly impossible to expect communists to adopt a wholly loyalist attitude." একদিকে যেমন ইংরেজ সরকার ভারতীয় কমিউনিস্টদের মোটেই বিশ্বাস করেনি, অন্যদিকে কমিউনিস্ট-বিরোধীরা ঐ সময় প্রচণ্ড কুৎসা অভিযানে মেতেছিল।

আসামে সি. পি. আই.-এর প্রভাবাধীন গণসংগঠনগুলি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় তেমন সক্রিয় ভূমিকা না নিলেও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন 'কমিউনিস্ট লিগ' (যেটি ১৯৪৩ সাল থেকে 'আর. সি. পি. আই.' নামে পরিচিত), নবজাত 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের অনুগত 'সি. এস. পি.'-র সদস্যরা ব্যাপকভাবে '৪২-এর আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং কিছু স্থানে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এঁরা কেউই গান্ধিজির এতদিনের অনুসৃত তথাকথিত অহিংস নীতির সমর্থক ছিলেন না। নেতৃত্ববিহীন কংগ্রেসের অনেকেই আসামে সেই সময় এইসব দলের প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। জনমনকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে এইসব গোষ্ঠীর উদ্যোগেই 'আগস্ট আন্দোলন'-এর সময় আসামে বেনামে অনেক প্রচার পুস্তিকা গোপনে জনগণের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। 'সি. পি. আই.'—অনুসৃত 'জনযুদ্ধের' তত্ত্বকে কেন্দ্র করে আসামের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলিওে নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। 'আসাম ছাত্র সম্মিলন'—এর এক অংশ ছিল 'এ. আই. এস. এফ.' এবং 'সি. পি. আই.'-এর সমর্থনপুষ্ট জনযুদ্ধের সৈনিক, অন্য অংশ ছিল 'আর. সি. পি. আই.' সমর্থনপুষ্ট হয়ে 'আসাম প্রভিন্সিয়্যাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন' বা 'এ. পি. এস. এফ.' নাম নিয়ে 'আগস্ট আন্দোলনে'র যোদ্ধা এবং পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন ছাত্ররা তৃতীয় একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৪২ সালে 'সি. পি. আই.'-এর উপর

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর কংগ্রেস বা 'সি. এস. পি.'র অভ্যন্তরে দুই উপত্যকার যেসব কমিউনিস্টরা ছিলেন তাঁরা 'সি. এস. পি.' ত্যাগ করে প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসে 'সি. পি. আই.' কে শক্তিশালী করার কাজে হাত দিলেন। কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও বীরেশ মিশ্র সিলেট জেলা কংগ্রেস কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ ঘোষিত হওয়ার পর বীরেশ মিশ্র জেল থেকে মুক্তি পান এবং ২৭ জুলাই ১৯৪২ সালে সিলেটে প্রথম বৈধ কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 'জনযুদ্ধে'র ডাক দেন। আসলে, **সিলেট ও কাছাড়ে কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে কমিউনিস্টরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন এবং দলের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি তাঁদের দখলেই ছিল। এরই জন্য দেখা দেয়, 'আগস্ট আন্দোলনের' প্রভাব প্রথম দিকে সিলেট ও কাছাড়ে তেমন ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়নি।**

'আগস্ট আন্দোলনে' অংশগ্রহণ না করায় কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা হলেও, শিক্ষিত জনমানসে 'জনযুদ্ধের' ডাক কিছু ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল ; যদিও কৃষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সেই সময় ফ্যাসি-বিরোধ 'জনযুদ্ধের' তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে প্রায় অন্ধকারেই ছিলেন। এরই জন্য কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ প্রচার সহজ হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে মুম্বাই-এ 'Indian People's Theatre Association" বা 'ইপ্টা'র প্রতিষ্ঠার সময় থেকে দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা লাল ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান হতে থাকে। ১৯৪৩ সালে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে বাংলায় ভয়াবহ 'পঞ্চাশের মন্বন্তরে' কমিউনিস্ট পার্টির উজ্জ্বল ভূমিকা হারানো-সমর্থনকে আবার ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। ২২.৭.২ প্যারায় ব্রিটিশ প্রতিনিধি T. Wickenden-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে Wickenden 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় গান্ধিজির অহিংস নীতির ব্যর্থতা ভারতবর্ষের সর্বত্র লক্ষ করে এটিকে 'end of Gandhian era' হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র ডাক গান্ধিজিও দিলেও, এর জন্য কোনো সাংগঠনিক বা মানসিক প্রস্তুতি ছিল না বলেই এক এক স্থানে আন্দোলনের চেহারা এক এক রকম হয়েছিল। এরই জন্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার (*History of the Freedom Movement in India*, vol. III, p. 673) মন্তব্য করেছেন ঃ *On 8 August 1942, he (Gandhi) again pulled his trigger (against the British) but there was no shot, because he forgot to put any cartridge in the Chamber.* এই কারণেই গান্ধিজির নেতৃত্বদানের যোগ্যতা সম্পর্কে অন্যদের

মতো এমনকি জওহ্‌রলাল নেহরু পর্যন্ত প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন। কারাগারের অন্তরালে বসে 'আগস্ট আন্দোলন' প্রত্যাহারের গুজব শুনে গান্ধিজি সম্পর্কে নেহরু তাঁর ডায়ারিতে লিখেছিলেন ঃ "...With all his (Gandhijee's) great qualities he has proved a poor and weak leader, changing his mind frequently."

একদিকে যখন গান্ধিজির ব্যর্থতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছিল, তখন অন্যদিকে ১৯৩৪ থেকে নিষিদ্ধ 'সি. পি. আই.'-এর আকর্ষণ (অনেক 'ভুল সিদ্ধান্ত' সত্ত্বেও) ক্রমাগত বাড়ছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশি (১৯০৭-১৯৮০) মাত্র ২৮ বছর বয়সে ঐ গুরু দায়িত্ব পেয়ে অনেক ঝড়ের মধ্যে আইনি ও বেআইনি অবস্থায় দীর্ঘ ১২ বছর (১৯৩৫-১৯৪৭) ঐ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যোশির জীবনীকার গার্গি চক্রবর্তী ২০০৭ সালে যোশির জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কীভাবে অনেক সংগ্রামের মোকাবিলা করে তিল তিল করে সাম্যবাদের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে যোশির কিছু মৌলিক চিন্তা ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং মুম্বাই-এ ১৯৪৩ সালে (২৩ মে-১ জুন) বৈধ কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস চেতনার জগতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার 'সি. পি. আই.'-এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির একটা হিসাব দিয়েছেন—যেমন, ১৯৪২ সালে সমগ্র দেশে কমিউনিস্ট পার্টির মাত্র ৪,০০০ সদস্য ছিল, এটি ১৯৪৩-এর মে মাসে (কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার যখন তুঙ্গে) বেড়ে হয় ১৫,০০০ এবং ১৯৪৬ সালে ৫৩,০০০ সদস্য। ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় এটি ১ লক্ষে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ-এর পর সমগ্র দেশে 'সি. পি. আই.' ছিল তৃতীয় বৃহত্তম দল। ১৯৪২-এর আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে যতই সমালোচনা হোক, আসাম সহ সমগ্র দেশে কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা যে ক্রমবর্ধমান ছিল নানা ঘটনাই তার সাক্ষ্য দেয়।

২২.৭.৩.৫.১.২ গান্ধিজি সম্পর্কে সমকালীন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মন্তব্য

১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশ জুড়ে যে বিশৃঙ্খলা নেমে এসেছিল তার সমস্ত দায় দায়িত্বের জন্য যখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নানাভাবে গান্ধিজিকেই অভিযুক্ত করা শুরু করলেন। **সেই সময় গান্ধিজি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য সহিংস আন্দোলনকে কঠোর ভাষায় নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে জেলে অন্তরীণ অবস্থায় আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি**

থেকে আমৃত্যু অনশন শুরু করলেন। এই অনশন শুরু হওয়ার চারদিনের মাথায়, অর্থাৎ ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩, ইংরেজ সরকার *Congress Responsibility for the Disturbances of 1942-43* শিরোনামে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ইঙ্গিত ছিল। ভাইসরয় লিন্‌লিথ্‌গো (এপ্রিল ১৯৩৬—অক্টোবর ১৯৪৩) গান্ধি সম্পর্কে শুধু যে বিরূপ মন্তব্য করতেন (যেমন, 'Gandhi was the most successful humbug in world history') তাই নয়, গান্ধির অনশন চলাকালীন সময়ে তাঁর মৃত্যু কামনাও করেছিলেন। ব্রিটিশ War Cabinet-এর কাছে এক তারবার্তায় লিন্‌লিথগো জানিয়েছিলেন "....strongly in favour of letting Gandhi starve to death." শুধু লিন্‌লিথ্‌গো একা নন, সমকালীন ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অনেকেরই গান্ধি সম্পর্কে বিরক্তি ছিল। যেমন, লিন্‌লিথ্‌গোর পরবর্তী ভাইসরয় ওয়াভেল (অক্টোবর ১৯৪৩-মার্চ ১৯৪৭) মন্তব্য করতেন ঃ "Gandhi used the mask of non-violence to hide an extremely cunning person" (অতি ধূর্ত গান্ধি অহিংসার মুখোশ পরে থাকতেন)। কিংবা গান্ধি সম্পর্কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল-এর সেই ব্যাপক প্রচারিত ১৯৩১ সালের মন্তব্যটি (অর্ধ উলঙ্গ ফকিরকে দেখে বমি বমি ভাব আসে) ঃ "It is nauseating to see Mr. Gandhi, posing as a fakir, striding half-naked the steps of the Viceregal Palace." এর থেকেই অনুমান করা যায়, গান্ধিজির আমরণ অনশনের হুমকিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তেমন বিচলিত হননি। তবে অন্যরা না হলেও, আসামের তৎকালীন গভর্নর A. C. Clow (৪ মে ১৯৪২—২৪ এপ্রিল ১৯৪৬) যে যথেষ্ট উদ্‌বিগ্ন ছিলেন সেটি উপলব্ধি করা যায়। অন্তরীণ অবস্থায় ১৯৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া অনশন গান্ধিজি যখন ৩ মার্চ (১৯৪৩) ভঙ্গ করলেন, সেই সময় চারিদিকে একটা স্বস্তির ভাব লক্ষ করা যায়। A. C. Clow ৫ মার্চ ১৯৪৩-এ এক চিঠিতে ভাইসরয় লিন্‌লিথ্‌গো-কে লিখেছিলেন ঃ

"The end of Gandhi's fast has come as a relief to many. This includes myself." সমকালীন *অসমিয়া* এবং *Assam Tribune* পত্রিকায় গান্ধির অনশন ভঙ্গের বার্তা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

আসামে 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে তিন চার মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি। সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে অন্যত্রও এইরকম অসংগঠিত স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছিল। যে দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার

একটিও প্রকৃতপক্ষে আদায় করা সম্ভব হয়নি। সহিংস পদ্ধতির প্রতি গান্ধিজির তীব্র ধিক্কারের ফলে আন্দোলনকারীদের মনে হতাশাও নেমে এসেছিল। **আসামে আত্মগোপনকারী আন্দোলনকারীদের অনেকে গান্ধি-নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন গণ-সংগঠনে যোগ দিতে এগিয়ে আসেন ; যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা'র মতো ব্যক্তিত্ব। সমকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষ-জোড়া স্বাধীনতার দাবিতে এত বড়ো মাপের শেষ আন্দোলনের এইরকম করুণ পরিণতিতে স্বাভাবিক কারণেই অনেকে বিমর্ষ হয়ে পড়েন।** ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসেই প্রকৃতপক্ষে 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। অন্যদিকে 'সি. পি. আই.' নতুন উদ্যমে 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে যুক্ত সকল বন্দির অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে। এরপর একে একে সকল বন্দিই মুক্তি পান। গান্ধিজিও অবশেষে ৬ মে ১৯৪৪-এ মুক্তি পান।

১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে 'মুসলিম লিগ' অংশগ্রহণ না করায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ লিগের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। ব্রিটিশ মদতপুষ্ট হয়ে ১৯৪৩ সালের ২৩ মার্চ লিগ দেশের সর্বত্র 'পাকিস্তান-দিবস' পালনের ডাক দেয়। মহম্মদ আলি জিন্না এক বার্তায় দেশের সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। **কংগ্রেসের ডাকা 'Quit India'-র পাল্টা হিসাবে, Penderel Moon-এর ভাষায়, 'Divide and Quit' হয়ে দাঁড়ায় সেই সময় মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রধান আওয়াজ।** সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে আসামে মুসলিম লিগ নেতৃত্বাধীন শাদুল্লাহ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ফলে সমগ্র আকাশ বাতাস সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষ বাষ্পে দূষিত হয়ে গিয়েছিল। 'আগস্ট আন্দোলনে'র পরবর্তী স্তরে আসামের জনসংখ্যার পট-পরিবর্তনসহ কীভাবে আসামকে ভারতবর্ষ থেকে বিন্যাস ও বিচ্ছিন্ন করে পরিকল্পিত পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করার নীল নক্শা আঁকা হয়েছিল সেগুলি পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

আসাম ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে দেশভাগ ও অভিবাসন সমস্যা

২৩.১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আসাম (World War II and Assam)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত জার্মানির উপর চাপিয়ে দেওয়া অপমানকর ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি ও ক্ষতিপূরণের তীব্র চাপ এবং জার্মানির হাইমার প্রজাতন্ত্রের সংকটময় অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, ভীত-সন্ত্রস্ত ফ্রান্সের নিরাপত্তার অন্বেষণ, ১৯২৯ থেকে শুরু হওয়া পৃথিবীব্যাপী মহামন্দা, জার্মানি-ইতালি-জাপান-স্পেন প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান, পাশ্চাত্য দেশগুলির অন্ধ সোভিয়েত-বিরোধিতা এবং হিটলার মুসোলিনি প্রভৃতি ফ্যাসিস্টদের কাজে লাগিয়ে সমাজতন্ত্রের মূলোৎপাটনের জন্য ফ্যাসিবাদী নায়কদের প্রতি তোষণনীতি (appeasement policy), নতুন বাজার ও উপনিবেশ দখলের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পারস্পরিক ক্ষমতা-প্রদর্শন, নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্ব-শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে 'লিগ-অব-নেশনস্'-এর ব্যর্থতা ইত্যাদি ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। ইতালির ইথিওপিয়া আক্রমণ, স্পেনের গৃহযুদ্ধে জার্মানি ও ইতালির প্রত্যক্ষ সাহায্য, চিনের উপর একাধিপত্য কায়েম করার উদ্দেশ্যে জাপানি আগ্রাসন যুদ্ধের আশঙ্কাকে বিস্ফোরক করে তোলে। **১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে।** ৩ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ দু'দিন পরেই, ব্রিটেন ও ফ্রান্স হিটলারের জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং একই সাথে ভারতে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো (১৯৩৬-১৯৪৪) ভারতীয়দের সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করে ভারতবর্ষকে যুদ্ধের অংশীদার হিসাবে ঘোষণা করে দেন। ব্রিটিশ ডোমিনিয়নভুক্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে ঐসব দেশের আইনসভার সম্মতির জন্য অপেক্ষা করা হয়েছিল, কিন্তু ভারতের যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্নে কারও মতামত গ্রহণ করা হয়নি। ব্রিটিশ চাপাচাপি সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আয়ারল্যান্ড নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিল এবং নিজের স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দেয়নি। ডোমিনিয়ন-ভুক্ত কানাডা যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেকদিন পরে মিত্রশক্তির পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল; ব্রিটিশ অনুরোধ সত্ত্বেও প্রথমে রাজি হয়নি।

যেভাবে ভারতীয়দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়েছিল তাতে ভারতের সকল অংশের মানুষের, বিশেষত জাতীয় কংগ্রেসের তীব্র আপত্তি ছিল। গান্ধিজি ব্রিটিশ সমর্থনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়ার বিনিময়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যই শেষপর্যন্ত ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের তিনি ডাক দিয়েছিলেন। এছাড়া ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতার পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক আইনসভা থেকে কংগ্রেস সদস্যদের পদত্যাগের নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথমদিকে ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পৃথিবীকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করার যুদ্ধ এবং ভারতের কোনো স্বার্থ জড়িত ছিল না, এরই জন্য সেই সময় যুদ্ধ-বিরোধিতার জনপ্রিয় আওয়াজ উঠেছিল : '**না এক পাই, না এক ভাই**'। কিন্তু দেশের মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা যাই হোক্, শেষ-পর্যন্ত ভারতবর্ষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গভীরভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৯ সালে, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সূত্রপাতের সময়, ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যা ছিল ২,০৫,০০০ মাত্র। কিন্তু ক্রমে '**আসাম রাইফেলস্**'সহ সমস্ত দেশের বিভিন্ন আধা-সামরিক বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকের বাধ্যতামূলক যোগদানের ফলে **ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সংখ্যা ২৫ লক্ষ অতিক্রম করে। এত বিশাল বাহিনী সেই সময় পৃথিবীর কোনো দেশে ছিল না।** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে ব্রিটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রাণ-বিসর্জন দিয়েছেন। অবশ্য পুরস্কার হিসাবে ভারতীয় সেনারা ৩০টি Victoria Cross অর্জন করতেও সমর্থ হয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আবার বিপরীত দিকে ১৭ জানুয়ারি ১৯৪১-এ সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণ ও নেতাজির অভ্যুত্থান, দেশের বাইরে ৪৩,০০০ সৈনিক নিয়ে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ এবং প্রবাসে অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন, ১৯৪৩ সালে জাপানি প্রধানমন্ত্রী তোজা'র পরিকল্পনা অনুযায়ী ইম্ফল-কোহিমা যুদ্ধের প্রস্তুতি, ভারতের অভ্যন্তরে 'আই' এন. এ.'র প্রবেশের সম্ভাবনা ইত্যাদির ফলে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার আগ্রহ অনেকের মধ্যেই সৃষ্টি হয়। আসলে, ১৯৪২-এর এপ্রিলের মধ্যে ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর, এমনকি আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ব্রিটিশের হাত থেকে জাপানের হাতে চলে যাওয়ার পর যুদ্ধের গতিপথ ভিন্ন-খাতে প্রবাহিত হওয়ার ফলে ভারতীয়দের মনে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। **সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতই ছিল প্রকৃত রণাঙ্গন** এবং এখানেই জাপানের দুর্বার অগ্রগতি প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোহিমায় পরাজয় বরণের পর

জাপানের একটার পর একটা বিপর্যয় ঘটতে শুরু করে। জাপানি সম্রাট হিরোহিতো ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমা এবং ৯ আগস্ট নাগাশাকি'র অভিজ্ঞতার পর ১৪ আগস্ট ১৯৪৫ আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করেন এবং দুই সপ্তাহ বাদে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সালে ঈঙ্গ-ফরাসি-মার্কিন শক্তির সমস্ত শর্ত মেনে আনুষ্ঠানিকভাবে জাপান আত্মসমর্পণের সাথে সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যবনিকাপাত হয়।

২৩.১.১ কোহিমা'র যুদ্ধ, ১৯৪৪ (Battle of Kohima, 1944)

রাজন্য-শাসিত মণিপুর ও ত্রিপুরা ছাড়া স্বাধীনতার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত আসাম মানে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতই বোঝাত। নাগা, লুসাই, খাসি, গারো ইত্যাদি পার্বত্য অঞ্চল সবই ছিল আসামের অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘদিন নানাভাবে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সমগ্র পৃথিবীর রণাঙ্গনের তালিকায় মণিপুর ও আসামের নাম উঠে এল। **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র অনুভূত হলেও মণিপুর ও আসামের মতো যুদ্ধক্ষেত্র এবং এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অন্যত্র হয়নি।** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান হয়েছিল। একদিকে মণিপুরে ইম্ফল-এর কাছাকাছি মইরাং পর্যন্ত এগিয়ে এসে ১৮ এপ্রিল ১৯৪৪-এ আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী ভারতের স্বাধীনতা-পতাকা উড়িয়ে দিয়ে সমগ্র জাতিকে বিস্মিত করে দিয়েছিল, অন্যদিকে ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল-এর দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথে জাপানি ও আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ প্রথম বাধা পেয়েছিল সামরিক দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমায়। ইম্ফল-কোহিমার যুদ্ধ (উভয় স্থানের দূরত্ব প্রায় ৮০ মাইল) একই সময়ে হয়েছিল এবং উভয় রণাঙ্গন থেকেই শেষপর্যন্ত জাপ-আই. এন. এ. যৌথ বাহিনী সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল।

২৩.১.১.১ যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায় ও গুরুত্ব

যে ভূমিতে পাহাড়ি ফুল 'কিউ' ফোটে সেই নাগাভূমির নাম ('কিউ' + 'হিমা') কোহিমা। ব্রিটিশ কর্মকর্তারা এই নাগা পাহাড়টিকে বশে আনতে এবং আসামের অন্তর্ভুক্ত করতে এক সময় রীতিমতো বেগ পেয়েছিলেন। তবে ১৯৪৪ সালে কোহিমার ইংরাজ ডেপুটি কমিশনার (ডি. সি.) Charter Pawsey তাঁর ব্যক্তিগত আচার-আচরণের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে আসামের সমতলে প্রবেশের সিংহদ্বার কোহিমা প্রহরার

জন্য 'আসাম রাইফেলস্'-এর মাত্র ২৬৬-জন সৈনিক মোতায়েন ছিল। নাগাদের একটা বড়ো অংশ যুদ্ধের সময় Pawsey-কে গোপন তথ্য সরবরাহে নানাভাবে সহয়তা করতে এগিয়ে আসার ফলে ব্রিটিশের পক্ষে কোহিমা যুদ্ধে জয় সম্ভব হয়েছিল। ডি. সি.'র বাংলোর সামনে টেনিস-কোর্ট এক সময় হয়ে উঠেছিল প্রধান রণাঙ্গন। কাব্যিক ভাবে যাকে 'Battle of the Tennis Court' বলা হয়—সেটিই অবশেষে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নটিকে নিশ্চিত করে দিয়েছিল। আসলে, ১৯৪৪ সালের ১৭ এপ্রিল রাত্রে ডি.সি.'র বাংলো জাপানি সেনাবাহিনী দখল করার পরই যুদ্ধটি জটিল আকার ধারণ করেছিল। **Arthur Swinson তাঁর *Kohima* গ্রন্থে কোহিমা যুদ্ধের গুরুত্বকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম রণক্ষেত্র স্তালিনগ্রাদ্-এর সাথে তুলনা করেছেন।** Swinson-এর ভাষায় ঃ *Kohima "was one of the greatest battles of the Second World War, rivalling El Alamein and Stalingrad, though it still remains comparatively unknown. However, to the men who fought there, it remains 'The Battle'."* নাগা পাহাড়ের নীচে কোহিমা থেকে ৪০ মাইল দূরে ডিমাপুরে জেনারেল উইলিয়াম স্লিম-এর নেতৃত্বে ব্যাপক ব্রিটিশ-বাহিনী মোতায়েন থাকলেও কোহিমা রক্ষার গুরুত্ব ইংরাজ সমরনায়করা প্রথমে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। কর্ণেল Hugh Richards মাত্র ১,৫০০ সৈন্য নিয়ে ১২,০০০ জাপ-আই. এন. এ. বাহিনীর মোকাবিলা করতে প্রথম দিকে সফল হননি। এরই জন্য কোহিমা যুদ্ধের প্রথমদিকে জাপ-আই. এন. এ. বাহিনীর হাতে ব্রিটিশ বাহিনীর একটার পর একটা বিপর্যয় ঘটে চলছিল এবং জাপানি সৈনিকরা যুদ্ধের 'U-go' পদ্ধতি অনুসরণ করে মোটামুটি সাফল্য অর্জন করছিলেন। **১৯৪৪ সালের ৪ এপ্রিল থেকে ২২ জুন পর্যন্ত স্থায়ী** কোহিমার যুদ্ধকে সামরিক-ইতিহাসবিদরা মোটামুটিভাবে **তিনটি পর্যায়ে ভাগ** করেছেন। (১) ১৯৪৪ সালের ৪ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিল—জাপ-আই. এন. এ. বাহিনী শৈল-শ্রেণি'র উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ইম্ফল থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও খাদ্য সরবরাহের পথ অবরোধ করে ; (২) ১৮ এপ্রিল থেকে ১৩ মে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী প্রত্যাঘাত হেনে গিরিপথের অধিকাংশই জাপানি কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়, তবে কোহিমা-ইম্ফল রাস্তায় জাপানি প্রাধান্য বজায় থাকে; (৩) ১৬ মে থেকে ২২ জুন মুখোমুখি সংঘর্ষের পর অবশেষে ইংরাজ সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিল্ড্-মার্শাল William Slim তাঁর *Defeat into Victory* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কীভাবে কোহিমার যুদ্ধে অনিবার্য পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েও শেষপর্যন্ত জয় ছিনিয়ে আনা ব্রিটিশ সামরিক শক্তির

পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। এই লোমহর্ষক যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণের অবকাশ এখানে নেই; তবে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান তথা ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় **লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯০০-১৯৮৪)-এর কোহিমার যুদ্ধ সম্পর্কে একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য**। চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও শুধুমাত্র অদম্য সাহস ও বীরত্বের উপর নির্ভর করে স্পার্টার নেতৃত্বে গ্রিক নগর-রাষ্ট্রগুলি সেপ্টেম্বর ৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাদে যেভাবে পারস্য-সম্রাট Xerxes I-এর প্রবল-প্রতাপের মুখোমুখি হয়ে **বিশ্ববিখ্যাত 'থার্মোপাইলের যুদ্ধে'** জয় ছিনিয়ে এনেছিল যুদ্ধের ইতিহাসে সে কাহিনি স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। **লর্ড মাউন্টব্যাটেন কোহিমার যুদ্ধকে সেই থার্মোপাইল যুদ্ধের সমকক্ষ বলে মনে করেন**; তাঁর ভাষায় "Kohima will probably go down as one of the greatest battles in history...naked unparalleled heroism...the British/India Thermopylae." কোহিমায় পরাজয়ের পরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি পরাজয়ের অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় এবং শেষপর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে জাপান ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সালে মিত্র-শক্তির কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

২৩.১.১.২ জাপান ও 'আই. এন. এ.' বাহিনী

কোহিমা'র যুদ্ধের জন্য জাপানের প্রস্তুতি ছিল নিখুঁত এবং এই ব্যাপক প্রস্তুতি দেখে Arthur Swinson পর্যন্ত এটিকে *must rank as one of the most brilliant feats of reconnaissance in the history of war* মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যুদ্ধ জয়ের জন্য যে দুটি ব্যাপারে জাপান অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিল সেটি ছিল খাদ্য ও অস্ত্রের পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাব। ব্রহ্মদেশ থেকে জাপ-সেনাবাহিনী ৫,০০০ গবাদি পশু নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল—যেটি সেনাবাহিনীর জন্য ৫০ দিনের মাংস সরবরাহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট—এবং ঐ সময়ের মধ্যে কোহিমা অধ্যায় সমাপ্ত করার হিসাব ছিল। কিন্তু জাপানি সেনাপতি Sato'র কাছে মাত্র ১,০০০ গবাদি পশু শেষপর্যন্ত আনা হয়েছিল ; কারণ বাকি ৪,০০০ পশুর দুর্গম পথ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি নানা কারণে পথিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছিল। নাগা পাহাড়ের মানুষ সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের সাথে কিছুক্ষেত্রে সহযোগিতা করলেও জাপানি সৈনিকদের মোটেই সহ্য করতে পারত না। সুতরাং স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে খাদ্য সরবরাহের প্রশ্নে জাপানি সৈনিকরা ব্যর্থ ও হতাশ হতে বাধ্য হয়। অভুক্ত সৈনিকদের পক্ষে যুদ্ধ করা ক্রমেই কঠিন হয়ে যায়। Napoleon Bonaparte'র সেই বিখ্যাত উক্তি "An army marches on its stomach" কোহিমা'র যুদ্ধে জাপানি সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে সর্বৈব

সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। একটি হিসাবে দেখা যায়, অপুষ্টি ও নানা রোগে আক্রান্তজনিত কারণে মৃত্যু ছাড়াও **শুধুমাত্র কোহিমা'র বিভিন্ন রণক্ষেত্রে জাপ-আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর মোট ৫,৭৬৪ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। অন্যদিকে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সৈন্যের ৪,০৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল।**

২৩.১.১.৩ যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিমানবন্দর নির্মাণ

যুদ্ধের প্রয়োজনে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি ব্রিটিশ শক্তি অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিল এবং এই সূত্রে আসামসহ উত্তর-পূর্ব-ভারতে কিছু রাস্তাঘাট ও বিমান বন্দর নির্মিত হয়েছিল। একদিকে **'স্টিলওয়েল রোড্'**—যেটি আসামকে চিনের সাথে যোগাযোগ রাখতে সাহায্য করেছিল ; অন্যদিকে দুর্গম স্থানেও আকাশপথ থেকে যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহ অক্ষত রাখার উদ্দেশ্যে **গুয়াহাটির বরঝাড় (বর্তমানে 'লোকপ্রিয় বরদোলই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট'), শিলচরের কুম্ভীগ্রাম, তেজপুরের শালোনিবাড়ি, ডিব্রুগড়ের মোহনবাড়ি ও দিনজান ('দিনজয়গাঁও' থেকে), ধুবরির রূপসী, লখিমপুরের লীলাবাড়িতে বিমানবন্দর নির্মাণের ফলে সামরিক দিক থেকে ব্রিটিশ শক্তি অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল**। কী কারণে কোহিমার যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তি অনিবার্য পরাজয়ের হাত থেকে জয় ছিনিয়ে আনতে পারল ('Defeat into Victory') এবং কেনই বা জাপানি শক্তির সম্ভাব্য জয়ের হাতছানি শেষে পরাজয়ে রূপান্তরিত হল ('Victory into Defeat') সেটি উপলব্ধি করতে গেলে এই সামরিক সুবিধা/অসুবিধাগুলি উল্লেখ করা দরকার। শুধু কোহিমার যুদ্ধের প্রয়োজনেই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামগ্রিক প্রয়োজনে, বিশেষত চিনের কুওমিংতাং সৈন্যাধ্যক্ষ চিয়াং-কাই-শেক (১৮৮৭-১৯৭৫)-কে জাপানি আক্রমণের মোকাবিলায় সামরিক সাহায্য করতে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট (১৮৮২-১৯৪৫) মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে থাকার সময় (১৯৩৩-১৯৪৫) আসামের লেডো (অর্থাৎ যে স্থান পর্যন্ত রেলপথ প্রসারিত ছিল) থেকে চিন পর্যন্ত 'স্টিলওয়েল রোড্' নির্মাণ এবং আপার-আসামের ডিব্রুগড়ের কাছে সামরিক বিমানবন্দর দিনজান-এর উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করতেন। সেই সময় দিনজান ছিল আসলে একটি গ্রাম এবং যুদ্ধ বিমানের পাইলটরা স্থানীয় চা-বাগানের বাংলোতে অবস্থান করতেন।

২৩.১.২ আসাম রাইফেলস্ (Assam Rifles)

'আসাম রাইফেলস্'-এর ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে ১৮৩৫ সালে ফিরে যেতে হবে যখন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান Mr. Grange নওগাঁও এবং সমতলের চা-

বাগানগুলো অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য 'Cachar Levy' নামে আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করেছিলেন। এরপর বাহিনীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা-রক্ষাসহ যুদ্ধে গোর্খা সেনাবাহিনীকে সাহায্যের দায়িত্বও অর্পিত হয়। এই আধা-সামরিক বাহিনীর নাম 'Assam Military Police', 'Frontier Police' ইত্যাদি একাধিকবার পরিবর্তনের পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে ১৯১৭ সালে 'আসাম রাইফেলস্' রাখা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৩,০০০ হাজার এই বাহিনী 'গোর্খা রেজিমেন্ট'-এর সাথে বিশ্বের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যৌথভাবে যুক্ত করে ৭৬টি Gallantry Award, ৭টি 10M (Indian Order of Merit) এবং ৫টি Indian Distinguished Service Medal অর্জন করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রহ্মদেশ সীমান্তে জাপানি আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে এবং কোহিমা ও ইম্ফলের যুদ্ধে এই বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য ব্রিটিশ শাসকরা খুশি হয়ে এটিকে 'Victor-Force' বা 'V-Force' হিসেবে চিহ্নিত করেন। ১৯৪১ সালে যখন ব্রহ্মদেশ থেকে হাজার হাজার শরণার্থী আসামে আশ্রয়ের জন্য অনুপ্রবেশ করেছিলেন, 'আসাম রাইফেলস্'-এর জওয়ানরা নানাভাবে শরণার্থীদের সাহায্য করে সেটি নিশ্চিত করেছিলেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, ত্রাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই আধা-সামরিক বাহিনী উল্লেখযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তির অঙ্গ হিসাবে অসমসাহসী ভূমিকা নেওয়ার জন্য এই বাহিনীর কমপক্ষে ২০০ জনের প্রাণহানি হয়েছিল। কোহিমার যুদ্ধে 'আসাম রাইফেলস্'-এর যে ব্যাটেলিয়ান অংশ নিয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন খগেন্দ্রনাথ গোগুই এবং সর্বেশ্বর রাজবংশীর মতো আসামের দুই যোদ্ধা।

শুধু ব্রিটিশ শাসনেই নয়, স্বাধীনোত্তর ভারতেও স্বতন্ত্র ডাইরেক্টর জেনারেল-এর অধীনস্থ এই আধা-সামরিক বাহিনীর উল্লেখযোগ্য কিছু কাজের জন্য অনেকেরই প্রশংসা অর্জন করেছে এবং 'Sentinels of the North-East' নামে পরিচিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীন হয় 'আসাম রাইফেলস্'-এর ৫ ব্যাটেলিয়ান বাহিনী ছিল; কিন্তু ইদানীং এটি বেড়ে ৪৬ ব্যাটেলিয়ানে দাঁড়িয়েছে।

২৩.১.৩ স্টিলওয়েল রোড্ (Stilwell Road)

আসামের লেডো রেল স্টেশন সীমান্ত থেকে চিনের ইউনান পর্যন্ত দীর্ঘ পথ যেটি 'লেডো রোড্' নামে এক সময় পরিচিত ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক

প্রয়োজনে এটি ব্যাপকভাবে প্রসারিত ও সংস্কারের পর 'স্টিলওয়েল রোড্' নামে খ্যাত হয়। ১৯৪২ সালের এপ্রিলে দীর্ঘ ১০৭৯ মাইলের পথের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে এটি শেষ হয়। **এই রাস্তাটির ৩৬ মাইল ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে, ৬৪৬ মাইল ব্রহ্মদেশে এবং ৩৯৭ মাইল চিনের অভ্যন্তরে প্রসারিত**। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে জাপানি আক্রমণে ব্রহ্মদেশের পতন হয় এবং মিত্রশক্তির সেনাবাহিনী ভারতবর্ষে (বতর্মান নাগাল্যান্ড, আসাম, অরুণাচল, মণিপুর) পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। চিনে চিয়াং-কাই-শেক্-এর কুওমিংতাং (KMT) মিত্রশক্তির অংশ হিসাবে জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মার্কিনি বা মিত্রশক্তির সামরিক ও বেসামরিক সাহায্য যাতে কুওমিংতাং-এর কাছে পৌঁছোতে না পারে এজন্য জাপান 'লেডো রোড্'টিকে ব্যবহারের অনুপযুক্ত করে তোলে। ফলে, দুর্গম পাহাড় জঙ্গলের উপর দিয়ে বিমান বাহিনীর মাধ্যমে ('Hump Route') চিয়াং-কাই-শেক্-কে অতি সামান্য সাহায্যের মধ্যেই মিত্রশক্তির যোগাযোগ রক্ষা করা কোনো মতে সম্ভব হয়। আসামের লেডো, দিনজান, ডুম-ডুমা, মিসামারি প্রভৃতি স্থানে সামরিক ঘাঁটি ও অবতরণ ক্ষেত্র তৈরি হয়। **আমেরিকান জেনারেল Joseph Stilwell** লেডো থেকে জয়রামপুর, নামপং হয়ে পাংসাউ গিরিপথ ও পাটকাই পর্বতমালা অতিক্রম করে ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার)-এর ভিতর দিয়ে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করে অত্যন্ত দ্রুত এই পথ নির্মাণ করতে গিয়ে ১৫,০০০ আফ্রিকান-আমেরিকান বাহিনী (যেটি EAB নামে পরিচিত), ৩৫,০০০ ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগ করেছিলেন। **অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় কাজটি করতে গিয়ে কমপক্ষে ১,১০০ শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটেছিল**। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Winston Churchill-এর আশঙ্কা ছিল, যুদ্ধের প্রয়োজনে এত শ্রম-সাপেক্ষ কাজটি যেদিন শেষ হবে, সেদিন হয়তো বা এর প্রয়োজন তেমন থাকবে না ("...an immense, laborious task, unlikely to be finished until the need for it has passed.") ব্রহ্মদেশ জাপানি আগ্রাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পরই কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়েছিল। রাস্তাটির পাশ দিয়ে তেলের পাইপ-লাইনও বিস্তৃত ছিল যাতে জ্বালানির অভাবে সংকট সৃষ্টি না হয় অথবা তেলের জন্য বিশাল ট্যাঙ্কার ইত্যাদির প্রয়োজন তেমন না হয়। ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে পথটির নির্মাণ কাজ মোটামুটিভাবে শেষ হলেও ১২ জানুয়ারি ১৯৪৫ সালে General Pick-এর নেতৃত্বে ১১৩টি যানবাহনসহ প্রথম 'কন্‌ভয়'টি আসামের লেডো থেকে প্রথম যাত্রা শুরু করে এবং চিনের কুনমিং-এ ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫-এ পৌঁছোয়। **রাস্তাটি উদ্বোধনের**

প্রথম ৬ মাসে আসাম থেকে কুওমিংতাং প্রধান চিয়াং-কাই-শেক্-এর কাছে ১,২৯,০০০ টন সামগ্রী ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন মিত্রশক্তি পাঠিয়েছিল। চিয়াং-কাই-শেক্-এর অনুরোধেই ব্রিটিশ শাসকরা মার্কিন জেনারেল Stilwell-এর নামেই রাজপথটি নামাঙ্কিত করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে, চিনে মাও-জে-দং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট চিন চিয়াং-কাই-শেক্-কে ফরমোজা (তাইওয়ান)-তে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করে, বিশ্বরাজনীতিতে রূপান্তর ঘটে, মায়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থান সহ নানা উত্তেজনার কারণে 'স্টিলওয়েল রোড্'-এর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যায়। ইদানীং অবশ্য বিশ্বায়নের জোয়ার এবং ভারত সরকার ঘোষিত 'Look East' ('পুব দিকে তাকাও') policy-'র ফলে 'স্টিলওয়েল রোড্'-এর ব্যাপক সংস্কার ও প্রসারণের উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

২৩.১.৪ নেতাজির আকর্ষণ-শক্তি

'India National Army' বা আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে আসামের হার্দিক সম্পর্ক নিয়ে ইতিপূর্বে ২.৬.৫.১ প্যারায় কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে সুভাষচন্দ্র আসামে এসেছিলেন এবং এরপরই সূত্রপাত হয় 'নেতাজি অধ্যায়', যে লোমহর্ষক কাহিনি এবং 'আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ'-এর গঠন ও আবির্ভাব সম্পর্কে অনেকেরই কিছু ধারণা আছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারতকে মুক্ত করার তীব্র আকুতি থেকেই দেশের বাইরে সিঙ্গাপুরে ২১ অক্টোবর, ১৯৪৩ সালে অস্থায়ী 'আজাদ-হিন্দ্ সরকার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৭ জানুয়ারি ১৯৪৪ সালে ঐ অস্থায়ী সরকারের সদর দপ্তর রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গন) স্থানান্তরিত এবং ৫ এপ্রিল ১৯৪৪-এ ওখানেই 'আজাদ-হিন্দ্ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'আজাদ-হিন্দ্ সরকার'-এর জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, প্রতীক, মুদ্রা, সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে একটি স্বাধীন সরকার চালানোর জন্য যা যা প্রয়োজন হয় সবই নেতাজি মাত্র এক বছরেরও কম সময়ে সম্পন্ন করেছিলেন। Hugh Toye তাঁর *The Springing Tiger* (p. 178) গ্রন্থে নেতাজি সম্পর্কে এই রকম মন্তব্য করেছেন ঃ *For most, the personality of the man was overwhelming, there was great genius of enthusiasm, of inspiration. Men found that when they were with him only the cause mattered, they saw only through his eyes, through the thoughts he gave them, could deny him nothing.*

জাপানি প্রধানমন্ত্রী তোজো নেতাজিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং জাপানি সেনাবাহিনীর কাছে নির্দেশ ছিল আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের সাথে যেন কেউ দুর্ব্যবহার না করেন।

২৩.১.৪.১ 'আই. এন. এ.'-র সাথে জাপানি অসহযোগিতা

অবশ্য তোজো'র উপরোক্ত নির্দেশ সত্ত্বেও সবসময় সকলে যে সেটি মান্য করতেন সেটি মনে হয় না। ১৯৪২ সালে জাপানি সেনাবাহিনী আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করার পরবর্তী পর্বে তোজো সরকার ঐ দুটি দ্বীপ 'আই. এন. এ.'র হাতে সমর্পণ করার পর সুভাষচন্দ্র যখন ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরে পোর্ট ব্লেয়ারে অবতরণ করলেন এবং দুটি দ্বীপকে যথাক্রমে 'শহীদ দ্বীপ' ও 'স্বরাজ দ্বীপ' হিসাবে নামাঙ্কিত করলেন, সেই সময় জাপানি সমরনায়করা তেমন বিরোধিতা না করলেও ক্রমশ 'আই. এন. এ.'র পক্ষে দ্বীপ দুটি দখলে রাখা কঠিন হয়ে উঠল। ১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে 'আই. এন. এ.'র পক্ষ থেকে কর্নেল এ. ডি. লোকনাথন-কে 'শহীদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপের চিফ্-কমিশনার হিসাবে পাঠানো হলেও জাপানি সমরনায়কদের অসহযোগিতা ও বিরোধিতার জন্য শেষপর্যন্ত লোকনাথন-কে সেপ্টেম্বর ১৯৪৪-এ ফিরে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। রণাঙ্গনেও জাপানি ও আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের সম্পর্ক যে সব সময় মধুর ছিল তাও নয়। জাপানি সেনানায়করা, সুভাষের অনুরোধ সত্ত্বেও, 'আই. এন. এ'-কে স্বাধীনভাবে কোনো একটি রণাঙ্গনে নেতৃত্ব দেওয়ার অনুমতি না দেওয়ার ফলে কোহিমার যুদ্ধসহ অন্যত্র জাপানি সৈনিকদের সাহায্য করাই প্রধান দায়িত্ব ছিল। আরাকান-চট্টগ্রাম-বঙ্গদেশ ও আসামের সমতলে রণাঙ্গনকে প্রসারিত করার যে নীল্-নকশা 'আই. এন. এ.' তৈরি করেছিল (যেটি হলে অগণিত মানুষের সমর্থন মিলত), জাপানি সমরকর্তারা বিশেষত ফিল্ড মার্শাল Terauchi সেটি গ্রহণ করেননি। এটি গ্রহণ করলে ভারত ইতিহাসের ঘটনা-প্রবাহ হয়তো বা অন্যদিকে গতি নিতে পারত।

২৩.১.৪.২ আই. এন. এ.'র জনভিত্তি

সেই সময় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ সম্পর্কে মানুষের মনে কত উৎসাহ উত্তেজনা ছিল, সেটি উল্লেখ করতে গিয়ে R. Coupland (*Indian Politics*, p. 268), লিখেছেন ঃ *The Revolutionaries of extreme left, specially in Bengal, were still ready to take orders from Mr. Subhas Chandra Bose, even if they came by radio from Berlin.* আসলে,

মণিপুর, আসাম ও নাগা পাহাড়ের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ও দল আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করতেন। মণিপুরের রাধাবিনোদ কইজাম মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী) এবং এইচ. নীলমণি সিংহ, 'নিখিল মণিপুরি মহাসভা', নাগা নেতা এ. জেড্. ফিজো (যিনি পায়ে হেঁটে ব্রহ্মদেশে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন), ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট' ছাড়াও নবগঠিত 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এবং 'আর. সি. পি. আই.'-এর নেতৃবৃন্দ, জোড়হাট জেলে রাজনৈতিক বন্দিরা 'আই. এন. এ.'-কে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আসামের সমতলে লক্ষ্মীপ্রসাদ গোস্বামী, দেবকান্ত বরুয়া, জালালউদ্দিন আমেদ, চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, শ্রীদামচন্দ্র মোহান্ত, হরেন্দ্রনাথ মেচ, উমেশচন্দ্র দেবচৌধুরি, এস. রহমান, এস. লউরাট সিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিরা এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং বন্দি অবস্থাতে গোপীনাথ বরদোলইও তাঁদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। উত্তেজনা এমন পর্যায়ে এসেছিল যে আসামের একদল বিপ্লবী যুবক লামডিং পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন 'আই. এন. এ.'-কে স্বাগত জানানোর প্রত্যাশায় (যদিও 'আই. এন. এ.', প্রচারিত গুজব অনুযায়ী, শেষপর্যন্ত নানা বাধা অতিক্রম করে লামডিং আসতে পারেনি)। আসলে, প্যারাস্যুটে আসামের সমতলে 'আই. এন. এ.'র কিছু দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা অবতরণ করে এবং প্রচার-পত্র ছড়িয়ে দিয়ে মানসিক প্রস্তুতির জন্য সকলের আছে আবেদন জানিয়েছিলেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের দৃষ্টিতে এইসব মুক্তি যোদ্ধারা "JIFS" ("Japanese-inspired fifth columnist spies") বা "BATs" ("Burma area trainees") নামে পরিচিত ছিলেন এবং এঁদের অধিকাংশকেই গ্রেফতার করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে দিল্লির রামযশ কলেজ'-এর ছাত্র এবং 'Bengal Volunteers'-এর কর্মী কাশীনাথ ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা অনেক গোপন তথ্যের সন্ধান পায়। **আসলে, ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের মূল-ভিত্তি ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সেই বাহিনীর একটা অংশ যেভাবে 'আই. এন. এ.'-র প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করছিল তাতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়ে। কোহিমা যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নটির চেয়েও এটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের নানা কারণ উল্লেখ করে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এট্‌লির নেতাজি সম্পর্কে একটি মন্তব্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ *In his reply Atlee cited among several reasons, the principal among them being the erosion of loyalty to the British*

crown among the Indian Army and Navy personnel as a result of the military activities of Netaji." ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে যেসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গোপনে 'আই.এন.এ.'র সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন তার একটা সন্দেহ তালিকাও ব্রিটিশ গোয়েন্দারা প্রস্তুত করেছিলেন এবং তার মধ্যে স্বাধীন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি স্যার সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন-এর জামাতা মেজর (ডাঃ) কে. নরসিংহ রাও-এর নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আসলে, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা-নির্বিশেষে 'আই.এন.এ.'-র আবেদন ছিল সামগ্রিক; যার জন্য পাকিস্তানের জন্মদাতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ'র মতো ব্যক্তিত্বও সুভাষচন্দ্রের একজন অনুরাগী ছিলেন এবং হয়তো বা তিনি (জিন্নাহ্) ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের জন্য অত চাপাচাপি করতেন না, যদি সুভাষচন্দ্র জাতিকে নেতৃত্ব দিতেন।

কোহিমার যুদ্ধের সময় নানা বাধা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কোহিমা থেকে ৬০ কিমি. দূরে Chesezu সেনা ছাউনিতে বসে নেতাজি যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতেন। কিন্তু ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ঐ ছাউনিতেও বোমা নিক্ষেপের ফলে 'আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ'-এর সর্বাধিনায়ককে ঐ স্থানটি অবশেষে ত্যাগ করতে হয়। কোহিমা যুদ্ধে জাপানি ও 'আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ'-এর পরাস্ত হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড়ো কারণ ছিল অপর্যাপ্ত খাদ্য ও অস্ত্র এবং যোগাযোগের জন্য বিমান বাহিনীর অভাব। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে নাগা পাহাড়ের মানুষ জাপানিদের কোনোভাবে সাহায্য করতে রাজি না হলেও 'আই.এন.এ.'র প্রতি ছিল নানা রকম দুর্বলতা। কিন্তু জাপানি সমরনায়করা সেই সুযোগটি ব্যবহার করতে পারেননি। আসলে, নাগা জনগণের সাহায্য ছাড়া যে এই যুদ্ধে জয় কঠিন ছিল, এটি সুভাষচন্দ্র যেভাবে অনুভব করতেন, জাপানি সমরকর্তারা সেইভাবে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে দুর্যোগ নেমে এসেছিল। কোহিমা রণাঙ্গন থেকে জাপানি সংবাদদাতা S. Maruyama জানিয়েছিলেন ঃ "We had no ammunition, no clothes, no food, no guns. At Kohima, we were starved and then crushed." নাগাদের লোককথা বা গল্পে আজও নেতাজি বেঁচে থাকলেও সুহৃদ হিসাবে জাপানিদের উল্লেখ কোথাও নেই।

২৩.১.৪.৩ কোহিমার সমাধিস্থল

'Commonwealth War Graves Commission.' কোহিমায় 'গ্যারিসন্-হিল্'-এর তলদেশে ডি. সি.'র বিখ্যাত 'টেনিস্-কোর্ট'-এর কাছে ঐ যুদ্ধে নিহত ব্রিটিশ ভারতীয় সৈনিকদের স্মরণার্থে একটি মনোরম সমাধিস্থল (Cemetery)

নির্মাণ করে সমাধিস্তম্ভে John Maxwell Edmonds (1875-1958)-এর কবিতার দুটি মর্মস্পর্শী লাইন খোদাই করে দিয়েছে ঃ

When you go Home, Tell Them of Us and Say,
For Their Tomorrow, We gave Our Today

(বাড়ি ফিরে গিয়ে আমাদের কথা উল্লেখ করার সময় ওদের বোলো, তাদের 'আগামীকাল'-এর জন্য, আমরা আমাদের 'আজ' বিসর্জন দিলাম।)

বিশ্ববিখ্যাত থার্মোপাইল যুদ্ধের বীর শহিদদের সমাধিস্থলে উৎকীর্ণ লিপি ছিল একই ধরনের।

উপরোক্ত সমাধিস্থলে কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রদর্শনীতে যেসব নাম-না-জানা 'আই. এন. এ.' সৈনিকের মৃত্যু হয়েছিল তার উল্লেখ নেই। বিদগ্ধ নাগা বুদ্ধিজীবী Khevito Sumi সেজন্য মন্তব্য করেছেন ঃ "Today when the state government has opened a museum in remembrance of World War II heroes, the sad part is that we have forgotten our INA heroes and their sacrifices." এর জন্য কোহিমায় সম্প্রতি 'Netaji Subhas Bose Memorial Development Society' আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ-এর স্মৃতি অক্ষয় রাখার উদ্দেশ্যে অনুরূপ আর একটি সমাধিস্থল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে Winston Churchill-এর একটি বিখ্যাত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ

"A nation that forgets its past has no future." (যে জাতি অতীত ভুলে যায়, তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই)।

অসমসাহস ও বীরত্বের এবং গুরুত্বের প্রশ্নে কোহিমার যুদ্ধটি যে কত তাৎপর্যপূর্ব সেটি ব্যক্ত করতে গিয়ে মাউন্টব্যাটেন (আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) যুদ্ধটিকে থার্মোপাইল যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন, অথচ ভারত ইতিহাসে এটি আজও উপযুক্ত মর্যাদার স্থান পায়নি এবং উপেক্ষিতই রয়ে গেছে।

২৩.১.৫ আসামে যুদ্ধের প্রভাব (Impact of the War in Assam)

কোহিমার যুদ্ধের ফলে নাগা পাহাড়ের কোহিমা শহরটি যে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল সেটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সেই সময় আসামের নাগা পাহাড়ের ডি. সি. Sir Charles Ridley Pawsey নিজেই স্বীকার করেছেন, ইঙ্গ-মার্কিন সৈনিকদের যথেচ্ছ বোমা, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির জন্যই কোহিমার বেশি ক্ষতি হয়েছিল। R. B. Vaghaiwalla (*Census of India, 1951*, vol. XII, (A, P. 54) তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, এমনকি ১৯৫১ সালেও

কোহিমা যুদ্ধের ক্ষত থেকে মুক্তি পায়নি ('Even by 1951 Kohima had not fully recovered from the ravages of the war') যুদ্ধোত্তর অবস্থায় কোহিমায় পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য যে কমিটি তৈরি হয়েছিল সেটির ডাইরেক্টর C. Ogilvie তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন ঃ

Houses containing paddy were set alight by the military as a measure of denial and the fire inevitably spread to other houses so that even before fighting began, a good many houses and the greater portion of the paddy stocks had been completely destroyed.

Pawsey এবং Ogilvie দুজনেই মন্তব্য করেছেন, জাপানি এবং 'আই.এন.এ.' বাহিনী (ব্রিটিশ ভাষ্যকারদের ভাষায় 'renegade Indians') কোহিমার অভ্যন্তরে সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন বা লুটপাট না চালালেও এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে জিনিসপত্র কিনতে চাইলেও স্থানীয় মানুষের অসহযোগিতার জন্য বেশিরভাগ সময় অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছে এবং সেটাই তাদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে দেশজোড়া যে খাদ্য-সংকট, জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য, কালোবাজারি শুরু হয়েছিল (১৯৪৩ সালে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য) আসাম তার ব্যতিক্রম ছিল না ; বরং কিছু ক্ষেত্রে আসামের অবস্থা আরও সংকটকজনক হয়েছিল। যুদ্ধ শুরুর সময় সমগ্র দেশে অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে পাইকারি দরের সূচক ছিল ৮৮.১৫; কিন্তু ১৯৪২-৪৩ সালে এটি বেড়ে হয় ১৬২.৮০; ১৯৪৫-৪৬ সালে ১৯৯.১০ এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে ২২১.৯০। আসামে কিছু ক্ষেত্রে এটি ৩০০ শতাংশ অতিক্রম করেছিল। এর থেকেই অনুমান করা যায়, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য কত ব্যাপক প্রভাব নেমে এসেছিল। যেহেতু সমগ্র দেশের মধ্যে মণিপুর ও আসাম ছিল প্রকৃত রণাঙ্গন—যেখানে সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত—ফলে, সাধারণ মানুষের জীবন কত অসহনীয় হয়ে উঠেছিল সমকালীন পত্র-পত্রিকাই তার সাক্ষ্য দেয়। নিত্য-প্রয়োজনীয় লবণের দামও আসামের বিভিন্ন স্থানে ৮ টাকায় ১ সের পর্যন্ত উঠেছিল। নির্দিষ্ট বেতনের চাকুরিজীবীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অভুক্ত মানুষের হাট/বাজার লুঠ (বিশেষত গোয়ালপাড়া অঞ্চলে), অ-অসমিয়া ছোটো-খাটো ব্যবসাদারদের আসাম ত্যাগ ইত্যাদি ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে নামেই রেশনিং ব্যবস্থা

চালু করা হয়েছিল, কারণ এটিকে কেন্দ্র করে কালোবাজারি রমরমা অবস্থায় পৌঁছেছিল।

একদিকে জাপানি অধিকৃত ব্রহ্মদেশ এবং অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অবিভক্ত বঙ্গদেশ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দলে দলে শরণার্থী আসামে আশ্রয় নেওয়ার ফলে খাদ্য-সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ব্রিটিশ শাসকরা (একদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং অন্যদিকে ভাইসরয় লিন্‌লিথ্‌গো) এই অবস্থার মোকাবিলার জন্য 'আরও অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান' বা 'Grow More Food Campaign'-এর প্রচারের জন্য আসামের শাদুল্লাহ্ সরকারসহ ভারতের সর্বত্র নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু, নানা কারণে আসামে এই অভিযান পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আসামে ধানের উৎপাদন ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে মাত্র ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যেটি প্রত্যাশার নগণ্য মাত্র, এবং আখ, আলুসহ্ অন্যান্য ফসলের উৎপাদন প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পেয়েছিল। নানা সমস্যায় জর্জরিত আসামের কৃষক এই ডাকে সাড়া দিতে উৎসাহ পায়নি। কিন্তু আসামের প্রধানমন্ত্রী শাদুল্লাহ এটিকেই "spectacular success" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আসলে, শাদুল্লাহ্ সরকারের নজর খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির স্থলে প্রতিবেশী পূর্ববঙ্গের জমি-বুভুক্ষু মুসলিম কৃষকদের কাছে আসামের দ্বার উন্মোচন এবং তাদের বসতি-স্থাপনের দিকেই বেশি ছিল। এরই জন্য ঐতিহাসিক অমলেন্দু গুহ (*Planter Raj*... p. 229) ভাইসরয় লিন্‌লিথ্‌গো'র (১৯৩৬-১৯৪৪) একটি মন্তব্যসহ লিখেছেন ঃ *"...the fourth Saadulla ministry, therefore, adopted a new resolution on land settlement under the slogan of '**grow more food**'. What is really meant, according to the Viceroy, was '**grow more Moslems**'."*

আসামে জনসংখ্যা বিন্যাসে অধিক সংখ্যায় মুসলিম অভিবাসনের ফলে কত জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেটি পরবর্তী স্তরে উল্লেখ করা হবে।

কোহিমার যুদ্ধ তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আসামের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোহিমাসহ বর্তমান নাগাল্যান্ড ছিল আসামের একটি জেলা মাত্র। কোহিমার যুদ্ধে জাপানি ও আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের (একটি হিসাব অনুযায়ী) মোট ৫,৭৬৪ জন এবং মিত্রপক্ষের মোট ৪,০৬৪ জন সৈনিকের প্রাণহানি বা মৃত্যু হয়েছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলির সন্ধান পাওয়া যায়নি। ঐসব খোওয়া-যাওয়া অস্ত্র হাতে পাওয়ার পর নাগা জাতীয়তাবাদীদের উদ্যোগে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রথম উগ্রপন্থার জন্ম**

হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে নাগাদের পথ অনুসরণ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে উগ্রপন্থা ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণকারী সৈনিকরা রণাঙ্গনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘরে ফিরে আসার পর সমস্যা আরও জটিল হয়। আসামসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে এই একই ছবি দেখা যায়। গেরিলা কায়দায় অস্ত্রের ঝনঝনানির মাধ্যমে ছোটো বড়ো নানা জাতিগোষ্ঠী নিজেদের সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করার নতুন পথের সন্ধান পায়।

সামরিক প্রয়োজনেই আসামের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিকাঠামো কিছুটা গুরুত্ব পায়। নতুন রাস্তাঘাট (যেমন 'স্টিলওয়েল রোড্'), বিমানবন্দর (২৩.১. ১.৩ দ্রষ্টব্য), সামরিক হাসপাতাল ইত্যাদি যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে নির্মিত হয়। যেহেতু কালাজ্বর, কলেরা ইত্যাদি মহামারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যাপকভাবে দেখা দিত, এটির মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে। যুদ্ধের জন্যই এইসব দিকে ব্রিটিশ শাসকরা নজর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। খনিজ তেল, কয়লা, চা ইত্যাদির চাহিদা ও উৎপাদন আসামে বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যও যুদ্ধের সময় কিছুটা প্রসারিত হয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিকের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুদ্ধের সময় আসামে ব্যাঙের ছাতার মতো কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক গজিয়ে উঠেছিল, যদিও কিছুদিনের মধ্যে বেশিরভাগেরই অপমৃত্যু হয়। ঋণদানের উদ্দেশ্যে কিছু সমবায় ব্যাংকও ঐসময় সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সেগুলিও অকালে ঝড়ে যায়। আসামে Cooperative Societies-এর Registrar দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাময়িকভাবে সমবায়-ব্যবস্থার ব্যর্থতার জন্য যে কারণগুলি চিহ্নিত করেছিলেন সেগুলি হ'ল ঃ

> *dwindling assets, increasing liabilities, waning public confidence, a falling off in the number of members,...and an all-round stagnation.*

উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনা-ছাউনি তৈরির ফলে তার প্রভাব আজও সমাজ-জীবনে দৃষ্ট হয়। যুদ্ধের ফলে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছিল, অন্যদিকে সামাজিক পরিবেশও নানাভাবে কলুষিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে মহিলারা বাইরের কর্মজগতে স্থান পাওয়ার যেমন সুযোগ পায়, তেমনি আবার যৌন কারণে বলাৎকার, ধর্ষণ, পাশবিক অত্যাচারের কালো অধ্যায়েরও সূত্রপাত হয়। সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের ক্রমশ অবক্ষয় এবং সমাজে উপেক্ষিত **'War childrens'**

শব্দটি পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মতো উত্তর-পূর্ব ভারতেরও দেখা যায় এবং এইসবের মনস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ। **সামাজিক ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আজও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি।**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে অনেক গল্প ও লোককথা আসামের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। আসামের সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়বস্তু নিয়ে রীতিমতো গবেষণার সুযোগ আছে। আসলে, **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই অসমিয়া সাহিত্যে রোমান্টিকতার স্থলে বাস্তবতা ও সমাজতান্ত্রিক চেতনার গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়।** বাস্তবধর্মী উপন্যাস ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া (১৭.৪৬ দ্রষ্টব্য), সৈয়দ আব্দুল মালিক (১৭.৬৯ দ্রষ্টব্য), বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (১৭.৪৯ দ্রষ্টব্য, যোগেশ দাস (১৭.৫৭ দ্রষ্টব্য); জীবনমুখী কাব্য কবিতার ক্ষেত্রে হেম বরুয়া (১৭.৭২ দ্রষ্টব্য), নবকান্ত বরুয়া (১৭.৩৪ দ্রষ্টব্য) এবং তাঁদের অনুসারীরা; উদ্দীপক সংগীত, নাটক, ছায়াছবির ক্ষেত্রে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য) ও অন্যান্যরা; সমাজের রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে লক্ষ্মীধর শর্মা, সৌরভ চালিহা, মহিম বোরা, ভবানন্দ শইকিয়া সহ অন্যান্যদের সৃষ্ট ছোটো গল্প ছিল অনবদ্য সংযোজন। এঁদের প্রত্যেকেই একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সর্বভারতীয় ঘটনা-প্রবাহ এবং অন্যদিকে আসামের মাটিতে পরিবর্তনের ধারাকে নিপুণভাবে উপস্থিত করে আসামের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নতুন মাইল-ফলক বসিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল একটি 'total war', সুতরাং জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর প্রভাব ছিল অনিবার্য।

২৩.২ ব্রিটিশ ভারতের শেষ নির্বাচন (১৯৪৬)

২৩.২.১ প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ব্রিটেনে নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়। **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ব্রিটিশ কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন 'কনজারভেটিভ' বা রক্ষণশীল দলের নেতা স্যার উইনস্টন লেনার্ড স্পেন্সার চার্চিল (১৮৭৪-১৯৬৫); যিনি ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার তীব্র বিরোধী। কিন্তু ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরাজয় হয় এবং বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে 'লেবার' বা শ্রমিক দলের নেতা ক্লিমেন্ট রিচার্ড এট্‌লি (১৮৮৩-১৯৬৭)—যিনি যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন—প্রধানমন্ত্রীর (১৯৪৫-১৯৫১) দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্রিটেনে শ্রমিক দলের এই**

জয়ে ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে খুশির হাওয়া বইলেও (কারণ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন) এবং এট্‌লি'কে উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হলেও, মুসলিম লিগ কোনো উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যবনিকার এক বছর আগে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো ভারতের ভাইসরয় পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ফিল্ড্ মার্শাল আর্কিবল্ড পার্সিভ্যাল ওয়াভেল (১৮৮৩-১৯৫০)-কে উইনস্টন চার্চিল ভারতের ভাইসরয় পদে নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। ভাইসরয় থাকাকালীন সময়ে (১৯৪৪-৪৭) ওয়াভেল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের পারস্পরিক আলোচনার জন্য ২৫ জুন, ১৯৪৫ সালে 'সিমলা সম্মেলন'-এর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু এটির ব্যর্থতার পর ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা পাকা করলেন। ওয়াভেল-এর উদ্দেশ্য ছিল নবগঠিত প্রাদেশিক আইনসভা/বিধানসভার প্রতিনিধিদের নিয়ে ভারতের সংবিধান-সভা গঠন। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫-এ ভাইসরয় ওয়াভেল ঘোষণা করলেন ঃ "His Majesty's government was determined to promote in union with the leaders of Indian opinion the early realisation of full self-government." কিন্তু মুসলিম লিগের প্রথম স্তরের দুই নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮, পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল) এবং তাঁর ডান-হাত হিসাবে পরিচিত নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খান (১৮৯৬-১৯৫১, পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী) স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, ১৯৪০-এর মার্চে মুসলিম লিগের 'লাহোর সিদ্ধান্ত' অনুযায়ী 'পাকিস্তান প্রস্তাব'কে স্বীকৃতি না দিলে ব্রিটিশের কোনো প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য হবে না। আসলে, ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, অবিভক্ত ভারতে ধর্মীয় আঙ্গিকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ কোটি ; অন্যদিকে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ২৬ কোটির কাছাকাছি ; অর্থাৎ মুসলিমরা সংখ্যালঘু। এই প্রেক্ষিতে যতই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ হোক্ না কেন, 'মুসলিম লিগে'র পক্ষে পক্ষে এককভাবে সমগ্র ভারতের ক্ষমতা দখল ছিল অবাস্তব স্বপ্ন ; এরই জন্য 'পাকিস্তান' সৃষ্টির দাবিতে লিগ অত সোচ্চার হয়েছিল। কংগ্রেস নেতারাও ভাইসরয় ওয়াভেল-এর প্রস্তাবকে "vague, inadequate and unsatisfactory" হিসাবে বর্ণনা করেন ; কারণ স্বাধীনতার উল্লেখ ওয়াভেল-এর ঘোষণায় ছিল না। মুখে ওয়াভেল-এর ঘোষণার বিরুদ্ধে যাই বলা হোক্, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে ব্রিটিশ ভারতের শেষ নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৪৬-এর

নির্বাচনে মুসলিম লিগের একটিই দাবি ছিল 'পাকিস্তান' এবং এই নির্বাচনকে লিগ 'গণভোট' বা 'referendum' হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। ভারতের সকল মুসলমান যে 'মুসলিম লিগ'-এর সমর্থক এবং কংগ্রেস যে হিন্দু প্রভাবিত দল, এটি প্রমাণ করাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেস 'অখণ্ড ভারত' ও 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবিতে নির্বাচনে অংশ নিয়ে 'মুসলিম লিগ' বিরোধী বিভিন্ন মুসলিম দলকে নানাভাবে সাহায্য করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮)-এর মতো কিছু মুসলিম নেতা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, দেশভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি কখনও মুসলিম জনগণের কল্যাণ করতে পারে না। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধানে প্রতিটি ইউনিটের স্বাধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে কাঠামোটি যাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের হয়—এটিই গান্ধিজিসহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের কাছে মৌলানা আজাদ-এর আবেদন বার্তা ছিল।

উপরোক্ত পটভূমিতে একদিকে যখন 'মুসলিম লিগ' সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের মাধ্যমে দেশভাগের জন্য মরিয়া, সেই সময় দেশভাগের বিরোধী শক্তিও নানাভাবে বক্তব্য পেশের মাধ্যমে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে মজবুত করার ক্ষেত্রে সেই সময় দিল্লির লালকেল্লায় 'আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ'-এর বন্দিদের বিচারের (INA Trial) প্রশ্নটিও এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের মে মাস পর্যন্ত স্থায়ী এই বিচারকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশে দল মত নির্বিশেষে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের সর্বত্র কংগ্রেস-মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্টদের পতাকা একসাথে বেঁধে ঐ ঐতিহাসিক 'কোর্ট মার্শাল'-এর বিরুদ্ধে এই ধরনের ঐক্যবদ্ধ ধিক্কার ও ঘৃণা দেখে ব্রিটিশ শাসকরা রীতিমতো হতবাক্ ও আঁতকে উঠেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত এই বিচারের যবনিকা টানতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনেকের মধ্যে প্রথম যে তিনজন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন ভারতীয় অফিসার—যাঁরা মালয় অথবা সিঙ্গাপুরে যুদ্ধবাদী হয়ে এবং 'আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ'-এ যুক্ত হয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—সেই কর্নেল প্রেমকুমার সাইগল (১৯১৭-১৯৯২), মেজর-জেনারেল শাহ-নওয়াজ খান (১৯১৪-১৯৮৩) এবং কর্নেল গুরবক্স সিং ধীলন (১৯১৪-২০০৬) ছিলেন যথাক্রমে হিন্দু-মুসলিম ও শিখ সম্প্রদায় ভুক্ত। **ব্রিটিশ আমলাদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য উপরোক্ত তিন ধর্মভুক্ত ভারতের সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ প্রতিবাদ করার সুযোগ পেয়েছিল।**

২৩.২.২ আসাম বিধানসভায় কংগ্রেসের সাফল্য

সমকালীন ভারতবর্ষের এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৪৬ সালে আসামসহ অন্যান্য প্রাদেশিক নির্বাচনের সামগ্রিক পরিমণ্ডল বিবেচনা করতে হবে। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরেই কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন পর্ব শেষ হয়েছিল। অ-মুসলিম আসনগুলিতে কংগ্রেস বিপুল সাফল্য পায় এবং ৫৭টি আসনে জয়ী হয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনই মুসলিম লিগের দখলে যায়। একই ধারা প্রাদেশিক নির্বাচনেও প্রতিফলিত হয়। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সকল রাজ্যেই কংগ্রেস জয়ী হয় এবং মন্ত্রীসভা গঠন করে। অন্যদিকে **মুসলিম লিগ বঙ্গদেশ ও সিন্ধুতে মন্ত্রীসভা গঠন করে**। পাঞ্জাবে খিজির হায়াৎ খান-এর নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ—উভয় দলই নিজেদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলে ঘোষণা করে। ১৯৪৬-এর জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত আসাম বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের কেন্দ্রীয় স্তরের বড়ো বড়ো নেতারা আসাম সফরে আসেন ; কারণ সকলের কাছেই আসামের গুরুত্ব ছিল বিরাট। ১৯৪৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর জওহরলাল নেহরু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তাঁর নির্বাচনী প্রচার শেষ করেন। এর আগে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে আসাম অয়েল কোম্পানি'র শ্রমিক ধর্মঘটের সময়ও তিনি এসেছিলেন এবং আসামের সমস্যা অবগত ছিলেন। সতীশচন্দ্র কাকতি 'Nehru and Assam' প্রবন্ধে ১৯৪৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয়ের কারণ হিসাবে নেহরুর আসাম সফরের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কাকতির ভাষায় "This Victory...the credit goes to Nehru's tour." ১০৮ সদস্য-বিশিষ্ট আসাম বিধানসভায় কংগ্রেস দল ৫৮টি আসন দখল করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সালে গোপীনাথ বরদোলই-এর নেতৃত্বে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয় (সারণি '১৬' দ্রষ্টব্য)। যদিও ১৯৩৭ এবং ১৯৪৬-এর প্রাদেশিক বিধানসভার জন্য নির্বাচন ১৯৩৫-এর আইন অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে হয়েছিল, সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নয়, তথাপি সারণি ঃ '২১' থেকে ১৯৪৬-এর নির্বাচনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। ১৯৪৬-এর আসাম বিধানসভা নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল, ১৪,৬৫,৬৮৬ জন এবং ভোটদানে অংশ নিয়েছিলেন ৭,৪৩,২৭৫ জন; অর্থাৎ ৫০ শতাংশের কিছু বেশি।

সারণি ২১

আসাম প্রাদেশিক বিধানসভার নির্বাচন, ১৯৪৬ (শতাংশ ভোট বন্ধনীতে)

নির্বাচকমণ্ডলী	মোট প্রদত্ত ভোট	কংগ্রেসের প্রাপ্ত	হিন্দু মহাসভা ভোট ও শতাংশ	মুসলিম লিগ	জাতীয়তাবাদী	কমিউনিস্ট মুসলিম	অন্যান্য
১. সাধারণ	৪,১৬,৮৪৮	৩,২৬,৩০৪ (৭৮.৩%)	৫,৩৩৭ (১,৩%)	—	—	১৭,৮৫১ (৪,৩,)	৬৭,৩৫৬ (১৬.১)
২. মুসলিম	২,৭২,৮৭১	৮৪৪ (০.৩)	—	১,৮৮,০৭১ (৬৮.৯)	৪৬,১৫৯ (১৬.৯)	—	৩৭,৭৯৭ (১৩.৯)
৩. মহিলা	২,৮৭২	১,৪৫৪ (৫০.৬)	—	—	—	—	১,৪১৮ (৪৯.৪)
৪. ইউরোপিয়ান	১,০৫৮	—	—	—	—	—	১,০৫৮ (১০০)
৫. ভারতীয় খ্রিস্টান	৫,৭৭২	৯৫০ (১৬.৫)	—	—	—	—	৪,৮২২ (৮৩.৫)
৬. পশ্চাৎপদ উপজাতি (সমতল)	১১,৪৪০	৫,৬৩১ (৪৯.২)	—	—	—	—	৫,৮০৯ (৫০.৮)

নির্বাচকমণ্ডলী	মোট প্রদত্ত ভোট	কংগ্রেসের প্রাপ্ত	হিন্দু মহাসভা ভোট ও শতাংশ	মুসলিম লিগ	জাতীয়তাবাদী	কমিউনিস্ট মুসলিম	অন্যান্য
৭. পশ্চাদ্‌বর্তী এলাকা (পার্বত্য)	১৬,৪১৯	৭,৩৮৯ (৪৫.০)	—	—	—	—	৯,০৩০ (৫৫.০)
৮. প্ল্যান্টিং (বাগিচা)	৬৯৯	৪৯৯ (৭১.৪)	—	—	—	—	২০০ (২৮.৬)
৯. শিল্প ও বাণিজ্য	৫৪১	৫৩৬ (৯৯.১)	—	—	—	—	৫ (০.৯)
১০. শ্রমিক (চা বাগান)	১৪,৭৫৫	১৩,১৯০ (৮৯.৪)	—	—	—	৫৫৮(৩.৮)	১,০০৭ (৬.৮)
মোট	৭,৪৩,২৭৫	৩,৫৬,৭৯৭ (৪৮.০)	৫,৩৩৭ (০.৭২)	১,৮৮,০৭১ (২৫.৩০)	৪৬,১৫৯ (৬.২১)	১৮,৪০৯ (২.৫)	১,২৮,৫০২ (১৭.৩)

সূত্র ঃ *Planter Raj to Swaraj*, p. 296 (Appendix : 14A)

সারণি '২১' থেকে ১৯৪৬ সালে আসামের রাজনৈতিক চালচিত্র সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। মূলত কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ-এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ ছিল। অ-মুসলিম সাধারণ ভোটের সিংহভাগ কংগ্রেসের দিকেই ছিল এবং একটি ভোটও মুসলিম দলের দিকে যায়নি। (যদিও কংগ্রেস দলের বেশ কিছু মুসলিম প্রার্থী ছিলেন)। 'হিন্দু মহাসভার কোনো গণভিত্তি আসামে ছিল না এবং কেবলমাত্র সাধারণ আসন থেকে এক শতাংশের কম ভোট ঐ দলের দিকে গিয়েছিল। মুসলিম ভোটারদের অধিকাংশই হয় লিগ অথবা জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের সমর্থন জানিয়েছিলেন ; যদিও কংগ্রেসের বাক্সেও ৮৪৪টি এসেছিল। আইনগত স্বীকৃতি পাওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম ১৯৪৬-এর নির্বাচনে অংশ নিয়ে সাধারণ ভোটারদের ৪ শতাংশের কিছু বেশি এবং চা-শ্রমিকদের প্রায় ৪ শতাংশ ভোট সংগ্রহ করতে পেরেছিল। বাকি অংশের ভোটাররা হয় কংগ্রেস অথবা 'অন্যান্য'দের ভোট দিয়েছিলেন। এই 'অন্যান্য'দের মধ্যে কিছু ব্যক্তি এবং ছোটোখাটো দল অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতীত ঐতিহ্য অনুযায়ী, আসামে সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ বা বৈষম্য তীব্র ছিল না ; কিন্তু ১৯৩৭ সালে শাদুল্লাহ মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার সময় থেকে নানা কারণে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ধীরে ধীরে সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করে।

২৩.২.৩ আসাম বিধানসভার সূত্রপাত

২ আগস্ট ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন অনুমোদন করে এবং সেইমতো ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ১৯৩৭ সালে বিধান পরিষদ (Legislative Council) এবং বিধানসভা (Legislative Assembly) গঠিত হয়। আসামেও এই দু-কক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়েছিল। 'বিধান পরিষদ' ছিল উচ্চকক্ষ (কমপক্ষে ২১ জন মনোনীত সদস্য সহ) এবং 'বিধানসভা' ছিল নিম্নকক্ষ (১০৮ জন নির্বাচিত সদস্য সহ)। ৭ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে আসামের তৎকালীন রাজধানী শিলং-এ আসাম বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে। ১ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে আসামে শাদুল্লাহ মন্ত্রীসভা গঠিত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্য ৫ বছরের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও অক্ষত থাকে। সেদিন থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ পর্যন্ত শাদুল্লাহ ছিলেন আসামের প্রধানমন্ত্রী ; যদিও মাঝে দু'বার স্বল্প সময়ের জন্য এর ছেদ ঘটেছিল; প্রথমবার (২৫ ডিসেম্বর ১৯৪১-২৫ আগস্ট ১৯৪২) গভর্নরের শাসনের সময় এবং দ্বিতীয়বার (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-১৭ নভেম্বর ১৯৩৯) গোপীনাথ

বরদোলই-এর নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার সময় (সারণি '৩' '১৬' দ্রষ্টব্য)। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে (২২.৬) '১৯৩৫-এর নয়া সংবিধান ও আসাম' শীর্ষক আলোচনায় এই প্রসঙ্গের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। একই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে বিধানসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনো দলের না-থাকা সত্ত্বেও কীভাবে ১৯৩৭ থেকে দীর্ঘদিন প্রধানত শাদুল্লাহ'র নেতৃত্বে একটার পর একটা সরকার গঠিত হয়েছিল এবং জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে কিছু দিনের জন্য গোপীনাথ বরদোলই মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও (২২.৬.৫. দ্রষ্টব্য) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী, বরদোলইসহ সকল কংগ্রেস সদস্য একযোগে বিধানসভার সদস্য-পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর ফলে, ব্রিটিশ অনুগত শাদুল্লাহ'কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দীর্ঘ ৬ বছর বিধানসভার অভ্যন্তরে তেমন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়নি। ১৯৩৭ সালের ৭ এপ্রিল বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে স্পিকার বা অধ্যক্ষ নির্বাচন পর্বে নাটকের সূত্রপাত হয়। সরকারের নেতৃত্ব শাদুল্লাহকে দেওয়া হলেও তাঁর মনোনীত প্রার্থী কেরামত আলি অধ্যক্ষ পদে পরাজিত হন এবং কংগ্রেসের বসন্ত কুমার দাস ৫৬-৫১ ভোটে ঐ পদে জয়ী হল। **বিধানসভায় পরাজয়ের মাধ্যমেই শাদুল্লাহ সরকার এইভাবে যাত্রা শুরু করেছিল**। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আসাম বিধানসভার প্রথম অধ্যক্ষ সুরমা উপত্যকার প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা তথা আইনজীবী বসন্ত কুমার দাস (১৮৮৩-১৯৬৫) বিধানসভায় অনেক জটিল অবস্থায় দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে বরদোলই মন্ত্রীসভার সদস্য হয়েছিলেন।

দেশ ভাগের সময় সিলেটকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করার ফলে আসাম বিধানসভার সদস্য-সংখ্যা স্বাধীনোত্তর পর্বে হ্রাস পেয়ে ৭১ হলেও কিছুদিনের মধ্যেই আবার ১০৮ সদস্য বিশিষ্ট বিধানসভা হয়েছিল এবং বিধান পরিষদ (উচ্চকক্ষ) অবলুপ্ত হয়েছিল। **এরপর আসামের আয়তন ক্রমশ ছোটো হতে শুরু করে এবং ১৯৬৩ সালে নাগাল্যান্ড, ১৯৭২ সালে মেঘালয় এবং ১৯৮৭ সালে যথাক্রমে মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশের সৃষ্টি হয়। মেঘালয় রাজ্য সৃষ্টি হওয়ার পর আসামের রাজধানী শিলং থেকে গুয়াহাটির দিসপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানেই ১৯৭৩ সালের ১৬ মার্চ বিধানসভার অধিবেশন বসে**। আসাম বারবার খণ্ডিত হলেও জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে বিধানসভার আসন সংখ্যারও হেরফের ঘটে। স্বাধীনোত্তর পর্বে প্রথম বিধানসভায় (১৯৫২-৫৭) সদস্য-সংখ্যা ছিল ১০৮, দ্বিতীয় বিধানসভায়

(১৯৫৭-৬২) এটি কমে হয় ১০৫, তৃতীয় বিধানসভায় (১৯৬৭-৭২) ১১৪ এবং এরপর এটি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১২৬-এ দাঁড়িয়েছে।

২৩.৩ নৌবিদ্রোহের (১৯৪৬) বার্তা

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ গোপীনাথ বরদোলই-এর নেতৃত্বে আসামে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই মুম্বাইসহ ভারতের অন্যত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ চরমতম আঘাত নৌবিদ্রোহের ঘটনা (১৮-২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬) ঘটে। মুম্বাই বন্দরের ৪৪টি রণতরী এবং নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মী মিলে প্রথমে ২০,০০০ নাবিক ও কর্মী এই বিদ্রোহ শুরু করলেন এবং 'তলোয়ার' জাহাজ থেকে ব্রিটিশ রাজকীয় পতাকা 'ইউনিয়ন জ্যাক্' নামিয়ে দিয়ে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা উড়িয়ে দেন। একই সাথে 'রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি' (RIN)-এর নাম পরিবর্তন করে। ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল নেভি (INN) রাখা হয়। ক্রমে এই বিদ্রোহ করাচি সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭৮টি যুদ্ধ জাহাজে এবং ২০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিদ্রোহীরা পোতাশ্রয়ের সব জাহাজের ইউনিয়ন জ্যাক্' নামিয়ে দেন। নৌসেনা ও নাবিকদের সমর্থনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের ডাকে সাধারণ ধর্মঘটে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন এবং সামরিক আইন উপেক্ষা করে মুম্বাইয়ের রাস্তায় সামরিক ও অসামরিক বাহিনী হাতে হাত মিলিয়ে ব্যারিকেড় গড়ে তোলেন। নৌবাহিনীর সমর্থনে মুম্বাই ও পুনায় বিমান বাহিনীর পাইলটরাও পথে নেমে আসেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে এইরকম অভূতপূর্ব দৃশ্য বিরল। ২১ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সেনাবাহিনী মুম্বাইয়ে নৌসেনাদের উপর নির্মমভাবে গোলাবর্ষণ শুরু করলে চারিদিক রক্ত-বন্যায় ভেসে যায়। 'Naval Central Strike Committee'-র শেষ বার্তা ছিল এই রকম ঃ

> *Our strike has been a historic event in the life of our nation. For the first time the blood of men in the Services and in the streets flowed together in a common cause....Long live our great people!*

যদিও ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ নৌসেনারা নানা কারণে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তথাপি এই ঘটনাটিতে ব্রিটিশ শক্তির হৃৎকম্প শুরু হয়েছিল। এরই জন্য মন্তব্য করা হয়, "The RIN revolt of 1946 rang the death-knell of the mighty British Empire and paved the way for freedom."

নৌবিদ্রোহের এই বার্তা ভারতবর্ষের অন্য অংশের মতো আসামেও আছড়ে পড়েছিল এবং মানুষকে সাহসী করতে সাহায্য করেছিল। একটা প্রবাদ আছে 'The British conquered India by sword and they will hold it by the sword" অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান ভিত্তি ছিল সামরিক শক্তি, **কিন্তু INA Trial-এর অভিজ্ঞতা, কিংবা RIN ঘটনা প্রমাণ করে দিল, ভারতে ব্রিটিশ তলোয়ারে মরচে পড়েছে এবং সামরিক সমর্থন বা শক্তিও নির্ভরশীল নয়।** এক সময় ব্রিটিশ শাসকদের ধারণা ছিল, ভারতীয়রা স্বাধীনতা অর্জনের বা দেশ-শাসনের উপযুক্ত নয়। লর্ড রিপনের রাজত্বে (১৮৮০-৮৪) ভারতীয়দের প্রথম স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এরপর মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারের (১৯১৯) এবং ১৯৩৫-এর বিধির মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকার পরিচালনার কিছু দায়িত্ব ভারতীয়দের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৬ সালের একটার পর একটা ঘটনায় উদ্‌বিগ্ন ব্রিটিশ শাসকরা এবার কিছুটা লজ্জিত হয়েই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থা পাকা করতে মরিয়া হয়ে উঠলেন। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার-এর ভাষায় ঃ "...radical mass actions forcing an unqualified imperial retreat." **এইরকম 'radical mass actions' ১৯৪৬ সালে 'ক্যাবিনেট-মিশন' প্রস্তাবিত 'গ্রুপিং'-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আসামে হয়েছিল এবং আসামের এই ব্যাপক প্রতিরোধের জন্যই 'ক্যাবিনেট-মিশন'-এর সমস্ত প্রকল্পই অবশেষে বানচাল হয়ে গিয়েছিল এবং 'imperial retreat' অনিবার্য হয়েছিল।**

২৩.৪ 'ক্যাবিনেট্ মিশন' (১৯৪৬) এবং 'গ্রুপিং' বিতর্ক ('Cabinet Mission' and the 'grouping' controversy)

২৩.৪.১ প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-৪৫) মিত্রশক্তি জয়ী হলেও ইংল্যান্ড বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। একই সাথে ব্রিটেনে রক্ষণশীল দলের পরাজয় এবং ক্লিমেন্ট এট্‌লি'র (১৮৮৩-১৯৬৭) নেতৃত্বে শ্রমিকদলের ক্ষমতালাভে ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক পটভূমিও পরিবর্তিত হয়, যা ভারতীয়দের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করে। 'আজাদ-হিন্দ্' সেনানায়কদের বিচারের প্রতিবাদে যেভাবে দল-মত নির্বিশেষে সমগ্র ভারতে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল এবং যেভাবে নৌ-বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছিল তাতে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণি ভারতীয় সেনাবাহিনী, পুলিশ বা

আমলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসনকে অব্যাহত রাখতে আস্থাশীল ছিলেন না। এরই জন্য ভারতবর্ষে যতদূর সম্ভব ব্রিটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। লখনউ-এর রক্ষণশীল পত্রিকা *Pioneer* পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকদের সতর্ক করে দিয়েছিল ঃ "If freedom for India is withheld for long, a revolution is inevitable." এরই জন্য ক্ষমতা-হস্তান্তরের উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমতি নিয়ে তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দলকে এট্‌লি ভারতবর্ষে প্রেরণ করেছিলেন, যেটি 'ক্যাবিনেট-মিশন' নামে পরিচিত। এই 'মিশন' ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করার আগে ১৯৪৬ সালের ১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি ঘোষণা করেছিলেন।

> *My colleagues are going to India with the intention of using their utmost endeavours to help her to attain her freedom as speedily and fully as possible. What form of government is to replace the present regime is for India to decide, but our desire is to help her to set up forthwith the machinery for making that decision.*
> *I hope that India and her people may elect to remain within the British Commonwealth. I am certain that they will find great advantages in doing so.*

২৪ মার্চ ১৯৪৬-এ 'ক্যাবিনেট্-মিশন' দিল্লিতে অবতরণ করার পর চারিদিকে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা যায়। এই ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলে ছিলেন ঃ (১) ভারত-সচিব লর্ড ফ্রেডারিক উইলিয়াম পেথিক লরেন্স (১৮৭১-১৯৬১)—যিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে সংবেদনশীল হলেও কিছুটা ভাবপ্রবণ ছিলেন এবং বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে তাঁর তেমন স্পষ্ট ধারণা ছিল না ; (২) স্যার রিচার্ড স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ (১৮৮৯-১৯৫২)—যিনি কংগ্রেসের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং এব আগে দু-বার ভারতবর্ষে এসেছিলেন—১৯৩৯ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং ১৯৪২ সালে 'ক্রিপস্ দৌত্য' উপলক্ষ্যে, যদিও সেটি ব্যর্থ হয়েছিল; (৩) আলবার্ট ভিক্টর আলেকজান্ডার (১৮৮৫-১৯৬৫)—যিনি মনে-প্রাণে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী তেমন ছিলেন না। উপরোক্ত তিনজন ছাড়া 'মিশন'-এর কাজকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভাইসরয় (১৯৪৩-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭) আর্কিবল্ড পার্সিভ্যাল ওয়াভেল (১৮৮৩-১৯৫০)—যিনি ছিলেন পুরোপুরি কংগ্রেস-বিরোধী। এক কথায়, 'ক্যাবিনেট্ মিশন' সদস্যদের মধ্যে নানারকম মতবিরোধ ছিল। লরেন্স ও ক্রিপস্

কংগ্রেসের সাথে চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা-হস্তান্তর পর্বের যবনিকা টানার পক্ষপাতী ছিলেন; অন্যদিকে ওয়াভেল ও আলেকজান্ডার 'মুসলিম লিগ'-এর বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হতে চাইতেন। এই 'মিশন'-এর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অখণ্ডতা বজায় রেখে এবং পাকিস্তানে গঠনের অযৌক্তিকতা বুঝিয়ে যতদূর সম্ভব 'মুসলিম লিগ'-এর দাবি-দাওয়া মিটিয়ে দেওয়া। পাকিস্তান গঠনের দাবি অস্বীকার করে 'ক্যাবিনেট্ মিশন' কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলেও 'গ্রুপিং' প্রশ্ন নিয়ে আসামের তীব্র বিরোধিতার জন্য উভয় সম্প্রদায়কে (হিন্দু ও মুসলিম) প্রসন্ন করার যে মধ্যপন্থা 'মিশন' গ্রহণ করেছিল সেটি অবশেষে ব্যর্থ হয়। কংগ্রেস ও 'মুসলিম লিগ' সহ মোট ৪৭২ জন রাজনৈতিক নেতার সাথে ১৮২টি আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করে যে বিশাল দলিল 'ক্যাবিনেট্ মিশন' তৈরি করেছিল সেটি অবশেষে অর্থহীন হয়ে যায়। ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখার যে ইচ্ছার কথা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি ব্যক্ত করেছিলেন সেটি ব্যর্থ হওয়ায় তিনি প্রধানত ভাইসরয় ওয়াভেল-এর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। ১৯৪৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ওয়াভেল-এর স্থলে লুই মাউন্টব্যাটেন (১৯০০-১৯৭৯) ব্রিটিশ-ভারতের শেষ ভাইসরয় হিসাবে নিযুক্ত হন। মাউন্টব্যাটেন-প্রকল্প অনুযায়ী, দেশ-ভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। মাউন্টব্যাটেন শুধু যে ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় ছিলেন তাই নয়, ২১ জুন ১৯৪৮ পর্যন্ত তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল।

২৩.৪.২ 'ক্যাবিনেট্ মিশন'-এর প্রস্তাব

১৯৪৬ সালে শুধু যে 'ক্যাবিনেট্ মিশন' সদস্যদের মধ্যে নানা প্রশ্নে মতানৈক্য ছিল তাই নয়, জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যেও বিশেষত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যে 'মুসলিম লিগ'-এর দাবি, কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতা ও 'গ্রুপিং' প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে মতভেদ প্রকাশ্যে আসার ফলে আসামের কংগ্রেস নেতৃত্বে তীব্র সংকট ও বিভ্রান্তি এবং আসামের রাজনীতিতে এক জটিল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। অরুণচন্দ্র ভুঁইয়া এবং অন্যান্যদের সম্পাদিত *Political History of Assam* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে 'ক্যাবিনেট্-মিশন'-এর প্রস্তাবের ফলে আসামের ভাগ্য কীভাবে নির্ধারিত হতে যাচ্ছিল তার ধারাবাহিক বিবরণ বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিস্তৃত বিবরণের বর্ণনা না করে শুধুমাত্র ১৬ মে ১৯৪৬-এ 'ক্যাবিনেট মিশন'- এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নীচে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হল ঃ

(১) ব্রিটিশ ভারত ও রাজন্য-শাসিত দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে অখণ্ড ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে Executive বা কার্যনির্বাহক সভা এবং Legislature বা আইনসভা থাকবে। কেন্দ্রের অধীনে থাকবে বৈদেশিক দফতর, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ। বাকি সমস্ত ক্ষমতা প্রদেশগুলির এক্তিয়ারে থাকবে।

(২) **ভারতের প্রদেশগুলিকে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হবে—A, B এবং C তে।** কোনো প্রদেশ ইচ্ছা করলে সংবিধান চালু হওয়ার ১০ বছর পরে অথবা প্রতি ১০ বছর অন্তর এক শ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য শ্রেণিভুক্ত হতে পারবে এবং প্রয়োজনে সংবিধান পরিবর্তন করতে পারবে। এরজন্য আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত প্রয়োজন হবে।

(৩) সমগ্র দেশের জন্য সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে **একটি সংবিধানসভা গঠিত হবে। যেহেতু 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নীতি চালু ছিল এজন্য ভারতীয়দের ধর্মের ভিত্তিতে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিল ঃ** (১) **সাধারণ** (অ-মুসলিম এবং অ-শিখ), (২) **মুসলিম** এবং (৩) **শিখ**। প্রাদেশিক আইনসভাগুলি উপরোক্ত ভিত্তিতে তাদের প্রতিনিধি সংবিধানসভায় পাঠাবে এবং রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী, প্রতিনিধিদের সংখ্যা নির্দিষ্ট হবে—অর্থাৎ প্রতি ১০ লক্ষের জন্য ১ জন প্রতিনিধি (১০ লক্ষ ঃ ১) থাকবে। বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত রাজ্যগুলিও নিজেদের সংবিধান তৈরি করতে পারবে।

২৩.৪.৩ আসামের অসন্তোষের কারণ

কংগ্রেস ও 'মুসলিম লিগ'-এর মধ্যে নানা প্রশ্নে বিভিন্নতা থাকলেও ১৬ মে'র উপরোক্ত প্রস্তাব প্রধান দুটি দল গ্রহণ করার ব্যাপারে একমত হওয়ার পরেই শুরু হল আসামকে কেন্দ্র করে জটিলতার অধ্যায়। আসলে, ১৬ মে ১৯৪৬ পেথিক লরেন্স বেতারে প্রস্তাবগুলি ঘোষণা করার সময়েই আসামে শুরু হয়েছিল মৃদু গুঞ্জরণ। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তায়েবুল্লাসহ সকলে একমত হয়ে 'এ. আই. সি. সি'র সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে তারবার্তার মাধ্যমে নিজেদের অসন্তোষ জানিয়েছিলেন "intimating the universal feeling of deep resentment of the people of Assam and their opposition to, and rejection of the grouping clauses in the State Paper." আসামের প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বরদোলই সেই সময় দিল্লিতেই ছিলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল অবিলম্বে মৌলানা আজাদ-এর সাথে দেখা করে আসামের উদ্বেগের কথা জানাতে। আসলে, **আসামের কাছে 'ক্যবিনেট্ মিশন'-এর সবচেয়ে**

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল শ্রেণি হিসাবে সমগ্র দেশকে তিনটি অংশে চিহ্নিত করে আসামকে অবিভক্ত বঙ্গের সাথে 'C' গ্রুপে স্থান-দেওয়ার প্রশ্নটি। 'A' শ্রেণিভুক্ত প্রদেশগুলির মধ্যে মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ (সেন্ট্রাল প্রভিন্স্) স্থান পেয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায়/ কেন্দ্রীয় সংবিধানসভায় এই গ্রুপ্ (সাধারণ ১৬৭ + মুসলিম ২০) মোট ১৮৭ জন প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকারী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। 'B' শ্রেণিভুক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল (সাধারণ ৯ + মুসলিম ২২ + শিখ ৪) মোট ৩৫ জন। 'C' শ্রেণিভুক্ত রাজ্যের মধ্যে ছিল বঙ্গদেশ ও আসাম এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংবিধানসভার (সাধারণ ৩৪ + মুসলিম ৩৬) মোট ৭০ জন প্রতিনিধি। এইভাবে সমগ্র ব্রিটিশ ভারত থেকে (১৮৭ + ৩৫ + ৭০) মোট ২৯২ জন, এবং রাজন্য শাসিত দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে ৯৩ জন, অর্থাৎ সর্বমোট ৩৮৫ জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠনের কথা 'ক্যাবিনেট্ মিশন' ঘোষণা করেছিল। আমরা এখানে 'C' গ্রুপের প্রশ্নটি নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

২৩.৪.৪ আসামকে পাকিস্তান-ভুক্ত করার ষড়যন্ত্র

কী উদ্দেশ্যে অবিভক্ত বঙ্গের সাথে আসামকে রেখে 'C' শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছিল? আসলে, দেশভাগের প্রস্তাবকে 'ক্যাবিনেট্ মিশন' আমল না দিলেও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতেই গ্রুপগুলি করা হয়েছিল। Ayesha Jalal (*The Sole Spokesman : Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan* গ্রন্থে) মন্তব্য করেছেন, জিন্না 'ক্যাবিনেট্ মিশন'কে প্রথমে সমর্থন করেছিলেন কারণ তাঁর স্বপ্ন-পূরণের ইঙ্গিত তিনি 'মিশন'-এর প্রস্তাবে খুঁজে পেয়েছিলেন (...offered him the substance of what he was really after.") বিশিষ্ট আইনজীবী হিসাবে জিন্না 'ক্যাবিনেট্ মিশন'-এর বিভিন্ন ধারা ও সুপারিশের মধ্যে ত্রুটি ও পরস্পর-বিরোধিতাও লক্ষ করেছিলেন এবং সময় ও সুযোগমতো সেগুলি নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে পারতেন। যেমন, 15 (5) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছিল "Provinces should be free to form groups", কিন্তু 19 (V) ধারায় ঠিক উল্টো কথা বলা হয়েছিল, যেখানে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত প্রদেশগুলির পক্ষে গ্রুপে থাকা ছিল বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ প্রথমটিতে 'ঐচ্ছিক' কিন্তু দ্বিতীয়টিতে 'বাধ্যতামূলক'। ইতিহাসবিদ S. R. Mehrotra (*Towards India's Freedom and Partition,* p. 231 গ্রন্থে) এই পরস্পর-বিরোধিতার দিকটির প্রতি অঙ্গুলি

নির্দেশ করেছেন। অবশ্য ভারত সচিব পেথিক লরেন্স ১৭ মে ১৯৪৬ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, প্রদেশগুলি নির্ধারিত 'গ্রুপ' থেকে, কেবলমাত্র সংবিধান চালু হওয়ার পর (দশ বছর বাদে), অন্য 'গ্রুপে' অন্তর্ভুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে, তার আগে নয়। পেথিক লরেন্সের ভাষায় ঃ *The Provinces automatically came into the sections 'A', 'B' and 'C'...The right to opt out of the group formed by that section arises after the constitution has been framed and the first election to the Legislature has taken place. It does not arise before that.* **'ক্যাবিনেট্ মিশন'-এর সুপারিশে এই 'গ্রুপিং'-এর শর্তটি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ভাইসরয় ওয়াভেল সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী ছিলেন** ; যদিও শেষপর্যন্ত এটি ভেস্তে যায়। যেহেতু মিশন-এর প্রস্তাব অনুযায়ী, গ্রুপগুলি'কে প্রয়োজনে দশ বছর পরে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং **যেহেতু 'B' এবং 'C' গ্রুপে মুসলিম-প্রাধান্য বজায় ছিল, এরই জন্য মন্তব্য করা হয় "the foundation and basis of Pakistan are there in their own scheme". আসামের ভয় ছিল এখানেই যদিও আসাম মোটেই মুসলিম-প্রধান রাজ্য ছিল না ; কিন্তু বঙ্গদেশের সাথে 'C' গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার** বিপরীত চিত্র তৈরি হয়েছিল। 'ক্যাবিনেট্-মিশন'-এর বক্তব্য ও তথ্য অনুযায়ী, 'C' গ্রুপের চিত্র ছিল এইরকম ঃ

সারণি ২২ ; 'C' গ্রুপের জনসংখ্যা ও প্রতিনিধি

'C' গ্রুপ	মুসলিম	অমুসলিম (সাধারণ)
(১) বঙ্গদেশ ঃ	৩,৩০,০৫,৪৩৪	২,৭৩,০১,০৯১
(২) আসাম ঃ	৩৪,৪২,৪৭৯	৬৭,৬২,২৫৪
মোট ঃ	৩,৬৪,৪৭,৯১৩	৩,৪০,৬৩,৩৪৫
মোট জনসংখ্যার শতাংশ ঃ	৫১.৬৯%	৪৮.৩১%

কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধির সংখ্যা

	সাধারণ	মুসলিম	মোট
(১) বঙ্গদেশ ঃ	২৭	৩৩	৬০
(২) আসাম ঃ	৭	৩	১০
মোট ঃ	৩৪	৩৬	৭০

আবুল কালাম আজাদ তাঁর আত্মজীবনীতে (*India Wins Freedom...*, pp. 201-02) আসামের এই ভয়কে অযৌক্তিক হিসাবে বর্ণনা করেছেন ("...that

the fears of the Assam leaders were unjustified") এবং জওহরলাল নেহরুও প্রথম দিকে একই ধারণার বশবর্তী ছিলেন। যেহেতু 'গ্রুপিং'-এর শর্তটি না মানলে, ভাইসরয় ওয়াভেল-এর ভাষ্য অনুযায়ী, ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটি আটকে যেতে পারে (কারণ 'গ্রুপিং' ছিল জিন্নার ভাষায় "an essential feature of the scheme"), এরই জন্য জাতীয় কংগ্রেস বা মুসলিম লিগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এটিকে কেন্দ্র করে প্রথমদিকে তেমন আপত্তি প্রকাশ করেননি। জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতার কাছে গোপীনাথ বরদোলই এবং আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গ আসামের প্রশ্নটি গুরুত্ব দিয়ে ভাবার জন্য অনুরোধ করার পরেও লক্ষ করলেন **বেশিরভাগ নেতাই দ্রুত ব্রিটিশের হাত থেকে ক্ষমতা গ্রহণের চিন্তাতেই ব্যস্ত। সতীশচন্দ্র কাকতি উল্লেখ করেছেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একমাত্র শরৎচন্দ্র বসু ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে তেমন সহানুভূতি আসামের প্রতিনিধিবর্গ পাননি**। এই অবস্থায় বরদোলই কিছুটা হতাশ হলেও হাল ছাড়েননি। শেষ ভরসা ছিলেন গান্ধিজি। গান্ধিজির নিত্য সাথী সুধীর ঘোষ তাঁর *Gandhi's Emissary* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, **বরদোলই-এর চোখে জল দেখে গান্ধিজি বিচলিত হন এবং সর্বশক্তি দিয়ে আসামকে 'C' গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করার পরামর্শ** দেন। গান্ধিজির আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে আসামের প্রধানমন্ত্রী বরদোলই সাহসী হয়ে (১) আসাম বিধানসভায় ('মুসলিম লিগ' সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও) 'C' গ্রুপে আসামের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণের এবং আসামের স্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন; (২) সমগ্র আসামে গণ-আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান জানান; (৩) 'ক্যাবিনেট্ মিশন'-এর শর্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সংবিধান সভায় আসামের ১০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের উদ্যোগ নেন। ১৬ জুলাই ১৯৪৬-এ আসাম বিধানসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই ১০ জন প্রতিনিধির মধ্যে 'মুসলিম লিগের' ৩ জন মুসলিম প্রতিনিধি (মহঃ শাদুল্লাহ্, আব্দুল হামিদ এবং আব্দুল মতিন চৌধুরি); অন্যদিকে সাধারণ আসন থেকে ছিলেন বাকি ৭ জন (গোপীনাথ বরদোলই, রোহিণীকুমার চৌধুরি, বসন্তকুমার দাস, জে. জে. এম. নিকলস্-রায়, অমিয়কুমার দাশ, ধরণীধর বসুমাতারি এবং অক্ষয় কুমার দাস)। অবশ্য **স্বাধীনতার পূর্ব-মুহূর্তে ৬-৭ জুলাই ১৯৪৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সিলেট অবশেষে পরিকল্পিত পূর্ব-পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার রায় প্রকাশের ফলে গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন ভারতের সংবিধানসভায় আসামের প্রতিনিধি সংখ্যা ১০ থেকে কমিয়ে ৮ করে দেন। এই ৮ জনের মধ্যে ২ জন মুসলিম ও 'লিগ'-**

এর সদস্য এবং বাকি ৬ জন সাধারণ আসনের, যাঁরা সকলেই ছিলেন কংগ্রেসের প্রতিনিধি।

আসাম বিধানসভার 'গ্রুপ'-বিরোধী সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও জাতীয় কংগ্রেস-নেতৃত্বের দোদুল্যমানতা লক্ষ করে ১৯৪৬ সালের মে মাস থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের উদ্যোগে সমগ্র আসাম জুড়ে শত শত ছোটো বড়ো সভা ও বিক্ষোভ কর্মসূচি গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়। আসামে ক্ষুদ্র শক্তি হলেও 'সি. পি. আই.', 'আর. সি. পি. আই.' প্রভৃতি বামপন্থী শক্তিও আসামের ন্যায়-সংগত দাবির প্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়। এমনকি আসামের তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নর Andrew Clow পর্যন্ত ভাইসরয় ওয়াভেল-এর অবগতির জন্য জানিয়েছিলেন যে, *Assam had "only one-third Muslim, and if the Surma Valley, which is geographically, ethnographically and linguistically part of East Bengal were cut off, it would be only one-fifth Muslim.* তথাপি ধর্মীয় আঙ্গিকেই মুসলিম-প্রধান অবিভক্ত বঙ্গের সাথে আসামকে একই 'গ্রুপে' রাখা হয়েছিল। ওয়াভেল যে এটি জানতেন না তা নয়, কারণ তিনি নিজেও পেথিক লরেন্সকে জানিয়েছিলেন, আসাম মুসলিম-প্রধান রাজ্য নয় এবং আগামী দিনে আসামকে পরিকল্পিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কি না সেই ব্যাপারে তিনি নিজেও সন্দিহান ছিলেন। এসব সত্ত্বেও 'মুসলিম লিগ'কে খুশি রাখার জন্য ব্রিটিশ কর্মকর্তারা আসামের প্রতিবাদকে তেমন আমল দিতে চাননি। আসাম বিধানসভায় বসন্তকুমার দাস, বৈদ্যনাথ মুখার্জি, জে. জে. এম. নিকলস্ রায় প্রভৃতি অ-অসমিয়া সদস্যরা বরদোলই-কে সর্বতোভাবে সমর্থন জানালেও, শাদুল্লাহ সহ 'মুসলিম লিগ' সদস্যরা এবং Whiteakkar-এর নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান লবি অবিভক্ত বঙ্গের সাথে আসামকে একই 'গ্রুপে' রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

Political History of Assam (vol. III) গ্রন্থে নানা দলিল-পত্র উল্লেখ করে 'ক্যাবিনেট্'-মিশন'-এর আসল উদ্দেশ্য উন্মোচন করা হয়েছে এবং এটিকে "a clever manoeuvre of the British to keep their commercial interests intact" হিসাব বর্ণনা করা হয়েছে। 'গ্রুপিং'-এর আবরণে আসামে ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। একটা সময়ে 'A', 'B' 'C', ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার না করে 'ক্যাবিনেট্ মিশন' স্পষ্ট করেই 'হিন্দুস্তান' ও 'পাকিস্তান' প্রদেশ হিসাবে 'গ্রুপ'গুলি বিভাজনে উদ্যোগী হয়েছিল; কিন্তু শেষপর্যন্ত Reforms Commissioner V. P. Menon এবং সংবিধানসভার

উপদেষ্টা B. N. Rau-এর পরামর্শ মেনে নিয়ে 'পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহারে ক্ষান্ত হয়। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যে আগামী দিনে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও প্রতিরক্ষার স্বার্থে আসামকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না ; এবং এরই জন্য ধর্মকে বাহানা করে ঐভাবে 'গ্রুপ'গুলি তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি একটি Note-এ ভারত সচিব পেথিক লরেন্স খুব খোলামেলা ভাবেই উদ্দেশ্যটি প্রকাশ করেছিলেন— *...Pethick-Lawrence, the secretary of State for India, circulated a note on the viability of Pakistan wherein Assam, due to the considerations of economic, defence and financial aspects, was included in East Pakistan.*

২৩.৪.৫ 'কুপল্যান্ড পরিকল্পনা' ও 'ক্রাউন কলোনি'র ছক্

শুধুমাত্র আসামের সম্পদকে ব্রিটিশ স্বার্থে ব্যবহার করাই নয়, সমগ্র পাহাড় অঞ্চলে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব যাতে কোনোভাবে স্পর্শ করতে না পারে এজন্য আগেই 'বহির্ভূত এলাকা', 'আংশিকভাবে বহির্ভূত এলাকা', 'ইনার-লাইন' ইত্যাদি চালু ছিল। স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃবৃন্দও অবিভক্ত আসামের পাহাড়-অঞ্চল সম্পর্কে তেমন উৎসাহ কোনোদিনও দেখাননি। 'ক্যাবিনেট্-মিশন'-এর আগে, সামরিক দিক থেকে ব্রিটিশ দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড় অঞ্চলকে ভারতের স্বাধীনতার পরেও নিজেদের দখলে চিরদিন রাখার জন্য আসামের গভর্নর (১৯৩৭-৪২) Sir Robert Reid প্রথম ১৯৪২ সালে 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সময় একটি **'Crown Colony'** গঠনের নীল্-নক্শা এঁকেছিলেন। তাঁর এই প্রাথমিক চিন্তাটি পল্লবিত করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক Reginald Coupland (১৮৮৪-১৯৫২) ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত *Report on the Constitutional Problem in India* গ্রন্থে এটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এটিই অবশেষে **'Coupland Plan'** হিসাবে পরিচিত হয়। কুপল্যান্ড-এর মতে, ভারতবর্ষকে শুধুমাত্র হিন্দু (সাধারণ), মুসলিম ও শিখ অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করাই যথেষ্ট নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ের খ্রিস্টান আদিবাসীদের কথাও চিন্তা করা দরকার এবং ঐ অঞ্চলটিকে (যেহেতু সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) ব্রিটিশ-কলোনি হিসাবে নতুনভাবে চিহ্নিত করা দরকার। ভাইসরয় ওয়াভেল 'কুপল্যান্ড প্রকল্পটি' অনুমোদনের জন্য লন্ডনেও ছুটে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

উইনস্টন চার্চিল এটি অনুমোদনের সপক্ষে ছিলেন, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষলগ্নে **ইম্ফল-কোহিমার যুদ্ধ প্রমাণ করেছিল সামরিক দিক থেকে স্থানটি কত গুরুত্বপূর্ণ**। কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ের স্থানীয় উপজাতিদের যথেষ্ট সমর্থনের অভাবে এবং পরবর্তী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এট্‌লির সম্মতির অভাবে 'কুপল্যান্ড প্রকল্প' শেষপর্যন্ত বানচাল হয়ে যায়। পাহাড়-অঞ্চলসহ অবিভক্ত আসামের উপর ব্রিটিশ স্বার্থ যে কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল, এই একটি ঘটনাই সেটি প্রমাণ করে দেয়। **নামে 'অখণ্ড ভারতের' কথা 'ক্যাবিনেট্‌-মিশন' বললেও সেটি যে দেশভাগের পূর্ব প্রস্তুতি এটি উপলব্ধি করতে আসামের মানুষের মোটেই অসুবিধে হয়নি। গোপীনাথ বরদোলই সহ আসামের নেতৃত্ব ভালোভাবেই জানতেন, একবার আসাম 'C' গ্রুপে অন্তর্ভুক্তিতে রাজি হলে, ভবিষ্যতে ঐ গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসা হত সুকঠিন।**

২৩.৪.৬ 'গ্রুপিং ব্যবস্থা'র বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন

আসামকে 'C' গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে ১৯৪৬ সালের মে মাস থেকে একাধারে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের কাছে বারবার 'ডেপুটেশন' এবং অন্যদিকে তুমুল গণ-আন্দোলন সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় গড়ে ওঠে। জগদীশচন্দ্র মেধির নেতৃত্বে পাঁচ-সদস্যের একটি কমিটি 'গ্রুপিং-বিরোধী' আন্দোলনকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে। ৫ জুন ১৯৪৬ সমগ্র আসামে 'গ্রুপিং-বিরোধী দিবস' পালিত হয়। 'এ. পি. সি. সি.' ছাত্র ও যুবকদের কাছে ব্যাপকভাবে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে আবেদন রাখে। 'আসম জাতীয় মহাসভা'র সাধারণ সম্পাদক অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি (১৭.৩. দ্রষ্টব্য) আমরণ অনশনের হুমকি দেন। বাংলার 'সি. পি. আই.' নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জি এবং 'আর. সি. পি. আই.' নেতা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর আসামে ছুটে আসেন এবং **'গ্রুপিং'-এর নামে ব্রিটিশ চক্রান্তের বিরুদ্ধে কামরূপ জেলায় বড়ো বড়ো সভা করেন। 'গ্রুপিং'-এর প্রশ্নে আসামের মুসলিমরা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল**। যদিও সুরমা উপত্যকার মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং 'মুসলিম লিগ' সমর্থকরা 'গ্রুপিং'কে স্বাগত জানিয়েছিলেন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মুসলিমরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তবে অধিকাংশেরই ধারণা হয়েছিল 'গ্রুপিং'-এর ফলে মুসলমানদের তেমন কোনো লাভ হবে না, বরং সাম্প্রদায়িক শক্তি আরও মরিয়া হবে। 'এ. পি. সি. সি.'র সভাপতি তায়েবুল্লা নিজেই ছিলেন 'গ্রুপিং-বিরোধী', যদিও আসামের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শাদুল্লাহ ছিলেন 'গ্রুপিং'-এর সমর্থক। শাদুল্লাহ ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছিলেন ঃ *Assam's destiny*

by reason of her geographical position is tied with Bengal; অথবা *If Bengal is to be vindictive, they can strangle our economic life in no time.* "All Assam Student's Union" (AASU)'র সভাপতি বিশ্বদেব শর্মা এবং সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ গোস্বামী ২৬ মে ১৯৪৬ একটি চিঠিতে 'এ. পি. সি. সি'র সভাপতি তায়েবুল্লা'কে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 'গ্রুপিং-বিরোধী' সমস্ত আন্দোলনের কর্মসূচিতে আসামের ছাত্র-সমাজের সর্বশক্তি দিয়ে শামিল হওয়ার অঙ্গীকার করেন। গুয়াহাটির 'কার্জন হলে' ২৩ মে একটি বিশাল সভার পর মঙ্গলদই, তেজপুর, গোলাঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। AASU নিজেই উদ্যোগী হয়ে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে গুয়াহাটি ছাড়াও শিবসাগর, গোলাঘাট, রাহা প্রভৃতি অঞ্চলে সভার আয়োজন করে। অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরির নেতৃত্বাধীন 'আসাম জাতীয় মহাসভা' নানা রকম বিবৃতি প্রকাশ করে প্রয়োজনে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। *অসমিয়া* পত্রিকাটি ধারাবাহিকভাবে 'গ্রুপিং-ব্যবস্থা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে এটি যে ব্রিটিশ আমলাদের আসামকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার ভয়ংকর ষড়যন্ত্র সেটি সকলকে ওয়াকিবহাল করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। ২৫ মে ১৯৪৬-এ *অসমিয়া* সম্পাদকীয়তে 'গ্রুপিং-ব্যবস্থা'কে কিছুদিন আগের 'কুপল্যান্ড পরিকল্পনা'-র সাথে তুলনা করে পাঠককে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। ৫ জুন ১৯৪৬ 'গ্রুপিং-বিরোধী দিবসে' আসামের সর্বত্র প্রকৃতপক্ষে হরতাল পালিত হয়েছিল এবং পথে বড়ো বড়ো মিছিল সংগঠিত করা হয়েছিল। রাজধানী শিলং-এ নিকলস্-রায় একটি বড়ো সভায় 'গ্রুপিং'-এর বিরুদ্ধে উদ্দীপক বক্তব্য রাখেন। এইভাবে রাজধানী শিলং সহ সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় গণ-আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে এবং জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে প্রতি মুহূর্তের ঘটনা ওয়াকিবহাল করা হয়।

২৩.৪.৬ আসামকে গান্ধির অকুণ্ঠ সমর্থন

জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সকল পরামর্শ গ্রহণ না করে 'এ. পি. সি. সি.'র পক্ষে আসামে কিছুটা স্বাধীন পদক্ষেপ গ্রহণ ও তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা ঐরকম বিপন্ন মুহূর্তে সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র গান্ধিজি প্রথম থেকে আসামকে সমর্থন করেছিলেন বলে। **১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে (৯-১৩) গান্ধিজি তৃতীয় ও শেষ বারের মতো আসামে এসেছিলেন** এবং সারনিয়া আশ্রমে একটি ছোটো-খাটো 'গান্ধি-ঘর' তাঁর অনুরাগীরা সেই সময় তৈরি করেছিলেন। **আসাম-**

প্রশ্নে গান্ধিজি যে কত দুর্বল অতীতে বারবার সেটি প্রমাণিত হয়েছিল। 'এ. পি. সি. সি.' সভাপতি তায়েবুল্লা তাঁর Note-এ উল্লেখ করেছেন, ১৯৪৬ সালের ৯ জুন তিনি, ফখরুদ্দিন আলি আমেদ, অমিয়কুমার দাশ, পুষ্পলতা দাশ, নীলমণি ফুকন, হরেশ্বর গোস্বামী হরেন্দ্রনাথ বরুয়া, কামাখ্যাপ্রসাদ ত্রিপাঠী এবং পরবর্তী সময়ে অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি প্রভৃতি আসামের প্রতিনিধিদল দিল্লিতে একে একে নেহরু, আজাদ ও প্যাটেল-এর সাথে পরামর্শের পর 'হরিজন কলোনি'তে যখন গান্ধিজির সাথে দেখা করতে যান, সেই সময়ের কথোপকথন। প্রতিনিধিদলের জনৈক সদস্য যখন গান্ধিজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কংগ্রেস দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি আসামের পাশে না দাঁড়ান তাহলে তাঁরা কি করবেন? গান্ধির স্পষ্ট উত্তর ছিল ঃ প্রয়োজনে কংগ্রেস দল থেকে বেরিয়ে এসে কংগ্রেসেরই বিরুদ্ধে 'সত্যাগ্রহ' করতে হবে। গান্ধির ভাষায় *...Even if Congress fails to support you eventually, come out of the Congress...Do Satyagraha against Congress.* এরপর তায়েবুল্লা উল্লেখ করেছেন ঃ *Being sure of Bapu as our tower of strength, with bold hearts we retired fully satisfied.*

২৩.৪.৭ 'গ্রুপিং' প্রশ্নে আসাম ও বাংলার কংগ্রেস-নেতৃত্বের মতপার্থক্য

'গ্রুপিং'-এর প্রশ্ন নিয়ে 'এ. পি. সি. সি.'র সাথে সিলেট জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের মতান্তর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। আসলে, বঙ্গীয় আইনসভায় কংগ্রেস দলের নেতা কিরণশংকর রায় (১৮৯১-১৯৪৯)-এর একটি দাবিকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। দেশ-বিভাগের আগে শরৎচন্দ্র বসু'র সাথে হাত মিলিয়ে কিরণশংকর রায় **ঐক্যবদ্ধ 'সার্বভৌম বাংলাদেশ'** স্থাপনের যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন, যদিও সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ক্যাবিনেট্ মিশনের কাছে কিরণশংকর রায়-এর দাবি ছিল, সিলেটসহ বাঙালি অধ্যুষিত কাছাড় ও গোয়ালপাড়া-কে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলার সাথে যুক্ত করা। প্রসঙ্গত, গোয়ালপাড়া জেলায় সেই সময় মাত্র ১৯ শতাংশ মানুষ অসমিয়া ভাষায় কথা বলতেন। সিলেটের কংগ্রেস নেতা অবলাকান্ত গুপ্তচৌধুরি 'গ্রুপিং ব্যবস্থা'র বিরোধিতার জন্য 'এ. পি. সি. সি.'—বিশেষত গোপীনাথ বরদোলই-এর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ৩১ মে ১৯৪৬ গুপ্তচৌধুরি এক বিবৃতিতে দাবি করেন ঃ "If Surma Valley or as Mr. Bardoloi insists Sylhet alone is to be transferred to Bengal under the new constitution, justice and fairness demand that their representatives should participate in the constitusion-making of Bengal. The proposed grouping offers this

opportunity." যদিও সুরমা উপত্যকায় কংগ্রেসের একাংশ 'গ্রুপিং'-এর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু বসন্তকুমার দাস এবং বৈদ্যনাথ মুখার্জির নেতৃত্বে অন্য অংশ আসামের পাকিস্তান-ভুক্তির ভয়কে যথাযথ বলে মনে করতেন এবং গোপীনাথ বরদোলই-কে সর্বতোভাবে সমর্থন করতেন। এক কথায়, সুরমা উপত্যকায় অথবা বঙ্গদেশে 'গ্রুপিং'-এর প্রশ্নটি নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। আসলে, সারণি '২২' থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, 'C' গ্রুপে মুসলিমরা নামে মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫১.৬৯;) এবং সেটি সিলেটসহ পূর্ববঙ্গের জনবিন্যাসের জন্যই ; অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত কলকাতায়, সেই সময় জনসাধারণের মাত্র ২৩.৬% মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। 'ক্যাবিনেট্ মিশন'-এর কর্মকর্তাদের কাছে ধর্মীয় আঙ্গিকে অবিভক্ত বঙ্গের জনবিন্যাস সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ চিত্র ছিল। যাই হোক্, বঙ্গদেশে একদিকে যেমন কিরণশংকর রায় অথবা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পদক কালীপদ মুখার্জির মতো নেতৃত্ব 'গ্রুপিং ব্যবস্থা'র মাধ্যমে আসামকে বঙ্গের সাথে যুক্ত করার পক্ষে ছিলেন; তেমনি আবার আসামের সমর্থনে এবং 'গ্রুপিং'-এর বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র বসু বা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি'র মতো নেতৃত্ব সরব ছিলেন। তবে এটাও ঠিক, 'গ্রুপিং' প্রশ্নে বাংলার অধিকাংশ কংগ্রেস নেতার সাথে 'এ. পি. সি. সি.'র মতপার্থক্য সমস্যাটিকে আরও জটিল করে দিয়েছিল।

২৩.৪.৮ 'গ্রুপিং' প্রশ্নে নেহরু'র ভূমিকা প্রসঙ্গ

১৯৪৬ সালের জুলাই মাস থেকে 'গ্রুপিং'-কে কেন্দ্র করে ঘটনা-প্রবাহ নাটকীয় মোড় নিতে শুরু করল। যদিও নেহরু'র পরামর্শ অনুযায়ী, বরদোলই আসাম বিধানসভায় 'গ্রুপিং'-এর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 'ক্যাবিনেট্ মিশন'-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন; তথাপি মৌলানা আজাদ-এর হাত থেকে কংগ্রেস সভাপতি পদ গ্রহণের পর নেহরু ২২ জুলাই ১৯৪৬-এ বরদোলই-কে লেখা এক চিঠিতে তাঁর অখুশি হওয়ার কথা গোপন করেননি; কারণ আসাম বিধানসভার ভাষাগুলি নাকি যথার্থ হয়নি এবং 'ক্যাবিনেট্-মিশন'-এর সুপারিশমতো 'Section' এবং 'group'-এর মধ্যে পার্থক্য-রেখা টানা হয়নি। নেহরু'র ভাষায় ঃ "That a section may definitely decide not to form any group and yet may continue as a section to consider provincial constitution. Thus making the provincial constitution, representatives of the province need not be out-voted by others." বরদোলই ঐ চিঠির উত্তর দিলেও সেটি নেহরুকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। গোপীনাথ বরদোলই-এর উপর আপাতদৃষ্টিতে

বিরক্ত হলেও নেহরুর পক্ষে গান্ধিজির ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া সেই মুহূর্তে নানা কারণে সম্ভব ছিল না। এরই জন্য দেখা যায়, ১০ জুলাই ১৯৪৬ মুম্বাই-এ নেহরু'র সেই **ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলন** যেখানে তিনি সংবিধানসভায় কংগ্রেসের যোগদানের ইচ্ছা এবং একই সাথে 'গ্রুপিং'-এর ব্যাপারে সংবিধানসভা প্রয়োজনে 'ক্যাবিনেট্ মিশন'-এর প্রস্তাব পরিবর্তন করতে পারবে, সেটিও ঘোষণা করলেন। যেহেতু আসাম কোনোমতেই 'গ্রুপিং'-এর প্রস্তাব সহ্য করতে রাজি নয়; এরই জন্য নেহরু'র ভাষায় "...the big probability is that from any approach to the question, there will be no grouping" মৌলানা আবুল কালাম আজাদ *India Wins Freedom* গ্রন্থে নেহরু'র মৃদু সমালোচনা করে ঐ ঘোষণাকে 'bombshell' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত, দেশভাগ না করে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ'কে এক জায়গায় এনে যেভাবে 'ক্যাবিনেট্ মিশন' ১৯৪৬-এর মে মাস পর্যন্ত অগ্রগতি বজায় রেখেছিল তাকে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে মৌলানা আজাদ "a glorious event in the history of the freedom movement" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু, তাঁর মতে, জওহরলাল নেহরু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির আসনে আসার পর (যদিও তিনি নেহরু'র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন) ঘটনা-প্রবাহ অন্যদিকে বইতে শুরু করল এবং **আসামের আপত্তিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে শেষপর্যন্ত 'ক্যাবিনেট্-মিশন'-এরই মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেল।**

২৩.৪.৯ মুসলিম লিগের 'প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ'

নেহরু'র উপরোক্ত ঘোষণার পরই জিন্না সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে 'পাকিস্তান'-এর দাবিতে আবার সোচ্চার হলেন। 'কাবিনেট্ মিশন'-এর প্রস্তাব সম্পর্কে জিন্নার বক্তব্য ছিল "...the sections and groups were an essential feature of the scheme which the Congress wanted to smash." **জিন্না আরও স্পষ্ট করে বললেন শুধুমাত্র 'গ্রুপিং'-এর দিকে লক্ষ রেখেই মুসলিম লিগ 'ক্যাবিনেট-মিশন'কে অনেক প্রশ্নে ছাড় দিতে রাজি হয়েছে** "...the one thing for which the Mustim League had made concessions one after another in accepting the plan." জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'বিশ্বাসঘাতকতা'র অভিযোগ এনে (কারণ মে মাসে কংগ্রেস রাজি হয়েছিল) জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ ২৭ জুলাই ১৯৪৬ এক সভায় 'Direct Action' বা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। 'মিশন'-এর সূত্র মেনে নিয়ে যে কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংবিধানসভা গঠিত হয়েছিল তাতে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল ২০৭; অন্যদিকে মুসলিম

লিগের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৩ জন; সুতরাং ঐ সংবিধানসভা থেকে মুসলিম লিগের কোনো প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সুযোগ কম। এ ব্যাপারে জিন্না নিশ্চিত ছিলেন। তাছাড়া ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস ১১টি রাজ্যের মধ্যে ৮টিতেই জয়ী হয়েছিল এবং মুসলিম লিগ শুধুমাত্র মুসলমান ভোটারদেরই ভোট পেয়েছিল। এরই জন্য একদিকে সংবিধানসভা বর্জন ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানে অনিচ্ছা এবং অন্যদিকে কংগ্রেসের উপর চাপ বাড়ানোর কৌশল হিসাবে মুসলিম লিগ 'Direct Action'-এর কর্মসূচি পালনের ডাক দেওয়ার ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে **হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার কালো অধ্যায় নতুন ভাবে শুরু হল**। ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ 'Direct Action Day'-কে কেন্দ্র করে কলকাতায় নেমে এল ঘন অন্ধকার যেটি 'The Great Calcutta Killing' নামে ইতিহাসে চিহ্নিত। বিহারের দাঙ্গায় মুসলিমরা বেশি হতাহত হওয়ায় নোয়াখালিতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত নেমে এল। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির ঠিক এক বছর আগে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার কলঙ্কজনক অধ্যায়ের ফলে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। **যে আসামের 'গ্রুপিং'-ভুক্তির প্রশ্ন নিয়ে এতসব কাণ্ড সেখানে 'Direct Action Day'তে জোড়হাট, ডিব্রুগড়, তেজপুর, শিবসাগর অথবা শিলং-এ উত্তেজনা থাকলেও তেমন কোনো অঘটন কিন্তু ঘটেনি। সিলেট শহরে অবশ্য কিছু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছিল**। মোট কথা, মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পরিকল্পনা আসামে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তথাপি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দীর্ণ দেশের ঐরকম বিপন্ন সময়ে 'গ্রুপিং' প্রশ্নে আসামের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য বরদোলই সহ 'এ. পি. সি. সি.'র উপর বিভিন্ন অংশ থেকে চাপ অব্যাহত থাকায় **'গ্রুপিং-বিরোধী' আন্দোলন দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করল।**

২৩.৪.১০ ভাইসর ওয়াভেল-এর উদ্যোগ

১৬ আগস্ট ১৯৪৬-এ কলকাতায় ভয়ংকর দাঙ্গার পরবর্তী স্তরে ভাইসরয় ওয়াভেল কলকাতা পরিভ্রমণের পর লিগ ও কংগ্রেসকে এক জায়গায় এনে 'ক্যাবিনেট্ মিশন-এর প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য আর একবার জোর তৎপরতা শুরু করলেন। ২৭ আগস্ট ১৯৪৬-এর ভাইসরয় ওয়াভেল যুগ্মভাবে গান্ধিজি ও নেহরু'র সাথে সাক্ষাৎকারে জানালেন, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই শেষ সুযোগটি নির্ভর করছে কংগ্রেস যদি 'মিশন'-এর প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত করার গ্যারান্টি দেয়। Leonard Mosley তাঁর *Last Days of the British Raj* গ্রন্থে ঐ সময়ের কথোপকথন এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

"...Wavell : "It is a moment possibly the last we have to bring the League and the Congress together. And all I ask is a guarantee."
Nehru : "To accept this is tantamount to asking Congress to put itself in fetters."
Wavell : If so, why did you accept it at all?"
Gandhi : "What the Cabinet Mission intended and the way we interpret what they intended may not necessarily be the same."

২৩.৪.১১ কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও আসাম

এইভাবে দেখা যায়, 'ক্যাবিনেট মিশন' ১৯৪৬ সালের মে মাসের পর লন্ডনে প্রস্থান করার পরেও ভাইসরয় ওয়াভেল 'মিশন'-এর প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করার ব্যাপারে হাল ছাড়েননি এবং এই আলোচনা ডিসেম্বর ১৯৪৬ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ভাইসরয় ওয়াভেল-এর সাথে ২৭ আগস্ট ১৯৪৬ বিস্তারিত আলোচনার কথা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে নেহরু উল্লেখ করেন। ওয়াভেল প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'গ্রুপিং' সংক্রান্ত ব্যাপারে আসামের আপত্তি বা অন্যান্য জটিল প্রশ্ন 'Federal Court'-এর বিচারের বা মধ্যস্থতার জন্য পেশ করা যেতে পারে এবং সেই রায় সকলে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে। ভাইসরয় ওয়াভেল-এর এই আশ্বাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সন্তুষ্ট হয়। স্বল্পমেয়াদি প্রস্তাব হিসাবে 'ক্যাবিনেট্ মিশন'-এর সুপারিশ মতো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রসঙ্গটি এতদিন কংগ্রেস অগ্রাহ্য করলেও, এইবার সম্মত হয় এবং ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ পরাধীন ভারতে ওয়াভেল-এর সভাপতিত্বে এবং নেহরুর প্রধানমন্ত্রীত্বে ১৩ জনের মন্ত্রীসভা নিয়ে প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। জিন্না ঐ সরকারে প্রথমে যোগদান করতে রাজি হননি। অবশ্য এক মাস পরে (অক্টোবরে) ওয়াভেল-এর বিশেষ অনুরোধে নিজে মন্ত্রীসভায় যোগ না দিয়ে মুসলিম লিগের পাঁচজন প্রার্থীকে মনোনীত করেন এবং এঁরা হলেন (১) লিয়াকৎ আলি খান (অর্থ), (২) আই. আই. চুন্দ্রীগড় (বাণিজ্য), (৩) আব্দুর রব নিস্তার (পোস্ট ও আকাশ), (৪) জি. আলি খান (স্বাস্থ্য), (৫) যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (আইন)। মুসলিম লিগের পাঁচজনকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথম কংগ্রেসের সমর্থকদের নিয়ে যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল তার মধ্য থেকে পাঁচজন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন এবং এঁরা হলেন (১) শরৎচন্দ্র বসু, (২) সি. রাজাগোপালাচারি, (৩) এম. আসফ আলি, (৪) শরাফৎ আমেদ খান এবং (৫) সৈয়দ আলি জহির। গভর্নর-জেনারেল ও

ভাইসরয় ওয়াভেল-এর সভাপতিত্বে যে 'Executive Council' বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছিল তাতে কংগ্রেসের মনোনীত সাতজন মন্ত্রীর মধ্যে ছিলেন (১) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, (২) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, (৩) ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, (৪) ড. জন মাথাই, (৫) সর্দার বলদেব সিং, (৬) জগজীবন রাম এবং (৭) সি. এইচ. ভাবা।

২৩.৪.৮. প্যারায় 'section' এবং 'group' সংক্রান্ত ব্যাপারে গোপীনাথ বরদোলই-এর কাছে জওহরলাল নেহরু'র চিঠির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। সেই একই প্রসঙ্গ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ বেতার-ভাষণে নেহরু এইভাবে ঘোষণা করলেন ঃ

We are perfectly prepared to, and have accepted, the position of sitting in section which will consider the question of formation of groups.

নেহরু'র এই ঘোষণায় 'এ. পি. সি. সি.' যুগপৎ বিস্মিত ও হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল, কারণ **'Section' ও 'group'-এর সূক্ষ্ম তফাত সেই সময় অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল; দুটিই আসামের মানুষের চোখে একই দোষে দুষ্ট।** গোপীনাথ বরদোলই সহ আসামের নেতৃত্ব চিন্তা করতে পারছিলেন না কীভাবে নেহরুর ১০ জুলাই-এর ঐতিহাসিক ঘোষণা ৭ আগস্টে এইভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। 'Federal Court'-এর যে প্রসঙ্গটি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন পেয়েছিল সেটির নিরপেক্ষতা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ দানা বেঁধেছিল; কারণ ঐ কোর্টটিতে ব্রিটিশ সরকারের অঙ্গুলি হেলনেই তথাকথিত বিচার-পদ্ধতি শুরু করার আশঙ্কা ছিল। **১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে 'গ্রুপিং-এর বিরুদ্ধে আসামের উত্তেজনা ও গণ-আন্দোলন আবার সেই মে-জুন মাসের অবস্থায় ফিরে এল।** সেই সময় গোপীনাথ বরদোলই-এর নিদ্রাবিহীন রাত-কাটানো এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে শরণাপন্ন হওয়া ও পরামর্শ গ্রহণের নানা কাহিনি আসামে প্রচারিত আছে। ১৯৪৬-এর ১৬ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহরু'র কাছে 'এ.পি.সি.সি.' সকল সদস্যের স্বাক্ষর সংবলিত একটি পত্রে উল্লেখ করা হল কীভাবে ৭ সেপ্টেম্বর নেহরু'র বেতার-ভাষণ সমগ্র আসামে চরম বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। **চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হল, সমগ্র দেশের স্বার্থে মুসলিম লিগের সাথে সুসম্পর্ক সকলেই চায়, কিন্তু সেটি আসামের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অথবা স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে মহান আদর্শের জন্য কংগ্রেস পরিচিত, তার বিরুদ্ধে নয়।** চিঠির ভাষায় "We appreciate the anxiety of coming to a settlement with the Muslim

League but we feel that this should not be attained at the sacrifice of all those lofty ideals for which the Congress has stood so for.” চিঠির কপি ওয়ার্কিং কমিটির প্রতিটি সদস্যের কাছে পেশ করার দায়িত্ব ফখরুদ্দিন আলি আমেদ-কে দেওয়া হল। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ বরদোলই-কে ঐ চিঠির উত্তরে নেহরু যথারীতি আশ্বাস দিয়ে জানালেন ঃ “...in no event are we going to agree to a Province like Assam being forced against its will to do anything.” নেহরু'র ঐ উত্তরে কিছুদিনের জন্য স্বস্তি ফিরে এলেও ১৩ অক্টোবর ১৯৪৬ মুসলিম লিগ কেন্দ্রের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে রাজি হওয়ার পর ঘটনা-প্রবাহ আবার ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করল।

ওয়াভেল মুসলিম লিগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানে রাজি কবাতে পারলেও সংবিধানসভায় যোগ দিতে লিগকে কোনো মতে রাজি করাতে না পারার ফলে আবার অচলাবস্থার সৃষ্টি হল। ওয়াভেল জানতেন, কংগ্রেস যেভাবে ‘গ্রুপিং' ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করতে চাইছে তার সাথে মুসলিম লিগ মোটেই একমত নয়। লন্ডনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এটির সমাধন সূত্র বের করার জন্য, ঐতিহাসিক তারাচাঁদের ভাষ্য অনুযায়ী *(History of the Freedom Movement in India,* vol. III, p. 492), নেহরু, বলদেব সিং, জিন্না এবং লিয়াকৎ আলি খান-কে সাথে নিয়ে ওয়াভেল ইংলন্ডে পাড়ি দেন। কিন্তু ‘গ্রুপিং'-এর প্রশ্নে সেই আলোচনাও ব্যর্থ হয়। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ৬ ডিসেম্বর ১৯৪৬ এই জটিল প্রশ্নে এবং ‘Federal Court'-এর গুরুত্ব সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা প্রচার করে যেটি পরোক্ষে মুসলিম লিগের স্বপক্ষেই যায়। পরিস্থিতি এমনি সমস্যাকণ্টকিত হয় যে, ‘এ.পি.সি.সি.'র পক্ষ থেকে নেহরুসহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রতিটি সদস্যের কাছে ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬ এক তারবার্তায় জানানো হয় ঃ

> *Assam can Under no circumstances accept British Government interpretation section deciding matters by simple majority of votes or Federal Court decision as binding on Assam's grouping with Bengal.*

এই সময় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের নানা প্রশ্নে বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে এবং অসমিয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তা বা ‘একলা চলো' নীতি গুরুত্ব পায়। পরবর্তী সময়ে আসামের রাজনৈতিক মানচিত্রে পরিবর্তনের পিছনে উপরোক্ত ঘটনাবলীর প্রভাব অস্বীকার করা কঠিন। যদিও জয়প্রকাশ নারায়ণ, শরৎচন্দ্র বসু'র মতো কেন্দ্রীয় স্তরের কিছু নেতা আসামের

এই সংকটের সময় বরদোলই-এর পাশে ছিলেন, তথাপি নেহরুর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাঁদের বক্তব্যে তেমন গুরুত্ব আরোপ করত না। কিন্তু যে ব্যক্তিটিকে পুরোপুরি অস্বীকার করা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে কঠিন ছিল তিনি গান্ধিজি। আগেও বারবার গান্ধিজি আসামের রাজনৈতিক সংকটের সময় উত্তরণের পথ দেখিয়েছিলেন, ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে আবার গান্ধিজির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। গান্ধিজি সেই সময় নোয়াখালি-দাঙ্গার প্রেক্ষিতে শান্তি-মিশন নিয়ে নোয়াখালির শ্রীরামপুর গ্রামে অবস্থান করছিলেন। গোপীনাথ বরদোলই ১৫ ডিসেম্বর ১৯৪৬ একটি চিঠিতে আসামের সর্বশেষ পরিস্থিতিতে তাঁর উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করে সহকর্মী বিজয়চন্দ্র ভগবতী এবং মহেন্দ্রমোহন চৌধুরিকে শ্রীরামপুরে গান্ধিজির সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ভগবতী ও চৌধুরির সামনে আসামকে সমর্থন করে নীচের যে বক্তব্যটি গান্ধিজি রেখেছিলেন সেটি নানা কারণে ঐতিহাসিক ঃ

> *...The Federal Court is the creation of the British. It is a packed Court. ...If Assam keeps quiet, it is finished... As soon as the time comes for Constituent Assembly to go into Section, you will say 'Gentlemen, Assam retires'. For the independence of India, it is the only condition....Tell Bardoloi, I don't feel the least uneasiness. My mind is made up. Assam must not lose its soul. It must uphold it against the whole world. Else, I will say that Assam had only manikins and no men. It is an impertinent suggestion that Bengal should dominate Assam in any way.*

আসামের সমর্থনে গান্ধিজির এই বলিষ্ঠ বক্তব্য সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার পর কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে দোদুল্যমানতা লক্ষ করা যায়। ৫ জানুয়ারি ১৯৪৭ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কোনো প্রদেশকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলকভাবে সংবিধান প্রণয়নে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে। ৭ জানুয়ারি ১৯৪৭-এ *The Statesman* পত্রিকায় মুসলিম লিগের 'চক্রান্তে' আসামে 'মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে আসামকে মুসলিম রাজ্যে পরিণত করার বিতর্কিত প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে খাসি পাহাড় থেকে নির্বাচিত আসামের মন্ত্রী J. J. M. Nichols-Roy-এর মন্তব্যটিও ছাপা হয় ঃ

> *...Even now the Muslim League in Bengal wants to send thousands upon thousands of immigrants to Assam and take possession of the land in Assam. That is feared by everyone. The people of the hills are afraid of that immigration and say they will fight it to the last.*

The people of the plains do not want to be swamped. They do not want Assam, which is a non-Muslim majority province now, to be turned into a Muslim majority province. That is the crux of the whole fight between Assam and the Muslim League. Once we go into section, we are committed to a wrong principle, we are acceding to the unjust demand of the League. (সূত্র ঃ *Political History of Assam*, vol. III, p. 384)

অসমিয়া না হওয়া সত্ত্বেও Nichols-Roy-এর উপরোক্ত দীর্ঘ মন্তব্য থেকে উপলব্ধি করা যায় মুসলিম লিগের অভিবাসন নীতির ফলে আসামের পাহাড় ও সমতলে মানুষের মনে নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও বিপন্নতাবোধ কত তীব্র হয়ে উঠছিল। **পরবর্তী সময়ে এই অভিবাসন সমস্যাটিই আসামের প্রধান এবং জ্বলন্ত সমস্যায় পরিণত হয়েছিল।**

২৩.৪.১২ 'ক্যাবিনেট মিশন' প্রস্তাব সমাধিস্থ

একদিকে যখন আসামের অভ্যন্তরে মুসলিম লিগের অনমনীয় মনোভাব এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের দোদুল্যমানতাকে কেন্দ্র করে চারদিকে ক্ষোভ-বিক্ষোভ উত্তেজনা নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল; অন্যদিকে কেন্দ্রের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলীর অভ্যন্তরে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ সদস্যদের মধ্যে নানা প্রশ্নে মতবিরোধ ও তিক্ততা চরম আকার নেওয়ায় নেহরু এবং প্যাটেল উভয়েই তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং এভাবে যে একসাথে কাজ করা সম্ভব নয় সে ব্যাপারে ক্রমশ নিশ্চিত হতে থাকেন। একই সাথে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া ক্রমশ জটিল ও বিলম্বিত হচ্ছে দেখে ওয়াভেল-এর স্থলে **১৯৪৭-এর মার্চে আর্ল মাউন্টব্যাটেন-কে ভাইসরয় হিসাবে নিয়োগ** করার সাথে সাথে 'ক্যাবিনেট-মিশন'-এর প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে সমাধিস্থ করার আয়োজন শুরু হয়ে যায়। আসাম মুহূর্তের জন্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' অনুযায়ী দেশভাগ এবং সিলেটে গণভোট-কে কেন্দ্র করে আসাম আবার অন্য ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়। দেশভাগ ও 'পাকিস্তান' সৃষ্টি সম্পর্কে নেহরু ও প্যাটেল-এর রাজি হওয়া এবং প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে Alan Campbell-Johnson তাঁর *Mission with Mountbatten* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ (Nehru and Patel accepted partition) *on the understanding that by conceding Pakistan to Jinnah they will have no more of him and eliminate his nuisance*

value, or as Nehru put it privately, that by cutting the head we shall get rid of headache. গান্ধিজি অবশ্য জানতেন, দেশভাগের ফলে কত বিপর্যয় মানুষের জীবনে নেমে আসবে এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূল আদর্শই অর্থহীন হয়ে যাবে। দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার তাগিদে ১৯৪৭-এর এপ্রিলে জিন্না'কে অখণ্ড স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী করার উদ্যোগও গান্ধিজি নিয়েছিলেন; যদিও নানা কারণে তাঁর সেই চেষ্টাও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

২৩.৫ সিলেট গণভোট (Sylhet Referendum)

২৩.৫.১ সিলেট প্রেক্ষাপট : বঙ্গ থেকে আসামে

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বঙ্গের একটি জেলা হিসাবে শ্রীহট্ট বা সিলেট ৩ জানুয়ারি ১৭৮২তে স্বীকৃতি পায়। এরপর ঔপনিবেশিক স্বার্থে ১৮৭৪ সালে আসামের সাথে সিলেটকে যুক্ত করা হয় এবং সিলেট ও কাছাড় জেলাকে নিয়ে তৈরি হয় 'সুরমা ভ্যালি ডিভিসন'। ১৯০৫-এর বঙ্গ-ভঙ্গের সময় সিলেটের বৃহত্তর অংশটি আবার যুক্ত হল খণ্ডিত বঙ্গেরই সঙ্গে ; এবং 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে নতুন রাজ্য গঠিত হল। বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের ফলে ১৯১২ সালে বাংলা ভাগ নাকচ এবং আবার ঐক্যবদ্ধ বঙ্গের জন্ম হলেও ১৯১২ থেকে স্বাধীনতার পূর্ব-লগ্ন পর্যন্ত সিলেটকে কিন্তু আসামেরই অঙ্গীভূত করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এরই জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন :

মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।

বর্তমান গ্রন্থের একবিংশ অধ্যায়ে (২১.৫) সিলেটের গঠন-প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে। সিলেটকে আসাম-ভুক্ত করায় আসাম অথবা বাংলার কেউই প্রথম দিকে খুশি হয়নি; তথাপি ব্রিটিশের স্বার্থেই এটি ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতকে ব্রহ্মদেশের সাথে যুদ্ধের সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিলেটের সামরিক গুরুত্ব প্রথম উপলব্ধি করে। ১৮৭৪ সালে আসামে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনে, বিশেষত ইংরেজি-জানা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা তথাকথিত 'ভদ্রলোক'দের সাহায্য নেওয়ার প্রশ্নে, সিলেটের কিছু নিজস্ব আকর্ষণ ছিল। সিলেটের চা-বাগান ও আসামের চা-বাগানকে একই পদ্ধতিতে পরিচালনা করার প্রশ্নে ইউরোপীয় 'প্ল্যান্টার'দের বক্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সর্বোপরি ছিল ব্রিটিশ

শক্তির দুটি ভেদ বুদ্ধি ('divide and rule' নীতি)—সেটি প্রথমে অসমিয়া বনাম বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে এবং (যেহেতু সিলেটে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ) এজন্য 'ক্যাবিনেট্ মিশন্'-এর সময় সাম্প্রদায়িক অস্ত্র ব্যবহার করে 'C' গ্রুপ হিসাবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টায়।

২৩.৪.২ বাংলার সাথে সিলেটকে আবার সংযুক্ত করার প্রচেষ্টা

এক সময় সিলেটে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই আসাম থেকে নিজেদের ছিন্ন করে বঙ্গের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সিলেট জেলা কংগ্রেস কমিটি বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্দেশেই কাজ করত। সুরমা উপত্যকার মুসলমানদের অধিকাংশ নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং বঙ্গের তুলনায় আসামে যদি সিলেট থাকে তাহলে সেখানে সংখ্যালঘু হিসাবেই মুসলমানদের স্থান থাকবে বলে তাদের আশঙ্কা ছিল। ১৯১২ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ নাকচ করার পরেও আসামের সাথে সিলেটকে পুনর্বার সংযুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে 'অঞ্জুমান ই-ইসলামিয়া' সিলেট ও ঢাকায় ঐ একই সালে যথাক্রমে আব্দুল মাজিদ ও সামসুল হুদা'র সভাপতিত্বে দুটি বড়ো প্রতিবাদ-সভার আয়োজন করেছিল। সিলেটের হিন্দু-মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা একসাথে ১৯২০-তে 'Sylhet Bengal Reunion League' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। **কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়** এবং 'অঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া'র মঞ্চ থেকেই আসামে অবস্থানের সমর্থনে একটার পর একটা বিবৃতি প্রকাশিত হতে থাকে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার ফলে অবস্থানের পরিবর্তনও আসে। ১৯২৪ সালে সুরমা উপত্যকায় স্বরাজ্য দলের নেতা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি সিলেটসহ কাছাড়-কে বঙ্গের অঙ্গীভূত করার দাবিতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন পেশ করেন। এক কথায়, দাবিটির সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ফলে সিলেটের সমস্যা ক্রমশ জটিল হতে শুরু করে। ১৯২৬ সালের ৬ জানুয়ারি Assam Legislative Council বা বিধান-পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন শুধু সিলেট-এর অবস্থান প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ডাকা হয়। সদানন্দ দুয়ারা নামে জনৈক অসমিয়া সদস্য সিলেটকে বঙ্গের সাথে যুক্ত করার পক্ষে একটি বিল পেশ করে শুধুমাত্র সকলের আশ্বাস চান যে, এরফলে প্রদেশ হিসাবে আসামের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা নেই (কারণ এর ফলে আসাম একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হবে)। শাদুল্লাহ'র নেতৃত্বে মুসলিম সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলটি ২৬-১১ ভোটে গৃহীত হয়। প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তীব্র আকার ধারণ করায় এবং জটিল প্রশ্নটিকে ধামা-চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সুরমা উপত্যকার কংগ্রেস নেতা বসন্তকুমার দাস ('Surma Valley Political Conference'-এর ক্রমাগত দাবি সত্ত্বেও) একটি সংশোধনী বিল আসাম বিধান পরিষদে পেশ করেন। এরপর Indian Statutory Commission-এর কাছে আসাম সরকারের Chief Secretary, G.E. Soames এক পত্রে জানান ঃ "...the opinion of the province, now expressed through its elected representatives in the Lagislative Council, is opposed to the transfer of Sylhet ;" অর্থাৎ আসামের অঙ্গ হিসাবেই আপাতত সিলেট থাকছে। স্বাধীনতার পূর্ব-লগ্ন পর্যন্ত এই ছিল প্রেক্ষাপট।

২৩.৫.৩ মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও সিলেটে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া

ওয়াভেল-এর বিদায় এবং 'ক্যাবিনেট্ মিশন'-এর ব্যর্থতার পর, মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় পদ গ্রহণ করে শীঘ্রই উপলব্ধি করেন যে, ঐক্যবদ্ধ ভারতকে ক্ষমতা-হস্তান্তর অসম্ভব। এরই জন্য দেশভাগ অনিবার্য। বিতর্কিত পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ করে সিলেটের ভবিষ্যৎসহ সীমানা যথাক্রমে গণভোটের মাধ্যমে এবং Boundary Commission-এর সুপারিশ অনুযায়ী নির্ধারণের প্রসঙ্গটি কংগ্রেস, মুসলিম লিগ এবং শিখ নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করে এবং ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি নিয়ে মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ঘোষণা করেন। **এটিই মাউন্টব্যাটেনের ৩ জুন পরিকল্পনা নামে পরিচিত**। 'ক্যাবিনেট্ মিশন' (১৯৪৬)-এর সময় মুসলিম লিগ পরোক্ষভাবে সমগ্র আসামের উপরই দাবি জানিয়েছিল, মাউন্টব্যাটেনের উদ্যোগের জন্য সেই দাবি শুধুমাত্র সিলেটের উপর কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে 'এ.পি.সি.সি.' কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। খণ্ডিত ভারতের অঙ্গরাজ্য আসামের অভ্যন্তরে সিলেট থাকবে, নাকি মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গের (১৯৫৫ থেকে যেটি 'পূর্ব পাকিস্তান' এবং ১৯৭১-এর 'মুক্তিযুদ্ধের'পর যেটি 'বাংলাদেশ' নামে পরিচিত) অভ্যন্তরে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মতামত জানার জন্য সরাসরিভাবে সিলেটিদের ভোটগ্রহণ বা গণভোটের তারিখ ১৯৪৭ সালের ৬-৭ জুলাই ঘোষণার সাথে সাথে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তুঙ্গে উঠল। দুটি প্রশ্নে এই গণভোট ছিল গুরুত্বপূর্ণ—(ক) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতের রাজ্য-গঠন, (খ) ভাষাগত ভিত্তিতে আসামের পুনর্গঠন। দুটি সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—(ক) সিলেটি হিন্দুদের অধিকাংশ যাঁরা এতদিন বাংলার সাথে সংযুক্তির পক্ষে ছিলেন, তাঁরা ১৯৪৭ সালে আসামের অভ্যন্তরে থাকার পক্ষে; অন্যদিকে (খ) সিলেটি মুসলিমদের অধিকাংশ আগের অবস্থান বদল করে ১৯৪৭

সালে মুসলিম-প্রধান পূর্ববঙ্গের মধ্যে সিলেটকে অঙ্গীভূত ও প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক বেশি সক্রিয় হলেন কারণ, **সিলেটের ৬০% মানুষ মুসলমান** এবং তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষেরও সাহায্য তাঁরা চাইলেন। সেই সময় সিলেটের প্রভাবশালী মুসলিম নেতা আব্দুল রব চৌধুরির ভাষায় ঃ "Pakistan is the only solution of all evils of India and for the good for all..." তপশিলি জাতির নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন 'মুসলিম লিগ'-এর সমর্থক। অন্যদিকে আবার 'জামিয়াত্-উল-উলেমা'র নেতা হুসেন আহমদ মাদানি (১৮৭৯-১৯৫৭) পাকিস্তান-আন্দোলনের বিরোধিতা করে সিলেটসহ অবিভক্ত আসামের পক্ষপাতী ছিলেন কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল ধীরে ধীরে সমগ্র আসাম একদিন মুসলিম রাজ্য হয়ে যাবে। যদিও মাদানি বিভিন্ন ব্যাপারে প্রভাবশালী ছিলেন; কিন্তু গণভোটের সময় মুসলিম মানসে তাঁর প্রভাব ছিল গৌণ।

২৩.৫.৪ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রতিক্রিয়া

অন্যদিকে সিলেট প্রশ্নে অসমিয়া জনমানসের প্রতিক্রিয়া ও ছবি প্রথম থেকে মোটামুটি একই ধরনের ছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালে আসাম বিধানসভা নির্বাচনের সময় 'এ. পি. সি. সি.'-র নির্বাচনী ইস্তাহারে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ ছিল, কংগ্রেস দল সিলেট-কে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে, কারণ ইস্তাহারের ভাষ্য অনুযায়ী, "...Unless the province of Assam is organised on the basis of Assamese language and Assamese culture, the survival of the Assamese nationality and culture will become impossible." ভাইসরয় ওয়াভেল ১৯৪৬-এর এপ্রিলে তাঁর জার্নালে উল্লেখ করেছেন, কীভাবে আসামের প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বরদোলই 'ক্যাবিনেট্ মিশন'কে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, "Assam would be quite prepared to hand over Sylhet to Eastern Bengal." সেই সময়ের অচলাবস্থা কাটাতে গোপীনাথ বরদোলই নিজেই ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ এক চিঠিতে সর্দার প্যাটেলের কাছে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর সমাধান সূত্র উল্লেখ করে লিখেছিলেন ঃ "Maulana Sahib seemed to come to the conclusion that the only alternative to this state of things is to separate the Bengali district of Sylhet and a portion of Cachar from Assam and join these with Bengal—a consummation to which the Assamse people are looking forward for the last 70 years." (*Sardar Patel's Correspondence*, vol. III, p. 195) **১৯৪৭-এর গণভোটের সময় আসাম-কংগ্রেসের একই দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত ছিল; যদিও প্রকাশ্যে সেটি উচ্চারিত**

হত না। গণভোটের সময় সিলেট জেলার কংগ্রেস নেতাদের কোনোভাবে সাহায্য না করে 'এ. পি. সি. সি.' তার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছিল ; কারণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নেতাদের কাছে সিলেটের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে এটি ছিল "lifetime's opportunity". অবশ্য জওহরলাল নেহরুর কাছে লেখা একপত্রে গোপীনাথ বরদোলই নাটকীয় ভাবে উল্লেখ করেছিলেন, সিলেটকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিরুদ্ধে অসমের প্রতিটি মানুষ শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়ে লড়বে। এই রকম একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৪৭-এর ৬-৭ জুলাই সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হল। Referendum Commissioner হিসাবে নিযুক্ত হয়ে H. C. Stork সিলেটের ২৩৯ পোলিং বুথে ৪৭৮ জন প্রিসাইডিং-অফিসার এবং ১৪৩৪ পোলিং অফিসার নিয়ে এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত নির্বাচন-পরিচালনার পর ফলাফলের চিত্র ছিল এই রকম ঃ

সারণি ঃ ২৩

সিলেট গণভোটের ফলাফল

মহকুমার নাম	মোট ভোটার	পূর্ববঙ্গের পক্ষে ভোট	আসামের পক্ষে ভোট
সিলেট (নর্থ)	১,৪১,১৩৯	৬৮,৩৮১	৩৮,৮৭১
করিমগঞ্জ	১,০০,২৪৩	৪১,২৬২	৪০,৫৩৬
হবিগঞ্জ	১,৩৫,৫২৬	৫৪,৫৪৩	৩৬,৯৫২
সিলেট (সাউথ) অর্থাৎ মৌলবিবাজার	৭৯,০২৪	৩১.৭১৮	৩৩,৪৭১
সুনামগঞ্জ	৯০,৮৯১	৪৩,৭১৫	৩৪,২১১
মোট	**৫,৪৬,৮১৫**	**২,৩৯,৬১৯**	**১,৮৪,০৪১**

সিলেটের মোট ৫,৪৬,৮১৫ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছিলেন ৪,২৩,৬৬০ জন, অর্থৎ ৭৭% ভোটার অংশ নিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন ২,৩৯৬১৯ জন, এবং প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৫৬.৬%, অন্যদিকে অবিভক্ত আসামের পক্ষে ১,৮৪,০৪১ জন, এবং প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৪৩.৪%। একমাত্র সিলেট (সাউথ) বা মৌলবিবাজার ছাড়া সিলেট জেলার সকল মহকুমার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার পূর্ববঙ্গের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন।

গণভোটের এই রায় ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই India Independence Act এর ৩নং ধারায় স্বীকৃতি পেয়েছিল। এরপর Boundary Commission-এর চেয়ারম্যান Sir Cyril Radcliffe-এর উপর সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পিত

হয়। গণভোটের মাধ্যমে আসামের অঙ্গচ্ছেদ হলেও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি; বরং একটা সুখপ্রদ ঘটনা বলেই অনেকের কাছে মনে হয়েছিল। অধ্যাপক সুজিৎ চৌধুরির ভাষায় ঃ *The partition of the country, for the Assamese leaders, was perceived not as a tragic development but as a 'god-sent opportunity' to carve out a linguistically homogenous province.* খুশিতে ডগমগ হয়ে *The Assam Tribune* পত্রিকায় (২১ জুলাই ১৯৪৭) প্রকাশিত হল "The Assamese public seem to feel relieved of a burden." এমনকি আসামের গভর্নর Sir Muhammad Saleh Akbar Hydari (১৮৯৪-১৯৪৮)'র মতো দুঁদে ICS অফিসার (যিনি ১৯৪৭-এর মে মাস থেকে ১৯৪৮ এর ২৮ ডিসেম্বর মৃত্যু পর্যন্ত আসামের গভর্নর) স্বাধীনতা-প্রাপ্তির মাত্র কুড়িদিন পরে (৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) আসাম বিধানসভায় ঘোষণা করলেন ঃ

The natives of Assam are now masters of their own house...The Bengali no longer has the power, even if he had the will, to impose anything on the people of these hills and valleys which constitute Assam. অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ উল্লেখ করেছেন, সিলেটের গণভোটের ফলাফলে উল্লসিত হয়ে 'আসাম জাতীয় মহাসভা'র সাধারণ সম্পাদক অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি নাকি মন্তব্য করেছিলেন, শুধু সিলেট কেন, একই সাথে যদি বাংলা-ভাষী কাছাড়, বিশেষত হাইলাকান্দি মহকুমা এবং মৌলানা ভাসানি'র ঘাঁটি ধুবরি মহকুমার বাংলা-ভাষী চারটি থানাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হত ভালো হত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সিলেট-গণভোটের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল এইসব মন্তব্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। **কিন্তু এই উচ্ছ্বাস উল্লাস ছিল ক্ষণস্থায়ী, কারণ কিছু দিনের মধ্যেই দেশভাগের বিষময় ফল শুধুমাত্র সুরমা উপত্যকার বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না ; সমগ্র আসামকে গ্রাস করল।** আসলে, ১৯৪৭-৪৮ সালে সমগ্র ভারতবর্ষের বিশেষত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের, রাজনৈতিক বাতাবরণ এমনি উথাল-পাথাল, উত্থান-পতনের মুখোমুখি হয়েছিল যে অনেক ব্যক্তিই দিগ্‌ভ্রান্ত বা দিশাহীন হয়ে বেপরোয়া মন্তব্য করেছেন যেগুলির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ যথার্থ হবে না। একদিকে মুসলিম লিগসহ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চাপা-আনন্দ, অন্যদিকে সুরমা উপত্যকায় বাঙালি হিন্দুদের বুক-ফাটা কান্না—এই পরস্পর-বিরোধী প্রতিক্রিয়া সিলেট গণভোটের পর দৃষ্ট হয়েছিল। সিলেট আসাম ভুক্ত হওয়ার পর **সুরমা উপত্যকার যেসব হিন্দু জনগোষ্ঠী উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলার সাথে সিলেটের সংযুক্তির জন্য সরব ভূমিকা**

নিয়েছিলেন, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের জন্য স্বাধীনতার পূর্ব-মুহূর্তে তাঁরাই আবার আসামের মধ্যে আশ্রয় পেয়ে নিজেদের অস্তিত্ব কোনোমতে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করেছিলেন—ইতিহাসের এ কী নির্মম পরিহাস! ভৌগোলিক অবস্থানও মাঝে-মাঝে ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়।

২৩.৫.৫ সন্ত্রাসদীর্ণ গণভোট

সিলেট গণভোটকে কেন্দ্র করে লোকমুখে কারচুপি, সন্ত্রাস প্রহসন ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা রকম কাহিনির প্রচার আছে এবং কিছু ক্ষেত্রে ইতিহাসে তার প্রমাণও আছে। ঐতিহাসিক জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর 'Sylhet : Myth of a Referendum in Indo-British Review' প্রবন্ধে এই গণভোটের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা প্রসঙ্গে সেই সময়ের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং মুসলিম লিগের 'সংগঠিত গুণ্ডাবাজি'র ('organised goondaism') একটি নিপুণ চিত্র এঁকেছেন। বাংলার মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভার (সেই সময় সমগ্র ভারতের একমাত্র মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভা) প্রধান হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি (১৮৯২-১৯৬৩)—যিনি পাকিস্তানের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী (১৯৫৬-১৯৫৭) ছিলেন—নিজে বিশাল এক লিগ-বাহিনী নিয়ে সিলেট গণভোটের প্রচারে অংশ নিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে তুঙ্গে তুলে দিয়েছিলেন। যদিও ৭৭ শতাংশ ভোটার অংশ নিয়েছিলেন, তথাপি বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু হিন্দুরা ভয়ে ভোট দিতে পারেননি; এবং একটি স্থানে পোলিং-অফিসার নিজেই আতঙ্কে পালিয়ে গিয়েছিলেন। মৌলবিবাজারের কাছে আমতলি'তে পুলিশকে শেষপর্যন্ত গুলি চালাতে হয়ছিল এবং ১ জনের মৃত্যু এবং ২ জন গুরুতর জখম হয়েছিল। একইভাবে সিলেট শহরের কাছে গোপসার এলাকায় পুলিশের গুলিতে ১২ জন আহত হয়েছিল। সিলেটের কংগ্রেস নেতা রবীন্দ্রনাথ আদিত্য এই রকম এক অরাজক অবস্থায় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। M. Kar তাঁর *Muslim Politics in Assam, North Eastern Affairs* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কীভাবে আসামে প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বরদোলই বহিরাগত শত শত মুসলিম লিগ 'ন্যাশানাল গার্ড'কে গণভোটের সময় সিলেটে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে "endangered the safety and security of the entire Hindu population." প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গণভোটের সময় যেসব ভোটার সিলেটের বাইরে ছিলেন তাদের অধিকাংশই ভোটে অংশ নিতে ফিরে এসেছিলেন; কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু ভোটার ভোট দিতে পারেননি। নীরদকুমার গুপ্ত তাঁর *স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি* গ্রন্থে সর্দার প্যাটেল-

এর কাছে লেখা পূর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত'র একটি চিঠির (১৫ জুন ১৯৪৭) উল্লেখ করে জানিয়েছেন, সেই সময় সিলেটে ২২১টি চা-বাগানে মোট ১,৯৭,২৭২ জন শ্রমিক কাজ করতেন যাদের অধিকাংশই আসামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পক্ষে ছিলেন; কিন্তু অধিকাংশেরই নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। *সর্দার প্যাটেল করেসপন্ডেন্স*-এর পঞ্চম খণ্ডে (পৃ. ২৫) ঐ গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটির উল্লেখ আছে। **সুতরাং নির্বাচনে কারচুপি প্রক্রিয়া প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল। এইভাবে স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটদান করার অধিকারের তিক্ত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে সিলেট যাত্রা শুরু করে।**

স্বাধীন ভারতবর্ষ থেকে সিলেটকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারটিকে গান্ধিজি মোটেই সহজভাবে নেননি। লিলি মজিন্দার বরুয়া তাঁর "Lokapriya Gopinath Bardoloi : A Devotee of Mahatma Gandhi" প্রবন্ধে জানিয়েছেন, সিলেটের গণভোটের পর গান্ধির প্রকাণ্ড অনুগত গোপীনাথ বরদোলই যখন তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন সেই সময় গোপীনাথের কাছে গান্ধির একটাই প্রশ্ন ছিল ঃ কেন তিনি গণভোটের প্রশ্নে সম্মতি দিলেন? বরদোলই এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারায় তাঁর স্নেহধন্য শিষ্যকে গান্ধিজি সেদিন মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলেন। যাই হোক্, এই গণভোট এবং মানুষের বিপর্যয়ের প্রশ্নে কংগ্রেসের দায়-দায়িত্ব সংক্রান্ত সমস্ত বিতর্কের যবনিকা টেনে দিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী 'লৌহ-মানব' বা 'ভারতের বিসমার্ক্' হিসাবে খ্যাত—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (১৮৭৫-১৯৫০) একটি ভয়ংকর মন্তব্যের মাধ্যমে। ১৯৪৮ সালের ২ জানুয়ারি আসামের রাজধানী শিলং-এ একটি সভায় সর্দার প্যাটেল মন্তব্য করলেন, **আসামের দেহের একটি রোগগ্রস্ত অঙ্গের নাম 'সিলেট' যেটি সঠিকভাবেই কাটা হয়েছে** (M. Kar-এর উল্লেখিত গ্রন্থের ৩৪০ পৃ.)।

২৩.৬ দেশভাগ ও আসাম

২৩.২.১ র‍্যাড্ক্লিফ্ সীমানা কমিশন

সিলেটে গণভোটের পর Sir Cyril Radcliffe (১৮৯৯-১৯৭৭)-নামে একজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ আইনজীবীর নেতৃত্বে গঠিত কমিশনের উপর বাংলা ও আসামের মুসলিম ও অ-অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি চিহ্নিত করে সীমানা-নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পিত হয়। ৮ জুলাই ১৯৪৭ র‍্যাডক্লিফ্ প্রথম ও শেষবারের মতো ভারতবর্ষে আসেন (ভারতের জনগোষ্ঠীর গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে র‍্যাড্ক্লিফ্-এর

কোনো ধারণাই ছিল না)। স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে ভারতের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একজন আইনজ্ঞকে দায়িত্ব দিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগকে মাউন্টব্যাটেন আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, র‍্যাডক্লিফ্-এর সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট হবে না। ১৩ আগস্ট ১৯৪৭-এর মধ্যে র‍্যাড্‌ক্লিফ্-কে সীমানা নির্ধারণের কাজ অত্যন্ত গোপনে শেষ করে মাউন্টব্যাটেনের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ পেয়ে দিল্লিতে নেমেই তিনি কাজ শুরু করে দেন। **যে কাজ সম্পূর্ণ করতে কয়েক বছর সময় প্রয়োজন হতে পারত সেটি প্রধানত দিল্লিতে বসে বিভিন্ন ধরনের পুরাতন মানচিত্রের উপর নির্ভর করে এবং বাংলা ও আসামের কোনো এলাকা নিজে পরিভ্রমণ না করে মাত্র ৩৭ দিনে তাড়াহুড়ো সমাপ্ত করে মাউন্টব্যাটেনের কাছে জমা দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণার ঠিক আগের মুহূর্তে র‍্যাড্‌ক্লিফ্ দিল্লি থেকে লন্ডনের পথে পাড়ি দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিলেন।** Stanley Wolpert তাঁর *Shameful Flight* অথবা Lary Collins and Dominique Lapierre তাঁদের *Freedom at Midnight* গ্রন্থে দেশভাগের পূর্ব মুহূর্তের এইসব চিত্তাকর্ষক ও মর্মন্তুদ ঘটনাবলী অত্যন্ত নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। যদিও র‍্যাড্‌ক্লিফ্-এর নেতৃত্বাধীন 'Bengal Boundary Commission'-এ দু'জন হিন্দু ও দু'জন মুসলিম বিচারপতি—যথাক্রমে বিজনকুমার মুখার্জি, সি. সি. বিশ্বাস, আবু সালেহ্ মহম্মদ আক্রম এবং এস. এ. রহমান—অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তথাপি তাঁদের ভূমিকা ছিল একেবারেই গৌণ। গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু করার র‍্যাড্‌ক্লিফ্ একাই করতেন এবং মাঝে মাঝে ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের সাথে শলা-পরামর্শ করতেন। **শেষদিকে র‍্যাড্‌ক্লিফ্ অশান্ত ভারতবর্ষের চেহারা দেখে এত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, সংগৃহীত সমস্ত নথি-পত্র পুড়িয়ে নষ্ট করে তিনি তড়িঘড়ি লন্ডনে ফিরে যান।**

২৩.৬.২ সিলেট ও র‍্যাড্‌ক্লিফ্ কমিশন

রবীন্দ্রনাথ আদিত্যের *From the Corridors of Memory* থেকে জানা যায়। র‍্যাড্‌ক্লিফ্ কমিশনের কাছে মুসলিম লিগ যে স্মারক-পত্র পেশ করেছিল তাতে শুধুমাত্র সিলেটই নয়, সাথে কাছাড়, গোয়ালপাড়া, খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়কে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও ছিল। মাউন্টব্যাটেন একবার গোপীনাথ বরদোলইকে ডেকে খাসিপাহাড় সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য নিচ্ছিলেন, সেই সময় বরদোলই-এর সন্দেহ হয় এবং তিনি এই ধরনের দাবির বিরোধিতা করায় মাউন্টব্যাটেন তাঁকে শেষপর্যন্ত আশ্বস্ত করেন। সিলেট সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গিই

থাক, অন্যান্য স্থানগুলি আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিরুদ্ধে কিন্তু বরদোলই-এর স্পষ্ট অবস্থান ছিল। গণভোটের রায় অনুযায়ী, সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার সময় সীমানা কমিশনের নজরে এল, সিলেটের ৩৫টি থানার মধ্যে ৮টিতে অ-মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুল্লা ও আজমিরিগঞ্জ থানা এলাকায় মুসলিম জনগোষ্ঠী অ-মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রায় কাছাকাছি থাকলেও, অন্য ৬টি থানা এলাকায় অ-মুসলিমদের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। যেহেতু ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, সুতরাং উপরোক্ত ৮টি থানা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা নয়। এই ৬টি থানা আবার সিলেট (দক্ষিণ) এবং করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সিলেটের মধ্যে করিমগঞ্জ ছিল সবচেয়ে বড়ো মুসলিম প্রধান মহকুমা। আবার অন্যদিকে ভারতের তথা আসামের অন্তর্ভুক্ত কাছাড় জেলার হাইলাকান্দিতে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। একদিকে ধর্ম, অন্যদিকে ভাষাকে কেন্দ্র করে দেশভাগের সময় আসামে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌-এর ভাষায় ঃ

> *...Out of 35 thanas in Sylhet, 8 have non-Muslim majorities; but...are entirely surrounded by preponderatingly Muslim areas, and must therefore go with them to East Bengal. The other six thanas comprising a population of over 5,30,000 people stretch in a continuous line along part of the southern border of Sylhet District. They are divided between two sub-divisions of which, one South Sylhet, comprising a population of over 5,15,000 people, has in fact a non-Muslim majority of some 40,000; while the other, Karimganj, with a population of over 5,68,000 has Muslim majority that is a little larger.... In those circumstances, I think that some exchange of territories must be effected if a workable division is to result. Some of the non-Muslim thanas must go to East Bengal and some Muslim territory and Hailakandi must be retained by Assam.*

১৩ আগস্ট ১৯৪৭-এ গভর্নর-জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের কাছে পেশ করা রিপোর্ট ও প্রতিবেদনে র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। উক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে কুশিয়ারা নদীকে সীমান্ত করে সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমাকে দু'ভাগ করে এক প্রান্ত আসামে এবং অন্য প্রান্ত পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, কাছাড়ের হাইলাকান্দিসহ সিলেটের মাত্র তিনটি থানা—পাথারকান্দি, রাতাবাড়ি ও বদরপুর—আসামের অভ্যন্তরে আসে ; সিলেটের বাকি অংশ পূর্ববঙ্গে চলে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, **১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হলেও সীমানা-সংক্রান্ত ঘোষণা সঙ্গে সঙ্গে হয়নি ; এর জন্য আরও তিন দিন অপেক্ষা করতে হয়। চরম অনিশ্চিয়তার মধ্যে**

ঐ অঞ্চলের মানুষকে তিনটি দুঃস্বপ্নের রাত কাটাতে হয়। সিলেটের দুর্যোগ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অমলেন্দু গুহ লিখেছেন ঃ

> *Sylhet, 'the golden calf' that was sacrificed in 1874 to usher in a new province, was now once more sacrificed at the altar of a new state.*

২৩.৬.৩ ছিন্নমূল মানুষ

দেশভাগের সময় কত আতঙ্কে মানুষ প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়েছেন সেই সম্পর্কে সতীনাথ ভাদুড়ি'র (১৯০৬-১৯৬৫) 'গণনায়ক' নামের একটি অসাধারণ ছোটো গল্প আছে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভেদ-বিভেদ'-এর এই ধরনের অলোকসামান্য অনেক গল্পের সমাহার আছে, যার মধ্যে প্রথম খণ্ডে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আচার্য কৃপালনি কলোনি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশভাগ, ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে ইদানীং **'Partition historiography'** একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যেও এক ঝাঁক শক্তিশালী লেখক তীব্র অনুভূতি নিয়ে মানবিক দৃষ্টিতে অনন্য সৃষ্টি করে চলেছেন। অবশ্য এটাও ঠিক যে, নিজের ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে মমত্ববোধ ও দুর্বলতা অনেকের মধ্যেই থাকে। আসামে অবশ্য অনেক খ্যাতিমান লেখক থাকা সত্ত্বেও দেশভাগের কারণে এক সময় আসামেরই অঙ্গ সিলেট থেকে ভিটেমাটি ছাড়া তথাকথিত 'উদ্বাস্তু'দের করুণ জীবনের কাহিনি নিয়ে অসমিয়া ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়াস তেমন একটা চোখে পড়ে না। ইন্দিরা গোস্বামী রাইসম (১৭.৭ দ্রষ্টব্য)-এর মতো অসাধারণ লেখিকা যিনি মানবিক দৃষ্টিতে শ্রীমতী গান্ধির মৃত্যুর পর দিল্লির শিখনিধন যজ্ঞ থেকে শুরু করে অনেক নিষ্ঠুর বাস্তবকে সাহিত্যের আঙিনায় তুলে এনে বিশ্ববন্দিত হয়েছেন, তিনিও এই ব্যাপারে নীরব। সমাজ-বিজ্ঞানীরা অবশ্য এইসব ছিন্নমূলদের সম্পর্কে ইংরেজিতে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছেন। সিলেটের মতো Chittagong Hill Tracts বা পার্বত্য চট্টগ্রাম-এ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাস্তুহারা চাকমা উপজাতিদের দুর্দশার কাহিনি নিয়ে অসমিয়া লেখক সঞ্জয় হাজারিকার 'Refugees Within, Refugees Without' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আসলে, সিলেটের চেয়েও আরও মর্মন্তুদ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের কাহিনি।

২৩.৬.৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের কাহিনি

আসামের চা-বাগানসহ অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রায় ৫,০০০ বর্গমাইলের বিশাল পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা (যেটি বর্তমান বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায়

এক-দশমাংশ) ব্রিটিশ শক্তি ১৮৬০ সালে দখল করেছিল এবং ১৯০০ সাল থেকে এটিকে 'excluded area' বা 'বহির্ভূত এলাকা' হিসাবেই দেখা হত, কারণ এর পূর্বদিকে ছিল আসামের লুসাই পাহাড় (বর্তমান মিজোরাম)। ধর্মের আঙ্গিকে দেখলে ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাত্র ১.৫% ছিল মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং বাকি ৮৫.৫% বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, ১০% হিন্দু এবং ৩% সর্বপ্রাণবাদী (animist)। মুসলিম লিগ অথবা কংগ্রেস—কেউই ভাবতে পারেনি পার্বত্য চট্টগ্রামকে র‍্যাড্‌ক্লিফ্ কমিশন অবশেষে পাকিস্তানভুক্ত করবে। ১৩ আগস্ট ১৯৪৭-এ মাউন্টব্যাটেনের কাছে কমিশন সীমান্ত-সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করার পর দিল্লির আশপাশে যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে খুব কানাঘুষো চলছে সেই মুহূর্তেই জাতীয় কংগ্রেস ঘোষণা করে যে, 'র‍্যাড্‌ক্লিফ্-অ্যাওয়ার্ড' "lacked all sense of justice, equity and propriety" এবং সেজন্যই "ineffective, infructuous and incapable of execution in international consciousness." **সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, যিনি সিলেট-কে আসামের 'রোগগ্রস্ত অঙ্গ' বলেছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে বিপরীত ভূমিকা নিয়ে ১৩ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন-এর কাছে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে যে ঐতিহাসিক চিঠি লেখেন তাতে 'র‍্যাড্‌ক্লিফ্-অ্যাওয়ার্ড'কে** "monstrous and a blatant breach of the terms of reference" বলে বর্ণনা করে মাউন্টব্যাটেনকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন "I am urging the tribesmen (of CHT) to resist amalgamation with Pakistan by force, if necessary." এই চিঠি পেয়ে শুধু র‍্যাড্‌ক্লিফ্ নয়, স্বয়ং মাউন্টব্যাটেনও প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়েছিলেন. মাউন্টব্যাটেন-এর জীবনীকার Philip Ziegler লিখেছেন, *India's indignation at the award of the Chittagong Hill Tracts to Pakistan may have been a factor in making up Mountbatten's mind to keep the reports to himself till after independence.* এরই জন্য ১৫ আগস্ট ভারত-পাক্ সীমান্ত ঘোষিত হল না, এবং র‍্যাড্‌ক্লিফ্ অত ভয় পেয়ে দ্রুত লন্ডনে ছুটলেন। Leonard Mosley তাঁর *The Last Days of the British Raj*, কিংবা Collins and Lapierre তাঁদের *Freedom at Midnight* গ্রন্থে এইসব কাহিনির সত্যতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এতসব হুংকার, প্রতিবাদ সত্ত্বেও কী কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের শেষপর্যন্ত পাকিস্তানভুক্তি সম্ভব হল, সেটি আজও প্রশ্ন হয়ে আছে। আজও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপন্ন ছিন্নমূল মানুষ, বিশেষত চাকমা

উপজাতি বিশ্বের দরবারে বিচারের প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছে। এই কারণেই ভারত-ভাগকে **"one of the ten greatest tragedies in human history"** বলা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যদি ভারতবর্ষের মধ্যেই থাকত (যেটি থাকার সংগত কারণও ছিল), তাহলে আজ আসামসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চেহারা কিছুটা ভিন্ন হত; দেশভাগের বিষময় ফল আজকের মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের কাছে হয়তো এত তীব্রভাবে অনুভূত হত না। আসলে, 'North-East' বা 'উত্তর-পূর্বাঞ্চল' ধারণাটি দেশভাগের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল। সমগ্র দেশ থেকে জল, সড়ক ও রেলপথের মাধ্যমে যোগাযোগের সুবিধা এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে শুধু যে জিনিস-পত্রের দাম অগ্নিমূল্য বা অর্থনৈতিকভাবে আসামসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাই নয়; **বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনও ক্রমশ দানা বেঁধেছিল যেটির দিকে জাতীয় নেতৃত্ব প্রথম দিকে মোটেই নজর দেননি।** (অষ্টাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'Indo-Pak Standstill Agreement'-এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর (স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথম ছয় মাস পাকিস্তানের অভ্যন্তর দিয়ে ভারতের অন্যত্র যেটুকু যোগাযোগের সুযোগ ছিল সেটিও প্রত্যাহৃত) মানুষের দুর্গতি চরমে উঠেছিল। অবশেষে দীর্ঘ সর্পিল পথ অতিক্রম করে সরু 'Siliguri Corridor' (যেটি 'মুরগির গলা' বা 'Chicken's neck' নামে পরিচিত)-এর মাধ্যমে ভারতের অন্য অংশের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম উন্মুক্ত হয়েছিল। **আসাম সহ-সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বর্তমান গতিধারা যে কত ঘনিষ্ঠভাবে 'র‍্যাড্‌ক্লিফ্ অ্যাওয়ার্ড' ও দেশভাগের সাথে জড়িত সেটির শিকড় অন্বেষণ সমাজবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।** স্বাধীনতা ও দেশভাগের ফলে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কান্না ও যন্ত্রণা B. G. Verghese তাঁর *India's Northeast Resurgent* গ্রন্থে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

> *The physical and psychological severity of the blow (of partition) was not fully appreciated in the country and the disruption of communication and markets was not repaired soon enough. nor infrastructure developed to match the new needs...Isolated and traumatised, the Northeast turned inward. A succession of insurgencies and movements to seek separation or autonomy, assert identity or exclude foreigners and outsiders aggravated the hiatus, with the rest of the country coming to think of the Northeast with disinterest as a far-away place, perpetually troubled.*

২৩.৭ অভিবাসন সমস্যা ও 'লাইন' ব্যবস্থা (Immigration Problem and 'Line System')

২৩.৭.১ সকলেই অভিবাসী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম রাষ্ট্রপতি (১৯৩৩-৪৫) ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট (১৮৮২-১৯৪৫) এক সময় মন্তব্য করেছিলেন ঃ "Remember, remember always, that all of us, and you and I especially, are descended from immigrations and revolutionists." মন্তব্যটি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই নয় পৃথিবীর দেশে দেশে একইভাবে প্রযোজ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কে যে প্রকৃত দেশজ এবং কে বহিরাগত এটি সঠিকভাবে নিরূপণ করা খুবই কঠিন। প্রশ্নটা শুধু সময়ের উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ, কে কবে একটি বিশেষ স্থানে এসেছে। কতদিন একটা স্থানে থাকলে দেশজ বা স্থানিক হয়, সেটি নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। আসলে, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম অধ্যায়টি 'immigration' বা অভিবাসনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের তথা আসামের ইতিহাস ব্যতিক্রম হতে পারে না। তত্ত্বগতভাবে যাই সত্য হোক্, বাস্তবক্ষেত্রে একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে 'immigration'-কে এত সহজভাবে গ্রহণ করা খুবই কঠিন, কারণ "There is a huge gap between the elite and public perception on immigration."

২৩.৭.২ অতীত আসামে অভিবাসন

শত শত বছর ধরে আসামের উর্বর মাটিসহ প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দলে দলে মানুষ এসেছে এবং অন্যের সাথে মিশে গিয়ে একটি সমৃদ্ধ ও মিশ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আসামে গড়ে তুলেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চিনের দক্ষিণ অঞ্চল এবং একই সাথে গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধারা এসে কীভাবে প্রাচীন যুগে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও কামরূপ কিংবা মধ্যযুগে আহোমদের দীর্ঘ ৬০০ বছরের রাজত্বে আসামের শ্রীবৃদ্ধি করেছে কিংবা জাতিগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে সেটি আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ করেছি। সেই সময় অভিবাসনকে কেন্দ্র করে আসামে কোনো সমস্যা উদ্ভূত হয়নি। ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই ধীরে ধীরে সমস্যাটি সৃষ্টি হল। আসামের মাটির নীচে কয়লা, তেলসহ খনিজ সম্পদ, মাটির উপর চা, পাট, কাষ্ঠ সম্পদ ইত্যাদি এবং স্থল-জল-রেলসহ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ স্বার্থে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং সেটিকে কেন্দ্র করেই

অভিবাসন পর্বের সূত্রপাত হয়। যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হত, আসামে পর্যাপ্ত পরিমাণে আগ্রহী শ্রমিকের অভাব হেতু এটি ঘটেছিল। প্রথমদিকে অবশ্য অসমিয়া বুদ্ধিজীবীরা এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে তেমন সরব হননি; বরং ১৮৮৫-৮৬-তে গুণাভিরাম বরুয়া (১৭.১৮ দ্রষ্টব্য) আসামের উন্নয়নের জন্য বহিরাগত শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তার উপর ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এমনকি বিংশ শতকের প্রথম দিকে জগন্নাথ বরুয়া (১৭.২৬ দ্রষ্টব্য) Assam Banking Enquiry Committee'র কাছে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন কীভাবে অস্থানিক মানুষের উদ্যোগে বরপেটা অঞ্চল ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। কৃষি জমির ক্ষেত্রে দেখা যায়, আহোম যুগে কৃষকদের একটা অংশ ঊনবিংশ শতকে জমি কেনা-বেচার দালালিকে লাভজনক বৃত্তি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন এবং আসামে আগমনকারী মানুষের দিকেই তাদের প্রধান দৃষ্টি ছিল। অনাবাসী কৃষকরা যাতে পতিত জমি উদ্ধার করে লাভজনক ফসল চাষবাসসহ বসতি স্থাপন করতে পারে এজন্য তাদের সুদসহ ঋণ দিতে মাড়োয়ারি ব্যবসাদারদের মতো আসামের স্থানীয় বিত্তবানদের মধ্যেও একটা অংশে মহাজন শ্রেণি গড়ে উঠছিল। ভূমি রাজস্বের লোভে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আসামে অস্থানিক মানুষের এই আগমনের ধারাকে প্রতিহত করার প্রয়োজনবোধ করেনি। বরং ১৮২৬ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত আসামে নানা ধরনের ভূমি-ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছিলেন। এইভাবে দেখা যায়, একদিকে পর্যাপ্ত অনাবাদী জমি এবং অন্যদিকে আসামের স্বল্প জনসংখ্যার (সারণি ঃ '৯' দ্রষ্টব্য) কারণে প্রথমদিকে অভিবাসনকে কেন্দ্র করে তেমন জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু আসামে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের অভ্যুদয়ের ফলে ধীরে ধীরে স্থানিক এবং অস্থানিক বোধগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে।

২৩.৭.৩ আদমশুমারির চিত্র এবং Mullan সাহেবের ভবিষ্যদ্‌বাণী

ঔপনিবেশিক আমলের সেন্সাস্ বা জনগণনার উপর ভিত্তি করে একথা বলা যায়, ১৯০১ পর্যন্ত আসামে তথাকথিত বহিরাগতের ধারা তেমন তীব্র ছিল না। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের এবং পূর্ববঙ্গের সাথে আসাম যুক্ত হওয়ার পর থেকেই এই ধারা ধীরে ধীরে অনুভূত হতে শুরু করল। ১৯১২ সালে আসাম আবার তার স্বতন্ত্র মর্যাদা ফিরে পাওয়ার পর থেকেই এটি প্রকাশ্যে উচ্চারিত হল। যদিও ১৯১১ সালে সেন্সাস্-কমিশনার প্রথম অভিবাসন সম্পর্কে মন্তব্য করে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তথাপি ঐ একই সালের জনগণনায় আসামের 'সুখী' কৃষকের চিত্র যেভাবে আঁকা হয়েছিল সেটিও উল্লেখযোগ্য ঃ

The Assam peasant, living in a half-populated province, and surrounded by surplus land is indolent, good-natured and on the whole, prosperous. He raises sufficient food for his wants with very little labour, and, with the exception of a few religious ceremonies, he has no demand made upon him for money, saving the light rental of his fields.

সেন্সাস্ রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯১১ সালে আসামের মোট জনসংখ্যা ছিল ৭০,৬০,৫২১ এবং দশ বছর পরে, অর্থাৎ ১৯২১ সালে এটি বেড়ে হয়েছিল ৭৯,৯০,২৪৬ (পুং ঃ ৪১, ৪৯, ২২৮ এবং স্ত্রী ঃ ৩৮, ৪১, ০১৮) মাত্র। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ঘরছাড়া মানুষের সংখ্যা ১৯১১ সালে ছিল ১,২০,০০০ (যার মধ্যে শুধুমাত্র ময়মনসিংহ থেকেই ৩৭,০০০) এবং ১৯২১ সালে ছিল ৩,০১,০০০ (ময়মনসিংহ থেকে ১,৭২,০০০)। পূর্ববঙ্গের এইসব অস্থানিক মানুষের বিশেষত ময়মনসিংহের, বেশিরভাগই মুসলিম জনগোষ্ঠীর কৃষক এবং ব্রহ্মপুত্রের চর এলাকায় বসতি স্থাপন করে কৃষিকাজই ছিল তাদের মূল বৃত্তি। ১৯৩১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, আসামের মোট আয়তন ছিল ৬৭,৩৩৪ বর্গমাইল, মোট জনসংখ্যা ৯২,৪৭,৮৫৭ জন এবং প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৩৭ মাত্র। ১৯৩১ সালে আসামের মোট ৯২,৪৭,৮৫৭ জনসংখ্যার মধ্যে ৪,৯৬,০০০ জন ছিলেন অস্থানিক এবং এর মধ্যে শুধুমাত্র ময়মনসিংহ থেকেই এসেছিলেন ২,২১,০০০ জন। এই সংখ্যা দেখে একদিকে অসমিয়াদের মনে ভীতি এবং স্বাজাত্যবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের এক্তিয়ার-বহির্ভূত হয়ে আগামীদিনে আসামে অসমিয়ারা সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার যে ভয়ংকর চিত্র ইচ্ছাকৃতভাবে ১৯৩১ সালে আসামের সেন্সাস্ সুপারিন্টেন্ডেন্ট C. S. Mullan সাহেব এঁকেছিলেন তারপর থেকেই জাতিগত, ভাষাগত ও সাম্প্রদায়িক বৈরিতা আসামের সামাজিক ও রাজনৈতিক মানচিত্রে বিস্তৃত হতে শুরু করে। ১৯৩১ সালে বহিরাগতের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ দেখিয়ে এবং আসামের মানুষের প্রতি মেকি-দরদ দেখিয়ে Mullan মন্তব্য করেছিলেন ঃ

...The immigrant...has almost completed the conquest of Nowgong. The Barpeta subdivision of Kamrup has also fallen to their attack and Darrang is being invaded. ... Wheresoever the carcass, there the vultures be gathered together. Where there is wasteland thither flock Mymansingias.

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে Mullan সাহেব অভিবাসনকারীদের আগমনকে আগ্রাসী সামরিক বাহিনীর অভিযান এবং মাংসাশী শকুনের পালের সাথে তুলনা করে, বিশেষত ময়মনসিংহীদের (যাদের বেশিরভাগই মুসলিম) বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি ; একই সাথে পরবর্তী স্তরে ভবিষ্যদ্‌বাণীও করেছেন যে,

একমাত্র শিবসাগর জেলা ছাড়া অসামে অসমিয়াদের আগামী ৩০ বছর পরে কোনো স্থান থাকবে না। C. S. Mullan-এর ভাষায় ঃ

> *...Probably the most important event in the province (Assam) during the last 25 years—an event, moreover, which seems likely to alter permanently the whole future of Assam and...the whole structure of Assamese culture and civilization—has been the invasion of a vast horde of land-hungry Bengali militants, mostly Muslims, from the districts of East Bengal in general and Mymensingh in particular. It is sad but by no means improbable that in another 30 years Sibsagar district will be the only part of Assam is which an Assamese will find himself at home.*

আদমশুমারির একজন ইংরেজ কর্মকর্তা কীভাবে বাঙালি অভিবাসনকারীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে অসমিয়া বুদ্ধিজীবীদের মনে একদিকে ভীতি এবং অন্যদিকে বিদ্বেষ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলেন (যদিও প্রকৃত চিত্র ১৯৩১ সালে অত ভীতিপ্রদ ছিল না) সেটি এইরকম নানা ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যেই প্রমাণিত হয়। অথচ ইউরোপীয় 'প্ল্যান্টার'রা কীভাবে আসামের হাজার হাজার একর জমি বিনা পয়সায় সরকারি দাক্ষিণ্যে আত্মসাৎ করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গটি Mullan সাহেব পুরোপুরি উহ্য রেখেছিলেন। Mullan-এর উপরোক্ত মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শুধু যে ১৯৭৯-১৯৮৫'র আসাম আন্দোলনের সময় এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল তাই নয়, ১৯৯৮ সালে (৮ নভেম্বর) ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে অভিবাসন সম্পর্কে এক দীর্ঘ প্রতিবেদনেও আসামের রাজ্যপাল এস. কে. সিন্হা 'Illegal Migrants' সংক্রান্ত ১৪নং প্যারায় Mullan-কে উদ্ধৃত করেছেন। এইচ. কে. বরপূজারীর (১৭.৭৬ দ্রষ্টব্য) মতো বিশিষ্ট ঐতিহাসিকও (*North East India : Problems, Policies and Prospects*, p. 126) একই ধারা অনুসরণ করে মন্তব্য করেছেন ঃ "If the inflow of infiltrators remains unabated even at the present rate, it will be only a question of time when the indigenous Assamese will be alien in their own home." এতেই প্রমাণিত হয় Mullan সাহেবের উদ্দেশ্য মোটামুটি সফল হয়েছে এবং এটিও একই সাথে সত্য যে, অভিবাসন সমস্যাই আজকের আসামের অন্যতম জ্বলন্ত সমস্যা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ব্যয় সংক্ষিপ্ত করার কারণে ১৯৪১ সালের সেন্সাসে বিস্তৃত তথ্য না থাকলেও জনসংখ্যা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। ১৯৪১ সালে আসামের জনসংখ্যা ছিল ৯৪,১৬,০৮১; অর্থাৎ ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ এই দশ বছরে আসামের লোক সংখ্যা বেড়েছিল মাত্র ১,৬৮,২২৪ জন।

১৯৩১ সালে Mullan সাহেবের ভবিষ্যদ্‌বাণী যে কত অসাড় এতেই প্রমাণিত হয়। আসলে, ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আসামের জনসংখ্যা ১৮৮১ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে ১০০% বেড়েছিল এবং সেটির জন্য অভিবাসনকেই প্রধানত দায়ী করা হয়। একদিকে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ নানা উপায়ে তথাকথিত বহিরাগতদের আসামে বসতি স্থাপনে ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে এবং অন্যদিকে ভাষাগত ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নানাভাবে ব্যবহার করে এবং আসামের মানুষের মনে সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার ভীতি ছড়িয়ে দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে আসামকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত একইভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে। আসামের প্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবী হীরেন গোঁহাই (১৭.৭১ দ্রষ্টব্য) এই কারণেই সাম্প্রতিককালে অসমিয়া উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবনা-চিন্তার শিকড় সন্ধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আসামে অ-মুসলিম অভিবাসীদের ঐতিহাসিক অমলেন্দু গুহ চারভাগে ভাগ করেছেন ঃ (১) চা-বাগানের শ্রমিক, (২) দেশভাগের অনেক আগে পূর্ববঙ্গ থেকে আসামে আগত মানুষ, (৩) দেশভাগের শিকার বাস্তুহারা মানুষ, (৪) জীবন জীবিকার তাগিদে আগত নেপালি জনগোষ্ঠী। ভাষাগতভাবে এইসব অভিবাসিত মানুষ অ-অসমিয়া যদিও ধর্মগতভাবে আসামের মানুষের সাথে অধিকাংশের বিরোধ নেই। বিশেষত ২ এবং ৩ গোষ্ঠীভুক্ত অ-অসমিয়া জনগোষ্ঠী জমি, চাকুরি এবং স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রশ্নে কর্তৃত্বকারী উদীয়মান শিক্ষিত অসমিয়া মধ্যবিত্তদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার ফলেই প্রধানত বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল।

২৩.৭.৪ মুসলিম লিগ ও অভিবাসন

একদিকে অভিবাসিত মানুষের সাথে অসমিয়াদের ভাষাগত বিরোধ সৃষ্টি, অন্যদিকে মুসলিমদের ধর্মীয়বোধ উস্‌কে দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্মদান ব্রিটিশ মদতেই হয়েছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ এবং আসামকে পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত করার পর কীভাবে ১৯০৬ সালে ভাইসরয় লর্ড মিন্টো (১৮৪৫-১৯১৪) সিমলায় আগা খান-এর নেতৃত্বে মুসলিম প্রতিনিধিদের নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি করে মুসলিমদের রাজনৈতিক অধিকার দাবির পরামর্শ দিয়েছিলেন সে কথা কারও অজানা নয়। ১৯০৬ সালেরই ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় ব্রিটিশ মদতে তৎকালীন ঢাকার নবাব খাজা সেলিমুল্লা'র উদ্যোগে কীভাবে 'মুসলিম লিগ'-এর জন্ম হয়েছিল সে কথাও সকলে জানেন। জন্মসূত্রে 'মুসলিম লিগ'-এর মোট তিনটি বড়ো লক্ষ্য ছিল ঃ (ক) মুসলিম স্বার্থ রক্ষা (খ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের

প্রতিপক্ষ হিসাবে কংগ্রেসের প্রভাব খর্ব করা এবং (গ) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি। ব্রিটিশ আমলাদের মৌন সমর্থনের জন্যই আসামে মুসলিমদের দলে দলে অভিবাসন সম্ভব হয়েছিল; আবার একই সাথে 'লাইন সিস্টেম' সহ বিভিন্ন নিয়ম-কানুন জারি করে আসামের মানুষের কাছে ব্রিটিশ আমলারা 'ত্রাণকর্তা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করতেন। এই ভণ্ডামির মুখোশ উন্মুক্ত হয়ে যায় যখন স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে 'ক্যাবিনেট মিশন'-এর সময় 'গ্রুপিং'-এর নামে (২৩.৪ দ্রষ্টব্য) প্রধানত ভাইসরয় ওয়াভেল-এর উদ্যোগে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আসামকে মুসলিম-প্রধান দেশ হিসাবে গণ্য করে পরোক্ষে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার ষড়যন্ত্র প্রায় পাকা করে ফেলা হয়েছিল। শাদুল্লাহ'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ এই একই ওয়াভেল আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন অধিক ফসল ফলানোর অভিযান চালানো হচ্ছিল সেই সময় আসামের শাদুল্লাহ মন্ত্রীসভাকে ব্যঙ্গ করে 'Viceroy's Journal' (২২ ডিসেম্বর ১৯৪৩)-এ মন্তব্য করেছিলেন ঃ "The chief political problem is the desire of Muslim Ministers of Assam to increase the immigrations into uncultivated Government Lands in Assam under the slogan of 'Grow more food,' but what really is to 'Grow more Muslim'." এই কারণেই মন্তব্য করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ১৯৩৯ সালে জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশদের সাথে অসহযোগিতার পথ প্রশস্ত করার জন্য যেভাবে প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলিকে বাধ্যতামূলক পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিল, আসামের ক্ষেত্রে সেটি প্রয়োগ করা ছিল 'ঐতিহাসিক ভুল'। সুভাষচন্দ্র বসু (যদিও কংগ্রেস সভাপতির পদ ঐ সময় পরিত্যাগ করেছিলেন) জাতীয় কংগ্রেসের ঐ নির্দেশের বিরোধিতা করেছিলেন। কংগ্রেসের নির্দেশে বরদোলই মন্ত্রীসভা পদত্যাগে বাধ্য হওয়ার ফলেই মুসলিম লিগ নেতৃত্বাধীন শাদুল্লাহ মন্ত্রীসভা বিধানসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন দীর্ঘ সময়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থায় আসামের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ পেয়েছিল এবং ঐ সময়েই ব্যাপকভাবে 'মুসলিম অনুপ্রবেশ' আসামে ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের দ্বিমুখী ভূমিকা সম্পর্কে নীরব থেকে শুধুমাত্র 'বহিরাগতে'র উপর দোষারোপ যথার্থ নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, আসামে সকল মুসলিম কিন্তু অস্থানিক বা 'অনুপ্রবেশকারী' নয়। বঙ্গদেশের প্রথম মুসলিম শাসক ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজি (১২০১-১২০৬) যখন ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে কামরূপ অভিযান শুরু করেন সেই সময় থেকে আসামে তুর্কি, আফগান, আরবি, ফার্সি প্রভৃতি

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আগমনের ধারা অব্যাহত থাকে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিশ্রিত হয়ে এঁরাই আসামের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহাবস্থান ও মিলনের একটি নতুন সৌধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। সুতরাং ত্রয়োদশ শতক থেকে আসা ঐসব স্থানিক মুসলিম জনগোষ্ঠী—যারা গুয়াহাটিসহ জোড়হাট, গোলাঘাট, শিবসাগর, ডিব্রুগড় প্রভৃতি জেলার বাসিন্দা—তাদের সাথে ময়মনসিংহ বা পূর্ববঙ্গ থেকে আসা 'জমি-ক্ষুধার্ত' মুসলিমদের একটা গুণগত পার্থক্য আছে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক আঙ্গিকে 'মুসলিম' বলে যদি স্থানিক এবং অস্থানিকদের একীভূত করা হয় যেটি বাংলা ভাষা-ভাষীদের ক্ষেত্রে 'আসাম আন্দোলনের' সময় (১৯৭৯-৮৫) হয়েছে, তাহলে অভিবাসিত্ব নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে যায়। আসামে সকল মুসলিম যে 'মুসলিম লিগ'-এর সমর্থক নন, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অনুগামীও যে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে আছেন সেটি বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু ভাষাগত বা ধর্মীয় আঙ্গিকে বিচার করলে স্থানিক এবং অস্থানিককে সাধারণত একই বন্ধনীভুক্ত করা হয়। (সারণি ঃ '১১' দ্রষ্টব্য)

সাধারণত অভিযোগ করা হয়, ১৯৩৯-৪১ সালে আসামের শাদুল্লাহ্ সরকার পূর্ববঙ্গের ঘরছাড়া কৃষকদের (যার মধ্যে বেশিরভাগই মুসলমান) এক লক্ষ বিঘা জমি আসাম উপত্যকায় বরাদ্দ করেছিল। এই অভিভাসীরা কামরূপ, গোয়ালপাড়া, দরং, নওগাঁও এবং নর্থ লখিমপুরের কিছু স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং সংরক্ষিত গো-চারণভূমিও দখল করে। ১৯২০ সালে আসাম সরকার 'লাইন-ব্যবস্থা' চালু করে নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার বাইরে অনাবাসী কৃষকদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করলেও সেটি কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। পূর্ববঙ্গের কৃষকনেতা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি (১৮৮০-১৯৭৬) একই সাথে পূর্ববঙ্গ ও আসামে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেন। পূর্ববঙ্গের অত্যাচারী জমিদার ও সুদখোর মহাজনের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে পলাতক ও সর্বহারা আসামের এইসব অস্থানিক কৃষক ছিল ভাসানির শক্তির প্রধান উৎস। ১৯৩৭ সালে মৌলানা ভাসানি মুসলিম লিগে যোগ দেন এবং আসাম মুসলিম লিগের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন (পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে 'আওয়ামি মুসলিম লিগ' নামে নতুন দল তৈরি করেন)। 'লাইন ব্যবস্থা' কার্যকরী করার প্রশ্ন নিয়ে শাদুল্লাহ'র সাথে ভাসানির কিছুটা মতবিরোধের পর ভাসানি প্রায় যুদ্ধের ডাক দিয়ে আওয়াজ তোলেন ঃ

চল, চল, দরং চল,
জঙ্গল ভাঙ্গিয়া আবাদ কর,
পতিত মাটি দখল কর।

ভাসানি'র এই ডাক ও অভিযানকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 'Muslim invasion of Assam' বা 'A silent and invidious invasion of Assam' হিসাবেই দেখা হয়। অভিবাসনকে কেন্দ্র করে আসামের সমাজ জীবনে, বিশেষত আসামের মধ্যবিত্তদের মধ্যে, যে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল সেটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

২৩.৭.৫ 'লাইন সিস্টেম'

যেহেতু ১৯১১ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ নাকচ এবং আসাম স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে ১৯১২ সালে পুনর্বার আত্মপ্রকাশের পর থেকে অভিবাসন প্রক্রিয়া তথা মুসলিম জনসংখ্যা আসামে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল, এরই জন্য আসাম উপত্যকার জেলাগুলিতে (গারো পাহাড়সহ) ১৯১১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত মুসলিম জনসংখ্যার হিসাব সারণি ঃ '১১'-তে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রিটিশ-শাসিত আসামের পাহাড়ে ১৮৭৩ সালে 'ইনার লাইন রেগুলেশন' প্রবর্তিত হয়েছিল (২১.৯.২ দ্রষ্টব্য) এবং পরবর্তী সময়ে ঐ পাহাড়গুলি 'Excluded Areas' বা 'বহির্ভূত এলাকা' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল ; ফলে অন্যদের অবাধ যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেক নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু সমতলের ক্ষেত্রে ঐরকম কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। নওগাঁও এর ডি. সি.'র পরামর্শ অনুযায়ী, **১৯২০ সালে সমতলের ক্ষেত্রে আসাম সরকার 'লাইন সিস্টেম' প্রবর্তন করেছিল** এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল, কিছু অভিবাসনবিধি প্রয়োগ করে স্থানিক মানুষের এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অভিবাসীদের বিচ্ছিন্ন করা এবং নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে তাদের বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। কিন্তু আসামের প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের মতে, 'লাইন সিস্টেম'-এর লাইনটি কিছুটা 'ম্যাকমোহন লাইন'-এর মতোই ছিল পুরোপুরি কাল্পনিক এবং এরই জন্য পুরোপুরি ব্যর্থ। ভট্টাচার্যের ভাষায় ঃ *This measure (Line system) was a total failure. It only created unnesessary and expensive bitterness between the immigrants and the indigenous people.* যাই হোক্ অন্যদের থেকে অভিবাসীদের বিচ্ছিন্ন করার এই নীতিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষী ঔপনিবেশিক সরকারের 'apartheid' নীতির সাথে তুলনীয় বলে আসামের মুসলিম লিগ প্রচার করত, এবং 'লাইন' ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মতবিরোধ তুঙ্গে

উঠেছিল। একই ভাবে এই সময় থেকেই অসমিয়া উগ্র জাতীয়তাবাদের তথা বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রকাশ অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরির (১৭.৩. দ্রষ্টব্য) উদ্যোগে প্রথম শুরু হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে লেখা এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে আসামের রাজ্যপাল এস. কে. সিন্‌হা উল্লেখ করেছিলেন, ক্রমাগত বাইরের মানুষ আসার ফলে অসমিয়া মননে সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার ভীতি থেকেই এইরকম উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা একসময় প্রসারিত হয়েছিল। সিন্‌হা'র ভাষায় ঃ *The Assamese fear of losing their identity and being swamped by Bengalis goes back to the British decision to annul the partition of Bengal in 1911. This fear had been aroused both by Bengali Hindus dominating the administration and the professions and the Bengali Muslims altering the demography of the province.* ব্রিটিশ শাসিত আসামে ১৯৩০-এর দশক থেকে অসমিয়া নেতৃত্বের দুটি মুখ্য দাবি ছিল ঃ (১) ক্রমাগত মুসলিম অভিবাসনকে বন্ধ করা ; (২) শাসনব্যবস্থায় ও অফিস আদালতে বাঙালি হিন্দুদের আধিপত্য থেকে আসামকে মুক্ত করার উপায় হিসাবে সিলেটকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

আসাম বিধানসভার নির্বাচনে প্রচার উপলক্ষ্যে ১৯৩৭ সালের নভেম্বরে জওহরলাল নেহরু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এলে তাঁর কাছে 'অসমিয়া ডেকা দল' এবং 'অসমিয়া সংরক্ষণী সভা'র পক্ষ থেকে দুটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়। 'ডেকা দল' ছয়-দফা দাবির মধ্যে উপরোক্ত দুটি দাবির উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি ও নীলমণি ফুকন-এর নেতৃত্বাধীন 'অসমিয়া সংরক্ষণী সভা' উপরোক্ত দুটি মুখ্য দাবি ছাড়াও নেহরু'কে অবগত করেন যে, বহিরাগত মুসলিমরা অসমিয়া ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে একাত্মতা চাইলেও তাদের বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি 'গ্রহণ করতে বাধ্য' করা হচ্ছে, যেটি অসমিয়া অস্তিত্বের পক্ষে ধ্বংসাত্মক ('disastrous to Assamese interests')। **এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে প্রয়োজনে ভারত থেকে আসামকে বিচ্ছিন্ন করার দাবিও নেহরুর কাছে 'অসমিয়া সংরক্ষণী সভা' পেশ করে।** উক্ত 'সভা'র ভাষায় ঃ

> *...as a means of saving the Assamese race from extinction a considerable section of the Assamese intelligentsia had even expressed their minds in favour of the secession of Assam from India. This is how the present situation appears to the average Assamese, and they look to you, the National Congress, to help the Assamese to get out of these dangers.*

২৩.৭.৫.১ অভিবাসন সম্পর্কে জওহরলাল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ

আসামের জটিল সমস্যা সম্পর্কে সেই সময় যথেষ্ট ওয়াকিবহাল না-থাকার কারণে নেহরু প্রথম দিকে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। ভারত থেকে আসামের বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবিকে সমর্থন না করলেও অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার প্রশ্নে নেহরু অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন এবং সিলেটকে আসাম থেকে পৃথক করার যৌক্তিকতাও মেনে নেন। তবে অভিবাসিত মানুষ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ভিন্ন ছিল। ১৯৩৭ সালের ১ ডিসেম্বর আসাম কংগ্রেসের সভাপতি বিষ্ণুরাম মেধি'র কাছে এক পত্রে নেহরু লেখেন, আসামের মতো উর্বর জমি-প্রধান রাজ্যে নিতান্ত মুষ্টিমেয় কৃষক-শ্রমিক থাকার কারণে বহিরাগতর সাহায্য নিয়েই উন্নয়নের অগ্রগতি অব্যাহত রাখা সম্ভব; তবে 'Line System' অভিবাসনবিধি প্রয়োগ করা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা দরকার। নেহরুর ভাষায় ঃ

> *...Indead, even from the point of view of developing Assam and making it a wealthier province, immigration is desirable. The real problem is how to control and organize this immigration.*

নেহরুর উপরোক্ত মন্তব্য আসামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং আসামের কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশও নেহরুর সমালোচনা শুরু করেছিলেন। বিরিঞ্চিকুমার বরুয়ার (১৭.৪৬ দ্রষ্টব্য) মতো প্রখ্যাত পণ্ডিতও ২০ জুলাই ১৯৪৭ (অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে) ঘোষণা করেছিলেন ঃ

Eternal Vigilance is the price of liberty. Culturally, racially, linguistically, every non-Assamese is a foreigner in Assam. In this connection we must bear in mind that Assam from the very ancient times never formed a part of India. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই 'foreigner' বা 'বিদেশি' শব্দটি ছিল পরবর্তী সময়ে 'আসাম-আন্দোলনের' মূল আওয়াজ। আসামের নেতৃত্বের কাছে উদ্বেগজনক ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যা ঃ যেটি ১৮৮১ সালে ৯% থেকে বাড়তে বাড়তে ১৯৩১ সালে ১৯% ১৯৪১ সালে ২৩% এবং ১৯৫১ সালে ২৪% দাঁড়ায়। শুধুমাত্র আসামের নেতৃবৃন্দই নয়, জাতীয় নেতাদের মধ্যে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ (১৮৮৪-১৯৬৩) প্রথম ১৯২০'র দশকে আসামের এই সমস্যাটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং বিহারি হিন্দু কৃষকদের আসামে ঢুকিয়ে পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের মোকাবিলা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এইভাবে **অভিবাসন সমস্যাটি সাম্প্রদায়িক সমস্যায় পরিণত** হয়েছিল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ *India Divided* গ্রন্থেই নয়, তাঁর *Autobiography* তেও (pp. 259-60) প্রসঙ্গটি এইভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

I sounded the Assamese on the subject and they welcomed it...some thought it better to have the Hindus of Bihar than the Muslims of Mymensingh....They welcomed the idea also because by themselves the Assamese were unable to bring the land under plough....The influx from Mymensingh could be countered only by Bihar Hindus to settle down on the land.

শুধুমাত্র লিখেই ক্ষান্ত হননি ; অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ'র বিবরণ অনুযায়ী রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর দাদা মহেন্দ্রপ্রসাদ এবং বিশিষ্ট বন্ধু অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ ও জনৈক বাঙালি হিন্দুর যৌথ উদ্যোগে আসামের ১,০০০ একর পতিত ভূমি দখলসহ জঙ্গল পরিষ্কার ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিকাজের জন্য একটি ট্রাকটরও পাঠিয়েছিলেন। এই যৌথ উদ্যোগ ও পরীক্ষা ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও রাজেন্দ্রপ্রসাদ কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত আসামে আগুয়ান মুসলিম কৃষকদের অভিযান ঠেকানোর পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে অবিচল ছিলেন।

২৩.৭.৫.২ হোকেনহুল্ কমিটির রিপোর্ট

'লাইন সিস্টেম'কে কেন্দ্র করে নিয়মিত বিবাদ-বিসংবাদ এবং হিন্দু-মুসলিম ও বাঙালি অসমিয়া সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হওয়ায় আসামে ইউরোপিয়ান পার্টির নেতা F. W. Hockenhull-এর নেতৃত্বে ১৯৩৭ সালে একটি 'Line System Committee' গঠিত হয় এবং ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারিতে কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করে। Hockenhull কমিটি 'লাইন' ব্যবস্থা অব্যাহত রাখাসহ স্থানিক মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেকগুলি সুপারিশ করে। কিন্তু কী শাদুল্লাহ সরকার কী ক্ষণকালের জন্য ক্ষমতায় আসীন বরদোলই সরকার (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-১৬ নভেম্বর ১৯৩৯) স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ইতস্তত করে কারণ, সকলেরই লক্ষ্য ছিল 'Vote-bank'-এর উপর। যাই হোক্ শেষপর্যন্ত পদত্যাগের আগে বরদোলই মন্ত্রীসভা ৪ নভেম্বর ১৯৩৯ গেজেটে ঘোষণা করে যে, (১) গ্রামের অভ্যন্তর বা চিহ্নিত গোচারণক্ষেত্রে অস্থানিক মানুষের দখল নাকচ, (২) প্রাপ্ত পতিত জমিতে ভূমিহীনসহ ১৯৩৮-এর ১ জানুয়ারির আগে আসা দেশছাড়া মানুষের জন্য পরিবার পিছু ৩০ বিঘা ভূমি ব্যবস্থার সুযোগ, (৩) উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ব্লক থেকে অস্থানিক মানুষের উচ্ছেদ। Hockenhull কমিটির সুপারিশ মোতাবেক উক্ত গেজেট ঘোষণার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা কঠিন হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর আসামের টালমাটাল রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কে ঐ সিদ্ধান্ত রূপায়িত করবে সেটিকে কেন্দ্র করে ঘোর অনিশ্চয়তা দেখা দিল। ইতিমধ্যে মৌলানা ভাসানির নেতৃত্বে আসামে ১৯৩৯-এর নভেম্বরে

ধুবরির কাছে ঘাগমারিতে প্রাদেশিক মুসলিম লিগের প্রথম সম্মেলনে 'Line system'-এর বিরুদ্ধে জেহাদ এবং আইনটিকে অবৈধ ঘোষণা করে অবিলম্বে এটি প্রত্যাহারের দাবি উত্থাপন করা হয়। এদিকে আসাম বিধানসভায় ২৬ ফেব্রুয়ারির ১৯৪০ ভীমাবর দেউরি তাঁর বাজেট বক্তৃতায় 'Line System' যথাযথভাবে উপজাতি স্বার্থে ব্যবহারে অক্ষমতার জন্য বরদোলই ও শাদুল্লাহ উভয় সরকারের উপর দোষারোপ করে ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করেন। অন্যদিকে ২৯ মার্চ ১৯৪০-এ *Assam Tribune* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে 'Line System' অকেজো করার জন্য শাদুল্লাহ্ সরকারের নীতিকে 'a completely anti-Assamese policy' হিসাবে চিত্রিত করা হয়। এইভাবে Hockenhull কমিটির সমস্ত উদ্যোগ ও সুপারিশ প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন হয়ে যায়।

২৩.৭.৫.৩ ভূমি উন্নয়নের প্রশ্ন ও ১৯৪১-র জনগণনা

উপরোক্ত অস্থির ও জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে শাদুল্লাহ সরকার ১৯৪০ সালের ৩০ মে ১ জুন একটি সর্বদলীয় সভা ডাকতে বাধ্য হয় এবং একটি 'Land development scheme' বা ভূমি উন্নয়ন কর্মসূচিও গৃহীত হয়। পতিত জমিগুলি 'ব্লক' হিসাবে চিহ্নিত করে ১৯৩৮ সালের ১ জানুয়ারি পর আগত অভিবাসীদের সমস্ত অধিকার নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া Hockenhull কমিটির অন্যান্য সুপারিশও খতিয়ে দেখার ও কার্যকারী করার কথা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বরদোলই উল্লেখ করেন। প্রাথমিক স্তরে নওগাঁও-এ পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার উদ্যোগ নেওয়ার পর আবার জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং ১ ডিসেম্বর ১৯৪১-এ লখেশ্বর বরুয়া আসাম বিধানসভায় শাদুল্লাহ্ সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার প্রস্তাব আনেন। সর্বদলীয় সভায় সিদ্ধান্ত যাই হোক্, বাস্তবে সেগুলি রূপায়িত করার সদিচ্ছার অভাবে এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ডামাডোলে Hockenhull কমিটির সুপারিশের মতো অবশেষে সেটিও নিরর্থক হয়ে যায়। সরকারের পক্ষ থেকে মুসলিমদের গোপনে এই আশ্বাসও দেওয়া হয় যে, বাইরে যতই নিয়ম-কানুনের বাধা থাকুক, প্রকৃতপক্ষে 'লাইন' ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে, কীভাবে ভাইসরয় ওয়াভেল মন্তব্য করেছিলেন যে, শাদুল্লাহ মন্ত্রীসভার কাছে 'Grow more food' অভিযান প্রকৃতপক্ষে 'Grow more Muslim' অভিযানে পরিণত হয়েছিল। আসলে, ভূমি-বণ্টন সংক্রান্ত নীতির সাথে ১৯৪১ সালের সেন্সাস্-এর প্রশ্নটিও সেই সময় জড়িয়ে গিয়েছিল। যদিও যুদ্ধজনিত কারণে ১৯৪১ সালে আসামে তেমন

ব্যাপকভাবে জনগণনার কাজ হয়নি এবং প্রকৃত চিত্রও ঠিক মেলে না, তথাপি মুসলিম লিগের নেতৃত্বাধীন শাদুল্লাহ সরকারের একটি ঘোষিত নীতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতদিন আসামের পাহাড় বা সমতলের উপজাতি জনগোষ্ঠী নিজেদের ধর্ম হিসাবে হিন্দু বা খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ ইত্যাদির উল্লেখ করত; এর ফলে আসামে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি হত। অর্থাভাবের অজুহাত দেখিয়ে এত বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ না করে, উপজাতিদের শুধুমাত্র সম্প্রদায় হিসাবে এরা ধর্মের প্রশ্নে 'animist' বা সর্বপ্রাণবাদী হিসাবে চিহ্নিত করার নির্দেশ মহঃ শাদুল্লাহ্ দেন এবং ১ ডিসেম্বর ১৯৪১ আসাম বিধানসভায় এর কারণ এইভাবে ব্যাখ্যা করেন ঃ

The original intention was to classify the population by religion as well as communities. But funds were not found to be adequate for the double classification by the Government who ordered only the classification by communities. আসলে, সম্প্রদায় হিসাবে পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকলে ধর্ম সম্পর্কে মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায়; কিন্তু 'animist' বা অহিন্দু হিসাবে চিত্রিত করলে হিন্দুদের সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পায়। শাদুল্লাহ'র অভিসন্ধি বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না ; কারণ আসামে মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে চিত্রিত করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য, যাতে জিন্না সাহেবের পাকিস্তান আন্দোলনে আসামকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে 'ক্যাবিনেট মিশন'-এর সময় কত জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল সেটি আমরা আগেই লক্ষ করেছি। যাই হোক, শাদুল্লাহ'র উপরোক্ত ঘোষণার সাথে সাথেই গোপনীথ বরদোলই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি স্বাধীন সংস্থার মাধ্যমে সমস্ত ব্যাপারটি তদন্ত করিয়ে সংশোধিত জনগণনা অবিলম্বে তৈরি করার দাবি দোলেন। ১৯৪১ সালের ৩১ জানুয়ারি *Assam Tribune* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে শাদুল্লাহ সরকারের 'ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের' বিরুদ্ধে হিন্দু-ঐক্যের ডাক দেওয়া হয়। সেই সময় আসামে প্রভাবশালী 'হিন্দু মহাসভা' কাল-বিলম্ব না করে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়। ১৯৪১ সালের শেষদিকে 'আসাম প্রভিন্সিয়াল হিন্দুসভা' আয়োজিত গুয়াহাটির এক সভায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রধান পুরোহিত মারাঠি নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর (১৮৮৩-১৯৬৬) জ্বালাময়ী ভাষণ দেওয়ার পর আসামের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। উপরোক্ত উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ১২ ডিসেম্বর ১৯৪১ শাদুল্লাহ সরকার পদত্যাগ-পত্র পেশ করতে বাধ্য হয়। ১৯৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২ সালের ২৫ আগস্ট পর্যন্ত আসাম গভর্নরের অধীনে শাসিত হয় (সারণি ঃ '২' দ্রষ্টব্য)

২৩.৭.৫.৪ 'লাইন সিস্টেম'-এর সমাধি

কিন্তু বেশিদিন শাদুল্লাহ-কে ক্ষমতার বাইরে থাকতে হয়নি; কারণ তিনি ছিলেন ব্রিটিশ শক্তির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। ১৯৪২ সালের ২৫ আগস্ট আবার শাদুল্লাহ'র নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় এবং সেটি ১৯৪৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত (মাঝে কয়েক ঘণ্টার পদত্যাগ সংক্রান্ত বিরতি সহ) টিকে থাকে। এই শেষবারে সংরক্ষিত বনভূমি বা গোচারণ ক্ষেত্রেও অভিবাসন শুরু হয় এবং শাদুল্লাহ প্রায় মরিয়া হয়ে 'Line System'-কে পরোক্ষভাবে লণ্ডভণ্ড করে দেন। ১৯৪৪ সালের ২৫ আগস্ট অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি এবং নীলমণি ফুকনের নেতৃত্বাধীন 'আসাম জাতীয় মহাসভা' "Assam Land Policy Protest Day" বা প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেয়; কিন্তু আসামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে অস্ত্রের বিকট ঝনঝনানি শব্দে সমস্ত প্রতিবাদের কণ্ঠ প্রকৃতপক্ষে ডুবে যায়। সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আসামের বিভিন্ন অংশে কিছু মৌজাদার, শাসক ইংরাজ শক্তির মতো ভূমি রাজস্বের লোভে, গোয়ালপাড়া এলাকার কিছু জমিদারও অনাবাসী মানুষের মধ্যে চর এলাকার কিছু জমি ইচ্ছাকৃতভাবে বণ্টন করে 'Line system'-কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে শুরু করায় পুরো ব্যবস্থাটাই প্রকৃতপক্ষে ভণ্ডুল হয়ে যায়। ঐতিহাসিক অমলেন্দু গুহ'র ভাষায় ঃ

> *Line or no Line, the law of competition was in full operation. Whatever feeble attempts were made to set up Lines in Goalpara, for example, were found to he self defeating. Local people there could not be stopped from selling their lands even in 'Lined' villages to immigrants at high prices.*

'Line system' ভেঙে যাওয়ার ফল যে কত বিষময় হয়েছিল স্বাধীনোত্তর কালে আসামের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য এটাও ঠিক, স্বাধীনতা অর্জনের ঠিক এক বছর আগে মুসলিম লিগের 'Direct Action'-এর আওয়াজকে কেন্দ্র করে কলকাতাসহ পূর্ববঙ্গের ব্যাপক অঞ্চল দাঙ্গার আগুনে ক্ষত বিক্ষত এবং অত উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আসাম দাঙ্গা মুক্ত ছিল। যাঁরা মনে করতেন, সিলেট আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন এবং দেশভাগের পর অভিবাসিত্ব নিয়ে আসামের জ্বলন্ত সমস্যা হয়তো চিরতরে বিলুপ্ত হবে তাঁরা যে কত ভুল পরবর্তী সময়ে আসাম ইতিহাসের গতিপথ সেটাই প্রমাণ করে ; কারণ আজও নানাভাবে অভিবাসন সমস্যা অব্যাহত। প্রাক্-স্বাধীন ও স্বাধীনোত্তরকালে আসামের এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কত ধরনের বিধি চালু করা হয়েছে—যেমন, (১) The Foreigners' Act, 1946, (২) The Immigrants (Expulsion from

Assam) Act, 1950, (৩) The Foreigners' (Tribunals) Order, 1964, (৪) The Prevention of Infiltration from Pakistan Plan, 1964 (সংক্ষিপ্তভাবে যেটি PIP নামে পরিচিত), (৫) The Illegal Migrants (Detemination by Tribunals) Act, 1983 (সংক্ষিপ্তভাবে IMDT) ইত্যাদি—কিন্তু এতসব বিধি থাকা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশের ধারা রুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, বর্তমান আসামের (অনেকবার খণ্ডিত হওয়ার পর) মোট জনসংখ্যা ২,৬৬,৫৫,৫২৮ এবং এর মধ্যে ৩০.৯% মুসলিম জনগোষ্ঠীভুক্ত এবং অসমিয়া ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ৫০%-এর কিছুটা নীচে (১,৩০,১০,৪৭৮ অসমিয়া ভাষী এবং ৭৩,৪৩,৩৩৮ বাংলা ভাষী)।

আসামে অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত বর্তমান জটিলতার জন্য ঐতিহাসিক এইচ. কে. বরপূজারী রাজনৈতিক দলগুলির 'ভোট ব্যাংক' নীতিকে প্রধানত কংগ্রেস দলকে অভিযুক্ত করেছেন। বরপূজারীর ভাষায় ঃ

> *...The majority of them (political parties) are not prepared to alienate the immigrants as they form the powerful vote bank. The Congress, which had ruled the country for decades, had always found the foreigners a vote bank at the time of election. And thus, the larger interest of the country, including its security and integrity, were sacrificed to serve party interests.*

'ভোট ব্যাংক নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। 'বিদেশি বিতাড়ন'-এর নামে দীর্ঘ ৬ বছর (১৯৭৯-৮৫) উগ্র জাতীয়তাবাদী ব্যর্থ আন্দোলন, ১৯৮৫'র আসাম চুক্তি এবং ঐ একই শক্তির ('অসম গণপরিষদ') ১৯৮৫-১৯৮৯ এবং ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত আসামের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পরেও আজ কেন তথাকথিত 'বিদেশি' সমস্যাই আসামের জ্বলন্ত সমস্যা—এ প্রশ্ন থেকেই যায়। আসলে, আসামের জাতিগত সমস্যা এত জটিল এবং শিকড় এত গভীরে যে এর কোনো চটজলদি সমাধান সূত্র বের করা সম্ভব নয়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শিল্প ও সংস্কৃতি (Art and Culture)

শিল্পে পৃষ্ঠপোষকতা

'Art' বা শিল্পের ইতিহাসে প্রাচীন যুগ থেকে আজ অবধি 'patronage' বা পৃষ্ঠপোষকতার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সাধারণত রাজন্য আমলেই স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ইত্যাদি সুকুমার বা চারু শিল্প বিকশিত হয়েছিল। ধনাঢ্য ব্যক্তি বা শাসকশ্রেণি তাঁদের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আত্মতৃপ্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অনেক সময় এইসব সুকুমার শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। রাজা-মহারাজা সম্রাট বা বাদশাহরা অনেক সময় রাজতন্ত্রে দেবত্ব আরোপ করতেন ('Divine Theory of Kingship') এবং নিজেদের দেবতার সমকক্ষ বলে প্রচার করতেন। এটি প্রমাণ করার জন্যই বড়ো বড়ো মাপের শিল্প-কর্ম প্রয়োজন ছিল, যেগুলি দেখে মানুষ অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে এবং স্রষ্টার বন্দনা গাইবে। ধর্মীয় শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায়, দেবতার মহিমা কীর্তনের চেয়ে যার আর্থিক বদান্যতায় শিল্প-গুলির সৃষ্টি হয়েছিল সেটির কীর্তন ও প্রচার অনেক সময় মুখ্য স্থান লাভ করে। যুগে যুগে পৃষ্ঠপোষকদের পরিচয় ভিন্ন হয়েছে—সেটি অতীতের ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বর্তমানে 'কর্পোরেট' জগতের 'ক্যাপ্টেন'। আমেরিকান কবি R. W. Emerson (১৮০৩-১৮৮২)-এর একটি বিখ্যাত মন্তব্য আছে ঃ *Each of the arts whose office is to refine, purify, adorn, embellish and grace life is under the partronage of a muse, no god being found worthy to preside over them.* শিল্পীর (অনেক সময় তাঁদের নাম অজানাই থেকে যায়) সৃষ্টি ধনাঢ্য ব্যক্তি আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য কিনে কীভাবে নিজেকে শিল্পীর চেয়েও বড়ো বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন সেটি আর এক আমেরিকান কবি Ezra Pound (১৮৮৫-১৯৭২) এইভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

> *If a patron buys from an artist who needs money, the parton then makes himself equal to the artist, he is building art into the world, he creates.*

২৪.১ বিভিন্ন সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্প নিদর্শন

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২.৪), আসামের মুদ্রা (২.৪.১), লিপি (২.৪.২) এবং সৌধ ও শিল্প স্থাপত্য (২.৪.৩) ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। স্থাপত্য ও সৌধ সম্পর্কে দুটি স্পষ্ট বিভাজন সম্ভব ঃ (১) প্রাক-আহোম, (২) আহোম যুগ। আসামের শিল্প-সংস্কৃতি বিভিন্ন ধারার একটি অন্বিত বা মিলিত রূপ মাত্র এবং এই মিশ্র ঐতিহ্যের মধ্যে কতটুকু স্থানিক এবং কতটুকু অস্থানিক সেটি সঠিকভাবে নিরূপণ করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। ইদানীংকালে যাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, আসাম চিরদিনই ভারতবর্ষের অন্য অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন এবং আসামের সবকিছুই মৌলিক এবং স্বকীয়তা বা নিজস্বতায় মহিমান্বিত, তাঁদের ঐসব অর্থহীন দাবির বিরুদ্ধে শুধু লিখিত দলিলপত্রই নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক—বিশেষত স্থাপত্য শিল্পের সৃষ্টিগুলির—ভগ্নাবশেষ আজও সাক্ষ্য দেয়। আসামে প্রাক-আহোম যুগের স্থাপত্যের ঐতিহ্য প্রায় ৭০০ বছরের ঃ (১) প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপে বর্মন রাজত্ব (আনুমানিক ৩৫০-৬৫০ খ্রিস্টাব্দ), (২) শালস্তম্ভ শাসন (আনুমানিক ৬৫৫-৯০০ খ্রিস্টাব্দ), (৩) কামরূপের পাল রাজত্ব (আনুমানিক ৯০০-১১০০ খ্রিস্টাব্দ)। বর্মন বংশের ভাস্করবর্মনের (আনুমানিক ৬০০-৬৫০ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (৬০২/০৩-৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ) আসাম ভ্রমণে এসে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। কামরূপে পালদের শেষ অধ্যায়ের দুর্বল শাসন ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। প্রাক-আহোম যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন অক্ষত অবস্থায় নেই ; তবে ভগ্নাবশেষ থেকে স্থাপত্যের ধারা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। ষষ্ঠদশ থেকে ঊনবিংশ শতকের অনেক স্থাপত্য-নিদর্শন অবশ্য আজও অভঙ্গুর অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর শুরু হয় আহোমদের দীর্ঘ ৬০০ বছরের (১২২৮-১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ) শাসন, প্রধানত আসামের উপরিভাগে। অন্যদিকে পশ্চিম আসামে ও উত্তরবঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় কোচদের আধিপত্যে কামতা রাজ্য। মুঘলদের অধীনস্থ হয়ে আসামের হাজো এলাকায় কোচ শাসনের সূত্রপাত হলেও এবং অবশেষে কোচবিহারের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হলেও শেষপর্যন্ত আহোমদের দখলে কোচ-হাজো চলে আসে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে আহোম শাসন আসামের উপরিভাগ থেকে ক্রমশ নীচের দিকে প্রসারিত হতে শুরু করে এবং আহোম রাজা সুখরুংফা বা স্বর্গদেও রুদ্রসিংহের (১৬৯৬-১৭১৪ খ্রিস্টাব্দ) সময় এটি চরমে

ওঠে। এরই জন্য আহোম স্থাপত্যের সাথে আসামে কোচ স্থাপত্যও একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। (প্রথম খণ্ডের ১.৭ দ্রষ্টব্য)।

অন্যান্য যেসব শক্তি একসময় আসামে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল তাদের মধ্যে চুটিয়া ও বোড়ো-কাছাড়িদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য এবং আসামের স্থাপত্যে এদেরও অনেক অবদান আছে। সুবনশিরি নদীর তীরে সাদিয়া অঞ্চলে (বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশে) এক সময় চুটিয়াদের আধিপত্য ছিল (প্রথম খণ্ডের ৩.৯ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চুটিয়ারা অবশেষে আহোমদের অধীনস্থ হতে বাধ্য হয়। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (৩.১০) আসামের বোড়ো-কাছাড়িদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। **দিমাসা-কাছাড়িদের প্রথমে রাজধানী ছিল ডিমাপুরে (বর্তমানে নাগাল্যান্ডে), তারপর মাইবং-এ (উত্তর কাছাড় পাহাড়) এবং শেষে খাসপুরে (বরাক উপত্যকায়)**। আহোমদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্যাগ করে শেষে মিত্র হিসাবেই কাছাড়িরা তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। কাছাড়িদের প্রতিটি রাজধানীতে স্থাপত্যকীর্তিও উল্লেখের দাবি রাখে। এইসব অতীত স্থাপত্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ সম্ভবত ১৮৯৬ সালের ভয়ংকর ভূমিকম্প। তাছাড়া আসামের আর্দ্র আবহাওয়ায় অতিবৃষ্টিজনিত স্যাঁতসেতে জঙ্গলাকীর্ণ মাটিতে পাথরে নির্মিত সৌধের ক্ষণস্থায়িত্ব খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। পাহাড়ের উপরে মন্দির বা সৌধ অবশ্য সেই তুলনায় কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী।

২৪.১.১ গুহা শিল্প

প্রাক-আহোম যুগের লিপিতে স্থাপত্যের উল্লেখ খুব একটা পাওয়া যায় না। প্রথম যে লিপিতে এইরকম কিছুটা পরিচয় মিলেছে সেটি পঞ্চম শতাব্দীতে সুরেন্দ্র বর্মন/মহেন্দ্রবর্মনের নীলাচল লিপিতে। ঐ লিপিতে কামাখ্যা/নীলাচল পাহাড়ে একটি গুহা মন্দিরের উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদরা ঐ স্থানে এইরকম কোনো গুহা মন্দিরের সন্ধান পাননি। তবে একটা প্রাকৃতিক গুহার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। **বর্তমানে আসামে প্রায় ৪০টি স্থানে খনন কাজ চলছে ; এগুলি থেকে যদি উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় ; তাহলে হয়তো আগামীদিনে আসামের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে নতুন আলোকপাত সম্ভব হতে পারে**। শালস্তম্ভ যুগের পাঁচটি অভিনব পাহাড়-কাটা গুহা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বঙ্গাইগাঁও জেলার যোগীঘোপায় দেখা যায়। যদিও সোপান বা সিঁড়িসহ ঐ গুহাগুলি পশ্চিম ভারতের মতো আকর্ষণীয় নয় বা গুহার অভ্যন্তরে দেওয়ালচিত্র

নেই এবং স্থাপত্যের আঙ্গিকেও কোনো বিশেষ শৈলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তথাপি প্রাচীন গুহা-শিল্প যে আসামে প্রচলিত ছিল—এটি অনুমান করা যায়।

২৪.১.২ প্রাক-আহোম শিল্পে গুপ্ত শিল্পরীতির প্রভাব

প্রাক-আহোম যুগে—অর্থাৎ বর্মন, শালস্তম্ভ, পাল যুগের শিল্পরীতিতে গুপ্ত-প্রভাব সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ববিদরা সন্দেহাতীত ; যদিও কিছু ক্ষেত্রে গুপ্ত রীতি পুরোপুরি অনুসৃত হয়নি। যাতায়াতের অসুবিধা সত্ত্বেও কামরূপ ও মগধ রাজ্যের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে কামরূপ স্থাপত্য শিল্পও প্রভাবিত হয়েছিল। P. Sarma (*Architecutue of Assam* গ্রন্থে) এই শিল্পরীতিকে "separate group of the Indo-Aryan sytle" অথবা "Kamrupi sytle" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু R. D. Choudhury (*Archaeology of the Brahmaputra Valley of Assam* গ্রন্থে) Sarma'র এই চিত্রায়ণের বিরোধিতা করে মন্তব্য করেছেন, গুপ্ত শিল্পরীতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছুটা আঞ্চলিক রীতিতে প্রভাবিত হলেও আসামে এটিকে 'কামরূপী স্টাইল' হিসাবে চিত্রিত করা যথার্থ নয়। আসলে, মধ্য-ভারতীয় স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করেই প্রাক-আহোম যুগে আসামের স্থাপত্য শিল্পের কাঠামো তৈরি হয়েছে। আবার 'motif' বা বিষয়বস্তু নির্বাচনের প্রশ্নে R. D. Banerji আসামের প্রাক-আহোম যুগের শিল্পরীতিতে দাক্ষিণাত্যের চালুক্য শিল্পের প্রভাবও লক্ষ করেছেন। R. D. Choudhury একসময় উড়িষ্যা মন্দিরের 'শিখর'-এর প্রভাব প্রাক-আহোম যুগের মন্দির শিল্পে দেখলেও পরবর্তী সময়ে এই সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছেন। আসামের স্থাপত্যে গুপ্ত-পরবর্তী যুগের প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে Sarma উড়িষ্যার তুলনায় বরং মধ্য-ভারতীয় শিল্পরীতির প্রভাবের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আসলে, যেহেতু আসামে প্রাক-আহোম যুগের কোনো স্থাপত্য অক্ষত অবস্থায় নেই ; সুতরাং একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসা খুবই কঠিন। তবে বর্মন রাজত্বের সময় থেকে যেহেতু গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমানার পাশেই ছিল কামরূপ, এরই জন্য গুপ্ত প্রভাবকে অস্বীকার করা খুবই কঠিন। ব্রাহ্মণ্য শিল্প-সংস্কৃতির ধারক-বাহক বর্মনরা যে অক্ষরে অক্ষরে গুপ্ত স্থাপত্যের প্রতিটি নিয়ম অনুসরণ করতেন সেটি P. Sarma'র মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় ঃ "The building activities of the Varmans register strict Gupta idioms." বর্মন যুগের স্থাপত্যের তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নিদর্শন অক্ষত অবস্থায় না থাকলেও দরং জেলার মূল কেন্দ্র তেজপুরের কাছে দা-পর্বতিয়ার একটি মন্দিরের কাঠামো, গর্ভগৃহ ও মণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ থেকে

কিছু অনুমান করা যায়। **বর্মন যুগ থেকে শালস্তম্ভ যুগ পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী তেজপুরই ছিল আসামের স্থাপত্য-শিল্পের কেন্দ্রভূমি।** তেজপুর বা পূর্বতন শোণিতপুরকে কেন্দ্র করে আসামে কত পুরাকাহিনি, লোককথা ও সাহিত্য অতীতে গড়ে উঠেছে। তেজপুরের বামুনি ও শিঙ্গ্‌ পাহাড়ে শিল্পের ভগ্নাবশেষ, মাজগাঁও মন্দিরের আকর্ষণীয় দ্বার বা দরজা, গুপ্ত-শিল্পের জনপ্রিয় 'motif' নদী-দেবী দণ্ডায়মান গঙ্গা-যমুনার হাতে মালাসহ খোদাই করা মূর্তি, দা-পর্বতিয়ায় ফুলে-ফলে খোদিত ও আচ্ছাদিত তোরণ ও সিংহদ্বার—এর প্রত্যেকটিই গুপ্ত যুগের ধ্রুপদী শিল্পের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। স্থাপত্যের সামগ্রী হিসাবে প্রাক-আহোম যুগে পাথর ও ইটের সমানভাবে ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে। সপ্তম থেকে দশম শতকের কাছাকাছি পর্যন্ত প্রসারিত শালস্তম্ভ যুগের শিল্পকর্ম সম্পর্কে তেমন ব্যাপক নমুনা না থাকলেও, বর্মনদের শিল্পরীতি যে এই যুগেও একইভাবে অনুসৃত হয়েছিল—সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপরোক্ত একই মন্তব্য পাল যুগ সম্পর্কে প্রযোজ্য যেটি প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। পাল যুগের প্রথম দিকে পাথরের ব্যাপক ব্যবহার হলেও শেষদিকে ইটের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আসলে, প্রাক-আহোম যুগের ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভিন্ন মন্দিরের ভিত্তি ও কাঠামোর উপর নির্ভর করে আহোম যুগের বিভিন্ন সময়ে কিছু স্থানে মন্দির ও সৌধ নির্মিত হয়েছিল। ফলে, আহোম যুগেও পরোক্ষভাবে গুপ্ত শিল্প ধারার কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

২৪.১.৩ অম্বারি খনন কার্য

১৯৬৯ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ভারত-চিন বাণিজ্যপথ অতীতের হারিয়ে-যাওয়া **'সিল্ক-রুট'**-এর সন্ধানে প্রথম খনন কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯৫ সালে আসাম রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব দফতর ঐ উদ্যোগে শরিক হয়। গুয়াহাটি শহরের অভ্যন্তরে দিঘলিপুখুরির একটি চতুর্ভুজ দিঘিতে খননের সময় কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে শুনে 'আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া' (ASI) বা ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ বিভাগ এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে অম্বারি খননের গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়। গুয়াহাটি রেল স্টেশন, উজানবাজার, শিলপুখুরিসহ বিস্তীর্ণ এলাকা অম্বারি খনন কাজের অঙ্গীভূত। একটি শহরের অভ্যন্তরে এই ধরনের খোঁড়াখুঁড়ি যেহেতু নানা কারণে জটিল ও কঠিন, এজন্য প্রকল্পটি বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আজও এটি অসমাপ্ত। প্রাথমিক স্তরে ১৯৬৯ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত যেসব উপাদানের সন্ধান মিলেছে তার উপর নির্ভর করে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

মাটি কেটে যত নীচের দিকে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে ততই মাটির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সভ্যতার নিদর্শন মিলছে। **এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় গুয়াহাটি শহরের ঐতিহ্য কত প্রাচীন**। ইতিমধ্যেই কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, গুয়াহাটি আজ থেকে ২ হাজার বছর আগেও একটি সমৃদ্ধ শহর ছিল। ইদানীং দ্বিতীয় পর্বের কাজ শুরু হয়েছে।

নানা ধরনের মৃৎশিল্প, পোড়ামাটির কাজ বা টেরাকোটা, চাকতি, লিপি, পুঁতির মালা, অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি, শিবলঙ্গ, ছোটো-বড়ো নানা ধরনের পাত্র, সেজবাতি, দীপপাত্র, লোহার অস্ত্র, বিভিন্ন আকারের সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদির সন্ধান ও সংগ্রহ অম্বারি খননের ফলে সম্ভব হয়েছে। কার্বন-ডেটিং এবং অন্যান্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবিষ্কৃত এইসব উপাদানগুলির সময় নির্ধারণ আজ খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। **সোনালি রং-এর আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রে** কেউ রোমান প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন, কেউ বা গঙ্গা উপত্যকায় হস্তিনাপুরে (মহাভারতে কুরু বংশের বা কৌরবদের রাজধানী এবং বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ মিরাটের কাছে ছোটো শহর) প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের অনুরূপ বলে মনে করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয়, বহির্জগতের সাথে যোগাযোগ কত নিবিড় ছিল। অম্বারিতে প্রাপ্ত ইটের দেওয়াল-ঘেরা জলাশয়কে (যেটি হরপ্পা সভ্যতায় অত্যন্ত উন্নত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল) ধারণা করা হয়, গুপ্ত-যুগের পূর্ববর্তী কুষাণ আমলে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ইটের প্রাচীর ঘেরা সরোবরের রেওয়াজ ছিল। এই সরসীর আশপাশে সাধারণ মানুষের বসতি সম্পর্কেও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অম্বারির দেওয়ালে ব্যবহৃত ইটের মাপ ও গঠন পদ্ধতি দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদরা এটিকে উত্তরপ্রদেশের কৌশাম্বী (এলাহাবাদ ডিভিশনের অন্তর্গত কৌশাম্বী বর্তমানে একটি জেলা) এবং পশ্চিমবঙ্গের বালুরঘাট জেলার অন্তর্গত বানগড়-এ প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সমতুল্য ও সমসাময়িক—অর্থাৎ শুঙ্গ বা কুষাণ যুগের বলে মনে করেন। অম্বারিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির একটি ভাঙা ফলকে বেশভূষায় সজ্জিত একটি পুরুষের মূর্তি দেখে সেটিকে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তমলুকে কিংবা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিদ্যাধরী নদীর পাশে চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির অনুরূপ ফলকের সাথে প্রত্নতত্ত্ববিদরা তুলনা করেছেন।

২৪.১.৪ 'গৌহাটি' ও 'গুয়াহাটি'

গুয়াহাটি (পূর্বতন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা দুর্জয়)-কে কেন্দ্র করে অনেক রূপকথা, উপকথা, পুরাকাহিনি বা মিথ্ গড়ে উঠেছে। যদিও এই শহরের জন্ম বা বয়স

সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই। ঔপনিবেশিক ও প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে এটি 'গৌহাটি' নামেই পরিচিত ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আজও ঐ নামেই প্রসিদ্ধ। আসলে, অসমিয়া ভাষা অনুযায়ী, প্রকৃত নাম হওয়ার কথা 'গুয়াহাটি' ("গুয়া" = সুপারি, "হাট" = বাজার), কারণ ব্রহ্মপুত্রের উপকূলে প্রধানত সুপারির বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবেই নামটির উৎপত্তি। সরকারি নথি-পত্রে **দীর্ঘদিনের 'গৌহাটি' নামটি আসাম-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৮০'র শেষদিকে 'গুয়াহাটি'তে পরিবর্তন করা হয়। বর্তমান রাজধানী দিসপুর আসলে গুয়াহাটি শহরেরই অভ্যন্তরে। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার ঐতিহ্যপূর্ণ এই শহরের ইতিকথার আবরণ উন্মোচন করতে অম্বারির খনন-কাজ প্রভূতভাবে সাহায্য করবে।** প্রাক-আহোম যুগে নিম্ন-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গুয়াহাটি ছিল কামরূপ আসামের প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র—বর্মন, শালস্তম্ভ ও পাল বংশের কীর্তিভূমি ও রাজধানী। এই ধারা একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কামরূপেরই অন্তর্ভুক্ত হাজোতে কোচদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও গুয়াহাটি তার গুরুত্ব হারায়নি। কামতা রাজ্য ধ্বংস করার পর মুঘল শাসকরা ১৭ বার আসাম আক্রমণ করে কিছু সময়ের জন্য গুয়াহাটির উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারলেও ১৬৭১ সালে গুয়াহাটির কাছে ঐতিহাসিক সরাইঘাটের যুদ্ধে লাচিৎ বরুফুকনের কাছে পরাস্ত হওয়ার পর (প্রথম খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে ৭.৪ দ্রষ্টব্য) সেই অধ্যায়েরও যবনিকাপাত হয়। আহোম রাজত্বের শেষ দিকে সমগ্র নিম্ন-আসামসহ গুয়াহাটি ছিল আহোম রাজাদের প্রতিনিধি বরফুকনের শাসনাধীন এবং বর্তমান ফ্যান্সিবাজার এলাকায় ছিল তাঁদের মূল কর্মকেন্দ্র। আসলে, অম্বারি খনন-কাজের ফলে, অন্যের সাথে যোগাযোগ প্রশ্নে শুধু গুয়াহাটি নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসের ধারা একটি নতুন মাত্রা পাবে বলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন। ASI-এর গুয়াহাটি বিভাগের কর্মকর্তা ড. সঞ্জয় কুমার মঞ্জুল মন্তব্য করেছেন "....that the findings of the Ambari site are to be treated as the earliest excavated archaeological evidence of the early historical period concerning the North-Eastern region." প্রাচীন চিন, দক্ষিণ এশিয়া (ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাসহ), মিশর, পারস্য থেকে রোম পর্যন্ত বিস্তৃত ৪,০০০ মাইল দীর্ঘ হারিয়ে যাওয়া 'সিল্ক-রুটের' সন্ধান কাজ অম্বারি খননের ফলে কতটুকু এগিয়েছে সে সম্পর্কে সম্প্রসারিত তথ্য প্রকাশিত না হলেও অতীতে আসামের 'সিল্ক' বা রেশম যে কত বিখ্যাত ছিল সেটি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে (প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে ৫.২.৫ দ্রষ্টব্য)। *Periplus of the Erythrean Sea*-র মতো প্রাচীন গ্রন্থেও প্রসঙ্গটির

উল্লেখ আছে। আসামে 'Silk-Culture' বা রেশম-সংস্কৃতি প্রসারের প্রশ্নে বোড়ো উপজাতিদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২৪.২ আহোম যুগের স্থাপত্য (Architecture in the Ahom Age)

আহোম যুগের স্থাপত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর ৮০'র দশক পর্যন্ত, (খ) ১৬৮১ থেকে উনবিংশ শতক। প্রথম ভাগে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য সৃষ্টি প্রায় হয়নি বললেই চলে ; দু-একটির কথা *বুরঞ্জিতে* শুধু উল্লেখ আছে মাত্র। তবে সুসেঙ্গফা বা প্রতাপসিংহ'র আমলে (১৬০৩-৪১) শিবসাগরের উপকণ্ঠে নাজিরায় সৃষ্ট গড়খিয়া মন্দির একমাত্র নজির হিসাবে আজও মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ মন্দিরে ইসলামীয় প্রভাব খুবই স্পষ্ট, যেটি ঐ সময়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে একইভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথম পর্বে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় শেষার্ধ পর্যন্ত আহোমদের আর তেমন উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন না থাকলেও নিম্ন আসামে কোচ রাজারা কিন্তু ঐ সময়ে অর্থাৎ ষষ্ঠদশ শতকে নতুন আঙ্গিকে কামাখ্যা মন্দির পুনর্নির্মাণ করে বিরল নিদর্শন রেখে গেছেন।

২৪.২.১ ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে স্থাপত্য নিদর্শনের স্বল্পতা

আহোম স্থাপত্যের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় প্রধানত সুপাতফা বা গদাধরসিংহ'র (১৮৬১-১৬৯৬) সময় থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আহোমসহ আসামে অন্যান্য রাজাদের স্থাপত্য কীর্তি প্রধানত ধর্মীয় এবং বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। মধ্যযুগে ইসলামিক স্থাপত্যে যেমন মসজিদ, ইদগাহ্ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব থাকলেও ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে দুর্গ, মিনার, অট্টালিকা নির্মাণ, নতুন শহরের পত্তন, রাস্তাঘাট ইত্যাদির উপরও সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হত ; আসামে কিন্তু এর কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। ধর্মের আঙ্গিনার বাইরে গিয়ে স্থাপত্য সৃষ্টি আসামে কিছু হয়নি বললে ভুল হবে, তবে সংখ্যার দিক থেকে সেটি ছিল খুবই সীমিত। দীর্ঘস্থায়ী ঘরবাড়ি তৈরির প্রশ্নটিতেও আহোম যুগে তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। এরই জন্য দেখা যায়, মুঘল সেনাপতি মীরজুমলার সাথে আসাম আগমনকারী মুসলিম পর্যটক শিয়াবুদ্দিন তালিশ ১৬৬২-৬৩ সালে তাঁর বিবরণীতে (ইংরেজি অনুবাদ) এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

> *In the whole of Assam there is no building of brick, stone or mud, with the exception of the gates of Garhgaon and a few temples.*

Rich and poor alike construct their houses with wood, bamboo and straw.

যেহেতু ক্ষণস্থায়ী উপকরণ দিয়ে ঘরবাড়ি ইত্যাদি তৈরি হত, এরই জন্য কালের আঘাতে সবই পুরোপুরি ধ্বংস ও অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে, আহোম যুগে সামাজিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র (ধর্মীয় আনুগত্য ব্যতিরেকে) তৈরির প্রশ্নে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মাধ্যমে সত্যকে যাচাই করা কঠিন হয়ে যায় এবং তালিশ-এর মতো পর্যটকদের বৃত্তান্তের উপরই পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়। অবশ্য আহোম রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিচিত সুখরুংফা বা রুদ্রসিংহ'র আমলে (১৬৯৬-১৭১৪) এই অবস্থার কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। Edward Gait (*A History of Assam*)-এর বিবরণ অনুযায়ী, সমগ্র আসামে ইটের প্রাসাদ এবং শহরে গৃহ নির্মাণ করার স্থপতি ও রাজমিস্ত্রির অভাবে উদ্‌বিগ্ন হয়ে রুদ্রসিংহ শেষপর্যন্ত কোচবিহার থেকে ঘনশ্যামের মতো স্থপতি ও রাজমিস্ত্রিদের আমদানি করেছিলেন। Gait-এর ভাষায়

He (Rudra Simha) was anxious to build a palace and city of bricks, but there was no one in his kingdom who knows how to do this. He, therefore, imported from Koch Bihar an artisan named Ghanashyam, under whose supervision numerous brick buildings were erected at Rangpur, close to Sibsagar and also at Caraideo.

সুখরুংফা/রুদ্রসিংহের প্রথম পুত্র সুতনফা/শিবসিংহ (১৭১৪-৪৪) এবং অন্যান্য পুত্র সুনেনফা/প্রমত্তসিংহ (১৭৪৪-৫১) ও সুরমফা/রাজেশ্বরসিংহ-র আমলেই (১৭৫১-৬৯) ধর্ম-বহির্ভূত শিল্পকাজ কিছুটা গুরুত্ব পায়। এইসব আহোম রাজাদের আমলেই শিবসাগরে ইসলামিক শিল্পধারায় প্রভাবান্বিত কাঠ ও ইটের তৈরি দ্বিতল **'রং-ঘর'** বা প্রমোদ ঘর, বহুতল বিশিষ্ট দুর্গের মতো **'তলাতল-ঘর'**, 'গোলা-ঘর' (বারুদ ইত্যাদি মজুত রাখার জন্য), নামদং নদীর উপর একটি পাথরের মাধ্যমে সেতু নির্মাণ, কিংবা গোরগাঁও-এ **'কারেং-ঘর'** (রাজপ্রাসাদ), চরাইদেও'র বিখ্যাত সমাধিস্থল **'মইদাম'** (যদিও ধর্মীয় প্রভাবান্বিত) এর সংস্কার, **জয়সাগর, গৌরীসাগর** বা **শিবসাগরের** মতো বিশাল সরোবর ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল। আসলে, আহোম যুগের মন্দির ও ধর্মনিরপেক্ষ স্থায়ী স্থাপত্যের মধ্যে যা কিছু উল্লেখযোগ্য তার প্রায় সবই হয় রুদ্রসিংহ অথবা তাঁর পুত্রদের আমলেই নির্মিত হয়েছিল ; যদিও এর অধিকাংশই আজ প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি।

২৪.২.২ আহোম মন্দির শিল্প

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আহোমরা ক্রমশ, হিন্দু ধর্মের আঙ্গিনাভুক্ত হলেও তাঁদের পূর্বেকার 'তাই' ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার কিন্তু পুরোপুরি ভোলেননি ; এবং এটি শুধু দৈনন্দিন আচার আচরণেই নয়, আহোম স্থাপত্যে বিশেষত মন্দির শিল্পেও নানাভাবে প্রতিভাত। অবশ্য একই সাথে উল্লেখযোগ্য, কিছু আহোম শাসক—যেমন, সুসেঙ্গফা/প্রতাপসিংহ (১৬০৩-৪১) অথবা সুপাতফা/গদাধর-সিংহ (১৬৮১-৯৬) ইত্যাদি—প্রায় পুরোপুরি হিন্দু ধর্মভুক্ত হয়ে হিন্দু দেবদেবীর পূজা-অর্চনাসহ মন্দির নির্মাণে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আহোম যুগে প্রতাপ সিংহ প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। যাইহোক, এইসব ব্যতিক্রম সত্ত্বেও রুদ্র-সিংহ'র সময় থেকে দুই ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ শুরু হয়। তাঁর পুত্র **শিবসিংহ'র আমলে শিবসাগরে নির্মিত শিবমন্দির আহোমযুগের সর্বোচ্চ (৪০ মিটার) মন্দির**। রুদ্রসিংহ'র অন্যান্য পুত্ররাও হিন্দু-দেবদেবীর নামে অনেক মন্দির নির্মাণ করেছেন, কিন্তু সেগুলি তুলনায় অনেক ছোটো। **নিম্ন ব্রহ্মপুত্র এলাকায় প্রাক-আহোম যুগের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের ভিত্তির উপরই আহোম যুগের মন্দির নির্মিত হয়েছে। 'Indo-Aryan Style'-এর উপর মোটামুটি নির্ভর করেই আহোম যুগে এইসব সৌধ গড়ে উঠেছিল**—যার মধ্যে *গর্ভগৃহ, বিমান, শিখর, মণ্ডপ* ইত্যাদি অঙ্গীভূত থাকত। অবশ্য একই সাথে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে—যেমন, রুদ্রসিংহ'র আমলে হাজো'তে নির্মিত 'Fakuwa doul' ('ফাকুয়া-দউল') যার মধ্যে ইসলামিক প্রভাব স্পষ্ট। যাইহোক, রাজেশ্বর-সিংহ'র (১৭৫১-৬৯) পর আহোম মন্দির-শিল্পে ভাটার টান দৃষ্ট হয়। আহোম রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ (১৮১১-১৮, ১৮১৯-২১)'র আমলে গুয়াহাটি সংলগ্ন অঞ্চলে যে চন্দ্রশেখর, উমানন্দ ও বাণেশ্বর মন্দির নির্মিত হয়েছিল সেগুলিতে শিল্পের দারিদ্র্য দেখে পতনোন্মুখ আহোম প্রভুত্বের করুণ ছবি ভেসে ওঠে।

২৪.২.৩ কোচদের মন্দির স্থাপত্য

আসামে কোচরা কত শক্তিশালী ছিল প্রথম খণ্ডে কিছু উল্লেখ করা হয়েছে (১.৭, ২.৪.১.১.১ দ্রষ্টব্য)। কোচরা এমনকি আহোম রাজের রাজধানী গোরগাঁও কিছুদিন দখলে রেখেছিল। কোচ রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত **মল্লদেব** বা **নরনারায়ণ** (১৫৪০-৮৭)-এর আমলেই আসামে কোচ স্থাপত্য-কীর্তি প্রসারিত হয় এবং তাঁর অনুগত ভাই তথা **সেনাপতি শুক্লধ্বজ—যিনি 'চিলা রাই' নামে প্রসিদ্ধ**—এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। কোচ স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গুয়াহাটির

সন্নিকটে নীলাচল পাহাড়ে **কামাখ্যা মন্দির** (প্রথম খণ্ডের ১.৩.১ দ্রষ্টব্য)। শাক্ত-তীর্থ-কামাখ্যায় প্রাক-আহোম যুগের মন্দিরটি, প্রবাদ অনুযায়ী, কালাপাহাড় ধ্বংস করার পর চিলা রায়ের উদ্যোগে ১৫৬৫-তে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়। 'দরং-রাজবংশাবলী'র তথ্য অনুযায়ী কোচবিহার থেকে আগত স্থপতি Meghamukdum/মেঘামুকদুম-এর নেতৃত্বে পূর্বেকার মন্দিরের পাথরের স্থলে ইট সুরকি দিয়ে পুরাতন ভিত্তি ভূমির উপর এটি গঠিত হয়। ইসলামিক স্থাপত্যের নিদর্শনে কামাখ্যায় একটি মিশ্র স্থাপত্যের জন্ম হয় যেটি 'নীলাচল স্টাইল' নামে পরিচিত। পিরামিড্-এর ঢং-এ মৌচাকের আকৃতি সহ কোচদের নির্মিত কামাখ্যা মন্দিরে চিরাচরিত 'বাস্তু-শাস্ত্র'র অনেক নিয়মই মানা হয়নি। বাণীকান্ত কাকতি (১৭.৪৩ দ্রষ্টব্য) তাঁর *The Mother Goddess Kamakhya* গ্রন্থে এই শক্তি পীঠকে প্রাথমিক স্তরে খাসি ও গারো উপজাতিদের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি দিয়ে তথাকথিত আর্য-অনার্যদের মিলনভূমি "fusion of faiths and practices" বলে চিহ্নিত করেছেন। সো-তাম-লা/জয়ধ্বজ সিংহ (১৬৪৮-৬৩)-র সময় থেকে শৈব বা শাক্ত মতাবলম্বী আহোম রাজাদের অনেকে মন্দিরটির সংস্কার এবং কিছু ক্ষেত্রে পুনর্গঠনে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে মন্দিরটির আকৃতিও কিছুটা বদলে গেছে। কামাখ্যা মন্দির আলোচনা প্রসঙ্গে P. Sarma-র একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ

> *In fact, architecture as a science always has its own course of action and it is beyond the permanent dominance of any religion. It moves on with time, assimilating in the process whatever is structurally advanced and aesthetically better suited.*

কোচ রাজা রঘুদেব (১৫৮৮-১৬০৩) নীলাচল পাহাড়ের নীচে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে একই ধরনের স্থাপত্যকলা অনুসরণ করে 'পাণ্ডুনাথ মন্দির' তৈরি করেছিলেন ; যদিও সেটি তুলনায় অনেক ছোটো এবং তেমন আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু রঘুদেব কর্তৃক হাজাতে পুনর্নির্মিত 'হয়গ্রীব-মাধব মন্দির'—যদিও কামাখ্যার তুলনায় ছোটো এবং বিষ্ণুমন্দির—তথাপি 'নীলাচল রীতি' অনুসরণ করেই সৃষ্টি হয়েছে। ঐ মন্দিরের *গর্ভগৃহ, অন্তরাল, মণ্ডপ, বিমান* এবং উপরে অসংখ্য মূর্তির সমাবেশ কামাখ্যারই মতো। **আসলে, 'নীলাচল রীতি' সর্বসাধারণের কাছে এত গ্রহণযোগ্য হয়েছিল যে শেষদিকে আহোম স্থাপত্যেও এটি অনুসরণ করা হয়েছিল।**

২৪.২.৪ অন্যান্যদের মন্দির স্থাপত্য

ডিব্রুগড় জেলার সাদিয়া অঞ্চলে চুটিয়াদের ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে নির্মিত তাম্রেশ্বর বা মালিনিথান (বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশের অন্তর্গত) মন্দিরের

ধ্বংসাবশেষে ইসলামিক প্রভাব দৃষ্ট না হলেও জয়ন্তিয়া ও দিমাসা-কাছাড়িদের মন্দির স্থাপত্যে ইসলামিক প্রভাব স্পষ্ট, যেমনটি 'নীলাচল রীতি'র ক্ষেত্রে দেখা যায়। আসলে, ঐসব মন্দির স্থাপত্যের মধ্যে তেমন কোনো অভিনবত্ব ছিল বলে মনে হয় না। কাছাড়ি স্থাপত্যে ইসলামিক প্রভাব প্রথম দৃষ্ট হয় কাছাড়ি রাজধানী ডিমাপুরের প্রবেশ তোরণে, যে স্থানটি কাছাড়িরা ১৫৩৬ সালে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। মুসলিম-বাংলার স্থাপত্যের প্রভাব—বিশেষত 'দো-চালা' ছাদ—আসামের শিল্পকলায় মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে প্রেক্ষিত হয়। মুসলিমদের অনেক মসজিদ, মাজার, ইদগাহ, ইত্যাদি ঐ সময় আসামে নির্মিত হয়েছিল—যেমন, গৌরীপুরে রাঙ্গামাটি মসজিদ, শিবসাগরে আজান ফকিরসহ পাঁচ পীরের দরগা, ধুবরিতে মীর জুমলার মসজিদ, কামরূপের হাজো'তে 'পোয়া মক্কা' প্রভৃতি—কিন্তু ধুবরি জেলার পানবাড়ি মসজিদ ভিন্ন কোনোটিই বর্তমানে পুরোপুরি অক্ষত অবস্থায় নেই। **সমগ্র আসামে মুসলিম শাসন প্রসারিত না হলেও ইসলামিক শিল্পকলার প্রভাবকে কিন্তু আটকে রাখা সম্ভব হয়নি।** প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে আসামে প্রায় ৩১ শতাংশ মানুষ মুসলিম ধর্মাবলম্বী এবং রাজ্যের মোট জনসংখ্যার শতাংশের হিসাবে জম্মু-কাশ্মীরের পরই সমগ্র ভারতবর্ষে আসামের স্থান দ্বিতীয়।

২৪.৩ ভাস্কর্য (Sculpture)

ভারতবর্ষের অন্য অংশের মতো আসামেও সম্ভবত পুরানো প্রস্তর যুগ (megalithic) এবং নব প্রস্তর যুগ (neolithic)-এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। কনকলাল বরুয়ার (১৭.১০ দ্রষ্টব্য) মতে, খাসি জনগোষ্ঠী—যারা এক সময় আসামের সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল—*made several distinctive cultural contributibns such as megalithic burials, neolithic shouldered hoe, terraced rice cultivation, iron-smelting and matriarchy, all indicative of advanced culture and cuvilization* (*JARS*, VI!, 2, 1939, p. 35). আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *The Place of Assam in the History and Civilization of India* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, বিভিন্ন জনজাতির সংস্কৃতি থেকে শুরু করে স্থাপত্য-ভাস্কর্য সবকিছুকে একীভূত করার মধ্যেই আসামের মহত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে এবং "this may be looked upon as the great contribution in the pre-historic period." বিভিন্ন ধরনের পাথর আসামের শিল্পে ব্যবহৃত হত।

যদিও অম্বারিসহ বিভিন্ন স্থানে খনন-কাজের সময় মাঝে মাঝে দু-একটা ব্রোঞ্জ-এর মূর্তি পাওয়া গেছে, কিন্তু হরপ্পা সভ্যতার মতো **উত্তর-পূর্ব ভারতে সত্যিই 'ব্রোঞ্জ যুগ' ছিল কি না, তা নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন** ; সম্ভবত অন্য স্থান থেকে এগুলি আনা হয়েছিল বলে তাঁরা মনে করেন। অন্যদিকে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মনে করেন, "The tradition of making bronze sculpture was strong in ancient Kamarupa" প্রাক-আহোম যুগের প্রথম ও নয়নাভিরাম ভাস্কর্য-কীর্তি তেজপুরের কাছে দা-পর্বতিয়ায় পঞ্চম/ষষ্ঠ শতাব্দীর ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ড-শিলায় উৎকীর্ণ দ্বার ও স্তম্ভে ধ্রুপদী গুপ্ত শিল্পের অনুকরণে ভগ্ন মকরের বা কুম্ভীরের উপর দণ্ডায়মান গঙ্গা-যমুনার মূর্তি। পাথরে খোদিত লতায়-পাতায়-ফুলে মোড়া এই শিল্প শুধু যে অনুপম তাই নয়, ভারতের অন্যত্র এটি দুর্লভ। কেউ কেউ মনে করেন, সারনাথ শিল্পের আদর্শে প্রভাবিত এই ভাস্কর্য-শিল্প সম্ভবত গঙ্গা উপত্যকার কোনো স্থানে নির্মিত হয়েছিল এবং অত্যন্ত যত্নে দা-পর্বতিয়ায় আনা হয়েছিল। এইভাবে আসাম ভাস্কর্যের ব্যাখ্যা অবশ্য অন্যরা গ্রহণ করতে রাজি নন। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যেমন প্রাক-আহোম যুগে বর্মন, শালস্তম্ভ ও পাল রাজাদের আমলে বেশিরভাগ মন্দির ব্রাহ্মণ্য ধারায় পুষ্ট ছিল, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে গুপ্ত শিল্পের ধারায় যে প্রস্তর শিল্প সহ পোড়ামাটির শিল্পও প্রভাবিত হয়েছিল সেটি অনস্বীকার্য।

প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেওপানিসহ অন্যত্র কিছু মূর্তি দেখে মন্তব্য করেন, *There were fusions of an indigenous style with the Gupta idom, as indicated by the well-known images from Deopani (Sibsagar district) of c 8th-9th century AD and several sculptures found at other sites.* গুপ্ত ধারার সাথে স্থানীয় শিল্পের 'স্টাইল' মিলে যে কিছুটা ভিন্ন গোত্রের ভাস্কর্য প্রাক-আহোম যুগে প্রচলিত ছিল তাকে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তাঁর *East Indian Art Styles : A Study in Parallel Trends* গ্রন্থে **'কামরূপ স্টাইল' বলে অভিহিত করেছেন ; যদিও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ঐ নামটি নিয়ে বিতর্ক আছে। আসামের ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে সর্বেশ্বর কাকতিও গান্ধার, মথুরা, ভারহুত, অমরাবতী বা পাল শিল্পকলার মতো কামরূপ শিল্পকলারও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন**। গুয়াহাটিতে 'আসাম স্টেট মিউজিয়াম' বা জাদুঘরে সংরক্ষিত জটাধারী নয়ন-মুদিত তপস্যারত পার্বতীর প্রস্তর-মূর্তি অথবা তিনসুকিয়ার রঙ্গাগোড়ায় প্রাপ্ত দক্ষ'র একই ধরনের মূর্তিতে (দা-পর্বতিয়া শিল্পের সমসাময়িক) গুপ্ত শিল্পধারার সাথে স্থানীয় শিল্পের সমন্বয় স্পষ্ট করে দেয়। পাল যুগে আসামে

এই মিলনের ধারা যে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল সেটি গোলাঘাট, দেওপানি, বড়পাথর প্রভৃতি এলাকা থেকে প্রাপ্ত মূর্তিগুলিতে স্পষ্ট। অবশ্য আসামের পাল-দের সাথে বাংলার পাল-রাজাদের মোটেই কোনো সম্পর্ক ছিল কি না তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। এককথায়, তথাকথিত 'কামরূপ ভাস্কর্য' একাদশ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নানাভাবে বিকশিত হয়েছিল।

অম্বারিতে প্রাপ্ত গ্রানাইট পাথরে খোদিত ভাস্কর্যের মধ্যেও স্থানিক শিল্প-প্রভাব একইভাবে লক্ষণীয়। পাথরে খোদাই করা এক অম্বারি লিপিতে জনৈক সমুদ্রপালের নাম এবং ১১৫৪ শক (১২৩২ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ থাকায় এগুলি যে ত্রয়োদশ শতকের শিল্প সেটি অনুধাবন করা যায় ; যদিও ঐ সময় থেকে আসামের শিল্পে তেমন আকর্ষণীয় কিছু পাওয়া যায় না বলে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক মন্তব্য করেছিলেন। অম্বারি থেকে প্রাপ্ত অলংকারে ভূষিত 'কিরীটমুকুট'ধারী চতুর্ভুজ 'সমপদস্থানক' ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান বিষ্ণু মূর্তিকে কেন্দ্র করে গবেষণার শেষ নেই। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে তেজপুর, শিলবাড়ি, মালিনিথান প্রভৃতি এলাকা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মূর্তির গড়ন দেখে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন ঃ "The 'deviated' Pala idiom, which began in the ancient period continued in the early medieval age." (i.e. upto 1200 AD) অর্থাৎ কামরূপ ঘরনার ভাস্কর্য প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আসামে স্থায়ী হয়েছিল।

২৪.৩.১ শ্রীসূর্য পাহাড় (Sri Surya Pahar)

গুয়াহাটি থেকে ১৩৬ কিমি উত্তর-পশ্চিমে এবং গোয়ালপাড়া থেকে ১২ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে শ্রীসূর্য পাহাড়ে ASI ১৯৯৩ সালে প্রথম খনন কাজ শুরু করে এবং পরবর্তী সময়ে সেটি অব্যাহত রেখে ভাস্কর্যের অনেক অনুপম নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি দেখে অনুমান করা যায় যে, এলাকাটি ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মিলন স্থল। পাহাড়ের নামটিই ইঙ্গিত দেয় ওখানে একসময় সূর্যের উপাসনা হত। *কালিকা পুরাণে* (দশম শতাব্দী) আসামে সৌর উপাসনার দুটি কেন্দ্রের মধ্যে একটি ঐ পাহাড়ে ছিল বলে উল্লিখিত। খণ্ডিত শিলায় গোলাকৃতি সীমানার মধ্যে একটি মূর্তিকে কিছু প্রত্নতত্ত্ববিদ সূর্যের মূর্তি এবং প্রান্তবর্তী পদ্মের বারোটি পাপড়িতে বারো আদিত্যের মূর্তি বলে পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীসূর্য পাহাড়ের পাদদেশে খোদাই করা অনেক মূর্তির মধ্যে সাতফণা বিশিষ্ট সর্পের ছত্রতলে দ্বাদশ হস্তবিশিষ্ট বিষ্ণু, পদ্মের উপর দণ্ডায়মান দশভুজা দুর্গা, শিব, গণেশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য মূর্তিগুলির সঠিক পরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে ; কারণ

দীর্ঘদিন ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার ফলে এগুলি তেমন স্পষ্ট নয়। যেমন, যেটিকে বিষ্ণুমূর্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেটি আসলে, বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া (১৭.৪৬ দ্রষ্টব্য) কিংবা শ্রীনিবাস মূর্তির মতে, মা-মনসার প্রতিকৃতি। ব্রহ্মপুত্রের ধারে এই পাহাড়ে ছড়িয়ে থাকা ছোটো-বড়ো অসংখ্য লিঙ্গ 'phallic worship' বা লিঙ্গ পূজার ইঙ্গিত দেয়। Pagletek (পাগ্‌লেটেক্)-খননের সময় একই ধরনের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল।

সূর্য পাহাড়ে জৈন শিল্প ও গুহার মধ্যে শুধু একটি ছাড়া, বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নেই এবং সেটিও সম্ভবত ঋষভনাথের অনুগামীরা পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন।

সূর্য পাহাড়ে কমপক্ষে ২৫টি ছোটো-বড়ো বৌদ্ধ স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, প্রাচীন কামরূপ রাজ্যেও বৌদ্ধ প্রভাব ছিল এবং ভারতের অন্য স্থানের তুলনায় এই প্রাচীনত্ব কম নয়। পাহাড়ের প্রায় শীর্ষদেশে উত্তর-পূর্ব কোণে বিশাল এক গ্রানাইট-'বোল্ডারে' পূর্বমুখি তিনটি বড়ো স্তূপের ছত্রাবলীসহ পাশাপাশি অবস্থানকে 'ধম্ম', 'সংঘ', 'বুদ্ধ'র প্রতীক অবস্থান অথবা বুদ্ধের স্মরণে 'উদ্যেশিক স্তূপ' হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। উক্ত তিনটি স্তূপে 'বেদি', 'মেধি' ও 'হর্মিকা' খুবই স্পষ্ট। সূর্য পাহাড়ের এই স্তূপকে খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে হীনযানদের প্রতীক চিহ্ন যদি বলা যায়, তাহলে পরবর্তী স্তর বা মহাযানদের অথবা বজ্রযানপন্থীদের স্মরণীয় কোনো শিল্প-কীর্তি কিন্তু উক্ত স্থানে দেখা যায় না যেটি বাংলা বা বিহারে প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হয়। একই সাথে ঐ স্তূপের পাশেই 'যোনিপীঠ'সহ অসংখ্য 'লিঙ্গ'র অবস্থান সম্ভবত এটিই প্রমাণ করে যে, দুই ধর্মের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থান বজায় ছিল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কামরূপে মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী সময়ে কিছু প্রভাবের পরিচয় মিললেও, হীনযানদের শিল্পকীর্তি সম্পর্কে প্রমাণ সম্ভবত সূর্য পাহাড়ে খননের সূত্রেই প্রথম পাওয়া গেছে। একই ধরনের ভাস্কর্যের নিদর্শন সাম্প্রতিককালে নিম্ন ব্রহ্মপুত্র এলাকার পঞ্চরত্ন, বরভিটা গ্রাম কিংবা ভইৎবাড়ি প্রভৃতি স্থানে খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের এই অনুপম নিদর্শন দেখে গোয়ালপাড়ার সূর্য পাহাড়কে তাই যথার্থভাবেই **"art gallery of Indian sculpture"** বলা হয়।

২৪.৩.২ ভইৎবাড়ি খনন কার্য (Bhaitbari Excavation)

১৯৯০-এর দশক থেকে শুরু হওয়া প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ভইৎবাড়ি (বর্তমানে মেঘালয়-এর পশ্চিম গারো পাহাড়ে)-তে ASI-এর সহযোগিতায় খনন

কাজের ফলে সূর্য পাহাড়ের মতো অনেক স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে যেগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই সঠিক সময়কাল নির্ধারণ করা সম্ভব। মেঘালয়-আসাম সীমান্তের ফুলবাড়ি থেকে তুরা'র দিকে মাত্র ৮ কিমি দূরে **ভইৎবাড়ির দীর্ঘ কুড়ি বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে খননকাজের ফলে এমন সব অভিনব নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি আগামীদিনে উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসের ধারাকেই কিছুটা নতুন রূপ দিতে পারে**। সূর্য পাহাড়ের মতো শিবলিঙ্গ ও বৌদ্ধ স্তূপের সহাবস্থানসহ পোড়ামাটি শিল্পে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি—যার মধ্যে গণেশ, পার্বতী, কুবের, যক্ষ ইত্যাদি প্রধান। মূর্তিগুলির গঠনের ভঙ্গি দেখে এগুলিকে সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক এবং 'মন্দির-নগর' বলে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুমান করেছেন। কেউ বা নগরের উন্নয়নের ছবি দেখে ভইৎবাড়িকে সাময়িককালের জন্য হলেও প্রাচীন কামরূপের রাজধানী বলতেও দ্বিধা করেননি। কেউ আবার মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা সভ্যতার গুরুত্বের সাথে ভইৎবাড়ির তুলনা করেছেন। গোয়ালপাড়া জেলার সন্নিকটে জিঙ্গিরাম নদীর ধারে পশ্চিম গারো পাহাড়ে ভইৎবাড়ি এতদিন ঘন জঙ্গলে-ঘেরা গ্রাম হিসেবেই চিহ্নিত ছিল ; কিন্তু সাম্প্রতিক খনন-কাজের ফলে এলাকাটি বর্তমানে জাতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে।

পোড়া ইটের প্রায় ১৫ কিমি বেষ্টিত কাদা দিয়ে গাঁথা প্রাচীর-ঘেরা ভইৎবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখে অনেক কিছু অনুমান করা যায়। প্রথম প্রশ্ন ঃ কেন এত বিশাল প্রাচীর? দেওয়ালের অভ্যন্তরে ৩.৩০ মিটার প্রশস্ত পথের চিহ্নও আছে। ইটের দেওয়ালের বাইরে 'টেরাকোটা' টালি শিল্পগুলি এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছিল যাতে উন্নত নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টকোণ-বিশিষ্ট একটি মন্দির এবং বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ এই খননের প্রধান আকর্ষণ। মন্দিরের গঠনটি সাদা-মাটা হলেও গর্ভগৃহ ও অন্তরাল ছাড়া প্রবেশপথে মণ্ডপও আছে। যদিও খনন-অভিযান এখনও সম্পূর্ণ হয়নি এবং সময়কাল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি, তথাপি ঐতিহাসিক সত্যকে অনুসন্ধানের প্রশ্নে ভইৎবাড়ি একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষার স্বার্থে বড়ো বড়ো 'গড়' বা প্রাচীর (যদিও 'দুর্গ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়) শুধু আসাম নয়, পৃথিবীর অনেক প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে একইভাবে দেখা যায়। ভইৎবাড়ির 'গড়'-এর মতো কমপক্ষে ৩০টি 'গড়' আসামে ছিল—যেমন, গোলাঘাটের 'নুমালিগড়', রঙ্গিয়ার 'বৈদ্যগড়, ডিব্রুগড়, গুয়াহাটির কাছে 'মমাই-কটা-গড়' ইত্যাদি।

ভইৎবাড়ির মতো একইভাবে তেজপুরের **'বামুনি পাহাড়'** (Bamuni Hills)-এ ৯ম-১০ম শতকের মূর্তিগুলিও কম আকর্ষণীয় নয়। দশাবতার বিষ্ণুর মস্তকে কীর্তিমুখসহ অলংকারে শোভিত মূর্তিগুলি থেকে ব্রাহ্মণ্য শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তেজপুরের 'ভৈরবী' ও 'মহাভৈরব' মন্দিরসহ 'বড়-পুখুরি', 'পদুম পুখুরি' ইত্যাদি সরোবর ব্রিটিশ কমিশনার Mr. Cole-এর নামে নামাঙ্কিত 'Cole Park'-এর সংলগ্ন থাকায় অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বামুনি পাহাড়ের অলংকারান্বিত পাথরের দুটি বিশাল স্তম্ভও ঐ স্থানের অন্যতম আকর্ষণ। আসলে, আসামে প্রাক-আহোম যুগের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং কিছুটা অবহেলিতভাবেই আছে—সেটি প্রাচীন শোণিতপুরের 'দা-পর্বতিয়া' বা শিলাপাথরের 'মালিলিথান' বা গোয়ালপাড়ার 'সূর্য পাহাড়' সহ প্রায় সকল স্থানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

২৪.৩.৩ আহোম ভাস্কর্য

ত্রয়োদশ শতক থেকে ভাস্কর্যের ক্রমাবনতি লক্ষ করা যায়, যেটি অম্বারি শিল্পের শেষদিকে দেখা গিয়েছিল। সম্ভবত রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই এটি হয়েছিল। ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ—দীর্ঘ ছয় শতকের আহোম রাজত্বের প্রথমদিকে তেমন উন্নত শিল্পের নমুনা না পাওয়া গেলেও, আহোমরা হিন্দু ধর্মে অঙ্গীভূত হওয়ার পরে কিন্তু এই ধারার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এবং সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আবার মন্দির শিল্পের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি দৃষ্টি কেড়ে নেয়। কিন্তু ঐসব শিল্প ভাস্কর্যের মধ্যে ধ্রুপদী ধারার তুলনায় বরং স্থানিক প্রভাবই বেশি দৃষ্ট হয়। সুতানফা/শিবসিংহ (১৭১৪-৪৪) শিবসাগরে যে তিনটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন—শিবদেউল (সর্বোচ্চ), দেবীদেউল এবং বিষ্ণুদেউল—এর মধ্যে বিষ্ণুমন্দিরে শিবলিঙ্গ একই সাথে গুরুত্ব পেয়েছে, যেটি সচরাচর চোখে পড়ে না, কারণ বিষ্ণু ও শিবের অনুগামীরা সাধারণত ভিন্ন হয়ে থাকেন। আহোমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকে নিম্ন আসামের কামরূপ ধীরে ধীরে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং আসামের উপরিভাগে শিবসাগর শুধু আহোম ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুই নয়, শিল্প-সংস্কৃতিরও কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। আহোম স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মধ্যে 'নাগর' স্টাইল অনুসৃত হলেও এবং বেশিরভাগ মন্দির পুরাতন ভিত্তির উপর নির্মিত হলেও, কোচ-অনুসৃত কামাখ্যা মন্দিরের গঠনই গুরুত্ব পায়, যার মধ্যে মুসলিম প্রভাব ছিল স্পষ্ট। আহোম যুগের ভাস্কর্যে মনুষ্য মূর্তিগুলির মুখ সাধারণত চতুষ্কোণ, নেত্র রুদ্ধ অথবা অর্ধ-নিমীলিত, ভারী অধর, স্থূল নাসিকা—যেগুলির মধ্যে

স্থানীয় মানুষের চেহারার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মহিলাদের বক্ষও প্রাক-আহোম যুগের মতো অত উন্নত নয়। পোশাক বা বেশভূষার মধ্যেও আঞ্চলিক ছাপ আছে। অবশ্য শোণিতপুরের বা তেজপুরের ফুলাবাড়ি দেবালয়ের মূর্তিগুলির বেশভূষায় বাইরের প্রভাব রীতিমত স্পষ্ট। আসলে, ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ আহোম শিল্প-ভাস্কর্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরকম মাত্রা পেয়েছে, সকল স্থানে বিশেষ একটি নিয়ম বা রীতি মেনে অনুসৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। কিছু পশুর মূর্তি দেখে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে যায় এটি ঠিক কী ধরনের পশু। যেমন, গবাদি পশু মূর্তি স্বাভাবিক মনে হলেও মাইবং-এর পাথরে খোদাই 'সিংহ' মূর্তিটিকে চিনতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। সম্ভবত পশুরাজ সিংহ আসামে না থাকার জন্য শিল্পীর হয়তো জন্তুটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল না। আবার কুম্ভীর বা মকরের ক্ষেত্রে শিল্পীর জন্তুটির সম্পর্কে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থাকা স্বাভাবিক বলে মনে হলেও যেভাবে আহোম ভাস্কর্যে এটি স্থান পেয়েছে তাতে শিল্পীর কল্পনাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, যার ফলে বাস্তব চেহারার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। সুনেনফা/প্রমত্তসিংহ (১৭৪৪-৫১) রংপুরে যে 'রং-ঘর' বা প্রমোদ-ভবন নির্মাণ করেছিলেন তাতে অলংকার হিসাবে জোড়া মকরের মূর্তি উপরিভাগে স্থান পেয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঐ 'রং-ঘর'-এর উপর থেকেই রাজ-পরিবারের সদস্যরা সপারিষদ পরিবৃত হয়ে নীচে ডিম্বাকৃতি মুক্তাঙ্গণে হাতির লড়াই দেখতেন। ভাত ও ডিমের লেই দিয়ে পাতলা ইট জোড়া দিয়ে যেভাবে এই ধরনের অট্টালিকা এক সময় নির্মিত হয়েছিল এবং কালের আঘাত সত্ত্বেও যেভাবে আজও কিছুটা অক্ষত আছে সেটি দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

২৪.৩.৪ কারু বা দারু শিল্প ও ভাস্কর্য (Wood art and Sculpture)

আসামের অরণ্য-সম্পদ বিশ্ববিখ্যাত। অশ্বত্থ, বট, শাল, সেগুন, মেহগিনি, শাল্মলী, সপ্তপর্ণী তমাল, টিক, গামার, শমী, অর্জুন, দেওদার, অগুরু প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষরাজিকে কেন্দ্র করে আসামে দারু শিল্প গড়ে ওঠে। বাণভট্ট উল্লেখ করেছেন, কীভাবে হর্ষবর্ধনকে একটি মনোরম কাষ্ঠনির্মিত কাস্কেট কামরূপের ভাস্করবর্মন উপহার দিয়েছিলেন। তেজপুর তাম্রশাসনসহ অনেক লিপিতে অটবী ও ফুলের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আহোম রাজারা ইট ও পাথরের তুলনায় কাষ্ঠশিল্পকে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক বলে মনে করতেন। যাদের ছুতোর বা সূত্রধর বলা হয়, একসময় বাইরে থেকে তাদের আমদানি করা হত এবং স্থানীয় ভাষায় তাদের বলা হল 'খনিকর'। শিবসাগরে 'খনিকর'দের একটি এলাকা ছিল যে গ্রামটি আজও

'খনিকরগাঁও' নামে পরিচিত। আহোমরা দারু ও চিত্র শিল্পকে এত গুরুত্ব দিতেন যে, এই বিষয়গুলি দেখাশোনার জন্য 'খনিকর বরুয়া' নামে একটি পদ সৃষ্টি করেন। বিভিন্ন দেব-দেবতার মূর্তি ছাড়াও গরুড়, হনুমান, ময়ূরাসন, হংসাসন, গজাসন, টিয়া, সিংহ ইত্যাদি বিভিন্ন পশুপাখি এবং লতাপাতা-ফুলে-ফলে আচ্ছাদিত কাষ্ঠনির্মিত শিল্প ধর্মস্থানে এবং ব্যবহারিক জীবনে একইভাবে গুরুত্ব পেত। আসামের 'নামঘর'ও 'সত্র'গুলি ছিল 'খনিকর'দের প্রধান কর্মস্থল। বিভিন্ন 'সত্রে' সাধারণত চার হাতি, চব্বিশ সিংহ, সাত বাঘ-এর উপর নির্মিত 'সিংহাসন' আসামের দারু-শিল্পের অনুপম নিদর্শন। এছাড়া দরজা, জানালা, দেওয়াল, খিলান থেকে শুরু করে রাজপ্রাসাদ ও সত্রের প্রায় সবকিছুই ছিল কারুশিল্পে শোভিত। শেয়ালকুচির 'হাতি সত্র' কিংবা বরপেটার সত্রগুলিতে দারু শিল্পের মাধ্যমে 'ভাগবদ্'-এর দৃশ্যগুলি চিত্রিত ও অলংকৃত। পুথিপত্র ইত্যাদি পড়াশোনার জন্য ছিল 'খড়াই'। কাষ্ঠপাদুকা হিসাবে খড়ম ছিল জনপ্রিয়। দারু-শিল্পে শোভিত আসামের নৌকা, দোলা (পাল্কি) বা শিবিকা, লাঙল, তাঁতঘরে বস্ত্রবয়ন যন্ত্র, দণ্ড ও আসবাবপত্র ইত্যাদির বিবরণ প্রাচীন 'বুরঞ্জি'তে পাওয়া যায়। আধুনিক 'খনিকর'রা আসামের এক খড়্গ বিশিষ্ট গণ্ডার এবং কামাখ্যাসহ বিভিন্ন মন্দিরের অবিকল প্রতিরূপ কারুশিল্পের মাধ্যমে সৃষ্টি করে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

২৪.৪ চিত্রকলা (Painting)

আসামের পাণ্ডুলিপি ও পুঁথিপত্রে যেভাবে অতীতে চিত্রপটের অস্তিত্ব ছিল তার উপর নির্ভর করে চিত্রকলার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু অনুমান করা যায়। 'মহাভারত'-এর 'হরিবংশ' ও 'দ্বারিকা-লীলা'র কাহিনিকে ভিত্তি করে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রাচীন পুথি-চিত্রে 'চিত্রলেখা' নামে এক মহিলা পটুয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং আসামে প্রচলিত লোক-কাহিনি অনুযায়ী, তিনিই প্রথম চিত্রকলা শিল্পের জননী। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১.২ দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করা হয়েছে, কীভাবে শ্রীকৃষ্ণের দৌহিত্র অনিরুদ্ধ এবং রাজা বানাসুর-এর কন্যা ঊষার প্রেম ও মিলনকে কেন্দ্র করে এক সময় শোণিতপুর (বর্তমান তেজপুর)-এর জন্ম হয়েছিল। ঊষা যখন তাঁর স্বপ্নে-দেখা এক নায়ক (অনিরুদ্ধ)-এর কথা প্রিয় সখীর কাছে বর্ণনা করছিলেন, সেইসময় ঐ বর্ণনা শুনে কল্পনার ঐ নায়কের ছবি চিত্রলেখা এঁকেছিলেন এবং অনিরুদ্ধ-ঊষার প্রকৃত মিলনের প্রশ্নেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। এইভাবে এক মহিলার নামের সাথে আসামের অঙ্কন-বিদ্যা বা চারুকলার জন্ম-কাহিনি জড়িত। কামরূপে ভাস্করবর্মনের 'নিধনপুর তাম্রশাসন' দেওয়ালে ঝোলানো চিত্রপট, কিংবা

বলবর্মনের 'নওগাঁও লিপি'তে 'চিত্রশালা' অথবা বনমালের 'তেজপুর তাম্রশাসনে' মন্দিরের চিত্রিত প্রাচীর অথবা ইন্দ্রপালের 'গুয়াকুচি তাম্রশাসনে' সর্প-ঘেরা গরুড়ের চিত্র উল্লেখ ইত্যাদি দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, প্রাক্-আহোম যুগে চিত্রশিল্প কত উন্নত ছিল। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' গ্রন্থেও উল্লেখ আছে কীভাবে সপ্তম শতাব্দীতে কনৌজ-এর হর্ষের কাছে কামরূপের ভাস্করবর্মন যেসব উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে চিত্রাঙ্কনের সাজসরঞ্জামও অঙ্গীভূত ছিল।

আসামে অঙ্কনবিদ্যার বিভিন্ন পর্বকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) প্রাক-আহোম যুগের চিত্রশিল্প এবং (২) আহোম যুগের সৃষ্টি। আহোম যুগের শিল্পকে আবার কমপক্ষে তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) তাই-আহোম স্টাইল, (২) সত্রীয় চিত্রায়ণ, (৩) রাজকীয় গোরগাঁও ধারা।

২৪.৪.১ তাই-আহোম ধারা

তাই-আহোমরা ত্রয়োদশ শতকে আসামে প্রবেশের সময় থেকে তাঁদের পুরাতন ধর্মবিশ্বাস, বিভিন্ন প্রথা বা রীতি দীর্ঘদিন অক্ষত রেখেছিলেন এবং এটি অঙ্কন-শিল্পের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। প্রথমদিকে আহোমরা পুথি-চিত্রের মধ্যেই তাঁদের অবদান সীমিত রেখেছিলেন, দেওয়াল-চিত্র (mural) বা ভাঁজ করা/পাকানো চিত্র (Scroll Paintings)-র নমুনা দেখা যায় না। সান বা বর্মী প্রভাবে প্রভাবান্বিত তাই-আহোমদের আলেখ্যপটের নিদর্শন একমাত্র লন্ডনের 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম' অথবা রাজস্থানের জয়পুরে মানসিং জাদুঘরে পাওয়া যায়, অন্যত্র এগুলি দুর্লভ। মূলত দুটি পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করেই তাই-আহোমদের চিত্রিত শিল্প সম্পর্কে কিছু আন্দাজ করা যায়। এই দুটি পাণ্ডুলিপি হল (১) 'Phung Chin' (১৪৭৩ খ্রি.), (২) 'Suktanta Kyempong' (আনুমানিক ১৫২৩ খ্রি.)। থেরবাদ ও আহোম বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে 'Phung Chin'-এ ১৬টি স্বর্গ ও ১৬টি নরকের চিত্র আছে। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটিতে লোকধর্মের ধারণা আছে যা আজও বিভিন্ন বৌদ্ধ-বিহারের চিত্রপটে লক্ষ করা যায়। বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশের লোহিত জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ-বিহারের চিত্রফলকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—বিশেষত 'সান'-স্টাইল-এর প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। আহোম যুগে সাধারণত **তুলাপাত**-এ অঙ্কনের রীতি প্রচলিত ছিল। মহেশ্বর নিয়োগ (*The art of Painting is Assam* গ্রন্থে) তুলা থেকে ঐ পাণ্ডুলিপির পত্রগুলির সৃষ্টি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু চৈখাং-লেট্ গোঁহাই ও রজতানন্দ দাশগুপ্ত-র মতে, 'তুলাপাত' আসলে গাছের বাকল বা ছালের মণ্ড (wood pulp) থেকে প্রস্তুত হত এবং বিভিন্ন

রং-এর পত্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের গাছ বাছা হত। তালপাতায় লেখা পুঁথি যেমন বঙ্গদেশ বা ব্রহ্মদেশে প্রচুলিত ছিল, আসামে তালবৃক্ষ না হওয়ার কারণে তালপাতার পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি ছিল না বললেই চলে। অন্যদিকে 'তুলাপাত' তৈরি ও আকর্ষণীয় করতে রীতিমত বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন হত। যেহেতু পৃথিবীর মধ্যে চিনে প্রথম কাগজ তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং তাই-আহোমরা ভৌগোলিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে চিনাদের কাছাকাছি এই জন্য কাগজের আদিম রূপ 'তুলাপাত' তৈরি সম্পর্কে তাঁদের প্রাথমিক ধারণা ছিল এবং এরই উপর নির্ভর করে আহোমদের অঙ্কন-শিল্প প্রথম পর্বে বিকশিত হয়েছিল।

২৪.৪.২ সত্রীয় চিত্রকলা (Sattriya School of Painting)

তাই-আহোমদের 'তুলাপাত'-এর তুলনায় আসামের বিভিন্ন সত্রে (প্রথম খণ্ডের 'শব্দসূচি' পৃ. ৩৮১ দ্রষ্টব্য) অগুরু বা আগর গাছের বল্কল থেকে মণ্ডের মাধ্যমে **'সাঁচিপাত'** প্রস্তুত করে তাতে চিত্রীকৃত পুথি বা পাণ্ডুলিপি তৈরি হত। অনেক সময় ভাঁজ করা বা গোল করে পাকানো (scroll) মুগা বা অন্যান্য রেশম বস্ত্রে চিত্রাঙ্কন করে সত্রে টাঙিয়ে দেওয়া হত। 'খনিকর', 'লিখক' ও 'পটুয়া'রা এই কাজে পারদর্শী ছিলেন। অলংকরণের জন্য ভেষজ রং ব্যবহার করা হত—যেমন টকটকে লাল বা সিঁদুরে রং-এর জন্য 'হেঙ্গুল', তামাটে রং-এর জন্য গেরু-মাটি, হরিদ্রাভ বা বাসন্তী রং-এর জন্য 'হৈতাল', নীল ইত্যাদি। একটার সাথে অন্যটা মিশিয়ে সবুজ, গোলাপি, কমলা, বেগুনি বা নীল-লোহিত, পিঙ্গল বা পাঁশুটে, ধূসর বা পাণ্ডুবর্ণ ইত্যাদি তৈরি হত। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বৈষ্ণব সত্রে ও 'নামঘরে' এইরকম চিত্রিত অসংখ্য পুথি থাকলেও, বেশিরভাগই নানা কারণে নষ্ট হয়ে গেছে, যতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার থেকে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। সৃষ্টির রহস্য থেকে শুরু করে রামায়ণ, ভাগবত, পুরাণ এবং বিশেষত মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনি, এমনকি বাস্তব-জীবনে হাতি-সংক্রান্ত নানারকম তথ্যও চিত্রায়িত করা হয়েছে। বাণীকান্ত কাকতি (১৭.৪৩ দ্রষ্টব্য) 'বনমালীদেবর চরিত', 'গুরু-চরিত কথা' ইত্যাদি যেসব পুঁথি নিয়ে গবেষণা করেছেন তাতে শিষ্য-পরিবৃত শিক্ষা-মুদ্রায় উপবেশনরত স্বয়ং শংকরদেবের (প্রথম খণ্ডের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) বেশকিছু প্রতিকৃতির তিনি সন্ধান পেয়েছেন। আসলে, শংকরদেব নিজেই ছিলেন এক বড়ো চিত্রকর। তাঁর রচিত বিখ্যাত 'গুণমালায়' তিনি 'তুলাপাত' কাগজে লাল ও হলুদ রং-এ একটি হস্তী এঁকেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সত্রে অঙ্কনবিদ্যার যে ধারা শংকরদেব প্রবর্তন করেছিলেন সেটি ঊনবিংশ শতকের

শেষার্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। **এই সত্রীয় ধারার চিত্রকলাই আসাম চিত্রকলা নামে পরিচিত।**

চিত্র-বিশারদ মতি চন্দ্র সত্রীয় ধারার চিত্রমালায় প্রথম পর্বের একটি পুথি-চিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন সেটি সত্রে সৃষ্ট প্রতিটি চিত্র সম্পর্কে একইভাবে প্রযোজ্য। ১৫৩৯ সালে নওগাঁও-এর বালি-সত্রে ভাগবতের দশম অধ্যায় যেভাবে *চিত্র-ভগবতে* অঙ্কিত হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ছিল ঃ সাদামাটা পদ্ধতি, নাটকীয় উপস্থিতি, রং-এর জৌলুস বা চাকচিক্য এবং কাব্যিক গাথা (lyrical draughtmanship) যেগুলি, মতি চন্দ্রের ভাষায় "...give the *Bhagavata* illustrations a charm which distinguishes them from similar *Bhagavata* paintings from Udaipur and elsewhere"। *চিত্র-ভাগবত*-এর পর *বর-কীর্তন, ভক্তি-রত্নাবলী, আনন্দলহরী, গীত-গোবিন্দ, লব-কুশ যুদ্ধ* সহ অসংখ্য পুথি বৈষ্ণব সত্রে প্রণীত হয়েছে এবং প্রতিটি চিত্রপট একই ধারা অনুসরণ করেছে। এই চিত্রগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এগুলি আনুভূমিক এবং সমান্তরালভাবে পাশাপাশি চিত্রিত এবং এখানেই সুদীর্ঘ লম্বা ও সোজা ও খাড়া চিত্র—যেটি পারস্য বা ইউরোপে প্রচলিত—তার সাথে সত্র চিত্রের তফাত। একটা ফ্রেমের মধ্যে (architectural niches) মানুষ, পশু সহ প্রকৃতি এইসব পুথি-চিত্রে স্থান পেয়েছে। দেহের প্রতিটি অঙ্গের সৌষ্ঠব গঠনের তুলনায় একটি ঘটনা বা কাহিনিকে উপস্থিত করার উপরই পটুয়ার নজর ছিল বেশি। মুখ বা চোখের অভিব্যক্তির অভাব অনেক সময় বিভিন্ন মুদ্রা ও ভঙ্গির মাধ্যমে—'অভঙ্গ', 'ত্রিভঙ্গ', 'অতিভঙ্গ'—প্রকাশিত হত। আকাশের চিত্রায়ণেও বাস্তবের সাথে দূরত্ব বোঝা যেত। এইসব সত্ত্বেও ধর্মীয় কাহিনির উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে সত্রীয় চিত্র ধারার আকর্ষণ ছিল বিরাট। সাধারণের কাছে এই পুথি-চিত্রগুলি ছিল প্রণম্য। এরই জন্য হেমচন্দ্র গোস্বামী (১৭.৭৩ দ্রষ্টব্য) মন্তব্য করেছেন ঃ "The illustrations of the manuscripts by no means are the best specimens of Indian art"। অনেক সময় সুবনশিরি বা বুড়িদিহিং নদীর ধারে বালি থেকে 'সোনোয়াল'দের সংগৃহীত চূর্ণীকৃত স্বর্ণ বা 'সোনার পানি' চিত্রপটে ব্যবহার করে জৌলুস বৃদ্ধি করা হত। রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন এত চাকচিক্য সম্ভবপর ছিল না। সবসময় না হলেও অনেক সময় সত্রগুলি রাজ বদান্যতা থেকে বঞ্চিত হত না। শেষ আহোম রাজা পুরন্দরসিংহ'র (১৮৩৩-৩৮) আমলে চিত্রকর দুর্গারাম বেথা *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ*-এর কাহিনিকে এমন অসাধারণভাবে চিত্রায়িত করেছিলেন (বর্তমানে লন্ডনের 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম'-এ সংরক্ষিত) যেটি

দেখে চিত্র-সমালোচক J. P. Losty মন্তব্য করেছেন : *...this is the last of the great ones, in which the native Assamese Style has triumphantly reasserted itself over the desiccated Ahom court style.*

সত্রীয় বা আসাম ধারার শিল্পের মধ্যে অন্য শিল্পের প্রভাব ও স্বকীয়তা কতটুকু ছিল, তা নিয়ে চিত্রশিল্প বিশারদদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। মহেশ্বর নিয়োগ (১৭.৫৩ দ্রষ্টব্য) এবং রজতানন্দ দাশগুপ্ত—যাঁরা আজীবন এই শিল্প নিয়ে গবেষণা করেছেন—তাঁরাও এটিকে স্বতন্ত্র পরিচয় দিতে ইতস্তত করতেন। কিন্তু 'গীত-গোবিন্দ'র চিত্রায়ণ দেখে Kapila Vatsyayan স্পষ্টভাবে মন্তব্য করেছেন যে, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এটি একটি স্বতন্ত্র ধারা (...that the Assam miniature painting could form a separate school)। পাল বা ওড়িশি, এমনকি বিহারের মধুবনী চিত্রের সাথে আসাম শিল্পের তেমন মিল খুঁজে পাওয়া না গেলেও রাজস্থানি বা পাহাড়ি শিল্পের কিছু আদল বা সাদৃশ্য দেখা যায়, যদিও সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে স্থানিক শিল্পধারা।

২৪.৪.৩ রাজকীয় চিত্রকলা (Royal School of Paintings)

আসামের রাজকীয় চিত্রশিল্পের দুটি কেন্দ্র ছিল—দরং এবং গোরগাঁও। মঙ্গলদই-এর দরং রাজারা যে চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন সেটি মোটামুটি সত্রীয় ধারাই অনুসরণ করত। কিন্তু কোচ রাজাদের সামর্থ্য ছিল সীমিত, এজন্য আহোম রাজাদের মতো জাঁকজমক তাঁদের শিল্পে প্রতিভাত হয়নি। দরং ধারার শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল 'তীর্থকৌমুদী' (১৬৮৬ খ্রি.) যেটি আসামের বিভিন্ন শাক্ত-পীঠ সম্পর্কে বিবরণ ও চিত্রায়ণ। সত্রীয় চিত্রের মতো 'সাঁচিপাত'-এ এগুলি অঙ্কিত হত। দরং-এর এইসব পুথি ও পাণ্ডুলিপিতে পুরুষ মূর্তিগুলি ছিল দীর্ঘদেহী। নদীতে স্নানসহ 'বস্ত্রহরণ' ইত্যাদির দৃশ্যও এইসব পুঁথি চিত্রে স্থান পেত। যাইহোক, দরং রাজকীয় শিল্পে তেমন উল্লেখযোগ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না।

অন্যদিকে আহোম রাজকীয় স্টাইল বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, যেটি **গোরগাঁও ধারা** হিসাবে চিহ্নিত। যেহেতু আহোম রাজাদের রাজধানী ছিল শিবসাগরের কাছে গোরগাঁও এবং এই চিত্রশিল্প সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল না, এরই জন্য এটিকে Court art বা দরবারি শিল্প হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়। দরবারি শিল্প সম্পর্কে Stella Kramrisch যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি এইরকম : *Works of Court Art and thus being dependent largely on the will of*

one person, are freed from the necessity of creative forms, as peculior to national genious. যেহেতু রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন, সেজন্য রাজার মর্জি-মাফিক চিত্র তৈরি হত। সেই শিল্পে কতটুকু মৌলিক বা সৃজনশীল—সেই প্রশ্নটি ছিল গৌণ। এরই জন্য গোরগাঁও চিত্রশিল্পে অত অলংকরণ, ঔজ্জ্বল্য ও জাঁকজমক থাকা সত্ত্বেও কতটুকু স্বকীয়তা ছিল সেটি নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন এবং আসামের অগণিত সাধারণ মানুষের কাছে তথাকথিত গোরগাঁও ধারা অপরিচিতই রয়ে গেছে। **যেহেতু আহোম যুগে তুংখুংগিয়া বংশের শাসনকালে এই অঙ্কনশিল্প বিকশিত হয়েছিল এজন্য গোরগাঁও শিল্পের অপর নাম তুংখুংগিয়া শিল্প**। মুসলিম চিত্রশিল্পীদের ব্যাপক অবদানের মাধ্যমেই এই চিত্রপট সৃষ্টি হয়েছিল। মুঘল সম্রাট আলমগির বা আওরঙ্গজেবের সময় থেকে (১৬১৮-১৭০৭) চারুশিল্প নানাভাবে অবহেলিত হওয়ার ফলে মুঘল শিল্পীরা রাজধানী দিল্লি ত্যাগ করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আহোম রাজারা—বিশেষত রুদ্রসিংহ (১৬৯৬-১৭১৪) এবং তাঁর পুত্ররা এইসব পলাতক শিল্পীদের আশ্রয় দেন এবং প্রধানত তাঁদেরই মাধ্যমে গোরগাঁও শিল্পধারা গড়ে তোলেন, যার মধ্যে মুঘল শিল্পের প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। তবে মুঘল চিত্রের সাথে গোরগাঁও চিত্রের একটি পার্থক্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। মুঘল চিত্র ছিল পুরুষ প্রধান (masculine art), অন্যদিকে রাজকীয় গোরগাঁও শিল্পে রাজমহিষীদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যায়, কারণ এইসব রানিদের ফরমায়েশমতোই বেশিরভাগ ছবি তৈরি হয়েছিল। আহোম রাজার নির্দেশে 'খউন্দ্' ও 'বৈরাগী'রা সমগ্র দেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে সেইসব স্থানের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও নিদর্শনগুলি 'বুরঞ্জি'তে লিপিবদ্ধ করে আহোম দরবারে পেশ করতেন। এরফলে, আহোম শাসকদের অন্যান্য শিল্পধারা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা প্রাথমিক ধারণা ছিল। এরই জন্য আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : *It is to be seen to what extent the style of Hindu and Mughal (i.e. Indo-Persian with European influences) painting was modified by Mongoloid, Bodo and Ahom influences.* অন্য চিত্র-সমালোচকরা ভিন্ন ভিন্ন ধারার মিশ্রণে এই দরবারি শিল্পকে স্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হলেও সুনীতিকুমার কিন্তু এগুলিকে ভিন্ন গোত্রের শিল্প বলেই মনে করেন। তাঁর ভাষায় : *These pictures form separate styles of late mediaeval Indian painting which have their place of honour beside the better known Mughal, Rajasthani, Kangra and other styles.*

K. B. Iyer মনে করেন, 'মুঘল চিত্রকলার মতো গোরগাঁও চিত্রশিল্পও "faithful chronicler of the pomp, pageantry and personalities of the court. Realism was its keynote".

গোরগাঁও চিত্রকলায় একদিকে বাস্তবতাবোধ এবং অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়বস্তু ছিল মুখ্য আকর্ষণ। গোরগাঁও স্টাইলের প্রায় ৫০০ ছবি বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত আছে, যার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির 'পোর্টেট' বা প্রতিকৃতি অন্তর্ভুক্ত। পারসি ও মুঘল প্রভাবে প্রভাবান্বিত হলেও এইসব প্রতিকৃতি কিন্তু ইউরোপীয় ধারার প্রভাব থেকে কিছুটা মুক্ত এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ছিল অন্যতম আকর্ষণ। মহেশ্বর নিয়োগ এটিকে 'landscapes with green undulating plains and blue hills' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই ধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল, শিবসিংহ এবং রানী অম্বিকা দেবীর নির্দেশে সুকুমার বরকইথ প্রণীত পুথি-চিত্র ***হস্তীবিদ্যার্ণব*** (বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২.২.২.৩ দ্রষ্টব্য) যার অনবদ্য চিত্রগুলি এঁকেছিলেন দিলওয়ার এবং দোসাই নামে দুই চিত্রশিল্পী।

২৪.৫ সংস্কৃতি (Culture)

২৪.৫.১ আসামের মিশ্র সংস্কৃতি

বর্তমান ভারতে বসবাসকারী যে কোনো জাতি বা উপজাতি সুদূর অতীতে এদেশে এসেছিল বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে। বিভিন্ন জনজাতির মিলনে ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে যেমন বর্তমান আসামের জনগোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয়েছিল সংস্কৃতির অঙ্গনেও একই ধারা অব্যাহত ছিল। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, আসামে প্রথম অস্ট্রেলয়েড বা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অভিবাসন, এরপর উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে মঙ্গোলয়েড, পশ্চিমদিকের গাঙ্গেয় ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা বেয়ে ককেশিয়ানসহ **মানবজাতির বিভিন্ন প্রজাতির অভিবাসনের মধ্য দিয়ে আসামের জনগোষ্ঠী একদিন গড়ে উঠেছিল**। অসমিয়া ভাষার বিকাশে যেমন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অবদান ছিল, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আসামে এই জাতিগত ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ঘটে আসছে বহুকাল ধরে, যদিও মঙ্গোলয়েড প্রভাব অনেকটা বেশি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, দক্ষিণ ভারতের কিছু জনজাতির মতো সেদিনের আসামে নাগাদের মধ্যেও নিগ্রোয়েড প্রভাব লক্ষণীয়। বর্তমানে বোড়ো-কাছাড়ি, দেউরি, মিশিং, দিমাসা, কার্বি, লালুং, রাভা সহ কমপক্ষে ৪৫টি ভাষাভাষী ছোটোবড়ো জাতি-উপজাতি জনগোষ্ঠী আসামে অবস্থানের ফলে সংস্কৃতির আঙ্গিনাতেও এর

অনিবার্য প্রভাব এসেছে এবং ক্রমাগতভাবে এর উৎকর্ষ বেড়েই চলেছে। আসলে, **আসাম mini-India,** অনেকের মিলনে সৌধ গড়ে উঠেছে। যদিও ব্যাপকভাবে আসামের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে জাতি এবং উপজাতি সংস্কৃতি হিসাবে বিভক্ত করা হয়, তথাপি যে উপজাতি সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে আসামে সাংস্কৃতিক সৌধ গড়ে উঠেছে, সেই উপজাতি সংস্কৃতি আজও বিদ্যমান এবং সেটিকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া আজকের আসামের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার পক্ষে জরুরি, কারণ অসমিয়া ভাষা ও ব্যাকরণে সংস্কৃতায়নের (Sanskritisation) প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ। এই কারণেই মন্তব্য করা হয় ঃ

> *Assamese culture in its hybrid form and nature is one of the richest, still developing and in true sense is a 'cultural system' with sub-systems. It is interesting that many source–cultures of Assamese cultural system are still surviving either as sub-systems or as sister entities, e.g. Bodo, Khasi, Mising etc. Today it is important to keep the border system closer to its roots and at the same time to focus on development of the sub-systems.*

সংস্কৃতির শিকড়ের অনুসন্ধান যাঁরা করেন সেইসব পণ্ডিতদের মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) ভাষাতত্ত্ববিদ—যাঁরা প্রচলিত শব্দের মাধ্যমে ভাষার উৎপত্তি চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন ; (২) লোকবিজ্ঞানী—যাঁরা লোকসাহিত্য, লোককথা, প্রবাদ বা লোকসংগীতের কথা ও সুর থেকে উৎপত্তি নির্ণয় করেন ; (৩) নৃতত্ত্ববিদ—যাঁরা মনুষ্যদেহের গঠন দেখে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

১৯২০-র দশকের আগে আসামের শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে তেমন আগ্রহ বা আলোচনা আসামের পণ্ডিতমহলে দেখা যায়নি। বেশিরভাগ প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্প নিদর্শনগুলি মাটির নীচেই লুকিয়ে ছিল অনাদরে অবহেলায়। আসামের যে লোক-সংস্কৃতি নিয়ে আজ এত গবেষণা চলছে সেটিও আসামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে সমাদৃত হয়নি—এমনকি 'বিহু' সম্পর্কেও ছিল উন্নাসিকতা। ১৯২০-র দশকে খ্যাতির শিখরে থাকা 'বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট' থেকে শিক্ষিত হয়ে আসামের যে চারজন যুবক তাঁদের জন্মস্থানে ফিরে গিয়েছিলেন তাঁরাই প্রথম আসামের অবহেলিত শিল্প-সংস্কৃতির দিকে বর্তমান প্রজন্মের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। এই চারজন যুবক ছিলেন ঃ ডিব্রুগড়ের মুক্তানাথ বরদোলই, জোড়হাটের সুরেন বরদোলই, জগৎ সিং কাছাড়ি এবং তেজপুরের প্রতাপ বরুয়া। **আসামের বিদগ্ধ**

বুদ্ধিজীবী নীলমণি ফুকন অবশ্য মনে করেন, যে দুই আলোকদীপ্ত প্রতিভার অসামান্য কাজের ফলে আসামের সাংস্কৃতিক ইতিহাস নতুন প্রাণের সন্ধান পেয়েছিল তাঁরা হলেন সর্বেশ্বর কাকতি এবং 'রূপ কানোয়ার' জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা।

২৪.৫.২ আসাম সংস্কৃতির প্রতীক

আসামের সমাজ-সংস্কৃতির তিনটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে ঃ (১) 'তামুলপান', (২) 'গামোচা' (গামোসা), (৩) 'সোরাই'/'জোরাই' (Xorai)। (১) সুপারি ('গুয়া'/'গুবাক'—'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'—নজরুল ইসলাম) অর্থাৎ অধুনা অপ্রচলিত 'গুয়া' ('গুয়াহাটি' শব্দটিও তাম্বূলবাচক) বা খাসিয়ারা যাকে 'কুয়েই' বলে, সেটি তাম্বূল বা পান সহযোগ 'তাম্বূলপান' (betal+areca)—আসামের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৫.২.৩ দ্রষ্টব্য)। আহোম রাজ দরবারে তাম্বূলপান নিয়মিত সরবরাহের তদারকি করার জন্য 'তামূলি ফুকন' নামে এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক ছিলেন। জনজাতিদের মধ্যে খাসিয়ারা সর্বপ্রথম সম্ভবত এই অভ্যাসটি আমদানি করে থাকে কাম্পুচিয়া থেকে। অসমিয়া বাড়িতে অতিথিকে আপ্যায়ন করা হয় পান-সুপারি দিয়ে, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম নিবেদনের প্রথম পর্বের সূচনা হয় পরস্পরের মধ্যে পান আদান-প্রদানের মাধ্যমে (বাৎসায়নের *কামসূত্রে* এই প্রথার ইঙ্গিত আছে), বিবাহ-সহ প্রতিটি অনুষ্ঠানে পানের একটি বিরাট ভূমিকা আছে। খাসিয়ারা মৃতদেহের উপরে একটি পান রেখে বিদায় জানায়। (২) আসামের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক 'গামোচা' বা 'গামোসা'কে আমাদের পরিচিত গাত্রমার্জনী গামছার সাথে তুলনা করলে ভুল হবে। সাধারণত আয়তক্ষেত্রাকার সাদা কাপড়ের (মাঝে মাঝে রেশমের) তিনদিকে লাল দাগের পরিসীমা চিহ্নিত করে এই অঙ্গাবরণের চতুর্থ প্রান্তে থাকে হস্তশিল্প। প্রার্থনা-সভায় বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী অতিথিদের গলায় বা কাঁধে 'গামোসা' বা উত্তরীয় দিয়ে বরণ করার রীতি আজও প্রচলিত। মাথায় 'গামোসা' জড়িয়ে বিহু নৃত্যে অংশগ্রহণ অথবা বয়স্কদের এই উত্তরীয় দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন আজও অব্যাহত। ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থকে 'গামোসা'য় মুড়ে রাখা বিভিন্ন সত্রের প্রচলিত রীতি। যেহেতু 'গামোসা' জীবন ও আসামের সংস্কৃতির প্রতীক এজন্য ধর্ম-বর্ণ, জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে সকলের কাছেই এটি সমানভাবে জনপ্রিয়, যদিও অলংকরণ ও রং ব্যবহারের প্রশ্নে কিছু জনগোষ্ঠীর কাছে একটু ভিন্ন রূপ পায়।

(৩) 'সোরাই' বা 'জোরাই' অর্থাৎ তাম্বূলাধার বা পানদান আসামের অস্ট্রো-এশিয়াটিক সাংস্কৃতিক জীবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। সাধারণত পিতল বা কাঁসায় এবং কিছু ক্ষেত্রে রূপায় নির্মিত এই পানের বটুয়াগুলির মুখ অনেক সময় আবৃত থাকে, আবার মাঝে মাঝে অনাবৃত এবং প্রধানত কামরূপ জেলার হাজো ও সার্থেবাড়ি এলাকায় এগুলি নির্মিত হয়। প্রচলিত পানের বাটাগুলির তুলনায় এগুলি একটু ভিন্ন গোত্রের, কারণ কারুকার্য-শোভিত ধাতুর পাত্রে এটি দণ্ডায়মান। যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ও সম্মানিত অতিথিদের 'সোরাই'/'জোরাই'-এ তামুলপান পরিবেশন করে আপ্যায়ন করা হয়। অনেক সময় 'নামঘরে'র সামনে 'সোরাই'-এ তামুলপানের সাথে ফলমূলও রাখা হয় দেবতার শুভদৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আধুনিক যুগে 'বিহু' উৎসবের সময় কিছু স্থানে অলংকারের প্রতীক হিসাবেও 'সোরাই' রাখা হয়।

২৪.৫.৩ অন্যান্য প্রতীক ও 'নামঘর'

আসামের সংস্কৃতির প্রতীয় হিসাবে আরও কিছু সামগ্রীকেও অঙ্গীভূত করা যায়, তবে ব্যবহারিক জীবনের তুলনায় বেশিরভাগই সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যেই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন, বিচিত্র ধরনের অসমিয়া সিংহ, উড়ন্ত সিংহ, ড্রাগন অথবা ড্রাগনরূপী সিংহ ইত্যাদি যেগুলির মূর্তি বিশেষ উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়। আসামের পাহাড় ও সমতলে অনেক উপজাতি আছে যাদের ধর্ম সর্বপ্রাণবাদ (animism) থেকে হিন্দু ধর্ম এবং কিছু খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেও উপরোক্ত প্রতীকগুলি সকলের কাছেই সমানভাবে প্রিয়। আন্তরিক আতিথেয়তা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন, পূর্বপুরুষকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ, আনন্দানুষ্ঠানে রেশম অথবা পরিচ্ছন্ন শ্বেতবস্ত্র পরিধান ইত্যাদি আসামের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে হিন্দুধর্মভুক্ত আসামের মানুষের কাছে সবচেয়ে বড়ো পরিচয় নববৈষ্ণব আন্দোলনের ফসল তাদের 'সত্র' ও 'নামঘর'। এই দুটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন অসমিয়া সংস্কৃতিকে কত ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে অসমিয়া সংস্কৃতির পিতা শ্রীমন্ত শংকরদেব সংক্রান্ত আলোচনায় কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চদশ শতকে **মাজুলি দ্বীপেই প্রথম সত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল**। পরবর্তী সময় মাজুলিতে ৬৫টি সত্র স্থাপিত হলেও, বন্যা ইত্যাদি নানা কারণে সেটি কমে বর্তমানে ২২টিতে দাঁড়িয়েছে। কোনো নদ বা নদীর উপর এত বড়ো দ্বীপ পৃথিবীতে নেই। দীর্ঘ ১,২৫০ বর্গ কিমি জোড়া (যদিও ভাঙন ইত্যাদির কারণে বর্তমানে ক্ষয়প্রাপ্ত) এই দ্বীপে ছোটো বড়ো মিলিয়ে ২৪৩টি গ্রামে নামঘর আছে এবং এক-একটি গ্রামে একাধিক। মাজুলি

বর্তমানে জোড়হাট জেলার একটি মহকুমা এবং বেশিরভাগ এলাকা মিশিং, দেউরি ইত্যাদি উপজাতি অধ্যুষিত। **একসময় এই দ্বীপই ছিল 'শংকরী সংস্কৃতি'র (শংকরদেবের নাম অনুসারে) প্রধান কেন্দ্র**। বর্তমানে সমগ্র আসামে ৫০০'র বেশি 'সত্র' এবং হাজার হাজার 'নামঘর' আছে। একসময় 'নামঘর'গুলি কীর্তন-ঘর হিসাবেই পরিচিত ছিল এবং বেশিরভাগই ছিল বাঁশ, মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালের, কিন্তু ক্রমে টিনের চাল, পাকা মেঝে ইত্যাদি প্রবর্তিত হয় এবং 'ভাওনা' নাটক, শাস্ত্রীয় ও লোক নৃত্য থেকে শুরু করে গ্রামের যাবতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'নামঘরেই' পরিবেশিত হয়। সাদামাটা 'নামঘরের' স্থাপত্য শুধু যে দৃষ্টিনন্দন বা নান্দনিক তাই নয়, একটি গ্রামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য 'নামঘর'-এর মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। সাধারণত সন্ধ্যাবেলায় (যদিও প্রতিদিন নয়) গ্রামের সকলে 'নামঘরে' সমবেত হয়ে এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপভোগ করে। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু গৃহেও 'নামঘর' দেখা যায়।

২৪.৫.৪ বিহু

আসামের সবচেয়ে বড়ো উৎসব 'বিহু' যাতে জাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করে। এই ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবটি মূলত কৃষি বা ধানচাষের সাথে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত। যদিও বিহুগানের সাথে সংস্কৃত ভাষার কোনো যোগাযোগ নেই, তথাপি পণ্ডিতদের অনুমান 'বিহু' নামটি সম্ভবত সংস্কৃত 'বিষুবন' থেকে এসেছে। অন্যদিকে আর একটি ধারণা হল, চুটিয়া উপজাতি শব্দ 'বিষু' থেকেই 'বিহু'র জন্ম। যেখান থেকেই শব্দটির জন্ম হোক্, 'বিহু' গান বা নৃত্যে আসামের জাতি ও উপজাতি নিজের মতো করে অংশগ্রহণ করে এবং খাসি ও গারো সমাজেও এটি প্রচলিত।

আসামের প্রতি বছর যে **তিনটি বিহু** পালিত হয় সেগুলি হল : (১) **বহাগ** (বৈশাখ) বিহু, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে যখন বসন্তের শেষে নতুন বছর শুরু হয়। এটি **'রঙালী'** (হাসি-খুশি আনন্দের) বিহু নামে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এইসময় কৃষক খেত প্রস্তুত করে চাষের জন্য। বেশ কিছুদিন ধরে এক একটি বিহু উৎসব স্থায়ী হয়। বিহুর আগের দিনটি 'উডুকা' নাম পরিচিত এবং ঐ দিন নানারকম আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। হেম বরুয়ার মতে, প্রকৃতির ঋতুচক্র আবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে, আচার-অনুষ্ঠানে ও গীতনৃত্যের যোগে মানুষের আদিম বাসনা চরিতার্থ করার (fertility cult) উৎসব হল বিহু এবং 'রঙালী' বিহুই এব্যাপারে প্রথম।

(২) **'মাঘ বিহু'** (মাঘ মাস অর্থাৎ জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে) যে সময় সোনার ধান কেটে গোলায় তোলা হয়। এটি **'ভোগালি'** (ভোগ = ভোজন) বিহু নামেই জনপ্রিয়। মাঘ বিহুর আগের দিন পৌষ-সংক্রান্তির দিনটিকে বলা হয় 'উরুকা'। এটি আসলে পুলি বা পিঠে পার্বণ উৎসব। 'মেজি' বা বুড়ি ঘরে পরদিন অগ্নিসংযোগ, চড়ুইভাতি ইত্যাদির মাধ্যমে এই বিহু'র সূচনা।

(৩) **'কাতি-বিহু'** (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বরে) যে সময় কৃষকের গোলা প্রায় শূন্য থাকার ফলে বিশেষ আমোদ-প্রমোদ হয় না। এটি **'কঙালি' (কাঙালি)** বিহু নামেও পরিচিত। এই সময়ে প্রত্যেকটি ক্ষেতে বীজধানের চারা বোনা হয় এবং তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে ও নাচগানের মাধ্যমে উন্নত ফসল কামনা করা হয়। বিহু গীতের ভাষা সময় পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়। প্রতিটি বিহু'র নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তবে সবগুলির সাথেই কৃষিকাজের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে।

মিরি উপজাতিরা উপরোক্ত তিনটি বিহু ছাড়াও অতিরিক্ত আরও দুটি বিহু উৎসব পালন করে—একটি 'আহু' বা আউস ধান বপনের আগে এবং দ্বিতীয়টি আউস ধান কাটার পরে। অরুণাচলের 'আদি' জনগোষ্ঠী বিহুর মতোই ফসল কাটার **'সলুং'** উৎসব পালন করে সপ্তাহব্যাপী। বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কৃষিকাজ ও যৌবনের নৃত্য-গীত এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে আদিম কোনো জনজাতির জীবনে 'বিহু' উৎসবের সম্ভবত সূচনা ঘটে থাকতে পারে। 'বিহু' সাধারণ মানুষের উৎসব, সমাজের উচ্চবর্ণ বা সম্ভ্রান্তরা প্রথমে এই উৎসবে অংশ নিতেন না, অবশ্য শংকরদেবের নববৈষ্ণব আন্দোলনের পর এই দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। B. N. Dutta 'বিহু'র বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন : "...the *bihu* dance is characterised by brisk steppings, flinging of the hands and vigorous hip movements symbolizaing ecstacy and desire for union. The *bihu* form of expression must have evolved through the syncretism of the tribal and non-tribal, the Indo-Mongoloid and the Indo-Aryan".

প্রথম দিকে কেউ কেউ 'বিহু'কে বিকৃত সংস্কৃতি হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেও সেটি অবশেষে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে আসাম-সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ 'বিহু' যেটি বাদ দিলে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ হয় না। নগরায়ণের ফলে 'বিহু' উৎসবের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন এসেছে এবং ভাড়া করা শিল্পীরা শহরের নানাস্থানে কিছুটা কৃত্রিমভাবে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতিকে পরিবেশন করলেও

'বিহু'র মাধুর্য কিন্তু আজও অক্ষত এবং 'বিহু'র সাথে আসামের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

২৪.৫.৫ 'সত্রীয়' বা 'শংকরি সংস্কৃতি' এবং প্রায়োগিক শিল্প

সংগীত, সংগীতজ্ঞ ও সংগীত যন্ত্রের বর্ণনা প্রাচীন অসমিয়া সাহিত্যে—বিশেষত 'চরিত' ও 'বুরঞ্জি'তে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে চতুর্দশ শতকের মাধব কন্দলি রচিত *রামায়ণ* কিংবা হরিহর বিপ্র'র *লব-কুশর যুদ্ধ* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য যেখানে *মল্লার, বৈতালিক, ভেরি, ঝাঁজর, শিঞ্জিনী, বিষাণ, দোতারা, বীণা* ইত্যাদি রাগ ও যন্ত্রসহ *গায়েন, বায়েন* প্রভৃতি অবহিত করা হয়েছে। পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতকে ভক্তি-আন্দোলনের সময় সংগীত, নৃত্য, নাটক ইত্যাদি প্রভূত গুরুত্ব পায়। শ্রীমন্ত শংকরদেবের (১৪৪৯-১৫৬৮) বর্ণাঢ্য আকর্ষণীয় চরিত্রের ফলে প্রতিটি শিল্পকলা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়ে ওঠে এবং নব-বৈষ্ণব আন্দোলনের 'সত্র' ও 'নামঘর'গুলি প্রধান কেন্দ্র-বিন্দুতে পরিণত হয়। ক্রমশ শংকরদের, মাধবদেব প্রভৃতি নব-বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রচারকরা হয়ে ওঠেন আসাম সংস্কৃতির প্রাণ ও অহংকার। **শংকরদেবের নামানুসারে সত্রের আঙিনায় এই সংস্কৃতিকে 'শংকরী সংস্কৃতি' বলা হয় ; যেটি 'সত্রীয় সংস্কৃতি'র অপর নাম**। 'বরগীত', 'অংকর গীত', 'ভাতিমা', 'ঘোষা', 'লেছাড়ি', 'তোতাই' প্রভৃতি সংগীত, নানারকমের নৃত্য ঃ যেমন, কৃষ্ণ, সূত্রধর, বেহার, নটুয়া, গোপী, নাড়ুভঙ্গী, রাস-ঝুমুর ইত্যাদি শংকরদেব ও মাধবদেবের অঙ্গুলি স্পর্শে অনবদ্য হয়ে ওঠে এবং *সত্রীয়* বা *শংকরি সংস্কৃতি'র* প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

২৪.৫.৫.১ 'সত্রীয় নৃত্য'

অঙ্কিয়া-নট বা একাঙ্ক নাটকের অঙ্গ হিসাবে শংকরদেব ৫০০ বছর আগে *সত্রীয় নৃত্য* সৃষ্টি করেছিলেন এবং এটি বিভিন্ন সত্রেই একমাত্র প্রদর্শিত হত। কিন্তু এই উন্নত নৃত্যের আবেদন এত ব্যাপক ছিল যে ক্রমে পরবর্তী সময়ে—অর্থাৎ বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সত্রের বাইরেও এটি দেখানো হত। *সত্রীয় নৃত্যকে* দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ (ক) পৌরাণিক বা তাণ্ডব ভঙ্গি বা পুরুষ-প্রধান, (খ) স্ত্রী বা লাস্য ভঙ্গি, অর্থাৎ যে নৃত্য মহিলা-কেন্দ্রিক। সত্রের আঙিনায় একমাত্র পৌরাণিক ভঙ্গিই অনুমোদিত ছিল এবং অক্ষরে অক্ষরে ধ্রুপদী নৃত্যের ব্যাকরণ মেনে এটি পরিদর্শিত হত। এরফলে এই নৃত্যের নিজস্বতা, পবিত্রতা বা শুদ্ধতা দীর্ঘদিন অক্ষত ছিল। তবে সত্রের আওতার বাইরে আসার পর এবং লাস্য ভঙ্গি প্রবর্তিত হওয়ার পর এর জনপ্রিয়তা প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এটি

ধর্মাশ্রিত নৃত্য। ***নাট্যশাস্ত্র* অনুমোদিত মন্দির-নৃত্য** 'ভারতনাট্যম' এবং 'ওড়িশি' ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদী মর্যাদা পেলেও 'সত্রীয়' নৃত্যের ক্ষেত্রে এটি বিলম্বিত হয়। **অবশেষে ১৫ নভেম্বর ২০০০ সালে 'সংগীত নাটক অকাদেমি' এই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। আজ ভারতবর্ষে যে ৮টি নৃত্য 'ক্ল্যাসিকাল' পর্যায়ভুক্ত** (তামিল-নৃত্য **'ভারতনাট্যম'**, উড়িষ্যার **'ওড়িশি'**, তেলেগু-নৃত্য **'কুচিপুদি'**, মণিপুরের **'মণিপুরি'**, কেরালার **'মোহিনীঅট্টম'** ও **'কথাকলি'**, উত্তর ভারতের **'কত্থক'** এবং আসামের **'সত্রীয়') তার মধ্যে দুটিই উত্তর-পূর্ব (মণিপুর ও আসাম) ভারতের।** বর্তমানে গুয়াহাটির 'নর্তন কলা নিকেতন' যুব সম্প্রদায়কে এই নৃত্যকলার প্রশিক্ষণ দিয়ে ও দক্ষ করে সংস্কৃতির বিশ্বমঞ্চে আসামের স্থান পাকাপোক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২৪.৫.৫.২ 'দেওধনী' ও 'ওজাপালি'

সত্রীয় নৃত্য ছাড়াও আসামে কিছু পুরাতন নৃত্য দীর্ঘদিন চালু ছিল—এর মধ্যে *শংকরী-সংস্কৃতি*র অঙ্গ হিসাবে বরপেটার *ভোরতাল নৃত্য* উল্লেখযোগ্য। বরপেটা আসামের নব-বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র এবং বরপেটার সাধারণ মানুষের উপর সত্রের প্রভাব খুবই গভীর। 'ভোরতাল' বা বড়ো মাপের খঞ্জনি বা কত্তাল বা ঝাঁজর আসলে তিব্বতীয় 'ভোটা-তাল' থেকে সংগৃহীত বলে সংগীতজ্ঞরা মনে করেন। এছাড়া *দেওধনী, ওজাপালি* ইত্যাদির প্রভাবও একসময় কম ছিল না, কারণ ঐ দুটিই অবৈষ্ণব প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও সর্পদেবী মনসার বন্দনার সাথে জড়িত। কামাখ্যার পুরুষ দেওধাদের মতো কুমারী *দেওধনী* দেবদাসীরা বাস্তবজ্ঞানরহিত অবস্থায় কপালে সিঁদুরের প্রকাণ্ড একটি টিপ পরে দীঘল এলোচুল ছড়িয়ে চারিদিকে মাথা ঘুরিয়ে নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত। 'খাম' বা জয়ঢাক ও ভুটিয়া করতালের ক্ষিপ্র বাদনের সঙ্গে তাল রেখে যেভাবে '*দেওধনী*' নারী-নৃত্য পরিবেশিত হত সেটি তাণ্ডব-নৃত্যের সাথেই তুলনীয়। আহোম রাজমহিষী ফুলেশ্বরীর সময় থেকে **দেবদাসী প্রথা** ও নৃত্যের প্রবর্তন হলেও সেটি আসামে তেমন আদৃত হয়নি, যদিও *দেওধনী* নৃত্যের আকর্ষণ ছিল। অন্যদিকে আসামের জনসাধারণের কাছে 'ওজাপালি' এতই জনপ্রিয় ছিল যে, *ওজাপালি*'র প্রকৃতি অবৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও, শংকরদেবের অনুগামীরা তাঁদের নব-বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য *ওজাপালি* অনুষ্ঠানের করণ-কৌশল প্রয়োগ করতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছিলেন। 'ওজা' হলেন প্রধান নেতা যিনি গান ও কথার মাধ্যমে কিছুটা নাটকীয় ভঙ্গিতে গল্পটি পরিবেশন করতেন, এবং 'পালি' হল সহযোগী গায়ক

ও বাদক, যাদের নৃত্যে ধ্রুপদী ভঙ্গিতে মুদ্রা, গতি, ভ্রমরী, উৎপ্লবন, আসন ইত্যাদির সঞ্চালনের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যায়। 'ওজা' সাধারণত তিনটি ভাগে সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে ভাগ করতেন, দেব-খণ্ড, বানিয়া-খণ্ড ও ভাটিয়ালি-খণ্ড। পরবর্তী সময়ে মনসা ছাড়াও মহাকাব্য ও পুরাণ-এর বিভিন্ন গল্প একই ভঙ্গিতে অভিনীত হত এবং এটিই ছিল *শংকরী সংস্কৃতি*তে *ওজাপালি*'র মূল আকর্ষণ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'ওজাপালি' সংগীতের সুরের সাথে ভুটিয়া ও তিববতীয় বৌদ্ধ সুরের যথেষ্ট মিল আছে। এছাড়া আহোমদের 'তাই' সংস্কৃতির প্রভাব বিভিন্ন অঙ্গে নানাভাবে জড়িত।

২৪.৫.৫.৩ 'অঙ্কিয়া-নট' ও 'ভাওনা'

শংকরদেব ও মাধবদেব প্রণীত এক অঙ্কের নাটককে সাধারণত 'অঙ্কিয়া-নট' বলা হয়। এই নাটকের প্রায়োগিক দিক 'ভাওনা' নামে পরিচিত'। পুরাতন পদ্ধতিতে শুদ্ধতা বজায় রেখে উপরোক্ত বৈষ্ণব প্রচারকদের যে নাটক উপস্থিত করা হয় সেটি 'অঙ্কিয়া-ভাওনা' এবং 'অঙ্ক' ও 'নট' উভয়ের মিলনে অর্থাৎ 'অঙ্কিয়া-নট'-এর আদলে বা মডেলে অন্যদের রচিত নাটককে এবং অভিনয়কে শুধুমাত্র 'ভাওনা' বলার রেওয়াজ আছে। গ্রামের 'নামঘর' ও 'সত্র'গুলিতে 'অঙ্কিয়া-নট' ও 'ভাওনা' অভিনীত হত। প্রধানত বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের দিকে লক্ষ রেখেই শংকরদের ও মাধবদেব এই নৃত্য-নাটকের প্রচলন করেছিলেন। ১৫১৮-১৫৬৮'র মধ্যে শংকরদেব ৬টি এইরকম এক অঙ্কের নাটক প্রণয়ন করেছিলেন—যেমন, 'পাটনি-প্রসাদ', 'কালী-দমন', 'কেলি-গোপাল', 'রুক্মিণী-হরণ', 'পারিজাত-হরণ' এবং 'রাম-বিজয়'। শুধুমাত্র শেষের নৃত্য-নাট্যটি অর্থাৎ 'রাম-বিজয়'-এর কাহিনি 'রামায়ণ' থেকে সংগৃহীত, বাকি সব নাটকের কাহিনি 'ভাগবত' থেকে আহরিত। আসলে, 'অঙ্কিয়া-নট' মূলত শ্রীকৃষ্ণ অথবা বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের উপর কাহিনি-ভিত্তিক। ধ্রুপদী সংস্কৃত গ্রন্থের মূল কাহিনি থেকে বিচ্যুত না হয়ে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মিশ্রিত করে এইসব নৃত্যনাট্য অভিনব ভঙ্গিতে রচিত হয়েছিল। কালিরাম মেধি (১৭.১৩ দ্রষ্টব্য), বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া (১৭.৪৬ দ্রষ্টব্য), মহেশ্বর নিয়োগ (১৭.৫৩ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে, শংকরদেব ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতের সাথে 'ধুলিয়া' বা 'ওজাপালি'র নাট্যগুণের মিশ্রণে এইসব একাঙ্ক নাটক তৈরি করে অসমিয়া নাটকের ইতিহাসে এক নবদিগন্ত সৃষ্টি করেছিলেন। 'ভাওনা'র যিনি সূত্রধার, তিনি নাটকের কোনো চরিত্র না হলেও *যাত্রার বিবেক*-এর মতো অভিনয়ের অপরিহার্য অঙ্গ। তিনি সংস্কৃতি শ্লোক উচ্চারণ করেন, নৃত্য

ও গীতের মাধমে ব্রজবুলি ভাষায় গল্পটি ব্যাখ্যা করেন এবং বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে একই সূত্রে বাঁধেন। সূত্রধারের এই ভূমিকা থেকে আবার সূত্রধারী নৃত্য, কৃষ্ণভঙ্গি, গোপীভঙ্গি, প্রবেশ ও প্রস্থানের বিশেষ বিশেষ নৃত্যরূপের উদ্ভব হয়েছে। সূত্রধারের মুখের ভাষা, ভঙ্গির পবিত্রতা ও ভূমিকা দেখে মনে হয় তিনি যেন দেবতার প্রতি ভক্তদের ভক্তি নিবেদনের একটি প্রতিমূর্তি। পূর্বে যুবকরাই সাধারণত নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। মার্গ সংগীতের বিশেষ বিশেষ রাগ ও তালে নৃত্য ও গীত *ভাওনা*'র প্রধান আকর্ষণ। নব-বৈষ্ণব আন্দোলনের নৃত্য, গীত ও নাটকাভিনয়ের ক্রমাগত প্রসারণ একসময় সুর ও ভক্তির তরঙ্গে সমগ্র আসামকে প্লাবিত করেছিল এবং গানের ক্ষেত্রে শংকরদেবের *কীর্তন-ঘোষা*, মাধবদেবের *নাম-ঘোষা*, অথবা *অঙ্কিয়া/ অঙ্কর গীত*, বিভিন্ন 'নাম-সুর' ছিল অগণিত মানুষের প্রাণ।

২৪.৫.৫.৩.১ অন্য সংস্কৃতির প্রভাব

আসাম ললিতকলা একাডেমি'র প্রাক্তন সম্পাদক প্রদীপ চালিহার মতো কিছু সংগীত ও নৃত্য-নাটক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, আসামে মার্গ সংগীতের চর্চা প্রাচীনকালেও ছিল, তবে 'অঙ্কিয়া-নট' ও 'ভাওনা'র মাধ্যমে এটি বিকশিত হয়েছিল ধ্রুপদী ধারার বাইরে অন্য কোনো প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে। মার্গ সংগীতের অনেক রাগরাগিণীর মধ্যেও আসামে আঞ্চলিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, 'সারঙ্গ', 'ভৈরব', 'পাহাড়ি', 'চৌরথ' ও 'বেলি' হল এই ধরনের রাগ। তাছাড়া আসামে 'আকাশমণ্ডলী', 'বায়ুমণ্ডলী', 'দেবজিনি'-র মতো এমন কয়েকটি রাগ আছে যেগুলি ভারতের অন্যত্র শোনা যায় কি না সন্দেহ আছে। কৃষ্ণের বংশীধারণের মুদ্রাটি অসমিয়া 'ভাওনা'তে কিছুটা ভিন্নরকম। যেহেতু আহোম রাজাদের আমলে আসাম ও মণিপুরের রাজ-পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, সেই সূত্রে উভয় রাজ্যের সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া নৃত্য-নাট্যের ক্ষেত্রে 'ভাওনা'র মধ্যে উত্তর ভারতের কিছু প্রভাবও লক্ষ করা যায়। 'অঙ্কিয়া-নট'-এর সূত্রধারের পোশাক এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। **সূত্রধারের 'ঘুরি' বা পুরুষদের ঘাগরা, জামা ও পাগ্ বা পাগড়ি মুঘল দরবারের রাজকীয় পোশাকের সাথে মিলে যায়। সপ্তদশ শতক থেকে আহোম রাজারা মুঘলদের রাজকীয় পোশাক-আশাক ধারণ করতে শুরু করেন** এবং 'অঙ্কিয়া-নট'-এর ক্ষেত্রে দরবারের পৃষ্ঠপোষকরা সম্ভবত সত্রের কলাকারদের এই ধরনের পোশাক পড়তে উৎসাহিত করে থাকবেন। উত্তর ভারতের কত্থক শিল্পীরা যেমন তালের সাথে সংগতি রেখে পায়ের নূপুর বাজিয়ে নাচেন, একই ভঙ্গিতে 'অঙ্কিয়া

নট’-এর সূত্রধার ক্ষিপ্রগতিতে বায়েনের খোলের বোলের সাথে তাল রেখে নৃত্য পরিবেশন করেন। নাচ, গান, অভিনয়ের এরকম অপূর্ব মিলন দেখে M. M. Ghosh (*Contributions to the Study of Hindu Drama* গ্রন্থে) ‘অঙ্কিয়া-নট’-এর সাথে সংস্কৃত নাটকের মিল ও অমিল প্রশ্নটি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে শংকরদেবের দীর্ঘ তীর্থ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তথাকথিত আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলনে প্রভূতভাবে সাহায্য করেছিল। শংকরদেব শুধু নিজেই যে বিরাট মাপের শিল্পী ছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর পিতার কাছে ভারতীয় গন্ধর্ববিদ্যা ও ধ্রুপদী শিল্পকলা সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন সেটি পিতাকে ‘গন্ধর্ব’ সম্বোধনেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বাংলার বৈষ্ণবদের ‘সংকীর্তন’ পদ্ধতিও শংকরদেব চালু করেন। রুদ্রসিংহ ও শিবসিংহ ‘হিন্দুস্তানি’ সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করার ফলে ‘পাখোয়াজ’সহ অনেক নতুন সংগীত-যন্ত্রের সৃষ্টি ও প্রচলন শুধু দরবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সত্র ও ‘নামঘরে’ও চালু হয়েছিল এবং ‘অঙ্কিয়া-নট’ ও ‘ভাওনা’ এইসব যন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। নওগাঁও ও শোণিতপুর জেলায় ‘অঙ্কিয়া-নট’ ও ‘ভাওনা’কে কেন্দ্র করে ব্যাপকভাবে নানা সাংস্কৃতিক উৎসব পালিত হয়। Kapila Vatsyayan এই দুই ধরনের নৃত্য-নাটকের গড়ন ও পরিবেশনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বিভিন্ন স্থান থেকে কীভাবে শংকরী শিল্প সংস্কৃতি নানা সম্পদ আহরণ করেছিল সেটিকে ‘extra-regional dimension’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

২৪.৫.৫.৩.২ মুখোশ

‘ভাওনা’র অন্যতম উপকরণ হল মুখোশ। শংকরদেব তাঁর প্রতিটি নাটকে মুখোশের ব্যবহার করতেন এবং ক্রমশ অসমিয়া সংস্কৃতির বুনিয়াদ হয়ে ওঠে মুখোশ। সাধারণত লোকসংস্কৃতিতে মুখোশের ব্যবহার হত এবং তিববতীয় লামা বৌদ্ধ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অভিনেতারা অতীতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতেন। শংকরদেব বরপেটার সত্রে কাঠের মুখোশ তৈরি করেছিলেন। কাঠ ছাড়া বাঁশ, পোড়ামাটি এবং ধাতুর মুখোশও পরবর্তী সময়ে ব্যবহৃত হত এবং শংকরি সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে মাজুলি দ্বীপ মুখোশ তৈরির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে কোনো চরিত্রকে—বিশেষত দেবদেবী বা জন্তু ইত্যাদিকে জীবন্ত করার ব্যাপারে আসামে শংকরদেব এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং তিন ধরনের মুখোশ তৈরির উদ্যোগ নেন ঃ (১) ‘চো’, (২) ‘লোটোকই’, (৩) ‘মুখ’। ‘চো’ হল সবচেয়ে বড়ো আবরণ যেটি সমগ্র দেহকে আবৃত করার

জন্য দুটি অংশে বিভক্ত ঃ ঊর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নার্ধ। কিছু 'চো' প্রায় ১৫ ফিট পর্যন্ত উঁচু, যার ফলে দেবতা বা দৈত্য-দানবের বিশালাকৃতি সম্ভব হয়। মাঝে মাঝে এগুলি এত ভারী হয়, যার ফলে যেসব দৈত্য বা জন্তুর মঞ্চে খুব একটা ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই, তাদের জন্যই প্রধানত এগুলি নির্মিত হয়। 'লোটোকই' হল মাঝারি ধরনের বহিরাবরণ, এবং 'মুখোশ' শুধুমাত্র মুখের আচ্ছাদন। ইদানীং অবশ্য অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের 'মুখোশ' ব্যবহার আসামে ক্রমশ কমে আসছে, ফলে মাজুলি সহ অন্যত্র 'মুখোশ' তৈরিকে কেন্দ্র করে যে কুটির-শিল্প একদিন গড়ে উঠেছিল তাতে স্বাভাবিক কারণেই সংকট দেখা দিচ্ছে।

শংকরদেব-সৃষ্ট শিল্প সংস্কৃতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হল একদিকে 'Great tradition' বা ধ্রুপদী সংস্কৃতি এবং অন্যদিকে 'Little tradition' বা লোকসংস্কৃতির অপূর্ব যুগলবন্দি অবস্থান, যেটি একই সাথে নান্দনিক এবং জনপ্রিয়।

২৪.৫.৫.৩.৩ 'বরগীত'

কৃষ্ণ ও রামের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এবং বিশেষ বিশেষ রাগে বাঁধা 'বরগীত' একধরনের ভক্তিমূলক গীত, যেটি লোকসংগীত পর্যায়ভুক্ত নয়। কালিরাম মেধি এই গীতকে 'Great Songs', দেবেন্দ্রনাথ বেজবরুয়া 'Holy Songs' এবং বাণীকান্ত কাকতি 'Noble Numbers' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। **শংকরদেবের ২৪০টি এবং মাধবদেবের ১৫৭টি নিয়ে 'বরগীত'-এর যে ভাণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে তার সুরের মূর্চ্ছনা শুধু 'সত্র' বা 'নামঘর'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বাইরেও প্রসারিত হয়েছে। একমাত্র শংকরদেব ও মাধবদেবের সংগীতগুলিই 'বরগীত' হিসাবে স্বীকৃত, অন্যান্যদের রচিত ভক্তিগীতিগুলিকে এই মর্যাদা দেওয়া হয় না।** 'বরগীত'গুলি প্রায় ৩০টি রাগে বিভক্ত, যার মধ্যে একটি বা দুটি ছাড়া প্রায় সবগুলির উল্লেখ ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রগুলিতে পাওয়া যায়—যেমন, আহির, সিন্ধুড়া, কল্যাণ, কেদার, মল্লার, কামোদ, শ্রীগৌরী, ধানশ্রী, ললিত, বসন্ত, পূরবী ইত্যাদি ইত্যাদি। সাধারণত 'বরগীত'-এর সাথে শুধুমাত্র খোল বা মৃদঙ্গ ও নাগরা বাজানো হয় তালবাদ্যরূপে, অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংগীতশাস্ত্রে চার ধরনের বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ থাকে, যেমন, (১) Idiophones বা ঘনযন্ত্রবাদ্য—খঞ্জনি, ঘণ্টা, নূপুর ইত্যাদি। (২) Aerophones বা সুষিরযন্ত্রবাদ্য, যেগুলি হাওয়া অথবা ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়—বাঁশি, বিষাণ, শিঙা, ভেঁপু, তূর্য ইত্যাদি, (৩) Chordophones বা তারযন্ত্রবাদ্য, যেমন, বীণা, রবাব, এস্রাজ, একতারা,

দোতারা ইত্যাদি। (৪) Membranophones বা আনদ্ধযন্ত্রবাদ্য, অর্থাৎ চামড়া দিয়ে ঢাকা বাদ্যযন্ত্র, যেমন, ঢাক, ঢোল, নাকাড়া, খোল, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ ইত্যাদি। (সম্প্রতি অবশ্য পাঁচ নম্বর হিসাবে Electrophones বা ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র চালু হয়েছে—যেমন, theremins ইত্যাদি)। শংকরী শিল্প-সংস্কৃতিতে উপরোক্ত চার ধরনের বাদ্যযন্ত্র অনুমোদিত হলেও 'বরগীত'-এর ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন অনুশাসন চালু আছে এবং পবিত্রতা ও শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য এই নির্দেশ দীর্ঘদিন অনুসরিত হয়েছে। ইদানীং অবশ্য এত কঠিন অনুশাসনের প্রতি সকলে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না। প্রধানত কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে লোকসংগীতের সুরে যেসব ভক্তিগীত কামরূপসহ অন্যত্র রচিত হয়ে থাকে সেগুলিকে 'বরগীত'-এর গ্রাম্য সংস্করণ বলার প্রথা চালু হয়েছে।

ষোড়শ শতকে **আসামের প্রবর্তিত নববৈষ্ণব আন্দোলনকে 'নামধর্ম' বলা হয়**। 'নাম' শব্দটি যদিও 'ঈশ্বরের নাম' অর্থেই সাধারণত ব্যবহৃত হয়, তথাপি অসমিয়া মৌখিক সাহিত্যের যেসব দৃষ্টান্ত আছে সেখানে **'নাম' অর্থে অধিকাংশ স্থলে 'গান' বোঝায়**। লোকগীতের বা লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যখন 'নাম' যুক্ত হয়—যেমন, 'বিয়ানাম', 'আইনাম', 'বিহুনাম', 'ধাইনাম', 'গোপিনিনাম', 'দুর্গাগোঁসানির নাম' ইত্যাদিতে একদিকে যেমন বৈষ্ণব প্রভাব অনুভূত হয়, অন্যদিকে 'নাম' ও 'গান' সমার্থক হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে 'কামরূপিয়া লোকগীতি' অথবা 'গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতি'র বিষয়বস্তু উল্লেখযোগ্য। শংকরদেব এবং মাধবদেব যে 'বরগীত' রচনা করেছিলেন সেটি আসামের কথ্য ভাষায় ছিল না, বরং সংস্কৃতি, মৈথিলি ইত্যাদির প্রভাবে প্রভাবান্বিত 'ব্রজবুলি' ভাষায় ছিল—যেমন, 'মন মেরি রাম শরণে লাগু' ইত্যাদি। এছাড়া শাস্ত্রীয় সংগীতের সুরের শুদ্ধতা বজায় রেখে 'বরগীত' পরিবেশিত হত। এরই জন্য 'বরগীত'-এর আবেদন আসামের সীমানা অতিক্রম করতে পেরেছিল। দীর্ঘ ৫০০ বছর পথ পরিক্রমার পর আধুনিক যুগে 'কলাগুরু' বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা (১৭.৪৭ দ্রষ্টব্য), ভূপেন হাজারিকা (১৭.৫১ দ্রষ্টব্য), জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৭.২৮ দ্রষ্টব্য), জুবিন গর্গ প্রভৃতি অসমিয়া সংগীতের দিকপালদের হাতের স্পর্শে 'বরগীত' নতুনমাত্র ও নতুন জীবন লাভ করেছে।

২৪.৫.৬ আসামের অন্যান্য সংস্কৃতি ও উৎসব

আসামে সকলেই যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে একই ধরনের শিল্প-সংস্কৃতির আঙিনাভুক্ত তা নয়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি আছে।

জিকির ও **জারি** হল অসমিয়া মুসলমানদের ভক্তিমূলক গান যেটি সাধারণত গোল হয়ে বসে হাতে তালির সাথে গাওয়া হয়। **জিকির** শব্দটি আরবি 'জিকর' থেকে এসেছে যার অর্থ 'আল্লার নাম গান করা' বা 'আল্লাকে স্মরণ করা'। কথিত আছে, খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী আজান ফকির সুদূর বাগদাদ থেকে সপ্তদশ শতকে আসামে এসে এবং আহোম রমণীকে বিবাহ করে আসামকে স্বদেশ হিসাবে গ্রহণ করে প্রায় 'আট-কুড়ি' অর্থাৎ ১৬০টি 'জিকির' রচনা করেছিলেন। ধর্মপ্রাণ পির আজান ফকির-এর প্রকৃত নাম নাকি হজরত শাহ সৈয়দ মৈনুদ্দিন। আরবি কিংবা আহোম লিপিতে লিখিত 'জিকির' গানগুলির (যদিও আজপর্যন্ত কোনো লিখিত 'জিকির' উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি) সাথে বৈষ্ণব কবিদের রচনাবলী এবং 'ওজাপালি' ও দেহতত্ত্বের নৃত্যগীতের সাথে তুলনীয় বলে মনে করা হয়। আসামের গ্রামের সরল মুসলমানেরা বংশানুক্রমে এইসব গান শ্রুতি ও স্মৃতির মাধ্যমে প্রচার করে এসেছে। পরবর্তী সময়ে আরও অনেকে 'জিকির' রচনা করেছেন যদিও কবি ও সুরকারের নাম অপরিচিতই রয়ে গেছে। বিবাহ কিংবা সার্বজনিক ভোজসভায় মুসলমানরা দল বেঁধে 'জিকির' গান গেয়ে এবং নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। মেয়েরা 'জিকির' গান গাইলেও সাধারণত নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন না। কিছু 'জিকির' সুফি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ এবং অপরিহার্য কিছু আরবি শব্দ ছাড়া এগুলির ভাষা ও সুর অসমিয়া লোকগীতির অনুরূপ। আজান ফকির-এর মতো আসামের আদি মুসলমানেরা শুধু যে স্থানীয় রমণীদের জীবনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করেছিলেন তাই নয়, স্থানীয় জীবনপদ্ধতি ও সংস্কৃতি বহুল পরিমাণে গ্রহণ করে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিলেন। **সংস্কৃতির এই বাঁধনের জন্য আসামের মতো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এমন নজির ভারতের অন্যত্র সচরাচর দেখা যায় না।**

কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে অসমিয়া ভাষায় শোকার্ত হৃদয়ের **জারি** গান বা মর্সিয়াগানগুলি কার রচিত এটি নিশ্চিত করে বলা কঠিন হলেও সুদূর আরব দেশের চরিত্রগুলিকে যেন এইসব গানে অসমিয়া সাজ পরিয়ে উপস্থাপন করা হয়। অসমিয়া মুসলিমরা যেসব প্রথাপদ্ধতিতে সাধারণ বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকেন, হজরত আলির বিবাহও সেইভাবে বর্ণিত হয়েছে জারি গানে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আসামের মানুষ ও সংস্কৃতি মঙ্গোলীয়-তিব্বতীয়, আর্য, বর্মী প্রভৃতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মিলনের ফলেই উদ্ভূত এবং এরই জন্য সংস্কৃতির অঙ্গনে এত বিচিত্রতা। চা-বাগানের পুরুষ ও নারী শ্রমিকরা কিংবা শুধু

নারীরা পরস্পরের কোমর ধরে নির্দিষ্ট পদক্ষেপের মাধ্যমে ছন্দোবদ্ধভাবে যখন 'ঝুমুর' গানের সাথে তাল রেখে নাচে সেই সময় এটিকে ভিন্ন গোত্রের বলে মনে হয়। একই মন্তব্য বোড়োদের 'বগুরুম্বা' অথবা 'খেরাই' উৎসবের অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রযোজ্য। আসলে, আসামের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব স্বাদের বর্ণাঢ্য উৎসব আছে—যেমন, 'রাভা'দের 'বৈখু' এবং 'ফারকান্তি', 'মিরি' বা 'মিশিং'দের 'প্রাগ্' অথবা 'অলি-আই লিগাং', 'তিউয়া'দের 'ওয়ানশা' অথবা 'লঘুন', 'আহোম'দের 'মি-দেম্-মেহফি', 'কাছাড়ি'দের 'বাথৌ', 'দেউরি'দের 'বোহাগীয়া বিষু' ইত্যাদি ইত্যাদি।

একদিকে যেমন শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গনে বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য আছে, তেমনি কিছু প্রতীকের মাধ্যমে আসাম সংস্কৃতির ঐক্যও নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। এইরকম একটি প্রতীকের নাম **জাপ্পি বা জাপি**। এটি আসলে বাঁশের তৈরি টোকা বা টুপি বা মস্তকাবরণ যেটি অনাদিকাল ধরে আসামে চালু আছে। 'তাম্বুলপান' অথবা 'গামুচা'র সাথে এটিও খুব জনপ্রিয় এবং সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং যখন আসাম পরিভ্রমণে আসেন, তাঁকেও 'জাপ্পি' উপহার দিয়ে সম্বর্ধিত করা হয়েছিল। কৃষক, চা-বাগানের শ্রমিক থেকে শুরু করে জাতি-উপজাতির গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসাবে 'জাপ্পি'র কদর বর্তমানে বেড়েছে এবং বিশেষত জোড়হাটে বর্ণময় 'জাপ্পি' তৈরির জন্য বিভিন্ন কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। বেশভূষার ক্ষেত্রে অসমিয়া মহিলাদের 'মেখলা'র (কিছুটা শাড়ির মতো) নিজস্বতা আছে, যদিও খাসি বা কাছাড়ি মহিলাদের দেহাবরণ একই ধরনের।

২৪.৫.৭ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর অবদান

আসামে যেমন পার্বত্য উপজাতি হিসাবে কার্বি বা মিকির জনগোষ্ঠী আছে তেমনি সমতলের উপজাতি হিসাবে বোড়ো, রাভা, মিশিং বা মিরি, তিউয়া বা লালুং, দেউরি, সোনোয়াল কাছাড়িও আছে। এছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত তাই-আহোম, তাই-খামতি, চুটিয়া, মোরান, মটক, কোচ রাজবংশী প্রভৃতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী একই সাথে দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সংস্কৃতিও নানারূপ নিয়েছে। ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে, **অসমিয়া কথ্য ভাষার কমপক্ষে ২৫ শতাংশ উপজাতিদের অবদান**। উদাহরণস্বরূপ, 'খাং' (ক্রোধ)—চুটিয়া শব্দজাত, 'বরলা' (বিপত্নীক)—কোচ, 'ডং' (খাল)—মিকির, 'ডেকা' (যুবক)—চুটিয়া, 'বতর' (আবহাওয়া)—কার্বি, 'হিলোই' (বন্দুক)—তাই-

আহোম, 'আদলাহি' (অতিথি)—কার্বি (মিকির) এবং অসংখ্য বোড়ো শব্দ অসমিয়া ভাষায় স্থান পেয়েছে—যেমন, 'অনলি' (ঝামেলা), 'অব্র' (বোকামি), 'টংগন' (ঢাকের কাঠি), 'জাখলা' (মই), 'হোজা' (সাদা-মাটা), 'লফা' (সব্জি), 'হ্বং' (দুষ্টু) ইত্যাদি।

কাছাড়ি ভাষায় 'দি'/'ডি' = জল এবং আসামের অনেক স্থান বা নদীর নাম কাছাড়ি শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে—যেমন, ডিব্রুগুড়, ডিফু, দিহিং, দিয়াং, ডিমো ইত্যাদি। তাই-আহোমদের কাছে 'নাম' = জল, যেমন নামরূপ, নামডং, নামচই। আহোমদের চোখে 'টি'/'তি' = স্থান, যেমন টিপাম, টিপলিং, তিহু, তিয়োক, তিংখিন। কার্বি কথ্য ভাষায় 'লাম'/'ল্যাং' = জল, এবং আসামে জলের ধারে অনেক স্থানের নাম সম্ভবত এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে—যেমন, লামডিং, লংকা, ল্যাংঘিং, ল্যাংচোলিয়ত ইত্যাদি।

সংযোজন-১

দিল্লির সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কৃত অসমিয়া লেখক ও গ্রন্থ

সন	লেখক	গ্রন্থ
১৯৫৫	যতেন্দ্রনাথ দুয়ারা	বনফুল (কবিতা)
১৯৬০	বেণুধর শর্মা	কংগ্রেচর কচিয়ালি রজত (স্মৃতিকথা)
১৯৬১	বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য	ইয়ারুআঙ্গম (উপন্যাস)
১৯৬৪	বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া	অসমর লোক-সংস্কৃতি
১৯৬৬	অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরি	বেদনার উল্কা (কবিতা)
১৯৬৭	ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী	আধুনিক গল্প সাহিত্য
১৯৬৮	নলিনীবালা দেবী	অলকানন্দা (কবিতা)
১৯৬৯	অতুলচন্দ্র হাজারিকা	মঞ্চলেখা (অসমিয়া থিয়েটার)
১৯৭০	লক্ষ্মীনাথ ফুকন	মহাত্মার পরা রূপকোনারলই (স্মৃতিকথা)
১৯৭২	সৈয়দ আব্দুল মালিক	অঘরি আত্মর কহানি (উপন্যাস)
১৯৭৪	সৌরভ কুমার চালিহা	গোলাম (ছোটগল্প)
১৯৭৫	নবকান্ত বরুয়া	কল্কি দিউটার হর (উপন্যাস)
১৯৭৬	ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়া	শৃঙ্খল (ছোট গল্প)
১৯৭৭	আনন্দচন্দ্র বরুয়া	বকুল বনর কবিতা (কবিতা)
১৯৭৮	হোমেন বরগোঁহাইন	পিতা-পুত্র (উপন্যাস)
১৯৭৯	ভবেন বরুয়া	সোনালি জাহাজ (কবিতা)
১৯৮০	যোগেশ দাস	পৃথিবীর অসুখ (ছোট গল্প)
১৯৮১	নীলমণি ফুকন (ছোট)	কবিতা
১৯৮২	ইন্দিরা গোস্বামী	মমরে ধরা তরোয়াল আরু ধুখন উপন্যাস (উপন্যাস)
১৯৮৩	নির্মলপ্রভা বরদোলুই	সুদীর্ঘ দিন আরু ঋতু (কবিতা)
১৯৮৪	দেবেন্দ্রনাথ আচার্য	জঙ্গম (উপন্যাস)

সন	লেখক	গ্রন্থ
১৯৮৫	কৃষ্ণকান্ত হ্যান্ডিক	কৃষ্ণকান্ত সন্দিকই রচনা—সম্ভার (রচনাবলী)
১৯৮৬	তীর্থনাথ শর্মা	বেণুধর শর্মা (জীবনী)
১৯৮৭	হরিকৃষ্ণ ডেকা	আন ইজন (কবিতা)
১৯৮৮	লক্ষ্মীনন্দন বোরা	পাতাল ভৈরবী (উপন্যাস)
১৯৮৯	হীরেন গোঁহাই	অসমিয়া জাতীয় জীবন্ত মহাপুরুষিয় পরম্পরা (উপন্যাস)
১৯৯০	স্নেহা দেবী	স্নেহাদেবীর একুকি গল্প (ছোট গল্প)
১৯৯১	অজিত বরুয়া	ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি পদ্য (কবিতা)
১৯৯২	হীরেন ভট্টাচার্য	সইচর পইহর মঘু (কবিতা)
১৯৯৩	কেশব মোহান্ত	মোরে যে ক্ষণ নেপা (কবিতা)
১৯৯৪	শীলভদ্র (রেবতীমোহন দত্তচৌধুরি)	মধুপুর বহুদূর (ছোট গল্প)
১৯৯৫	চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়া	মহারথী (উপন্যাস)
১৯৯৬	নিরুপমা বরগোঁহাইন	অভিযাত্রী (উপন্যাস)
১৯৯৭	নগেন শইকিয়া	অন্ধরাত নিজর মুখ (ছোট গল্প)
১৯৯৮	অরুণ শর্মা	আশীর্বাদর রং (উপন্যাস)

সংযোজন-২

১৯৩৭ সাল থেকে আসাম বিধানসভার অধ্যক্ষ (স্পিকার)

নাম	সময়কাল
১. বসন্ত কুমার দাস	৭ এপ্রিল, ১৯৩৭—১১ মার্চ, ১৯৪৬
২. দেবেশ্বর শর্মা	১২ মার্চ, ১৯৪৬—১০ অক্টোবর, ১৯৪৭
৩. লখেশ্বর বরুয়া	৫ নভেম্বর, ১৯৪৭—৩ মার্চ, ১৯৫২
৪. কুলধর চালিহা	৫ মার্চ, ১৯৫২—৭ জুন, ১৯৫৭
৫. দেবকান্ত বরুয়া	৮ জুন, ১৯৫৭—১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯
৬. মহেন্দ্রমোহন চৌধুরি	৯ ডিসেম্বর, ১৯৫৯—১৯ মার্চ, ১৯৬৭
৭. হরেশ্বর গোস্বামী	২০ মার্চ, ১৯৬৭—১০ মে, ১৯৬৮
৮. মহীকান্ত দাস	২৭ আগস্ট, ১৯৬৮—২১ মার্চ, ১৯৭২
৯. রমেশচন্দ্র বরুয়া	২২ মার্চ, ১৯৭২—২০ মার্চ, ১৯৭৮
১০. যোগেন্দ্রনাথ হাজারিকা	২১ মার্চ, ১৯৭৮—৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯
১১. শেখ্ চাঁদ মহম্মদ	৭ নভেম্বর, ১৯৭৯—৭ জানুয়ারি, ১৯৮৬
১২. পুলকেশ বরুয়া	৯ জানুয়ারি, ১৯৮৬—২৭ জুলাই, ১৯৯১
১৩. জীবকান্ত গোগুই	২৯ জুলাই, ১৯৯১—৯ ডিসেম্বর, ১৯৯২
১৪. দেবেশ চন্দ্র চক্রবর্তী	২১ ডিসেম্বর, ১৯৯২—১১ জুন, ১৯৯৬

সংযোজন-৩

স্বাধীনোত্তর ভারতে আসামের রাজ্যপাল

১. আকবর হায়দারি (Akbar Hydari)—১৫ আগস্ট, ১৯৪৭—ডিসেম্বর, ১৯৪৮।

২. রোনাল্ড ফ্র্যান্সিস্ লজ্ (Ronald Francis Lodge)—মাত্র দেড় মাসের জন্য সাময়িকভাবে (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ পর্যন্ত) নিযুক্ত।

৩. শ্রীপ্রকাশ (Sri Prakasa)—১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯—২৭ মে, ১৯৫০।

৪. জয়রামদাস দৌলতরাম (Jairam Das Daulatram)—২৭ মে, ১৯৫০—১৫ মে, ১৯৫৬।

৫. সৈয়দ ফজল আলি (Saiyid Fazal Ali)—১৫ মে, ১৯৫৬—২২ আগস্ট, ১৯৫৯।

৬. চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ সিন্হা (Chandresar Prasad Sinha)—২৩ আগস্ট, ১৯৫৯—১৪ অক্টোবর, ১৯৫৯। (সাময়িকভাবে)

৭. সত্যবন্ত মল্লনাহ শ্রীনাগেশ (Satyavant Mallanah Shrinagesh)—১৪ অক্টোবর ১৯৫৯—১২ নভেম্বর, ১৯৬০ (প্রথমবার)

৮. বিষ্ণু সহায় (Vishnu Sahay)—১২ নভেম্বর, ১৯৬০—১৩ জানুয়ারি, ১৯৬১ (প্রথমবার)

৯. সত্যবন্ত মল্লনাহ শ্রীনাগেশ (Satyavant Mallanah Shrinagesh)—১৩ জানুয়ারি, ১৯৬১—৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ (দ্বিতীয়বার)

১০. বিষ্ণু সহায় (Vishnu Sahay)—৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২—১৭ এপ্রিল ১৯৬৮ (দ্বিতীয়বার)

১১. ব্রজকুমার নেহরু (Braj Kumar Nehru)—১৭ এপ্রিল, ১৯৬৮—১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ (দু'মাসের জন্য বি. কে. নেহরুর অনুপস্থিতিতে পি. কে. গোস্বামী [P. K. Goswami] ডিসেম্বর ১৯৭০—জানুয়ারি ১৯৭১ সাময়িকভাবে নিযুক্ত ছিলেন।)

১২. লালন প্রসাদ সিং (Lallan Prasad Singh)—১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩—১০ আগস্ট, ১৯৮১।

১৩. প্রকাশ চন্দ্র মেহরোত্রা (Prakash Chandra Mehrotra)—১০ আগস্ট, ১৯৮১—২৮ মার্চ, ১৯৮৪ (এরপর কয়েকদিনের জন্য টি. এস. মিশ্র [T. S. Mishra] দায়িত্বে থাকেন)

১৪. ভীষ্ম নারায়ণ সিংহ (Bhishma Narayan Singh)—১৫ এপ্রিল, ১৯৮৪—১০ মে, ১৯৮৯।
১৫. হরিদেও যোশী (Harideo Joshi)—১০ মে, ১৯৮৯—২১ জুলাই, ১৯৮৯ (সাময়িকভাবে নিযুক্ত)
১৬. অ্যানিসেটি রঘুবীর (Anisetti Raghubir)—২১ জুলাই, ১৯৮৯—২ মে, ১৯৯০ (সাময়িককালের জন্য)
১৭. ডি. ডি. ঠাকুর (D. D. Thakur)—২ মে, ১৯৯০—১৭ মার্চ, ১৯৯১
১৮. লোকনাথ মিশ্র (Lok Nath Misra)—১৭ মার্চ, ১৯৯১—১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭
১৯. শ্রীনিবাস কুমার সিন্‌হা (Srinivas Kumar Sinha)—১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭—২১ এপ্রিল, ২০০৩।
২০. অরবিন্দ দাভে (Arvind Dave)—২১ এপ্রিল, ২০০৩—৫ জুন, ২০০৩।
২১. অজয় সিংহ (Ajai Singh)—৫ জুন, ২০০৩—৪ জুলাই, ২০০৮।
২২. শিব চরণ মাথুর (Shiv Charan Mathur)—৪ জুলাই, ২০০৮—

সংযোজন-৪

স্বাধীনোত্তর ভারতে আসামের মুখ্যমন্ত্রী

১৫ আগস্ট, ১৯৪৭—৬ আগস্ট, ১৯৫০	ঃ	গোপীনাথ বরদোলই
৯ আগস্ট, ১৯৫০—২৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৭	ঃ	বিষ্ণুরাম মেধি
২৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৭—৬ নভেম্বর, ১৯৭০	ঃ	বিমলাপ্রসাদ চালিহা
১১ নভেম্বর, ১৯৭০—৩১ জানুয়ারি, ১৯৭২	ঃ	মহেন্দ্রমোহন চৌধুরি
৩১ জানুয়ারি, ১৯৭২—১২ মার্চ, ১৯৭৮	ঃ	শরৎচন্দ্র সিন্‌হা
১২ মার্চ, ১৯৭৮—৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯	ঃ	গোলাপ বরবোরা
৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯—১১ ডিসেম্বর, ১৯৭৯	ঃ	যোগেন্দ্রনাথ হাজারিকা
১১ ডিসেম্বর, ১৯৭৯—১২ ডিসেম্বর, ১৯৮০	ঃ	**রাষ্ট্রপতির শাসন**
১২ ডিসেম্বর, ১৯৮০—২৯ জুন, ১৯৮১	ঃ	আনোয়ারা তৈমুর (মহিলা)
২৯ জুন, ১৯৮১—১৩ জানুয়ারি, ১৯৮২	ঃ	**রাষ্ট্রপতির শাসন**
১৩ জানুয়ারি, ১৯৮২—১৯ মার্চ, ১৯৮২	ঃ	কেশব চন্দ্র গোগুই
১৯ মার্চ, ১৯৮২—২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩	ঃ	**রাষ্ট্রপতির শাসন**
২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩—২৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৫	ঃ	হিতেশ্বর শইকিয়া (প্রথমবার)
২৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৫—২৭ নভেম্বর, ১৯৯০	ঃ	প্রফুল্ল কুমার মোহান্ত (প্রথমবার)
২৭ নভেম্বর, ১৯৯০—৩০ জুন, ১৯৯১	ঃ	**রাষ্ট্রপতির শাসন**
৩০ জুন, ১৯৯১—২২ এপ্রিল, ১৯৯৬	ঃ	হিতেশ্বর শইকিয়া (দ্বিতীয়বার)
২২ এপ্রিল, ১৯৯৬—১৫ মে, ১৯৯৬	ঃ	ভূমিধর বর্মন

গ্রন্থপঞ্জি

[বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে অনেক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ঐসব গ্রন্থ ছাড়া আরও যেসব গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডটি রচিত হয়েছে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল]

Agrawal, M. M., *Ethnicity, Culture and Nationalism in N. E. India,* Indus Publishing Company, New Delhi, 1996.

Ahmed, Kamaluddin, *The Art And Architecture Of Assam,* Spectrum Publishing House, New Delhi, 1994.

Bannerjee, Dipankar : (i) *Heritage Guwahati,* Govt. of Assam, Guwahati, 2004 ; (ii) *Labour Movement in Assam,* Anamika, New Delhi, 2005 ; (iii) *Brahmo Samaj and North East India,* Anamika, New Delhi, 2006.

Baragohāñi, Nirupamā, Borgohain, Pradipta, *Abhiyatri : One Life Many Rivers,* (Translated by Pradipta Borgohain), Sahitya Akademi, New Delhi, 1999.

Barkataki, Meena Sharma, *British Administration in North East India (1826-74),* Mittal, Delhi, 1985.

Barkaith, Sukumar, *Hastibidyarnava Sarasamgraha (English & Assamese), 18th Century,* Assam Publication Board, Guwahati, 1976.

Barpujari, H. K., (i) *The American Missionaries and North-East India, 1836-1900 A. D.* Spectrum Publications, Guwahati, 1986; (ii) (ed.) *The Comprehensive History of Assam,* vol. III, Assam Publication Board, Guwahati, 1st edition, 1994; (iii) *North-East India : Problems, Policies, and Prospects : Since Independence,* Spectrum Publication, Delhi, 1998 ; (iv) *Assam In The Days Of The Company (1826-1858),* NEHU Publications, Shillong, 1996.

Barpujari, S. K., *History of the Dimasas (from the earliest times to 1896 A. D.),* Haflong Autonomous Council, N. C. Hills District, Assam, 1997.

Barua, Birinchi Kumar, (i) *History of Assamese Literature,* Sahitya Akademi, New Delhi, 1985 ; (ii) *A Cultural History of Assam,*

Lawyer's Book Stall, Guwahati, 1969 ; (iii) *Sankardeva*, Assam Academy, Guwahati, 1960.

Barua, Hem, (i) *The Red River & The Blue Hill*, Lawyer's Book Stall, Guwahati, 1954 ; (ii) *Assamese Literature*, National Book Trust, New Delhi, 1965.

Barua, Kanak Lal, *Studies in the Early History of Assam*, Kanaklal Barua Birth Centenary Celebration Committee [on behalf of] Asam Sahitya Sabha (Jorhat), 1973,

Baruah, Sanjib, *India Against Itself : Assam and the Politics of Nationality (Critical Histories Series)*, Oxford University Press, New Delhi, 1999.

Basa, Kishor K. and Medhi, Brinchi K., *Intangible Cultural Heritage of Assam*, Pratibha Prakashan, New Delhi, 2008.

Bezbaroa, Lakshminath, Sahityarathi Lakshminath Bezbaroa Birth Centenary Celebration Committee. *Assamese Language and Literature and Sahityarathi Lakshminath Bezbaroa.*, Delhi, 1968.

Bezbaruah, Ranju, (i) *America and India in Global and South Asian settings*, Punthi-pustak, Calcutta, 1999 ; (ii) (ed), *Sources of History of North East India*, ICHR, New Delhi, 2006.

Bharali, Arunima, *Assamese Culture : as reflected in the medieval Assamese literature*, Lawyer's Book Stall, Guwahati, 1999.

Bhattacharjee, J. B., (i) *North East Indian Perspectives in History*, Vikas Publishing House, New Delhi, 1995 ; (ii) "The Kachari (Dimasa) state formation", in Barpujari, H. K., *The Comprehensive History of Assam*, 2, Assam Publication Board, Guwahati, 1992.

Bhattacharyya, Birendra Kumar, (i) *Humour & Satire in Assamese Literature*, Sterling, New Delhi, 1982 ; (ii) *Gopinath Bardoloi*, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, New Delhi, 1986.

Bhattacharyya, Hiranya Kumar, *The Silent Invasion : Assam Versus Infiltration*, Spectrum Publications, Delhi, 2001.

Bhattacharyya, N. N., *Religious Culture of North-Eastern India*, Manohar Publishers & Distributors, New Delhi, 1995.

Bhuyan, Arun Chandra (ed.), (i) *Nationalist Upsurge in Assam*, Govt.

Second World War and Indian Nationalism, Manas Publications, New Delhi, 1975.

(iii) Bhuyan, Arun Chandra & De, Sibopada, (eds), ... *Political History of Assam,* vol. I, 1826-1919, Publication Board Assam, Guwahati, 1999.

.... *Political History of Assam,* vol. II, 1920-1939, Publication Board Assam, Guwahati, 1999.

——— *Political History of Assam,* vol. III, 1940-47, Publication Board Assam, Guwahati, 1999.

Bhuyan, P. C., *Laxminath Bezbaruah-Influence Of Tradition On His Writings,* Cosmo, Delhi, (Paperback), 2003.

Bhuyan, Suryya Kumar, (i) *Satasari Asama Buranji,* Gauhati University, Guwahati, 1964 ; (ii) *Kamrupar Buranji or An Account of Ancient Kamarupa, and a History of the Mogul Conflicts with Assam and Cooch Behar, up to A. D. 1682,* 1930.

Bose, Matilal, *Social History of Assam,* Concept Publishing Company, New Delhi, 1989.

Chaube, S. K, *Hill Politics in Northeast India,* Orient Longman Limited, New Delhi, 1973.

Chaudhuri, Prasenjit, *Socio-Cultural Aspects of Assam in the Nineteenth Century,* Vikas Pub. House, New Delhi, 1994.

Choudhury, R. D., (i) *Archaeology of Brahmaputra Valley of Assam,* Agam Kala Prakashan, Delhi, 1985 ; (ii) *Art Heritage of Assam,* Aryan Books International, 1998.

Chowdhury, Iswar Prasad, *Jyotiprasad Agarwala,* (Builders of Modern India), Publications Division, Govt. of India, Patiala House, New Delhi, 1986.

Danda, D., *The Dimasa Kacharis of Assam,* Concept Publishing Co., New Delhi, 1989.

Das, Amiya Kumar, *Assam's Agony : A Socio-Economic and Political Analysis,* Lancers Publishers, New Delhi, 1982.

Das, Jogesh, *Folklore of Assam,* NBT, India, New Delhi, 2005

Das, Paromita, (i) *History and Archaeology of North-East India (with Sp. Reference to Guwahati),* Agam Kala Prakashan, New Delhi, 2007 ; (ii) *Evolution of Assam : A Historical Perspective,* Published by IV Corps Army H. Q. Tejpur, Assam, 2005.

Deka, Kanak Sen, *Assam's Crisis : Myth and Reality,* Mittal Publications, New Delhi, 1993.

Deka, Meeta, *Student Movement in Assam,* Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1996.

Dev, B. J. & Lahiri, Dilip K., *Cosmogony Of Caste And Social Mobility In Assam,* Mittal Publications, New Delhi, 1984.

Deva Goswami, Basanta Kumar, *A Critical Study of the Ramayana Tradition of Assam, upto 1826 A. D.,* Punthi Pustak, Calcutta, 1994.

Dhar, Nripen, *Impact of Immigration in Assam (1871-1951),* Worldview, Kolkata.

Dhekial Phukan, Anandaram, *Anandaram Dhekiyal Phukanar Racana Samgrah,* Guwahati : Lawyer's Book Stall, 1977.

Duara Barbarua, Srinath, *Tungkhungia Buranji,* H. Milford, Oxford University Press, Bombay, 1933.

Dutta, Anima, *Assam Vaishnavism : Its twentieth century voice, Lakshminath Bezbaroa,* Mittal Publications, New Delhi, 1989.

Dutta, Arup Kumar, (i) *The Brahmaputra,* National Book Trust, New Delhi, 2001 ; (ii) *Bhupen Hazarika : The Roving Minstrel,* Rupa & Co., New Delhi, 2002.

Dutta, Birendranath, (ed.), *Traditional Performing Arts of North-East India,* Assam Academy for Cultural Relations, Guwahati, 1990.

Ganguly, Jalad Baran, *An Economic History of North East India from 1826 to 1947,* Akansha Publishing House, New Delhi, 2006.

Gogoi, Lila, *Sahitya-Samskriti-Buranji,* New Book Stall, Dibrugarh, 1972.

Gogoi, Padmeshwar (1968), *The Tai and the Tai Kingdoms,* Gauhati University, Guwahati.

Gohain, Hiren, *Assam : A Burning Question,* Spectrum Publications, Guwahati, 1985.

Goswami, Indira, (i) *The Shadow of Kamakhya,* Rupa & Co., New Delhi, 2001; (ii) *An unfinished autobiography,* Sterling Publishers, New Delhi, 1990.

Goswami, Praphulladatta, (i) *Folk-Literature of Assam,* Department of Historical and Antiquarian Studies in Assam, Guwahati, 1954 ; (ii) *Bohag Bihu of Assam and Bihu Songs,* Assam Publication Board, Guwahati, 1988.

Goswami, Priyam, (i) *Assam in the Nineteenth Century : Industrialization and Colonial Penetration,* Spectrum Publications, New Delhi, 1999 ; (ii) *Indigenous Industries of Assam : Retrospect and Prospect,* Anshah Publishing House, Delhi, 2005.

Guha, Amalendu : *Planters Raj to Swaraj, Freedom Struggle and Electoral Politics in Assam 1826-1947,* Tulika Books, New Delhi, 2006.

Gurdon, Philip Richard Thornhagh, *Some Assamese Proverbs,* The Assam Secretariat Printing Office, Shillong, 1896.

Hazarika, Sanjoy, *Strangers of the Mist : Tales of War and Peace from India's northeast,* Viking, Penguin Books India, 1994.

Hussain, Monirul, *The Assam Movement : Class, Ideology and Movement,* Manak Publications in association with Har-Anand Publications, Delhi, 1993.

Kakati, Banikanta, (i) *The Mother Goddess Kamakhya,* Publication Board Assam, Guwahati, 1989; (ii) *Aspects of Early Assamese Literature,* Gauhati University, Guwahati, 1959.

Kar, Makhanlal, (i) *Muslims in Assam Politics,* Omsons, Delhi, 1990 ; (ii) *Evolution of Constitutional Government and Assam Legislatures,* Akansha, New Delhi, 2005.

Khosla, G. S. A, *History of Indian Railways,* Ministry of Railways, Govt. of India, New Delhi, 1988.

Kumar, Nikhilesh, *Survey of Research in Sociology and Social Anthropology in North-East India (1970-1990),* Regency Publications, New Delhi, 1999.

Mazinder Baruah, Lily, *Lokopriya Gopinath Bordoloi, an Architect of Modern India,* Gyan Pub. House, New Delhi, 1992.

Medhi, Kaliram, (i) *Assamese grammar and origin of the Assamese Language,* Publication Board, Assam, 1988 ; (ii) *Studies in the Vaisnava literature & culture of Assam,* Asam Sahitya Sabha, Jorhat, Assam, 1978 ; (iii) *Kalirama Medhi Racanawali,* Asam Sahitya Sabha, Jorhat, 1979.

Misra, Udayon, *The Periphery Strikes Back : Challenges to the Nation-State in Assam and Nagaalnd,* Indian Institute of

Nag, Sajal, (i) *Roots of Ethnic Conflict, Nationality Question in North-East India,* Manohar, New Delhi, 1990 ; (ii) *Contesting Marginality : Ethnicity, Insurgency and Subnationalism in North-East India,* Manohar, New Delhi, 2002.

Neog, Maheswar, (i) *The Art of Painting in Assam.* Guwahati, Assam, 1959 ; (ii) Neog, Maheswar &. Barpujari H. K. (eds), *Professor Suryya Kumar Bhuyan Commemoration Volume,* All India Oriental Conference. Guwahati, Assam, 1966.

Pakrasi, Mira, *Folk Tales of Assam* (Paperback), Sterling Publishers, New Delhi, 1977.

Paul, Amar Krishna, *The Humanist : A Short Life Sketch of Dr. Indira Goswami,* Akansha, New Delhi, 2002.

Phukan, Tarunram, *Tarunarama Phukana Racanawali,* Asam Prakasan Parishada, Guwahati, 1977.

Rai Barma, Hemanta Kumar, *Kochbiharer Itihas,* (in Bengali), 2nd edition, 1988.

Rao, M. A., *Indian Railways,* National Book Trust, New Delhi, 1988.

Rastogi, Tara Charan, *Assam Vaisnavaism : Sociological Perspectives,* Omsons Publications, New Delhi, 1994.

Rhodes, N. G. and Bose, S. K., *A History of the Dimasa Kacharis– As Seen through Coinage,* New Mira Basu Publishers, Delhi, 2006.

Saikia, C. P. (ed.), *Laxminath Bezbaruah,* Guwahati, 1968.

Saikia, Rajen, *Social and Economic History of Assam (1853-1921),* Manohar Publishers & Distributors, 2001.

Satarawala, Kaikous Burjor, *Indira Goswami (Mamoni Raisom Goswami) & Her Fictional World*—The Search for the Sea, B.R.

Shakespear, Leslie Waterfield, History of Upper Assam, Upper Burmah and Northeastern Frontier, Macmillan (London), 1914.

Sharma, Monorama, *Social and Economic Change in Assam : Middle Class Hegemony,* Ajanta Books International, Delhi, 1990.

Sharma, Mukunda Madhava & Ratha, Satyanarayana, *Dr. Maheswar Neog : A Profile and a Short Bibliography,* Lawyer's Book Stall, Guwahati, 1974.

Singh, Jai Prakash & Sengupta, Gautam, (eds), Archeology of North-Eastern India, Har-Anand Publications, New Delhi. 1991.

চিত্র পরিচিতি

ক্রমিক নং	ছবির নাম	প্যারা
চিত্র-১	'সোরাই'/ 'জোরাই'	(২৪.৫.২)
চিত্র-২	দা-পর্বতিয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত পাথরের মন্দিরের দ্বার	(২৪.৩)
চিত্র-৩	কামাখ্যা মন্দির	(২৪.২.৩)
চিত্র-৪	অমলেন্দু গুহ	(১৭.১)
চিত্র-৫	হেরম্বকান্ত বরপূজারী	(১৭.৭৬)
চিত্র-৬	পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া	(১৭.৩৭)
চিত্র-৭	বাণীকান্ত কাকতি	(১৭.৪৩)
চিত্র-৮	সূর্যকুমার ভুঁইয়া	(১৭.৬৮)
চিত্র-৯	লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া	(১৭.৬২)
চিত্র-১০	মহেশ্বর নিয়োগ	(১৭.৫৩)
চিত্র-১১	বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া	(১৭.৪৬)
চিত্র-১২	বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য	(১৭.৪৯)
চিত্র-১৩	বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা	(১৭.৪৭)
চিত্র-১৪	হেমচন্দ্র বরুয়া	(১৭.৭৪)
চিত্র-১৫	জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা	(১৭.২৮)
চিত্র-১৬	গোপীনাথ বরদোলই	(১৭.২০)
চিত্র-১৭	নবকান্ত বরুয়া	(১৭.৩৪)
চিত্র-১৮	রজনীকান্ত বরদোলই	(১৭.৫৮)
চিত্র-১৯	পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া	(১৭.৩৯)
চিত্র-২০	শীলভদ্র / রেবতীমোহন দত্তচৌধুরি	(১৭.৬০)
চিত্র-২১	সৈয়দ আবদুল মালিক	(১৭.৬৯)
চিত্র-২২	রঙালী বিহু	(২৪.৫.৪)

চিত্রাবলি

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তিনাম

বিবিধপ্রসঙ্গ